গজেন্দ্রকুমার মিত্র রচনাবলী

ষষ্ঠ খণ্ড

মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ★ কলিকাতা-৭৩

সূচীপত্র

জন্মেছি এই দেশে

উৎসর্গ

শ্রীমান সবিতেন্দ্রনাথ রায়

কল্যাণীয়েষু

॥ ১ ॥

আড়াই শ' গজের মধ্যে তিনটি ইস্কুল। একটা মেয়েদের—সকাল সাড়ে ছ'টা থেকে দশটা একবার, এগারোটা থেকে চারটে আর একবার,—এই ডবল্ শিফ্টে চলে লেখাপড়ার পালা। সন্ধ্যেবেলা একটা কলেজও বসছে আজকাল, যদিও রেকগ্নিশন্ পায়নি। ছেলেদের ইস্কুলেও দু বার কাজ হয়—সন্ধ্যেটা কি কাজে লাগানো যায় কর্তৃপক্ষ ভাবতে শুরু করেছেন। কেবল ইন্দুমতী গদাধর হাই স্কুলে সকালটা মেয়েরা পড়ে, দুপুরে বসে ছেলেদের ইস্কুল।··· কিন্তু সে যাই হোক এই তিনটে ইস্কুলই ভর্তি থাকে ছেলেমেয়েতে। নতুন কাউকে ভর্তি করতে গেলে শুনতে হয়, 'এ বছর তো উপায় দেখছি না। আজকাল আবার ইন্স্পেক্টর এসে মাথা গুনে নেয়।·· সামনের ডিসেম্বরে নিয়ে আসবেন, চেষ্টা করে দেখব।···অবশ্য খুব অসুবিধা হয় তো পাঠাতে পারেন। বসবে, ইস্কুল করবে ঠিকই—খাতায় নামটা কেবল তুলতে পারব না।···মাইনে? হ্যাঁ তাও দেবেন, ওটা আমরা টিচার্স বেনিফিট্ ফাণ্ডে ডোনেশন ব'লে জমা ক'রে নেব।'

এধারে যখন এই অবস্থা—তখনও এম. ই. স্কুলে ছাত্রসংখ্যা বাড়ে না কেন? এ নিয়ে বলাইবাবু রীতিমত দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

অথচ এইটেই ওঁর ট্রাম্প্-কার্ড! অর্থাৎ কিনা রঙের গোলাম।

অনেক তদ্বিরে, অনেক ষড়যন্ত্রে এই সেক্রেটারীর পদটি তিনি পেয়েছেন। অন্য কোনও প্রতিষ্ঠানে পাত্তা পাননি, জনগণেশের পূজারী হওয়া (অবৈতনিক) যে এত কঠিন তা কে জানত! যদি বা দৈববলে এই চাকরীটি পেয়েছেন, সেটার একটা মূল্য স্বীকৃত না হ'লে চলবে কেন? আগামী মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে দাঁড়াতেই হবে। তখন পরিচয় দেবার মত যে আর কিছুই নেই। দাসপাড়া এম. ই. স্কুলের সেক্রেটারী—আপনাদের বিশ্বস্ত সেবক শ্রীবলাইচাঁদ মল্লিক আপনাদের ভোট প্রার্থনা করেন।' এই পোস্টার চোখ বুজলেই কল্পনানেত্রে দেখতে পান বলাইবাবু। কিন্তু যদি কেউ একথা বলে যে, 'দাসপাড়া এম. ই. ইস্কুল? সেটা আবার কি? আছে নাকি এ নামের কোন ইস্কুল?' তখন কি বলবেন তিনি? মোটে সাতষট্টিটি ছাত্র, সে আবার ইস্কুল, তার আবার সেক্রেটারী! বিশেষ ক'রে প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষ (সে যে কে কে দাঁড়াবে তাও মানস-চক্ষে দেখতে পাচ্ছেন বৈ কি!) তো একথা আগেই বলে বেড়াবে। টিট্কিরি দেওয়ার এ সুযোগ কি ছেড়ে দেবে তারা?

এদিকে, এই মিউনিসিপ্যাল ইলেক্শনে না দাঁড়াতে পারলে, ওর নাম পৌরনির্বাচনে জনগণের সেবকরূপে চিহ্নিত হ'তে না পারলে—ভবিষ্যতে য়্যাসেম্ব্লী ইলেক্শনেই বা দাঁড়াবেন কি ক'রে?

সুতরাং যেমন ক'রেই হোক এটায় দাঁড়াতে হবে। আর তা হ'লে পরে ইস্কুলটাকেও দাঁড় করাতে হবে।

অথচ উপায়ই বা কি? কোনও পথই তো দেখতে পান না বলাইবাবু? ক্যানভাসার নিযুক্ত করবেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন? কিন্তু তাতে কি কোন ফল হবে? ছেলেমেয়েদের শিক্ষার প্রশ্ন যেখানে সেখানে কি আর বিজ্ঞাপন দেখে লোকে ভুলবে? ঐ প'ড়ো টিনের চালায় পুরোনো ইস্কুল, ভাঙ্গা বেঞ্চি এবং নড়বড়ে চেয়ার—দেখলেই লোকের অভক্তি হয়। তা ছাড়া লোকের কেমন একটা ধারণা হয়ে গেছে যে ওসব সেকেলে ইস্কুলে পড়তে দিয়ে মিছিমিছি সময় নষ্ট ক'রে কোন লাভ নেই। একেবারে হাই স্কুলে দেওয়াই ভাল।

অনেক ভাবছেন বলাইবাবু—ইদানীং একরকম দিনরাতই ভাবছেন—কোথাও কোন কূলকিনারা দেখতে পাচ্ছেন না, এমন সময় একদিন সত্যেন এসে বললে, 'বলাইদা, আমাদের পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের কিছু একটা করুন। তাঁর এ দুর্দশা তো আর চোখে দেখা যায় না। অর্ধেক দিন ঠায় উপোস ক'রে কাটছে!'

'কেন, তাঁর তো একটা পেনসন ঠিক ক'রে দিয়েছি।'

'সাত টাকা পেনসন দেন মাসে। তাতে কি হয় বলুন তো? আপনার দৈনিক বাজার খরচই তো তার চেয়ে বেশি।'

'না—তা ঠিক নয়—' গলা ঝেড়ে সাফ ক'রে নেন বলাইবাবু, কন্ঠস্বরে বেশ জোরও পান, কারণ আজই বাজার করতে যে দশটাকার নোট দিয়েছিলেন ছেলেকে, তা থেকে তিনটাকা ছ পয়সা ফিরে এসেছে—'সে যাকগে, কিন্তু তার চেয়ে বেশি কোথা থেকে দিই বলো তো! ঐ তো ইস্কুলের অবস্থা। নেহাৎ সরকারী গ্রান্টটা আছে তাই।'

'সে তো জানি। অন্য একটা কিছু করতে হবে। আগে আগে তবু টিউশনি করতেন দু তিনটে, তাতে চলত। এখন আর ঘুরে ঘুরে টিউশনিও করতে পারেন না। কখনও কখনও দু একটা ছাত্র জোটে, বাড়ীতে এসে পড়ে। তা, তারা আর কতই বা দেবে বলুন? চার পাঁচ টাকার বেশি তো নয়। দুটো প্রাণী—এই বাজার, শুধু নুন-ভাত খেতে কত লাগে বলুন তো!'

অকস্মাৎ যেন নিকষ কালো আঁধারে জ্যোতির বিচ্ছুরণ হ'ল। মজ্জমান ব্যক্তি তৃণ নয়—একটা নৌকাই দেখতে পেলেন। বলাইবাবু বলে উঠলেন, 'থামো থামো। হয়েছে—আচ্ছা পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের বয়স কত হ'ল বলো তো।'

'বয়স? ঠিক ষাটে রিটায়ার করেছেন, আর সেও তো আজ দশ বছর হ'ল। পুরো সত্তর ধরুন।'

'ঠিক হয়েছে। ইয়া—মার দিয়া কেল্লা! সেপ্টুয়াজেনারী করা যাক্ পূর্ণ মাষ্টার মশায়ের। কি বলো?'

'অর্থাৎ—?' সত্যেন কথাটা ঠিক বুঝতে না পেরে বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

'আরে, এটা বুঝলে না? জয়ন্তী—মাষ্টার মশাইয়ের সত্তর বছর পূর্ণ হওয়ার উপলক্ষে এক বিরাট জয়ন্তী সভার আয়োজন করা যাক। সেই সভায় ওঁকে এক অভিনন্দন পত্র, গরদের ধুতি-চাদর এবং একটা টাকার পার্স দেওয়া হবে। এমনি দুঃস্থ মাষ্টারের জন্য দু-এক টাকা চাঁদা চাইতে গেলে কেউ দেবে না ভাই, কিন্তু জয়ন্তী বললে লোকে বুঝবে—দেবেও।'

'দেবে কি?' সংশয়ের সুর বাজে সত্যেনের কণ্ঠে।

'আলবৎ দেবে। দেওয়াতে হবে। বেশ বড় ক'রে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এক য়্যাপীল বার করতে হবে, দেখাতে হবে যে এত বড় মহাপ্রাণ ব্যক্তি এদিকে আর জন্মায়নি। তবে দেবে। দাদা, সবাই বড়কে দিতে চায়—সেই আলোয় নিজেকেও আলোকিত করবে ব'লে। কেষ্ট বিষ্টু একজনের অভিনন্দন-সভায় চাঁদা দিলে হয় তো নাম বেরোবে, জানাজানি হবে—এমনি প্রাইভেট ভিক্ষে দিয়ে লাভ কি?··· না না, সে ঠিক হয়ে যাবে—দ্যাখো না, এয়সা মুসুবিদে করব একখানা য়্যাপীল!'

উৎসাহে বলাইবাবুর চোখ জ্বলতে থাকে!

॥ ২ ॥

কলকাতার উপকণ্ঠে গ্রাম—এখন প্রায় শহরই হয়ে উঠেছে। বাড়ী ভাড়ার রেট ও জিনিসপত্রের দাম কলকাতাকে ছাড়িয়ে গেছে। শুধু নাগরিক জীবন-যাপনের কতকগুলো স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা এখনও হয়নি। খোলা নর্দমার দুর্গন্ধে বাতাস বিষাক্ত হয়ে থাকে, মশার উৎপাতে সন্ধ্যা থেকে বসা যায় না।

তা হোক, লোক কম নেই এখানে। টাকা কি আর উঠবে না? খুব উঠবে!

বলাইবাবু নিজেকে আশ্বাস দিয়ে য়্যাপীল লিখতে বসেন।

লেখবার আছেও ঢের। যখন জায়গাটা শহর হয়নি, সেই প্রায় নব্বুই বছর আগে, ১৮৬২ সালে, প্রথম ইংরেজী পড়বার ব্যবস্থা হয় এই ইস্কুলের পত্তনে। সেই ইস্কুলের হেড মাষ্টার পূর্ণবাবু বিয়াল্লিশ বছর হেডমাষ্টারি করার পর অবসর নিয়েছেন। কর্মক্লান্ত জীবনে তবু দেশবাসীর সেবা বন্ধ করেননি, এখনও যতটা পারছেন বিদ্যা বিতরণ ক'রে যাচ্ছেন। এখানকার অনেক বিখ্যাত এবং প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তিই তাঁর ছাত্র। তাঁরা সবাই জানেন, কি যত্নের সঙ্গে, কি ঐকান্তিকতার সঙ্গে পূর্ণবাবু ছাত্রদের পড়াতেন। অধ্যাপনা ছিল তাঁর তপস্যা, ছাত্ররা ছিল তাঁর ইষ্ট।

সংক্ষেপে এই।

আর যা ইতিহাস তা এতে লেখবার নয়। তাতে সুর কেটে যাবে। সমস্ত সত্য ইতিহাস বিবৃত করতে গেলে বলতে হয় যে আঠার বছর বয়সে কুড়ি টাকা মাইনেতে ঢুকে ছিলেন, রিটায়ার করেছেন পঁয়ত্রিশ টাকাতে—বিয়াল্লিশ বছর

চাকরী করার পরও। বলা চলত যে এই সেবার পরও ওঁরা তাঁকে সাত টাকার বেশি পেন্‌সন দিতে পারেননি। বলা চলত যে মাটির একখানি ঘর ভরসা—তারও গোলপাতা পচে গলে গেছে, বর্ষায় ভেজা ছাড়া উপায় থাকে না। সে ঘরও হেলে পড়েছে গোড়ার মাটি ধুয়ে গিয়ে—পাশে ভাগ্‌নের প্রাসাদে ঠেকে না থাকলে পড়েই যেত। বলা যেত যে ওঁর সে ভাগ্‌নে ওঁর কাছেই ছেলেবেলার লেখাপড়া শিখে বড় চাকরী পেয়ে এই প্রাসাদ তৈরী করেছে কিন্তু তার একখানা ঘর মামাকে ছেড়ে দিতে পারেনি—তবে মাসিক পাঁচ টাকা ক'রে সাহায্য করে।

কিন্তু এসব বললে চলবে না।

আর যা বলা উচিত ছিল—সেটার গুরুত্ব বলাইবাবু জানেন না। বলা চলত যে পূর্ণ মাষ্টার মশাই যখন পড়াতেন প্রতিটি ছাত্রের দায়িত্ব বহন করতেন নিজে। কোন একটি ছাত্রকে কি একটা ভুল অর্থ ব'লে দিয়ে একটি পুরো রাত ঘুমোতে পারেননি তিনি; পরের দিন ভোরে উঠে আড়াই মাইল পথ হেঁটে গিয়ে ভুলটা সংশোধন ক'রে এসেছিলেন। বলা চলত যে প্রত্যেকটি বই পড়ে দেখে তবে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতেন। ইদানীং কর্তৃপক্ষের চাপে সব সময় নিজের পছন্দমত বই পাঠ্য করতে পারতেন না। কিন্তু ভুল আছে কি না দেখে সংশোধন ক'রে তবে ছাড়তেন। একবার জিতেন্দ্রলালের নামে প্রচলিত একটি ইংরেজী বইতে in the sun-এর জায়গায় under the sun দেখে তিনদিন তিনরাত্রি নিদ্রা ছিল না তাঁর। একদিকে লেখকের প্রচন্ড খ্যাতি আর একদিকে নিজের জ্ঞান—এই দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে একদিন প্রকাশকের কাছে ঠিকানা জোগাড় ক'রে সত্যি-সত্যিই কর্ণওয়ালিস্‌ স্ট্রীটে জিতেন্দ্রলালের বাসায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তারপর যখন জিতেন্দ্রলাল সে ভুল স্বীকার ক'রে নিলেন এবং অকপটে জানালেন যে বইটি তাঁর লেখা নয়—তখন তিনি একবার অবশ্য চোখ বুলিয়ে দিয়েছিলেন কিন্তু ওটা দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে—তখন পূর্ণ মাষ্টার মশাই স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিলেন, কথাটা বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয়নি এবং বেরিয়ে আসবার সময় যখন জিতেনবাবু ধন্যবাদ দিয়ে ওঁর সঙ্গে করমর্দন করলেন তখন যে পূর্ণবাবুর চোখে জল এসেছিল তা ভাবাবেগে নয়, জিতেনবাবুর মত শিক্ষিত লোক সামান্য ক-টা টাকার জন্য পরের বইতে নিজের নাম দিয়েছেন এই ভেবে ক্ষোভে ও ধিক্কারেই তাঁর নিজের চোখে জল এসে গিয়েছিল। অর্থাৎ শিক্ষাকে ব্যবসা হিসাবে কখনও তিনি দেখতে পারেননি। অন্য মর্যাদা ছিল তার—তাঁর কাছে।

বলাইবাবু হয় তো এত ইতিহাস জানতেন না, কিংবা জানলেও তার এত মূল্য বুঝতেন না। তিনি নিজে এ স্কুলের ছাত্র ছিলেন না কিন্তু শুনেছিলেন যে পূর্ণ মাষ্টার মশাই হাতের লেখা নিয়ে বড় খিট খিট করেন। আইয়ের মাথায় ফুট্‌কী না দিলে কিংবা ছোট টি-এর মাথা না কাটলে নম্বর কাটেন। সে জন্য তিনি আগে পাগল মনে করতেন ওঁকে, এখন করুণার চোখে দেখেন।

যাই হোক—য়্যাপীল লেখা হ'ল। তাতে 'পূর্ণচন্দ্র সংবর্ধনা সমিতি'র

হয়ে বলাইবাবু নিজেই সম্পাদক ব'লে সই করলেন। সমিতির সভ্য হিসাবে কয়েকটি নামও বলাইবাবু বসিয়ে দিলেন নীচে। সত্যেনকে চোখ টিপে বললেন, 'বেশ শাঁসালো দেখেই নাম দিয়েছি। সভ্যদের কাছ থেকে পাঁচ টাকার কম নিও না—বলবে সে কি স্যার, আপনি সংবর্ধনা সমিতির সভ্য, এর চেয়ে কম দিলে চলে কখনও ?'

সত্যেন বললে, 'যদি কেউ বলে এ সমিতি কবে গঠিত হ'ল—কারা করলে, তখন কি বলব ?'

'কেউ তা জিজ্ঞেস করবে না। আর যদিই করে তো বলবে, অমুকদিন বলাইদার ওখানে আমরা একদিন মীট্ করেছিলুম। আপনি স্যার সর্বসম্মতি ক্রমে সভ্য নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যাস—ওতেই গলে যাবে।'

পাড়ার পশুপতি প্রিণ্টিং ওয়ার্কস-এর মালিককে ধরে য়্যাপীলখানা বিনামূল্যে ছাপিয়ে নেওয়া হ'ল। কাগজও তিনিই দিলেন। এছাড়া বিল-বুকের দাবীটাও জানানো রইল। বলাইবাবু বললেন, 'তুই তো ওঁর ছাত্তর রে পশু। এছাড়াও তো চাঁদা আশা করি কিছু তোর কাছে। তাঁর জন্যই তো ক'রে খাচ্ছিস আজ।'

পশুপতি অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'তা ঠিক। তবে কি জানিস্ কাগজ মেলে না, ছাপার কাজ ত একরকম বন্ধই। নেহাত খদ্দেরের কাছ থেকে স্পয়লেজ ব'লে কিছু কিছু সরিয়ে রাখি দু'চার শীট, তাই এখন দিতে পারলুম। নইলে এই কাগজ জোটানোই ভার হ'ত। তা না হ'লে দিতে কি আর অসাধ।'

য়্যাপীলের একখানা কাগজ দৈবাৎ একদিন হাত-ফেরতা হয়ে পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের হাতে এসে পড়ল। তিনি প্রায় ছুটতে ছুটতে এলেন বলাইবাবুর কাছে, 'ও বলাই, এ করেছ কি? ছি ছি এ বন্ধ করো। আমার মত সামান্য লোক—না না, ভারি লজ্জার কথা।'

'কি বলছেন মাষ্টার মশাই। আপনার দেশবাসী যদি আপনাকে সম্মান দেখানোর উপযুক্ত মনে করে—সে ক্ষেত্রে আপনার আপত্তি করবার কি আছে? আর আপত্তি করলেই বা শুনবে কে! ও আমরা সবাই মিলে স্থির করেছি স্যার!'

পূর্ণ মাষ্টার মশাই আকুল হয়ে উঠলেন, 'কিন্তু কে কি মনে করবে, সে একটা—না না, য়্যাপীল করেছ করেছ, ও নিয়ে আর নাড়া চাড়া ক'রো না। টাকা কড়ি তুলো না, লক্ষ্মী বাপ আমার।'

বলাই মাথা চুলকে বললেন, 'সে তো আর হয় না স্যার—টাকা কিছু কিছু যে উঠে গেছে। এধারেও সব অ্যারেঞ্জমেণ্ট রেডি। আর সত্যি কথা বলতে কি, পাড়ার লোকের আগ্রহও খুব। আপনি কিছু ভাববেন না, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

পূর্ণ মাষ্টার মশাই আর বার-দুই ক্ষীণ প্রতিবাদ ক'রে বিমর্ষ চিত্তে বাড়ী

ফিরলেন। তাঁর অবস্থা দেখে মনে হ'তে লাগল যে এরকম বিপন্ন জীবনে তিনি হননি। কারুর সঙ্গে পথে ঘাটে দেখা হ'লে পাছে এ প্রসঙ্গ কেউ তোলে সেই ভয়ে প্রাণপণে সবাইকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অবশেষে একদিন সত্যেন এসে তাঁকে প্রণাম ক'রে চরম দুঃসংবাদটি দিয়ে গেল—আগামী মাসের পাঁচ তারিখে যে রবিবার, সেইদিনই ওঁকে অভিনন্দন দেবার দিন স্থির হয়েছে। সভাপতিত্ব করবেন স্থানীয় এক অধ্যাপক। ওঁর পুরাতন স্কুল-হলেই সভার অধিবেশন হবে।

খবরটা শুনে কিছুক্ষণ যেন স্তম্ভিত হয়ে চেয়ে রইলেন পূর্ণবাবু। হবে এটা ঠিক—কিন্তু এত তাড়াতাড়ি যে হবে তা তিনি ভাবেননি। চাঁদা তোলা ব্যাপারটা সহজ নয়, এই ভেবে কিছুটা নিশ্চিন্ত ছিলেন। এখন একেবারে নির্ঘাৎ তারিখটি পর্যন্ত যখন জানা হয়ে গেল তখন আর ক্ষীণ আশাও রাখতে পারলেন না। সত্যেনকে আশীর্বাদ করবার জন্য হাত তুললেন, ঠোঁট দুটোও নড়ল কিন্তু কণ্ঠ ভেদ ক'রে কোন স্বর বেরোল না।

॥ ৩ ॥

চাঁদা তোলা ব্যাপারটা সত্যিই সোজা নয়। তবু হয়তো আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে আরও কিছু টাকা উঠত, কিন্তু বলাইবাবুর আর সে সময় ছিল না। মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন আসন্ন, আগামী মার্চেই বোধ হয় হবে। ভোটার তালিকা তৈরী হচ্ছে। এখন থেকে ওদিকে মন না দিলে দাঁড়ানো যাবে না, এ সব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে এখনও কি থাকা সম্ভব ?

অগত্যা যা টাকা উঠেছে তাতেই কাজ সারতে হবে। দেখা গেল, কাপড় চাদর কিনে আর সত্তরটি টাকা থাকে। বলাইবাবু বললেন, 'বেশ, আমি ওতে পাঁচটাকা দিয়ে পঁচাত্তর ক'রে দেব এখন। কি আর হবে। বরং না হয় য়্যানাউনসমেন্টের সময় একশ' এক বললেই হবে।'

সত্যেনের আয় খুবই কম। তবু সে বললে, 'আচ্ছা দিন ঠিক করুন। দেখি যদি অফিস থেকে ধার পাই তো ওটা পুরো ক'রেই দেব আমি।'

সুতরাং দিন স্থির, সভাপতি নির্বাচন সব ঠিক হয়ে গেল। কিছু জলযোগের আয়োজন করতে হবে, সেটা ঐ ইস্কুল থেকেই চাঁদা তুলে হেডমাষ্টার মশাই ব্যবস্থা করবেন স্থির হ'ল। বলাইবাবু নিশ্চিন্ত হয়ে নিজের কাজে মন দিলেন। অর্থাৎ পাড়ায় পাড়ায় যারা ভোটের চাঁই তাদের কাছে কীর্তিটাকে যতটা সম্ভব ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে ব'লে বেড়াতে লাগলেন।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনের দিন দুই আগে থেকেই পূর্ণবাবুর আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। বিয়ের দিন ঘনিয়ে এলে কিশোরী মেয়েদের যে অবস্থা হয়, কতকটা সেই অবস্থাই হ'ল ওঁর। আগের দিন তো সমস্ত রাত ঘুমোতে পারলেন না!

গৃহিণীরও সেই ব্যাপার। ক্ষার সিদ্ধ ক'রে একমাত্র ব্যবহার-যোগ্য কাপড় জামা পরিষ্কার ক'রে রেখেছিলেন, আগের দিন গিয়ে বোনপোর কাছ থেকে

একটা মটকার চাদরও চেয়ে আনলেন। এমন দিন ওঁদের দীর্ঘ বিবাহিত জীবনে এতকালের মধ্যে কখনও আসেনি। সুতরাং উত্তেজনার কারণ আছে বৈকি!

কতকাল ইস্কুলে যাননি। বাড়ীটা চোখে দেখেননি প্রায় ন বছর।

রিটায়ার করার পরও দিন কতক গিয়েছিলেন, নিজে থেকে কয়েকটা ক্লাসে পড়াতে গিয়েছিলেন, অযাচিত ভাবে উপদেশ দিতে গিয়েছিলেন নতুন হেড-মাষ্টারকে, কিন্তু তারপর একদিন বুঝতে পারলেন যে সে ভদ্রলোক এতে বিরক্ত হন, এমন কি ওঁর নিঃস্বার্থ ভাবে পড়ানোটাও পছন্দ করেন না। ওসব নাকি সেকেলে, ব্যাক্‌ডেটেড্‌ পদ্ধতি—একালে আর ওসব চলে না।

সেই থেকে অভিমান করে আর যাননি ওদিকে। কোন কাজে ওদিকে যেতে হ'লে মুখ অন্য দিকে ফিরিয়ে গেছেন, চোখ তুলে চেয়ে দেখেন নি।

এতকাল পরে আবার সেই বাড়ীতে পা দেবেন!

কথা ছিল, সত্যেন এসে নিয়ে যাবে ওঁকে। উনি সত্যেনকে ব'লে দিয়েছিলেন, 'একটু বরং আগে আসিস্‌ বাবা! ইস্কুলটা ঘুরে দেখব।' সত্যেনও অবশ্য যতটা সম্ভব আগেই এসেছিল—ঠিক ক'রে বলতে গেলে, যখন আসা উচিত তার পুরো একটি ঘণ্টা আগে—কিন্তু তবু সে এসে দেখলে পূর্ণ মাষ্টার মশাই সেজেগুজে একেবারে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে আছেন। পাছে বাতাসে চাদরটা উড়ে যায় সেজন্যে চাদরটা গলায় ঝুলিয়ে তার দুটো খুঁট্‌ এক ক'রে একটা হাতে ধরে আছেন, আর একটা হাতে প্রাচীনকালের একটি লাঠি। পায়ে ছেঁড়া একটি মোজা—চটি জুতোর সঙ্গে মোজা পরা মানায় না—এমন কি মোজা পরার কোন প্রয়োজনও নেই, এসব কথা ভেবে দেখার মত পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের অবস্থা নয়। সত্যেনও কিছু বলতে পারলে না, এমনিতেই হেঁট হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে দেখলে ওঁর পা দুটো কাঁপছে থর থর ক'রে।

বলাইবাবু বলেছিলেন, একটা গাড়ীর ব্যবস্থা করবেন; কিন্তু আজ যখন সত্যেন আসবার সময় সে কথাটা স্মরণ করাতে গেল তখন তিনি আকাশ থেকে পড়লেন, 'গাড়ী! তাইতো! গাড়ী কোথায় পাই! সত্যেন, তুমি ভাই লক্ষ্মীটি এক কাজ করো—একটা রিক্সা ক'রে ওঁকে নিয়ে এসো। এই তো এইটুকু—'

পূর্ণ মাষ্টার মশাই রিক্সা করবার প্রস্তাবেও মৃদু আপত্তি করলেন, 'এই তো সামান্য পথ, কি আর হবে বাবা—মিছামিছি অন্ততঃ গণ্ডা-ছয়েক পয়সা খরচ—'

কিন্তু সত্যেন বেশ একটু দৃঢ়স্বরেই বললেন, 'না—না, আজ আর আপনার ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আজ আমাদের ওপর সব ভার ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন দিকি।'

সে একটা রিক্সা ডেকে সযত্নে ওঁর হাত ধরে তুলে বসিয়ে নিজেও পাশে বসল। ওঁর হাত ধরে তুলে বসাতে গিয়ে দেখলে, শুধু পা নয়—হাতও

কাঁপছে থরথর ক'রে। স্নায়ুর ওপর আর কোন জোর নেই ওঁর।

গৃহিণী প্রিয়ম্বদা দরজার কাছে দাঁড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে স্মরণ করলেন, 'দুর্গা দুর্গা!'

ইস্কুলে এসে পৌঁছে কিছুক্ষণ বিহ্বলভাবে তাকিয়ে রইলেন পূর্ণবাবু লাল শালুর ওপর তুলো দেওয়া ক-টা শব্দের দিকে: 'আচার্য পূর্ণচন্দ্রের সপ্ততিতম জন্মজয়ন্তী।'

কার কথা লিখেছে ওতে? এ কিসের উৎসব? সত্যি-সত্যিই কি ঐ লাল শালুর ওপর ওঁর নাম লিখে পয়সা খরচ করছে ওরা?...নামটার বানান ভুল আছে। তা থাক্—তবু এ যেন বিশ্বাসই হয় না।

পূর্ণ মাষ্টার মশাই নিজেকে মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করলেন বলাইয়ের কাছে, সত্যেনের কাছে। তাঁর জীবনেও এমন লগ্ন আসবে তা কে ভেবেছিল? ভাগ্যিস বেঁচেছিলেন এই ক বছর—নইলে এ দৃশ্য দেখবার তো অন্ততঃ সৌভাগ্যলাভ করতে পারতেন না। ঈশ্বরকেও ধন্যবাদ! এদিন তিনি ওঁর জন্য রেখেছিলেন নির্দিষ্ট করে।...

অফিস ঘরে ঢুকে সেই ভাঙ্গা টেবিলটি এবং হেলে-পড়া আলমারীটার দিকে চেয়ে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে গেল। মনে হ'ল যেন কতদিন পরে পুরোনো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল।

এ ইস্কুল থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবার দিনও এমনি বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি, এমনি দু চোখ ঝাপসা ক'রে জল ভরে এসেছিল—এই আলমারীগুলোর দিকে চেয়েই। ঐ যে দেওয়ালের বালি খসে পড়েছে লোনা ধরে—এ সবও ওঁর পরিচিত, উনি ঠিক ক'রে ব'লে দিতে পারেন—এই ক বছরে আর কতটা বালি খসেছে, তাঁর আমলে কতটুকু ছিল।

রিটায়ার করার পরও ছুটির দিনে দুপুর বেলা এসে বাইরে থেকে বাড়ীটাকে দেখে গেছেন—দেওয়ালগুলোয় হাত বুলিয়ে গেছেন সকলের অজ্ঞাতে। নেহাৎ যেদিন অপমান বোধ ক'রে চলে গিয়েছিলেন সেই দিন থেকেই না আর কখনও ফিরে তাকাননি এদিকে! আজ যেন সে অভিমানের জন্যও অনুতাপ বোধ করতে লাগলেন।

সত্যেন পিছন থেকে ডাকলে, 'মাষ্টার মশাই।'

'য়্যাঁ?' যেন ঘুম ভেঙ্গে জেগে ওঠেন। যেন স্বপ্ন দেখছিলেন তিনি, অতীতের কোন্ অতলে তলিয়ে গিয়েছিল তাঁর মন।। কেমন একটু বিকৃত-কণ্ঠেই বললেন, 'তুমি যাও বাবা সত্যেন, আপনার কাজ করো গে—আমি, আমি একটু এখানেই বসি।'

সত্যেন তাঁর অবস্থা বুঝে 'আচ্ছা' ব'লে সরে গেল।

কান্নাতেই যে তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে আসছে এটা সত্যেনের অজানা নেই।

কিন্তু মাষ্টার মশাই একা থেকে তাঁর বহু পরিচিত পুরাতন বন্ধুর মত এই অফিস-ঘরটির সান্নিধ্য অনুভব করবেন, বেশিক্ষণ সে সুযোগ হল না। চারিদিক থেকে ছাত্ররা ভীড় ক'রে দাঁড়াল এসে। দু একজন মাষ্টার মশাই

এলেন আলাপ করতে। অগত্যা তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে তাঁদের সঙ্গে কথা কইতে শুরু করলেন।...

যথা সময়ে সভার কাজ শুরু হ'ল। উদ্বোধন সঙ্গীত, উপস্থিত ভদ্রমহোদয়গণের বক্তৃতা, ছেলেদের আবৃত্তি, কবিতা-পাঠ ও মানপত্র-পাঠের পর স্বয়ং মাষ্টার মশাই উঠলেন অভিনন্দনের উত্তর দিতে। বয়সের জন্য কণ্ঠস্বর ক্ষীণ ও কম্পিত, তবু প্রাণপণ চেষ্টায় তিনি গলা পরিষ্কার ক'রে বলতে আরম্ভ করলেন, 'মাননীয় সভাপতি মহাশয়, উপস্থিত ভদ্রমহিলা ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ এবং কল্যাণীয় ছাত্রগণ! আপনারা আজ আমাকে যে সম্মান দেবার জন্য আহ্বান ক'রে এনেছেন আমি যে তার যোগ্য নই তা আপনারাও জানেন। তবু আমি এসেছি, তার কারণ আপনাদের আহ্বানে আমার প্রতি যে স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে তাকে উপেক্ষা করার শক্তি আমার নেই। কিন্তু এ অনুষ্ঠান আমার পক্ষে যতই সম্মানজনক হোক, আজ আমি সুখী নই একথাটা আপনাদের কাছে স্বীকার না ক'রে পারলাম না।'

এই পর্যন্ত ব'লে তিনি একটু থামলেন। সভাস্থ সকলে বিস্মিত, একটা মৃদু গুঞ্জনও উঠল চারিদিকে; কিন্তু পূর্ণ মাষ্টার মশাই তখনই আবার শুরু করলেন, 'দেখুন—আমি আজ কয়েকটি কথা আপনাদের কাছে না ব'লে পারছি না। তাতে যে অপরাধ হবে তা আপনারা মার্জনা করবেন। আজ আমার সত্তর বৎসর বয়স পূর্ণ হ'ল ব'লে আপনারা আমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, এত কাল আমার বেঁচে থাকা ঠিক হয়নি—বহু পূর্বেই মরে যাওয়া উচিত ছিল। কারণ তা হ'লে আজ যা দেখলাম তা আর আমাকে দেখতে হ'ত না। এই ইস্কুলে আমি বিয়াল্লিশ বৎসর কাজ করেছি, সাধ্যমত কখনও ফাঁকি দিইনি—যে ছাত্রদের ভার আমার উপর তুলে দেওয়া হয়েছিল তাদের যাতে মঙ্গল হয়, উন্নতি হয়, প্রাণপণে আমি সেই চেষ্টাই করেছি। কিন্তু আজ কি দেখলাম? সেই ইস্কুলের এ কি অবস্থা হয়েছে! যে নিমন্ত্রণপত্রটি ছাপা হয়েছে তার রচনায় তিনটি ব্যাকরণগত এবং ছ'টি বানান ভুল। একে ঠিক ছাপার ভুল ব'লে মনে করা যায় না, এ রচনারই ভুল। ইস্কুলের প্রবেশ-পথে যে লাল শালুর ওপর তুলোর অক্ষর দেওয়া সংবর্ধনা-সূচক বস্ত্রখন্ড টাঙ্গানো হয়েছে, তাতেও বানান ভুল। যে ছেলেগুলি আমার চার পাশে ভীড় ক'রে দাঁড়াল—গাড়ী থেকে নামতেই—তারা সবাই আমাকে চেনে দেখলাম, তারা সকলেই আমার বয়ঃকনিষ্ঠ এবং দু চারজন ছাড়া কেউই ব্রাহ্মণ নয়, তবু তারা কেউ আমাকে প্রণাম করা উচিত ব'লে মনে করলে না, কেউ কেউ হাতটা একবার ক'রে কপালে ঠেকালো মাত্র। এরা ভাল করে দাঁড়াতে শেখেনি; কথা কওয়া তো দূরের কথা। এখানে এসে দেখছি যে ছাত্রগণ শিক্ষকদের শ্রুতি-সীমার মধ্যেই প্রকাশ্যভাবে সিনেমা, ফিল্ম এবং নটীদের কথা আলোচনা করছে। তাদের যে সব বর্তমানে পাঠ্য আছে তার দু চারখানা ওলটাতে গিয়ে নজরে

পড়ল, সব বই-ই তথ্যগত এবং ছাপার ভুলে পরিপূর্ণ। অঙ্কের বইতে নতুন পদ্ধতি অবলম্বন করতে গিয়ে ছাত্রদের সুবিধা অসুবিধার কথা চিন্তাই করা হয়নি। ভূগোলে লেখকের অবিশ্বাস্য অজ্ঞতা প্রকাশ পেয়েছে। ছাত্রদের সঙ্গে কথা কয়ে দেখলাম যে তাদের জ্ঞান কম তো বটেই—আগ্রহ আরও কম। পড়া বোঝবার কেউ চেষ্টাই করে না, মুখস্থ করার মত কিছু পেলে সেইটুকু শুধু মুখস্থ করে। হাতের লেখা অপাঠ্য, ভুল বানানে কণ্টকাকীর্ণ। আমাকে বেঁচে থেকে যে শিক্ষার এই অবনতি দেখতে হ'ল, তার জন্য সত্যই আমার অনুতাপের শেষ নেই! বনেদের যদি এই ব্যবস্থা হয় তাহ'লে এর উপর যে ইমারত গড়ে উঠবে, তার কি হবে? অন্য শিক্ষায়তনের কি হচ্ছে জানি না—কিন্তু আপনাদের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এ শিক্ষায়তনটি তুলে দিন।'

এই ব'লে প্রায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বক্তব্য শেষ করে কাঁপতে কাঁপতে মাষ্টার মশাই বসে পড়লেন এবং একটু পরেই কোনদিকে না চেয়ে লাঠি ধরে বাড়ীর দিকে রওনা হলেন।

তাঁর প্রণামী ব'লে টাকার যে তোড়াটা দেওয়া হচ্ছিল, কোনমতেই সেটা তাঁকে নিতে রাজী করা গেল না।

বলাইবাবু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, 'ভীমরতি!'

মনের আবেগে অনেক দূর হন হন ক'রে চলে এসেছিলেন বটে, কিন্তু দুর্বল শরীরে অতখানি উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া হতেও দেরি হ'ল না। আর যেমন সেটা বুঝতে পারলেন অমনি মনে হ'ল পা-দুটো যেন ভেঙ্গে আসছে, সোজা হয়ে দাঁড়ানোও আর সম্ভব নয়।

রাস্তাতেই বসে পড়ছিলেন, অনেক কষ্টে একটা বাড়ীর রকে গিয়ে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসলেন।···

অনেকক্ষণ ঐ অভিভূত ভাবে বসে থাকবার পর হঠাৎ ওঁর চমক ভাঙ্গল এক অতি পরিচিত কণ্ঠের আহ্বানে, 'এই যে স্যার, আপনি এখানে বসে! আমি খুঁজে খুঁজে হয়রান।'

'কে!'

চমকে চোখ মেলে চান পূর্ণবাবু, 'বিমল? কোথা থেকে এলি বাবা! আয়, আয়!' সব দুঃখ দূরে গিয়ে খুশিতে যেন উদ্ভাসিত হয়ে ওঠেন।

বিমল ওঁর ছাত্র। বরং বলা চলে বিমলই ওঁর একমাত্র গৌরব করবার মত ছাত্র। ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় জলপানি পায়। ম্যাট্রিকেও স্কলারশিপ পেয়েছিল। তারপর ছোট ছোট টিউশনি ক'রে কলেজে পড়তে হয়েছিল বলে ইণ্টারমিডিয়েটে আর স্কলারশিপ পেলে না। পড়বার ইচ্ছা প্রবল ছিল ব'লে সাংসারিক বাধা সত্ত্বেও আবার কলেজে ঢুকল। ফলে টিউশনির সংখ্যা বাড়াতে হ'ল, কারণ বেশি মাইনের টিউশনি কে তাকে জোগাড় করে দেবে? সুতরাং সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স ও পরে এম-এ-তেও সেকেণ্ড ক্লাস জুটল। তবু আর কেউ না জানুক, পূর্ণবাবু জানেন, যে শিক্ষায় এমন অনুরাগ

আজকালকার দিনে দুর্লভ।

বিমল ওঁকে প্রণাম ক'রে পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'এখন তো থাকি সেই রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীটে—এধারে আসাও হয় না, খবরও রাখিনা। হঠাৎ খবরের কাগজের এককোণে দেখি এই খবর। ছ পয়েন্ট টাইপে তিন লাইনে—সভাসমিতির বিজ্ঞাপনের মধ্যে। দেখেই চলে এলুম, যখন পৌঁছলুম তখন সভা সবে শুরু হয়েছে। তারপর তো আপনার এই কাণ্ড। আপনি বেরোলেন, আমিও সঙ্গে সঙ্গে ভীড় ঠেলে বাইরে এসে দেখি আপনার চিহ্নও নেই। খুঁজে খুজে হয়রান!'

'বোস্ বাবা বোস্।' পূর্ণ মাষ্টার মশাই সেই সংকীর্ণ রকেই পাশের জায়গাটা দেখিয়ে দিলেন।

'না না—আপনার অবস্থা দেখে চারিদিকে ভীড় জমে গেছে। ছেলেপুলের দল হাসছে। চলুন বাড়ী চলুন। ইস্ আপনার জামাটা কি হয়েছে!'

মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল—রকটা কিন্তু সিমেন্ট বাঁধানো। বসবার সময় অত লক্ষ্য ক'রে দেখেননি, দেখা সম্ভবও ছিল না—কোনমতে চোখ বুজে অবসন্নভাবে বসে পড়েছিলেম। জামাটা ঘামে ভিজে গিয়েছিল, মাটির দেওয়ালে ঠেস্ দেওয়ার ফলে পিঠে কাদার ছাপ পড়ে গেল যে—সেটাও বুঝতে পারেননি।

বিমল একটা রিক্সা ডেকে কোনমতে ওঁকে তুলে তাতে বসিয়ে দিলে। তারপর নিজেও পাশে উঠে বসে রিক্সাওয়ালাকে নির্দেশ দিলে ওঁর বাড়ীতে যাবার। সে পুরোনো ছাত্র, সে-সময় এ পাড়াতেই ভাড়া থাকত। সবই সে চেনে।

রিক্সা চলতে শুরু করার পর কেমন একটু অপ্রতিভ ভাবে পূর্ণবাবু বললেন, 'তুই তো শুনেছিস সব। আমি—আমি কি খুব অন্যায় বলেছি?'

হয়তো তিনি নিজের সমর্থনই শুনতে চেয়েছিলেন বিমলের কাছে, কিন্তু সম্পূর্ণ হতাশ হলেন যখন বিমল দৃঢ়কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ মাষ্টার মশাই, সেই ঝগড়াই আমি করতে এসেছি আপনার সঙ্গে।'

পূর্ণবাবু বিস্মিত এবং কিছু স্খলিত-কণ্ঠে বললেন, 'সে কি রে?'

'হ্যাঁ। কিন্তু তার আগে নামুন তো, বাড়ী এসে গিয়েছি।' যত্ন ক'রে হাত ধরে নামিয়ে নেয় বিমল।

॥ ৪ ॥

বিমলরা পাঁচ ভাই-বোন। বিমলই বড়, তারপর তিনটি বোন ও সব শেষে একটি ভাই। মা-বাবা আছেন—এই সবসুদ্ধ সাতটি প্রাণীর ভরণপোষণের সম্পূর্ণ দায়িত্ব তার। তার উপর বোনগুলি সবই প্রায় বিবাহযোগ্যা।

বিমলের বাবা ছিলেন সামান্য মাইনের কেরানী। তাতে কোনমতে সংসারটা চলত। কিন্তু যে বছর বিমল ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিল সেই বছরেই

পরীক্ষার ফল বেরোবার অল্প ক'দিন পরে দেখা গেল যে, বেরিবেরি তাঁর দুটি চোখকেই গ্রাস করেছে। তারপর কিছু কিছু চিকিৎসার চেষ্টা যে হয়নি তা নয়, কিন্তু সে আরও মাসকতক ধস্তাধস্তিই হ'ল শুধু—সম্পূর্ণ দৃষ্টিশক্তি আর ফিরে পাওয়া গেল না। একটা চোখ একেবারেই নষ্ট হ'ল—আর একটা চোখে ঝাপ্সা ঝাপ্সা দেখা চলতে লাগল, কিন্তু চিকিৎসকরা বললেন পড়াশোনার কাজ আর কোনদিনই চলবে না।

উপার্জন সেই থেকে তাঁর বন্ধই। সামান্য কিছু হোমিওপ্যাথি জানতেন, সেইটেই অবলম্বন ক'রে আছেন। এক আনা ক'রে ওষুধের পুরিয়া নেন—তাও মেয়েরা কেউ কেউ কম্পাউন্ডারের কাজ করে কিন্তু সে আয় এত সামান্য যে, কোন কোন মাসে পাঁচ টাকাও হয় না।

সুতরাং বিমলকে উপার্জন করতেই হবে। কিন্তু কোন্ পথে যে সেটা করতে হয়—এই সামান্য তথ্যটুকু তার জানা নেই।

ছেলেবেলা থেকে জানত যে, কোনমতে লেখাপড়া শেখাটাই জীবনের বড় উদ্দেশ্য—আর সে শিক্ষার চরম সার্থকতা হ'ল এম.এ. বা এম.এস্-সি. পাশ করা। প্রাণপণে সেই চেষ্টাই শুধু ক'রে গেছে—আর কিছু ভাবেনি, কোন দিকে তাকায়নি। ছেলে ভাল, ভালভাবে লেখাপড়া করছে ব'লে কোনদিন এমন কি বাজার পর্যন্ত করতে দেননি বাপ-মা, ঘর-সংসারের অন্য কাজ তো দূরের কথা। তিনটি বোন থাকার জন্যে কিছু বিশেষ করতেও হয়নি কোনদিন—অসহ্য তৃষ্ণা বোধ হ'লেও জল কলসী থেকে গড়িয়ে খাবার কথা বিমল ভাবতে পারে না আজও।

সুতরাং একমনে এক লক্ষ্যর দিকে এগিয়ে গেছে সে চিরকাল। অবশ্য টিউশনি করে সংসারের খরচ কিছু কিছু চালাতে হয়েছে বটে, কিন্তু সেটা সে গ্রাহ্য করেনি কোনদিন। যত পরিশ্রমই করুক—মনকে সে চিরদিন এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছে যে, এই কটা বছর শুধু, এর পর আর কোন দুঃখ থাকবে না। এই দুঃখের কালটা কোনমতে সাঁতরে পার হয়ে যেতে পারলেই—ওপারে তার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে সুখ আর আনন্দ, নিশ্চিন্ত নিরাপদ জীবন। শুধু সে নয়, ওর বাড়ীর সকলেও তাই ভাবত। বোনেরা স্বপ্ন দেখত তাদের বিবাহের, স্বামী ও শ্বশুরঘরের, আর বাপ-মা দেখতেন পরিশ্রমহীন ধীর মন্থর জীবন—জামাই পুত্রবধূ নাতি-নাতনি। তাই তাঁরাও সকলে মিলে বিমলের সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ্রতার সুদুশ্চর তপস্যা করেছেন হাসিমুখেই, এই তো এই ক-টা বছর, দেখতে দেখতে কেটে যাবে।

তারপর এম-এ পাশ করার আনন্দ-উৎসব স্তিমিত হয়ে এলে প্রশ্নটা অত্যন্ত রূঢ়ভাবে সামনে এসে দাঁড়াল।

কি করবে সে এখন ?

চাকরি ত বটেই—কি চাকরি? ক্রমশঃ মুখ শুকিয়ে উঠল বিমলের। বাপ্-মাও যেন একটু বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এত কষ্ট ক'রে লেখাপড়া শেখানো হ'ল (অবশ্য তাঁরা যে শেখাননি সেটা তাঁরা ভুলেই গিয়েছেন), সে কি

বাড়ীতে বসে থাকার জন্যে ?

আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে যাঁরা জীবনযুদ্ধে জয়ী, বেশ প্রতিষ্ঠিত, তাঁরা উপদেশ দিয়ে যান—দেশ স্বাধীন হ'ল, চারিদিকে অসংখ্য লাইন খুলে যাচ্ছে ইয়ংম্যানদের সামনে—এই তো মওকা। আমাদের সময়ে কিছুই ছিল না এসব। এখন আর ভাবনা কি। তাড়াতাড়ি লেগে যাও কোথাও! আর দেরি নয়।

এই 'কোথাও'টা যে ঠিক কোথায় তা যদি বিমলকে কেউ ব'লে দিতে পারত।

খবরের কাগজ একখানা মাত্র তাদের বাড়ীতে আসে কিন্তু পাড়ায় লাইব্রেরীতে বা ছাত্রদের বাড়ীতে পর্যায়ক্রমে সব কাগজেরই বিজ্ঞাপনের পাতা সে দেখে। চেনাশোনা যত লোক আছে—চেনা এবং শোনা, দুরকমেরই পরিচিত—সকলকার কাছেই গেছে অফিসে অফিসে। এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নামও লিখিয়েছে, দরখাস্তও যে না করছে তা নয়।

সব জায়গাতেই ঐ এক প্রশ্ন।

কি জান তুমি ?

ইঞ্জিনিয়ারিং কিছু জান ? কলকারখানার কোন কাজ ? কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জানা আছে ? যদি ডিগ্রি থাকে এসব বিষয়ের এবং বছর-কয়েকের অভিজ্ঞতা থাকে তো এগিয়ে এস।

কেমিষ্ট হ'তে পারবে ? কাজ করেছ কোথাও ? রিসার্চ অভিজ্ঞতা আছে ?

মেটালার্জি পড়েছ ? ধানবাদের খবর রাখ ?

এগ্রিকাল্‌চারের ডিগ্রি আছে ?

কিছুই জান না ? তবে আর কি করতে পারি বলো। কোন্ দিক খোলা আছে আর ?

এম. এ. পাশ করেছ ?

ও তো ঢের আছে। সেদিন বি গ্রেড্ কেরাণীর সতেরোটা পোষ্টের জন্য দরখাস্ত এসেছিল আড়াই হাজার, তাতে এম. এ., এম. এস-সি. সব ছিল। নতুন বিভাগ খোলা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় পরিবহণ—মানে বাস চালানো হবে—তাতে কন্‌ডাক্টারের জন্য দরখাস্ত এসেছে ছ হাজার, তাতেও এম. এ. পাস প্রার্থী আছে।

না—কিছুই হবে না। যদি বয়স থাকে তো ঐ কেরানীর চাকরীর পরীক্ষা দিতে পারো। ফর্ম নিয়ে যাও দশ টাকা লাগবে।

শিক্ষানবীশ থাকতে চাও ?

সে বয়স আর নেই। নেভি, মিলিটারী, আই. এ. এফ. ? সাড়ে সতেরো থেকে সাড়ে উনিশ। বয়স যদি কমানো থাকে তো চলে যাও এক নম্বর গোখেল রোডে। দেখা করো গে।

বয়স আছে অ্যাডমিন্‌স্ট্রেটিভ সার্ভিসের। ফাইন্যান্স পরীক্ষা দিতে পার।

সে চেষ্টাও করেছে বিমল দু-বছর ধরে। কিন্তু চারটে টিউশ্যন যাকে

করতে হয় সকাল-বিকেল (আর তার মধ্যে তিনটেই ইস্কুলের)—তার পক্ষে এসব পরীক্ষায় শীর্ষস্থান অধিকার করা বাতুলতা। য়্যাডমিনস্ট্রেটিভ সার্ভিসে সেবার তেরোজন লোক নেবে—ওর স্থান হ'ল না সে তেরোজনের মধ্যে। নম্বর কিছু কম ছিল।

বিমল চায় লেখাপড়ার কাজ করতে ; দু-একজন পরামর্শ দিলেন, দিল্লীতে খোঁজ করো কিংবা পুণায়—নতুন সব স্কিম হচ্ছে। আর শুনছি আলিপুরে, যাদবপুরে এবং হিজলীতে সরকারের নতুন পরিকল্পনা হচ্ছে, একটু খোঁজ করো না।

কি ক'রে কোথায় খোঁজ করতে হয় সেইটেই তো জানা নেই। অসহায় ভাবে বিমল একে-ওকে-তাকে প্রশ্ন করে। কেউ সদুত্তর দিতে পারে না। উত্তর দেবার জন্য সরকারের কোন বিভাগ নিশ্চয়ই কোথাও আছে কিন্তু সে কোথায় তাই বা কে বলবে ?

অকারণ হাঁটাহাঁটি করে বিমল। পায়ের দড়ি ছিঁড়ে যায় হেঁটে আর সিঁড়ি ভেঙ্গে।

সরকারী অফিসে ইচ্ছামত ঢোকা যায় না। যেখানে যেতে পারে সেখানকার লোক ঝাপসা ঝাপসা উত্তর দেয়, বেশী প্রশ্ন করলে বিরক্ত হয়।

অথচ ওদের দীনেন্দ্র স্ট্রীটের বাড়ীওয়ালার ছেলে তেরো বছরে মার্চেন্ট নেভিতে গিয়েছিল শিখতে—ডাফ্‌রিন জাহাজে—এই আঠারো বছর বয়সেই সাড়ে চারশো টাকা মাইনের (বিনা খরচে) চাকরী পেয়েছে। ওর মামাতো ভাই আই. এস-সি. একবার ফেল ক'রে গত বছর কোনমতে পাশ করেছে, সেও চলে গেল ব্যাঙ্গালোরে। শোনা যাচ্ছে, বছর চারেক পরেই সাড়ে তিনশ টাকা আয় তার বাঁধা, খুব কম পক্ষেও। ওর মামা ঘোড়েল লোক। কিন্তু ছেলের জন্য যতটা করা যায় ভাগ্নের জন্য ততটা করা সম্ভব নয়, তার উপর ওর বয়স হয়ে গেছে বেশি।

ম্যাট্রিক পাশ করার পর ওকে কে পরামর্শ দিয়েছিল রেলের মেক্যানিক্যাল য়্যাপ্রেন্টিস্‌শিপ ট্রেণিং নেবার জন্য। কিছু খরচ ওরা দেয়। পাঁচ বছর পরেই দু'শ কুড়ি টাকা বেতন। কিন্তু সে নাকি ভেতরে লোক না থাকলে হয় না। ওর সে মুরুব্বি ছিল না. তা ছাড়া ভালও লাগেনি কথাটা তখন। হাজার হ'ক কারখানার কাজ ত।

এখন অনেক কারখানাতেও খোঁজ করল। কাজ পাওয়া যায়—মজুরের কাজ। ভাল কাজের জন্য চাই বিশেষ শিক্ষা। সে শিক্ষা ওর নেই। ফোরম্যান ইত্যাদি ত দূরের কথা। আজকাল কোন কারখানার সামান্য একটু উঁচু ধরনের কাজের জন্যও বহু শিক্ষিত লোক পাওয়া যায়। ডিগ্রি ডিপ্লোমা না হ'ক, অন্য কোন ট্রেণিং-এর সার্টিফিকেট দিলেও হবে।

এম. এ. পাশ ?

'কি হবে মশাই আমাদের এম. এ. পাশ লোক নিয়ে ?' বিদ্রূপ খেলে যায় তাঁদের ঠোঁটের কোণে।

অগত্যা একমাত্র যে পথ খোলা ছিল সেই পথই বিমলকে নিতে হয়েছে।

এ. জি. বেঙ্গলের জুনিয়ার ক্লার্ক—এখন সে পায় মাগ্‌গি ভাতা ইত্যাদি নিয়ে প্রায় একশ পঁচিশ। কোন উন্নতির পথ কোথাও নেই। এক যদি সাব্-অর্ডিনেট য়্যাকাউন্টস্ সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারে। নইলে পচে মরতে হবে দুশো টাকায়। অবশ্য সেক্রেটারিয়েটে গেলে কিছু বেশি সুবিধা পাওয়া যায়, কিন্তু সে আশা সুদূর-পরাহত।

সেই কেরানীগিরি। আশাহীন আনন্দহীন, দীর্ঘকাল ধরে অবজ্ঞাত অবস্থায় কলম ঠেলে ঠেলে একদিন রিটায়ার করে বসা অথবা বাবার মত পুষ্টির অভাবে কঠিন ব্যাধিতে ভুগে বয়সের আগেই সরে দাঁড়ানো আর ভিক্ষান্নে দিন যাপন করা।

পাথরের মূর্তির মত নিস্তব্ধ হয়ে বসে পূর্ণবাবু সমস্ত ইতিহাসটা শুনে যান। শুধু ব্যাকুল হয়ে ওঠেন যখন সব বক্তব্য শেষ ক'রে বিমল বলে, 'ছোট ভাইটার এবছরে ম্যাট্রিক দেবার কথা ছিল, কিন্তু আমি তার আগেই তাকে ইস্কুল ছাড়িয়ে ঐ পাড়াতেই একটা কারখানাতে লাগিয়ে দিয়েছি—লেদের কাজ শিখছে।'

'সেকি ?' প্রায় আর্তনাদ ক'রে ওঠেন পূর্ণ মাষ্টারমশাই, 'ভদ্রলোকের ছেলে—একেবারে সাধারণ কারখানায় কুলি-মজুরের কাজ শিখবে ?'

'অবজ্ঞা করবেন না স্যার' কঠিন হয়ে ওঠে বিমলের গলা, 'আমাদের ঐ পাড়াতে অনেক বস্তি আছে জানেন তো, বস্তির অধিকাংশ লোকই নিরক্ষর, আর তাদের বেশীর ভাগই ছোটখাট কারখানাতে কাজ করে, কিন্তু তারা কেউই আমার চেয়ে কম রোজগার করে না !'

'কিন্তু একটা বছরের জন্যে'—তবুও পূর্ণবাবু আকুল হয়ে বলতে চেষ্টা করেন, 'ম্যাট্রিকটা পাশ ক'রে নিয়েও তো—'

'শুধু শুধু একটা বছরই বা নষ্ট করি কেন ?'

'না না—ঐ লাইনেই যদি দিতে চাও তো কোন টেকনিক্যাল ইস্কুলে পড়িয়ে নিয়ে—ধরো ম্যাট্রিক পাশ করে যদি কোন মেকানিক্যাল ট্রেণিং নিত—'

'সময় নেই স্যার !' অসহিষ্ণুভাবে উত্তর দেয় বিমল, 'আমার বড় বোনের বয়স চব্বিশ হ'ল, মেজ বোন তেইশ, ছোট বোনও কুড়ি পেরিয়েছে। তাদের লেখাপড়া শেখানো হয়নি, কারণ সঙ্গতি ছিল না। কোনমতে সকলে কষ্ট ক'রে আমাকেই সুযোগ দিয়েছে বড় হয়ে ওঠবার। ওরা যদি সেদিন ঝিয়ের মত মুখ বুজে খেটে ঝিয়েরও অধম জীবন যাপন ক'রে আমাকে নিশ্চিন্ত ও নিরাপদ না রাখত তো আমি এম. এ. পর্যন্ত পড়তে পারতুম না। এবার ওদের দিকে তাকাতেই হবে। আমি যদি এর চেয়ে ভাল কাজ জীবনেও না খুঁজে পাই, ওরা আর কতকাল অপেক্ষা করবে ? এখন দুভাইয়ে রোজগার না করলে আর চলবে না।'

অনেকক্ষণ আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকবার পর পূর্ণবাবু কেমন যেন অসহায়ভাবে

বলেন, 'কি জানি! সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে। তোর ভাইও ত ভাল পড়াশুনো করত?'

'হ্যাঁ—বরাবরই ফার্স্ট-সেকেন্ড হ'ত।'

'উঃ!' কেমন যেন এক ধরণের আর্তনাদ ক'রে ওঠেন পূর্ণবাবু। এ যেন আত্মীয়-বিয়োগ-ব্যথার চেয়েও বেশি—যেন তাঁর দেহেরও কোথাও একটা গুরুতর আঘাত লেগেছে।

একটু চুপ ক'রে থেকে বিমল বলল, 'এই মাত্র আপনি যে অভিযোগ ক'রে এলেন তারই আমি জবাব দিচ্ছি। আপনি চিরদিন ঐ পুরানো ইস্কুলের ভাঙ্গা দেওয়ালগুলোর মধ্যে বন্ধ হয়ে ছিলেন, তার বাইরের জগৎ আপনার জানা নেই। মনে আছে 'টি'র মাথা না কাটলে কিংবা 'আই'-য়ে না ফুটকি দিলে আপনি নম্বর কাটতেন আর বকা-বকি করতেন, কিন্তু তাতে ক'রে আপনি ছাত্রদের কি ভাবে মানুষ ক'রে তুলতে চেয়েছিলেন? কি কাজের উপযুক্ত ক'রে?'

পূর্ণবাবু বিহ্বল হয়ে যান এ প্রশ্নের সামনে। খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলেন, 'তা ত কোনদিন ভাবিনি বাবা। শিক্ষা না পেলে ছেলেরা মানুষ হবে না, সেই শিক্ষার ভার আমার হাতে—এই ভেবেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি নির্ভুল শিক্ষা দিতে।'

'অর্থাৎ বর্তমানটাই শুধু ভেবেছেন, ভবিষ্যৎ নয়। বড় হয়ে ছাত্রদের একদিন বিশাল পৃথিবীর সামনাসামনি দাঁড়াতে হবে, তুলে নিতে হবে তাকে সংসারের ভার নিজের কাঁধে। সে দায়িত্ব বহনের সে উপযুক্ত কিনা, যে যুদ্ধ তাকে করতে হবে তার সমস্ত রকম পদ্ধতি সে শিখেছে কি না, ঠিকমত হাতিয়ার পেয়েছে কিনা—এ সব কথা কোনদিন কি ভেবে দেখেছিলেন? যাকে চাকরী ক'রে খেতে হবে কি কাজে আসবে তার ব্যাকরণের কচ্‌কচি আর ভূগোলের জটিলতা? ইংলন্ডের ইতিহাস জেনেই বা কি হবে? কেরানীগিরি যদি করে কমার্স পড়ে? বেশ তো তখনই না হয় ভূগোল প'ড়ে নেবে। তার জন্য আট দশ বছরের বালকদের উপর এ অত্যাচার কেন?… আর যদি টেক্‌নিক্যাল লাইনে যায়, যদি তাকে লোহা-পেটার কৌশলই আরত্ত করতে হয় তো কোন্‌ কাজে আসবে তার নরঃ-নরৌ-নরাঃ কিংবা ভীত্যর্থানাং ভয়হেতু? মিছিমিছি এ সময় নষ্ট করা কেন?'

যেন দম নেবার জন্যই বিমল থামে একটু। পূর্ণবাবু ঈষৎ অনুযোগের সুরে বলেন, 'আমরা জানতুম, এই পাঠ্য-পুঁথি যাঁরা তৈরী করেছেন তাঁরা ভেবেই করেছেন। তাই কোন দিন এ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিনি। তা ছাড়া, সব রকম ভবিষ্যতের জন্যই ছাত্রদের তৈরী ক'রে দেওয়া হয় ইস্কুলে—এই আমরা জানি, পরে যে-পথে খুশি যেতে পারবে। অল্প অল্প বনেদ সব দিকেই হয়ে থাকা কি ভাল নয়?'

'হ্যাঁ! একখানা ঘর করবার আপনার ক্ষমতা, আপনি সেই সবটুকু সাধ্য দিয়ে তিনমহলা বাড়ীর ভিত ফেঁদে নিঃস্ব হয়ে বসে রইলেন। তারপর? সে

ভিতের কি হবে, আপনার বা ঘরের কি হবে ? তার চেয়ে গোড়া থেকেই একটা পথ ধরে চলা কি ভাল নয় ? শুনেছি, আমেরিকায় এমন বিদ্যালয় বহু আছে যেখানে আগে ছাত্রদের জীবিকার পথ ধরানো হয়—তার রুচি ও ক্ষমতামত ; তারপর তার আনুসঙ্গিক হিসাবে কিছু কিছু বিদ্যা সে শেখে, ঠিক যেটুকু তার প্রয়োজন। তাতে সময়ও বাঁচে, ভবিষ্যতের অনেক ব্যর্থতা, অনেক হতাশা থেকে সে ছাত্র অব্যাহতি পায়। আর আপনি সব রকম বনেদের কথা বলছিলেন না ? যে ছেলে ইস্কুল থেকে বেরিয়ে এসে পড়তে ঢুকেছে, এমন কোন সেকেণ্ড ইয়ার কি থার্ড ইয়ারের ছেলেকে ডেকে কোনদিন ইতিহাসের দু-একটা প্রশ্ন ক'রে দেখেছেন কি—কি অসামান্য অজ্ঞতা তার ? আমি এই চাকরীর পরীক্ষা দিতে গিয়ে কিছু কিছু টের পেয়েছি স্যার। যেমন তারা জানে ভূগোল তেমনিই ইতিহাস ! পরীক্ষার্থীদের মধ্যে ম্যাট্রিক পাশও কিছু কিছু ছিল। তারা সবে ইতিহাস ভূগোল শেষ ক'রে এসেছে। নিউজিল্যাণ্ড আমেরিকার রাজধানী লেখে এবং হর্ষবর্ধন অশোকের পৌত্র এবং চানক্যের পুত্র লিখে বসে থাকে ! অর্থাৎ সব দিকেই আপনাদের এই শিক্ষা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হচ্ছে ! শিক্ষা আর তার সঙ্গে তাদের জীবন !'

উত্তেজিতভাবে কথা বলে যাচ্ছিল ওরা, প্রিয়ম্বদা ইতিমধ্যে এসে দুটি নারকেল নাড়ু এবং এক গ্লাস জল বিমলের সামনে রাখলেন। এতক্ষণ একটি কথাও বলবার তিনি অবকাশ পাননি, কোন্ প্রশ্নই করতে পারেননি। তাঁর সেই শান্ত সহনশীল একান্তভাবে তদ্গতপ্রাণ মূর্তিতে কি ছিল—সহসা সেদিকে চেয়ে বিমলের চোখে যেন জল এসে গেল।

প্রিয়ম্বদা এতক্ষণে প্রশ্ন করলেন, 'কি হ'ল বাবা বিমল ওখানে ?'

'ওরা ধুতি-চাদর এবং কিছু টাকা ওঁকে দিতে চেয়েছিল, উনি না নিয়েই চলে এসেছেন।' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠকে চাপা দিতে তাড়াতাড়ি নারকেল নাড়ুটা মুখে পুরে দেয় বিমল।

'না নিয়েই চলে এসেছেন ? কেন ?'

'ওঁকেই জিজ্ঞাসা করুন। শিক্ষার নাকি এত অধঃপতন ঘটেছে যে সেই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে দাঁড়িয়ে কোন সম্মানই উনি নিতে পারবেন না। তাতে ওঁর সততায় বাধবে।'

পূর্ণ মাষ্টার মশাই অপরাধীর মত মাথা হেঁট ক'রে বসে রইলেন। প্রিয়ম্বদা একবার স্বামীর সেই মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'সে উনি যা ভাল বুঝেছেন তাই করেছেন বাবা। আর কী-ই বা হ'ত, ঐ ক-টা টাকায় কি আর চিরকালের মত দুঃখ ঘুচে যেত ?'

বিমল যেন জ্বলে ওঠে নিমেষের জন্য, 'দেখুন এটা স্রেফ্ জোচ্চুরি, ধাপ্পাবাজি। নিজে চিরকাল ঠকেছেন, ভুল করেছেন, অথচ এমনভাবে আপনাদের বুঝিয়েছেন যেন উনি একজন পূজনীয় মহাপুরুষ।…নিজের জীবন নষ্ট ক'রেই শুধু ক্ষান্ত হতেন ত কথা ছিল, আপনার জীবনও উনি নষ্ট করেছেন' বলতে বলতে সত্যই ওর চোখে জল এসে যায়। ওর নিজের জীবনের

যা কিছু ক্ষোভ, যা কিছু ব্যর্থতা, যত তিক্ততা তা এই অভিযোগের মধ্যে, এই কটূক্তির মধ্যে বেরিয়ে আসে। এ চোখের জলও সেই তিক্ততারই বিন্দু এক একটি।

অপ্রতিভ হয়ে প'ড়ে চোখ মুছে হেঁট হয়ে পূর্ণবাবুর ও প্রিয়ম্বদার পায়ের ধুলো নেয় বিমল, 'মাপ করবেন স্যার, আজ আমার মাথার ঠিক নেই। আরও যেন আপনার অবস্থা দেখেই আনব্যালেন্সড হয়ে পড়েছি।··· আপনার মত কর্ত্তব্যনিষ্ঠ পরিশ্রমী মানুষের জীবনটা কি হ'ল বলুন তো! সব ছেড়ে যেটাকে অবলম্বন ক'রে ছিলেন সেটাও আজ আপনার খসে পড়েছে। ···এ শিক্ষা যে কি শোচনীয় রকমের ব্যর্থ—তা' নিজেকে দিয়েই ত বুঝতে পারছেন! আচ্ছা আসি—।'

বিনা ভূমিকায়, বিনা আয়োজনে অকস্মাৎ সে একেবারে উঠে দাঁড়ায় এবং পরমুহূর্তেই বাইরে সেই খররৌদ্রের মধ্যে হাঁটতে শুরু করে।

'ও বাবা বিমল, এই এত রোদ্দুরে—' আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন প্রিয়ম্বদা, কিন্তু বিমল ততক্ষণে বহুদূর পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

খানিক চুপ ক'রে থাকেন প্রিয়ম্বদা। প্রশ্ন করার কিছু দরকার হয় না। এতকাল এই সংসার চালিয়ে এসে, এই মানুষের ঘর ক'রে অনেক কিছুই নিজের মন দিয়ে বুঝতে পারেন।

অনেকক্ষণ পরে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে স্বামীর দিকে ফিরে বলেন 'মুখে-হাতে একটু জল দিয়ে নাও। যা হয় খাবে চলো দুটো।'

'হ্যাঁ—এই যে যাই।'

কিন্তু তবুও তিনি উঠতে পারেন না। বিমলের শেষ কথাটা তাঁর অন্তরে বেদনা-জড়িত স্মৃতির সরোবরে প্রচণ্ড এক ঢেউ তুলেছে। তাঁর মন বসে বসে সেই ঢেউ আছড়ে পড়ারই শব্দ শুনতে থাকে।

॥ ৫ ॥

পূর্ণবাবু বিহ্বল হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ পর্যন্ত। বলতে গেলে সারা দিনেও সে বিহ্বলতা কাটল না তাঁর। আজকের মত দিন তাঁর এই সত্তর বছরের জীবনে কোনদিনই আসেনি। সকাল থেকে সেই বিশেষ মুহূর্তটি, বরং বলা যেতে পারে নাটকীয় মুহূর্তটির জন্য প্রস্তুত হ'তে গিয়ে বিষম উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন; এবং সে উত্তেজনা বেড়েই গিয়েছিল। নাটকের যেমন অঙ্কের পর অঙ্ক চরম পরিণতির পথে এগিয়ে গেলেও প্রতি অঙ্ক শেষ হবার সময়ে আবার একটি বিশেষ ধাক্কা দেয় দর্শকের মনে—সে ধাক্কারও অভাব ছিল না, আর চরম নাটকীয় পরিণতি ত তিনিই সৃষ্টি ক'রে এলেন। সুতরাং বলতে গেলে একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকই অভিনীত হয়ে গেল আজ তাঁর জীবনে। সে প্রতিক্রিয়া ত আছেই—তার ওপর বিমল আবার এ কী ক'রে গেল! 'অন্যায় করেছেন' এ কথা জানবার পর কোনদিনই তিনি স্থির

থাকতে পারেন না—তার প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত। বিমল যা বলে গেল তা যদি সত্য হয় ত তিনি একটি ঘোরতর অন্যায় করেছেন—আর বোধ করি তার প্রতিকারের পথ খোলা নেই। এ কী হ'ল। এখন কী করেছেন তিনি ? কে বলে দেবে তিনি ভুল করেছেন কি না।

সারাদিন ভেবেও তিনি কুল-কিনারা পেলেন না ভাবনার। এমনভাবে ভাবতে তিনি অভ্যস্ত নন। শিক্ষাকে এভাবে তিনি কখনও দেখেননি। এ একেবারে নতুন কথা। সব যেন গুলিয়ে যেতে লাগল তাঁর মাথার মধ্যে।

আজ তাঁর বাল্যকালের কথা মনে পড়ছে। সেদিনও কম দুর্দিন নয়—এত সমস্যা হয়ত ছিল না জীবনে কিন্তু দারিদ্র্য ও অভাব ছিল যথেষ্ট। তবু সেদিনও এই শিক্ষাকে, যাকে বলে য়্যাকাডেমিক বা পুঁথিগত শিক্ষা, তাকেও হীন ব'লে ভাবতে পারেননি। এই শিক্ষা বিতরণ করা জীবনের মহত্তম ব্রত ও আদর্শ ব'লে বেছে নিয়েছিলেন অনায়াসে। শিক্ষক জীবনের পরিণাম সেদিনও তাঁর অজানা ছিল না। এত কালো ছবি হয়ত দেখেননি তিনি, তবু আর্থিক অভাব অনটনের জন্য প্রস্তুত হয়েই এই জীবন বেছে নিয়েছিলেন, আর সারা জীবনে সে জন্য অনুতপ্ত হবারও কোন কারণ অনুভব করেননি তিনি। যেটাকে আদর্শ ব'লে, কর্তব্য ব'লে জেনেছেন, প্রাণপণে সেটাকেই পালন ক'রে যাচ্ছেন, সেই লক্ষ্যের দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন—এই ত ছিল এতদিন সান্ত্বনা।

অথচ আজ—

বহু কষ্টে, বহু সাধনায় যে ইমারৎ গগনচুম্বী হয়ে উঠেছিল, এতদিন পরে প্রথম শুনলেন যে তার ভিতরটাই নেই !

সাধনা ! শুধু কি কৃচ্ছ্রসাধন—শুধু কি আর্থিক অভাব ? সমস্ত রকমের প্রয়োজনকে সংকুচিত ক'রে কোন রকমে জীবনধারণ করা।

না—আরও অনেক আছে। আজ সেই সব কথাই মনে পড়ছে। বহুদিনের শুকিয়ে যাওয়া ঘা-টায় খোঁচা দিয়েছে—টাটকা রক্ত ঝরছে সেখান দিয়ে।

ছেলেবেলার কথা মনে পড়ছে বৈকি। খুব ছেলেবেলার কথাও।

মফস্বলে মুন্সেফ কোর্টের উকীল—পূর্ণবাবুর বাবা ছিলেন তাঁরই মুহুরী। সামান্য আয়—সংসার খুব বড় ছিল না ব'লেই চলে যেত। ওঁরা থাকতেন সে মফস্বল শহরের বাইরে এক ছোট্ট গ্রামে (গণ্ডগ্রাম নয়—অনেকেই যেটা ভুল ক'রে থাকে। পূর্ণবাবুর মাস্টারী মন এই স্মৃতি-মথিত আবেগের মধ্যেও মনে করে কথাটা—শুধু ছাত্র কেন, বহু শিক্ষক ও সাহিত্যিকও এই ভুল করেন—গণ্ডগ্রাম বলতে অজ-পাড়াগাঁ বোঝেন) সেখান থেকে দেড় ক্রোশ রাস্তা হেঁটে ওঁর বাবা আসতেন চাকরী করতে, পূর্ণবাবুকেও আসতে হ'ত। প্রথম প্রথম খুব পা-ব্যথা করত—বাবা নির্জন মাঠে পড়লে কোলে করতেন এক-আধবার। বাবাকে আসতে হ'ত ভোরবেলা—শীতকালে ত রীতিমত অন্ধকার থাকতে বেরিয়ে পড়তেন—কারণ সকাল থেকেই মক্কেলের ভীড় লাগবে, তার আগে মুহুরীর পৌঁছনো চাই। তিনি মনিব-বাড়ীতে খেতেন, ঐ রকমই

রেওয়াজ ছিল, তার কারণ অতদূর বাড়ী গিয়ে খেয়ে আসা সম্ভব নয়। এখনকার কথা পূর্ণবাবু জানেন না, কিন্তু তখনকার দিনে অনেক মক্কেলও উকীলবাড়ী মাথায় দু'ঘটি জল ঢেলে চাট্টি ভাত খেয়ে নিতেন। রান্না করতেন অবশ্য উকীলবাবুর বাড়ীর মেয়েরাই—ওঁর স্ত্রী আর বিধবা বোন, কিন্তু তবু তাঁদের বিরক্তি প্রকাশ করার উপায় ছিল না। ঠাকুর, গরু-বাছুর, কিষেণ এসব ছাড়াও বাইরের অতগুলি লোকের রান্না—অনেক সময়ে আগে থাকতে জানাও যেত না, বাবু হঠাৎ বলে পাঠাতেন বেলা দশটার সময়ে, আরো চারখানা থালা বেশি পড়বে, মক্কেল খাবে।' এসব তাঁদের গা সয়ে গিয়েছিল ব'লে সাধারণত তাঁরা প্রয়োজনের একটু বেশিই রাঁধতেন—হয় বাসি থাকত নয় গোরুর ডাবায় যেত। কিন্তু তাতে ক্ষতি হ'ত না—উকীলবাবুর নগদ আয় তেমন কিছু বেশী না থাকলেও চালকড়াই আসত চাষের—তাতে ভাত ডাল চলত। আর তাছাড়া কীই বা রান্না হ'ত—ভাত-ডাল-আলুভাতে, উঠোনের শাক-ডাঁটা-কচু দিয়ে একটা চচ্চড়ি—বড় জোর একটা বড়ি কি বড়ার তরকারী। তার সঙ্গে চালতা আমড়া কি নোড়ের টক। মাছ কদাচিত আসত—হাটের দিন কিংবা পুকুরে জাল ফেললে—সেদিন অন্য টক না হয়ে মাছেরই অম্বল রান্না হ'ত। তবে একটা কথা এই যে বাড়ীর কর্তাও সকলের সঙ্গে বসে ঐ খাওয়াই খেতেন। বেশির মধ্যে তাঁকে একবাটি দুধ দেওয়া হ'ত ভাতের সঙ্গেই।

পূর্ণবাবুও ওখানে খেতেন সকালবেলা। কারণ ছেলে ছোট, কার সঙ্গে আসবে সে একটা বড় সমস্যা, তার ওপর বাড়ীতে পড়াবে কে? ছেলেকে এনে বৈঠকখানা-ঘরের দাওয়ায় এক কোণে একটা চট পেতে বই শেলেট দিয়ে বসিয়ে দিতেন ওঁর বাবা আর কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসে পড়া ব'লে দিতেন বা পড়া নিতেন। দশটার সময় বাবা নিজে পুকুরে স্নান করতে যেতেন, ওঁকেও নিয়ে যেতেন। ভাত খেয়ে তিনি যেতেন কাছারী, পূর্ণবাবু যেতেন ইস্কুল। ছুটির পরও বসে থাকতে হ'ত অনেকটা—কাজ সেরে বাড়ী যেতে সন্ধ্যা পেরিয়ে যেত এক-একদিন। এক গাল মুড়ি চিবিয়ে বসে বসে ঢুলতেন পূর্ণবাবু। তারপর বাবার হাত ধরে লণ্ঠনের আলোয় বাড়ী ফিরতে হ'ত। ওঁর বই শেলেটের সঙ্গে বাবার কাগজপত্রও বইতে হ'ত তাঁকে। বাড়ী ফিরে বাবা বহুরাত্রি পর্যন্ত কাজ করতেন—ছেলের জন্যই সকাল ক'রে বাড়ী ফিরতে হ'ত—নইলে সব মুহুরীই রাত দশটা পর্যন্ত উকীল বাড়ী থাকে। কাজ বাড়ী এনে সেটা পুষিয়ে দিতেন ওঁর বাবা।

এই জীবন।

কষ্ট তখনই বুঝতেন পূর্ণবাবু। আর সেই সুযোগে বাবা ওঁকে কেবল বোঝাতেন—'দেখছিস ত! লেখাপড়া শিখেছেন বলেই উকীলবাবু আজ মনিব—আমি ওঁর মুহুরী। নইলে কাজ ত আমিই বেশী করি, উনি কতটুকু করেন? আমি ভূতের মত খাটি আর ওঁর পয়সা হয়। তুই দেখে শেখ। মন দিয়ে লেখাপড়া শিখে উকীল হবি—এইটে যেন দেখে যেতে পারি।'

কিন্তু সেটা দেখে যাওয়া তাঁর অদৃষ্টে ঘটে ওঠেনি। তার বহু আগে,

পূর্ণবাবুর যখন মোটে দশ বছর বয়স তখনই হঠাৎ মারা গেলেন ওঁর বাবা। কাছারীর সামনে ঘোড়ার গাড়ি চাপা পড়েছিলেন—সেই উপলক্ষ্য ক'রে ভুগতে ভুগতে মাস দশেক পরে একদিন চিরকালের মত চোখ বুজলেন।

পূর্ণবাবুদের দাঁড়াবার স্থান ছিল—কারণ বাড়ীটা পৈত্রিক—কিন্তু খাওয়ার মত কিছু ছিল না। এগারো বিঘা জমির তিন অংশীদার—ধান চাল যা হ'ত তাতে তিন মাসও ওঁদের সংসার চলবার মত কথা নয়। কাকাদের অবস্থা তথৈবচ, তা ছাড়া সম্ভাব ছিল না কারুর সঙ্গেই। ওঁর মা নীলাব্জ-সুন্দরী চোখে অন্ধকার দেখলেন। এতকাল যা কিছু জমেছিল, দশমাস চিকিৎসার খরচ টানতেই শেষ হয়ে গেছে—এখন দুটি ছেলে ও মেয়েকে তিনি খাওয়াবেন কি?

পূর্ণবাবুর দাদামশাই থাকতেন কাশীতে—খবর পেয়ে তিনিই এসে নিয়ে গেলেন। সেকালের কমিশেরিয়েটে চাকরী—এগার টাকা পেন্সন পেতেন ভদ্রলোক। বিপত্নীক—নিজেই একবেলা রেঁধে খেতেন ব'লে বেশ স্বচ্ছন্দে চলে যেত। কিন্তু তার মধ্যে মেয়ে তার তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে এসে ঢুকলে একটু অসুবিধা হবারই কথা। কাশীতে সেকালে খুবই সস্তা-গন্ডা ছিল—মাসিক দুটাকা তিনটাকা আয়ে বহু বিধবা জীবন কাটাতেন, কিন্তু তবু একটা টাকা ষোল আনাই—কোন মতেই তাকে টেনে উনিশ আনা এমন কি সতেরো আনাও করা যায় না। তার ভেতর আবার লেখাপড়া শেখানোর প্রশ্ন উঠলে দস্তুর-মত বিব্রত হয়ে পড়তে হয়। সুতরাং বাধ্য হয়েই বাহাত্তর বছর বয়সে তাঁকে এক কাঠ-কয়লার দোকানে খাতা লেখবার কাজ নিতে হ'ল মাসিক তিনটাকা বেতনে।

একটা মাটি থেকে মূলসুদ্ধ উঠিয়ে এনে আর একটা মাটিতে ফেলা হ'ল।

কিন্তু পূর্ণবাবুর তখনও সেটা বাল্যকাল, এমন কোন অসুবিধা হ'ল না।

কাশীতে এসেই বলতে গেলে ভাল ক'রে জ্ঞান হ'ল পূর্ণবাবুর। জন্মের প্রথম লগ্নে গর্ভনিদ্রার যে ঘোর লেগে থাকে এইবার তা কাটল। ভাল ক'রে চোখ মেলে তাকালেন পৃথিবীর দিকে।

কাশী ছিল তখন বিচিত্র স্থান!

ধনবানের ঐশ্বর্যের দম্ভ এবং বিলাসব্যসনে উচ্ছৃঙ্খলতা যে কিছু না ছিল তা নয়—কিন্তু সে যেন অন্য এক কাশী। সে কাশী ছিল দূরে এক প্রান্তে সরানো—ঐ চকের ধারে—কোথায় যেন 'ডাল-কা-মন্ডী'—ঐটেই নাকি খারাপ জায়গা। আর বড়লোক জমিদার যাঁরা তাঁরাও নাকি ঐ ওধারের কোন্ কোন্ অঞ্চলে থাকতেন। সে কাশী পূর্ণবাবু কখনও চোখে দেখেননি। গঙ্গার ধারে সে কাশীর দেখা মিলত চৈত্রমাসে 'বুঢ়ুয়া-মঙ্গলে'র সময়—তখন ওঁর মা এবং দাদামশাই ওঁকে গঙ্গার ত্রি-সীমায় যেতে দিতেন না।

পূর্ণবাবু দেখেছিলেন, বরাবরই দেখেছিলেন আর আজও সেই ছবিই তাঁর মনের পটে আঁকা আছে—কাশীর অন্য রূপ। 'প্লেন লিভিং য়্যান্ড হাই

থিংকিং' যে-কথাটা অনেক বড় হয়ে শুনেছিলেন পূর্ণবাবু, যা আর কোথাও আছে কি না তিনি অন্তত জানেন না—তার পরিপূর্ণ চেহারা দেখা যেত সে সময় কাশীতেই। অন্ধকার সংকীর্ণ গলির সারি—তারই মধ্যে মধ্যে আরও অন্ধকার ঘরে বসে চলেছে শাস্ত্র চর্চা। কাব্য ব্যাকরণ-সাহিত্য-দর্শন-স্মৃতি—তার সঙ্গে সঙ্গে, ইংরেজী-জানা লোকেরও অভাব নেই—পাশ্চাত্ত্য দর্শন ও চিন্তাধারার আলোচনা। টোল ঠিক না থাকলেও অধ্যাপক পরম্পরায় অব্যাহত শাস্ত্র-চর্চা অক্ষয় হয়ে ছিল ঐ সব প্রায়ান্ধকার বাড়ীর কোটরে কোটরে। ছিল অসংখ্য বেদ বিদ্যালয়; বেদ, উপনিষদ নিয়মিত পঠন-পাঠন চলত। মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুরবাড়ীতে ঠাকুরবাড়ীতে চলত কথকতা। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে রামায়ণ ও চণ্ডীর গান—পালা কীর্তন ও কথকতা! তার সঙ্গে ঐ সব ঘাটেরই সিঁড়িতে সিঁড়িতে এসে বসতেন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতরা, রাত আটটা নটা—গরমের দিনে আরও গভীর রাত পর্যন্ত চলত আলোচনা ও তর্ক। যার কিছু জ্ঞান আছে সে এসে কান পেতে শুনত ও উপকৃত হ'ত। এক একটি পণ্ডিতের দলকে কেন্দ্র করে ছোট খাট উৎসুক শিক্ষার্থীর ভীড় জমে উঠত—সেদিকে চেয়ে পূর্ণবাবুর মনে হ'ত ভাবীকালের নক্ষত্ররা নীহারিকার মত ঝাঁক বেঁধে অপেক্ষা করছে; বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের প্রস্তুতি চলছে এখানে।

আমোদ-প্রমোদও ছিল বৈকি!

কোন্ বড় বড় গায়ক ওখানে না আসতেন এবং গঙ্গার ঘাটে না গাইতেন। মহীশূরের সভা-গায়ক, মাইহারের সভা-বাদক থেকে শুরু ক'রে বড় বড় গায়ক ও বাদক—হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে কোন দিন না কোন দিন ওখানে বসে গাইবেনই; বিষ্ণু দিগম্বরকে তিনি দেখেছেন ঐ গঙ্গার ঘাটেই। একবার যেন রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর গানও শুনেছিলেন মনে হচ্ছে। গঙ্গার ঘাটে না হ'লে কোন ঠাকুরবাড়ীতে আসর পেতে গানের মজলিস বসত। গরমের দিনে হয়ত কোন ধনী রসিক ব্যক্তির আনুকূল্যে বজরার ছাদেও বসত—দেখতে দেখতে অসংখ্য নৌকা এসে লাগত সেই বজরার সঙ্গে, পরে যারা আসত তারা লাগাত এদের সঙ্গে—এমনি ক'রে অল্প সময়ের মধ্যে অসংখ্য নৌকা এক ভাসমান দ্বীপের সৃষ্টি করত। বহু রাত্রি পর্যন্ত চলত গান-বাজনা। সরস্বতী-পূজার রাত্রে, শিবচতুর্দশীর রাত্রে—সারারাত ধরে গান-বাজনা চলত। পরবর্তী জীবনে একবার দুদিনের জন্য কাশীতে আসতে হয়েছিল, ওঁর এক বোনের শাশুড়ী মারা যান সেই উপলক্ষে—তারই মধ্যে উনি শুনেছিলেন ইউরোপ থেকে সদ্যপ্রত্যাগত দিলীপকুমার রায়ের গান ঐ গঙ্গার ঘাটে বসেই। আজও কানে বাজছে সে সুর, পরিপূর্ণ অবসরমুহূর্তে চোখবুজে কথাটা ভাবলেই কানে বাজে 'মলয় আসিয়া কহে গেছে কানে প্রিয়তম তুমি আসিবে' কিংবা 'ছিল বসি সে কুসুম কাননে।'

অনেক দেখেছেন পূর্ণবাবু। বহু পণ্ডিতকে। তখন তাদের মর্যাদা সব বোঝেননি, কিন্তু অপরে যে সম্ভ্রমের সুরে উল্লেখ করত এঁদের—তাতে

এটুকু বুঝতেন যে এঁরা অসাধারণ পণ্ডিত। সারা ভারতের শিরোমণি পণ্ডিত। এঁরাই সরস্বতীর বরপুত্র। পরবর্তী জীবনে এঁদের মূল্য আরও বুঝেছিলেন, এঁদের খ্যাতি তখনও বিদ্বজ্জন সমাজে মুখে মুখে ছড়িয়ে আছে। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতেন পূর্ণবাবু যে অন্তত এঁদের দর্শনের সৌভাগ্য তাঁর হয়েছিল।

এখনও চোখ বুজলে মূর্তিগুলো স্পষ্ট না মনে পড়ুক, আদলগুলো মনে আসে। দেখেছেন বেদান্তের ভারতখ্যাত অধ্যাপক সুব্রহ্মণ্যম্ শাস্ত্রীকে, দেখেছেন সাংখ্যের দিক্পাল পণ্ডিত রাম মিশ্র শাস্ত্রীকে। রাখালদাস ন্যায়রত্ন নাকি সাক্ষাৎ ব্যাসদেবের বংশধর। সেটা কতটা সত্য তা জানেন না পূর্ণবাবু, কিন্তু রাখালদাস যে সর্বজনপূজ্য অধ্যাপক ছিলেন তা জানেন। কৈলাস শিরোমণির কথাও মনে আছে। সবচেয়ে একজনের কথা মনে আছে—এখন যাঁর নামও কেউ মনে করতে পারবে না, কিন্তু তখন কাশীর বিখ্যাত পণ্ডিতরাও তাঁকে সম্ভ্রম করতেন—তিনি বামনাচারী। চার বেদ তাঁর ছিল নখদর্পণে। এ না কি দুর্লভ পাণ্ডিত্য। আজ বেদ নিয়ে কে-ই বা মাথা ঘামাচ্ছে। যাঁরা চর্চা করেনও—তাঁরাও হয়ত স্বীকার করবেন না যে এই চারটি পুঁথি সম্যক আয়ত্ত করতে এমন কিছু পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন হয়!

এই জ্ঞানচর্চার মহৎ অথচ সহজ পরিবেশেই পূর্ণবাবুর বাল্যকাল এমন কি প্রথম কৈশোরও কেটেছে। কিন্তু তবু তিনি প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যাদান-পদ্ধতির দিকে আকৃষ্ট হ'তে পারেননি, গতানুগতিক ইংরেজী শিক্ষায়—ইংরেজী স্কুলের শিক্ষার নেশাতেই উন্মত্ত হয়ে উঠে আজীবন সাধনা করেছেন যতটা সম্ভব নির্ভুলভাবে এই শিক্ষা প্রচারের জন্য।

কেন?

তার জন্য বোধ হয় প্রধানত দায়ী ছিলেন ওঁদের স্কুলের তারাপদবাবু। তারাপদবাবু বিচিত্র, তারাপদবাবু অদ্ভুত।

আজও তাঁকে স্মরণ করলে হাত দুটো আপনিই ললাটে পেঁছয়। প্রণাম করেন মনে মনে।

আজ জীবনে এই প্রথম সন্দেহ জাগছে মনে যে তারাপদবাবুর শিক্ষার আদর্শ মনেপ্রাণে গ্রহণ ক'রে ভুল করেছেন কিনা। নইলে এতদিন নিশ্চিন্তই ছিলেন।

তবু—তারাপদবাবুর প্রভাব মুছে ফেলা আজ বোধ হয় কিছুতেই সম্ভব নয়।

॥ ৬ ॥

মাঝারি চেহারার গাঁট্টাগোট্টা মানুষটি! এক গাল দাড়ি গোঁফ, খালি পা, মালকোঁচামারা ধুতি আর উড়ুনি। চোখ বুজলেই এই চেহারাটা মনের পটে ভেসে ওঠে। সেকালের ইংরেজী ইস্কুলে বাংলার মাষ্টার—তাও কাশীর মত জায়গায়—মাত্র পনেরোটি টাকা বুঝি মাইনে পেতেন। কিছু কিছু যজমানীও

ছিল অবশ্য, কিন্তু সেও—তারাপদবাবু নিজেই ঠাট্টা ক'রে বলতেন, 'কাশীতে যজমানের চেয়ে যাজকের সংখ্যা বেশী। ডাকবে কে?' সুতরাং খুব কায়ক্লেশে সংসার চলত। উড়ুনি ছাড়া জামা কি গরম চাদরও কখনও গায়ে দেখেননি পূর্ণবাবু। বালক-সুলভ প্রগল্ভতায় একদিন প্রশ্ন ক'রে ফেলেছিলেন তিনি, 'আপনার শীত করে না মাস্টার মশাই?' তারাপদবাবু মোন্দা হেসেই উত্তর দিয়েছিলেন, 'করে না আবার! কাশীর শীত। হাড়ভাঙ্গা শীত। দেখছিস না গায়ে কাঁটা দিচ্ছে? কিন্তু করলেই বা উপায় কি? পাবো কোথায়? দানে ধুতি চাদর পাই—উড়ুনিটাই জোটে। গরম গায়ের কাপড় দেবার লোক কৈ? কদাচিৎ কখনও যা পাই, ছেলেপুলের জন্যে রাখতে হয় ত।'

জুতো নাকি কখনই পায়ে দেননি। খড়ম পায়ে দিতে পারতেন, কারণ দানে পাওয়া যায় খুবই—চটিও যে এক আধ জোড়া না মেলে তা নয় কিন্তু পায়ে কিছু দিতেন না ইচ্ছা ক'রেই, বলতেন, 'ইংরেজ এদেশ থেকে গেলে তবে জুতো পায়ে দেব। এখন ত অশৌচ চলছে!'

এইটেই ছিল তারাপদবাবুর চরিত্রের সবচেয়ে বড় কথা—ধ্যানে-জ্ঞানে-স্বপ্নে—ঐ এক চিন্তা। 'প্যাসন' বলাই উচিত। পূর্ণবাবু তাঁর এই সুদীর্ঘ জীবনেও এতবড় ইংরেজবিদ্বেষী লোক দেখেননি। আবার অমন ইংরেজ ভক্তও কেউ ছিল না।

পৃথিবীতে যেখানে যত অন্যায় অবিচারই ঘটুক না কেন, সে দোষটা অনায়াসে ইংরেজের ঘাড়ে চাপিয়ে দেবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তারাপদ-বাবুর। খবরের কাগজ—তখনকার দিনে যা বাংলা সাপ্তাহিক পাওয়া যেত—মন দিয়ে পড়তেন তিনি, রাজনীতি ছিল তাঁর বড় রকমের নেশা—আর প্রতিদিন ক্লাসে এসেই সেই সব সংবাদ সম্বন্ধে তাঁর যা ব্যাখ্যা—তা ছেলেদের বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন। ছেলেরা অনেকেই তা বুঝত না, এসব কথা ভাল লাগত না বেশীর ভাগ ছেলেরই, কিন্তু তারাপদবাবু তা দেখতেন না। এমন কি পড়াতে পড়াতে কোন প্রসঙ্গ-সূত্র পেলেই রাজনীতিতে চলে আসতেন আর সেই উপলক্ষে যে-কোন রকমে ইংরেজের কথা এনে বিষ উদ্গার করতেন তাদের বিরুদ্ধে। পূর্ববঙ্গের লোক ছিলেন—উচ্চারণ ছিল বাঁকা, ব্রিটিশ পলিশি বলতে পারতেন না—বলতেন 'ব্রিটিছ্ পলিছি'—এই পলিছি তিনি প্রত্যেকটি ঘটনায় দেখতে পেতেন। ডিকেন্সের ডেভিড কপারফিল্ড উপন্যাসের মিস্টার ডিকের যেমন সব কথায় 'রাজা চার্লসের মাথা' এসে পড়ত—তেমনি ছিল তারাপদবাবুরও—ছটা কথা বললেও তিনি তার মধ্যে একবার 'ব্রিটিছ পলিছি'র উল্লেখ করবেনই। এই পলিছির সাংঘাতিক ক্ষমতার পরিচয় তিনি প্রতিদিনকার দৈনন্দিন অভাব-অভিযোগ থেকে শুরু ক'রে মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্রের আড়ালেও খুঁজে বার করতেন।

অথচ তাঁর মত ইংরেজী শিক্ষার এমন সমর্থক কেউ ছিল না। সংস্কৃত পড়ার কথা উঠলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতেন, 'ঝ্যাটা মারো—ঝ্যাটা

মারো! ওসব ইক্‌ড়ি মিক্‌ড়ি পড়ে কি হবে বাবা—সংস্কৃত পড়া হলো পৃথিবীর উল্টো দিকে হাঁটা। পৃথিবী যাচ্ছে একদিকে তোমরা চলেছো অন্য দিকে। এখন সারা পৃথিবীটা পড়ে রয়েছে ঐ ইংরেজগুলোর পায়ের তলায়। জ্ঞান-বিজ্ঞান রণবিদ্যা যা কিছু বলো না কেন—ওরাই হাতের মুঠোয় পুরেছে। যেমন ক'রে হোক ইংরেজী শিখে ঐগুলো আগে হাতাও তারপর অন্য কথা! সংস্কৃতে আছে কি? সাংখ্য? পাতঞ্জল? বেদান্ত?—ওরে বাবা, তাও পাবি ইংরেজী পুঁথি পড়লে। ওরা নেয়নি কি? কোন বিদ্যেটা ওদের আত্মসাৎ করতে বাকী আছে তাই শুনি? প্রাণপণে ইংরেজী শেখ—পৃথিবীতে যা কিছু শেখা সব তোর কাছে সহজ হয়ে যাবে। সরস্বতীর ঘরের কপাট হল ঐ এ-বি-সি-ডি—জানিস বাবা? ঐ দোর খুলতে পারিস, গোটা ঘরখানাই তোর।'

শুধু জ্ঞানের কথাই নয়—প্রয়োজনের কথাটাই ছিল তাঁর কাছে বড়। বলতেন, 'ইংরেজী লেখাপড়া না শিখলে কোনদিন ওদের চিনতেও পারবিনি, ওদের সঙ্গে লড়তেও পারবিনি। ওদের সমান হয়ে তবে ওদের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। রাবণের মৃত্যুবাণ রাবণের ঘর থেকেই চুরি করতে হয়েছিল। পুরাণে এসব গল্প যে তোদের শিক্ষা দেবার জন্যেই লেখা হয়েছে বাবা!'

প্রতিদিন শুনতে শুনতে কথাটা গভীর ভাবে মূলপ্রসার করেছিল পূর্ণবাবুর মনে। ওঁর দাদামশাই রাখালদাস ন্যায়রত্নের কাছে যেতেন অবসর পেলেই—তাঁর নিজের বেশি লেখাপড়ার সুযোগ হয়নি—বোধ হয় সেইজন্যই তাঁর সাধ হয়েছিল নাতি অন্তত সংস্কৃত শিখে পণ্ডিত হোক। মুখ ফুটে ব'লেও ছিলেন সে কথা—পূর্ণবাবু কান দেননি। তারাপদবাবুর কথা প্রত্যহ মনের ইস্পাতে হাতুড়ি পেটার মত ঝঙ্কার তুলত—দাগও রাখত। তাই শোনা হয়নি। হয়ত—আজ মনে হয়—দাদামশাই সেদিন দুঃখই পেয়েছিলেন।

কিন্তু শিক্ষা চাই।

একথাটাও তারাপদবাবু বলতেন; শিক্ষাই মানুষের জীবনে বড় কথা। পয়সা রোজগারের জন্য কেউ যেন লেখাপড়া শিখতে এসো না। ঐ যে মারোয়াড়ীরা লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করছে—কার ক-টা ডিগ্রি আছে? না, পয়সা রোজগারের জন্যে লেখাপড়া শেখার কোন প্রয়োজন নেই। টাকা চাও? কাঁধে ক-খানা গামছা নিয়ে দশাশ্বমেধের ধারে দাঁড়াও—এক টাকার গামছা বেচলে অন্তত চার আনা পয়সা লাভ পাবে। লেগে যাও। এক টাকার গামছা কেনবারও সঙ্গতি নেই? বেশ ত—রাস্তার পাশে হাজার হাজার নিমডাল আছে—কেউ কিছু বলবে না, একরাশ দাঁতন ভেঙ্গে এনে বসে যাও। কিছু ত হবে—এমনি পাঁচদিন বসলেই রোজকার খরচ চলেও একটা টাকা মূলধন জমবে। তখন গামছা কেনো। গামছা বেচতে বেচতে কাপড়—তা থেকে মুদীর দোকান। এ-ও ইস্কুলের মতই ক্লাস ওআন থেকে ক্লাস টেন! কিন্তু সে হ'ল আলাদা পাঠ। লক্ষ্মীর পাঠ।

'শিক্ষার উদ্দেশ্য তা নয়। দারিদ্র্যই হ'ল শিক্ষার গৌরব। এই ত সব মাস্টার—ভিক্ষে করলেও হয়ত বেশী রোজগার হ'ত এদের—এদের হাত দিয়ে কত বড় বড় লোক বেরিয়ে যাচ্ছে। জজ মেজেস্টার—কত কে! তারা ত কৃতজ্ঞ, তারা ত দেখা হ'লে হাত তুলে নমস্কার করে, কেউ হেঁট হয়ে পায়ে হাত দিয়েও প্রণাম করে। এইটুকুই পুরস্কার। শাস্ত্রে বলেছে বিদ্যাদানের চেয়ে বড় দান নেই। সামান্য দেহের দুঃখ হয়ত পাচ্ছে—কিন্তু এতবড় দান ত ক'রে যেতে পারছে অনায়াসে। সে সৌভাগ্য কি কম!'

কোন অকালপক্ক ছেলে হয়ত প্রশ্ন ক'রে বসত, 'মাইনে নিয়ে পড়ানোও কি দান মাস্টার মশাই?'

জ্বলে উঠতেন তারাপদবাবু, 'মাইনে? পনেরো কুড়ি—বড়জোর ত্রিশ—এই ত মাইনে। একে কি তবে বিক্রী বলবি? এ-ও দান। ঐ টাকাতে কার কী হয়? অকৃতজ্ঞ হোসনি—ঐ কটা টাকা দিয়ে ভাবিসনি যে গুরুকে কিনে নিয়েছিস। এক বর্ণ শিখে যদি গুরুর কৃপায়—শিষ্য তাহে চিরদিন বাঁধা থাকে পায়ে।

এই সব কথাই শুনেছেন পূর্ণবাবু—প্রতিদিন। আর শুনেছেন তাঁর বাল্যকালে। যখন সহজেই নরম মনে ছাপ পড়ে এসব কথার। আর নরম না হলেই বা কি? তারাপদবাবুর কথা ত নয়—হাতুড়ী। যে-কোন শক্ত লোহাকেও বাঁকিয়ে নিজের ছাঁচে ফেলতে পারতেন তিনি।

না—শিক্ষার ক্ষেত্রে দারিদ্র্য অগৌরব নয়।

ওদের সহপাঠী বহু ছেলেই সত্রে—বা 'ছত্রে' খেত! নাটোরে সত্র, রাঙ্গামাটি সত্র, বিদ্যাময়ী সত্র, পুঁটিয়ার সত্র—নাট্‌কোটাদের সত্র। কাশীতে তখন অন্ন—জীবনধারণের মত ডাল ভাত আর একটা নিরামিষ তরকারী—খুবই অনায়াস-লভ্য ছিল। বহু ছাত্র খেত—এমন কি মাস্টার মশাইরাও কেউ কেউ খেতেন। আর তা প্রকাশ্যে—সবাই জানত, সবাই দেখত। সেটা কিছুমাত্র অগৌরবের ছিল না। টোলের বহু বয়স্ক ছাত্রও এইসব সত্রে খেত—কারণ সব অধ্যাপকের অন্নদান করার ক্ষমতা ছিল না। স্থানটার ব্যবস্থা হ'ত খুব সহজেই কিন্তু খাওয়ার অভাব। এসব সত্র ছাড়া কোন কোন ঠাকুরবাড়ীতেও প্রসাদেরও বন্দোবস্ত ছিল কিন্তু সে-সব বাঁধা-ব্যবস্থা। তাছাড়া ওখানে ত অধিকাংশই শিবমন্দির—শিবমন্দিরে অন্নভোগ নেই। গোপাল কি কৃষ্ণমন্দির কিংবা দেবী মন্দিরে অন্নভোগের বরাদ্দ আছে।

আহার বাসস্থান বস্ত্র—সব দিক দিয়েই দৈন্য ছিল। খুবই টানাটানি, খুবই কৃচ্ছ্রতা। তবু কী প্রসন্ন ছিল সবাই। চোখ বুজলে অতীতের যেসব ছোটখাটো দৃশ্য, যে সব আপাতত-হারিয়ে যাওয়া মুখ অকস্মাৎ থেকে থেকে মনের পটে ফুটে ওঠে তাতে ঐ একটা কথাই পূর্ণবাবু দেখতে পান। প্রসন্ন মুখে সর্বপ্রকার দৈহিক অসুবিধা অবহেলা ক'রে পরিপূর্ণ নিষ্ঠার সঙ্গে বিদ্যাচর্চা—জ্ঞানচর্চা ক'রে যাচ্ছে। শিক্ষাই জীবনের উদ্দেশ্য, শিক্ষাই জীবনের পরিপূর্ণতা—সার্থকতা।

শিক্ষা বলতে সাধারণ লোক যা বুঝত তখন—অবশ্য সেই শিক্ষাই।

পূর্ণবাবুর দাদা-মশাই বেশিদিন টেঁকেন নি। বয়স হয়েছিল ঢের—দীর্ঘদিন পশ্চিমে ছিলেন বলেই সুস্থ ছিলেন। পূর্ণবাবু প্রবেশিকা দেবার কিছু আগেই তিনি একদিন অকস্মাৎ মারা গেলেন। শ্রাদ্ধশ্রান্তি চুকে গেলে হিসাব করতে বসে নীলাব্জসুন্দরী দেখলেন যে, যা অবশিষ্ট আছে তাতে কাশী শহরে ছ মাস চলতে পারে, অন্য কোথাও তা-ও চলবে না। তিনি কাশীতেই রইলেন এবং অন্যান্য বিধবাদের দেখে দেখে তক্‌লীতে সুতো কেটে পৈতে তৈরী করতে লাগলেন। যা দু' এক পয়সা হয়! পূর্ণবাবু ও তাঁর ভাই সত্রে খেতে লাগল। পাড়ার দু' একটি লোক তদ্বির করে রাঙ্গামাটি সত্রে ব্যবস্থা করে দিল। একটু দূর পড়বে—তা পড়ুক। ওখানে নাকি খাওয়া ভাল।

তবু পূর্ণবাবু পড়া ছাড়েন নি। তারাপদবাবু বলেছিলেন, 'না হয় সবাই মিলে হপ্তায় দুদিন উপোস দিবি—লেখাপড়া খবরদার ছাড়িসনি। একটা বছরের জন্যে পাসটা দিবি না? একটা পাস না দিলে ভদ্রলোকের ছেলে পরিচয় দিবি কি ক'রে? আর কাজই বা কোথায় কি পাবি? কেরানীগিরি হয়ত জুটতে পারে তাও ধরবার লোক থাকলে। কিন্তু জীবনটা নষ্ট হ'তে দিবি এমনি ক'রে?'

বলতে বলতে চোখ স্বপ্নালু হয়ে ওঠে তারাপদবাবুর, তিনি বলেই চলেন, 'ইস্কুল কি ছিল এখানে? ইস্কুল ত বসাল ওরাই—নিজেদের মৃত্যুবাণের সন্ধান দিলে নিজেরাই। এক স্কচ্ সাহেব—কী যেন, হ্যাঁ—জোনাথন ডানকান তখন এখানকার রাজার রেসিডেন্ট—লর্ড কর্ণওয়ালিস্ ভারতের গবর্ণর জেনারেল—ডানকান তাঁকে ধরে রাজাকে রাজী করিয়ে প্রথম ইংরেজী ইস্কুল বসালে পাদ্রীদের দিয়ে। ঐ যে এখন যাকে কুইন্স কলেজ বলে। সে হল ১৭৯৩ সালের কথা। তারপর অবিশ্যি বাঙ্গালীই এখানে ইস্কুল করলেন—খিদিরপুর ভূকৈলাসের রাজারা—জয়নারায়ণ ইস্কুল। সেও হ'ল ধরো ১৮১৪-র কথা, আর আমাদের এই ইস্কুল বসল বাঙ্গালীদের চেষ্টায়—১৮৫৪ সালে, মিউটিনিরও তিন বছর আগে। এখন ত কতই হচ্ছে, শুনছি আবার চিন্তামণি মুখুজ্জে বলে একজন কে উঠে-পড়ে লেগেছে বাঙ্গালীর জন্যে এক ইস্কুল করার। বেশ করছে, যত হচ্ছে তত মঙ্গল। ইংরেজী ইস্কুল নয় বাবা—ও ইংরেজ মারবার কামান ঢালাই হচ্ছে একটি একটি। ইংরেজ তাড়াতে হ'লে ইংরেজী পড়তে হবে—মনে প্রাণে ইংরেজ হতে হবে। এও তোমাদের বলে রাখছি বাবারা, যদি কেউ সত্যি সত্যি ইংরেজদের গুণটুকু নিয়ে ইংরেজ হয়ে উঠতে পারে—সেই এ দেশ থেকে ইংরেজ তাড়াতে পারবে। ভেতরে ভেতরে ইংরেজ হ'লে দেখবি যে সে বাইরেটায় যতটা সম্ভব এদেশী হবে—কারণ জাতীয়তাবোধ আমাদের কোনদিনই ছিল না, ওটা ইংরেজদেরই। বিদ্যাসাগর অমনি মানুষ ছিলেন, তাই দেশটাকে এতটা এগিয়ে দিয়ে যেতে পেরেছেন। আর একজন অমনি মানুষ চাই আমরা। তাহ'লেই কেল্লা ফতে!'

ইস্কুলের পাট যেদিন চুকলো—সেইদিনই পূর্ণবাবুকে বোধ হয় চাকরী বা ভিক্ষায় বেরোতে হত যদি না ইতিমধ্যেই ওদের অবস্থা দেখে হেডমাস্টার মশাই এক অসাধ্য-সাধন করতেন। অসাধ্য-সাধনই তখনকার দিনে—কাশীতে টিউশানী। একটি ধনী পরিবারের ছ'বছরের ছেলেকে পড়ানো—তাতেই পাঁচ টাকা মাইনে। যে কোন শিক্ষকই এমন চাকরী পেলে বেঁচে যেতেন কিন্তু তখন এর রেওয়াজ ছিল না ব'লে কেউ খুঁজত না—হেডামাস্টার মশায় অনায়াসে টিউশনীতে পূর্ণবাবুকে ঢুকিয়ে দিলেন। পাঁচ টাকায় তখন কাশীতে দুটো লোকের চলতে পারত।

পূর্ণবাবু ভাল ভাবেই এন্‌ট্রান্স পাস করলেন। আর পড়ার প্রশ্নও উঠত না যদি না ঈশ্বর একটু মুখ তুলে চাইতেন। ঐ একবারই পূর্ণবাবুর জীবনে তিনি বোধকরি মুখ তুলে চেয়েছিলেন। ও'র মা'র মামাতো ভাই একজন বেড়াতে এসেছিলেন কাশীতে—হঠাৎ গঙ্গার ঘাটে দেখা হয়ে যায়। তাঁর অবস্থা ভাল—তিনি সব দেখেশুনে সদয় হয়ে বললেন, 'বেশ ত, পূর্ণ যদি আমার ওখান থেকে খেয়ে পড়তে চায় ত চলুক। কিন্তু তোমাদের কী হবে?'

নীলাম্বুজসুন্দরী বহুদিনই ভাবা ছেড়ে দিয়েছিলেন—হতবুদ্ধির মত শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। পূর্ণবাবু এধারে ভেতরে ভেতরে ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন, এতবড় সুযোগ সামান্য সুবিধার জন্য হাতছাড়া হয়ে যাবে? তিনি বললেন, 'ওখানে কি টিউশনী একটাও জুটবে না মামা? যদি মাসে দশটা টাকাও জোটাতে পারি ত দুটো টাকা নিজের জন্যে রেখে আটটা টাকা এদের পাঠাবো। তাতেই কায়ক্লেশে এরা চালিয়ে নেবে। পারবে না মা?'

মা তেমনিই বিহ্বলভাবে ঘাড় নেড়েছিলেন।

মামা বলেছিলেন, 'তা হয়ত আমার অফিসের বড়বাবুকে বললে—কিংবা অন্য বাবুদের বললেও দুটো একটা জুটতে পারে। তা যা জোটে তাই জুটবে। তোমার হাত খরচও আমি দেব একটা টাকা মাসে। কিন্তু পাস করতে হবে, মনে থাকে যেন। পাস করো, বি. এ-টাও পড়াবো, নইলে ঐ পর্যন্ত! আমি এক কথার মানুষ।'

সাগ্রহে ও সানন্দে রাজী হয়েছিলেন পূর্ণবাবু। এ-ত হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাওয়া! তার জন্যে সামান্য-মাত্রও ভয় পেলে চলবে কেন?

মামাই গাড়ী ভাড়া দিয়ে কলকাতায় নিয়ে এলেন। প্রথমে পূর্ণবাবু ভেবেছিলেন সবটাই উদারতা, মামীও তাই মনে করেছিলেন—সেজন্য স্বামীর নির্বুদ্ধিতায় কিছু বিরক্তও হয়েছিলেন কিন্তু কয়েকদিন পরেই দেখলেন যে স্বামী তাঁর শুধু-শুধুই সামান্য বিদ্যে নিয়ে অফিসে অর্থকরী পদ (অর্থাৎ মাইনে ছাড়াও যে পদে উপরি আছে) অধিকার করেননি।—কারণ এখানে আসার পর একটু একটু ক'রে তাঁর নিজেয় তিন-চারটি ছেলেমেয়ের পড়ার ভার সম্পূর্ণরূপেই পূর্ণবাবুর ঘাড়ে তুলে দিলেন; 'ওরে তোর পূর্ণদাকে দেখিয়ে নে না, পড়াটা'—'ও পূর্ণ তোমার ভাইয়ের এই আঁকটা দেখিয়ে দাওনা বাবা'—এই ভাবে। পূর্ণ 'না' বলতে পারেন নি—বিরক্তও হননি। কৃতজ্ঞতার

কিছু মূল্য তখনও মানুষের জীবনে ছিল।

তবে বাইরের টিউশনীর সময় কমে গেল। মামা সকালে বিকালে দুটো টিউশনী জুটিয়ে দিলেন, একটি ছ' টাকা ও একটি চার টাকা। ছ' টাকার টিউশনিতে দুটি ছেলে—আর চার টাকায় একটি। এতগুলি পড়িয়ে (মামাতো ভাইবোনদের নিয়ে সাতটি) আর সময় থাকত না একটুও। গভীর রাত্রে নিজের পড়া পড়বার সময় হ'ত। তাও আলো পাওয়া যেত না—সামান্য 'সেজ'-এর আলোয় রাত দেড়টা দুটো পর্যন্ত পড়তেন। আবার ভোর বেলাই উঠতে হ'ত। তবু পূর্ণবাবু তাতে কষ্ট বোধ করেন নি কখনও—বরং মনে মনে যেন একটা আনন্দই বোধ করতেন। পড়তে পারছেন এই ত কত সৌভাগ্য! ছাত্রদের অধ্যয়ন হ'ল তপস্যা। তপস্যা কি এতই সহজ? সম্পূর্ণরূপে নিজের দেহকে ভুলে গিয়ে এই তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন পূর্ণবাবু।...

কিন্তু বোধ হয় সকল তপস্যাতেই ঈশ্বর বিঘ্ন সৃষ্টি করেন। পূর্ণবাবু সামান্য মানুষ, সামান্য তাঁর তপস্যা—লক্ষ্য আরও ছোট, তবু ঐকান্তিকতার অভাব ছিল না ব'লেই বোধ করি ভগবান তাঁর স্বর্গলোকের সর্বশ্রেষ্ঠ বরনারীকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে ছিলেন ওঁর তপোভঙ্গের জন্য।

সে-ই ওঁর জীবনের একমাত্র রোম্যান্স। একমাত্র আনন্দ-স্মৃতি।

পূর্ণবাবু জীবনে কোন ব্যর্থতার জন্য কখনও বেদনা অনুভব করেননি এতকাল—শুধু তরুবালার স্মৃতিটি কখনও কোন অবসর-মুহূর্তে মনে এলেই বেদনায় টনটন ক'রে উঠত সমস্ত অন্তরটা।

ঐ ক্ষোভটুকুকে কিছুতেই জয় করতে পারেননি।

তরুবালা বুঝি দেবতারও আকাঙ্ক্ষিত ধন!

॥ ৭ ॥

তরুবালার সঙ্গে ওঁর প্রথম পরিচয় এফ-এ পরীক্ষার মাত্র মাস-কতক আগে। ওঁর চার টাকা ব্যবস্থার যে ছাত্র নবগোপাল, তরুবালা তারই দিদি। নবগোপালের দিদি আছে জানতেন তিনি, কারণ তার বাবা প্রায়ই দুঃখ করতেন, 'মেয়েটা আমার খুব লক্ষ্মী, জানো বাবা কিন্তু ছেলেটা যে কোথা থেকে এমন বদ হ'ল তা জানি না। আর তেমনি বেটির লেখাপড়ার চাড়—একেবারে লক্ষ্মী-সরস্বতী!'

ছেলেটা অবশ্য কিছু বদ নয়—একটু বেশী চঞ্চল। কিন্তু সেটা ত হওয়াই ভাল। প্রতিবাদ করার চেষ্টা করতেন পূর্ণবাবু সবিনয়ে।

'একটু? রীতিমত চঞ্চল। ওতে কি লেখাপড়া হয়! তুমি আমার মেয়েকে দ্যাখোনি বাবা—ভারি শান্ত, আর ভারি লক্ষ্মী।'

কিন্তু দেখা হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিল না—কারণ তরুবালা পড়ত মহাকালী পাঠশালায়। বাড়ীতে পড়বার দরকারই হ'ত না। দেখা হওয়ার

অন্য সুযোগ-সুবিধাও অত সুলভ ছিল না। তখন ভাইদের পড়ার ঘরে পুরুষ মাস্টারের সামনে গিয়ে বোনদের দাঁড়ানো—খুবই শিশু-বয়সের মেয়ে ছাড়া—দোষের ব'লে গণ্য হ'ত।

দেখা হ'তও না কোনদিন হয়ত—দূরে থেকে ছাড়া, যদি না পূর্ণবাবুর ভাগ্যদেবতা ওঁর জীবন নিয়ে এই নিষ্ঠুর খেলা খেলতে চাইতেন।

মেয়ে বড় হয়েছে, এগারো থেকে বারোয় পড়ল—হুকুম এল মেয়ের ঠাকুমার কাছ থেকে—'ইস্কুল ছাড়িয়ে নাও, পড়াতে চাও বাড়ীতে ব্যবস্থা করো।' মেয়ে কান্নাকাটি করলে—বলতে গেলে আহার-নিদ্রা ছেড়ে দিলে কিন্তু ঠাকুমার হুকুম পালটালো না। তরুর বাবা ইস্কুল ছাড়িয়ে নিতে বাধ্য হলেন। বিশেষ ক'রে মেয়ের বিয়ের তাগাদা আসছিল বহুদিন থেকেই—নিজের স্বভাব-সিদ্ধ আলস্যের জন্যই পেরে ওঠেননি পাত্র ঠিক করতে—সেইটেই যথেষ্ট অপরাধ—তার ওপর এ আদেশ অমান্য করতে তাঁর সাহসে কুলোল না।

অবশ্য ভদ্রলোক—কী যেন নাম—মনে পড়েছে, প্রাণগোপালবাবু—মেয়েকে ভালবাসতেন খুবই, দিন-কতক ঘটা ক'রে নিয়ে বসলেনও পড়াতে। কিন্তু সে সদিচ্ছাটা বেশিদিন স্থায়ী হ'ল না। চিরকাল তাঁদের অফিসের ফেরৎ স্নান ক'রে সরবৎ আর ফল খেয়ে গিলে-করা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে ছড়ি নিয়ে বেরোনো অভ্যাস—অন্তত পূর্ণবাবু বরাবরই তাই দেখেছেন (কোথায় যেতেন তা পূর্ণবাবু আজও জানেন না)—সে অভ্যাস ত্যাগ করা গেল না। সকালে সময় হওয়া অসম্ভব ; কারণ তিনি উঠতেনই আটটার সময়।

মেয়েকে পড়ানো বন্ধ হ'ল কিন্তু পড়া বন্ধ হ'ল না। নবগোপাল এসে প্রায়ই গল্প করত—'জানেন-মাস্টার মশাই, দিদি নিজে নিজেই আঁক কষবার চেষ্টা করে আর যখন পারে না তখন কেঁদে ফেলে।'

শুনে শুনে একদিন পূর্ণবাবু বলেছিলেন ছাত্রকে, 'তোমার দিদি কি অংক কষতে পারে না—আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলো—আমি কষে দেবো খাতায়। পড়ে দেখে বুঝতে পারবে না ?'

সংকোচের বাঁধে আগ্রহ মাথা কুটছিল—এইটুকু প্রশ্রয়ের বাঁধ ভাঙ্গল। খাতা হাতে ক'রে দিদি একদিন নিজেই দেখা দিল।

ওকে দেখে একদিনেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন পূর্ণবাবু।

সুশ্রী খুবই—তবে এমন কিছু সুন্দরী নয়। কিন্তু তার সেই বারো বছরের বালিকা দেহটিকে ঘিরে এমন একটি স্নিগ্ধ শান্ত লক্ষ্মীশ্রী বিরাজ করত যে সেদিকে চাইলেই নিমেষে চোখ জুড়িয়ে যেত। এত শান্ত এত ভদ্র—এত মিষ্ট স্বভাব, পূর্ণবাবু কারও মধ্যে দেখেননি। আর তেমনি মেধা। ইঙ্গিত মাত্রে বুঝতে পারে, বুঝতে পারলে আর কখনও ভোলে না।

পূর্ণবাবুর মনে হ'ল এ মেয়েকে পড়ানোর জন্য নিজের পড়া বন্ধ হ'লেও ক্ষতি নেই।

সেদিন আর কিছু বোঝেননি। তাঁর বয়েস সতেরো, মেয়েটির বয়স বারো। এখনকার কালের হিসেবে বালক-বালিকা ; তখনকার দিনে অবশ্য

ঐ বয়সে অনেক বেশি অভিজ্ঞ ও বয়স্ক হয়ে পড়ত ছেলেমেয়েরা—কিন্তু যে কোন কারণেই হোক পূর্ণবাবু একটু কম পাকা হ'তে পেরেছিলেন ; তিনি যে ভালবেসেছিলেন তা তখন বোঝেননি—ভাল লেগেছিল এইটুকুই জানতেন।

অন্তঃপুরে খবরটা পৌঁছতে তরুর মা নিষেধ করলেন—শাসনও করলেন কিছু, কিন্তু প্রাণগোপাল সস্নেহে বললেন, 'তা কি আর হবে বড় বৌ—দুদিন পরেই ত বিয়ে হয়ে পরের বাড়ী চলে যাবে—পড়ার শখ হয়েছে মিটিয়ে নিক। মিছিমিছি অকারণ মেয়েটাকে কাঁদিও না।…পূর্ণ ছেলে ভাল, আর কে-ই বা অত জানছে যে নিন্দা হবে।'

পরের মাসে মাইনে দেবার সময় পুরো পাঁচ টাকাই দিলেন। একটু প্রসন্ন হেসে বললেন, 'পাগলী বেটি নাকি তোমাকে বড্ড জ্বালাতন করে ? তা একটু আধটু দেখিয়ে দিও বাবা !'

এক টাকা মাত্র বেশি। কিন্তু সে এক টাকা না পেলেই খুশী হতেন পূর্ণবাবু। তরুবালাকে পড়ানোর জন্য মাইনে—ছিঃ!

তরুবালাকে পড়ানো নেশার মত পেয়ে বসল পূর্ণবাবুকে। তিনি ভুলেই গেলেন যে মাত্র দুতিন মাস পরে তাঁর নিজের পরীক্ষা। পড়াতে অবশ্য আর কতটাই বা সময় নেওয়া যায়—কিন্তু সে চিন্তা বাকী অবসর সময়কে মোহগ্রস্ত করে রাখত, অনেক সময় নিজের পড়বার বই খোলাই থাকত, পড়া হ'ত না এক পৃষ্ঠাও।

এর যা ফল হবার তাই হ'ল। এফ-এ পরীক্ষায় পূর্ণবাবু ফেল করলেন। লেখাপড়ায় ঐখানেই পড়ল ইতি। মামা এক কথার মানুষ—তিনি আর পড়ার খরচ দেবেন না। কাশীতে ওদের দিন চলছে না—সেখানে আরও কিছু টাকা পাঠাতেই হবে। এখানে পড়ার খরচ চালায় কে ? এই পরীক্ষায় ফিয়ের টামা জমা দিতেই বহু অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়েছে তাঁকে ওর মামীর কাছে।

'অত টিউশনী করছে, মাসে একটা ক'রে টাকা জমালেও ত এ টাকাটা জমে থাকত! তা নয়—তোমাকে যেমন বোকচন্দর পেয়েছে—খুব দুয়ে নিচ্ছে!' ইত্যাদি—

সুতরাং উপার্জন করতেই হবে। ভাই-বোনদের প্রতিও কর্তব্য আছে। তাদের লেখাপড়া হয় ত হোক। ও'র যখন হ'লই না।

কী কাজ খুঁজবেন ?—কোন্ কাজ করবেন ?

কোন দ্বিধা ছিল না পূর্ণবাবুর মনে। মাস্টারীই করবেন তিনি।

মামা চেয়েছিলেন তাঁর অফিসে ঢুকিয়ে দিতে। মাইনে আপাতত পনেরো টাকা হয়ত হবে কিন্তু ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। উপরি আছে এখন থেকেই।

এই কৃতজ্ঞতার সূত্রে বিনা মাইনের মাস্টারটিকে চিরকাল বেঁধে রাখবার ইচ্ছাই হয়ত এ প্রস্তাবের মূলে ছিল প্রেরণা হয়ে—কে জানে। কিন্তু পূর্ণবাবু রাজী হননি।

'মাস্টারী ? তুই কি পাগল হয়েছিস ? মাস্টারীতে কি আছে ? চিরজীবন

দুঃখে কাটবে। তাছাড়া কী-ই বা লেখাপড়া শিখেছিস তুই যে মাস্টারী করবি? এফ-এটা পাস করলেও না হয় হত!'

কিন্তু সদানন্দ পূর্ণবাবু এই একটি স্থানে কঠিন হয়ে রইলেন। তারাপদবাবুর শিক্ষা তাঁকে পিটিয়ে কঠিন করেছিল—তিনি জানালেন, যা হবার হবে, তিনি মাস্টারীই করবেন।

খোঁজাখুঁজি ধর-পাকড়ের পর একটা মাস্টারী পাওয়া গেল। মাসিক কুড়ি টাকা মাইনে।

সেই টাকাটাই সেদিন মনে হয়েছিল ঢের। কুবেরের ঐশ্বর্য। ছেলে-পড়ানোগুলো ত রইলই।

ভাড়াটে ঘর খুঁজে মা-ভাইদের আনাবার ব্যবস্থা করলেন। এক কথায় শুরু হ'ল তাঁর সংসার, শুরু হল তাঁর নিজস্ব জীবন। নিজের পথে নিজের ইচ্ছায় সে জীবনধারাকে চালিত করবেন তিনি।

কিন্তু সেদিন কি শুধু মামাই প্রস্তাব করেছিলেন চাকরীর?

তাঁর এই শিক্ষকতা করার জেদ রাখতে গিয়ে কি চরম স্বার্থত্যাগই করেননি তিনি?

প্রাণগোপালবাবুর বড় একটা এসব তুচ্ছ কথা খেয়াল থাকত না কিন্তু হয়ত অদৃশ্য কোন ইঙ্গিতেই তিনি একদিন ওদের পড়ার ঘরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। হয়ত তরুবালার সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে শ্রদ্ধা ছাড়াও কোন গভীরতর মনোভাবের ইঙ্গিত পেয়ে তরুর মা-ই প্রবুদ্ধ করেছিলেন প্রাণগোপালবাবুকে। প্রাণগোপালবাবু মিনিটখানেক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে ছড়িটা খোলা কপাটে ঝুলিয়ে রেখে ছেলেমেয়েকে বলেছিলেন, 'তোরা একবার ভেতরে যাতো—আমি মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে কথা বলি একটু!'

শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন পূর্ণবাবু। কী এমন কথা। তবে কি তাঁর আচরণে কোন বৈসাদৃশ্য দেখা গেছে। বা কর্তব্যে কোন অমনোযোগ?

কিন্তু বেশিক্ষণ ভাবতে হয়নি তাঁকে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই প্রাণগোপালবাবু প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি না এফ-এ একজামিন দিয়েছিলে বাবা? কি হ'ল তার?'

মাথা নিচু ক'রে পূর্ণবাবু উত্তর দিয়েছিলেন, 'ফেল করেছি।'

'ফেল করেছ? ইস্। ছেলেমানুষ—। ফেল করলে কী ক'রে? তোমার ত বেশ ভাল মাথা বলেই মনে হয়?'

তারপরে আর উত্তরের অপেক্ষা রাখেননি। পুনশ্চ প্রশ্ন করেছিলেন, 'তারপর? এখন কি করবে?'

মাথা হেঁট ক'রেই পূর্ণবাবু বলেছিলেন, 'একটা মাস্টারি পেয়েছি—আপাতত তাই করব।'

'মানে পড়াশুনা আর করবে না—কেমন ত? তা ভালই—মিছিমিছি সময় নষ্ট। সেই যখন চাকরী-বাকরীই করতে হবে। তা মাষ্টারী কেন? ওতে

কাজ নেই, বরং ভাল একটা চাকরী দ্যাখো—বলো ত আমিও চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

পূর্ণবাবু মাথা হেঁট ক'রেই ছিলেন! কথা বলেননি।

কিন্তু দিনকতক পরে যখন প্রাণগোপালবাবু চাকরীর প্রস্তাব নিয়ে এলেন —পঁচিশ টাকা মাইনে—পরে বাড়বে—চাই কি বড়বাবু হওয়াও বিচিত্র নয় একদিন—তখন আর চুপ ক'রে থাকা চলেনি। কথা বলতে হয়েছিল।

'আজ্ঞে, আমার মাস্টারীই ভাল লাগে। অফিসের চাকরী আমি করব না।'

'এঃ—তুমি একটা আস্ত পাগল। চাকরী পেলে কি কেউ মাস্টারী করে নাকি? কী আছে ওতে? ওসব মতলব ছাড়ো, কালই একটা দরখাস্ত লিখে দিও দিকি, বরং মুসাবিদেটা আমিই ক'রে দেব—'

সবিনয়ে অথচ দৃঢ়তার সঙ্গে পূর্ণবাবু জানিয়েছিলেন যে ভবিষ্যতের কোন স্বর্ণস্বপ্নেই তিনি তাঁর বেছে নেওয়া পথ ছাড়তে রাজি নন।

তখন আসল প্রলোভনটাই সামনে তুলে ধরেছিলেন প্রাণগোপালবাবু-জানিয়েছিলেন তাঁর কল্পনা। পূর্ণবাবু তাঁদের স্বজাতি—পাল্‌টি ঘর। তাঁর ইচ্ছা তিনি পূর্ণবাবুর সঙ্গে তরুবালার বিবাহ দেন। চাকরী তাঁর নিজের অফিসে, উন্নতিও কতকটা তাঁর হাতে—বেশি দেরী হবে না মাসিক আয়টা একশ' টাকাতে পৌঁছতে। আর কি চায় পূর্ণ। তবে একথাটাও আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন প্রাণগোপালবাবু যে তাঁর অত আদরের মেয়েকে ইস্কুল মাস্টারের হাতে তিনি দেবেন না। বিশেষত যখন ওর এই অবস্থা—না চাল না চুলো—না কিছু!

সেদিন একটু টলেছিলেন বৈকি পূর্ণবাবু।

সারারাত সেদিন ঘুমোতে পারেননি—পায়চারি করেছিলেন ছাদে। এক—দিকে ওঁর আদর্শ, তারাপদবাবুর শিক্ষা—আর একদিকে জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রলোভন।

এ কী পরীক্ষায় ফেললেন তাঁকে ভগবান। এখন কি করবেন তিনি?

তরুবালা? তাঁর আত্মার আনন্দ, তাঁর প্রাণের আরাম।

কোনদিন ভুল হয় না তার, পড়াতে গেলে প্রথমেই পাখা হাতে ক'রে এসে বসে বাতাস করতে, যতক্ষণ না গায়ের ঘাম জুড়োয়। কোনদিন ভুল হয় না তার পূর্ণবাবুর বাড়ী চলে আসবার সময় প্রণাম করতে। তার সেই দীর্ঘ পক্ষ্মাচ্ছাদিত চোখের কী যে শ্রদ্ধা, কী যে প্রীতি নিয়ত উৎসারিত হতে থাকে —তিনি যতক্ষণ তার দৃষ্টিসীমায় থাকেন!

প্রতিটি কাজে তার কি নিপুণতা! কোন দিন কোন উপলক্ষে জলখাবারের ব্যবস্থা থাকলে কি যত্ন ক'রে আসন পাতে, ঠাঁই করে এবং খাবার এনে সাজিয়ে দেয়। হাতে জল ঢেলে দেওয়া থেকে, আচমনের শেষে পা ধুইয়ে দিয়ে পা মুছিয়ে দেওয়ার মধ্যে শুধু কি সুশিক্ষা, তার সঙ্গে কি ঐকান্তিকতাই কম—নিজের অন্তরের?

সেই তরুবালা তাঁর হবে। তাঁরই জীবনসঙ্গিনী, তাঁর গৃহিণী—? তাঁর অন্তঃপুরে থেকে তাঁর সুখস্বাচ্ছন্দ্যের বিধান করবে, এমনি অস্খলিত সেবা করবে চিরকাল ?

কিসের জন্য এ সুদুর্লভ সৌভাগ্যের সম্ভাবনা হাতে পেয়েও ছাড়বেন তিনি ? কি দিতে পারে তাঁকে তাঁর আদর্শ ?···

তবু সারারাত চিন্তার পর সেদিন তাঁর কাছে তাঁর আদর্শই জয়ী হয়েছিল। এতদিনের স্বপ্ন-কল্পনা, এতদিনের শিক্ষা ও জীবনব্রতকে ছাড়া সম্ভব হয়নি।

তরুবালাকেই ত্যাগ করেছিলেন সেদিন। সেই সঙ্গে ছেড়েছিলেন লক্ষ্মীকে—চিরদিনের মত নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-সৌভাগ্যের সম্ভাবনাকে।

'না'ই ব'লে দিয়ে এসেছিলেন প্রাণগোপালবাবুকে, তার পরদিন থেকে আর পড়াতেও যাননি। বেশি দিন হয়ত যাওয়া সম্ভবও হ'ত না—কারণ এই একেবারে দক্ষিণপাড়ায় চাকুরী ক'রে অতদূরে পড়াতে যাওয়া পোষাত না। তবু সেইদিন থেকেই ছেড়েছিলেন—লোভ বড় বলবান।

আজ প্রথম সংশয় দেখা দিয়েছে, আজ প্রথম মনে হয়েছে—সেদিন তিনি ভুলই করেছিলেন, নিবুদ্ধিতার চরম পরিচয় দিয়েছিলেন সেদিন।

সব ভুল, সব বৃথা !

যে দেবতাকে আজীবন পূজা করেছিলেন, বুকের সমস্ত রক্ত দিয়ে—আজ তিনি শুনলেন বিমলের মুখে যে সে দেবতা সেখানে নেই। বেদীমূলে ফুল বিল্বপত্র দিতে দিতে নিচের দিকে চোখ ছিল, ওপরের দিকে তাকিয়ে দেখেননি তাই, যে কখন সে দেবতা অন্তর্হিত হয়েছেন ! কিংবা আদৌ সে দেবতা ছিল কিনা !

॥ ৮ ॥

সারাদিন ধরেই মনটা তিক্ত হয়ে রইল বিমলের। কারণ আঘাত যতটা সে দিয়ে এসেছে তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছে সে নিজে। পূর্ণবাবুকে সে শ্রদ্ধা ক'রে এসেছে চিরকাল। কোন্ অলক্ষ্যে সে শ্রদ্ধা একদা প্রীতিরসে সিক্ত হয়ে গিয়েছিল তা বোধ করি সে নিজেও টের পায়নি। সুতরাং, এমনিতেই তাঁকে আঘাত দেবার বেদনা তো আছেই। তাছাড়া আছে নতুন ক'রে নিজের সম্বন্ধে সচেতনতা। যে খোঁড়া সে খুঁড়িয়ে চলতে চলতে ক্রমশ নিজের খঞ্জতার কথা ভুলেই যায়। নতুন কোন আঘাতে সচেতন হলে শুধু যে সে আঘাতের ব্যথাটা অনুভব করে তাই নয়—এত দিনের সমস্ত বেদনার ইতি-হাসটাও নতুন ক'রে তার মনে পড়ে। বিমলের হয়েছিল তাই। জীবনের ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের বেদনা—প্রত্যহের নিত্যনিয়মিততায় ও কর্মব্যস্ততায় একরকম ভুলে ছিল, অন্তত অনুভূতিটা গিয়েছিল খানিকটা অসাড় হয়ে। আজ এই আঘাতে নিজের জীবনের খঞ্জতা যেন নতুন ক'রে তীব্র বেদনা নিয়ে

জেগে উঠেছে ওর মনে, নতুন ক'রে সেই সমস্ত ক্ষোভ আর গ্লানি ক্ষতবিক্ষত করছে ওর সারা অন্তরকে। কিছুতেই তাই যেন সেদিন স্থির থাকতে পারল না ও—কোথাও। খেতে বসে উঠে গেল খাওয়া অসমাপ্ত রেখে, উত্তর দিল না কারও কথার, শেষ পর্যন্ত একটু রোদ পড়তেই সে বেরিয়ে পড়ল, তখন থেকে রাত এগারোটা অবধি পাগলের মত ঘুরে বেড়াল সে। একটা অশ্রান্ত বিক্ষোভ যেন অহরহ ওকে ঠেলছে সামনের দিকে—কোথাও ওর শান্তি নেই, বিশ্রাম নেই।

পরের দিন স্নানাহার ক'রে সে যখন অফিসে এল তখন আগের দিনের তিক্ততা আর না থাকলেও তার কটু স্বাদটা যেন একেবারে যায়নি। যেন একটা অবসাদ আজ আচ্ছন্ন করেছে তাকে, আগের দিনের সেই উল্কার মত গতিরই প্রতিক্রিয়া বোধ হয় এটা।

কালকের একটা জরুরী ফাইল সারতে হ'ল অফিসে এসেই। এটা শনিবার দেবার কথা ছিল, দেওয়া হয়নি। অফিসে ঢুকতেই ওদের সেকশ্যনের সুপারিনটেন্ডেন্ট শরৎবাবু শুনিয়ে দিলেন যে, এখুনিই খোদ ছোট সাহেব অর্থাৎ ডি-এ-জি তলব করবেন ফাইলটা! ওটা ক'রেই দিতে হবে।

অভ্যস্ত হাত চলে কোনমতে। মস্তিষ্ক অবসন্ন হয়ে যেন ক্লান্ত চোখ দুটি মেলে থাকে—নির্লিপ্ত উদাসীনের মত। পনেরো মিনিটের কাজ আধ ঘণ্টায় শেষ ক'রে ফাইলটা পাঠিয়ে দিয়ে সোজাসুজি চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে বিমল। আগেকার দিন হ'লে কাজের একটা 'শো' তাকে বজায় রাখতে হ'ত অন্তত। এখন অর্থাৎ স্বাধীনতা পাওয়ার পর, তার আর দরকার হয় না। চারিদিকেই এই ভাব, কেউ খবরের কাগজ পড়ছেন, কেউ পান-খাওয়া দাঁত খুঁটছেন, কেউ বা পাশের টেবিলের সহকর্মীর সঙ্গে উচ্চকণ্ঠেই গল্প করছেন। বারোটার পর চা খেয়ে ওঁরা ফাইল খুলবেন। দু' একজন যাঁরা এখন কাজ করছেন তাঁরা আবার ঐ সময়ে উঠে পড়বেন। কেউ যাবেন হাওড়ার হাটে কাপড় কিনতে, কারও বা বড়বাজার থেকে ডাল-মশলা কেনা দরকার, কেউ বা এমনিই অন্য সেকশ্যনে গিয়ে গল্পের আসর জমাবেন।

শ্রান্ত বিমল এদের দিকেই তাকিয়ে রইল বটে কিন্তু এই অফিস, এই পরিবেশ—এ সবে তার মন ছিল না। ওর মন চলে গিয়েছিল বহু দূরে—ওর ছেলেবেলায় পূর্ণবাবুর কথাই ভাবছিল সে। অদ্ভুত মানুষ ছিলেন পূর্ণবাবু। মাস্টারি করতে এসেছিলেন তিনি, আগ্রহ উদ্যম অধ্যবসায়—কোনটাই তাঁর কম ছিল না, তবু তিনি যে মাস্টারিতে বেমানান ছিলেন আজ বিমল সেটা বুঝতে পারে।

ছেলেবেলাকার কথা হ'লেও মনে আছে বৈকি! পূর্ণবাবুর অদ্ভুত কৌতূহল ছিল কলকব্জার প্রতি। পাড়ায় প্রথম যেদিন ছাপাখানার যন্ত্র এল, প্রথম যেদিন তেলের কল বসল—সেদিন ছেলেমানুষের মতই আহার নিদ্রা ত্যাগ ক'রে পূর্ণবাবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিল। কোন্ 'নাট'টির সঙ্গে কোন্ বল্টু বসল, কোন্ লিভারে কাকে ঠেলা দেবে—এ খুঁটিয়ে না দেখে তাঁর তৃপ্তি

ছিল না। তিনি যেন নিঃশ্বাস রোধ করে দেখতেন। কলগুলো চালু হ'লে তবে তাঁর নিঃশ্বাস পড়ত।…

শুধু কি তাই ?

আঁকবার হাতও ছিল পূর্ণবাবুর খুব ভাল। তাই ওদের ড্রয়িং ক্লাসটা তিনি স্বেচ্ছায় নিজে নিতেন। অন্তত বিমলদের সময় পর্যন্ত নিতেন, তার-পরের কথা আর সে জানে না। কিন্তু প্রথম প্রথম দু-একটা গেলাস, প্রদীপ, ছাতা আঁকানোর পরই তিনি ওদের আঁকতে দিতেন নানা রকমের কলকব্জা। কখনও গোটা কল—কখনও বা তার অংশ। রেলের ইঞ্জিন, তেলের কল থেকে শুরু ক'রে কত কি। মন থেকেই আঁকতেন তিনি, বোর্ডে এঁকে দিয়ে অনেক সময়ে বুঝিয়েও দিতেন কোনটা কি—কি করে কাজ চলে সে সব যন্ত্রের। কোন কোন ছেলে রাগ করত—কিন্তু অধিকাংশ ছাত্রই এগুলো বেশী ভাল লাগত। ড্রয়িং-বুকের একঘেয়ে আঁকা তাদের পছন্দ হ'ত না।

এ নেশা পূর্ণবাবুর নাকি আশৈশব।

পূর্ণবাবুর মুখেই শুনেছে সে। কলেজে পড়ার সময়ে ওঁর মামার বাড়ীর পাশে এক ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের ছাত্র ছিল। সে তাদের বাইরের ঘরে বসে নক্সা আঁকত নানা রকম। দেখে দেখে পূর্ণবাবুর আগ্রহ এত অদম্য হয়ে উঠল যে স্বাভাবিক সংকোচ দমন ক'রে একদিন সেধেই এগিয়ে গেলেন তার বাড়ী এবং আলাপ করলেন। দু-চার দিন সময় লেগেছিল ওঁর জিনিসটা বুঝতে। তারপর তিনিই সে ছাত্রটির গুরু হয়ে উঠলেন। ওর ভুল-ত্রুটি তো দেখিয়ে দিতে লাগলেনই, তাকে সাহায্যও করতে লাগলেন। অনেক সময় তার টাস্ক-ড্রয়িং পূর্ণবাবুই এঁকে দিতেন।

সেদিন যে-বিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন তা দীর্ঘকাল পরেও মনে ছিল। ওঁর বাড়ীর পাশে বছর কতক আগে যাদবপুর কলেজের একটি মেস হয়েছিল, ক্রমে তা দুটো তিনটে বাড়ীতে ছড়িয়ে পড়ে। বহু ছাত্র থাকত কাছাকাছির মধ্যে। কি ক'রে তাদের ভিতরেও পূর্ণবাবুর খ্যাতিটা ছড়িয়ে পড়েছিল। বহু ছেলে আসত ওঁকে দিয়ে নিজেদের ড্রয়িংগুলো বুঝিয়ে নিতে বা করিয়ে নিতে। কখনও কখনও পূর্ণবাবুই রাত্রে গিয়ে হাজির হতেন ওদের মেসে। ওদের সাহায্য করতেন, বুঝিয়ে দিতেন।

আর একবার, এই বৃদ্ধ বয়সে—বিমল তখন কলেজে পড়ছে—এক ইঞ্জিনীয়ার এসেছিলেন ওদের পাড়ায়। বড় বিলাতি ফার্মে চাকরি করেন, মোটা মাইনে। সেই ফার্ম বুঝি কোন্ একটা বড় পোল মেরামতের কনট্রাক্‌ট্ পায়। বিলেত থেকে কনসাল্‌টিং ইঞ্জিনীয়ার এসে দেখে শুনে প্ল্যান তৈরি ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন। সে প্ল্যানের সবটা এ ভদ্রলোকের মাথায় ঢুকছিল না। কার মুখে যেন খবর পেয়ে পূর্ণবাবু গিয়েছিলেন একদিন। যথেষ্ট সবিনয়েই প্রার্থনা করেছিলেন প্ল্যানটা দেখবার কিন্তু তবু ভদ্রলোক প্রথমটা চটে লাল হয়ে গিয়েছিলেন। ধৃষ্টতা মনে করেছিলেন ওঁর এই দুঃসাহসকে, প্রশ্ন করেছিলেন সোজাসুজি—'কতদূর লেখাপড়া করেছিলেন ?' কিন্তু

পূর্ণবাবু দুই হাত জোড় ক'রে বারবার এত বিনীতভাবে নিজের আচরণের জন্য মাপ চেয়েছিলেন যে শেষ পর্যন্ত প্ল্যানটা ওঁকে অফিস থেকে এনে দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন ভদ্রলোক।

প্ল্যানটা দেখে পূর্ণবাবুও প্রথমটা কিছু বুঝতে পারেন নি, আবারও সবিনয়ে নিজের ধৃষ্টতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে চলে এসেছিলেন, কিন্তু বাড়ীতে এসে দুদিন ধরে দিনরাত ভেবে ভেবে এক সময়ে সবটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তারপর—আর্কিমিডিসের মত বিবস্ত্র অবস্থায় না হোক—তেল মেখে মাথায় জল ঢালবার আগেই ছুটেছিলেন ভদ্রলোকের বাড়ী এবং কি কারণে বুঝবার তাঁর অসুবিধা হয়েছিল সেটা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। সে ইঞ্জিনীয়ার অবাক হয়ে গিয়েছিলেন, অনেকক্ষণ তাঁর মুখ দিয়ে কথা বেরোয় নি। তারপর বলেছিলেন, আপনার ইঞ্জিনীয়ারিং-এ এমন মাথা, আর আপনি কি না গেলেন বাংলা ইস্কুলে গোরু ঠেঙাতে! এই ক'রেই আমাদের দেশে ট্যালেন্ট নষ্ট হচ্ছে।'

সত্যিই আজ বিমলও তাই ভাবে—কি ট্যালেন্টটাই না অপচয় করলেন পূর্ণবাবু। ইঞ্জিনীয়ারিং-এ গেলে আজ কতদূর উঠতে পারতেন। ওঁর ঐ ভাগ্নের প্রাসাদে হেলান-দেওয়া মাটির ঘরে থাকতে হ'ত না, নিজেই প্রাসাদ তৈরি করতে পারতেন।

শুধু নিজের হৃদয়বৃত্তিকে উৎসর্গ ক'রেই ক্ষান্ত হন নি আদর্শের চরণে, নিজের প্রতিভাকেও বলি দিয়েছেন।

'ক্রিমিনাল অফেন্স!' মনে মনে গজরাতে থাকে বিমল। কালকের ব্যথাটা যেন নতুন ক'রে মাথা তোলে আবার।

চমক ভাঙল বিমলের, পূর্ণিমা এসে তার সীটে ধপাস ক'রে বসে পড়াতে। ওরই পাশের টেবিলে কাজ করে পূর্ণিমা। ঠান্ডা স্বভাবের মেয়ে। দেখতে চলনসই গোছের সুশ্রী। অনেকগুলি পোষ্য বাড়ীতে—তাই ইন্টারমিডিয়েট পাশ ক'রে বি. এ. পড়তে পড়তেই চাকরীতে ঢুকতে হয়েছে, ক-টা মাস থাকলেই পরীক্ষা দিতে পারত, কিন্তু তাও সম্ভব হয় নি।

পূর্ণিমা কখন উঠে গিয়েছিল তা বিমল টের পায় নি। ফিরে আসাটাও টের পেত না—যদি না কেমন এক রকমের হতাশ ভঙ্গীতে ধপ্ ক'রে বসে পড়ত। যেন পুঁটুলির মত গড়িয়ে পড়ল সে।

'কি ব্যাপার? হল কি?' সোজা হয়ে বসে প্রশ্ন করলে বিমল।

পূর্ণিমা বেচারীর মুখ শুকনো—কাঁদো-কাঁদো কতকটা। তখনই কোন উত্তর দিতে পারল না, চুপ ক'রে টেবিলের দোয়াতদানটার দিকে চেয়ে বসে রইল।

অর্থাৎ কিছু একটা হয়েছে নিশ্চয়!

'ব্যাপার কি আপনার? আজ আবার বকুনি খেলেন নাকি?'

ব্যাপারটা অনুমান ক'রে নিয়ে যতদূর সম্ভব কোমল ও অনুচ্চকণ্ঠেই প্রশ্ন করেছিল বিমল, সহানুভূতির সুরে।

কিন্তু সেইটেই হল আরও বিপদ। সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণিমার চোখের কোণ উপছে তিন-চার ফোঁটা জল ঝরে পড়ল। তাড়াতাড়ি হ্যান্ড ব্যাগটার মধ্যে থেকে রুমালটা বার ক'রে সবার অলক্ষ্যে মুছে নেবার চেষ্টা করতে করতে গাঢ়-কণ্ঠে বললে, 'আজও শশীবাবু যাচ্ছে-তাই করলেন একেবারে। ছি ছি! আমার মরে যাওয়াই উচিত!'

একটুখানি চুপ ক'রে রইল বিমল। হৃদয়াবেগের এই সব মুহূর্তগুলোতে সামলে নেবার জন্যে একটু সময় নিতে হয়।

খানিক পরে মুখ চোখ মুছে পূর্ণিমা একটু সুস্থ হয়ে বসতে আগের মতই শান্ত কোমল কণ্ঠে বিমল প্রশ্ন করল, 'আজ আবার হ'ল কি?'

কলমটা হাতে তুলে নিয়েছিল পূর্ণিমা। সেটা আর দোয়াতে ডোবানো হল না। সেটা নাড়াচাড়া করতে করতে মাথা হেঁট ক'রে জবাব দিলে সে, 'ঐ যে চক্রবর্তী সাহেবের টি. এ. বিলটা। কুড়ি মাইল পথকে উনি চল্লিশ মাইল ধরে বিল ক'রে দিয়েছেন—ডেলিবারেট জুচ্চুরি। ওঁর কোন দোষ হ'ল না তাতে। কিন্তু যেহেতু আমি জুচ্চুরিটা লক্ষ্য করি নি সেহেতু সব দোষ আমার! কত কথাই বললেন মিষ্টি মিষ্টি ক'রে—বললেন, "আর ক-টা বছর কোন মতে কাটিয়ে রিটায়ার করতে পারলে বাঁচি। বাপ-দাদারা অনেক কষ্ট ক'রে চাকরি করেছেন বটে কিন্তু মেয়ে কেরানীর পাল্লায় তাঁদের পড়তে হয়নি—এই এক বাঁচোয়া। তাঁরা হ'লে তিন দিনও টিকতে পারতেন না বোধ হয়।·· কবে যে এই বিপদ থেকে রেহাই পাবো!"···আবার বললেন, "ঘর সাজাতে যেমন ফার্নিচার, অফিস সাজাতে তেমনি মেয়েছেলে। ওটা শুধু শোভাবর্ধনের জন্য।···দয়া ক'রে এইটি ক'রো যে কাজ করবার চেষ্টা ক'রো না তোমরা। আমরা বরং উপরি খেটে তোমাদের কাজ ক'রে নেব সেও ভাল!"···এক ঘর লোকের সামনে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কি শোনানোটাই না শোনালেন! রোজ রোজ এমনি ক'রে কেন শোনাবেন উনি!'

আবারও চোখে জল এসে যায় পূর্ণিমার।

কিন্তু বিমলের মুখ কি একটা কারণে যেন কঠিন হয়ে ওঠে। আস্তে আস্তে হ'লেও কেমন একরকম নীরস কণ্ঠে সে বলে, 'কিন্তু আপনিও যে রোজ রোজ ভুল করেন এটাও ত সত্যি। একটা না একটা ত লেগেই আছে। শশীবাবু ত মিছে ক'রে বকেন না।'

মাথা আরও হেঁট হয়ে যায় পূর্ণিমার, 'সত্যি, কি যে হয় আমার! আজকের ভুলটা সম্বন্ধে সতর্ক হই ত কাল আর একটা ভুল হয়ে বসে থাকে। এত চেষ্টা করি—আপনি ত দেখেছেন—কি সিনসিয়ার্লি আমি চেষ্টা করি, কিন্তু তবু কোনমতেই যেন চারদিকে চোখ রেখে কাজ করতে পারি না।'

বিমল আবারও বললে, 'টি. এ. বিলের কোন আইটেমকেই আমরা পরীক্ষা না ক'রে মেনে নেব না—এই ত নিয়ম। কোনটা কত দূর মিলিয়ে নেবার ব্যবস্থা ত ছিলই।'

'তা ছিল, কিন্তু চক্রবর্তী সাহেব যে অমন ডেলিবারেটলি মিছে কথা

লিখবেন, কুড়ি মাইলকে চল্লিশ মাইল করবেন তা কেমন ক'রে জানব। ঐটুকু গাফিলির জন্যে কিন্তু এতটা কটু কথা বলা কি ওঁর উচিত হয়েছে?'

'বলেছেন বটে, কিন্তু রিপোর্টটা ত করেন নি। সেইটেই আপনার সৌভাগ্য ব'লে মেনে নেওয়া উচিত।'

'রিপোর্ট ক-টা মেয়ের নামে উনি করবেন? ওঁর সেকশ্যানের মণিকা, জয়ন্তী, রেখা—কে ভুল কম করে তাই শুনি?' এবার যেন পূর্ণিমা মাথা তোলে একটুখানি।

বিমলের ঠোঁটের কোণে হাসি দেখা দেয়, 'সুতরাং মেয়েদের যদি উনি ফার্নিচারের মতই শুধু অফিসের সাজ-পাট ব'লে মনে ক'রে থাকেন ত খুব দোষ দেওয়া যায় কি?'

'তা যায় না—' পূর্ণিমা কলমটা উলটো ক'রে ধ'রে স্লিপ প্যাডের ওপর ঘ'ষে অন্যমনস্কভাবে বলে, 'তবু ঐ ভাষাটা বড় কানে লাগে, নয় কি? উনি কিন্তু আপনাদেরও রেহাই দেন না। বলেন, এই ত আজও বললেন, এর চেয়ে সেকালে যে নন্‌ম্যাট্রিকরা চাকরি করতে আসত সে ঢের ভাল ছিল। আজকালকার গ্র্যাজুয়েট ছোকরারা জ্বালিয়ে খেলে একেবারে। এরা কি ধান দিয়ে লেখাপড়া শেখে না কি—তাও ত বুঝি না!'

'সেটাও উনি মিছে কথা বলেন না ত!' বিমল স্বীকারই করে, 'প্রথম প্রথম যখন আমার লেখা নোটগুলো ঢেরা মেরে কেটে দিতেন একেবারে আদ্যোপান্ত, তখন আমারও রাগ হ'ত। কিন্তু তারপর ওঁর নিজের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে বুঝতে পারতুম তফাৎটা।'

'তা বটে।' পূর্ণিমা আস্তে আস্তে বলে, 'আমার এক জ্যাঠামশাই ছিলেন—এক বড় মার্চেন্ট অফিসে চাকরী করতেন। সাতচল্লিশ বছর চাকরী করেছিলেন, মরে তবে ছাড়লেন। নইলে সাহেবরা ছাড়ত না কিছুতেই। সাহেবরা সুদ্ধ নাকি তাঁকে সমীহ করত, নতুন পাঁচ হাজার টাকা মাইনের ম্যানেজার এসে কাজ বুঝতে যেত তাঁর কাছে। অথচ ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে ছিল তাঁর, যা কিছু শিক্ষা ঐ অফিসেই।...শেষের দিকে বি. এ., এম. এ. কেরানীরা যখন নতুন নতুন চিঠির ড্রাফ্‌ট্‌ ক'রে নিয়ে যেত সাহেবের কাছে, সাহেবরা নাকি সে ড্রাফ্‌ট্‌ ছিঁড়ে ফেলে আমার জ্যাঠামশাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দিতেন। একটা আত্মজীবনী গোছের তিনি লিখতে আরম্ভ করেছিলেন—শেষ করা হয়ে ওঠেনি। সে খাতাটা আজও আছে বাড়িতে, সত্যিই—অপূর্ব ইংরেজি। অথচ সবটাই তিনি আয়ত্ত করেছিলেন চাকরি করতে করতে। আশ্চর্য!'

দুজনেই চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ।

সহসা এক সময় বিমল প্রশ্ন করলে, 'ইস্কুলে-কলেজে কেমন ছাত্রী ছিলেন আপনি?'

'খুব ভাল!' নিমেষে মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পূর্ণিমার, 'ভূগোলে আমি কখনও নব্বুইয়ের নীচে নম্বর পাইনি। ম্যাট্রিকে, আই. এ-তে আমার

বাঙলায় লেটার ছিল। ম্যাট্রিকে মাত্র দুটি নম্বরের জন্যে হিস্ট্রিতে লেটার পাইনি।'

বিমল একটা ছোটখাটো দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'দুঃখের বিষয় এখানে তার কোনটাই কাজে আসবে না। ছাত্র আমিও ভাল ছিলুম মিস রায়, তাতে কি ?'

'তবু—' পূর্ণিমার কণ্ঠে ঈর্ষার সুর, 'আপনার ত এত ভুল হয় না।'

'ওটা অন্যমনস্কতা ও অনবধানতার ফল ! অজ্ঞতার ভুল নয়।'

বিমল এবার জোর ক'রে একটা ফাইল টেনে নেয়। সরকারী সময়ের অনেক অপচয় হয়েছে—আর নয়।

পূর্ণিমা আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে বসে থেকে অপাঙ্গে একবার বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে কাজে মন দিল। এ মানুষটার পাশে বসে এত দিন কাজ করছে তবু যেন আজও এর তল পেলে না পূর্ণিমা। অথচ এমনি ত বেশ ভদ্র, কখনও খারাপ কথা বা ইঙ্গিত করে না—সাধ্যমত কাজে সাহায্যও করে। কে জানে কেন মধ্যে মধ্যে কেমন এক রকমের কঠিন হয়ে ওঠে ওর গলার সুর, সেই সময়টা যেন ভয় ভয় করে পূর্ণিমার।…

॥ ৯ ॥

ছুটির পর অফিসের বিস্তৃত সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে গতিটা কখন যে মন্থর হয়ে এসেছিল বিমলের তা সে নিজেই টের পায়নি। এমন কি একসময় যে রেলিংটায় হাত দিয়ে সে চুপ ক'রে দাঁড়িয়েই গেছে তাও বুঝতে পারেনি। একেবারে চমক ভাঙ্গল—চমকেই উঠল রীতিমত—পেছন থেকে যখন পূর্ণিমা প্রশ্ন করল, 'কী, অমন ক'রে দাঁড়িয়ে গেলেন যে ? হ'ল কী আপনার ?'

এবার বিমল একটু অপ্রতিভ হ'ল। পূর্ণিমার দিকে চেয়ে অপ্রস্তুত ভাবে হেসে বললে, 'না, এমনিই। চলুন।'

'আজ বাড়ি যাওয়ার খুব তাড়া নেই বুঝি ?' পাশাপাশি নামতে নামতে বললে পূর্ণিমা।

'না। কোনদিনই থাকে না। তবু যাই—অন্যত্র যাবার জায়গা নেই ব'লে।'

'টিউশ্যানী নেই ?'

'আছে বৈ কি। ওটা না থাকলে চলবে কেন ? কিন্তু সে ত সাতটার আগে নয়।'

পূর্ণিমা একটু চুপ ক'রে থেকে বললে, 'চলুন বরং একটু মাঠে গিয়ে বসি। আমারও আজ এখনই ফিরতে ভাল লাগছে না।'

'চলুন।' সংক্ষেপে বললে বিমল। অন্যদিন হ'লে সে বিস্মিত হ'ত একটু। কিন্তু আজ সে সত্যিই অন্যমনস্ক ছিল।

অফিস থেকে বেরিয়ে সহজেই গড়ের মাঠে পড়া যায়। কিন্তু পূর্ণিমা সে পথ পেরিয়ে এগিয়ে চলল।

'ও কি, চললেন কোথায় ?' হঠাৎ এক সময়ে খেয়াল হয় বিমলের।

'আগে এক কাপ চা খেয়ে নিলে হ'ত না ?' থমকে দাঁড়িয়ে বলে পূর্ণিমা।

'খেতে পারি। যে-যার পয়সা দেব কিন্তু।'

'আমিই না হয় আজকের পয়সাটা দিলাম ?'

'না। তাতে আর একদিন আপনাকে খাওয়াবার দায়টা থাকবে। বেশি-spare পয়সা আমার সত্যিই থাকে না মিস্ রায়—বিশ্বাস করুন।' একটু রূঢ় ভাবেই যেন বলে বিমল।

পূর্ণিমার মুখ রাঙা হয়ে ওঠে। সে পথের দিকে তাকিয়ে বলে, 'তাহ'লে চলুন, মাঠের ঐ কোণটায় পেতলের কলসী ক'রে চা বেচে—তাই কিনে খাওয়া যাক্।'

নিজের রূঢ়তায় বিমল একটু অনুতপ্ত হয়েছে এরই মধ্যে। সে বলে, 'তা মন্দ নয়। আচ্ছা বেশ, আপনি ঐ চা খাওয়ান। আমি একটু চিনেবাদাম কিনি। কী বলেন ?'

অনেক খুঁজে একটা অপেক্ষাকৃত নির্জন অংশে এসে বসে দু'জন। চারিদিকেই ভিড়—এর ভেতরে বসতে এমনি যদি বা আপত্তি না থাকে, দুটি তরুণ তরুণীকে মাঠে এসে বসতে দেখলেই সকলে যে এক রকমের অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাবে—সেটা মনে করতেই বিশ্রী লাগে বিমলের।

তারপর দুজনেই বহুক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে চীনাবাদাম খায়।

কী-ই বা বলবার আছে। একঘেয়ে দুঃখের বিবরণ। পারিবারিক ইতিহাসের একান্ত নগ্নতা এত স্বল্প পরিচয়ে অপরের কাছে উদ্ঘাটিত করতে মন চায় না। যেটুকু বলা যায়, তা বলা হয়ে গেছে এর আগেই।

'আচ্ছা, একটা ছোটখাটো ব্যবসা করলে কেমন হয় ? অল্প মূলধনে যা করা যায় অবশ্য।' হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসে পূর্ণিমা।

'কী ব্যবসা অল্প মূলধনে করা যায় ? পানের দোকান চলতে পারে বটে। তাও কোন ভাল জায়গায় একটু কোণে বা খাঁজেও দোকান সাজাতে গেলে তার ভাড়া, সেলামী, সাজপাটে যা পড়বে—অত টাকা আমাদের কারুর নেই। তবে হ্যাঁ, রাস্তার পাশে ঐ রকম একটা কাঠের বাক্স পেতে বসতে পারেন। দেখুন—পারবেন ? খদ্দেরের অভাব হবে না। তবে বেশিদিন ব্যবসা করতে যে দেবে আপনাকে তাও মনে হয় না।'

এ ধরনের ইঙ্গিত কখনও বিমলের কথাবার্তায় থাকে না। তবে ঝাঁজে মনে হয় তীব্র বিদ্রূপই করতে চায় সে। তাই ক্ষমা করে পূর্ণিমা মনে মনে।

সে রাঙা হয়ে ওঠে আবারও।

'ধ্যেৎ, আমি কি তাই বলছি।'

বিমল একটুখানি চুপ করে থেকে বলে, 'আমাদের দোষ কী জানেন,

ব্যবসার কথা যখনই ভাবি তখনই আমরা মনে করি যে শুধু মূলধনের জন্যেই আটকে আছে।'

'কিন্তু তাই কি ঠিক নয় ?'

'না। কে বলেছে আপনাকে ? ট্রেনিং কৈ ? আপনারা কি মনে করেন যে সব প্রোফেসনেই ট্রেনিং দরকার আছে—নেই কেবল ব্যবসাতে ? ডাক্তার হ'তে গেলে ডাক্তারী পড়তে হয় ছ-বছর। উকীল হ'লেও তিন বছর—তাছাড়া আর্টিকেলড্ থাকার ব্যবস্থা আছে। মাস্টারী করতে গেলে বি-টি পড়তে হয়। কেবল ব্যবসা করাটাই খুব সোজা ? শুধু মূলধন থাকলেই হ'ল, না ? আপনি জানেন না বোধ হয়—আমি নিজে দেখেছি প্রচণ্ড বড়লোকের ছেলে ব্যবসা করতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হয়েছে। শুধু ব্যবসা। একটি ভদ্রলোককে ত জানি—তিনি পান সিগারেট পর্যন্ত খান না। অন্য কোন বিলাসও নেই। পর পর চার-পাঁচটি ব্যবসা ক'রে আজ পথের ভিখারী।'

'কিন্তু ব্যবসার ট্রেনিংটা কী ক'রে নেওয়া যায় বলতে পারেন ? ওর ত স্কুল-কলেজ নেই!'

'আর্টিকেল্‌ড্ থাকার ব্যবস্থা হ'তে পারে। অন্য উপায় আছে। তবে একটা গল্প শুনুন। আমাকে গল্পটা বলেছিলেন পাড়ার সুরেশবাবু। হোমিওপ্যাথ ডাক্তার, বড়বাজার অঞ্চলে কোথায় যেন বসেন—বিরাট সংসার ডাক্তারিতে চলে না, তাই কিছু কিছু টিউশ্যানীও করেন। অর্থাৎ করতেন, এখন শুনেছি ভাল পসার হয়েছে। সুরেশবাবু এক ক্রোড়পতি মাড়োয়ারীর ছেলেকে পড়াতেন। ইস্কুলের পড়া নয়—হুকুম ছিল শুধু ইংরেজী আর অংক, তাও বীজগণিত জ্যামিতি নয়—শুধু পাটিগণিত! বছর দুই পড়িয়েছিলেন, তারপর অন্য ভাল টিউশ্যানী পেয়ে সেটা ছেড়ে দেন। তারও বছর-খানেক পরে একদিন ট্রামে দেখেন সেই ছেলেটি কানখুস্‌কী দাঁত-খোঁটা আর জিভছোলা বিক্রী করছে! সামান্য এক এক পয়সার জিনিস, ভারি দুঃখ হ'ল সুরেশবাবুর। বুঝলেন যে কোন বড় গোছের স্পেকুলেশ্যানে বা শেয়ার মার্কেটে সর্বস্বান্ত হয়েছেন ভদ্রলোক। তাই তার ছেলেকে আজ সামান্য কাজ করতে হচ্ছে। সাধারণ একটা দোকান দেওয়ার মতও পুঁজি নেই। একদিন সময় ক'রে সুরেশবাবু খবর নিতে গেলেন। হাজার হোক এক কালে যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল, পয়সা-কড়িও অনেক দিয়েছে। একটু সহানুভূতি দেখানো দরকার অথবা ওঁর ক্ষমতার ভেতর যদি কোন সাহায্য করবার থাকে, তাও করতে তিনি প্রস্তুত।...কিন্তু পূর্বের ঠিকানায় পোঁছে দেখেন, তেমনি বড় বাড়ি, দোরে তেমনি দুখানা দামী গাড়ি, চাকর, দারোয়ান—কিছুরই অভাব নেই। ভেতরে গিয়ে দেখেন দুটো টেলিফোন ঠিক আছে, গদীতে তেমনি কর্মব্যস্ততা। কী ব্যাপার ? সুরেশবাবু ত বেকুফ্। ভূতপূর্ব মনিব অবশ্য ওঁকে দেখে খুব খুশী হলেন। আদর ও অভ্যর্থনার ত্রুটি হ'ল না। একথা ওকথার পর সুরেশবাবু তাঁর ছাত্রর খবর করলেন। ছাত্রের বাপ বললে, ও, তাকে ত ব্যবসায় ঢুকিয়ে দিয়েছি! তখন সুরেশবাবু আসল কথাটাই বলে ফেললেন,

সেদিন ট্রামে দেখলুম ঠিক তার মত কে একজন জিভ্‌ছোলা ফিরি করছে। ভদ্রলোক খুব সহজভাবেই বললেন, হ্যাঁ, তাকেই দেখেছেন! সুরেশবাবু আরও অবাক্‌, তার মানে? ওর বাবাও যেন বিস্মিত হলেন, তার মানে কি, ব্যবসা শিখবে না? হাতে কলমে কাজ করুক, পয়সার মর্ম বুঝুক, নইলে এতবড় গদী আমার—ও চালাবে কি ক'রে? সব উড়িয়ে দেবে যে! তখন জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হ'ল সুরেশবাবুর।'

একসঙ্গে এতগুলো কথা ব'লে বিমল থামল। পূর্ণিমা বললে, 'আশ্চর্য ত!'

এমনি না হওয়াটাই আশ্চর্য মিস্‌ রায়। আমেরিকাতে শুনেছি ক্রোরপতি কারখানার মালিকের ছেলে সাধারণ শ্রমিক হিসাবে জীবন শুরু করে। আমার জানাশোনা এক বড় প্রেসের মালিক আমার কাছে গল্প করেছেন যে তিনি কম্পোজিটার হিসাবে কাজ শুরু করেছিলেন। চোখ খোলা রেখে প্রাণপণে শিখতে চেষ্টা করেছেন সব কাজ—কোথায় কোথায় ফাঁকি দেয় কর্মচারীরা,—তাও শিখেছেন, তাই আজ তাঁর প্রেসের এত উন্নতি। ছোট প্রেস থেকে খুব তাড়াতাড়িই বড় করতে পেরেছেন।'

'সকলকেই কি এইভাবে জীবন শুরু করতে হবে?'

'ক্ষতি কি?'

'সুযোগ-সুবিধা কোথায়?'

বিমল বলে, 'ধরুন আপনি মুদির দোকান করবেন। কোন মুদির দোকানে চাকরী নিতে পারেন না? খুব কম মাইনেতে যদি কাজ করতে চান ত কাজের অভাব হবে কি? না হয় বিনা মাইনেতেই করলেন ছ মাস।'

'তাতে কী এমন লাভ হবে?'

'আর কিছু না হয়—কর্মচারীরা কী ভাবে চুরি করে সেটাও ত শিখবেন। ভবিষ্যতে সতর্ক হবার সুবিধা হবে। আমাদের পাড়ায় মুদির দোকানে যেই চাকরী করত সে-ই চার-পাঁচটা সোনার আংটি গড়িয়ে ফেলত। একজন একবছর চাকরী ক'রেই সাইকেল কিনে ফেললে। মাইনে ত পেত বারো টাকা আর খোরাকী। ফলে দোকানটি উঠে গেল। অথচ খদ্দেরের অভাব ছিল না তার।'

অন্ধকার ঘনিয়ে আসে মাঠে। আকাশে তারা ফোটে একটার পর একটা। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকে পূর্ণিমা। তারপর বলে, 'আপনি সব তাইতে বড় ঠান্ডা জল ঢেলে দেন।'

বিমল ঈষৎ অনুশোচনার সুরেই বলে, 'তা বটে। ওটা দেখছি স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। লোককে ভেঙ্‌চাতে ভেঙ্‌চাতে মুখটাই বেঁকে গেছে আর কি। ...কিন্তু আপনার প্রস্তাবটা কি, কী ধরণের ব্যবসা করতে চান আপনি?'

'ধরুন যদি একটা রেস্তোরাঁ খুলি? আমি অনেক রকম খাবার তৈরি করতে পারি—তা জানেন? খদ্দের হবে না?'

'খদ্দের হয়ত হবে—হয়ত একটু বেশিই হবে—এ দেশে ওটা নতুন ত! কিন্তু লাভ হবে না মিস্‌ রায়। অনেক রকম ফন্দি-ফিকিরে হোটেলওলারা

লাভ করে, আপনি তার কিছুই জানেন না। তাছাড়া…সে আপনি পারবেনও না। সে শিক্ষা বা আবহাওয়া আলাদা।'

'যত লোক রেস্তোরাঁ করে—সকলেই কি ফন্দি-ফিকির জানে?'

'যত লোক রেস্তোরাঁ করে—সকলেই কি লাভবান হয়? ক-টা কদিন টেঁকে তা লক্ষ্য করেছেন? একটু নজর রাখলেই দেখবেন বার বার হাত বদল হচ্ছে!'

'তা বটে। আমাদের ভবশরণবাবুর গ্যারেজ ঘরটায় কত বার যে চায়ের দোকান হ'ল। কোনটাই বেশিদিন টেঁকে না।' পূর্ণিমাও স্বীকার করে।

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'আপনি ত এত জানেন শোনেন—আপনি কেন চেষ্টা করলেন না। আপনার যা বুদ্ধি, আপনি দু' দিনেই ফন্দি-ফিকির আয়ত্ত ক'রে নিতে পারতেন।'

'আমার সে অবস্থা নয় মিস রায়, এক্সপেরিমেণ্ট করার বা রিস্ক্ নেওয়ার মত সাহস আসবে কোথা থেকে? একদিনও টাকা না আনলে চলবে না। তা ছাড়া রেস্তোরাঁ করতে গেলে যে-কটা টাকা লাগে তাও ত আমার নেই।'

'ধরুন যদি আমি দিই?'

'না, সে ঝুঁকি আমি নিতে পারব না। ধন্যবাদ। চাক্‌রী ছেড়ে ব্যবসা ধরব—সংসার চালাবে কে? সে দায়িত্ব কে নেবে, যদি না টেকে? মাইনে পেতে চার-পাঁচ দিন দেরি হ'লেই ঘরে হাঁড়ি চড়া বন্ধ হয়। আমার যে কোথাও কেউ নেই।'

আবারও স্তব্ধতা নেমে আসে। দু'জনে বসে থাকে স্থির হয়ে।

কত কী ভাবে হয়ত দু'জনেই।

এক সময় দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বিমল বলে, 'এবার উঠতে হবে মিস্ রায়, আমার টিউশ্যনীর সময় হ'ল।'

'চলুন' ব'লে উঠে দাঁড়িয়ে পূর্ণিমা একটু হেসে যেন অপ্রতিভ-সুরে বলে, 'বার বার মিস্ রায় বলে ডাকেন কেন বলুন ত? বিশ্রী শোনায় কানে। আমার নাম ধরে ডাকতে আপত্তি কি! আপনি আমার চেয়ে বয়সে বড়ই হবেন সম্ভবত। তা যদি না-ও হয়, অফিসের সহকর্মিণী ত—বন্ধুর মতই, নাম ধরে ডাকলেই পারেন। পুরুষ সহকর্মীদের ত নাম ধরেন।'

বিমল শান্ত অথচ কঠিন কণ্ঠে উত্তর দেয়, 'এমন কি অফিসের সহকর্মিণীদের সঙ্গেও অন্তরঙ্গতা করবার মত অবস্থা আমার নয়—**the sooner you understand, the better**!'

সে হাঁটতে শুরু করেছে ততক্ষণ। পূর্ণিমাও নিঃশব্দে তার পিছন পিছন হাঁটতে লাগল। বিমল একবারও তার দিকে ফিরে তাকাল না—ফলে ওর স্পষ্টভাষণের ভেতরকার রূঢ় ইঙ্গিতে যে পূর্ণিমার চোখে জল এসে গিয়েছে, তাও সে লক্ষ্য করতে পারলে না।

॥ ১০ ॥

বিমলের ছাত্র নিখিল ক্লাস এইট্‌-এ পড়ে। ছোটখাটো এতটুকু ছেলে বয়সও কম—বছর-বারো হবে বড় জোর।

প্রথম যেদিন বিমল যায় নিখিলকে পড়াতে—সে প্রায় মাস-আষ্টেকের কথা হ'ল, নিখিল তখন ক্লাস-সেভেনের মাঝামাঝি পৌঁছেছে—ওর বাবা দুঃখ ক'রে বলেছিলেন, 'দেখুন না মাষ্টার মশাই, ছেলেটার কী মাথা ছিল আর কী হয়ে গেল। ওর যখন তিন বছর বয়স তখনই আমার বাবার মুখে শুনে শুনে সমস্ত মোহমুদ্গর মুখস্থ ছিল। বাবা ওকে বড় বড় সব সংস্কৃত কাব্যের সর্গ মুখস্থ করিয়েছিলেন। আধো-আধো গলায় কী মিষ্টি যে লাগত ওর মুখে সেই আবৃত্তি, কী বল্‌ব। তাই শুনে আমি আবার রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনাতে লাগলুম—দুবার শুনলেই জলবৎ! দেবতার গ্রাস ছাঁকা মুখস্থ ব'লে যেত—একবারও না থেমে। চার বছর বয়সে ওর দ্বিতীয় ভাগ, ফার্ষ্ট বুক শেষ হয়ে গেছে। প্রথম প্রথম ইস্কুলেও বেশ ভাল রেজাল্ট করেছিল, তারপর কী যে হ'ল—এই ক্লাস সেভেন-এ উঠে একেবারে যেন গবেট হয়ে গেল। কিচ্ছু মনে থাকে না, ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে—মাথাতেও ঢোকে না কিছু। সেই জন্যেই আপনার শরনাপন্ন হয়েছি। আমার বন্ধু দেবেনবাবু বললেন যে আপনি যাকেই পড়ান খুব ইন্টারেস্ট নিয়ে পড়ান, অন্য মাষ্টার-মশাইদের মত না—দেখুন, কী করতে পারেন। আমি ত খুব দুর্ভাবনায় পড়েছি।'

বিমল একটু হেসে জবাব দিয়েছিল, 'আপনাদেরই কৃতকর্মের ফল, এখন আর দুর্ভাবনায় লাভ কি বলুন!'

ভদ্রলোক একটু ঘাবড়েই গিয়েছিলেন। বিমলের হাসির মধ্যে যে তিক্ততা ছিল তাঁর নজর এড়ায়নি। প্রথম যে চাকরী করতে এসেছে তার পক্ষে এ হাসি সহজও নয়—স্বাভাবিকও নয়। তিনি একটু হতচকিত ভাবেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'তার মানে? আমরা কী দোষ করলুম?'

'না—আপনারা কেন দোষ করবেন। যত দোষ ঐটুকু ছেলের! তিন বছরের ছেলেকে দিয়ে যখন লম্বা লম্বা সংস্কৃত কবিতা মুখস্থ করিয়ে পাঁচ-জনের কাছে এক্‌জিবিট্‌ ক'রে পুত্রগর্বে স্ফীত হতেন তখন কি একবারও ভেবে দেখেছেন যে ছেলের কী সর্বনাশ করছেন! একে ত খুব সবল ছিল না—তা এখনকার চেহারা দেখেই বোঝা যায়—ওর সেই তিন বছর বয়সে কী এমন মস্তিষ্ক তখন ডেভেলপ করেছিল বলুন ত! ওর সেই অপরিণত অপরিপক্ক মাথাকে এমন ভাবে ট্যাক্স করার কী কারণ ছিল—আপনাদের একটু ভ্যানিটি চরিতার্থ করা ছাড়া? চার বছর বয়সে দ্বিতীয় ভাগ, ফার্স্টবুক শেষ করবার কথা কি ওর? আমাদের প্রথা আছে পাঁচ বছর বয়সে হাতেখড়ি দেবার—

অর্থাৎ পাঠ শুরু করার। যাঁরা এ প্রথার প্রচলন করেছিলেন তাঁরা কি এতই নির্বোধ ছিলেন? লালয়েৎ পঞ্চ বর্ষাণি—চাণক্যের এ কথাটাও কি ফেলে দেবার মত?'

নিখিলের বাবা সত্যশরণবাবু বলেছিলেন, 'কিন্তু মশাই আমিও ত শুনেছি ঐ সাড়ে তিন বছর বয়সে পড়া শুরু করেছিলুম, চোদ্দ বছর বয়সে পাস করেছি। স্কলারশিপও ত ছিল একটা ছোটখাটো।'

বিমল সবিনয়ে হ'লেও বেশ আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিল, 'আপনি কি অমনি অপুষ্ট ছিলেন? ভেবে দেখুন ত! এই সন্তানটির আপনার পুষ্টির কত অভাব তা কি লক্ষ্য করেননি? ওর ওপর পড়ার চাপ না দিয়ে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে রেখে ভাল খাইয়ে দিন কতক খেলে বেড়াতে দিলে ওর প্রতি আপনার কর্তব্য পালন করা হ'ত। তা ছাড়া, আপনি যখন পাস করেছিলেন তখন কি এতগুলি ভারি ভারি বই পড়তে হ'ত আপনাকে, এতগুলো সাবজেক্‌ট ছিল? মনে ক'রে, দেখুন দিকি। ইংরেজী, বাংলা, সংস্কৃত আর অঙ্ক। দুটো বিষয় অপশ্যনাল নিতে হ'ত—তাও ত আপনারা অঙ্ক আর সংস্কৃত নিয়েই সেরে দিতেন। ঠিক কি না বলুন?'

সত্যশরণবাবুকে অপ্রতিভ ভাবে হেসে স্বীকার করতে হয়েছিল, 'ঠিক। আমারও ঐ অপশ্যনাল ছিল—অঙ্ক আর সংস্কৃত।'

'তবে? এদের কতগুলো বিষয় দেখুন ত। ইতিহাস ভূগোল ত আছেই—আরও দিয়েছেন তার সঙ্গে বিজ্ঞান। বাংলায় দুটো পেপার—সব মিলিয়ে কত নম্বর বেড়েছে তার হিসেব দেখেছেন? ক্লাস সেভেনে হাঁপিয়ে যাবারই ত কথা—ম্যাট্রিকের সব বইগুলো ঐটুকু ছেলের ঘাড়ে এখন থেকে চাপিয়ে দিলেন। মোটামোটা ভারি ভারি বই—ম্যাট্রিকের ছেলেদের জন্য লেখা—দেওয়া হ'ল একটা এগারো বছরের ছেলেকে। ওর যে-কোন একখানা বই তার হাতে ক'রে তোলাই শক্ত—পড়া ত দূরের কথা। চার বছর ধরে পড়ানোর অছিলায় ঐ ভারি বইগুলো পড়তে দেওয়া হয় এখন থেকে। ওতে ছাপাই আছে নাইন-টেনের জন্যে, কিন্তু ঈশ্বর জানেন—ওর যা ভাষা আর লেখার ধরণ—কোন্ ক্লাসের ছেলেদের উপযুক্ত ওগুলো। বাংলা ব্যাকরণ-খানা খুলেছেন কখনও? ঐ ব্যাকরণ পড়ে যদি আপনাদের পরীক্ষা দিতে হ'ত, তা হলে ফার্স্ট ডিভিস্যান পেতেন কিনা সন্দেহ। আমার ইচ্ছে করে এক-একবার ছেলেদের বার করে এনে পরীক্ষার হলে মাস্টার মশাইদেরই বসিয়ে দিই। দেখি তাঁরা কেমন পরীক্ষা দেন!'

'তাই ত! ভাবিয়ে দিলেন যে! কী করব এখন?' সত্যশরণবাবু প্রশ্ন করেছিলেন।

'কী আর করবেন। Reap as you sow! আমি আমার যথাসাধ্য করব। তবে খুব ভাল ফল আশা করবেন না। আপনার ক্ষমতা যদি থাকে ত আমি পরামর্শ দেব গরমের ছুটি আর পুজোর ছুটি দুটোতেই বাইরে কোথাও নিয়ে গিয়ে খেলে বেড়াতে দেবেন এবং পড়ার বই সঙ্গে নিয়ে যাবেন না।'

'তাতে সব ভুলে যাবে যে!'
'যাক। সে ঝালিয়ে নেওয়া যাবে।'
'দেখি। দুটোয় পারব না—একটা ছুটি হয়ত—। তাইত, আপনি—। এমন ভাবে কখনো ভেবে দেখিনি। হয়ত আপনার থিয়োরীই ঠিক। কে জানে!'
সত্যশরণবাবু চিন্তিত মুখে বলেছিলেন।

আজ ওদের বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই কথাটাই মনে পড়ল বিমলের। হাসি পেল একটু। তখনও পড়াশুনোর ওপর কিছু আস্থা ছিল ওর। মানে এই ধরণের পড়াশুনোর ওপর। আজ—আজ আর নেই। আজ বোধ হয় কিছুর ওপরই আস্থা নেই।

পড়ার ঘরে নিখিল বই খাতা সাজিয়েই অপেক্ষা করছিল। চাড় আছে ছেলেটার—একটু বেশী রকমই চাড়। ক্ষমতা নেই তেমন। পড়ে অনেকক্ষণ, ক্লান্তি নেই যেন—কিন্তু কিছুই মনে থাকে না। মাথাতে ঢোকে না কিছু। ওর সেই অসহায় দৃষ্টি, ফ্যাল-ফ্যাল চাউনির দিকে চেয়ে মায়া হয় বিমলের। রাগ যে হয় না তা নয়—তবে রাগ প্রকাশ পেলেই নিখিলের চোখ দুটো যেন আরও করুণ হয়ে ওঠে। সঙ্গে সঙ্গে মমতায় বুক ভরে যায় বিমলের, কাছে টেনে নিয়ে আদর করে, মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়।

অবোধ জীব—তাইতেই খুশী ধরে না ওর। কৃতজ্ঞতায় চোখ স্তিমিত হয়ে আসে।

বিশ্বাস না থাক্—চেষ্টার ত্রুটি করেনি বিমল এটা ঠিক। ফলও কিছু কিছু হয়েছে। ক্লাস সেভেনের অর্ধ-বার্ষিক পরীক্ষায় কোনটাতেই সে পাস করতে পারেনি—বার্ষিক পরীক্ষায় সব কটাতেই কোন মতে পাস-মার্ক রেখেছে। ক্লাসে উঠেছে সসম্মানে। সত্যশরণবাবু তাইতেই সন্তুষ্ট। নিজে থেকে স্বেচ্ছায় দশটি টাকা মাইনে বাড়িয়ে দিয়েছেন। শুধু বিমল মনে মনে কুন্ঠিত হয়—সে জানে এ উন্নতির কী অর্থ। কতটা অন্তঃসারশূন্য এটা।…

হঠাৎ বিমলের খেয়াল হয়, সে চুপ ক'রে বসে আছে।
'কৈ নিখিল, পড়ছ না?' সে ধমকই দেয় একটু।
নিখিল অপ্রতিভ ভাবে বলে, 'এই যে—এইটে স্যার—কিছুতেই বুঝতে পারছি না।'
'তা কৈ, বলনি ত এতক্ষণ!'
'বলছিলুম স্যার।' কুণ্ঠিতভাবে, যেন অপরাধ তারই, এমনিভাবে নিখিল বলে, 'আপনি যে কী ভাবছিলেন। তাই আর—'
জোর করে পড়াতে বসে বিমল।
'কৈ—ব্যাকরণের টাস্‌ক্‌গুলো করেছ?'
'এই যে—' খাতা বার ক'রে দেয় নিখিল।
'কিছু হয় নি। এটা কি করেছ? দ্যাখো। এত ক'রে সেদিন বুঝিয়ে দিলুম অপিনিহিতি—সেইটেই ভুল ক'রে বসে আছ!'

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আবার অপিনিহিতি বোঝাতে শুরু করে।

এ সরস্বতীরও অসাধ্য বোধ হয়। এমন ক'রে ঠেলে ঠেলে আর কতদিন চলবে? খরস্রোতের উজানে এমন ভাবে নৌকো বাওয়া!

তবু। পয়সা নিয়েছে যখন, নিতেও হবে—তখন আর এসব চিন্তা অবান্তর।

'স্যার একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?'

'করো।' এই স্যারটা বড়ই শ্রুতিকটু লাগে ওর। বহুবার বলেছে দাদা বলতে কিন্তু নিখিল পারে না। বলে, 'সে আমার বড় লজ্জা করে। ভারি বিশ্রী।'

'বলো—কী বলবে?' একটু অসহিষ্ণু ভাবেই আবার বলে বিমল।

'আপনি ত বলেন, আগে এই বাংলা ব্যাকরণের বই পড়তে হ'ত না।'

'হ'ত—তবে এত নয়। সে সামান্যই ছিল।'

'যারা এই সব লিখেছেন—তাঁরা এত জানলেন কী ক'রে। তাঁরা ত এ-রকম বই পান নি।'

'তাঁরা পণ্ডিত লোক! তাঁদের পক্ষে এটা জানা সহজ। তাঁরা কি তোমার মত গবেট।'

'না—তা বলছি না।' ঘাড় হেঁট ক'রে টেবিলে পেন্সিলের দাগ কাটে নিখিল, 'বলছিলুম যে এত ব্যাকরণ না পড়লে কি হয়?'

'কী আবার হয়—ভাষাটা শেখা যায় না ভাল ক'রে। বাঙ্গালীর ছেলে বাংলা ভাষার ব্যাকরণ জানো না—এটা কি খুব গৌরবের কথা?'

লজ্জায় সঙ্কোচে এতটুকু হয়ে যায় নিখিল। তার মুখে অনেকক্ষণ কথা ফোটে না। শেষে চরম সাহসে ভর ক'রে বলে, 'না স্যার, আমার এক দাদা বলছিলেন কি না তাই।'

'কী বলছিলেন দাদা?'

'বলছিলেন যে আগে যাঁরা বাংলা ব্যাকরণ পড়েন নি তাঁরা কি বাংলা ভাষা শেখেন নি? বঙ্কিমবাবু, রবীন্দ্রনাথ—। যে সব নাম-করা অধ্যাপক আছেন বাংলায় তাঁরাও ত বাংলা ব্যাকরণ পড়েন নি। যাঁরা এই সব মোটা মোটা বই লিখেছেন তাঁরাও ত পড়তে পান নি তখন!'

'হ্যাঁ। তা পান নি তখন। সেইজন্যই অনেক কষ্ট ক'রে শিখতে হয়েছে। তোমরা ত তৈরী বই পাচ্ছ। আর বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথা আলাদা। তাঁরা সংস্কৃত ব্যাকরণ এত ভাল জানতেন যে তাতেই কাজ চলে যেত। তাঁরাই ত বলতে গেলে ভাষা তৈরী ক'রে গেলেন। তাঁদেরই কল্যাণে বাংলা ভাষা আজ এমন জায়গায় এসেছে যে এখন আর তার নিজস্ব ভাল ব্যাকরণ না হ'লে চলে না।'

তারপরই ধমক দেয় বিমল। 'এই সব পাকা পাকা কথা কে কী বলেছে তা ত বেশ মনে রেখেছ। অথচ পড়া ত একলাইনও মনে থাকে না! পড়ো এখন!'

নিখিলের হেঁট-হওয়া মাথাটা আরও হেঁট হয়ে যায়। ভয়ে ও অনুতাপে তার ছোট মুখখানি যেন বেশী ছোট দেখায়।

তাকে ধমক দেয় বটে কিন্তু বিমল মনে মনে জোর পায় না। বরং অনুতপ্ত হয়। ছাত্ররা খোলাখুলি আলোচনা করবে, সেইটেই ত বাঞ্ছনীয়। একেই ত নিখিল একটু বেশী ভীতু স্বভাবের। তার ওপর এমন ধমক দিলে যে একেবারেই সব প্রশ্নকে কুলুপ এঁটে বন্ধ ক'রে রাখবে।...একটুখানি চুপ ক'রে থেকে ঈষৎ স্নিগ্ধ কণ্ঠে বলে, 'আর কি বলেছেন তোমার দাদা ?'

নিখিল চকিতে একবার ভয়ার্ত একটা দৃষ্টি মেলে তাকায় ওর দিকে। পরক্ষণেই আবার মাথা নত ক'রে বলে, 'না, স্যার, সে আপনি শুনলে রাগ করবেন।'

'না, না—রাগ করবো না। তুমি বলো। সন্দেহটা দূর হয়ে যাওয়াই ভাল নয় কি ?' উৎসাহ দেবার সুরে বলে বিমল।

'দাদা বলছিলেন যে, এই ব্যাকরণ তোদের কোনই কাজে লাগবে না। করবি ত চাকরী। আজও ইংরেজিতে অফিসের কাজ চালাতে হয়। দেশ স্বাধীন হয়েছে বটে কিন্তু তবু ইংরেজী আমরা ছাড়ি নি—ছাড়লেও ধরতে হবে হিন্দী। বাংলা ব্যাকরণ কী কাজে আসবে। পরীক্ষাতেও ত মোটে পঁচিশটা নম্বর। তার জন্যে ঐ অতবড় মোটা বই যাঁরা লিখেছেন তাঁদের সঙ্গে সিলেবাস যাঁরা করেছেন তাঁদের যোগাযোগ আছে নিশ্চয়। এ শুধু বই বিক্রী হওয়ার ফন্দী। পঁচিশ নম্বরের জন্যে একশ পাতার বই-ই যথেষ্ট। চলতি ভাষায় আমরা যে ভাবে কথা বলি, তারই একশ গন্ডা ধরণকে একটা ক'রে নামের লেবেল এঁটে মুখস্থ করিয়ে লাভ কি ?'

ভয়ে ভয়ে থেমে থেমে কথাগুলো ব'লেই ফেলে নিখিল।

ধমক দিতে গিয়ে সামলে নেয় বিমল। আস্তে আস্তে বুঝিয়ে বলার ভঙ্গীতেই বলে, 'চাকরী করাই ত শুধু লেখাপড়ার উদ্দেশ্য নয়। তোমার মাতৃভাষা সম্বন্ধে একটু জ্ঞান যদি না থাকে ত তোমার মনের গঠনটাই যে অসম্পূর্ণ রইল। বিশ্বসংসারে দাঁড়াবে কিসের জোরে—কী ক'রে পরিচয় দেবে নিজেকে বাঙ্গালী বলে ? ইংরেজরা কি ইংরিজী ব্যাকরণ পড়ে না ? না—নিখিল, ওটা পড়তেই হবে।'

বলে কিন্তু মনে মনে জোর পায় না বিমল। সত্যিই কি দরকার খুব ? যেটুকু নিতান্ত দরকার সেটুকু কি একশ' পৃষ্ঠার একটা বইতে দেওয়া যায় না ? খুব কি ক্ষতি হয় এই 'অপিনিহিতি'র বিবরণ না পড়লে ? এতে ক'রে কি সত্যিই খুব ভাল শিখছে ছেলেরা ? কে জানে! ভাষা শিখুক বা না শিখুক—ভাষার যা উজ্জ্বলতম নিদর্শন—সেই সাহিত্য থেকে যে ক্রমশঃ দূরে সরে যাচ্ছে এটা ঠিক। আগে অনেক বেশী সাহিত্যের খবর রাখত ছেলেরা। এখন অবসর কোথায় ? না ইংরেজী না বাংলা—সাহিত্যের বই পড়ে ক-টা ছেলে ? খেলাধুলো, সিনেমা—অবসর বিনোদনের এই ত দুটো বড় পথ খোলাই আছে, যারা ভাল ছেলে তারা পড়ার বইতে ডুবে আছে ; যারা তা নয়—হয় রেডিও

খুলে তিন হাজার মাইল দূরের ক্রিকেট খেলায় কান পেতে আছে, নয়ত খবরের কাগজের শেষের দিক থেকে খুলে পড়ছে (অর্থাৎ খেলার পাতা) নয়ত সিনেমার চতুর্থ শ্রেণীর টিকিট ঘরে গিয়ে 'কিউ' দিচ্ছে রোদ্রবৃষ্টি উপেক্ষা ক'রে। সাহিত্য—না, সাহিত্য থেকে তারা বহুদূরে সরে আছে।

সাহিত্যের কথা বাদ দিলেও ভাষাই কি খুব বেশী শিক্ষা হচ্ছে ? এই সব মোটা মোটা ব্যাকরণের বইয়ের চলন হবার পর এই বই প'ড়ে যারা শিক্ষিত হয়েছে, সাময়িক পত্র খুললে সেই সব তরুণ সাহিত্যিকদের লেখা দেখলে কান্না আসে বিমলের। শব্দের মৌলিক অর্থের সঙ্গে পর্যন্ত এদের পরিচয় নেই। সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থে শব্দের প্রয়োগ ক'রে ভাষার তলোয়ার খেলা দেখিয়ে গর্বে নেচে বেড়ায় এরা। এদের কথাই বা কি ? বাংলার সর্বাগ্রগণ্য অধ্যাপকই ত আকর্ষক অর্থে আকর্ষণীয় শব্দ ব্যবহার করেন খবরের কাগজের দেখা-দেখি !

পড়ানো প্রায় অসমাপ্ত রেখেই উঠে পড়ে বিমল। নিখিল একটু বিস্মিত হয় কিন্তু কিছু বলে না। ওর সঙ্গে নিচে নেমে এসে একবারে দোরের কাছাকাছি পৌঁছে কোনমতে প্রশ্ন করে ফেলে সে—'আপনার শরীরটা আজ ভাল নেই, না স্যার ?'

'কেন বলো ত ! সকাল ক'রে উঠলুম তাই ?'

'না স্যার। তা বলছি না। মুখটা কেমন শুকনো শুকনো। গোড়া থেকেই আপনাকে যেন কী রকম দেখাচ্ছে। তাই বলছি। জ্বর হয়নি ত ?'

বিমল ওর মাথাটা ধরে নেড়ে দিয়ে একটু সস্নেহ হেসে বললে, 'এই ত বেশ বুদ্ধি দেখছি। ঠিকই ধরেছ। জ্বর হয় নি, তবে শরীরটা খুব ভালোও নেই। বড্ড ক্লান্ত লাগছে।'

আজ যা মানসিক অবস্থা তাতে পড়ানোর চেষ্টা করাই অন্যায় হয়েছে তার। কেবল নানা বিক্ষিপ্ত চিন্তা এসে অন্যমনস্ক ক'রে দিচেছ, বার বার অপ্রস্তুত হ'তে হচ্ছে ছাত্রদের কাছে। তার চেয়ে ও-চেষ্টা না করাই ভাল।

একেই গত দু'দিনে তার মনের ওপর দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেছে, তার ওপর আজ পূর্ণিমার সঙ্গে আলোচনা যেন আরও আলোড়নের সৃষ্টি করেছে তার মস্তিষ্কে। চিন্তাগুলো এলোমেলো ছুটোছুটি শুরু করেছে, কিছুতেই তাদের সংযত ক'রে কাজে লাগানো যাচ্ছে না।...

নিখিলদের বাড়ী থেকে বেরিয়ে ঘড়ি দেখল আটটা।

এখন বাড়ী যেতেও ইচ্ছা করে না। গেলেও সাত শ' জবাবদিহিতে পড়তে হবে—কেন এত সকাল সকাল ফিরল সে, শরীর খারাপ করেছে কি না—নানান্ প্রশ্ন। সে আরও বিরক্তিকর।

বিমল খুব জোরে হেঁটে গিয়ে একটা পার্কের এক কোণে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। শুয়ে পড়তেই ইচ্ছা করছিল কিন্তু জামাটা নষ্ট করতে সাহস হ'ল না।

বেশ ছেলেটি এই নিখিল। এর উন্নতি হ'লে মনে মনে খুশী হবে সে। কিন্তু হবে কি ?

বড় মায়া হয় বেচারীর ওপর। মুখের ভাবটাই যেন বেচারী-বেচারী।

এমনি আরো একখানা মুখ মনে প'ড়ে যায় ওর।

বার-বারই মনে পড়ে।

ঠিক নিখিলের মত অতটুকু না হ'লেও—অমনি মাজা শ্যামবর্ণ, অমনি শঙ্কিত ভীত অবোধ দৃষ্টি। বকলে ঠিক ঐ রকমই ম্লান হয়ে উঠত নিমেষে। তারও পড়বার আগ্রহ ছিল অসাধারণ কিন্তু কিছুতেই মাথায় ঢুকত না লেখা-পড়াটা।

সে মুখ আলপনার—আপুর।

ওরা আগে যেখানে থাকত—পূর্ণ মাষ্টারমশাইদের পাড়ায়—ওদেরই বাড়ীর একাংশে থাকত আপুরা। রেলে কাজ করতেন আপুর বাবা, কিন্তু কোয়ার্টার পান নি। রেলের কোট ছাড়া দ্বিতীয় জামা ছিল না ভদ্রলোকের ; স্টেশন কুড়িয়ে বাজার আনতেন ব'লে দু'বেলাই অনেক দেরিতে তাদের উনুনে আঁচ পড়ত। কী আসবে—মাছ পাওয়া যাবে কি না. আনাজ কী পাওয়া যাবে—কেউ জানে না। তিনি বাড়ী ফিরলে তবে রান্না চাপত। সকালে উঠে বোঁ ক'রে স্টেশনে চলে যেতেন—ডিউটি থাক্ বা না থাক্, ব্যাপারীদের ঝাঁকা থেকে টানাটানি ক'রে দুটো মুলো এক মুঠো বরবটি—হ'ল বা গোটা আষ্টেক উচ্ছে নামিয়ে দু' পকেট বোঝাই করতেন। মাছও ঐ ভাবে আদায় হ'ত। বাড়ীতে গিয়ে যখন রুমাল খুলতেন তখন দেখা যেত হয়ত একটা চিংড়ি, তিনটে খলসের বাচ্চা, গোটা দুই ট্যাংরা, তিনটে গুলে এবং গোটা আষ্টেক পুঁটি ! এ ছাড়া আসত একটা ঘটিতে দেড় পো কি আধ সের দুধ। তখন উনুন ধরত, চা হ'ত, রান্না চড়ত। গজ গজ করতেন আপুর মা, 'চিরদিন সমান গেল ! ঠিক যেন ভিখিরীর ঝুলি ঝাড়া হ'ল ! যেমন আনাজের ছিরি, তেমনি মাছের। ন-টা উচ্ছে—পাঁচটা মুকী কচু—একমুঠো বরবটি। এ আমি কী রাঁধব, কার পাতেই বা দেব ?' আপুর বাবা কিন্তু একটুও দমতেন না ; সোৎসাহে বলতেন, 'কেন—উচ্ছে ক-টা ভাতে দাও না। উচ্ছে আলু ভাতে বেশ ত হয় ! আর ঐ বরবটি আলু কচু বেগুন সব দিয়ে একটা ঘ্যাঁট ! মাছ কটার ঝাল করো—যার বরাতে যা ওঠে। কিম্বা উচ্ছে কচু সব দিয়ে সুক্তো ?'

তারপর কারুর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেলে হেসে চোখ মট্‌কে বলতেন—তা কে জানে বিমল আর কে জানে তার বাবা—'কতগুলো ক'রে পয়সা বাঁচছে, সেদিকে হুঁশ নেই ! পয়সা খরচ ক'রে বাজার করতে হ'লে কি আর রোজ বাজার হ'ত ? আঙুল ঠেলে ভাত খেতে হ'ত। এ রকমারী তরকারী আসছে, ভালই ত। কে বোঝাবে বলুন, তবে আর বোকা মেয়েমানুষ বলেছে কেন !'

অনেকক্ষণ শোনবার পর হয়ত আপুর মা ধমক দিতেন, 'তুমি চুপ করো ! বোকা মেয়েমানুষ পেয়েছিলে তাই, নইলে আর কেউ তোমার ঘর করতে পারত

না। যেন ডেয়ো-ডোক্‌লার ঘরকন্না। আমার বাবা কি আমার বিয়ে দিয়েছিলেন ? হাত পা বেঁধে জলে ফেলে দিয়েছিলেন।'

ভদ্রলোক শামুকের মত গুটিয়ে গিয়ে একটা ছেলে কি মেয়ে কোলে ক'রে আদর করতে বসতেন।

এখনও তাঁকে মনে পড়লেই হাসি পায় বিমলের। কোন খাদ্য-বস্তুই বোধ হয় কখনও কেনেন নি। শীতকাল হ'লে দুধের ঘটি ছাড়া আর একটা গেলাস যেত পকেটে। তাতে আসত পয়ড়া গুড়। কোন দিন বা মোয়া। নিজের কোটগুলো কাটিয়ে ছেলেমেয়েদের জামা ক'রে দিতেন। একদিন আপুরই পেট খারাপ হয়েছিল—ওর মা বলেছিলেন ডাব আনতে। ভদ্রলোক একটু বিমর্ষ হয়ে বলেছিলেন, 'তাই ত! মাছ ডাব দুধ এক গাড়ীতেই সব নামে যে। এটা ধরতে গেলে ওটা হয় না। ঈস্‌—! দুধটাই দেখছি বাদ দিতে হ'ল আজ। ব্যাটারা যা ছোটে পোঁ পোঁ ক'রে। যাক গে—কী আর হবে, না হয় নুন-লেবু দিয়েই চা খাওয়া যাবে।'

অবাক হয়ে গালে হাত দিয়ে বলেছিলেন গৃহিণী, 'কেন, রোগা মেয়েটার জন্যে একটা ডাব একদিন তুমি কিনে আনতে পারো না!'

'কিনে—? তা তা অবশ্য—কী জানো বড্ড দাম যে। ব্যাটারা একেবারে চোদ্দ পয়সা হেঁকে বসে একটা ডাব। কলকাতার কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেটে শুনেছি খুব সস্তা, ছ' পয়সা দু' আনায় ডাব পাওয়া যায়। কে যায়—আবার কলকাতা। দেখি—দুপুর বেলা এক ফাঁকে যদি ডুব দেওয়া যায়। ঐটুকু ত—যাবো আর আসব।'

হাত জোড় ক'রে বলেছিলেন গৃহিণী, 'থাক্‌। থাক্‌। ব্যাগোত্তা করি—আর আমার ডাবে কাজ নেই। তুমি মানুষ না পিশাচ, ঢের ঢের চসমখোর মানুষ দেখেছি—তোমার জুড়ি নেই।'

'হ্যাঁ! তা ত ব'টেই। দেখতুম আমার মত দেড়শ টাকা আয়ে ছ'টা ছেলেমেয়ে নিয়ে সংসার চালাতে হ'লে কে কত টাকার মাল গস্ত করত রোজ! ওধারে ত বিইয়েছ শুয়োরের পাল। সেদিকে ত কমতি নেই। অধিক সন্তান দারিদ্দিরের লক্ষণ! এত বড় সংসার সব কিনে চালাতে গেলে রাজাও ফতুর হয়ে যেত—তা জানো ?'

কিন্তু একটা শখ ছিল ভদ্রলোকের। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর ঝোঁক ছিল খুব। মেয়েটিই বড়। বিকেলে বা রাত্রে—যেদিন যেমন ডিউটি পড়ত—ফিরেই মেয়েকে নিয়ে পড়াতে বসতেন। ছেলেরাও পড়ত কিন্তু তাদের গৃহিণী তাঁর অল্পবিদ্যাতেই যা হয় ক'রে পড়াতে পারতেন। মেয়ে ক্লাস সেভেন-এ উঠেছে তখন—তাকে পড়ানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব। আপুর বাবাই পড়াতেন মেয়েকে ; কিন্তু সে সাংঘাতিক পড়ানো!

যেদিন নাইট-ডিউটি বা মর্ণিং-ডিউটি থাকত সেদিন তবু সুবিধা। ঈভ্‌নিং ডিউটি হ'লে ফিরতেন এক একদিন রাত দশটায়, নটার আগে ত হ'তই না। বেচারী আল্‌পনা তখন ঘুমে অচেতন হয়ে পড়ত। কিন্তু তা'হলে কি হয়—

তখনই এসে ওর চুলের ঝুঁটি ধরে বাবা ওঠাবেন এবং রাত এগারোটা পর্যন্ত পড়াবেন। নইলে ওঁরই বা সময় কোথা? সকালে আটটা অবধি কাটে বাজারের জোগাড়ে—তারপর ত আপুর ইস্কুলের সময়, কচি ভাই-বোনেদেরও একটু দেখতে হ'ত। সুতরাং সে সময় পড়া যায় না। অগত্যা ঐ রাত্রে। ঘুমে বিহ্বল হয়ে থাকত ওর বুদ্ধিসুদ্ধি—প্রায়ই কিছু বুঝত না, পড়াও বলতে পারত না। ফলে বাবার হাতে খেত নির্মম প্রহার। সে প্রহারের শব্দে বাড়ী-সুদ্ধ লোকের ঘুম ভেঙ্গে যেত—চোরের মার একেবারে। অথচ তাঁরই বা উপায় কি? কত কষ্টে যে মেয়ের ফ্রি পড়ার ব্যবস্থা করেছিলেন তা তিনিই জানেন—সেই খানে কি-না মেয়েটা ফেল ক'রে বসল! নেহাৎ তিনি করিৎকর্মা মানুষ তাই ফেল-করা সত্ত্বেও হাফ ফ্রি রইল কিন্তু এবার যদি সব বিষয়ে পাস করতে না পারে ত তাও থাকবে না। তখন পড়াবে কে? মায়া-দয়া করতে গেলে ছেলেমেয়ে মানুষ হয় না।

দেখে দেখে একদিন আপুর মা নিভৃতে ধরেছিলেন বিমলকে। সজল নেত্রে ওর হাত দুটো ধ'রে বলেছিলেন, 'দেখছ ত বাবা—মেয়েটার কি প্রেহারী। একে ত ঐ মেয়ে, চোরের মার খেতে খেতে আরও ওর মাথা যায় গুলিয়ে। আর রাত্রে মার খেতে হবে ব'লে সারাদিন যেন কাঁটা হয়ে থাকে। অমন দবকে দবকে থাকলে কদিন বাঁচবে বলো ত? তুমি বাবা একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেবে ওকে? সন্ধ্যেবেলা? তোমার কাছে গিয়ে বসবে? আমি তোমাকে কথা কিছু দিতে পারছি না কিন্তু যে মাসে যা পারব তোমাকে দু-এক টাকা লুকিয়ে চুরিয়ে দিয়ে যাবো। মেয়েটাকে বাঁচাও বাবা!'

তখন সবে ক্লাস টেনু-এ উঠেছে বিমল। তারও পাসের পড়া। তবু তাকে যে ভাল ছেলে ব'লেই অনুরোধ করা হচ্ছে তা বুঝতে পেরে আত্মতৃপ্তিতে ভারি আরাম পেয়েছিল ও। তাছাড়া এমন অনুরোধ এড়ানোও কঠিন। ওর বাবার একটু আপত্তি সত্ত্বেও সে-ভার নিয়েছিল বিমল। আর বিমল ওকে পড়ানোর ভার নিয়েছে—এবং বিনা পারিশ্রমিকে—শুনে ওর বাবাও নিশ্চিন্ত হলেন, কারণ বিমল ভাল ছেলে—কে না জানে? আলপনা বাঁচল।

কিন্তু লেখাপড়া তার বিশেষ এগোয় নি। বড়ই বোকা ছিল মেয়েটা। অথবা বোকা হয়ে গিয়েছিল! ক্ষমতা বা রুচির মাপে পড়াটা হ'লে কী হত বলা যায় না। হয়ত ঢের সহজে এবং অনায়াসে এগিয়ে যেত সে। কিন্তু এ বোঝা তার পক্ষে অতিরিক্তই হয়ে পড়েছিল! ফ্যালু ফ্যালু করে চেয়ে থাকত সে। প্রাণপণে মুখস্থ করত। মনে ক'রে রাখার চেষ্টা করত—অথচ সময়ে বলতে পারত না। তখন আপনিই চোখে জল এসে যেত বেচারীর। শুধু এত চেষ্টা সত্ত্বেও বলতে না পারার গ্লানিতে, অক্ষমতার লজ্জায় সে কেঁদে ফেলত। বিমল বুঝতে পারত না—এর পরও একে মারতে হাত ওঠে কেমন ক'রে।

হয়ত এ লজ্জা বিমলকেই তার বেশী। কে জানে! আজ তাই মনে হয় অন্তত। নইলে—ওর মা বলতেন—'চোরের মার খেয়ে এক ফোঁটা কাঁদে না

বাবা, কিন্তু তোমার কাছে আদর পেয়েও কাঁদে কেন মুখপুড়ী!' আবার নিজেই উত্তর দিতেন—'হয়ত আদর পায় বলেই কাঁদে। যার কাছে যত পায় তার কাছেই ত তত অভিমান কিনা!'

আদর অবশ্য বিমল কোনদিন দেয় নি—তবে হ্যাঁ সস্নেহ ব্যবহার হয়ত করেছে। ওর ঐ অবোধ পশুর মত করুণ চাহনি, যা সামান্য প্রশংসায় উজ্জ্বল হয়ে উঠে ছল-ছল করত, আবার এতটুকু কঠিন কথায় যা ভয়ার্ত হয়ে উঠত সঙ্গে সঙ্গে, নিজের অক্ষমতার সচেতনতায় যা সদাই কুন্ঠিত এবং দীন—সে চাহনি বিমলকে স্নেহার্দ্র ক'রে তুলত ঠিকই।

কিন্তু সেই স্নেহ কিংবা প্রশ্রয়—আলপনার মনে ঐটুকুর জন্যই কৃতজ্ঞতার অন্ত ছিল না। পালিত কুক্কুরীর মতই তার অন্তরটি সদা সর্বদা বিমলের পেছনে পেছনে ঘুরত—পদলেহন ক'রে। এত ভক্তি সে বেঁচে থাকলে তার গুরু বা ইষ্টকেও করতে পারত কিনা সন্দেহ! শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ের অন্ত ছিল না তার! এত বুদ্ধি এবং প্রতিভা (আপুর তাই ধারণা ছিল) যে কোন মানুষের মধ্যে থাকা সম্ভব—এ যেন তার কল্পনারও অতীত। এমন অনায়াসে এত ভারি পড়া আয়ত্ত করতে পারে কেউ? এমন জটিল অঙ্ক, দিনরাত ভেবেও যার কোন হদিশ পায় না আপু তাই কিনা একটু মুচকি হেসে এক মিনিটের ভেতর কষে ফেলে! অথচ কত মিষ্টি কথা। কত আস্তে আস্তে বুঝিয়ে দেয়! কী ধৈর্য। বার বার বোঝানো সত্ত্বেও তার মাথায় ঢোকে না কিছু, তাই ব'লে ত বাবার মত রেগে ওঠে না। আবার বোঝাতে বসে। ছি ছি, এর কাছে তার কী দৈন্যই না প্রকাশ পাচ্ছে। এই কথাটা ভাবলেই যখন-তখন ওর সে অবোধ কুণ্ঠিত নয়নের কোল উপছে জল ঝরে পড়ত।

তার এ মনোভাব আজ বিমল বুঝতে পারে। সেদিনও যে কতকটা পারে নি তা নয়। অপরিসীম আত্মগর্বে মন ভরে উঠত ওর। এমন ভক্তিমতী উপাসিকা পাওয়ার গৌরব—অত অল্পবয়সেও ওকে যৎপরোনাস্তি মোহগ্রস্ত করেছিল। আর তাইতেই না অমন কাণ্ডটা—।

ছিঃ। বিমলের জীবনে ঐ একটি কলঙ্ক।

কিন্তু আজ খুব ঠাণ্ডা-মাথায় ভাবলে কাজটাকে অত খারাপ ব'লে মনে হয় না। বেচারীর জীবনে জমার খাতায় ত কিছুই ছিল না। সে ত ওটাকে দেবতার প্রসাদ মনে ক'রেই কৃতার্থ হয়েছিল। তবু—বিমল বোঝে যে—সেদিন দেবতার আসন থেকে ভ্রষ্ট হয়ে সে সাধারণ মানুষের স্তরেই নেমে এসেছিল ঐ বালিকার অন্তর-লোকে। সেটা তখনই স্পষ্ট ভাবে তার কাছে প্রতীত না হ'লেও মনের অবচেতনে তাই ঘটেছিল! ঘটাই স্বাভাবিক।

বিমলের স্কুলজীবন ছিল বড় বিচিত্র। বড় মধুর, বড় তিক্ত।

পূর্ণ মাষ্টার মশাইয়ের ইস্কুল ছেড়ে হাইস্কুলে ভর্তি হ'য়ে প্রথমটা খুব সুখী হয় নি বিমল। অনেক ছেলে, শিক্ষকদের মনোযোগ নেই—ছাত্রদের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্ক কম। এ কী হাটের মাঝে এসে পড়ল সে।

ক্রমে ক্রমে সে নিজের গুণে শিক্ষকদের চোখে পড়ল। দু-একজনের অন্তরঙ্গ হবার সুদুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করল সে। আজও বিমলের বিশ্বাস, ব্যক্তিগতভাবে যে ছাত্র শিক্ষকের সাহচর্য লাভ না করেছে, সে বড় বঞ্চিত।

তারপর তার একটি বন্ধুগোষ্ঠিও গড়ে উঠল।

অদ্ভুত সে বন্ধুগোষ্ঠি। ভাল ছেলে ছিল ক-জন। তারা সত্যিই ভাল ছেলে; আর জনকতক ছিল ভালয়-মন্দে মিশানো। এরা লেখাপড়ায় মাঝারি, অত্যন্ত পরোপকারী, স্নেহময় বন্ধু—কিন্তু চরিত্রে কিছু গোলমাল ছিল তাদের। বেশী নয়, জন-দুই-তিন, এদের যৌনক্ষুধা জেগেছিল সেই বয়সেই। ক্ষুধা দৈহিক যত না উগ্র হোক—মুখে এরা ঐদিক-ঘেঁষা আলোচনা ক'রে সুখ পেত। এটাকে তারা 'খিস্তি' বলে স্বীকার করত না—বলত মুখ-খারাপ করা। গোড়াতে গোড়াতে তাও বলত না—বলত মাঝে মাঝে একটু 'ইয়ে' না হ'লে আড্ডা জমে কখনও?

ওদের ক্লাসে নাম-করা বকাটে ছেলেও ছিল। ক্লাস এইট্-এই তারা নানা বদমাইসীতে পরিপক্ক হয়ে উঠেছিল কিন্তু তারা নাম-করা ব'লেই তাদের সঙ্গ এড়িয়ে যাওয়া চলত সহজে। সারা ক্লাসে চমৎকার দুটি ভাগ হয়ে গিয়েছিল। পেছনের বেঞ্চিতে ওরা বসত, জনা-ছয়সাত ছেলে। তাদের যে লেখাপড়া হবে না তা তারা ত জান্তই, বাকী ছেলেরা এবং মাষ্টারমশায়রা সবাই জানতেন—জানতেন না কেবল তাদের অভিভাবকরা। অথবা ভাগ্যকে স্বীকার করতেন না। নানা দুষ্কার্যের পরে এসে তাঁদেরই মাপ চাইতে হ'ত—বছরের শেষে হ'ত হাতে-পায়ে ধরে পাস করাতে। ওরা কিন্তু বিপজ্জনক নয় মোটেই। শুধু বিমল নয়—আরও এমন অনেক ছেলে ছিল যারা কখনও কথাই বলে নি ঐ-সব মার্কা-মারা ছেলের সঙ্গে। বিপজ্জনক ছিল এই সব ছেলেরাই—যাদের ভাল না বেসে থাকা যায় না, অনেকখানি ভালর সঙ্গে একটু মন্দ মেশানো যাদের চরিত্র। তার ওপর এ আড্ডাটা ঠিক স্কুলেরও নয়—এটা পাড়ার আড্ডা। শহরতলীর এই সব আধা পাড়াগাঁয়ে পাড়ার ছেলের সখ্যতাটা শহরের চেয়ে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে। ওর সহপাঠীই বেশী ছিল ওর বিশেষ দলটিতে—কিন্তু ওদের শ্রেণীর এক-আধ শ্রেণী নিচে বা ওপরে পড়ে, এমন ছেলেও ছিল তার মধ্যে। তাতে ঘনিষ্ঠতা কিছু আটকায় নি। অত্যন্ত মধুর ছিল এদের সঙ্গ ও সাহচর্য। এদের এড়ানো সহজও ছিল না, প্রেয়ও ছিল না। সুতরাং বিমলের এই সব আলোচনা খুব ভাল না লাগলেও তা থেকে দূরে সরে যেতে পারে নি।

তাছাড়া···ভাল যে লাগে নি একেবারে, তাও কি হলফ ক'রে বলতে পারে বিমল? জীবনের এই অন্তরঙ্গ রহস্যময় অথচ গোপন দিকটা সম্বন্ধে মানুষের সহজাত কৌতূহল কি তারও ছিল না যথেষ্ট? আলোচনার মধ্যে মধ্যে ভাষাটা যখন একেবারে ইতর হয়ে উঠত তখনই বিশ্রী লাগত, কান মাথা ওর গরম হয়ে যেত—সমস্ত মুখ যে লাল হয়ে উঠেছে তা সে নিজেই টের পেত। নইলে ভালই লাগ্ত বৈকি! এই ভাবেই আরও অনেকের ভাল লেগেছে—

তারা জেনেছে, অনেক সময়ে অপরকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে জেনেছে—এবং আরও 'ভাললাগার' নেশায় সেই জ্ঞানবৃক্ষের ফল অন্বেষণ করেছে।

সব চেয়ে মজার কথা এই—যারা বিমলদের এই সব 'জ্ঞান' দিত, তারা কী ভাবে এই অভিজ্ঞতা আহরণ করেছে তা সব ক-জনকেই জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নিয়েছিল বিমল—পরে। সে মূল বিচিত্র। ওদের পাড়ায় একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক থাকতেন, হাইকোর্টের কেরাণী। সম্ভ্রান্ত বংশের ছেলে, লেখাপড়াও কিছু শিখেছিলেন, গম্ভীর-প্রকৃতি, সন্তানের পিতা। ইনিই নাকি কিশোর-বয়স্ক ছেলেদের নিরিবিলি পেলে তাদের ঐসব কথা শোনাতেন, আকারে ইঙ্গিতে তাদের সে কথার অর্থও বুঝিয়ে দিতেন। এটা অবশ্য শুধু জ্ঞান। অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে তারা অধিকাংশই তাদের গুরুজন-স্থানীয় দাদাদের কাছ থেকে—বা দাদার বন্ধুদের কাছ থেকে, যাদের সঙ্গে তাদের বয়সের তফাৎ পাঁচ থেকে পনেরো পর্যন্ত। এই ইতিহাস সর্বত্র—পরে ওপরের ক্লাসে বা কলেজ জীবনেও—যাদের সঙ্গে ওর কিছু ঘনিষ্ঠতা হয়েছে তাদেরই প্রশ্ন ক'রে জেনেছে বিমল। অবশ্য ক্লাসের বন্ধুরাও আছে, এবং হাতে-খড়ি অনেক জায়গায় ক্লাশ রুমেই হয়েছে এমন ইতিহাস যে একেবারে নেই তা নয়—কিন্তু খুব বেশী নয়। বরং প্রথম অভিজ্ঞতার পর তা ঝালাই করা হয়েছে স্কুলের আনাচে কানাচে কিংবা ক্লাসের ভিতরই—এই ইতিহাসই বেশী, ওর এম. এ. ক্লাসের এক সহপাঠী স্বীকার করেছিল যে যখন সে মাত্র ক্লাস ফাইভ-এ পড়ে, তখনই এক ক্লাস সেভেনের ছেলে তার কাছে এ সম্বন্ধে নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে সচেতন ক'রে দিয়েছিল।

কিন্তু সে আপুর কথা ভাবছিল!

আপুকে যে সে পড়াচ্ছে, এবং আপু তাকে কী সম্ভ্রমের চোখে দেখে, এ কথা বন্ধু-সমাজে গল্প করেছিল বৈকি! এতখানি আত্মপ্রসাদ কি একা-একা ভোগ করা চলে! কথা-প্রসঙ্গে নয়, ইচ্ছে ক'রেই সবিস্তারে গল্প করেছে সে বন্ধুদের কাছে। সগর্বে।

তার ফলে ঠাট্টা তামাসার অন্ত ছিল না। যেমন বন্ধুসমাজে হয়ে থাকে।

কেউ অভিযোগ করলে ডুবে ডুবে জল খাওয়ার।

কেউ বললে, সব ভালো ছেলেদেরই জানা আছে। বরং তারা এককাঠি সরেস।

কেউ বললে, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি!

সে সব তামাসার আড়ালে ইচ্ছাতুর ঈর্ষার অভাব ছিল না। সে ঈর্ষা উপভোগ করত সেদিন বিমল।

প্রথম ঠাট্টা-তামাসার ঝোঁকটা কেটে গেলে সবাই জানতে চাইলে পূর্ণ বিবরণ। ব্যাপারটা কতদূর গড়িয়েছে।

মোটেই গড়ায় নি শুনে কেউ কেউ করলে অবিশ্বাস। অধিকাংশই হতাশ হ'ল। তারা তাতাতে শুরু করলে, 'তুই কী রে? তুই কোনও কাজের

নোস্ ! ভোঁদা একেবারে। বোকারাম !'

ক্রমাগতই তাতাত তারা। বিদ্রুপবাণে জর্জরিত করত। কাপুরুষ বলত ! ক্রমে ক্রমে ওর ছেলেমানুষ মন সেই উস্কানির কাছেই হার মানল। এক নির্জন মুহূর্তে একদিন হঠাৎ আপুকে কাছে টেনে এনে ওর মুখখানা তুলে ধরে চুমো খেলে !

ইস্ ! সে লজ্জা, সে গ্লানিতে আজও ওর সমস্ত সত্তা রি-রি করে ওঠে। এই রাত্রির অন্ধকারে নিঃসঙ্গতার মধ্যেই—আজও তার মাথা ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠছে, ঘাম দেখা দিয়েছে সর্বশরীরে।

আপু অবাক হয়ে চেয়েছিল। সে বিস্ময়-বিহ্বল চাহনি যেন সঙ্গে সঙ্গে ছুঁচের মত বিঁধেছিল ওকে। আত্মসম্বরণ ক'রে লজ্জায় মাথা হেঁট করেছিল।

আজও সে চাহনি মনে পড়লে লজ্জা করে ওর।

এমন কি—তার অল্পক্ষণ পরে জিনিসটার পরিপূর্ণ অর্থ এবং অনুভূতিটা বোধগম্য হ'তে যে সুখ ও লজ্জায় সে মাথা নুইয়ে ছিল, তার শ্যামবর্ণ মুখেও যে রক্তিমাভা ফুটে উঠেছিল, আশার অতীত পুরস্কার লাভের যে কৃতজ্ঞতা ও চরিতার্থতা প্রকাশ পেয়েছিল অধরোষ্ঠের ভঙ্গীতে—তাতেও কোন সান্ত্বনা পায় নি বিমল সেদিন।

সেই প্রথম ও সেই শেষ।

আপুর দিক থেকেও কোন দাবী আসে নি বলাবাহুল্য। অত উচ্চাশা তার ছিল না। সাধ হয়ত ছিল কিন্তু বুক ফাটলেও মুখ ফোট্‌বার মত সাহস তার হয় নি কোন দিন।

শুধু তার মনোভাব বোধ করি গোপন রইল না—যখন মাত্র সতেরোটি দিন টাইফয়েডে ভুগে মারা যাবার পর ওর বই-রাখা কাঠের বাক্সটি থেকে বেরোল একখানা আধময়লা রুমাল আর একটা বিবর্ণ গ্রুপ ছবি।

অনেকদিন আগে এই রুমালটা হারিয়ে যায় বিমলের, কোথায় ফেলেছিল মনে করতে পারে নি কিছুতেই। ছবিটাও বহুদিন আগেকার। ওদের পাড়ার টীম সেবার কি একটা শীল্ড ফাইনালে জিতেছিল, তারই ছবি। সেই টীমের সঙ্গে বিমলেরও ছবি উঠেছিল। বহুদিন আগেকার কথা—রোগা টিংটিং-এ একরত্তি বিমল, আজ তাকে চেনাও কঠিন। ছবিটা কোথায় পড়ে ছিল ধুলোর গাদায়, বিমলের মা ঝাঁট দিয়ে জঞ্জালের সঙ্গে ফেলে দিয়েছিলেন। বিমল তুলে নিয়ে সকৌতুকে আপুকে প্রশ্ন করেছিল, 'বলো ত কোন্‌টা আমি ?' আপু ঠিকই দেখিয়েছিল কিন্তু। তারপর হাসতে হাসতে বিমল ছবিটা আবার জঞ্জালের গাদায় ফেলে দিয়ে চলে যায়। আপু যে কখন সেটা কুড়িয়ে সযত্নে এনে তুলে রেখেছিল, তা কেউ জানে না।

জীবনের সমস্ত সাধ আহ্লাদ অপূর্ণ রেখেই—মাত্র চোদ্দ পনেরো বছর বয়সে তাকে বিদায় নিতে হয়েছিল এই পৃথিবী থেকে। তার সেই একান্ত অন্ধকার জীবনে ওর ঐ দুষ্কৃতি কি একবিন্দু আলো দিতে পেরেছিল ? অথবা গভীরতর বেদনার কারণ হয়ে বিঁধেছিল বুকে। কে জানে !

নিস্তব্ধ রাত্রির নিকষ-কালো আকাশে ঐ যে তারাগুলো ফুটে আছে, হয়ত ওরই মধ্যে কোন এক নক্ষত্রের কোন এক গ্রহে সে আবার জন্ম নিয়েছে। হয়ত বা এই গ্রহেই কোন সুদূর দেশে সে জন্মেছে। কিম্বা বিশ্বের অনন্ত প্রাণ-সমুদ্রে মিশিয়ে গেছে তার ছোট্ট একরত্তি ভীরু আত্মা—শেষ নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে।

মানুষ দেহান্তর গ্রহণ করে কি না, তা বিমল জানে না।

যদি তা হয়—এ জন্মে যেন সে সুখী হয়। এমন বিড়ম্বিত জীবন যেন তাকে আর ভোগ করতে না হয়!

দূরের রাজপথে মানুষ ও যানবাহনের কোলাহল স্তিমিত হয়ে এসেছে। চমক ভেঙ্গে উঠে পড়ে বিমল।

॥ ১২ ॥

পূর্ণিমা বাড়ীতে ফিরে নিঃশ্বাস নেবার অবসর পায় না। মা একটু বিরক্ত-কণ্ঠেই বলেন, 'আপিসে ত ছুটি হয়েছে কখন? এত রাত পর্যন্ত কোথায় থাকিস আজ কাল? শেষে একটা কেলেংকারী করবি নাকি? ঝকমারী হয়েছিল তোমাকে চাকুরী করতে দেওয়া।'

বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে বলেন, 'চাকুরী আর করতে যেতে হবে না ওকে। অফিস ছাড়িয়ে নাও। আমাদের অদৃষ্টে যা আছে হবে।'

অভিযোগটা নতুন নয়,—কিন্তু ঝাঁজটা নতুন। পূর্ণিমা একটু অবাক হয়ে যায়। অবশ্য আসল কথাটাও জানতে বেশি দেরি হয় না। বাবার হাঁপানীটা বেড়েছে। বুকে-পিঠে একটা ব্যথা কদিনই টের পাচ্ছিলেন, তার-ওপর এই হাঁপানী—ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছেন। মা যথাসময়ে উনুনে আঁচ দিয়েছিলেন কিন্তু তারপর আর বাবাকে ছেড়ে উঠতে পারেন নি। এতক্ষণ ধরে বুকে তেল মালিশ ক'রে একটু সুস্থ করেছেন বটে কিন্তু ছেড়ে যাওয়ার মত এখনও হয় নি। বিশেষত হাঁপানী বাড়লে ত ওর বাবা একেবারে ছেলেমানুষ হয়ে পড়েন, কিছুতেই মাকে কাছছাড়া করতে চান না।

মা একটু যেন কুণ্ঠিত ভাবেই বললেন, 'তার ওপর আজ আবার ঝি আসে নি। বাসন-কোসন এখনও সব পড়ে।'

অর্থাৎ সোনায় সোহাগা! কিন্তু এ-ও নতুন নয়। দিনরাতের লোক রাখার ক্ষমতা নেই, ঠিকে ঝি একটি আছে, সে বাসন মেজে আর ঘর-বারান্দা মুছে দিয়ে যায়। কিন্তু মাসে অন্তত চারদিন কামাই সে করবেই! তাড়ানোও যায় না—কারণ বহুদিনের লোক ব'লেই আজও সে চার টাকা মাইনেতে কাজ করছে, তাকে তাড়ালে আট টাকার কম কাউকে পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। ওপর তলায় যে ঝি কাজ করে সে শুধু বাসন মেজে দিয়ে যায়—সাত টাকায়! অত টাকা দেবার ক্ষমতা তাদের নেই।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পূর্ণিমা বলে, 'সাদা বাসনগুলো অন্তত মালুকে দিয়ে মাজিয়ে নিতে পারো নি মা!'

'তবেই হয়েছে!' মা বলে ওঠেন, 'যেখানকার যা তেল ময়লা ঠিক লেগে থাকত, উল্টে তার সঙ্গে জড়িয়ে ধরত ছাই মাটি। একটা চায়ের পেয়ালা ধুতে পারে না—তার বাসন!'

বিরক্তিতে ভ্রূ কুঁচকে ওঠে পূর্ণিমার।

'পারে না ব'লে কি কোন কালে শিখবে না! ওকে এমন ক'রে তুমি তৈরী করছো যেন কোনও কালে ওর নিজের ঘর-সংসার হবে না!'

'তৈরী আর কি ক'রে করব বাছা তাও জানি না!' মা-ও বিরক্ত হ'য়ে ওঠেন একটু, 'বুড়ো বয়সে মারধোর করব? এই ত তোমার পেছনেও ত কম টিকটিক করি না। তুমিই কি এখনও গুছিয়ে কাজ করতে শিখেছো? তোমাদের হেঁসেলের ধারে-কাছে যেতে দিতেই ত আমার ভয় করে। না আছে এঁটো-কাঁটার বিচার, না আছে কোন হিসেব। এলো-পাতাড়ি কাজ। নেহাৎ দায়ে পড়েই যেতে দিতে হয়!'

কী একটা উত্তর দিতে গিয়েও সামলে নেয় পূর্ণিমা। প্রাণপণে বিরক্তিটা দমন ক'রে এ-ঘরে এসে অফিসের জামা কাপড় ছাড়ে। মাঠে বসার ফলে মাটির দাগ হয়েছে শাড়ীতে—অথচ এখনও তিনটি দিন চালাতে হবে। ভাল শাড়ী ওর এত কম যখন, তখন অত কাব্যি করা ঠিক হয় নি।

মা'রই একখানা তেল-চিটচিটে ছেঁড়া কাপড় জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে বাসন মাজতে বসে পূর্ণিমা। উনুনে দুবার কয়লা দেওয়া হয়ে গেছে—এর পর রান্না আর হ'তেই চাইবে না। কলতলা থেকেই ছোট বোনকে হেঁকে বলে, 'মালু ততক্ষণ একটা কাজ করবি, হাত ধুয়ে একটু ডাল চাপিয়ে দিবি? ততক্ষণ ফুটতে থাক্। তারপর আমি গিয়ে নামিয়ে চা ক'রে দেব!'

মালু ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'বাবা রে বাবা। এ বাড়ীতে লেখাপড়া করবার কোন উপায় নেই। কেন যে চেষ্টা করি তাও জানি না!'

পূর্ণিমার কণ্ঠস্বর তিক্ত হয়ে ওঠে, 'দ্যাখ মালু, আদিখ্যেতা করিস নি। লেখাপড়া আমরাও করেছি, ভাল ক'রেই করেছি। সাধারণ একটু আধটু ফায় ফরমাশ খাটলে তার কোন ক্ষতি হয় না। আমরা কি কখনও কিছু করি নি?'

মালুও সমান ঝাঁজের সঙ্গে জবাব দেয়, 'তোমাদের এত ফায় ফরমাস খাটতে হয় নি—তখনও বৌদি ছিল।'

সে দুম্ দুম্ ক'রে পা ফেলে রান্নাঘরে গিয়ে ঢোকে। কলঘরের দশ বাতির আলোয় ব'সে বাসন মাজতে মাজতে রাগে গজরায় পূর্ণিমা, 'মা যা তৈরী করছেন ছোট মেয়েকে, টের পাবেন এর পর! আমার কি? আমি কি আর চিরকালই এইখানে পড়ে থাকব?'

সব চেয়ে বিপদ হয়েছে এই যে—অবস্থা চিরদিনই ওদের এত খারাপ ছিল না। বাবা সরকারী চাকরি করতেন, তখনকার দিনের হিসাবে মাইনেও খুব

কম ছিল না। গত লড়াই বাধবার পরেই পেন্‌সন নিতে হ'ল। সে পেন্‌সনও পুরো রাখা গেল না, ওর দিদির বিয়ে বাকী ছিল, অনেকখানি পেন্‌সন বিক্রি ক'রে তার বিয়ে দেওয়া হ'ল। আয় কমে গিয়ে ভগ্নাংশে দাঁড়াল, অথচ ব্যয় বেড়ে গেল হু-হু ক'রে। ভরসার মধ্যে ছিল দাদা—সে-ও সরকারী চাকরী পেয়েছিল কিন্তু মা আর একটি ভুল ক'রে বসলেন। বড় মেয়ে চলে গেল, হাতের কাজ এগিয়ে দেবার লোক চাই—এই বায়নাতে ছেলের বিয়ে দিলেন। কাজ তার দ্বারা কিছুই হ'ল না, বিয়ের পর বোঝা গেল যে কম ক'রেও তার সাত রকমের অসুখ আছে, মাসের মধ্যে বাইশ দিনই সে থাকে অসুস্থ। সাতটার আগে তার ঘুম ভাঙ্গে না—শালীনতার দোহাই দিয়েও পূর্ণিমার দাদা স্ত্রীর সে অভ্যাস ছাড়াতে পারে নি। তাছাড়া কাজকর্ম সে কিছু জানতও না, শেখবারও ইচ্ছা ছিল না।

তবু কিছুদিন সময় পেলে কী হত বলা যায় না। কিন্তু বিবাহের বছর-খানেকের মধ্যেই তার মেয়ে হয়ে গেল। রুগ্ন কাঁদুনে মেয়ে। তাকে দেখতেই অবসর পেত না বৌদি, কাজ কর্ম করার সময় কৈ? আর সেই যে শুরু হ'ল—চার বছরে তিনটি। অভাব বেড়ে গিয়েছিল তার ভেতর অনেক। খরচ-পত্র দিয়ে দাদার সঙ্গে মায়ের খেচাখেচিও বেড়ে চলল সেই অনুপাতে। অবশেষে একদিন শোনা গেল দাদা শ্বশুরবাড়ীর কাছাকাছি কোথায় যেন ঘর ভাড়া করেছে। দিন-কতক পরে সত্যিই চলে গেল—স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-মালপত্র নিয়ে।

তখন এঁদের আয়ের মধ্যে ওপর-তলার ভাড়া বাবদ ত্রিশটি টাকা। আর বাবার পেন্‌সন সাতচল্লিশ। ভাড়াটে বহুকালের—দিত পঁচিশ, বেড়ে ত্রিশ করেছে। তার চেয়ে বাড়ানো সম্ভব নয়। তুলতে গেলে নালিশ মকদ্দমা করতে হয়—সে খরচ দেবে কে? তাছাড়া কীরকম ভাড়াটে আসবে কে জানে। সে ও যে ভাড়া দেবে ঠিক-মত, তারই বা নিশ্চয়তা কি? চক্ষুলজ্জাও আছে একটু। আত্মীয়ের মত হয়ে গেছেন ওঁরা। তবু পৈত্রিক এই বাড়ীটুকু ছিল শশীবাবুর তাই রক্ষা—নইলে কী যে হ'ত। বাড়ীতে চুনকাম করবার খরচ জোটে না, ভাড়া ক'রে থাক্‌তে হ'লে হয়ত আত্মহত্যা করতে হ'ত।

সেই সময়ই পূর্ণিমাকে কলেজের মায়া কাটিয়ে চাক্‌রিতে ঢুকতে হ'ল। ছোট বোন আছে, ছোট ভাই আছে। ওর মাইনে যোগ করলেও ডাল-ভাত জোটা কঠিন। তবু ত ওর এক কাকা আছেন দিল্লীতে, তিনি ওদের ইস্কুলের মাইনে বই খাতা বাবদ কিছু কিছু পাঠান—মধ্যে মধ্যে।

বাসন মেজে গাদা ক'রে রেখে এসে কাপড় কাচতে কাচতে ডাল-পোড়া গন্ধ এল নাকে। ভিজে কাপড়টাই কোনমতে গায়ে জড়িয়ে রান্নাঘরে ছুটল পূর্ণিমা। সেখানে গিয়ে কান্ড দেখে পূর্ণিমার চক্ষু স্থির। প্রায় জন-দশেকের খাবার মত ডাল চড়িয়েছে মালু, ফলে একরত্তি কড়ায় বেশী জল দেওয়া যায় নি, সে জল শুকিয়ে সমস্ত ডাল পুড়ে কয়লা হয়ে গেছে।

ততক্ষণে গন্ধ পেয়ে মা-ও ছুটে এসেছেন। তিনি কিন্তু সমস্ত ঘটনাটার

জন্য পূর্ণিমাকেই দায়ী করলেন। মালু কখনও করে নি, তার কি দোষ। পূর্ণিমা তাকে বলতেই বা গেল কেন, আর বললেও—কতটা ডাল চাপাবে ব'লে দেওয়া উচিত ছিল।

পূর্ণিমার যেন কান্না পেতে লাগল। মা'র এই পক্ষপাতিত্বের (অন্তত পূর্ণিমার তাই বিশ্বাস) কোন জবাব দিতে তার রুচি রইল না। সে নিঃশব্দে খুন্তির ডগা দিয়ে পোড়া ডালগুলো চেঁচে চেঁচে ফেলে দিয়ে আবার নতুন ক'রে ডাল চাপিয়ে ঘরে গেল কাপড় ছাড়তে।

তারপর কর্মের নিরন্ধ্র নিরবসর।

চা করতে হ'ল। বাবা রাত ন-টার পর খান না কিছুতেই। আগে তাঁর রুটি ক'রে দুধ জাল দিয়ে দিতে হ'ল। বাকী গৃহস্থর একটা তরকারী আছে, রুটি আছে, ভাত আছে। মা ভাত খান—বাকী সকলে রুটি।

অবশ্য শেষের দিকে মা এসে পড়লেন কিন্তু পূর্ণিমার মনে হ'ল—না এলেই বোধ হয় ভাল হ'ত। এসে পর্যন্তই গজ গজ করতে লাগলেন; আটা মাখতে গিয়ে নাকি সে আটা ছড়িয়েছে চারদিকে। তেলের বোয়েম থেকে পলা ডুবিয়ে তেল না নিয়ে কাৎ ক'রে ঢেলে নিয়েছে, তারপর বোয়েমের গা-টা মুছে নেয় নি—গা বেয়ে তেল গড়িয়ে তাকটা-ময় তেল হয়েছে। কুট্‌নো কুটে বঁটিতে খোসাতে আনাজে একাকার ক'রে ফেলে রেখেছে। জলের কলসীতে চাপা দেয়নি—বাটনার রেকাবীটা সক্‌ড়ি ক'রে ব'সে আছে—এমনি সহস্র অকর্মণ্যতার নজীর।

'অতবড় মেয়ে—একটা কাজ যদি গুছিয়ে করতে পারে।···ছোট বোন্‌কে বকবার সময় ত খুব আছ! নিজে ত কত কাজের লোক!'

অন্যদিন হ'লে রাগারাগি করত পূর্ণিমা। সামনে মায়ের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করত—তেজ দেখাত। বলত যে, 'ঐ জন্যেই তো তোমার কাজ করতে চাইনা। করেছি এই কত না।' বলত যে, 'মানুষে করতে করতেই শেখে। তুমি করতে দাওনা বলেই তো এই কাণ্ড।' কিন্তু কে জানে কেন আজ নিঃশব্দে শুনে গেল—একটি প্রতিবাদ পর্যন্ত করলে না।

মাকে খেতে দিয়ে নিজের খাবার ঢাকা দিয়ে রেখে যখন রান্নাঘর ধুতে শুরু করলে, তখন মা বিস্মিত হ'য়ে প্রশ্ন করলেন, 'কৈ তুই খেলি না?'

এইবার প্রথম মুখ খুললে পূর্ণিমা, 'আমিও ত মানুষ মা! মানুষ কেন—গাধাকেও বিশ্রাম করতে দিতে হয়। অফিস থেকে এসেই জুতেছি তোমাদের ঘানিগাছে, এখন একটু হাঁফ ছাড়তে দাও। এ অবস্থায় কি কিছু মুখে রোচে!'

মা জবাব দিলেন, এই ঘানিগাছে আমরা চিরদিনই জুতে আছি মা—বিশ্রামের কথা মুখেও আনতে পারি নি। তোমরাও কোনদিন ভাবো নি। উনি ত ভাবেই নি!'

'তোমার দুপুর ছিল মা। দুপুরে ঘুমোতে পেতে, আমাদের মত অফিস করতে হ'ত না।'

'তুমিই বা আজ সকালে কি কাজ করেছ মা? কিন্তু তাও নয়—। দুপুর ত তুমি আজ দেখ্‌ছ। ষোল বছরের মেয়ে এ বাড়ীতে এসেছি। নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ পাই নি তারপর থেকেই। দুপুর বেলা অবসর মিলত বটে কিন্তু শোবার হুকুম ছিল না—ব'সে ব'সে দিদিশাশুড়ীকে রামায়ণ শোনাতে হ'ত। নয়ত পিসশাশুড়ীর পাকা চুল তোলা ছিল। আমাদের কাঁচা বয়স, কাজেই বিশ্রাম করার দরকার কি? তবে সে প্রথম দু-বছর। তারপরই কোলে ছেলে এসেছে। তোমার যে দিদি মারা গেছে সেই দিদি—শুধু সে কেন আমার সব ছেলেমেয়েই, তোমরাই কি কম? কেউ দুপুরে ঘুমোতে না। অথচ পাছে শাশুড়ীদের ঘুম ভাঙ্গে সেই জন্যে সারা দুপুর তোমাদের কোলে ক'রে ক'রে ঘুরতে হ'ত। এধারে সারা দুপুর ঘুমোতে না—সন্ধ্যা হ'লেই সব অজ্ঞান হয়ে পড়তে ঘুমে। ওঁরা ভারি খুশী হতেন। মেজ বৌমার ছেলেপুলেরা খুব লক্ষ্মী, সকাল সকাল ঘুমিয়ে পড়ে—বৌমা একটু কাজ পায়। সে সময় যদি একটু ছুটি পেতুম ত হ'ত—কিন্তু সে সময় ছুটির কথা ভাবাই যায় না। তখন রান্নাবাড়া শুরু হ'য়ে যেত—একান্নবর্তী সংসার, এক এক বেলায় চল্লিশখানা পাতা পড়ত ছেলে বুড়ো মিলিয়ে। সব সেরে শুতে আসতাম রাত বারোটা সাড়ে বারোটা, ঠিক তিনটেতে ছেলেমেয়েরা উঠে পড়ত। সব ক-টি সমান ছিল আমার। যখন যে কোলে থাক্‌ত তারই ঐ দস্তুর। তখন তাকে ভোলাতে হ'ত, খেতে দিতে হ'ত। তারপর নিয়ে পায়চারী করো, নইলে ওঁর ঘুম হবে না। সারাদিন খেটেখুটে এসেছেন আপিস থেকে, রাতেও যদি ঘুম না হয় ত বাঁচবেন কি ক'রে। আমরা বাঁচব কি ক'রে সে খোঁজ কেউ কখনও নেয় নি মা। আর বেঁচেও ত আছি, সেদিন যদি মরতুম ত শান্তি হ'ত। বুড়ো বয়স পর্যন্ত এই লাঞ্ছনা সইতে হ'ত না।...একদিন একবেলা করতে হয়েছে তাতেই ত মুখনাড়া দিচ্ছ। তাও কি বসে ছিলুম?'

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে মা আবার ভাতের গ্রাস মুখে তুললেন। শেষের দিকে তাঁর কণ্ঠস্বর গাঢ় হ'য়ে এসেছিল, বহুদিনের ভুলে যাওয়া ব্যথার সমুদ্রে জোয়ার জেগেছে তাঁর। ডালমাখা ভাতও হ'য়ে এসেছে ঠাণ্ডা। তিনি হাত গুটিয়ে বাঁ-হাতে জলের ঘটিটা মুখে তুললেন।

চোখের নিমেষে তাঁর সেই বাঁ-হাতটা চেপে ধরে পূর্ণিমা বললে, 'আমার অন্যায় হয়েছে মা, ও কথাটা বলা। তুমি কিন্তু ভাত ফেলে উঠ্‌তে পারবে না।'

মা বিস্মিত হ'লেন। এ যেন নতুন কোন পূর্ণিমা। ভালও লাগল খুব, স্নিগ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন, 'আর ভাল লাগছে না রে!'

'না, তা হবে না। আজ আমি রেঁধেছি, তুমি যদি ভাত ফেলে উঠে যাও ত বুঝব রান্না ভাল হয় নি।'

'তবে তুইও খাবারটা নিয়ে বোস। গল্প করতে করতে খাওয়া যাক্—'

'দোহাই মা। জানোই ত রান্না করলে গা না ধুয়ে আমি কিছু খেতে পারি না। থাক আমি ঠিক—এখন এমনিই বসে গল্প করছি।'

মা'র খাওয়া হ'লে রান্নাঘরের সব কাজ শেষ ক'রে সত্যিই গা ধুতে গেল পূর্ণিমা, কিন্তু তারপরও খেতে ইচ্ছা করল না। মা শুয়ে পড়েছেন, সবাই ঘুমিয়েছে। চারিদিক নিস্তব্ধ নিঃঝুম। বোধহয় এগারোটা বাজে। সে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে রান্নাঘরের দরজার শেকলটা তুলে দিয়ে ছাদে চলে গেল।

অনেকদিন পরে ছাদে উঠল ও।

ওদের ত ছাদে ওঠাই হয় না। ভাড়াটেরাই ভোগ করে। তারা দোতলায় থাকে। কোন বাধা নেই তাদের। ওদের আসতে হয় ভাড়াটে পেরিয়ে, দিনের বেলা আসতে তাই ভাল লাগে না। মা কিছু শুকোতে দিতে বা বড়ি দিতে ওঠেন বটে মধ্যে মধ্যে—পূর্ণিমা কিন্তু কখনও-কোনদিন এলে রাত্রেই আসে! ভাড়াটেরা তাদের সিঁড়ির দোর বন্ধ করলে সিঁড়িটা আলাদাই হ'য়ে যায়।

আ! ছাদটা যা নোংরা ক'রে রেখেছে। অর্ধেকটা ছাদ জুড়ে গুল দিয়েছে। আর একটু হ'লে গুলের ওপরই পা তুলে দিত পূর্ণিমা।

কোন মতে এক পাশ দিয়ে আলসের ধারে এসে দাঁড়াল সে। পাড়ায় অধিকাংশ আলোই নিভে এসেছে। রাস্তার আলো শহরতলীর গাছ-পালা ছাপিয়ে ওপরে ওঠে না। অল্প একটা আবছা আলো মাত্র আছে—সেটা কতটা পথের আলোর প্রতিফলন আর কতটা নক্ষত্রর, তা ঠিক ক'রে বলা কঠিন।

তবু—ভারী আরাম বোধহয় পূর্ণিমার। ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস আর এই অন্ধকার। তার চেয়েও বড় কথা এই নিঃসঙ্গ অবসর--এইটেই যেন পরম উপভোগ্য।

একটু আগেকার কথাগুলো মনে পড়ল—এলোমেলো ভাবনার মধ্যে। বোনের কথা, নিজের কথা, মা'র কথা। আর—আর বিমলের কথাও।

ভাবতে ভাবতে মন ঘুরে ফিরে পেঁছিল বিমলের কাছেই।

ক-দিন আগেই ত সে বলছিল।

বলছিল, 'এই ত শিক্ষা পায় আমাদের দেশের মেয়েরা। লেখাপড়া শেখার অহঙ্কারে রান্নাভাঁড়ারের ত্রি-সীমানায় ঘেঁষে না—সংসারের খবর রাখা যেন স্কুল-কলেজের মেয়েদের কাছে বড় লজ্জার। অথচ সব কাজ এড়িয়ে যে শিক্ষা হয় তার কি মূল্য, তা ত কার্যক্ষেত্রে এসেই বোঝা যায়। আফিসের কাজেরও কি কোন যোগ্যতা অর্জন করে মেয়েরা? একটুও না। তাছাড়া—এই অযোগ্যতা বুঝেই হোক বা নিশ্চিন্ত-নিরাপদে পরের পয়সায় ব'সে খাওয়ার লোভেই হোক, অধিকাংশ মেয়েরই মন ঝুঁকে থাকে বিয়ের দিকে। আর বিয়ের পর ক-টা মেয়ে চাকরি রাখে তাও ত দেখতেই পাচ্ছেন!'

জয়ন্তী বাধা দিয়ে বলেছিল, 'কেন অণিমাদি, গীতাদি, এরা?'

বাঁ-হাতটা তুলে থামাবার ইঙ্গিত ক'রে বিমল উত্তর দিয়েছিল, 'আপনাদের অণিমাদি বিয়ের পরে চাকরীতে ঢুকেছেন, সংসারের টানাটানি দেখে। আর গীতা ঘোষের ট্রাজেডি ত জানেনই। স্পোর্টস্‌ম্যান্‌ স্বামী খেলায় পা ভেঙ্গে এল বিয়ের এক মাসের মধ্যে। তখন উনি ছুটি নিয়ে বসে ছিলেন, চাকরি

ছেড়ে দেবার ভূমিকা হিসেবে। স্বামীর পা ফ্ল্যাম্পুট্ ক'রে বাদ দিতে হ'ল দেখেই না ছুটির পর আবার উনি অফিসে এসে ঢুকলেন!... না মিস্ চৌধুরী, বিবাহিতা মেয়েরা দায়ে না প'ড়ে চাকরি করে খুব কম। শতকরা দুজন হবে কিনা সন্দেহ।...নেহাৎ খুব ভাল চাকরি হ'লে টিকে থাকে। কিংবা যেসব মহিলারা বুড়ো বয়সে বিয়ে করেন তাঁরা থাকেন। কারণ তখন চাকরিটা হ্যাবিট্ হয়ে যায়। অথচ দেখুন এই যে এঁরা বিয়ে করেন, কী শিক্ষা নিয়ে এঁরা ঘর করতে যান? না জানেন গৃহস্থালী গুছোতে, না জানেন হিসেব ক'রে চার দিকে চোখ রেখে সংসার করতে—না শেখেন ছেলে মানুষ করতে। মাপ করবেন আপনারা—স্বামী বিবাহ না ক'রে রক্ষিতার কাছে গেলে যেটুকু পেতেন ততটা যত্নও পান না স্ত্রীর কাছ থেকে। কারণ তাদের পুরুষকে ধ'রে রাখতে হয় চেষ্টা ক'রে, সেখানে শৈথিল্য করলে চলে না। এঁরা সে দায়ে নিশ্চিন্ত! পাঁচসিকে জোড়ার ফুলের মালার বাঁধন ছিঁড়ে যাবার জো কি? অন্তত ভদ্রসমাজে! Home, Sweet Home কী শুধু ইংরেজেরই স্বপ্ন? পৃথিবীর সব পুরুষেরই স্বপ্ন-কল্পনা হ'ল শান্তি ও আরামের একটি নীড়—ধরণীর এককোণে cosy corner একটি। কিন্তু দিনের পর দিন দেখছি সে স্বপ্ন কী নিষ্ঠুর ভাবেই না ভেঙ্গে যাচ্ছে! কারণ যাদের দিয়ে ঘর বাঁধার কথা—তাঁরা আজ আর গৃহিনী নন, তাঁরা আজ শুধু—।'

আর বলতে পারে নি বিমল। হয়ত শব্দ খুঁজে পায় নি বলেই।

সেদিন ওরা সবাই রাগ করেছিল। জয়ন্তী বিমল সম্বন্ধে আড়ালে মন্তব্য করেছিল 'Brute!' কিন্তু আজ পূর্ণিমার মনে হ'ল যে হয়ত বিমলের কথাই ঠিক। ওর বোন যে কাণ্ড করলে সেটাকে ছেলেমানুষের আনাড়ীত্ব ব'লে উড়িয়ে দিলেও নিজের ভেতরই যে বিমলের উক্তির সমর্থন পাচ্ছে। মা ওর প্রতি কাজে খুঁত ধরেন ব'লে এতকাল ও রাগ করত কিন্তু আজ মনে মনে স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে তিনি মিছে কথা বলেন না। মা যে ত্রুটিগুলো দেখান সেগুলো সত্যিকারের ত্রুটিই। সেগুলো না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।...

ঠাণ্ডা বাতাসে ওর সমস্ত শরীর যেন একটা তন্দ্রার শৈথিল্য লাগে। দেহের সঙ্গে চিন্তাও আসে শিথিল হয়ে, খেই হারিয়ে যায় ভাবনার। তখন কী ক'রে যেন মনটা ব্যক্তি ছেড়ে ব্যক্তিতে এসে পৌঁছয়। মনে হয় অদ্ভুত মানুষ। আজও যেন তল পাওয়া গেল না লোকটার।

অথচ—অথচ—কেন কে জানে কী একটা অজ্ঞাত আকর্ষণও অনুভব করে সে—দিনেরাতের নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার বার বিমলের কথাটাই মনে পড়ে।

যেন এক প্রচণ্ড বিক্ষোভ সর্বদা ওর ভেতরে জ্বলছে, সামান্য মাত্র আঘাতেই সে আগুন বেরিয়ে আসে বার বার। তার ঝাঁজ এক এক সময় অসহ্য লাগে। তবু কৌতূহল থেকেই যায় লোকটার সম্বন্ধে। আগুনের আস্বাদেও লোভ হয় বুঝি। কে জানে কোন মেয়ে কোনদিন ওকে সুখী

করতে পারবে কি না !···সেই মেয়ের জায়গায় কোন্ এক দুর্বল মুহূর্তে নিজেকেই কল্পনা ক'রে বসে সে। তারপর চমক্ ভেঙ্গে নিজেই লজ্জিত হয়—বুঝি বা সেই অন্ধকারেই রাঙা হ'য়ে ওঠে।

রাত গভীর হ'য়ে এসেছে। শহরের কলরব কখন একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে গেছে তা সে লক্ষ্য করে নি।

তাড়াতাড়ি নিচে নেমে যায় পূর্ণিমা।

॥ ১৩ ॥

সে কী একটা ছুটির দিন। খবরের কাগজ শেষ ক'রে বিমল ব'সে কি-যেন ভাবছিল—পুলক এসে বললে, 'আমাকে এই অঙ্কটা একটু বুঝিয়ে দেবেন বিমল দা ?"

অঙ্ক ! পুলক অঙ্ক শিখবে !

বিমল ত অবাক ! বেশ খানিকক্ষণ হতভম্ব হ'য়ে চেয়ে ছিল বিমল ওর মুখের দিকে।

সে চাহনির অর্থ বুঝতে পুলকের দেরি হয় নি। ওর সুগৌর মুখখানা লাল হ'য়ে উঠেছিল লজ্জায়। মাথা নিচু ক'রে বলেছিল, আমি এখন একটু একটু পড়াশুনা করছি বিমলদা। দেখলুম অন্তত আঁকাটা একটু ভাল ক'রে না জানলে কিছুতেই কাজে উন্নতি হবে না।'

'তুই কি পরীক্ষা দিবি ?' অনেকক্ষণ পরে কণ্ঠস্বর খুঁজে পেয়েছিল বিমল।

'দেখি সে পরের কথা। কিন্তু অঙ্কটা ভাল ক'রে শিখতেই হবে।'

তবুও বিমলের বিস্ময় সেদিন সহজে কাটে নি। কাটবার কথাও নয়।

পুলকরা ওদের বাড়ীতেই দুখানা ঘরে ভাড়া থাক্‌ত। পুলকের বাবার বেশী বয়স নয় কিন্তু অল্পবয়সে বিয়ে হওয়ায় অনেকগুলি ছেলেমেয়ে হ'য়ে গেছে। বিরাট সংসার, আয় কম—অধিকাংশ নিম্ন-মধ্যবিত্তের যে অবস্থা। তার ওপর ওর বাবা অভিলাষ বাবু একেবারেই লেখাপড়া শেখেন নি—ব্যাঙ্কে চাকরী করলেও কাজটা উঁচুদরের নয়।

অভিলাষ বাবু নিজে লেখাপড়া শেখেন নি বলেই বোধ হয় ছেলেকে শেখাবার জন্য প্রাণান্ত করেছিলেন। অভিলাষ বাবুর বড় সম্বন্ধী মোটা মাইনের চাকরী করেন—তিনি মাঝে মাঝে কিছু পাঠান ভাগ্নে-ভাগ্নার লেখা-পড়া বাবদ, ভদ্রলোক শত অভাবেও সে টাকা কখনও ছোঁন্ না। ওটা ওদের লেখাপড়ার জন্যই খরচ হয়। দুঃখের কথা এই যে—বড় ছেলে পুলকটি একেবারেই সেদিন গেল না। ওধারে ধর-পাকড় ক'রে কোনমতে ক্লাস-প্রোমোশন পাচ্ছিল, ক্লাস এইট্-এ এসে একেবারে আট্‌কে গেল। হেড্

মাষ্টার বললেন, 'নাইন মানে ম্যাট্রিক ক্লাস, এখানে আমি একটু দেখে শুনেই তুলব।'

প্রথমবার ফেল ক'রে সুবোধ বালকের মত ঐ ক্লাসেই টিকে ছিল আর এক বছর। আরও একবার যখন আটকাল তখন সহজেই আশা করেছিল যে এইবার তার এ যন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি মিলবে। কিন্তু অভিলাষ বাবু সে ধার দিয়েই গেলেন না। তিনি কড়া হুকুম জারি করলেন, 'লেখাপড়া ছাড়তে আমি দেব না। ইস্কুল ছেড়ে দাগা-ষাঁড় হ'য়ে ঘুরে বেড়ানো চলবে না। ফের পড়ো একবছর!'

মা ছেলের শুকনো মুখ দেখে প্রস্তাব করলেন, 'অন্য ইস্কুলে দিলে হ'ত না? ওর সঙ্গীরা সব টপাটপ উঠে গেল আর ও—ঐ ইস্কুলেই থেকে গেল সেই এক কেলাসে। ওর লজ্জা করছে বোধ হয়!'

'অত লজ্জা যদি ত মন দিয়ে পড়লেই পারে। আজকাল ভাল ছেলেদেরই কোথাও ভর্তি করা যায় না—ফেল ছেলে কোথায় ভর্তি করব? তা ছাড়া আবার বাড়তি খরচা। ওসব হবে টবে না—।'

এর পর দুর্বুদ্ধিমান ছেলে-মাত্রই যা করে পুলকও তাই করলে। একদিন বাড়ী থেকে বাড়তি একটি হাফ প্যাণ্ট এবং পাঁচটি মাত্র টাকা সম্বল ক'রে পালাল।

মা হা-হুতাশ করলেন, কান্নাকাটি করলেন। কেউ কেউ পরামর্শ দিলেন খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে। অভিলাষ বাবু কিন্তু অটল, 'অত পয়সা কোথায় আমার? যা গুণের ছেলে তার জন্যে আবার বিজ্ঞাপন। পড়াশুনো করলে না, মানুষ হ'ল না—সে ছেলে ঘরে থেকেই বা কি হবে। পারে রোজগার ক'রে খাক গে।'

যাই হোক—অভিলাষ বাবুর আশা বা মা'র আশঙ্কা কোনটাই সফল হ'ল না। মাস-দশেক পরে পুলক আবার বাড়ীতে ফিরে এল। এর ভেতর কিন্তু ওর পরিবর্তন হয়েছে ঢের। ছেলেটা বরাবরই সুশ্রী। উজ্জ্বল গৌর বর্ণ এবং লম্বা ছিপছিপে চেহারা ছিল। এবার দেখা গেল যেন আরও ঢ্যাঙা হয়েছে এবং ক-মাসে কিছু মাংসও লেগেছে গায়ে। ফলে আগের চেয়েও সুন্দর দেখাচ্ছে। টেরী কাটতে দিতেন না অভিলাষ বাবু, এখন বিনা বাধায় য়্যালবার্ট শোভা পাচ্ছে মাথার আগে। হাফ প্যাণ্ট ছেড়ে পাজামা ধরেছে—সঙ্গে একটা স্যুটকেস এসেছে তাতে কিছু জামা কাপড়। অর্থাৎ কিছু যে রোজগার করেছে ইতিমধ্যে তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ইতিহাসটা কি? সবাই কৌতূহলী হ'য়ে ঘিরে ধরল। অভিলাষ বাবু আত্মসম্মানে আঘাত লাগবার ভয়ে নিজে কোন প্রশ্ন করলেন না বটে কিন্তু তাঁরও কান খাড়া রইল।

সব ছেলেরাই আজকাল যা স্বপ্ন দেখে—পুলকেরও সেই স্বপ্নই ছিল, চিত্রাভিনেতা হ'বার। বাংলার চেয়ে বোম্বের বাজার ভাল—এ খবরটা সে পেয়েছিল সকলকার কাছেই। সুতরাং সোজা হাওড়াতে গিয়ে বোম্বের

গাড়ীতেই চেপে বসেছিল। সম্বল মোটে পাঁচ টাকা, কাজেই টিকিট নিয়ে মাথা ঘামানো সম্ভব ছিল না—ইচ্ছাও ছিল না বোধ হয়। বার দুই-তিন চেকারের হাতে ধরাও পড়েছিল, প্রায় বালক দেখে তাঁরা বিশেষ কিছুই বলেন নি, শুধু নামিয়ে দিয়েছিলেন। পুলকও আবার অন্যদিক দিয়ে ঘুরে গিয়ে অন্য কামরায় উঠেছিল। একবার শুধু নিজের একটু অন্যমনস্কতার ফলে একই চেকারের হাতে অল্পক্ষণের মধ্যে দু-বার ধরা প'ড়ে একটা গলাধাক্কা ও গাঁট্টা খেয়েছিল। কিন্তু সে কিছু নয়।

বোম্বে ত পৌঁছল। কোন জানাশুনো লোক নেই, কোন আশ্রয়ও নেই। দুটোতিনটে দিন সম্পূর্ণ পথে পথেই কাট্‌ল। সামান্য কিছু জলযোগ ক'রে নেয় আর টো টো ক'রে ঘোরে।

কিন্তু কোথায় সেই স্বপ্নে-দেখা সুখ-স্বর্গ? সে যে এত সুদূর, সেখানের গণ্ডী পার হওয়া যে এত কঠিন তা ত কেউ তাকে বলে দেয় নি। প্রথমত ঢোকা যায় না—যদি বা লুকিয়ে চুরিয়ে কৌশল ক'রে ঢোকে—বেরিয়ে আসতে হয় অল্পক্ষণ পরেই। অবাঙ্গালীরা হাসে, বাঙ্গালী যাঁরা আছেন তাঁরা ধমক দেন, '—বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছ নিশ্চয়! আঃ—তোমাদের জন্যে আমাদের মাথা কাটা যায় এখানে। সরে পড়ো দিকি সোজা—বাড়ী গিয়ে পড়াশুনো করোগে।'

অনেক কান্নাকাটি ক'রেও সে স্টুডিওতে একটা ঝাড়ুদারীর চাকরীও জোগাড় করতে পারলে না। অনেকদিন আগেকার এক পাঠ্যপুস্তকে মাইকেল ফ্যারাডের কাহিনী পড়েছিল সে—ল্যাবরেটরীতে চাকরের কাজ চেয়েছিলেন ভদ্রলোক। সেটা মনে ছিল পুলকের। সে-ও এবার সর্বত্র সেই কাজই চেয়ে চেয়ে বেড়াতে লাগল কিন্তু তাও যে এত দুর্লভ তা কে জানত!

অবশেষে পাঁচটাকার পুঁজি যখন পাঁচ আনায় এসে ঠেকল তখন সে কাজ পেলে এক রেস্তোরাঁয়। অপরিচিত ছেলের পক্ষে বাসন মাজার কাজও আজকাল পাওয়া কঠিন—নেহাৎ ওর সুশ্রী চেহারা দেখেই গুজরাটি মালিক দয়ার্দ্র হয়ে কাজটা দিলেন, বেশ একটু ঝুঁকি নিয়েই। কাপ-ডিস্ ধোয়ার কাজ—তা হোক্, মাথার উপর একটু ছাদ এবং নিয়মিত দুবেলা আহারের জন্য যে কোন কাজই ওর কাছে তখন লোভনীয়।

সেখানেই মাস পাঁচেক ছিল পুলক। না, চুরি বা বেইমানী সে করে নি কোন রকম। ভবিষ্যতে তার মত কোন অসহায় বাঙ্গালী ছেলের এই ধরণের আশ্রয় পাবার সম্ভাবনা সে তার ব্যবহারের দ্বারা নষ্ট ক'রে যাবে না, এটা সে আগে থেকেই ঠিক করেছিল। সে হয়ত চুরি ক'রে নিরাপদে পালিয়ে যেতে পারবে কিন্তু তারপর কি আর কেউ আশ্রয় দেবে এমনি কোন অপরিচিত ছেলেকে?

এই পাঁচ মাস সে অবসর পেলেই চেষ্টা করেছে স্টুডিওতে চাকরি পাবার। কিন্তু তারপর একটু একটু ক'রে স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে তার। রেস্তোরাঁয় বিস্তর লোক আসে যায়—এর ভেতর সে ওখানকার স্থানীয় ভাষাও আয়ত্ত ক'রে

ফেলেছিল—তাদের কথাবার্তায় সে স্টুডিওর ভেতরের হালচাল কিছু কিছু জেনেছিল। তারপর আর লোভ হয় নি সেখানে চাকরি করতে যাবার। বাড়ীই ফিরবে সে, কিন্তু তার আগে দেশটা একটু ঘুরে একবার দেখে যেতে দোষ কি? আর কি সুযোগ মিলবে?

ওখানকার কাজ ছেড়ে সে গিয়েছিল দিল্লী, সেখান থেকে আগ্রা, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কাশী। দিল্লীতে গিয়েও এক রেস্তোরাঁতে কাজ পেয়েছিল সে। এবার রাঁধুনীর কাজ—চপ কাটলেট ভাজতে শিখেছিল সে বোম্বাইতে থাকতেই। আসবার সময় গুজরাটী মনিবের কাছ থেকে একটা সার্টিফিকেট নিতেও ভুল করে নি—তাই দিল্লীতে পেঁছেই সে কাজ পেয়েছিল। ওখানে মাস কতক কাজ ক'রে সেই জমানো টাকায় বাকী শহরগুলো ঘুরে আবার কলকাতাতেই ফিরে এসেছে। যদি সামান্য কাজ ক'রেই খেতে হয় ত দেশে এসেই করবে। একা নির্বান্ধব অবস্থায় পড়ে থেকে লাভ কি?

এই হ'ল ওর অজ্ঞাতবাসের মোটামুটি ইতিহাস।

অভিলাষবাবু এবার আর ভুল করেন নি। ওকে লেখাপড়া শেখাবার বৃথা চেষ্টা না ক'রে কাকে কাকে ধরে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন এক কারখানাতে।

'বামুনের ঘরের গরু—লেখাপড়া শিখলি না—যা লোহা পিটগে যা। কামারের কাজ করতেই ভগবান তোকে পাঠিয়েছেন, তা আমি করব কি!'

এই কথা বলে অভিলাষবাবু নিশ্চিন্ত হলেন।

পুলকের লেখাপড়া হয়নি মন ছিল না ব'লে। নইলে নির্বোধ সে একেবারেই নয়। কয়েকমাস কারখানায় কাজ ক'রেই বুঝল যে সামান্য একটু লেখাপড়া না জানা থাকলে সেখানেও উন্নতি করার কোন সম্ভাবনাই নেই। চারদিনই তাকে সাধারণ মিস্ত্রি হ'য়ে থাকতে হবে, অশিক্ষিত অর্ধবর্বর কতকগুলি লোকের সঙ্গে।

সেটা বোঝামাত্রই কিছু কাগজ কিনে নিয়ে পুলক অঙ্ক কষতে লেগে গেল। যতদিনেই হোক—উন্নতি সে করবেই। ফোরম্যান-সুপারভাইজার না হ'তে পারা পর্যন্ত সে থামবে না।

পুলকের বক্তব্য শেষ হ'তে বিমল বিস্মিত হ'য়ে বললে, 'কিন্তু তোমার কাজে যা লাগবে তা ত এই সাধারণ অঙ্ক নয়। ততদূর পর্যন্ত পেঁছতে গেলে তোমাকে অন্য পড়াশুনাও কিছু কিছু করতে হবে।'

'তাও করব বিমলদা। যখন যা দরকার হবে তাই পড়ে নেব। আমি ওভারটাইম নেওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছি। কারখানা থেকে ফিরে এসেই বই খাতা নিয়ে বসি—রাত দশটা পর্যন্ত পড়াশুনো করি। খেলাধুলো বেড়ানো সবই ছেড়েছি। আপনি যদি ব'লে দেন যে কী ধরণের পড়াশুনো দরকার হবে ত এখন থেকেই শুরু করি।'

খুশী হয়েছিল বিমল। শিখিয়েছিল যত্ন ক'রেই। তবু এতটা উন্নতির জন্য সে প্রস্তুত ছিল না। পুলক যেন লাফিয়ে লাফিয়ে চলল। যে বীজ-

গণিত কিছুতেই তার মাথায় ঢোকে নি ইস্কুলে পড়ার সময়, সেই বীজগণিতের অঙ্ক একবার দেখিয়ে দেবার পর এক-এক রাতে পঞ্চাশ ষাট্টা ক'রে কষে ফেলত। শিগ্গিরই অর্থাৎ বছর খানেকের মধ্যেই এমন সময় এল যে বিমলের বিদ্যায় আর কুলোয় না। এর পর বিজ্ঞান-জানাছাত্রের দরকার। শুধু তাই নয়, পুলক চায় কিছু কিছু ফিজিক্স্ বা পদার্থ বিজ্ঞান পড়তে। কিন্তু তার জন্য একটু ইংরেজী জানা দরকার।

পুলক অধীর আগ্রহে শুধু বলে, 'আমাকে বলুন শুধু কি করতে হবে—আমি গাধার মত খাট্তে রাজি আছি। বলেন ত গোটা ডিক্সনারীটাই মুখস্থ ক'রে ফেলব!'

গাধার মত নয়—ভূতের মতই খাট্তে পারে সে।

ইংরেজী শেখবার সোজা রাস্তা হিসেবে বিমল তাকে একদিন ব'লে দিয়েছিল, ইংরেজী দৈনিকগুলো থেকে সম্পাদকীয় প্রবন্ধ বাংলায় অনুবাদ ক'রে তাকে দেখিয়ে সেই বাংলা থেকে ইংরেজী অনুবাদ ক'রে আসলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে। তার ফলে ওরই প্রাণান্ত। প্রতিদিনকার কাগজ থেকে দুটি ক'রে অন্তত বিরাট সম্পাদকীয় প্রবন্ধ অনুবাদ ক'রে রাখত। সেটা মিলিয়ে দেখতেই বিমলের দেড়ঘণ্টা দু-ঘণ্টা সময় লেগে যেত। প্রথম প্রথম খুবই হাস্যকর ভুল হ'ত কিন্তু শিগগিরই ভুল কমে এল। কিছুদিন পরে দেখা গেল যে দু একটি শক্ত বাক্যাংশ ছাড়া মোটামুটি ঠিকই বুঝেছে সে। তখন বিমল হাঁফ্ ছেড়ে বাঁচল। ওকে বললে, 'বাংলা আর আমাকে দেখাতে হবে না পুলক। বাংলা ক'রে তুমি তা থেকে সঙ্গে সঙ্গেই ইংরিজী ক'রে ফেলো—তাহ'লেই হবে।'

এর কিছুদিন পরে ওকে স্বাধীনভাবে একটি রচনা লিখতে দিয়ে আবার চমকে উঠ্ল সে—বানান ও ব্যাকরণ-গত ভুল দশ বারোটার বেশি চোখে পড়ল না! ক্লাস টেন্-এর ফার্স্ট সেকেণ্ড ছেলের কাছে ছাড়া এমন লেখা আশা করা যায় না। তাও ত তাদের মুখস্থ লেখা!

খুশি হ'ল যেমন, চিন্তিতও হ'ল। একদিন প্রকাশ্যেই বল্লে বিমল, 'পুলক ভাই, আমার বিদ্যেতে ত আর কুলোচ্ছে না। এবার ভাল বিজ্ঞান-জানা ছাত্রের কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু কে-ই বা বেগার দেবে তাও ত বুঝতে পারছি না!'

পুলক খুবই দমে গেল। ওর মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল একেবারে। কারণ ইতিমধ্যে ও নতুন করে ভূগোল ও ইতিহাস পড়তে শুরু করেছে, ম্যাট্রিক পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে, সে খবর বিমল পেয়েছিল অনেকদিনই। উচ্চাশার নেশায় পেয়েছে পুলককে।

সে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে, 'বিমলদা, ওভার-টাইম ত করি না—নইলে মাইনে দিতে পারতুম। ওভার-টাইম নিলে আর পড়বার সময় পাবো না।...আচ্ছা, এমন কাউকে ধরতে পারেন না, যাকে এখন কিছু সামান্য টাকা দিলে চলে? পরে আমি তাঁর যোগ্য মাইনের টাকাই কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়ে দেব।...আমাকে বিশ্বাস করুন, আমি মারব না। কিন্তু এখন—সামান্য টাকা

নিতে গেলেই বাবা গোলমাল করবেন—কারণ আমার আয়টা তিনি হিসেবের মধ্যে ধরতে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছেন।...তবু নিতেই হবে, যেমন ক'রে হোক। তবে সে ত ঠিক দেবার নয়। তাই বলতে লজ্জা করে।...পাওয়া যাবে না এমন কাউকে বিমলদা, যিনি আমাকে বিশ্বাস ক'রে অপেক্ষা করবেন?'

ওর বলবার করুণ ভঙ্গীতে বিমল বিচলিত হয়েছিল। ওকে কোলের ভেতর টেনে নিয়ে ওর মাথা নেড়ে আদর ক'রে বলেছিল, 'ওরে পাগল, লোক কি আমার বাক্সের মধ্যে লুকোন আছে যে বার ক'রে দেব! দেখছিস ত বাজার—লোকে হাঁড়ি চড়িয়ে তবে টিউশনী করতে যায়। দেখি একটু ভেবে, তবে আশা কম। তুই একলব্যের মতই মনে মনে গুরু রেখে তৈরী হ' ভাই!'

পুলক ছল-ছল চোখে জবাব দিলে, 'সে সাহস আমার আছে দাদা কিন্তু বড্ড যে দেরী হ'য়ে যাবে। আমার কারখানায় পরীক্ষা দেবার বয়স যে চলে যাবে!'

'আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি!'

'চেষ্টা ক'রে দেখব' এমনি আশ্বাস মুখে দিলেও মনে মনে কোন উপায়ই খুঁজে পায় না বিমল। অথচ পুলক ওর সেই প্রায়-স্তোক-বাক্যের ওপরই যে কতটা ভরসা ক'রে রইল তাও সে বুঝতে পারে। সেই জন্যই বলতে গেলে সারা-দিন কথাটা ওর মনের মধ্যে খচ্ খচ্ করতে লাগল। কারুর কথাই ওর মনে পড়ে না। কে এমন আদর্শবাদী আছে, যে এতখানি ত্যাগ স্বীকার করবে! ভবিষ্যতের আশা? পুলককে বিমল বিশ্বাস করলেও অপরে ততটা করবে কেন? তাছাড়া ভবিষ্যৎটা অনিশ্চিত, বর্তমানের অভাবটা ধ্রুব এবং নিশ্চিত।

সন্ধ্যার পর বিমল যখন নিখিলদের বাড়ী পৌঁছল তখনও কথাটা ওর মাথা থেকে যায় নি। সেখানে ঢুকতেই নিখিলের বাবার সঙ্গে দেখা। তিনি একটু ক্ষমা প্রার্থনার সুরে বললেন, 'নিখিলকে ওর মামা নিয়ে গেছেন জোর ক'রে—এখনই আসবে, দু'পাঁচ মিনিট বসবেন একটু অনুগ্রহ ক'রে?'

না ব'সে উপায়ও ছিল না বিমলের। এতটা হেঁটে এসে সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ওঁর সঙ্গে ওঁদের বাইরের ঘরে এসেই বসল। নিখিলের বাবা ভিতরে গিয়ে চায়ের ফরমাশ দিয়ে এলেন। চা খেতে খেতে নানা প্রসঙ্গ উঠল। ফলে, আজকে যে কথাটা বিমলের মনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী জুড়ে রয়েছে, সেই কথাটাই উঠে পড়ল। বিমল বললে, 'একটি অদ্ভুত ছেলের কথা বলব আপনাকে। আপনি হয়ত বিশ্বাস করবেন না—কিন্তু সবটাই সত্যি!'

এই বলে সে পুলকের কাহিনী আদ্যোপান্ত শোনালে তাঁকে সব। মায় আজকের কথাটা সুদ্ধ শেষ ক'রে বললে, 'বিশ্বাস হয় আপনার?'

সত্যশরণ বাবু কিন্তু কিছুমাত্র বিস্মিত হলেন না, বললেন, 'ও কি বলছেন, তবে শুনুন আর একজনের কথা। আমার এক বন্ধুর দাদা সুশীল গুপ্ত,

এখন উত্তর কলকাতার খুব বড় ডাক্তার, দিনেরাতে নাইবার-খাবার সময় নেই, চারটে ডাক্তার য়্যাসিস্ট্যান্ট। কিন্তু আমি ত ছেলেবেলা থেকে দেখছি, ইস্কুলে একেবারে গবেট ছাত্র ছিল। তখনকার দিনে ত মশাই বিজ্ঞান ফিজ্ঞান ছিল না—যা করে অংক, বড় জোর মেকানিক্‌স্। অংকে ভাল মাথা ছিল ওর—কিন্তু ঐ পর্যন্ত। বাংলায় পেত কেঁদে-ককিয়ে তিরিশ, আর ইংরেজিতে তের চোদ্দ। ওর বাবা দুটো মাস্টার রেখেছিলেন, তারা হিম সিম খেয়ে যেত। আমার বন্ধুর বাবা দুঃখ ক'রে বলতেন, আর সব ছেলেগুলো তবু সকাল-সন্ধ্যে দু'মুঠো খেতে পাবে—এইটেই হ'ল একেবারে বাঁদর। ওর আর কিছু হবে না।…ও মশাই, কোনমতে ত অংক আর মেকানিক্‌স্-এর জোরে ম্যাট্রিকটা সেকেন্ড ডিভিসনে পাশ করলে; ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে একেবারে ফার্স্ট ডিভিসন, সায়ান্স আর অংক তিনটে সাবজেক্টেই লেটার! ঢুকলো মেডিকেল কলেজে—ব্যস্ চড়চড় ক'রে উন্নতি, কোন পরীক্ষায় ফেল করে নি কখনও, ফাইন্যালে গিয়ে মেডিসিন আর একটা কিসে যেন ফার্স্ট হয়ে বেরোল। ওর মাথা বিজ্ঞানের দিকে, তাকে নর-নরৌ-নরাঃ মুখস্থ করালে চলবে কেন বলুন!—আপনার এই ছেলেটি দেখবেন এর পর উন্নতি করবে!'

'তা ঠিক।' বিমলও স্বীকার করে, 'আমিও ত এই কথা বলি, জোর ক'রে গেলাতে গেলে ভাল জিনিসও বিস্বাদ লাগে। নিজে থেকে প্রয়োজন বুঝে এগোলে কত সুবিধে হয়।'

কিন্তু তাতে আসল সমস্যার কোন মীমাংসাই হয় না। আরও খানিকটা গল্প ক'রে বিমল উঠে পড়ে। নিখিল তখনও পেঁছয় নি। সত্যশরণ বাবু লজ্জিত হয়ে বার বার ক্ষমা প্রার্থনা করেন, 'দেখুন ত এ কী কান্ড! আমার সম্বন্ধী এধারে এত রেস্‌পন্‌সিবিলিটির গর্ব করেন, অথচ দেখুন নিজের বেলায় কোন কান্ডজ্ঞান থাকে না। বার বার বলে দিলুম, মাষ্টার মশাই এত কষ্ট ক'রে আসবেন—। আগে থাক্‌তে বলা থাক্‌লেও না হয় কথা ছিল। ছি ছি, আপনার কাছে বড় অপরাধী হয়ে রইলুম!'

'না-না, তাতে আর কি হয়েছে' ব'লে বিমল উঠে পড়ে, 'তবু ত আপনার সঙ্গে খানিক গল্প করা গেল, এটুকু ত হ'ত না। যাক্—কাল শনিবার আছে, নিজে নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে'খন নিখিল। আচ্ছা আসি। নমস্কার!'

॥ ১৪ ॥

পথে বেরিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে হাঁটছিল বিমল। পুলকের সমস্যাটাই মনে মনে ভাবছিল ব'লে, গতিও একটু মন্থর হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ কাঁধে একটা ভারী হাতের চাপড় খেয়ে চমকে ফিরে দেখলে—অপরিচিত একটি যুবক, প্রায় তারই সমবয়সী, মিশ-কালো রং, বেশ জোয়ান গোছের চেহারা। অতিশয়

ময়লা একটা লং-ক্লথের পাঞ্জাবী পরা, হাতে একটা সিগারেট, ওর দিকে চেয়ে মুচকি মুচকি হাসছে।

হাসিটা দেখে চিনতে পারল, শিশির ভাদুড়ীর মত অনেকখানি বিস্তৃত নিঃশব্দ হাসি। এটা অনেক কষ্টে আয়ত্ত করেছিল মণি, স্কুলে পড়বার সময়ই।

মণি, ওদের সহপাঠী মণি ঘোষ।

'চিনতে পেরেছিস তাহ'লে। চল ঐ পার্কে গিয়ে বসি একটু। কতকাল পরে দেখা বলত!'

ওর চোখের চাউনিতে বিহ্বলতা কেটে গিয়ে বিস্ময় ফুটে ওঠা দেখেই মণি বুঝতে পারে যে বিমল তাকে চিনতে পেরেছে। আগের মতই তীক্ষ্ণধী আছে মণি! ছেলেবেলায় কোন কথা ওকে মুখে বলতে হ'ত না। মুখ দেখে অনুমান করত।

'উঃ সত্যিই রে মণি, কতকাল পরে বলত। চল্ চল্ বসি গে কোথাও।'

পার্কে গিয়ে খুঁজে খুঁজে বেঞ্চি পাওয়া যায় না, অগত্যা ঘাসের ওপরই বসে দুজন। মণি বলে, 'তারপর?'

ঠিক বিদ্যুৎ বেগেই কথাটা মাথায় খেলে যায় বিমলের।

এ হয়ত ঈশ্বরেরই নির্দেশ। নইলে আট ন' বছর পরে মণির সঙ্গেই বা এমন অভাবনীয় ভাবে দেখা হবে কেন?

মণি বিজ্ঞানের ছাত্র এবং বেশ ভাল ছাত্র। আই. এস-সিতে একটা স্কলারশিপ পেয়েছিল। বি. এস-সিতে অনার্স ছিল, যদিও ফার্স্ট ক্লাস পায় নি। পায় নি তার চরম দারিদ্র্যের জন্যই। সকালে কলেজে আসত, ল্যাবরেটরীর কাজ সেরে বেরোতে সাতটা সাড়ে-সাতটা—তারও পরে টিউশনী ক'রে বাড়ী ফিরতে কোনদিন সাড়ে নটা, কোনদিন দশটা হয়ে যেত। এর ভেতর শুধু জল ছাড়া আর কিছুই জুটত না। একদিন ক্ষিদেতে মাথা ঘুরে গিয়েছিল—ল্যাবোরেটরীর মধ্যেই। সেদিন প্রোফেসার ব্যাপারটা বুঝতে পেরে খুব তিরস্কার করেন। বলেন, 'এই দীর্ঘ সময় উপবাসী থাকলে কখনই ভাল কাজ করতে পারবে না। শরীরটা ভেঙ্গে যাবে। অবশ্যই কিছু খাবার ব্যবস্থা করবে। যা হোক—অন্তত চাট্টি মুড়িও।'

কিন্তু চাট্টি মুড়ি খাবার পয়সাও ওর ছিল না। সেটা তাঁকে বলাতে তিনিই একটা বেশী মাইনের টিউশনী ওকে যোগাড় ক'রে দেন। একটি স্কুলের ছাত্র—সত্তর টাকা। তাতে অবশ্য সামান্য জল খাবারের ব্যবস্থা ক'রে নিতে পেরেছিল—কিন্তু তবু পরীক্ষার ফল ভাল হয় নি, টিউশনী ক'রে, ঘর সংসারের বাজার-হাট ক'রে ফার্স্ট ক্লাস অনার্স পাওয়া শক্ত। মণিদের দারিদ্র্য বিমলের চেয়েও বেশী—সমস্ত কলেজ-জীবনে ওর বাইরে বেরোবার একাধিক কাপড় ছিল না। সেজন্য কোন রবিবার কোথাও বেরোতে পারত না। সাবান দিয়ে কাপড়-জামা কেচে—সারাদিন বাড়ীতে বসে থাকতে হ'ত।

বর্ষাকালে আরও দুর্ভোগ। নিবন্ত উনুনের ধারে দাঁড়িয়ে নেড়ে নেড়ে শুকোতে হ'ত।

এর পর আর এম. এস-সি পড়া হয় নি। টিউশনী ক'রে সংসার চালিয়ে পড়া—এই রকমই ফল হবে! তাছাড়া সংসারের অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। বাবা অশক্ত, মা পক্ষাঘাতে পঙ্গু। ছোট ছোট ভাই বোন। বাবা তাঁর শেষ ধুলি-গুঁড়ি ঝেড়ে ওর বড় বোনের বিয়ে দিয়েছিলেন. সে বিধবা হয়ে এসে উঠল তিনটি ছেলেমেয়ে নিয়ে। স্বামী অফিসের তহবিল তছরূপ করেছিলেন—ফলে একদা তাঁকে গলায় দড়ি দিতে হয়। একটি পয়সাও ছিল না সঞ্চয়—যা ওর গায়ের গয়না কটা। দেশে কোথায় জঙ্গলের মধ্যে ভাগের বাড়ী আছে, ওর বোন দেখেও নি। শ্বশুর এবং দেওর স্রেফ্ সব দায়িত্ব ঝেড়ে ফেলে দিলে!

সুতরাং মণিকে চাকরী নিতে হ'ল। দেরি করার সময় ছিল না! পাড়ার এই ইস্কুলে বিজ্ঞান শিক্ষকের চাকরী পেয়ে বেঁচে গেল। যুদ্ধের শেষের দিক সেটা—সরকারী চাকরীতে ছাঁটাইয়ের সময়। স্বাধীনতা পাবার পর হয়তো খোঁজ করলে সরকারী চাকরী পাওয়া যেত। কিন্তু তিনটে টিউশনী ও মাষ্টারী ক'রে উদ্যম থাকে না। দেখতে দেখতে বয়সও চলে গেল।

আগের দিকের খবর কতক বিমলের শোনা ছিল। শেষের দিকের খবর-গুলো সংক্ষেপে দিয়ে মণি বললে, 'তোর কথা বল এবার!'

'আমার কথা? তথৈচ!' ম্লান হেসে বিমল বললে, 'সাধারণ সরকারী চাকরীতেই ঢুক্‌লেই বা এমন কি রাজা হতিস? আমি ত ঢুকেছি। চারটে হাত বেরিয়েছে? প্রস্‌পেক্টই বা এমন কি? সেই ত টিউশনী করতে হচ্ছে, আর হবেও। তার চেয়ে এ বরং ভাল আছিস। অখণ্ড অবসর। বছরে চার মাস ছুটি বলতে গেলে।'

মণি যেন মুহূর্তে জ্বলে ওঠে, 'বলিস্ নি! বলিস্ নি! হেলিশ!'

'হেলিশ বলছিস কেন?' একটু যেন আহত হয় বিমল, হাজার হোক 'ছোট ছোট ছেলেদের সঙ্গ, তার একটা আনন্দ আছে ত!'

'You are a fool!' যেন ঝেঁঝে ওঠে মণি, 'সেইটেই ত বেশী হেলিশ। mischievous imps—যত সব! এত রকমের বজ্জাতি আর বদমাইসি জানে ওরা যে তা সব লিখতে গেলে একটা পুরো এনসাইক্লোপিডিয়াতেও কুলোবে না। ওদের সাহচর্যে আনন্দ! তুই বলিস কি? ছোট ছোট ছেলেপুলে দেখলে আমার গায়ে জ্বর দেয়! দুচোক্ষে দেখতে পারি না ওগুলোকে!··· ওটা তোদের একটা ফ্যাশন। যীশুখ্রীষ্টের বাপ-মা ভোলাবার চাল—তাই থেকে যত রাজনীতিকরা ঐটে নিয়েছে। শুনেছি বিলেতে ইলেক্‌শনের আগে যে ক্যান্ডিডেটের বৌ যত বেশী ছোট ছোট বাচ্চাদের চুমো খেতে পারে তার ইলেকশনু জেতবার তত চান্‌স। ও তুই নেহেরুই বলিস আর গান্ধীই বলিস—সকলকারই ওটা লোক-ভুলানো চাল। কেউ যে ঐ শয়তানগুলোকে সত্যিই ভালবাসতে পারে, তা আমি আদৌ বিশ্বাস করি না!'

চুপ ক'রে থাকে বিমল। কিছুক্ষণ পরে আস্তে আস্তে বলে, 'তাহ'লে তোর এ কাজ নেওয়া একেবারেই উচিত হয় নি মণি!'

'তা ত হয়ই নি! কিন্তু কি করব বল? সংসার যে ঘাড়ে চেপে আছে সেই সিন্ধুবাদ নাবিকের ঘাড়ের বোঝার মত। আসলে কি জানিস্—মাস্টারী কেরাণীগিরি, কোনটাই আমার ভাল লাগে না। আমার যা ট্যালেণ্ট, অভিনয়ে—সেদিকে যদি কোন একটা চান্‌স্ পেতুম রে!'

বলতে বলতেই বোধকরি কল্পনায় সেই সুখ-ছবি দেখে আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে মণির মুখ, সে কণ্ঠে একটু জোর দিয়েই বলে, 'একটা কোথাও যে-কোন রকমের চান্‌স্ পেলে আর আমি কোন সুপারিশের তোয়াক্কা করতুম না।...আছে নাকি তোর ও পাড়ায় কোন যোগাযোগ? বিস্তর ত ফিল্‌ম্ কোম্পানী হচ্ছে চারদিকে, কারুর সঙ্গে কোন আলাপ পরিচয় নেই?'

'তুই পাগল হয়েছিস? আমার মত লোকের সঙ্গে ঐ লাইনের যোগা-যোগ?'

'না—তা নয়। থাকতেও ত পারে। আত্মীয়তাসূত্রেও থাকে অনেক সময়—!'

উৎসাহ কতকটা নিভে আসে মণির। একটু থেমে আবার সে বলে, 'আমি সোজা গিয়েছিলুম দু একজনের কাছে। আমল দিতে চায় না। একজন খুব ভদ্র, তিনি বুঝিয়ে বললেন, 'দেখুন আপনার যা ফিগার আর ফেস্ কাটিং তা স্টেজে হয়ত চলে, ক্যামেরাতে চলবে না। মানে হিরো করা চলবে না আপনাকে। ছোট খাটো সাইড-রোল পেতে পারেন কিন্তু তাতে আজকাল সংসার চালানো শক্ত। আর কমিক পার্ট ত করেনও নি কখনও। সে কি পারবেন?...অগত্যা চলে এলুম। আমার প্রতিভা আমি দুশ তিনশ-ফুটের সাইড-রোলে নষ্ট করতে রাজী নই।...সত্যিই কি আমার দ্বারা হিরো সাজা চলবে না?

কণ্ঠে অনুনয়ই ফোটে মণির।

বিমল ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখে। কুচকুচে কালো রং—কিন্তু তাতে কিছু এসে যেত না, চোখ দুটোও অসম্ভব ছোট। ফিগারও ভাল না—একটু বেঁটে আর চৌকো গোছের। বলতে মায়া হ'ল কথাটা। সে চুপ করে রইল।

মণি আবার বললে, 'থিয়েটারে চলে। ভালই চলে। জানিস ত, শিশির ভাদুড়ী আর দানী বাবুর রোল সব একচেটে আমার। বহু অফিস ক্লাবের হয়ে প্লে ক'রে আসি পাবলিক বোর্ডে—সবাই ধন্য ধন্য করে। এর মধ্যে একদিন প্রায় হাতে পায়ে ধরে শিশির বাবুকেও দেখিয়েছিলুম—ওঁরই বোর্ডে প্লে ছিল একটা অফিসের, আমি সেজেছিলুম আলমগীর। উনি দেখে-শুনে বললেন, আপনার সত্যিই খুব ট্যালেণ্ট আছে। আমি নিতে পারি আমার দলে কিন্তু টাকা-কড়ি বিশেষ পাবেন বলে মনে হয় না। বুঝতেই ত পারছেন এখন স্টেজের অবস্থা—পয়সা সব ফিল্‌ম্ লাইনেই চলে গিয়েছে। ফিরে এসে ইস্কুলের সেক্রেটারীকে জিজ্ঞাসা করলুম, তিনি একেবারে সোজা

এম্‌ফ্যাটিক 'নো' বলে দিলেন। পাবলিক স্টেজে প্লে করলে অন্তত তাঁর ইস্কুলে মাস্টারী করা চলবে না।···কী করি বল। মাস্টারী আর টিউশনী মিলিয়ে যা আয় তাতেই সংসার চলে না—তার থেকেও যদি কম পাই ত চালাবো কি ক'রে ?'

বিমল একটুখানি চুপ ক'রে থেকে প্রশ্ন করলে, 'বিয়ে করেছিস বুঝি ?'

'পাগল হয়েছিস তুই ! বিধবা বোন—তার তিনটে ছেলেমেয়ে। এখনও দুটো ভাই-বোন ইস্কুলে পড়ছে। তাছাড়া—মা আবার বিধবা বোন, তার ভেতর বৌ এনে ঢোকালে অশান্তিতে একদিনও টিকতে পারব না। আইবুড়ো বোনের সঙ্গে বৌদিদের তবু বনে—কারণ তাদের জীবনে ভবিষ্যতের আশা আছে। বিধবা বোন বাড়ী থাকলে কারুর বিয়ে করা উচিত নয় !'

দুজনেই কিছুক্ষণ চুপ-চাপ বসে থাকে। রাস্তার কোলাহল কমে আসছে। পার্ক ও জনবিরল হয়ে আসছে ক্রমশ। একসময় মণি বলে ওঠে, 'আরও একটা টিউশনী ছিল। তা আজ আর হ'ল না। সিগারেট খাবি একটা ?'

'না। ওটা এখনও ধরিনি।'

'এখনও তেমনি গুডি-গুডি বয় আছিস !'

'তা হয়ত ঠিক নয়। অতটা বাজে খরচের অবস্থা নেই।'

'এটাকে বাজে খরচ বলিস নি বিমু। সকাল সাড়ে ছটা থেকেই প্র্যাক্‌টিক্যালি গাধা পিটোনো শুরু করি—রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত। মধ্যে কতটুকুই বা ফাঁক মেলে ? একটা কোন নেশা না হ'লে পারব কেন ?'

'আমার খাটুনী কি ওর চেয়ে কম মনে করিস ?'

না, তবু বৈচিত্র্য আছে। দুপুরটা বকতে হয় না—কলমপেশার কাজ ! আমাদের যে একঘেয়ে কাজ।'

'তোদের তবু একটা সান্ত্বনা আছে—তোরই দেশের কতকগুলো ছেলেমেয়ে তোদের হাতে মানুষ হচ্ছে।'

অকস্মাৎ চারিদিকের লোকজনকে সচকিত ক'রে পার্ক কাঁপিয়ে হো হো ক'রে হেসে ওঠে মণি। অতিকষ্টে অনেকক্ষণ পরে হাসি থামিয়ে বলে, ' What next ! আমরা ছেলে মানুষ করি ? দ্যাখ, ডাক্তাররা যেমন মনে মনে জানে যে রোগী ভাল হওয়ায় আসলে তাদের কোন কৃতিত্ব নেই—রোগী আপনিই ভাল হয়, তারা করে না—তেমনি মাস্টারেরাও জানে যে ছেলেমেয়ে মানুষ হওয়ায় তাদের কোন হাতই নেই। কেউ কেউ তবুও মানুষ হয়—সে শুধু তাদের বরাত আর জন্মগত কতকগুলো ফ্যাকাল্‌টি। পড়ানোর সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। তাহ'লে একই ইস্কুল থেকে বছর বছর ফার্স্ট হ'ত !'

'তা না হোক্‌, তবু কোন কোন ইস্কুলে ফি বছরই মোটামুটি ভাল রেজাল্‌ট্‌ হয় ত !'

'হ্যাঁ—তা হয়। তবে একটু লক্ষ্য করলে দেখবি যে-সব ইস্কুল বা কলেজে বাছাই-করা ছেলেরাই শুধু যায়। আবার সেগুলো বড়লোকের ইস্কুলও বটে, সেখানে যারা পড়ে তাদের বাড়ীতে প্রায় সবাইকারই দুটো তিনটে ক'রে

মাস্টার আছে।'

বিমল তর্ক করে কতকটা যন্ত্রের মতই। বলে, 'কেন পূর্ণ মাস্টার মশাই-এর মত মাস্টারও ত আছেন দু-চার জন।'

'ছিলেন। এখনও আছেন কি?' মণির কণ্ঠস্বর অস্বাভাবিক তীক্ষ্ন শোনায়, 'থাকলে ভালই। কিন্তু আমি ত দেখি না। কোথায় আছে। কে জানে!'

তারপর বিমলের কাঁধে একটা হাত রেখে সে বলে, 'একদিন আমাদের ইস্কুলের টিচার্স কমন রুমে গিয়ে বসলেই টের পেতিস—আজকালকার মাস্টার মশাইদের মনোভাব কি! দিনগত পাপক্ষয় শুধু! তাঁরা সব কথা আলোচনা করেন—ইউনিয়ন, য়্যাসোসিয়েশন, পলিটিক্স্, সংসার, চালডাল- নেহেরু গবর্ণমেণ্টের অযোগ্যতা—এভ্রিথিং বাট দেয়ার ওন্ ডিউটি! পড়াশুনো কেমন হচ্ছে ছেলেদের, কী করলে ইম্প্রুভমেণ্ট হয়, কোন্ থিওরীতে কি বলে—এসব কথা, যদি সাতদিন পর পর গিয়ে সারাদিন ধ'রে বসে থাকিস, তাহলেও কারুর মুখে কোনদিন শুনতে পাবি না।'

বোধ হয দম নেবার জন্যই কয়েক মুহূর্ত থেকে মণি আবার বলে, 'শুনবি তবে? আমাদের হেড মাস্টার মশাই আড়াই শ' টাকা মাইনে পান, এ ছাড়া য়্যালাউন্স ফ্যালাউন্স ত আছেই। এ অঞ্চলে খুব কম ইস্কুলের হেড্মাস্টারের এত বেশী মাইনে আছে। কিন্তু তবু তাতে তাঁর পোষায় না। তাঁর বইয়ের ব্যবসা আছে ভাগ্নের বেনামীতে, কিছু কিছু আমদানী রপ্তানীর কারবারও করেন। তাঁর নিজের নামে কতগুলো লাইসেন্স আছে। এ ছাড়া বিস্তর পাবলিশারের পাঠ্য বই লিখেছেন—কতক নিজের নামে বেরোয়, কতক অপরের নামে। মোটা টাকায় কপিরাইট বেচে দেন। তারা ভাবে এত বড একটা ইস্কুলের একজন এক্স্পিরিয়েন্সড্ হেডমাস্টার বই লিখছেন—বেশী দাম দিলেও ক্ষতি নেই। অথচ বইগুলো লেখেন আমাদের ফণীবাবুতে আর অটলবাবুতে। তাঁরা যৎসামান্যই পান। ইস্কুলে এসেও তাঁদের অধিকাংশ দিন ঐ সব কাজ নিয়ে থাক্তে হয়, গাদাগাদা প্রুফই দেখেন বসে বসে, ফলে ক্লাস নেওয়া হয় না বেশীর ভাগ দিনই। সময় কোথা? সে ক্লাসগুলো হেড্মাস্টার মশাই সুকৌশলে চাপিয়ে দেন এর-ওর ঘাড়ে। আমাদেরও নিতে হয়। জেনে শুনেই নিই। জলে বাস ক'রে কুমীরকে চটাবে কে? চাকরী করতে হবে যখন—তখন ওপরও'লাকে চটিয়ে লাভ নেই। আমাদের সেকেন্ড টিচার অপরেশ বাবু নাকি পাঁচটা টিউশনী করেন—সকালে দুটো, বিকেলে তিনটে। শৈলবিহারী বাবু সকালে কোন্ এক বড়লোকের বাড়ী টিউশনী করেন—কোন্ এক বিখ্যাত গয়নাও'লার ফ্যামিলি টিউটর। থাকেন শহরতলীতে—ছটায় বেরিয়ে আসেন। পড়ানো সেরেই ইস্কুলে আসেন—ইস্কুল শেষ হ'লে ওই ইস্কুলেরই একটা ঘরে কোচিং ক্লাস নেন। তিন শিফ্ট্। খাবার চাকর দিয়ে দিয়ে যায়। টিফিনের সময় কমন-রুমে বসে খেতে হয়। অপরেশ বাবু ত এসেই নাক ডাকান রীতিমত। ক্লাসে গিয়ে এঁরা সকলেই ঢোলেন।

বিশ্রাম চাই ত—সে বিশ্রামের আর অবসর কৈ ? ইস্কুলের ছাত্ররা শোনে—প্রাইভেট ছাত্ররা শুনবে কেন ?'

বিমল বোকার মত প্রশ্ন করে—'কর্তৃপক্ষের কানে এসব কথা কি ওঠে না !'

'উঠবেনা কেন ? তাঁরাই বা কি করবেন ! যে আসবে লঙ্কায় সে-ই হবে রাবণ। তাছাড়া—খুব দোষ দেওয়াও যায় কি এদের ? কী আয় সেটা ত দেখতে হবে ! দারিদ্র্য দোষঃ গুণরাশি নাশি !'

এবার বিমলের উত্তপ্ত হবার পালা। সে বললে, বাজে কথা বলিস নি মণি। এখনকার মাস্টার মশাইদের যা আয় তার চার ভাগ ছিল না আগে।—কিন্তু তখনকার দিনের এক একজন শিক্ষকের কথা মনে ক'রে দ্যাখ দিকি। অত কথায় দরকার কি, আমাদেরই দেখা পূর্ণ মাস্টার মশাইয়ের কথাটা ভেবে দ্যাখ্ না। তাঁর কি আয় ছিল ? কিন্তু তিনি কি কোনদিন ফাঁকি দিয়েছেন ? তোদের ঐ শৈলবিহারী বাবুকে আমি চিনি। ঢাকুরে একখানা দমদমে দুখানা বাড়ী করেছেন উনি। মাসিক বারোশ' টাকা ওঁর আয়—গর্ব করে বলেন উনি ওঁর শ্বশুর বাড়ীতে। আমাদেরই পাড়ায় ওঁর শ্বশুর-বাড়ী।…ওঁর কি এখনও এত অভাব আছে যে উদয়াস্ত খাট্‌তে হবে ? ঐ অপরেশ বাবুর কত আয় খোঁজ করিস ত !…অভাব নয় বন্ধু, স্বভাব ! তোমাকে এখন আড়াই শ' টাকা মাইনে দিলেও তুমি এর চেয়ে মন দিয়ে পড়াবে না ? ঐ ছেলেগুলোকে তখনও তেমনি মিস্‌চিভাস্‌ ইম্‌প্‌ মনে হবে। আগে যাঁরা মাস্টারী করতেন তাঁরা দারিদ্র্য জেনেই আসতেন। আর তার জন্য তাঁদের কাজে ফাঁকি দেবার অধিকার জন্মেছে এ কথা কখনও মনে করতেন না। অথবা তার জন্য রাস্তায় বসে ধর্মঘট করা যায়—একথাও ভাবতে পারতেন না। তাঁরা স্বর্গে গেছেন, এখানকার খবর সেখানে পেঁাছানোর উপায় আছে কিনা জানি না—কিন্তু মাস্টার মশাইরা স্লোগান দিয়ে রাস্তায় মার্চ করছেন আর ধর্মঘট করছেন জানলে তাঁরা সেখান থেকেও শিউরে উঠবেন।'

'তা আর কি করা যাবে। স্ট্রাগ্‌ল্‌ ফর এক্‌জিস্টেন্স্‌। বাঁচতে হবে ত ! বিরসকণ্ঠে বলে মণি।

'তা নয় বন্ধু। এর সবটাই নির্ভর করে তুমি কাকে বাঁচা বলো তার ওপর। দৈহিক স্বাচ্ছন্দ্য আর সুখের শেষ নেই। ওর কোন সীমাও নেই। কর্তব্যজ্ঞান আলাদা বস্তু। তখনকার দিনের শেষ শিক্ষকরাও বেঁচে গেছেন, সসম্মানেই। মনে আছে পূর্ণ মাস্টার মশাইয়ের এক ছাত্র আই. সি. এস. হয়েছিলেন ? সতেরো বছর পরে কি একটা কাজে তিনি ঐ পাড়ায় এসেছিলেন, পথে দেখা হয় পূর্ণ মাস্টার মশাইয়ের সঙ্গে। উনি তখন বাজার ক'রে ফিরছেন—খালি পা, এক পা কাদা। সে ভদ্রলোক গাড়ী থামিয়ে রাস্তার মাঝখানে ঐ কাদামাখা পায়েই হাত দিয়ে প্রণাম করলেন যখন, তখন আমি সেখানে দাঁড়িয়ে। সে যা অনির্বচনীয় তৃপ্তির হাসি দেখেছিলাম ওঁর মুখে তা আর কোনদিন ভুলব না। ছাত্রটি তখন হাজার দুই টাকা মাইনে পান—ভারত সরকারের এক বিশিষ্ট কর্মচারী। কোন স্বাচ্ছন্দ্য বা বিলাসের

উপকরণ পেয়েই ও হাসি ফ্‌টত না তোমার ম্‌খে।

কথাগ্‌লো বোধ হয় মণির মনে লাগল না। একট্‌খানি চুপ ক'রে থেকে সে একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, চল্‌—ওঠা যাক।'

বিমল ব্যস্ত হয়ে উঠল। ওর হাত ধরে একরকম জোর ক'রেই বসিয়ে দিলে। 'ওরে বোস বোস—আর একট্‌। তোর সঙ্গে আমার একটা জর্‌রী কথা আছে!'

'কি কথা বল্‌ত? ব্যাপার কি? বিস্মিত হয়ে তাকায় মণি, 'এতকাল ত মনেই ছিল না আমাকে। অথচ এখনই এমন কি দরকারী কথা মনে পড়ে গেল?'

'বলছি। মন দিয়ে শোন।'

ধীরে ধীরে—বেশ একট্‌ সঙ্কোচের সঙ্গেই—প্‌লকের কথাটা খ্‌লে বললে বিমল। সঙ্কোচ এই জন্যে যে—মণির মনোভাবের যে পরিচয় এতক্ষণ সে পেলে তাতে কথাটা না বলাই উচিত। এতক্ষণ কতকটা সেই কারণেই কথাটা পাড়েনি—অনেকক্ষণ মনের অবচেতনে লড়াই করেছে নিজের সঙ্গে। অথচ না না বললেও নয়, এমন স্‌যোগ হয়ত আর আসবেই না।

সব কথা শ্‌নে মণি একট্‌ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললে, 'তা আমাকে কি করতে হবে?'

'রবিবার ক'রে মধ্যে মধ্যে এক-আধ-দিন যদি একট্‌ আধট্‌ সময় দিতিস—ও তোর বাড়ীতে গিয়ে ব্‌ঝে আসত। পারবি না? এ একটা স্পেশ্যাল কেস্‌ ব'লেই বলছি, আর বড় বিচিত্র কেস্‌।'

মণি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে কি ভাবল। বললে, 'সপ্তাহে একটা দিন ছ্‌টি, তাও বিকেলের দিকে কোথাও না কোথাও রিহাস্যাল থাকেই। এক সকালটা। আবার বই খাতা নিয়ে বসা—ভাবলে গায়ে জ্বর দেয়। তাছাড়া ও-সব পড়া ভুলতেই বসেছি।...হাউ এভার, তোর কথা শ্‌নে আমার একট্‌ কৌত্‌হল হচ্ছে। সত্যিই স্ট্রেঞ্জ কেস্‌। আচ্ছা, আসছে রবিবার তোর বাড়ীতে যাবো। আমার ভাই দ্‌খানা ঘরে বাস—শোবার জায়গা, তাই মেলে না। ওখানে বসে পড়া হবে না। আমিই যাবো। তবে প্রত্যেক রবিবারে নয় এক হপ্তা অন্তর। কিম্বা মধ্যে অন্য ছ্‌টি পড়লেও যেতে পারি। খ্‌ব ছোট ছেলে নয়, এই একমাত্র সান্ত্বনা, তা' ছাড়া সায়েন্সে এখনও একট্‌ ইন্টারেস্ট আছে। এই জন্যই রাজী হচ্ছি!'

'বহ্‌ ধন্যবাদ। বাঁচালি ভাই।' বিমল ওকে একেবারে জড়িয়ে ধরে।

দ্‌জনে উঠে রাস্তায় এসে পড়ে। মণি ওর সঙ্গে খানিকটা ওর পথে এগিয়ে যায়। বিদায় নেবার ম্‌খে বলে, আমার কথাটা মনে রাখিস একট্‌—বলা ত যায় না—যদি কোন যোগাযোগ হয়ে যায় কোন ফিল্‌ম্‌ কোম্পানীর সঙ্গে। কমিক পার্ট নেবো না—সিরিয়াস পার্ট, মানে কাজ দেখাবার যদি কিছ্‌ থাকে ত—ছোট পার্ট'ও নিতে রাজী আছি। ব্‌ঝলি?'

যেতে যেতেও আর একবার ফিরে দাঁড়ায়।

'সামনের শুক্রবার স্টার বোর্ডে একটা অফিস ক্লাবের প্লে আছে, আমি নামব। আয় না, কেমন করছি আজকাল—দেখে যাবি!'

বিমলের আদৌ উৎসাহ ছিল না। কিন্তু মণির মুখের দিকে চেয়ে আর 'না' বলতে পারলে না। বললে, 'নিশ্চয়ই যাবো। কিন্তু ঢুকতে দেবে ত?'

'আলবৎ দেবে। কার্ড পাঠাবো।···হ্যাঁ—তোর ঠিকানাটা? আসলেই যে ভুল হয়ে যাচ্ছিল।'

পকেট থেকে একটা কাগজ বার ক'রে রাস্তার আলোতে দাঁড়িয়েই ঠিকানাটা লিখে দিলে বিমল।

॥ ১৫ ॥

অফিসে পা দিতেই খবর দিলেন এক সহকর্মী, 'শুনেছেন বিমলবাবু, খবরটা?'

'কি জানি! কী খবর বলুন ত?' কতকটা নিরাসক্ত-কণ্ঠেই উত্তর দেয় বিমল। এঁদের খবরের ওপর ওর কখনই খুব আস্থা নেই। অত্যন্ত তুচ্ছ কথাতেও এঁরা উত্তেজিত হন।

'জোর খবর! জয়ন্তী চৌধুরী বিয়ে করছেন!'

'ও, এই খবর!'

'আরে শুনুনই শেষ পর্যন্ত! বরটি কে জানেন কি? আমাদের শশিবাবু। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেব স্বয়ং!'

এবার অন্তত মনে মনেও, বিমলকে মানতে হ'ল যে খবরটা জোরই বটে। শশিবাবুর মোট দুটি বছর আর আছে চাকরীর, অর্থাৎ সরকারী হিসেবেও তিপ্পান্ন বছর বয়স হয়েছে। হয়ত আসল বয়সটা আরও বেশী। সম্প্রতি বছর-খানেক আগে বিপত্নীক হয়েছেন। অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। বড় ছেলেটি এম. এ. পাশ ক'রে চাকরীতে ঢুকেছে—সেও আজ বছর-কতকের কথা।

আর জয়ন্তী চৌধুরী?

ওদের অফিসের সবচেয়ে সুশ্রী মেয়ে ত বটেই, সবচেয়ে শৌখিনও। ভাল দামী প্রসাধন-সামগ্রী ছাড়া ব্যবহার করে না, নিত্য নূতন শাড়ী পরে অফিসে আসে। রুচিজ্ঞান প্রখর—সে সম্বন্ধে প্রায়ই উপদেশ দেয় সহকর্মিণীদের। ফুরফুরে মেয়ে জয়ন্তী, দেখলেই মনে হয় লতার মত ভঙ্গুর ও কোমল, প্রজাপতির মত সুখবিলাসী।

সেই জয়ন্তী বিয়ে করেছে শশিবাবুকে?

মুখ দিয়ে নিজের অজ্ঞাতেই বেরিয়ে গেল প্রশ্নটা—'যোগাযোগটা হ'ল কী ভাবে? বাপ-মা—?'

'ক্ষেপেছেন আপনি? ঐ সব মেয়ে বাপ-মার তোয়াক্কা রাখে?···নিজে-নিজেই সম্বন্ধ করেছেন ঠাকরুণ।···কদিন ধরেই শুনছি অফিসের পর শশিবাবুর সঙ্গে সিনেমায় যাচ্ছেন, একদিন আমার সঙ্গেও দেখা হয়ে গেল, নিউ

এম্পায়ারের বক্সে বসে দেখছেন ওঁরা দুটি মাত্র প্রাণী। মানে আরও দুখানি টিকিট কিনে নষ্ট করেছেন শশিবাবু। তারপরে এই খবর একেবারে। পাবেন, পাবেন—আপনিও খবর পাবেন। শুনছি পার্টি দেবে গ্রেট-ইস্টার্নে।'

বিমল আর কথা না বাড়িয়ে নিজের সিট্-এ গিয়ে বসল।

কিন্তু তখনই কোন কাজে মন দিতে পারল না। বাংলা দেশে—শুধু বাংলা দেশে কেন—সব দেশেই এমন হাজার হাজার মেয়ে চিরকাল প্রৌঢ় বা বৃদ্ধার লালসার খোরাক হচ্ছে—কিন্তু সে বাধ্য হয়েই। প্রয়োজনে—বাপ-মায়ের অভাবের তাড়নায়। কিন্তু জয়ন্তীর কী এমন দরকার পড়ল? সে নিজে চাকরী করে, দেখতেও সুশ্রী। তার ত কোন প্রয়োজন ছিল না এত তাড়াতাড়ি ঐ বৃদ্ধের কাছে আত্মসমর্পণ করার। শশিবাবু, রোগা একহারা শ্যামবর্ণ—নিতান্তই শ্রীহীন চেহারা। একটাও দাঁত নেই—বাঁধানো পাটি দুটোও খাপ্ খায় নি ঠিক, কথা বলবার সময় অনবরতই মনে হয় খুলে পড়ে যাবে। সেজন্য একটা বিশ্রী শব্দ হ'তে থাকে, কতকটা হাঁসের প্যাঁক-প্যাঁকানির মত। তার পাশে জয়ন্তী—ছিঃ!

বিমল জোর ক'রে পাশের লাল-পেন্সিল-চিহ্নিত ফাইলটা টেনে নিলে।

কিন্তু এ-ই বা তার অকারণ কী চিত্তক্ষোভ! বিমলের নিজেরই হাসি পেল খানিক পরে। তার এতে আপত্তির আছেই বা কি? যার সব চেয়ে আপত্তি করবার কথা, সে যদি নিজেই এ কাজে অগ্রণী হয়ে থাকে ত কার কি বলবার আছে। এ গায়ের জ্বালার কি তাহ'লে এই অর্থ যে জয়ন্তী চৌধুরী সম্বন্ধে তার নিজেরও কিছু দুর্বলতা ছিল?

না-না। প্রবলবেগে ঘাড় নাড়ে বিমল নিজের মনেই। ঐ ধরণের প্রজাপতি মার্কা মেয়েদের ঘৃণাই করে সে। যা খুশী করুক জয়ন্তী চৌধুরী—তার কি?

বিমল জোর ক'রে ফাইলে মন বসায়।

অফিস বসবার পুরো পঁয়তাল্লিশটি মিনিট পরে পূর্ণিমা এসে পৌঁছল।

দরদর ক'রে ঘামছে সে। ঘামে ওর গোটা ব্লাউজটাই ভিজে উঠেছে, ছোট্ট একটুখানি মেয়েলি রুমাল সপ্‌সপ্ করছে ভিজে। আসনে বসে সেটাতে একবার মুখ মোছবার বৃথা চেষ্টা করে সে সোজাসুজি আঁচলেই মুখ এবং গলা মুছে নিল।

সেদিকে চেয়ে কী একটা বলতে গিয়েও চেপে গেল বিমল। মনে হচ্ছে বেচারী যেন ছুটতে ছুটতে এসেছে। এর পর আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

কিন্তু সে কিছু না বললেও পূর্ণিমা তার অকথিত প্রশ্নেরই জবাব দিলে, 'আজও লেট—এই বলবেন ত! পর পর তিন দিন লেট্ হয়ে গেল। কিন্তু কী করব, মাথা খুঁড়ে মরা ছাড়া ত আর কোন উপায় দেখছি না। আজও বাবার এমন বাড়াবাড়ি—এক হাতে রান্না করা, ডাক্তারের বাড়ী যাওয়া—সব। ডাক্তার এনে ইন্‌জেকশন্ দিইয়ে তবে বেরোতে পারলুম। স্নান বা খাওয়ার

কোন চেষ্টাই তবু করি নি। কিন্তু হ'লে কি হবে, ডাক্তারও বিজ্ঞ, নটার পর তিনি এলেন। তাও কতকটা আমার প্রতি দয়া ক'রেই।···বাস এবং ট্রাম— কোনটাতেই উঠ্‌তে পারলুম না, সে-ও মিনিট দশেক বৃথা কেটে গেল। তারপর সোজাসুজি হেঁটেই—প্রায় ছুট্‌তে ছুট্‌তে আসছি। আর কি করতে বলেন আপনি?'

কণ্ঠে যেন তার রীতিমত অভিযোগ।

'আমি কিছুই করতে বলি না মিস্ রায়—আর বলবই বা কেন? ওপর-ও'লারা কিছু না বললেই হ'ল!···

'সে ত তাঁরা বলবেন। নিত্যই বলছেন। কিন্তু কী করি আমি। কোন-মতে মরতে পারতুম ত বেশ হ'ত!'

দুই চোখে তার জল ভরে আসে।

সেদিকে চেয়ে বিমল যেন হঠাৎ একটু কোমল হয়ে আসে। কথাটা ঘুরিয়ে দেবার জন্যই বলে, এদিকে খবর শুনেছেন—আপনার এক সহকর্মিণীর বিয়ে?'

কার—জয়ন্তীর নাকি?' সামান্য একটু কৌতূহল কণ্ঠে ফুটলেও চমকে ওঠে না সে। বরং বেশ স্বাভাবিক সুরেই বলে, 'শশিবাবুকে গেঁথে তুলল শেষ পর্যন্ত। না কি আর কেউ?'

শশিবাবুর সঙ্গে ব'লেই ত শুনলুম। আপনি জানতেন নাকি?'

'হ্যা। ও ত আমরা কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করেছি। আপনি শোনেন নি?'

'না। কিন্তু মাপ করবেন—অপরের ব্যাপারে নাক গলানো হয়ত অন্যায় —**but why** শশিবাবু?'

'তাছাড়া উপায় কি ছিল বলুন? মানুষটা একটু শৌখিন—দেখেছেন ত বিলাস ভালবাসে বললে ভুল হবে—বিলাস এখন ওর প্রয়োজন হয়ে উঠেছে। ওর বাবা ছিল বড় অফিসার, মেয়েকে সেই ভাবে মানুষ করেছিলেন—ছোট বেলা ওর জন্যেই তাঁর দুশ' আড়াইশ' টাকা খরচ হ'ত। ঝপ্ করে মারা গেলেন ভদ্রলোক—একটি পয়সা রেখে যেতে পারেন নি, উল্‌টে বিস্তর দেনা রেখে গেছেন। একটি ভাই আছে, সেও সবে চাকরীতে ঢুকেছে। ছোট সংসার—কোনমতে চলে যায় তাই, কিন্তু ভাল দেখে বিয়ে হবে সে আশা কম। কে কবে বিনা পয়সায় বিয়ে ক'বে—তাই ব'লে বসে থাকবে কতদিন? কে-ই বা উদ্যোগী হয়ে দেবে বলুন? এক এই অফিসের কোন ছেলে জুট্‌তে পারত কিন্তু তাতে ওর পোষাত না। সে-ই ত দারিদ্র্য!···চাকরী ও করতে চায় না কোনদিনই। তার ওপর ওর চাই এক গাদা হাত-খরচ। শশিবাবু ছাড়া অপর কে সে খরচ জোগাবে! শশিবাবুর শুনেছি পৈতৃক দু-তিনখানা বাড়ী আছে কলকাতাতে। টাকা-পয়সাও আছে ঢের। এ চাকরী করেন উনি কতকটা শখ ক'রেই।'

বিমল স্তব্ধ হয়ে বসে থাকে।

বিস্ময়ের বুঝি শেষ নেই। জয়ন্তী চৌধুরী যা করেছে, পূর্ণিমা রায় তা

সমর্থনই করছে—বরং বলা চলে জয়ন্তীর হয়ে ওকালতি করছে।

'কিন্তু···কিন্তু তাই ব'লে শশিবাবু! Old enough to be her father! কোন তরুণ ছেলে, মনের মত ছেলের সঙ্গে দারিদ্র্য ভাগ ক'রে নেওয়াও কি এর চেয়ে ভাল ছিল না?'

একটু চুপ ক'রে থাকে পূর্ণিমা, ব্লটিংটার ওপর কলম বোলায় অন্যমনস্ক ভাবে। তারপর বলে, 'আমরা মেয়েরা সাংসারিক বিষয়ে ঢের বেশী প্র্যাক্‌টিক্যাল—তা জানেন ত? আমার মনে হয় জয়ন্তী ভালই করেছে। রোম্যাণ্টিক একটা কিছু করতে গেলে ভুলই করত। কিন্তু, ঐ সে নিজেই আসছে—'

বিমল তাড়াতাড়ি মুখ তুলে তাকাল। সত্যিই জয়ন্তী আসছে। সাদা মূল্যবান ঢাকাই শাড়ী এবং উৎকৃষ্ট প্রসাধনে ফুটন্ত পদ্মফুলের মতই দেখাচ্ছে তাকে। কিন্তু কাছে আসতে এটাও চোখে না পড়ে উপায় থাকে না—ঐ সমস্ত প্রসাধন আর বেশভূষার মধ্যে আসল ফুলটি যেন কিছু ম্লান। জয়ন্তীর চোখ-দুটোতেও কেমন একটা অস্বাভাবিক রকমের দৃষ্টি, কিছু উদ্ধত কিছু অশ্রুভারনত! মুখেচোখেও অপরিসীম ক্লান্তির ছাপ। অহরহ যেন সে কার সঙ্গে সংগ্রাম ক'রে চলেছে—সেই সংগ্রামেরই ক্লান্তি তার সর্বদেহে—উদ্ধত স্পর্ধা তার দৃষ্টিতে!

জয়ন্তী চৌধুরী সম্বন্ধে ইতিপূর্বে যত বিরূপ মনোভাবই থাক্‌—এই মুহূর্তে ওর মুখের দিকে চেয়ে বিমল একটা বেদনা এবং সহানুভূতি বোধ না ক'রে পারল না। সে উঠে দাঁড়িয়ে তার স্বভাব-বিরুদ্ধ একটু কোমল-কণ্ঠেই অভ্যর্থনা জানাল, 'আসুন আসুন মিস্ চৌধুরী। শরীরটা খারাপ নাকি আপনার?'

জয়ন্তী ওর পাশের চেয়ার-খানাতে এক রকম ধপ্ ক'রেই বসে পড়ে। তারপর ভূমিকা-মাত্র না ক'রেই বলে, 'শুনেছেন ত সব? আমার বিয়ে!'

'হ্যাঁ, একটা কানা-ঘুষো শুনছিলাম বটে! অস্বীকার ক'রে কোন লাভ নেই। যাই হোক্‌—let me congratulate you first!'

সেই আধা-স্পর্ধিত আধা-ছলোছলো চোখ-দুটো তুলে তাকায় জয়ন্তী ওর মুখের দিকে, খাপছাড়া ভাবে বলে, 'আর—আর আমি পারছিলুম না, এই ডাক্তারী আর পোষাচ্ছিল না আমার। সে ক্ষেত্রে কী-ই বা করতে পারতুম বলুন! মুক্তির ত আর কোন উপায়ই দেখলুম না।···অন্যায় করেছি কি?'

'অন্যায় করবেন কেন মিস্ চৌধুরী। যাকে ভাল লেগেছে তাকে বিয়ে করছেন। এর মধ্যে অন্যায় আর কি আছে? এটা নিতান্তই আপনার ব্যক্তিগত পছন্দের কথা। তবে যদি নিজের মনের সঙ্গে প্রবঞ্চনা ক'রে থাকেন ত সে আলাদা কথা।'

'তাই-বা কেন? কিসের আলাদা কথা? আত্মরক্ষার জন্য সব কিছুই করা যায়—এমন কি আত্মপ্রবঞ্চনাও।'

একটু তীক্ষ্ণকণ্ঠেই বলে জয়ন্তী। তারপর বোধ করি উত্তর এবং সেই সঙ্গে সমর্থনেরও আশায় ব্যাকুল হয়েই চায় মুখ পানে।

বিমল এসব প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে মুখে একটু আনন্দ টেনে আনবারই চেষ্টা করে, 'তা শুভ-কার্যটা হচ্ছে কবে ?'

জয়ন্তী মাথা নামিয়ে বলে, 'রেজেস্ট্রী হয়ে গেছে গত শুক্রবারই। আসছে শনিবার একটা পার্টি দিচ্ছি গ্রেট-ইস্টার্নে। যাবেন কিন্তু।'

সে ব্যাগের মধ্যে থেকে কতকগুলি দামী বিচিত্র-বর্ণে মুদ্রিত কার্ড বার করলে।

'তুইও যাস ভাই পূর্ণিমা।'

'অবশ্য যাবো।' বিমল বলে, 'কিন্তু দামী উপহার যদি না নিয়ে যেতে পারি ত ক্ষুণ্ণ হবেন না।'

'ছি ছি! কী যে বলেন!···কী আনন্দের কাজ যে দামী উপহার দেবেন!'

ব'লে ফেলেই যেন চমকে ওঠে একটু—চুপ ক'রে যায় সে।

পূর্ণিমা এতক্ষণ একেবারে চুপ ক'রে ছিল। এবার সে আস্তে আস্তে বললে, 'শশিবাবুর ত ও-পক্ষের অনেকগুলি ছেলেমেয়ে আছে শুনেছি—যে জন্যে এ কাজ করলে জয়ন্তী দি—'

জয়ন্তী নড়ে চড়ে বসে একটু। তারপর গলাটা নামিয়ে বলে, 'কারুর ওপরই কোন অবিচার হ'তে দিই নি, সেই সঙ্গে নিজের ওপরেও না।···উনি আগের ছেলেমেয়েদের কতক কতক বিষয় ভাগ ক'রে, একেবারে লেখাপড়া ক'রে দিয়েছেন। আমার ওপরও একটা সেট্‌ল্‌মেণ্ট করেছেন—একখানা বাড়ী আর ত্রিশ হাজার টাকার ইন্সিওরেন্স। তাছাড়া যদি বেশী দিন বাঁচেন ত পেন্‌সনও রইল।'

'কিন্তু খুব বেশী দাম পেলেন কি—আফ্‌টার অল ?' কণ্ঠের বিদ্রূপ এবার আর বিমলের চাপা থাকে না, 'ছেলেপুলে যদি হয় এবং পেনসেন যদি না থাকে ত তাদের মানুষ করবার পক্ষে ও ক-টা টাকা খুব বেশী নয়!'

'ছেলেপুলে!' যেন হঠাৎ কী একটা বেঁধে জয়ন্তীর গায়ে, 'না না বিমলবাবু। সব দিক হয় না। ছেলেপুলের শখ আর নেই।···ওসব ঝঞ্ঝাটে যাবো না, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।'

ম্লান হেসে উঠে দাঁড়ায় সে।

'চলি! আরও ক-জনকে বলতে হবে।'

জয়ন্তী চৌধুরী চলে গেলে দুজনেই অনেকক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল। তারপর যেন আর থাকতে না পেরেই ব'লে উঠ্‌ল পূর্ণিমা, 'ইস্‌!···এ কী করলে জয়ন্তীদি, এ কী করলে! কী সামান্যর জন্যে কত কী দিলে!'

'Sins of the fathers!'—বিমল বললে ধীরে ধীরে, 'এ ওর বাবার পাপ। তিনি যখন অকারণ বিলাসের মধ্যে মানুষ করেছিলেন, সে বিলাস যখন ওর মজ্জাগত করিয়ে তাকে প্রয়োজন ক'রে তুলেছিলেন তখন একবারও ভেবে দেখেন নি যে কখনও ওকে বাস্তব জীবনের মুখোমুখি এমন ক'রে দাঁড়াতে হবে। কতটুকু তাঁর ক্ষমতা, ভবিষ্যতেও এই অভ্যাস বজায় রাখার মত যথেষ্ট

টাকা তিনি রেখে যেতে পারবেন কিনা তা কি একবারও ভেবেছিলেন? এখনকার অধিকাংশ বাপ-মাই এই সর্বনাশ করেন ছেলেমেয়েদের। আগেকার দিনে মেয়েদের বাপ-মার কাছে পদে পদে শুনতে হ'ত—দুদিন বাদে পরের বাড়ী যেতে হবে, সেখানে না নিন্দে কিংবা খোয়ার হয়। অমুকটা করিস নি, অমুকটা করতে নেই। কত কি বিধি-নিষেধ মানতে হ'ত তাদের ছেলেবেলা থেকে। এখনকার বাপ-মারা—যাঁরা খুব গরীব, তাঁরাও ব'লে থাকেন শুনি, দুদিন পরে ত পরের বাড়ী যাবেই, যতদিন আমার কাছে আছে একটু আরাম ক'রে নিক্। কিন্তু সেই আরাম এবং প্রশ্রয় যে তার স্বভাবটাই মাটি ক'রে দেয় তা বোঝেন না। হঠাৎ লড়াই করতে গেলে কেউ করতে পারে না, তার জন্যে চাই দীর্ঘদিনের ড্রিল বা অভ্যাস। কষ্ট করা অভ্যাস থাকলে কষ্ট বোধই হয় না যে!'

পূর্ণিমার চোখ দুটি ছলছল করতে থাকে। বোধকরি জয়ন্তী স্বেচ্ছায় যে ভুল করল তারই পরিমাণ আর পরিণাম ভেবে! বিমলের কথাগুলো বোধ হয় সব তার কানেও যায় না।

॥ ১৬ ॥

জয়ন্তী অনুষ্ঠানে পূর্ণবাবুর আর কিছু সুবিধা না হোক—আত্মীয় ভাগ্যটা একটু ফিরে গিয়েছিল। অর্থাৎ ওঁর যে আত্মীয়রা ওঁকে সম্পূর্ণ ভুলে বসেছিলেন—কখনও ওঁর খবর নেওয়া আবশ্যক বোধ করেন নি, তাঁরাই এবার যেন সচেতন হয়ে উঠলেন। সাধারণের তরফ থেকে চাঁদা তুলে সভা ক'রে যাঁর জন্মোৎসব করা হয়, তাঁকে অবহেলা করার বা আত্মীয় ব'লে স্বীকার না করার কোন কারণই নেই—এটা তাঁরা স্পষ্ট বুঝতে পারলেন। আত্মীয়রা দু-একজন ক'রে প্রতিদিনই খবর নিতে আসতে লাগলেন। যে ভাগ্নের প্রাসাদে হেলান দিয়ে ওঁর মেটে-ঘরের চালাটি কোনমতে আত্মরক্ষা ক'রে ছিল—সেই ভাগ্নেই উদ্যোগী হয়ে নতুন খুঁটি এবং গোলপাতার ব্যবস্থা ক'রে ঘরটাকে আত্মনির্ভর ক'রে দিলেন। মাসিক পাঁচটাকা ক'রে দিতেন তিনি এর আগেও, এখন সেটা বন্ধ ক'রে দিলেন বটে, তেমনি তার বদলে চাল আটা ও চিনি—একেবারে মাসকাবারি যতটা লাগে—হিসাব ক'রে পাঠাতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, তাঁর ঘরে একাধিক বাহাওয়ালপুরী গাই ছিল, তিনি দৈনিক এক পোয়া ক'রে দুধেরও ব্যবস্থা ক'রে দিলেন।

এতে সুখী না হোন—কতকটা নিশ্চিন্ত হবারই কথা। কিন্তু পূর্ণবাবু তা হ'তে পারলেন না। বরং একটা অস্বস্তিই বোধ করতে লাগলেন। কেমন একটা অকারণ কুণ্ঠা এবং সঙ্কোচ। সেটা কাউকে বোঝাতে পারা ত দূরে থাক্, মুখ ফুটে বলতেই পারেন না। এটুকু পার্থিব জ্ঞান তাঁর আছে—তিনি জানেন যে আসল কথাটা শুনলে সকলেই হাসবে।

আর হাসবারই ত কথা!

বিমলের সঙ্গে আলোচনা হবার পর থেকে সেই যে তাঁর মাথার মধ্যে সংশয় দেখা দিয়েছে সেই সংশয়েই তাঁকে না দিচ্ছে স্থির থাক্‌তে, না দিচ্ছে আত্মীয়দের এই সম্মান ও প্রীতিকে সহজে গ্রহণ করতে।

তাঁর কেবলই মনে হয়—এই যে সম্মান এরা তাঁকে দেখাচ্ছে এর তিনি যোগ্য নন। এর মূলেই একটা ফাঁকি থেকে গেছে। যেটাকে তিনি কর্তব্য ব'লে এতকাল আঁকড়ে ধরে রইলেন, নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবার চেষ্টা করলেন প্রাণপণে—সেইটেই যদি কর্তব্য না হয় ত এদের কাছ থেকে সে নিষ্ঠার পুরস্কার গ্রহণ করবেন কোন্‌ অধিকারে?

তিনি কি ভুলই করেছেন তাহ'লে এতকাল?

আগাগোড়া ভুল বুঝেছেন আর বুঝিয়েছেন?

এইটেরই মীমাংসা করতে পারেন না তিনি। ভেতরে ভেতরে ছট্‌ফট্‌ করেন আর কৃশ দেহটাকে কৃশতর ক'রে তোলেন।...

এই যখন অবস্থা তখন হঠাৎ ওঁর এক নাত্‌নী এসে পড়ল শ্বশুর বাড়ী থেকে। নাত্‌নী অর্থাৎ তাঁর এই অদ্বিতীয় ধনী ভাগ্নের মেয়ে অরুণা। অরুণাকে পূর্ণবাবু একটু বেশী ভালবাসতেন; তার কারণ শৈশব থেকেই অরুণা তাঁর বড় ন্যাওটো ছিল—নাতি-নাত্‌নীদের মধ্যে ও-ই একমাত্র। ওঁদের দারিদ্র্যকে সে আমল দেয় নি—বরং অধিকাংশ দিনই সে ইস্কুলের ফেরৎ প্রিয়ম্বদার কাছে ঝোল ভাত বা দুধ ভাত খেয়ে যেত। এর জন্যে গোপনে যে ওর ওপর কিছু শাসন চলে নি এমন মনে করবারও কোন কারণ নেই। তবু অরুণা ওঁদের বাড়ী এবং আদর কোনটাই ছাড়তে পারে নি।

অরুণার, বলতে গেলে সম্প্রতি, বছর চারেক হ'ল বিয়ে হয়ে গেছে। পাত্রটি ভাল; বিহারে কী এক নতুন-পত্তন করা সরকারী কারখানায় মোটা মাইনের চাকরী করে। সাতাশ-আটাশ বছর বয়স, এরই মধ্যে প্রায় সাড়ে পাঁচশ' টাকা মাসিক বেতন পায়, দেখতে রূপবান। এক কথায় অরুণার বরাত ভাল।

বলাবাহুল্য বাপের বাড়ী পৌঁছেই অরুণা ছুটে এল দাদুর কাছে। জয়ন্তীর কথা সে-ও শুনেছে বৈকি। খুশী হয়েছে সে-ই সবচেয়ে বেশী। দাদুকে তার মা-ও সমীহ করছেন আজকাল, এতে অরুণার আনন্দের সীমা নেই। তোমরা আজ যাকে চিনছ অরুণা তাকে বহুদিন আগেই চিনেছে—তার মুখের তৃপ্ত হাসিতে এই কথাটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অরুণাকে দেখে পূর্ণবাবুও এবার বিশেষ ক'রে খুশী হয়ে উঠলেন। দামী শাড়ী ও ঝলমলে অলঙ্কারের মধ্যে স্বাস্থ্যবতী মেয়েটিকে লাবণ্যবতীও মনে হচ্ছিল। কাছে বসিয়ে মাথায় গায়ে হাত বুলিয়ে পূর্ণবাবু অনেক আশীর্বাদ করলেন। কয়েক মাস ধরে মনে মনে উনি নিরন্তর যে পীড়া অনুভব করছিলেন তাও যেন এই স্বাস্থ্য-যৌবন-লাবণ্য-আনন্দের মূর্তিমতী প্রতিমা খানিকে সামনে পেয়ে কিছু কালের জন্য ভুলে গেলেন। শুধু বাইরে নয়—অন্তরেও ওঁর সমস্ত চৈতন্য বার বার আশীর্বাদ করতে লাগল মেয়েটিকে।

অরুণা ওঁর পায়ে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, 'ইস, এ কী চেহারা

ক'রে তুলেছেন দাদু! আপনি মোটেই ভাল থাকছেন না নিশ্চয়!'

ছেলেমানুষের মতই পূর্ণবাবু বললেন, 'তুই ঠিক বলেছিস দিদি, আমার শরীর বড়ই খারাপ যাচ্ছে। আজকাল যেন কেমন দিনরাতই ক্লান্তি বোধ করি।'

'আপনি এবার আমার সঙ্গে ওখানে চলুন—দিন কতক বেড়িয়ে আসবেন!'

'দূর পাগলী, তা কি হয়!'

'কেন হবে না। বা-রে! আমি বুঝি কেউ নই। আমার কাছে গিয়ে ক'টা দিন থাকতে পারেন না?'

'জামাই বাড়ী গিয়ে থাকব—না না, সে ভারি লজ্জার কথা।'

'জামাই-বাড়ী ত ঠিক সেটা নয়। কর্মস্থান। প্রকাণ্ড কোয়ার্টার আমাদের, পড়েই থাকে। আমার শ্বশুর শাশুড়ী কেউই ত সেখানে থাকে না। শ্বশুরের অত বড় বাড়ী কারবার ফেলে তিনি যাবেনই বা কি ক'রে?…চলুন দাদু, লক্ষ্মীটি!'

প্রিয়ম্বদাও সে অনুরোধে যোগ দেন, 'রুণু অত ক'রে বলছে, ঘুরেই এসো না। শরীর তোমার ক্রমশ ভেঙ্গে পড়ছে একেবারে—এখনও গেলে হয়ত সাম্‌লে যেতে পারো।'

তবু পূর্ণবাবুর সঙ্কোচ ঘোচে না, 'জামাই কী মনে করবেন বল ত!'

'ইস্!…ওর আবার মনে করাকরির কী আছে। আর আমিই বা তার কি ধার ধারি। আমি সেখানে গিন্নি না?'

প্রিয়ম্বদার মুখের দিকে চেয়ে পূর্ণবাবু বলেন, 'তুমি একা থাকতে পারবে?'

'খুব পারব। কটা দিনই বা!'

তারপর একটু ম্লান হেসে বলেন, 'বেশী দিন না থাকতে হয় যাতে—সেই জন্যেই ত যেতে বল্‌ছি!'

পূর্ণবাবু অসহায় ভাবে একবার অরুণার মুখের দিকে আর একবার প্রিয়ম্বদার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'দ্যাখো—তোমরা যা ভাল বোঝ। কুটুমের কাছে নিন্দে না হ'লেই বাঁচি। তোমার বাবা মা কিছু ভাববেন না ত ভাই রুণু?'

অরুণা জোর ক'রেই তাঁকে সঙ্গে নিয়ে গেল।

স্বাস্থ্যকর জায়গা। কারখানা হবার আগেও অপরিচিত ছিল না স্থানটা। তখনও বহু লোক এখানে আস্‌ত—স্বাস্থ্যনিবাস হিসেবে। বাইরে যাবার মধ্যে পূর্ণবাবুকে বার-কয়েক কাশী যাওয়া-আসা করতে হয়েছিল, তখন কয়েক-বার এই দিক দিয়ে গেছেন কিন্তু সে সময় এসব জায়গা নেহাৎই অরণ্য ছিল। এখন এর চেহারা ফিরে গেছে, কারখানাটিকে কেন্দ্রে রেখে চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত শহর উঠেছে গড়ে। বড় বড় চওড়া রাস্তা বেরিয়েছে। সে রাস্তায় জ্বলছে শুভ্র বড় বড় নতুন ধরনের বিজলী বাতি। দুদিকে সুন্দর সুন্দর কোয়ার্টার, তাদের সামনে একটু ক'রে বাগান। এর ভেতর ইস্কুল, ক্লাব,

খেলার মাঠ, সিনেমা—সব রকমই আছে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছিমছাম্ শহর।

পূর্ণবাবু এখানে এসে ভারি খুশী হ'লেন।

শুধু সেই নর্দমা এবং ধোঁয়াকে পেছনে ফেলে এসেছেন, সেই ভাঙ্গাবাড়ী এবং অপরিসীম দারিদ্র্যকে পেছনে ফেলে এসেছেন তাই নয়—অপরিসীম আত্ম-গ্লানি, উচিত অনুচিতের প্রশ্ন, বিমলের সমস্যা—সব কিছুই পেছনে ফেলে এসে বেঁচেছেন যেন।

নাত্‌জামাই সোমেশের কোয়ার্টারটি ভাল। তিনখানা বড় বড় ঘর, রান্না-ঘর, চাকরের ঘর, দুটি বাথরুম—কলকাতার হিসেবে বড় গৃহস্থের থাকবার মত জায়গা। থাকে এরা দুটি প্রাণী, অরুণার একটি শিশু এবং এক চাকর। কয়লা নাকি কিনতে হয় না, তাই সব সময়ই প্রায় উনুন জ্বলে। বাথরুমে গরমজলের কলে দিনরাত এবং বারোমাসই গরম জল মেলে। সরকার থেকে পাখা, রেডিও অনেক কিছুই দিয়েছে—আসবাবপত্র ত বটেই।

এত স্বাচ্ছন্দ্য এবং প্রাচুর্যের মধ্যে পূর্ণবাবু তাঁর এই দীর্ঘ জীবনে একটি দিনও কাটান নি। সুতরাং প্রথম প্রথম ভারি একটা আরাম বোধ করলেন।

কিন্তু দিনকতক পরেই সত্যটা আরব্য রজনীর দৈত্যের মত সামনে এসে দাঁড়ায় তার বিকট চেহারা নিয়ে। তাহ'লে ত বিমলের কথাটাই ঠিক। এই সুখ এবং বিলাস—এ ত কারখানারই অঙ্গ ; ব্যবস্থা হয়েছে যাদের জন্য, তাদের কারুর জীবনে 'ভীত্যর্থানাং ভয়হেতু' কোন কাজে আসবে না কোন দিন!

সোমেশও আই. এস-সি. পাশ ক'রে কোন্ এক কারখানার পাঠশালায় পড়ে এখানে এসেছিল চাকরী করতে। আর সেই জোরেই এত টাকা মাইনে পাচ্ছে, লেখাপড়ার জোরে নয়।

ভারি অস্বস্তি হয় পূর্ণবাবুর। বিলাসের এই সহস্র উপকরণ তাঁকে যেন নিরন্তর বেঁধে।

একটু অন্যমনস্ক হবার সুযোগ খোঁজেন।

সোমেশকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি খবরের কাগজ নাও না দাদুভাই ?'

সোমেশ একটু অপ্রতিভ হয়। মাথা চুলকে বলে, 'না। মানে কাগজ পেঁছায় সেই সন্ধ্যায়। তার আগে রেডিওতে তিনবার খবর শোনা হয়ে যায়। ...মিছিমিছি বাজে খরচ ক'রে লাভ কি ?'

'তা বটে।' চুপ ক'রে যান পূর্ণবাবু।

কিন্তু কোন বইও নেই এদের বাড়ী। অবশ্য পড়বার সময়ই বা কই খুব ? সোমেশ পৌনে সাতটায় (চাকরের ঘরে এলার্ম দেওয়া থাকে ঘড়িতে—সে উঠে চা ক'রে ঘুম ভাঙ্গায়—ঠিক নির্দিষ্ট সময়ে) ঘুম থেকে ওঠে—সাড়ে সাতটার ভেতর দাড়ি কামিয়ে স্নান ক'রে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়তে হয় তাকে। দুপুরে লাঞ্চ্ নিতে আসে কিন্তু সে আধঘণ্টার জন্য। বিকেল চারটেয় ছুটি হবার কথা—পাঁচটার আগে কোনদিনই ফিরতে পারে না, এক

একদিন আরও দেরী হয়। এসে চা খেয়েই ছোটে ক্লাবে। ভারি খেলাধ্লোর শখ ছেলেটির—টেনিস, গল্ফ, বিলিয়ার্ড—সব রকমই জানে। ক্লাব থেকে বাড়ী ফিরতে নটা সাড়ে-নটা বাজে—তখন ক্লান্তিতে দেহ ভেঙ্গে আসে। খেয়েই শুয়ে পড়া ছাড়া কোন উপায় থাকে না।

অরুণার অবশ্য অখন্ড অবসর। কিন্তু সে পড়তে ভাল বাসে না। বোনা এবং কাপড়ে ফুল-তোলায় তার ঝোঁক বেশী। এ ছাড়া মেয়ে আছে, রেডিও আছে, সিনেমা আছে—প্রতিবেশীরা আছেন। সন্ধ্যার দিকে পালা ক'রে আড্ডা বসে পাড়ায়। তাছাড়াও মেয়েদের একটি প্রতিষ্ঠান আছে এখানে, অরুণা আবার তার সহসম্পাদিকা। কাজও কম নয় খুব তার।

পূর্ণবাবু তবু সসঙ্কোচে একদিন বইয়ের কথাটা তুললেন।

সোমেশ ব্যস্ত হয়ে উঠল, 'তাইত, ইন্স্টিটিউটে মাসে মাসে চাঁদা দিচ্ছি, বই আসেও না কেন জানি না। দু'খানা বই আমার পাবার কথা। ওগো শুনছ, আজই লছমনকে পাঠিয়ে ভাল বই আনিয়ে দিও ত দাদুকে। সত্যি, ওঁরই বা সময় কাটে কি ক'রে?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং বই কিছু পাওয়া যায় এখানে দাদুভাই?'

'ইঞ্জিনিয়ারিং? সে ত অফিস লাইব্রেরীতে আছে। কিন্তু'—বিস্ময় আপনিই ফুটে ওঠে তার কণ্ঠে, 'কিন্তু সে আপনি—। মানে আপনার কি ও বিষয়ে পড়া আছে কিছু?'

অপ্রতিভভাবে পূর্ণবাবু বলেন, 'না না। ওটা আমার ধৃষ্টতা ছাড়া কিছু নয়। কিছুই বুঝি না। পাতা ওল্টাতেই ভাল লাগে। ও একটা হবি আর কি।'

অরুণা মাথা নেড়ে বলে, 'উঁহু। আমি জানি, আপনি ত মধ্যে মধ্যে পাড়ার ইঞ্জিনিয়ারিং ছাত্রদের কাছ থেকে বই এনে পড়তেন!'

'তাই নাকি? স্ট্রেঞ্জ!...আচ্ছা আমি এনে দেব এখন অফিস থেকে কিছু!'

ব্যস্ত-সমস্ত হয়ে উঠে পড়ে সোমেশ। আটটায় হাজরে, এতটা পথ যেতে হবে। আর মোটে পনেরোটি মিনিট সময় আছে।

পাড়াতে প্রবীণ লোকও দু' চারজন আছেন। তাঁদের কেউ কেউ যেচে-এসেই পূর্ণবাবুর সঙ্গে আলাপ করেন। কোথাও বা অরুণাই নিয়ে যায় তাঁকে। এভাবের সামাজিকতায় তিনি ঠিক অভ্যস্ত নন—তবুও তিনি যান সমস্ত রকম সঙ্কোচ কাটিয়ে। বহুদিন যে শামুকের মত একটা খোলার মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে রেখে ছিলেন—একটু বাইরের হাওয়া লাগানো সত্যিই দরকার। কিন্তু আশে-পাশের যত কোয়ার্টারেই যান—প্রায় সর্বত্রই ঐ একটা জিনিস লক্ষ্য করেন পূর্ণবাবু—বইয়ের বালাই নেই। দু' এক জায়গায় গৃহিণীরা লাইব্রেরী থেকে বই আনান বটে—কেনা-বই কারুর বাড়িতে দেখা যায় না। অথচ প্রচুর পয়সা খরচ করেন প্রত্যেকেই, অনাবশ্যক বিলাস দ্রব্যে অর্থব্যয়ের কার্পণ্য নেই একটুও। ফেরী-ওয়ালার দল দুপুরে বা বিকেলে এই সব কোয়ার্টারে উজাড়

করে দিয়ে যায় নানাবিধ পণ্য। ডাকেও আসে কত কী জিনিস! শুধু বই-ই আসে না কারুর বাড়ী।

বন্ধুদের সঙ্গে বসে গল্প ক'রেও খুব তৃপ্তি পান না পূর্ণবাবু।

অধিকাংশই আলাপ-আলোচনাই পারিবারিক জীবনের পথ ধরে চলে। ছেলেমেয়েদের অকৃতজ্ঞতা, বর্তমান যুগের মতি গতি, গৃহিণীদের নির্বুদ্ধিতা —এই সব। তা নাহলেও বৈষয়িক কথাবার্তা বেশী।···শিক্ষিত লোকও আছেন এঁদের মধ্যে। তাঁদের কাছে পূর্ণবাবু সাহিত্য বা দর্শনের কথা তুলতে চেয়েছিলেন, দু-একজনের সঙ্গে এ সব বিষয়ে আলাপ ক'রে আনন্দও পেয়েছেন কিন্তু সেদিকে তাদের মন না থাকায় কিছুতেই সে পথে আলোচনাটাকে ধরে রাখতে পারেন নি। পূর্ণবাবুর কেমন একটা ধারণা ছিল যে বৃদ্ধ হ'লেই মানুষের মন ঈশ্বরাভিমুখী হয়—সেভুলটাও এবার ঘুচল। দু-একজন শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করেন বটে, কিন্তু সেই পাঠের অহঙ্কার ছাড়া তাঁদের কাছ থেকে কিছুই পাওয়া যায় না। সে সব বইয়ের ভেতরে তাঁরা ঢুকতে পারেন নি।

এদের চেয়ে পথের ধারে দু একজন মজুরের সঙ্গে কথা ক'য়ে তবু আনন্দ পেয়েছেন পূর্ণবাবু। জীবন সম্বন্ধে এদের ধারণা খুব সংক্ষিপ্ত কিন্তু স্পষ্ট। এরা বিবেককে বেশী ভয় করে, ঈশ্বরকে বেশী ভালবাসে—ঐ সব তথাকথিত শিক্ষিত লোকের চেয়ে। কিন্তু এদের সঙ্গে বেশী মিশতে আবার পূর্ণবাবুর সাহসে কুলোয় না—কী জানি, অফিসার নাত-জামাই, সে আবার কি ভাববে। হয়ত সে পছন্দ করে না এই ধরণের মেলামেশা।

পূর্ণবাবু আবারও গুটিয়ে নেন নিজেকে। সোমেশ দু একখানা ইঞ্জিনিয়ারিং বই এনে দিয়েছে অফিস থেকে, সেইগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করেন। এগুলোর মধ্যেই তবু আজও কিছু শান্তি আছে!

॥ ১৭ ॥

পূর্ণিমা সেদিন এসে পর্যন্তই কেমন উসখুস করছিল। সেটা বিমলের চোখে পড়বার কথা নয়, কারণ সাধারণতঃ সে যখন কাজ করে একমনেই করে এবং যখন করে না, তখন অন্যমনস্ক হয়ে বসে থাকে। আর সে 'অন্য'টা ঠিক পার্শ্বর্তিনীদের কেউ নয়—তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু সেদিন বিমলের টেবিলে কাজ ছিল কম, মনটাও ছিল অনেক দিন পরে কিছু হাল্‌কা। তাই কয়েকবারই সে মাথা তুলে পূর্ণিমার দিকে তাকাল এবং প্রত্যেকবারই লক্ষ্য করল যে পূর্ণিমা তার দিকে কেমন একরকম ভাবে চেয়ে আছে। অর্থাৎ যেন কিছু বলতে চায়—অথচ ঠিক ভরসা ক'রে বলতে পারছে না।

অকস্মাৎ বিমলের মনটা কোমল হয়ে উঠল। সে নিজের কাছে অকারণেই স্বীকার করল যে পূর্ণিমা মেয়েটি মোটের ওপর মন্দ নয়। সাধারণ মেয়েদের মতই হয়ত ওরও কিছু বুদ্ধির অভাব আছে কিন্তু আন্তরিকতার অভাব নেই। খাটতে সে চায়, খাটেও। কাজে ভুল হয়, তবে ফাঁকি দেয় না। তাছাড়া

পূর্ণিমাই অন্তত তার সেকশ্যানের একমাত্র মেয়ে—সংসার চালানোর জন্য চাকরী করতে হচ্ছে বলে যে অনুযোগ করে না।

মনের এই একটি বিশেষ দুর্বল অবস্থায় বিমলের কণ্ঠস্বরটা আশ্চর্য স্নিগ্ধ শোনায়। সে প্রশ্ন ক'রে বসে, 'কী ব্যাপার আজ আপনার—মিস রায়? ··ফাইলে যে একেবারেই মন বসছে না।···আপনারও কী জয়ন্তী চৌধুরীর হাওয়া গায়ে লাগল না কি?'

পূর্ণিমা নিমেষে রাঙা হয়ে ওঠে। তবে তার কণ্ঠস্বরে একটু প্রচ্ছন্ন তিরস্কারের সুরই বাজে। সে আস্তে আস্তে বলে, 'ওসব চিন্তাবিলাসের অবস্থা আমার নয় বিমলবাবু, সে ত আপনি জানেনই।'

বিমলও বোধ করি কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই সচেতন হয়ে পড়েছিল। সে তাড়াতাড়ি অনুতপ্ত সুরে বলল, 'কিছু মনে করবেন না মিস রায়, কথাটা বলা আমার ঠিক হয় নি। আপনাকে অন্যমনস্ক দেখছিলুম বলেই—'

কথাটা অসমাপ্ত রেখেই বিমল একটা 'জরুরী'-মার্কা ফাইল টেনে নেয়।

কিন্তু পূর্ণিমা যেন নিজেও একটু বিব্রত হয়ে পড়ে। তার বড় টেবিলটার অপর প্রান্তে রেখা বসে, সে আজ আসে নি। তারই শূন্য চেয়ার-খানার দিকে চেয়ে সে কলমটা নিয়ে নাড়া-চাড়া করে শুধু—কাজে মন দিতে পারে না কিছুতেই। বিমল সেটা চোখে না দেখলেও অনুভব করতে পারে কিন্তু আর কোন প্রশ্ন করে না, বা ওর দিকে তাকায়ও না। একবারের শিক্ষাই যথেষ্ট, অনধিকার চর্চা সে আর কোন-মতেই করবে না, মনে মনে এই প্রতিজ্ঞাই করে বার বার।

এ যেন কী একটা হয়ে গেল। পূর্ণিমার মুখে এই ভাবটাই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ততক্ষণে। যে সুরে এই মাত্র ওদের কথোপকথন হয়ে গেল—সেটার ঠিক উলটো সুরে কথাটা কী ক'রে শুরু করা যায়, এই কথাটাই ত ভেবেছে পূর্ণিমা—বলতে গেলে সারা সকাল ধরে। তার যেন কান্না পায় অদৃষ্টের এই অকরুণ এবং অকারণ পরিহাসে। চোখ-দুটো ছল ছল করতে থাকে।

অনেকক্ষণ পরে, বোধ হয় প্রাণপণে সাহস সঞ্চয় ক'রেই—কতকটা কাঁদো কাঁদো গলাতে সে খুব চুপি চুপি প্রশ্নটা করে, 'আমার ওপরে কি রাগ করলেন আপনি?'

কণ্ঠস্বরটা ভুল বোঝবার উপায় নেই। চমকে মুখ তোলে বিমল, বিস্মিত ভাবে প্রশ্ন করে, 'সে কি! আমি রাগ করব কেন মিস রায়। রাগ ত আপনারই করবার কথা! আমার অনধিকার চর্চা শুধু নয়—ধৃষ্টতায়।··· কিন্তু আপনি কি বসে বসে এখনও সেই কথা ভাবছেন না কি? ছি ছি, আপনি বড্ড ছেলেমানুষ!'

এবার আর চোখের জল বাধা মানে না। লজ্জা পেয়ে তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে রুমাল বার ক'রে চোখ দুটো মুছে নেয় পূর্ণিমা। তারপর ধরা ধরা গলায় বলে, 'আমার বরাতটাই মন্দ, যা করতে যাই উল্টো হয়ে যায়। দেখুন

না সকাল থেকে ভাবছি আপনার মনটা ভাল থাকলে সময় বুঝে একটা অনুরোধ করব—অথচ আপনাকেই রাগিয়ে বসে রইলুম !'

'কী বিপদ !' এবার বিমলের বিব্রত হবার পালা—'আমি রাগ করলুম এটাই বা ধরে নিচ্ছেন কেন ? আমি সত্যিই রাগ করি নি। বরং লজ্জিত হয়েছি নিজের অসতর্ক কথায়।...আমার বরং জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল যে আপনার শরীরটা খারাপ লাগছে কি না। যে রকম উসখুস করছিলেন—! সত্যিই শরীর খারাপ হয় নি ত ?'

'না না। আসলে আপনার কাছে একটা কথা পাড়বার জন্যে সাহস সঞ্চয় করছিলুম। বার বার চেষ্টা করছিলুম—কিন্তু ভরসায় কুলোচ্ছিল না।'

বিমল বিস্মিত হয়ে বলে, 'কেন ? কী এমন কথা ? অসম্মানজনক কিছু ? গালাগাল দিতে চান ?'

'কী যে বলেন—!' হেসে ফেলে এইবার পূর্ণিমা, 'সে সব কিছু নয়।'

তারপর আরও একটু চুপ ক'রে থেকে বলে, 'কাল আমি নিজে হাতে একরকম পিঠে করেছিলুম, গোকুল পিঠে। মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন অবশ্য—কিন্তু করেছি সব নিজে। আপনার জন্য গোটা-দুই এনেছিলুম, খাবেন কিনা এইটেই প্রশ্ন করতে সাহস হচ্ছিল না !'

এক নিঃশ্বাসে, যেন মরীয়া হয়েই ব'লে ফেললে পূর্ণিমা। কিন্তু প্রত্যাখ্যানের আশঙ্কাতে মুখ ওর বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ততক্ষণে।

বিমল মুখে একটা অস্ফুট শব্দ ক'রে বলে, 'ও হরি, এই কথা !...তা এত ভয় কেন বলুন ত, আমি কি এতই ভয়ানক লোক যে একটু মিষ্টি খাবার কথাও আমাকে ভরসা ক'রে বলা যায় না ?'

'কী জানি বলুন—এক কাপ চা খাওয়াতে চাইলেই আপনি কত কথা বলেন ! হয়ত বলে বসবেন যে আপনাকে এর বদলে যখন মিষ্টি ক'রে খাওয়াতে পারব না—তখন আপনার কাছে খাবোও না !'

অন্যদিকে মুখ ক'রে বললেও পূর্ণিমা বেশ স্পষ্ট ক'রেই বলে কথাগুলো।

'বা, আপনারও ত বেশ স্পাইট্ আছে দেখছি ! সেদিন থেকে মনে ক'রে রেখেছেন কথাটা !...আচ্ছা আর বলব না। দিন, কী পিঠে করেছেন দেখি—'

নিজের হাতব্যাগটা থেকেই তাড়াতাড়ি ছোট্ট একটা টিফিন-কৌটো বার ক'রে দেয় পূর্ণিমা। বিমল ওর স্বভাব-ছাড়া আগ্রহ দেখায়—তখনই একটা পিঠেতে কামড় লাগিয়ে বলে, বাঃ ! চমৎকার হয়েছে ত ? এ কী সত্যিই আপনি করেছেন ?'

'হ্যাঁ মশাই। বিশ্বাস না হয় মাকে জিজ্ঞাসা করবেন চলুন !' পূর্ণিমা কিন্তু ঐটুকু প্রশংসাতেই যেন খুশিতে ঝলমলিয়ে ওঠে।

'না সত্যিই বড় ভাল হয়েছে। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমাদের বাড়ীতে কত কাল যে এসব হয় নি। স্বাদই ভুলতে বসেছি। .. আর হবেই বা কি ক'রে, ডালভাতের যোগাড় করতেই প্রাণান্ত, এসব আহার ত এখন আমাদের কাছে বিলাস !'

'আমাদের অবস্থাও আপনাদের চেয়ে খুব ভাল নয়। নেহাৎ আমার উৎসাহ দেখেই—নতুন শিখছি বলে—মা বাধা দিতে পারেন নি। কিন্তু তাঁর মুখ শুকিয়ে উঠেছে। অন্য অনেক খরচ থেকে বাঁচিয়ে এটা পূরণ করতে হবে। তাই ত বেশী করতে পারি নি। গুনে-গেঁথেই করতে হয়েছে!'

বিমল কৌটোটা ওর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে বললে, 'ধুয়ে দিয়েছি এক দফা—তবু দিতে সঙ্কোচই হচ্ছে। মেজে দেবার ত কোন উপায় নেই।'

'পাগল হয়েছেন আপনি! আমাকে গিয়ে ত বাসনের পাঁজা নিয়ে বসতেই হবে।'

তারপর কতকটা ছেলেমানুষের মতই বলে, 'আপনার কথা আমি মিথ্যে প্রমাণ করবই। জানেন আজ চোদ্দ দিন ঝি আসছে না, তার মেয়ের কলেরা। দু'বেলা সব বাসন আমি নিজে মাজি! তাছাড়া রাত্রের রান্নাও রোজ রাঁধি। মাকে কিছুতেই রান্নাঘরের দিকে আসতে দিই না। আর তাও যেমন তেমন ক'রে নয়—মা কাল স্বীকার করেছেন যে—এবার আমার কাজ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে এসেছে। আমার হাতে হেঁসেল ছেড়ে দিতে আগে যতটা ভয় করত এখন আর তত করে না!'

বিমল কিছুক্ষণ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে বলে, 'এই বাড়তি খাটুনির জন্যে কিন্তু আমাকে দায়ী করবেন না। আপনারা যা, আমি তাই বর্ণনা করেছি—অন্যরকম হ'তে বলি নি। সে ধৃষ্টতাও আমার নেই।…তবে সত্যি কথা বলতে কি এতে কোন ক্ষতি হয় নি আপনার, বরং কতকটা ফ্রেশই দেখাচ্ছে এই ক-দিনে!'

লজ্জায় খুশীতে আরও রাঙা হয়ে ওঠে পূর্ণিমা। অপাঙ্গে দ্রুত একবার নিজের হাত-পা গুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বলে, 'কে জানে। অত লক্ষ্য করি নি। তবে খারাপ কিছু লাগছে না, এটা ঠিক।'

অফিসের ফেরৎ বিমলের একটা চায়ের নিমন্ত্রণ ছিল। সাধারণত এ ধরণের নিমন্ত্রণে সে যায় না, কিন্তু আজ ওর না গেলেই নয়। কুমুদীশ ওর বহুকালের বন্ধু! কলেজ জীবনে যে ক-টি ছেলের সঙ্গে ওর সত্যকার সৌহার্দ্য হয়েছিল কুমুদীশ তাদেরই একজন। ছাত্র সে খুব ভাল ছিল না কোনদিনই কিন্তু মানুষটা ভাল ছিল। কোন মতে এম. এ-তে ফার্স্ট ক্লাসটা পেয়ে গেল, তার ওপর বাবাও একটা কী বড় চাকরী করেন যেন—তাই তদ্বিরের জোরে এক বেসরকারী কলেজে অধ্যাপনার কাজ পেয়েছে। বেতন বেশী নয়, এখন থেকেই টিউশনী শুরু করতে হয়েছে, তবু কুমুদীশ সুখী। সে ইচ্ছে করলে সরকারী চাকরী পেত কিন্তু তার নাকি এইতেই আনন্দ। ঐ কাজ পাবার পর যেদিন প্রথম দেখা হয়, সেদিন বিমলও একটু অনুযোগ করেছিল। তার জবাবে কুমুদীশ বলেছিল, 'না ভাই আমার বহুদিনের শখ, বেশ থাকি আমি ছেলেদের মধ্যে। সরকারী অফিসের ফাইল ঘাঁটার চেয়ে এ ঢের ভাল। আর সম্মান কত। যখন অনেক ছাত্র হয়ে যাবে—তখন যেখানেই যাবো, কেউ না কেউ

এগিয়ে এসে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। ভাবতেই আমার ভাল লাগে। আর কী হবে, সরকারী চাকরীতে বা এমন কি রাজা হতুম। পৈতৃক বাড়ী আছে, বাবা যা জমিয়েছে তাতে তাঁর শেষ বয়স কেটে যাবে ভাল ভাবেই। আমার সংসারটা আমি চালিয়ে নিতে পারব না ?'

বিমলের ভালই লেগেছিল কথাগুলো। পড়াতে ভাল লাগে বলে পড়াতে যায় এমন মানুষ আজকাল ত পাওয়াই শক্ত।

সেই কুমুদীশের বাড়ী নিমন্ত্রণ। উপলক্ষটা কুমুদীশ বলে নি। বলেছে, 'চা খেতে বলছি চা খেতে আসবি। অত কারণে দরকার কি ? কারণ বললেই—তা যত তুচ্ছ কারণই হোক,—উপহার কিনতে দৌড়বি। উপহার দেওয়াটা মধ্যে ছিল ফ্যাশন, এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে ব্যাধি। ক্ষমতা থাক বা না থাক—মোটা টাকা দিয়ে উপহারের জিনিস কিনতে হবে। তাতে শেষ মাসে পয়সার অভাবে বাজার না হয় সে-ও ভাল।·· না, কারণ দরকার নেই। দয়া ক'রে অকারণেই যেও।'

অবশ্য উপলক্ষটা বিমল অনুমান করতে পারে।

চাকরী পাবার পরই কুমুদীশের বিয়ে হয়েছিল। মাস-ছয়েক আগে ছেলে হয়েছে। সম্ভবত, সেই ছেলেরই অন্নপ্রাশন। কিন্তু কুমুদীশ যখন কারণ বলতে চায় না—ওরই বা গরজ কি ? তাছাড়া—সত্যিই, উপহার কিনতে গেলে ওর পক্ষে যাওয়াই সম্ভব হ'ত না।

কুমুদীশের বাড়ী গিয়ে দেখলে নিমন্ত্রণের পরিধিটা খুব বিস্তৃত নয়। ওর কলেজের অধ্যাপক জন-সাতেক, বিমল আর তাদের আর একজন সহপাঠী এবং কুমুদীশের শালা। মোট এই ক-টি লোক। উপলক্ষটা কেউ-ই জানে না—অন্তত সরকারী ভাবে জানে না। কুমুদীশ তার ছেলের কথাটা উল্লেখই করলে না—সামনে কেউ নিয়েও এল না। বোঝা গেল যে এ বিষয়ে তার কড়া নির্দেশ আছে। কেউ পাছে উপলক্ষটা অনুমান ক'রে নিয়েও অপ্রতিভ হয়, সেই জন্যই এত সতর্কতা।

অনেকদিন পরে এই পার্টিতে এসে ভারি ভাল লাগল বিমলের। কুমুদীশের রুচিজ্ঞান আছে, আহার্যের আয়োজনটা দু' তিন দফায় এসে পৌঁছতে লাগল, তার সঙ্গে প্রতিবারই একপ্রস্থ ক'রে চা। গল্প-গুজবের সঙ্গে কিছু কিছু খাওয়া—এটা যে কোন বিশেষ উপলক্ষে ভোজের আয়োজন তা কারুর মনেই হ'ল না। বহু রাত্রি পর্যন্ত যে কোথা দিয়ে সময় কেটে গেল তাও কেউ বুঝতে পারল না।

এই মজলিশে বসে একটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা হ'ল বিমলের।

কুমুদীশ নিজে কলা-বিভাগের ছাত্র। সেই বিভাগেই সে অধ্যাপনা করে। যে সব সহকর্মীদের সে নিমন্ত্রণ করেছে তাঁরাও বেশীর ভাগ ঐ বিভাগেরই লোক , কেবল একজন মাত্র বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন—তাঁর নাম নির্মলবাবু, কেন যে তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছে দলের বাইরের লোক হওয়া সত্ত্বেও, তা পরিচয়ের সময়ই কুমুদীশ বলে দিলে, 'ভারি আপরাইট লোক, আর তেমনি নিয়মনিষ্ঠ।

ফাঁকি বলে কোন শব্দ ওঁর অভিধানে নেই। খুব শ্রদ্ধা করি আমি ওঁকে।'

কিন্তু প্রাথমিক আলাপের পর নির্মলবাবু একেবারে চুপ ক'রে বসেছিলেন। তাঁর সহকর্মীদের উচ্চ-কণ্ঠ আলোচনার মধ্যে কোন অংশই নেন নি। ওধারে সাহিত্য, সমাজ-বিজ্ঞান, রাজনীতি, ইতিহাস—এবং বাঙ্গালীর যা সবচেয়ে প্রিয়প্রসঙ্গ—কর্মজীবন নিয়ে যখন তাঁরা কথার তুবড়ি ছড়িয়ে যাচ্ছেন—এমন কি ঝড় ওড়াচ্ছেনও বলা চলে—তখন তাঁদেরই এক পাশে বসে ভদ্রলোক মধ্যে মধ্যে একখানা বিলাতী মাসিকের পাতা ওলটাচ্ছিলেন নয়ত বিমলের কোন প্রশ্নের উত্তরে অতি সংক্ষিপ্ত দু-একটা উত্তর দিচ্ছিলেন।

ফলে বিমলের ধারণা হয়ে গিয়েছিল যে উনি অত্যন্ত মিতভাষী গম্ভীর প্রকৃতির লোক।

কিন্তু হঠাৎ সে ভুলটা ভেঙ্গে গেল অভাবনীয় ভাবে।

অধ্যাপকদের মধ্যে কে একজন ইতিমধ্যে য়্যাটমবোমার কথা তুলেছিলেন এবং প্রসঙ্গক্রমে ভুলক্ষেত্রে 'য়্যাটম' শব্দটির প্রয়োগ করেছিলেন।

অকস্মাৎ নির্মলবাবু যেন বোমার মত ফেটে পড়লেন, 'ওটা য়্যাটম নয়, আইসোটোপ!'

এবং তারপরই তিনি সবিস্তারে ও সোৎসাহে বোঝাতে লাগলেন আণবিক বোমার বিচিত্র কার্য-কারণ রহস্য। তিনি যে এত দ্রুত এত কথা বলতে পারেন তা বিমল এতক্ষণ ধারণাই করতে পারে নি। বিজ্ঞানের জটিলতা বেশ দিনের আলোর মতই স্বচ্ছ ও স্পষ্ট হয়ে উঠল। অর্থাৎ ভদ্রলোক সাধারণ ভাসা-ভাসা লেখাপড়া করেন নি—বেশ ভাল ভাবে তার গভীরেও ডুবেছেন। হজম করেছেন পুঁথির পাঠগুলো।

সে শুধু বিস্মিত হ'ল না—তার একটা জ্ঞানও হ'ল আজ। বর্তমান শিক্ষার আর-একটা দিকও দেখতে পেলে। যারা বিজ্ঞান পড়ে, তারা বিজ্ঞানের বাইরে আর কিছু জানে না,—যারা আর্টস-এর ছাত্র তারা বিজ্ঞানের সাধারণ খবরগুলোও রাখে না। অথচ এঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত, সব কজনই অধ্যাপক। মানুষের জীবনে যে সব তথ্য জানা আজ একান্ত আবশ্যক হয়ে পড়েছে, প্রতিনিয়ত যাদের কথা শুনতে হচ্ছে—সেই সব তথ্য বা সেই সব বিষয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকেও এঁরা অনায়াসে উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ব'লে চলে যাচ্ছেন। এটা দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পক্ষে নিশ্চয়ই খুব গৌরবের কথা না।

শেষের দিকে এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল বিমল, নির্মলবাবুর পুরো কথাগুলো তার কানেও যায় নি।

শুধু আর্টস্ বা সায়ান্সের মোটা বিভাগটাই বা কেন? একটু আগে অমিয়বাবু, জিতেনবাবু যে সব কথা আলোচনা করছিলেন—তারই কি সবটুকু ওর বোধগম্য? অথচ সে-ও আর্টস্-এর ছাত্র, বেশ ভাল রকম শিক্ষিত বলেই সে দাবী করে নিজেকে—তার পিসীমার ভাষায় চার-চারটে পাস করেছে সে। ...এ পাস করার প্রকৃত মূল্য আরও একবার বোঝা গেল আজ!

এঁদের আলোচনা থেকে একটা খবর শুনল সে। সরকারী শিক্ষা বিভাগ টেক্‌নিক্যাল বিদ্যা-সংস্থাগুলিতে হিউম্যানিটি বলে একটা বিভাগ খোলবার আয়োজন করেছেন। সে বিভাগে নাকি সাহিত্য, শিল্পের একাধিক বিষয় পড়াবার ব্যবস্থা থাকবে। ইচ্ছামত আবশ্যিক বিষয়গুলির সঙ্গে এরও একটা নিতে পারা যাবে। কিন্তু তাতেই কি খুব লাভ হবে? করুণাময় বাবু একটু আগেই বিদ্রূপ ক'রে যা বলছিলেন, 'অর্থাৎ কতকগুলি লোককে মোটা মাইনে দিয়ে পোষবার ব্যবস্থা হচ্ছে আর কি! যাকে ইলেক্‌ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে ভবিষ্যৎ জীবনে ক'রে খেতে হবে, বিলিতী কাব্য বা ছবি আঁকা তার কি উপকারে আসবে বাপু?' কথাটা খুব মিথ্যা নয়। তবে আর কি করবার আছে তাও ত ভেবে পায় না!

এটা সে বুঝতে পারে—বিশেষত আজ আরও ভাল ক'রে বুঝতে পারলে—হাই স্কুলের পাঠক্রমটাই প্রসারিত ক'রে এমনভাবে তার পাঠ্যতালিকা তৈরী করা দরকার যাতে সেইখানে যারা লেখাপড়া শেষ করবে, তারা যেন বর্তমান যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে। দুনিয়ার খবর যাতে তাদের কাছে হিব্রু বা গ্রীকের মত দুর্বোধ্য না ঠেকে। কিন্তু আর পাঠ্যতালিকা বাড়ালেও চলবে না এটাও সে বোঝে, বর্তমানে যা আছে তাই ঢের বেশী। ঢেলে সাজাতে হবে এ পাঠ্য সূচী। কিন্তু কী ভাবে, তা অবশ্য ওর বোঝবার বা জানবার কথা নয়। যাঁরা ভাবতে পারেন, যাঁরা পথ দেখাতে পারেন তাঁরা ত নির্বিকার! গতানুগতিক পথেই খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাহবা পেতে চান।

নির্মলবাবুর বক্তব্য শেষ হয়ে গিয়েছিল ইতিমধ্যে। লাভের মধ্যে ওঁর কথাগুলো শোনা হ'ল না। কী সব খাবারও এসে গিয়েছিল। এই শেষ-প্রস্থ বোধ হয়। অধ্যাপকরাও ওঠার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

পূর্ণ মাস্টার মশাইয়ের মত লোক যদি ক'জন থাকত দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে!

নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই হেসে ওঠে বিমল।

॥ ১৮ ॥

মণি তার কথামত ঠিক পরের রবিবারই পুলককে পড়াতে এসেছিল। খুবই বিরক্তির সঙ্গে এসেছিল তাতে সন্দেহ নেই—সেটা সে পরে একদিন নিজের মুখেই স্বীকার করেছিল বিমলের কাছে। এমন কি, যদি ঠিক তার দু'দিন আগেই বিমল ওর অভিনয় দেখতে না যেত এবং অভিনয়ের শেষে অমন উচ্ছ্বসিত প্রশংসা ক'রে না আসত ত, সুবিধামত কথাটা ভুলে যেতেও বোধ করি ওর বাধত না। নেহাত আটচল্লিশ ঘণ্টার আগের ব্যাপার বলেই ভোলার সুযোগ পাওয়া গেল না। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রের কাছে প্রশংসা পাওয়ার মাদকতা খুব কম নয় আজও—যতই কেন না মণি মুখে

উড়িয়ে দিক ডিগ্রিটাকে—, আরও কিছু প্রশংসা শোনবার লোভও বোধ করি তার ছিল।

সে যাই হোক—পড়াতে বসে খুব কিন্তু খারাপ লাগল না ওর। বরং মণি একটু বিস্মিতই হ'ল নিজের মনোভাব দেখে। তার যেন কেমন ভালই লাগল অভিজ্ঞতাটা। আসলে মেধাবী ও মনোযোগী ছাত্রকে পড়ানোতে শিক্ষকেরও যে একটা সুখ আছে—সেটা এতদিন অনুভব করবার কোন সুযোগ-সুবিধাই হয় নি ওর। এই প্রথম ওর সে অনুভূতি হ'ল। সে উঠে আসবার সময় হঠাৎ ঝোঁকের মাথায় ব'লে এল—'এই বুধবার আমার ছুটি আছে—তোমার কারখানারও ত ছুটি? আমি সে দিন আসতে পারি হয়ত।'

পুলকের বিস্ময় এবং আনন্দের সীমা রইল না। সম্ভব হ'লে খুশির চোটে সে খানিকটা লাফালাফিই ক'রে নিত হয়ত। তখন বিমল বাড়ী ছিল না, ফিরে আসতেই প্রায় ছুটতে ছুটতে গিয়ে তাকে সংবাদটা দিলে। বিমলও যে একটু চমকে উঠল তা বলা বাহুল্য। সে পুলকের মাথায় একটা হাত রেখে বললে, 'এ যে তোর কতবড় ট্রায়াম্ফ্ তা তুই জানিস না পুলক। যে কোন জেনারেলের একটা বড় যুদ্ধ জেতার চেয়েও কঠিন কাজ—শিক্ষায় বীতশ্রদ্ধ একজন হার্ডহার্টেড্ শিক্ষককে শিক্ষাদানে উৎসাহিত করা।'

মণি অবশ্য ঝোঁকের মাথায় কথাটা ব'লে ফেলে একটু অনুতপ্তই হয়েছিল। এবং সন্ধ্যানাগাদ নিজের মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিল যে সে 'হয়ত' বলেছে—পুরোপুরি যাকে 'কথা দেওয়া' বলে—তা সে দেয় নি। সুতরাং প্রতিশ্রুতিভঙ্গ বা—পালনের কোন প্রশ্ন এখানে উঠ্‌তেই পারে না। আর সে ত মাইনে নিয়ে পড়াচ্ছে না—পুরোপুরি প্রতিশ্রুতি দিলেও না-যাওয়াটা এমন কিছু অপরাধ বলে গণ্য হ'ত না।...সে মন স্থির ক'রেই ফেললে যে বুধবার সে যাবে না—পরের রবিবারেও না। যেমন আগে কথা ছিল মাসে দুদিন—তাই যাবে সে—। অত কিসের?

কিন্তু বুধবার সকালে বাজার-হাট চুকিয়ে, চা-জল খাবার খেয়ে সিগারেট দেশলাই এবং পাশের-ঘর-থেকে-চেয়ে-আনা খবরের কাগজখানা নিয়ে যখন নিশ্চিন্ত হয়ে বসল সে, তখন যেন আর ভাল লাগল না। কেমন একটু উসখুস করতে লাগল মনটা। কোন্ এক অজ্ঞাত কারণে বিনাপারিশ্রমিকের ঐ ছাত্রটি তাকে বেশ একটু প্রবলভাবেই আকর্ষণ করতে লাগল। অবশেষে সে মনকে বোঝাল যে আজ সকালে হাতে কাজ কম আছে—এর পরের দুই রবিবারই হয়ত এমন কাজ পড়বে যে পাঁচ মিনিটও ফুরসুৎ পাওয়া যাবে না। পর পর দুদিন গিয়ে যদি সে তিনটে রবিবারও না যায় ত কারুর কিছু বলবার থাকবে না। বরং আজ যখন এক রকম 'কথাই' দেওয়া হয়েছে তখন আজ যাওয়াই ভাল। তাতে কথার ঠিক রাখার গৌরবটাও পাওয়া যাবে।

এবং মনকে বোঝানোর পালাটা ভাল ক'রে শেষ হওয়ার আগেই সে এক সময় জামাটা গলিয়ে আর একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বাড়ী থেকে বেরিয়ে পড়ল।

তার পরের রবিবারও মণি গেল। তার পরের রবিবারও।

মনকে আর বোঝাতে হয় না। সে এবার নিজের মনের কাছেই স্বীকার করেছে যে এটা যেন তাকে এক নতুন নেশায় পেয়ে বসেছে। নেহাত অভিনয়ের নেশাটা আরও বড়, নইলে সে হয়ত বিকেলেও যেত। প্রায় প্রত্যেক ছুটির দিনেই বিকেলে কোথাও না কোথাও রিহাস্যাল থাকে, তাই ওখানটায় আর কিছু করা যায় না।

ওর কান্ডকারখানা দেখে বিমলও অবাক হয়ে যায়। এক একদিন পড়াবার সময় সেও বসে থাকে কাছে। মণিকে যে এটা নেশায় পেয়ে বসেছে তা সেও বুঝতে পারে। প্রচুর পারিশ্রমিক পেলেও কোন প্রাইভেট টিউটার এমন পরিশ্রম করে কিনা সন্দেহ। বস্তুত সুধমাত্র পারিশ্রমিকের জন্য একাজ বোধ হয় সম্ভব নয়। বিমল নিজে বিজ্ঞানের ছাত্র নয়—তবু এটা সে বোঝে যে ল্যাবরেটরী ছাড়া বিজ্ঞান পড়ানো প্রায় অসম্ভব, বিশেষ ক'রে যেখানে ল্যাবরেটরী কী বস্তু সে সম্বন্ধে ছাত্রের কোন ধারণা পর্যন্ত নেই। অথচ সেই অসম্ভবই সম্ভব করছে মণি. শুধু নিজের কথার দ্বারা সেই সমস্ত অভাব পূরণ ক'রে পুলককে সে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছে জিনিসটা। বিমল কৃতজ্ঞ হয়, অভিভূত হয়। তবে এটাও সে বোঝে যে এটা নিছক বন্ধুকৃত্য নয়। এর কৃতিত্ব পনেরো আনাই পুলকের প্রাপ্য।

কিন্তু এইখানেই এ পর্বের শেষ হয় না। এ নেশা ধীরে ধীরে মণিকে এমনভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে যে সে স্কুল সম্বন্ধে ক্রমশঃ সজাগ হয়ে ওঠে। স্কুলের কাজটাও যে তার পড়ানোর—সে কথাটা যেন নতুন ক'রে মনে পড়ে ওর। সে একটু একটু পরখ ক'রে দেখতে শুরু করে। মন দিয়েই পড়ার এক একদিন। আরও আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করে যে ফল ভালই হয়। ছেলেগুলির বেশীর ভাগই যে খুব বোকা এবং 'মীসচিভাস' নয়—এটাও ক্রমশ অনুভব করে সে। আর তারপর থেকে যেন কাজটা অত বেশী খারাপও লাগে না।

এ সম্বন্ধে সে তার সহকর্মীদেরও মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়েছিল বৈকি। কিন্তু ক্ষেত্র কঠিন, কাজটা অত সহজ হ'ল না। তাঁরা উড়িয়েই দিলেন ব্যাপারটা। শুধু তাই নয়, বেশ একটু হাসাহাসিই পড়ে গেল তাঁদের ভেতরে।

ফণীবাবু বললেন, 'মরেছে রে। গরীবের ঘোড়ারোগ ধরল বুঝি। ও মণি ভাই, এসব আবার মাথায় ঢোকালে কে হে তোমার? বাবা, টিউশনী করে খেতে হবে। ইস্কুল ছাড়া হাঁফ ছাড়বার জায়গা কোথায় বলো দিকি? ওসব কেতাবী কথাবার্তা ছাড়ো দিকি বাপু!'

অপরেশ বাবু বললেন, 'খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে, কাল করলে তাঁতি এঁড়ে গরু কিনে! তাই হয়েছে তোমার ··কেন ঘ্যানর ঘ্যানর করছ বলো ত বাবা··· যার যা, টিউশনী না পেলে ত আমাদের হাঁড়ি রইল শিকেয় তোলা; অত

বারফট্টাইতে দরকারটা কি ? ওসব নিয়ে মাথা ঘামাতে পারেন বরং পণ্ডিত মশাই, ওঁর টিউশনীর বালাই নেই !'

হেড্ পণ্ডিত মাথা নেড়ে বললেন, 'জোটে হে জোটে। আমাদেরও জোটে। কেমন হে নিকুঞ্জ বলি নি তোমাকে—সেই যে সেদিন যে ছেলেটি ভর্তি হ'তে এল—গেল হপ্তায় ? বললুম যে ছেলেটা শাঁসে-জলে আছে, ক-টা ভাল টিউশনীর মওকা এল। তুমি ত আমার সঙ্গে তর্ক করলে খুব, বললে ক-টা আবার। বাপ ট্রামে এসেছে, সে আবার ক-টা মাষ্টার রাখবে। বড় জোর পঞ্চাশ টাকার একটা মাষ্টার খুঁজবে, বলবে সব সাব্জেক্ট্ পড়াও।...তাকে কী রকম ঘায়েল করেছি জানো ? আমি পড়াবো সপ্তাহে তিন দিন সংস্কৃত—চল্লিশ ! অটলকে ঠিক ক'রে দিয়েছি ইংরেজী আর অঙ্ক রোজ পড়াতে হবে, একশ কুড়ি। তা ছাড়া সমরেশ আছে হিস্ট্রি, সেও সপ্তাহে তিন দিন—চল্লিশ। পুরো দুশোটি টাকা !'

'বলেন কি ?' নিকুঞ্জর চোখ দুটো জ্বলে ওঠে, 'কী করে বাপটা ? গাড়ী কেনে নি কেন ?'

'ঐ জন্যেই কেনে নি। দুটি ছেলেমেয়ের পেছনেই নাকি তার সাড়ে চারশ পাঁচশ টাকা চলে যায়। বারোশ টাকা মাইনে পায়. ফাটা প্যাণ্ট পরে এসেছিল। বলে—ঐ আমার সাধনা পণ্ডিত মশাই, ওরা মানুষ হয়ে উঠুক—আমি নবাবী ক'রে কী করব ?...চোখমুখ দেখে মানুষ চিনতে হয় হে, শুধু পোশাক দেখলে চলে ?'

তারপর একটু থেমে মণির মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'কী বলছিলে—ফাঁকি ? ফাঁকি আমি বড়-একটা দিই নে ভাই। তবে হয়ত আরও একটু খাটলে দুটো একটা ছেলে আর একটু উৎরে যেত—কিন্তু কী জানো ভায়া, টিউশনী বেশী নেই সত্যিকথা, তেমনি যজমানী আছে যে। শাঁকে ফুঁ কানে ফুঁ —দুটোই চালাতে হয়। তার ওপর আছে নোট লেখা। সব রকমই বজায় দিতে হয় রে ভাই। নইলে কি আর ছেলেমেয়ে মানুষ করতে পারতুম, না বালিগঞ্জে বাড়ী করতে পারতুম। ঐ সব ক'রে আর শরীর বয় না !'

উত্তর দিতে গিয়েও থেমে যায় মণি। বলা চলত যে—ওসব ক'রেই যখন বেশী আয় হয় তখন একাজটুকুর ওপর মায়া করার দরকার কি। ছেড়ে দিলেই হয়।...কিন্তু সে কথার উত্তর মণিই জানে বেশী। এটুকু না থাকলে টিউশনী, নোট লেখার কাজ কিছুই জুটবে না। এটাই উপলক্ষ। মণির নিজেরও ত তাই। সে থেমে যায়, বেশী বলতে গেলে প্রমাণ হয়ে যাবে যে—ওদের আয় বেশী বলে মণি ঈর্ষিত।

অগত্যা একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চুপ করতে হয় তাকে।

ইতিমধ্যে আরও একটি বিনা মাইনের টিউশনী মণির ঘাড়ে এসে পড়ল—সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে।

বিমলের মা বিমলকে খোঁচাচ্ছিলেন বহুদিন থেকেই। কিন্তু বিমল এক

কথা বললেই তাঁকে বার বার জবাব দিয়েছে—'ওর সে উপায় নেই মা, মিছিমিছি সুখ নষ্ট করাই সার হবে। তাছাড়া এ বিয়েতে লাভই বা কি? আরও কষ্টের মধ্যে পড়বে হয়ত!'

'তা পড়ুক রে! তবু সে শ্বশুরবাড়ি। বাপের বাড়িই বা কি সুখভোগে আছে। নিজের বাড়ী গিয়ে ঝি-গিরি করাতেও সুখ!'

তবু বিমল রাজী হয় নি কথাটা পাড়তে। অবশেষে একদিন ওর মা নিজেই পাড়লেন। ওঁদের ঘরের সঙ্গে রাস্তার দিকে একটুকরো ফালি বারান্দা ছিল, অপেক্ষাকৃত সেইটুকুই নির্জন স্থান গোটা বাড়ীটার মধ্যে। মণি এলে সেইখানে বসেই পুলক পড়ত। এই সূত্রে মণির সঙ্গে এদের পরিবারের একটা ঘনিষ্ঠতা হতে বাধ্য, এবং হয়েও ছিল। বিমলের মা ইদানীং প্রায় প্রত্যহই ওর জন্য কিছু না কিছু খাবার—নারকেল নাড়ু, তিলের নাড়ু জাতীয়—তৈরী রাখতেন। পড়ানো শেষ হ'লে ঘরে ডেকে এনে খাবার ও চা খাইয়ে ছাড়তেন। সেদিন সেই সুযোগে কথাটা তুললেন ভদ্রমহিলা, 'হ্যাঁ, বাবা তা তুমিও কি ঐ বিমুর মত চিরকাল থুবড়ো থাকবে, বিয়ে-থা করবে না?'

মণি একটু অন্যমনস্ক হয়েই নারকেল নাড়ুতে কামড় দিয়েছিল, হয়ত এইমাত্র পুলককে পড়ানো পাঠ্যের কথাই চিন্তা করছিল— বেশ একটু চমকে উঠল এই প্রশ্নে, আমতা আমতা ক'রে বললে, 'না—মানে কারণটা ত ঐ একই মাসীমা। · ইচ্ছা থাকলেই বা উপায় কি বলুন!'

'বিমুর ঘাড়ে যে তিন-তিনটে আইবুড়ো বোন বাবা, তোমার ত সে ভাবনা নেই। তোমার ছোট বোন ত নিতান্তই ছোট, তার বিয়ের কথা ভাববার এখনও ঢের দেরি।

'হ্যাঁ তা ঠিক—কিন্তু সংসারও যে ঢের বড়। এ ত তবু মেসোমশাই যা-হোক দু-পাঁচ টাকা রোজগার করছেন ঘরে বসে-বসেও; খোকাও আপনার তার হাত-খরচার মত কিছু পাচ্ছে—আমার যে এই একমুখো রুদ্রাক্ষী। বিধবা বোন, তার ছেলেমেয়ে—না মাসিমা, এই অভাবের মধ্যে আবার খরচ বাড়াতে সাহস হয় না। সুখের চেয়ে স্বস্তি ভাল, এটা মানেন ত?'

'তা কি সব সময় বলা যায় বাবা। শুনেছি যারা লড়াই করে সরকার বাহাদুর শুধু তাদের খাওয়া-দাওয়াই নয়, আমোদ-আহ্লাদের দিকেও নজর রাখেন। ছাউনিতে ছাউনিতে বায়স্কোপ থিয়েটার দেখানোর ব্যবস্থা করেন।··· এখনও জোয়ান বয়স, তাই এইভাবে খাটতে পারছ। এর পর ক্লান্তি আসবে। একটু আরাম, একটু স্বাচ্ছন্দ্য—একটুখানি সেবাযত্ন চাইবে মন। জীবনে সাধ-আহ্লাদকে গলা টিপে মারলে নিজেরও যে দম আটকে আসে বাবা।·· তোমরা ভয় পাচ্ছ কিন্তু মুটে-মজুররাও ত বিয়ে করে!'

'হ্যাঁ মাসিমা, তা করে। কিন্তু তাদের জীবন আর আমাদের জীবন আলাদা। তাদের বৌরা তাদের গলগ্রহ নয়—স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খাটে— খায়। তাতে তাদের লজ্জাও নেই, আপত্তিও নেই। আমাদের এই মধ্যবিত্ত বাঙালীর ঘরে মেয়েরা জানে বিয়ে করা মানেই বসে খাওয়ার একটা পাকাপাকি ব্যবস্থা।

বিয়ের পরের দিনই ভাত কাপড়ের ভার নিলুম বলে দিব্যি গালিয়ে নেন আপনারা। তারা ঘরে থাকবে, ছেলেমেয়ে দেখবে, দুপুরে ঘুমুবে—বড়জোর রান্নাবান্না করবে। তাও, যাদের ওরই মধ্যে একটু মাঝারি আয় তারা সে কাজটাও করতে চায় না। আলাদা রাঁধুনী রাখার খরচ জোটে না, কম্‌বাইন্ড হ্যান্ড রেখে নিশ্চিন্ত।···কিছুই করতে চায় না আমাদের মেয়েরা। সংসারের ভেতরের দায়িত্বটাও সহজে নিতে চায় না।···অথচ আর কোন জাতে এমন নেই। মুটেমজুরের কথা কি বলছেন? পশ্চিমে দেখেছি স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে দোকানদারী করছে। বেশ বড় সম্ভ্রান্ত দোকান, বিলক্ষণ দু'পয়সা আছে, কিন্তু চাকর না রেখে দুজনেই দোকান চালাচ্ছে। আমার সঙ্গে বড়বাজার চলুন—স্বামী-স্ত্রী বসে ভাগাভাগি করে সারাদিন নাগ্‌রা জুতা তৈরী করছে দেখিয়ে দেবো। তাদের দারিদ্র্য সত্ত্বেও বিয়ে করা শোভা পায় মাসিমা, আমাদের সাজে না!'

'সব মেয়েই কিন্তু পরিশ্রম-বিমুখ নয় বাবা, সারা জীবন খাটছে এবং হাসিমুখে খাটছে, খোঁজ করলে এমন মেয়েও পাবে বৈকি। আর তাদের ঘরে নিয়ে গেলে সুবিধেই হবে, অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারবে। লোকের ত দরকারই, মা তোমার বুড়ো হয়েছেন—তুমিই ত বলছ অর্ধেকদিন উঠতে পারেন না। বোন একা। তাছাড়া সে বোনেরও ছেলেমেয়ে আছে, তারা একদিন মানুষ হয়ে উঠবে, তখন সে চাইবে আলাদা সংসার পাততে, ভাই বোন বড় হয়ে শেকল কাটবে একদিন—তখন তুমি কোথায় থাকবে বাবা?'

চুপ ক'রে থাকে মণি। খানিক পরে বলে, 'কী জানি। ভাবি ত, ভেবে যেন কূলকিনারা পাই না।'

বিমলের মা গলাতে একটু জোর দিয়েই বলেন, 'আমি বাবা খুব নিঃস্বার্থ-ভাবে কথাটা বলি নি, তেমনি মিছে কথা বলি নি এটাও ঠিক। কথাটা ভেবে দেখো—যা বলছি তার দাম বুঝতে পারবে।···আমার কনুকে তুমি নাও না বাবা। ওকে নিয়ে তুমি অসুখী হবে না এটা জোর ক'রে বলতে পারি। আমার মেয়ে আমি ত বলবই—কিন্তু তুমিও ত দেখেছ!'

কনু—অর্থাৎ বিমলের বড় বোন কণিকা।

চমকে ওঠে মণি।

হ্যাঁ, দেখেছে বৈকি! প্রায়ই দেখেছে। লাবণ্যবতী না হোক্ স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হয়েছে, প্রথম যৌবনের লালিত্য আর নেই কোথাও, পরিশ্রমের চিহ্ন হাতের উঁচু-হয়ে-ওঠা শিরায়, পায়ের চামড়ার কর্কশতায় এবং মুখের তামাটে রঙে পরিস্ফুট—তবু, মেয়েটিকে ভালই লাগে মণির।·· আজকাল পথ চলতে চলতে মাঝে-মাঝেই কনুর কথা মনে হয় ওর। কিন্তু তাই ব'লে ঠিক এ ভাবে—না, এসব কথা তার কখনও মনে হয় নি।

তাকে অন্যমনস্ক এবং নিরুত্তর দেখে বিমলের মা ধীরে ধীরে বললেন, 'থাক্ বাবা, এখনই তোমাকে মন ঠিক করতে বলি নি। ভেবে দেখো কথাটা। ভেবেই উত্তর দিও, ইচ্ছে না হয় উত্তরও দিও না। হঠাৎ কথাটা বলে ফেললাম।

তাই ব'লে ভয় পেয়ো না, উত্যক্ত ক'রে তুলব না।'

মণি নিঃশব্দে চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে অপ্রতিভ ভাবে হাসে।

'না, না—তা নয়। তবে—'

কথাটা শেষ না ক'রেই উঠে পড়ে সে।···

বিমল ফিরে এসে মায়ের মুখে সংবাদটা শুনে বলে, 'কেন বলতে গেলে মা? মিছিমিছি হয়ত মনে করবে সেই জন্যেই ওকে তুমি যত্ন করো।'

'ওরে, অত শত ভাবতে গেলে আর আমাদের চলে না। গরীবের আবার অত চক্ষুলজ্জা কি?'

মুখে বলেন বটে কিন্তু তার পরের রবিবার মণি আসতে তিনিও যেন আর লজ্জায় ওর সামনে বেরোতে পারেন না। কণিকা ত ত্রিসীমানায় আসে না। মেজো বোন মণিকা এসে আরক্ত মুখে চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে দিয়েই পালায়। সেদিন মণিও বিশেষ কথাবার্তা বলে না। পড়ানো শেষ ক'রেই তাড়াতাড়ি উঠে চলে যায় গম্ভীর মুখে। তার সে গাম্ভীর্যকে বিরক্তি বলেই মনে করেন বিমলের মা, তাঁর লজ্জা ও পরিতাপের শেষ থাকে না। বিমলের মুখের দিকে তিনি যেন তাকাতে পারেন না। বিমলের কথাই ঠিক। মিছিমিছি 'মুখ নষ্টই' সার হ'ল। ছিঃ ছিঃ।

বিমলের মা যেটাকে গাম্ভীর্য বা বিরক্তি মনে ক'রে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লেন, আসলে সেটা মণির চিন্তাক্লিষ্টতা।

মণি সেদিনের সেই সামান্য কথা ক-টাতেই যেন বড় বেশী বিচলিত হয়ে পড়েছিল। বিচলিত এবং চিন্তান্বিত।

বহু সময় দেখা যায় কেউ কোন একটা অসুবিধা ভোগ করতে থাকলেও সে সম্বন্ধে তার কোন অনুভূতি থাকে না। কিন্তু পরের কথায় হঠাৎ এক সময়ে যখন সচেতন হয়ে ওঠে নিজের অবস্থা সম্বন্ধে—তখন যেন অসহ্য বোধ হয়।

মণিরও তাই হয়েছিল। 'একদিন ক্লান্তি আসতে পারে' এই কথাটা ভাবতে ভাবতেই একসময়ে অনুভব করল—ইতিমধ্যেই সে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। আর সে ক্লান্তির যেন সীমা-পরিসীমা নেই।

অনেক কথাই ভাবল সে। কয়েকদিন ধরে দিনরাতই ভাবল। সে বিজ্ঞানের ছাত্র, সুবিধা অসুবিধা নানাদিকই হিসাব ক'রে দেখল। ভাব-প্রবণতায় বিচলিত হবে না সে, এ তার প্রতিজ্ঞা। অথবা সামান্য একটু সুবিধার লোভে ভবিষ্যতের অনেক অসুবিধাকেও ডেকে আনবে না। যতই বয়স হোক্ তার, বিয়ের বয়স একেবারে পার হয়ে যায় নি। এমন কি পাঁচ-সাত বছর পরেও অসম্ভব শোনাবে না সে প্রস্তাব। সুতরাং আরও কিছুদিন অপেক্ষা করতে পারে সে অনায়াসে। তবে—

এই 'তবে'টাই যেন অনেকখানি।

কণিকাকে দেখছে সে। প্রথম কৈশোরের স্বপ্ন দেখা মানসী সে নয়। কিন্তু সে সব স্বপ্নও ত আর নেই তার মনের ধারে-কাছে কোথাও। এখন কণিকাকে তার পাশে-পাশে কল্পনা করতে এতটুকুও খারাপ লাগে না আর! জুতোসেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সবই মেয়েটি পারে—এবং করেও। ওদের বাসন মাজবার ঠিকে-ঝিও নেই, তাও লক্ষ্য করেছে মণি একদিন। ইস্কুল-মাষ্টারের ঘরণী হবারই উপযুক্ত মেয়ে। এর চেয়ে ভাল মেয়ে সে আশা বা কল্পনা করে না। বস্তুত এ সম্বন্ধে ত চিন্তাই করে নি দীর্ঘকাল। শুধু ক্লান্তিটাই যেন বড় বেশী অনুভব করে সে।...

পনেরোদিন ধরে ভাবল মণি। আর একটা রবিবার এসে পড়ল। এর আগের রবিবারে ওদের সাধ্যমত এড়িয়ে গেছে সে। আজ আবারও যেতে হবে ও বাড়িতে। প্রত্যহ কিন্তু ঐভাবে এড়ানো যাবে না। জবাব চাই একটা।

কিন্তু হঠাৎই একসময় সে মন স্থির ক'রে ফেলে। বাড়ি থেকে রওনা হয়ে ওদের বাড়ি যাবার পথে হাঁটতে হাঁটতেই। আর মন স্থির করার সঙ্গে-সঙ্গেই সে অনেকটা নিশ্চিন্ত ও প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। প্রস্তাবটা একটু অদ্ভুত শোনাবে? তা হোক—ওর আর উপায় নেই।

সেদিন পুলককে আর পড়ানো হয় না! চিন্তা গেছে—উত্তেজনা যায় নি। সে উত্তেজনা ওকে স্থির থাকতে দেয় না। সে পুলকের টাস্ক্-গুলো কোনমতে দেখে দিয়ে বলে, 'আজ এই পর্যন্তই থাক্ ভাই।...আমার...আমার শরীরটা আজ ভাল নেই।'

পুলক ব্যস্ত ও লজ্জিত হয়ে উঠে পড়ল; মণি খানিকটা সেইখানেই চুপ ক'রে বসে থেকে মণিকাকে ডাকল, 'মনু, মাসিমাকে একবার ডেকে দেবে?'

আশা ও আশঙ্কায় বিমলের মা'র বুক ঢিব্ ঢিব্ করতে থাকে। কী না জানি বলবে মণি। হে ঠাকুর, হে মা কালী—সুমতি কি হবে ওর?

চা তখনও চাপে নি। সেটা মনুকে আনতে ব'লে অপ্রতিভতা ঢাকতে তিনি তাড়াতাড়ি কতকগুলো মুড়ি গোটা মশলা দিয়ে মেখে এনে বসলেন।

মণি কিন্তু কুণ্ঠা বা সঙ্কোচের ধার দিয়ে গেল না। সরাসরি প্রশ্ন করল, 'মাসিমা, কনু—মানে কণিকা কতদূর পড়েছিল?'

'ঐ মেয়েটাই যা হয় তবু একটু পড়তে পেয়েছিল বাবা! ক্লাস এইট, না নাইনেই উঠেছিল বুঝি। হ্যাঁ নাইনে উঠতেই ও'র চোখটা গেল, আর পড়া হ'ল না। সে যে কী দুঃখ ওর! বরাবর ও ফার্স্ট সেকেণ্ড হ'ত ওদের ক্লাসে।'

'নাইন হ'লে ত ভালই হয়।...শুনুন মাসিমা, আপনার কথাটা আমি এই ক'দিন ধরেই ভেবেছি। আজ সকাল অবধি ভেবেছি। বিয়ে আমি কণিকাকে করতে পারি—কিন্তু এক শর্তে। ওকে পাশ করতেই হবে একটা। ক্লাস নাইনে যখন উঠেছিল, তায় ভাল মেয়ে বলছেন—একেবারে সব কিছুই ভুলে যায় নি নিশ্চয়। সামনের পরীক্ষাটায় অবশ্য হবে না। কিন্তু পরেরটার এখনও পুরো চোদ্দ মাস দেরি। এই চোদ্দ মাস যদি ভাল ক'রে পড়ে ত পাশ করতে পারবে। আমি ওকে পড়াতে রাজি আছি। আপনাদের ঘরে বসে,

আপনাদের সামনেই পড়াবো—আপত্তির কোন কারণ থাকা উচিত নয়। বই-টই আমি যোগাড় ক'রে দেব। পাশ করার পর ওকে বিয়ে করতে রাজী আছি। তবে ওকেও চাকরী করতে হবে। সে চাকরী যোগাড় করার ভার আমার। যোল্দা গলগ্রহ হয়ে থাকা চলবে না। সে অবস্থা আমার নয়। জীবনের সব সুখ-দুঃখ-দায়িত্ব সমান ভাগ ক'রে যে নিতে পারে তাকেই আমি স্ত্রী মনে করি। সে-ই অর্ধাঙ্গিনী। আপান ভেবে দেখুন কথাটা। মেসো-মশাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করুন, বিমলকেও বলুন। মেয়েকেও ভাল ক'রে জিজ্ঞাসা করুন। বিনা মাইনেতে সাধারণ ঝিয়ের মত যে খাটতে পারে —অর্থ উপার্জনের জন্য অন্য ধরণের খাটুনিতে তার ভয় পাবার কথা নয়। তবু, তাকেই কথাটা ভেবে দেখতে হবে সবচেয়ে বেশি। আমাদের ঘরের বাঙ্গালী মেয়েরা বিবাহিত জীবনের যে ছবি দেখে তাতে দুপুরে বই বুকে ক'রে ঘুমোনো এবং সপ্তাহে অন্তত একদিন সিনেমা দেখা—এইটুকু স্বাচ্ছন্দ্যের কথাই আঁকা থাকে। আমি তাতে রাজী নই!'

মণি আর বসে না। বিস্ময়াভিভূত বিমলের মা কোন কথা খুঁজে পাবার আগেই সে উঠে চলে যায়।

কণিকা প্রস্তাবটা শুনে তখনই কোন উত্তর দিতে পারে না কিন্তু অপ্রত্যাশিত মুক্তির কল্পনাতে যে তার দৃষ্টি উজ্জ্বল এবং মুখ উদ্ভাসিত হয়েও উঠে সেটা তার মা লক্ষ্য করেন শুধু। বিমলের বাবা সেকেলে মানুষ —তিনি খুঁৎ খুঁৎ করতে লাগলেন। এ-সব শর্ত-ফর্ত আবার কি? এর পর, মানে পাস করার পর সে যদি বিয়ে না করে? চাকরী যদি না জোটে? এই সব নানা প্রশ্ন তুললেন।

কিন্তু বিমল কথাটা শুনে লাফিয়ে উঠল। মণি সামনে থাকলে সে হয়ত তার পায়ের ধুলোই নিত। তারই প্রবল সমর্থনে তার বাবার ক্ষীণ আপত্তি ভেসে গেল। সে বললে, 'পাস করার পর যদি না-ই বিয়ে করে, ক্ষতি কি বাবা? পাসটা তো হয়ে যাবে। তখন ও নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে অন্তত, বিয়ের বাজারেও কিছু দর হবে। এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব ত আর কিছুই হতে পারে না। এমনিতেই ত কিছু হচ্ছে না, কোন চেষ্টা পর্যন্ত আমরা করতে পারছি না! এ ত একটা বড় মুক্তির পথ! এ কথাটা আমারই ভাবা উচিত ছিল, যতদিন ধরে হঠাৎ-একটা-কিছু ঘটবার অপেক্ষায় আছি, ততদিনে হয়ত ওরা এক-একটা পাস করতে পারত।'

'হ্যাঁ, পারত! সময় কোথা? সংসারের গাধা-খাটুনী খাটবে না পড়বে। টাকা-পয়সা চাই না?' অবিশ্বাস ও সংশয়ের সুর তাঁর কণ্ঠে।

'মণি ত সে ভারও নিতে চেয়েছে শুনলাম। তবে আর আপত্তি করছেন কেন?...আর সময়, যেমন ক'রেই হোক ক'রে নিতে হবে!'

সে মনে মনে প্রায় তখনই প্রতিজ্ঞা করে, ছোট বোন দুটোকেও সে নিজে একটু একটু পড়াবার চেষ্টা করবে। তার খুব সময় নেই হাতে সত্য কথা—

তবু যতটা হয়। আরও একজনের সাহায্য নিশ্চয় পাওয়া যাবে—সে পুলক। সে যা শিখেছে তাতে ওদের এখন খানিকটা সাহায্য করতে পারবে—এবং বিমলের মুখ চেয়ে করবেও, এটুকু বিশ্বাস তার আছে।

সে পরের দিন ভোর-বেলাই গিয়ে মণিকে ডেকে তুললে, ধন্যবাদ ও অভিনন্দন জানাতে। জড়িয়ে ধরে বললে, 'ভাই তুই দেবতা।'

মণি হাসি-হাসি মুখে বললে, 'ওরে ছাড়, ছাড়। আয় বাইরে আয়। এখানে গোল করিস নি, এখনই আমি বাড়ীতে এ সব কথা জানাতে চাই না। ওরা ভুল বুঝবে হয়ত, তা ছাড়া ইট ইজ টু আর্লি। কি দরকার!...তা-হ'লে তোরা য়্যাপ্রুভ্ করেছিস আমার স্কীম?'

'য়্যাপ্রুভ্। বলিস কি! তোকে আমার মাথায় ক'রে নাচতে ইচ্ছে করছে।'

একটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে প্রসন্ন মুখে মণি বললে, 'তোর বোনের কিন্তু পয়ও আছে রে! কাল মন স্থির ক'রে মাসিমার সঙ্গে আলোচনা ক'রে ফিরছি, দেখি বাড়ীতে কিলম্যারণক কোম্পানীর একটি বাবু বসে। বলে আলমগীরে রাজসিংহ করতে হবে। আলমগীর করবে ওদের বড় বাবু—শখ হয়েছে অথচ অভিনয়ে একেবারে গবেট। একটা ভাল লোককে পাশে না রাখলে বইটা ঝুলে যাবে, এই সব খোসামুদে কথা।...হঠাৎ কী মনে হ'ল—বলে ফেললুম, রাজী আছি—তবে পঞ্চাশটি টাকা নেব। এক কথায় লোকটা রাজী হয়ে গেল। মায় পঁচিশ টাকা য়্যাড্ভান্সও দিয়ে গেল!'

তারপর গলা নামিয়ে বললে, 'তোর কাছে মিছে কথা বলব না—এর আগেও দু-এক জায়গায় টাকা নিয়েছি—মফস্বল অঞ্চলে, তবে সে পনেরো বিশের বেশী নয়। একেবারে এত টাকা—আনথিংকেবল্! এ ত পাবলিক থিয়েটারের বড় বড় অভিনেতার চার্জ রে।'

খুশিতে ঝলমল করতে থাকে মণি।

'আসিস দেখতে—সামনের শুক্রবারের পরের শুক্রবার। তোর নাম লিখে দিয়েছি, কার্ড পাঠাবে।'

॥ ১৯ ॥

পূর্ণিমা বিমলের সামনে শব্দ ক'রে ফাইলটা ফেলে বললে, 'এবার আমাকে কি খাওয়াবেন খাওয়ান। অসাধ্য সাধন করেছি।'

বিমল হাসিমুখ তুলে তাকাল, 'কি রকম? হঠাৎ কী এমন ক'রে বসলেন?'

'বড়বাবুর কাছ থেকে কাজের সার্টিফিকেট পেয়েছি। আজ নিজে থেকেই স্বীকার করেছেন যে আমার কাজে আর বড় একটা ভুল হচ্ছে না। ঐ যে অরুণা ব'লে মেয়েটি—তাকে ডেকে আমার কাজের দৃষ্টান্ত দিলেন। বললেন,

'এই ত এঁরও আগে কত ভুল হ'ত—তারপর নিজেই কাজ বুঝে নিলেন একটু একটু ক'রে, এখন ত কৈ আর ভুল হয় না। চোখ বুজে ওঁর কাজে সই করা যায়। আপনি ত ওর চেয়েও বেশী দিন আছেন—আপনার আজও এতটুকু উন্নতি হ'ল না।' বেচারী মুখ চুন ক'রে চলে গেল একেবারে।'

বিমল একটু চিমটি কেটে বললে, 'ও, তাহ'লে আপনার প্রশংসাই শুধু নয়—আবার আর একটি মেয়ের লাঞ্ছনা। এইটেতেই বোধ হয় বেশী খুশী হয়েছেন, না!'

'যান। আপনি ভারি ইয়ে।' পূর্ণিমার মুখ এতটুকু হয়ে যায়, 'আনন্দ ক'রে একটা খবর দিতে গেলুম—'

'বসুন বসুন। অত চটবেন না। যেটা স্বাভাবিক তাই বলছিলুম। এটা আপনিও নিশ্চয় মানবেন যে মেয়েদের লাঞ্ছনা ও অপমানে মেয়েরা যত খুশী হয় এমন পুরুষে কখনও হয় না। মেয়েদের সবচেয়ে বড় শত্রু মেয়েরাই।'

'তা হয়ত হবে। হ্যাঁ—কতকটা তাই বটে। কিন্তু তা ব'লে, আপনি বড্ড সব তাইতে—'

'ছি। একটা তামাসা করছিলুম বৈ ত নয়। অত বিচলিত হবেন না। কিন্তু খাওয়াবেন ত আপনি, আমি খাওয়াবো কেন?'

'আপনি যে খেতে চান না। নইলে আপনাকেই ত খাওয়ানো উচিত। গুরুদক্ষিণা গুরুর প্রাপ্য।'

'কী দক্ষিণা?'

'সত্যি বলছি বিমলবাবু, আপনি আবার হয়ত এখনই আমার কথার উলটো ব্যাখ্যা করবেন—আপনার কথার চাবুকেই আমি খানিকটা কাজ-চলার মত মানুষ হয়েছি। এর যদি কোন ক্রেডিট থাকে ত সে আপনারই প্রাপ্য।'

'এই দেখুন। এবার সত্যিই আমাকে অপ্রতিভ করলেন। মানুষ করার মত কোন যোগ্যতা থাকলে নিজেই হতুম আগে। মিছিমিছি এসব কথা বললে ঠাট্টার মত শোনায়!'

'আমি কিন্তু মোটেই ঠাট্টা করছি না—বিশ্বাস করুন! আমি জানি আপনার শক্তি কতটা—'

'প্লিজ প্লিজ মিস রায়—ও প্রসঙ্গ থাক। তার চেয়ে বরং আপনার অতিথি হওয়া ঢের সোজা—'

'সত্যি? কথা দিচ্ছেন?' আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে পূর্ণিমার মুখ।

বিমল তাড়াতাড়ি অপর কথা পাড়ে। বলে, 'আপনার বন্ধু জয়ন্তী দেবী এসেছিলেন যে খানিক আগে।'

'তাই নাকি? কখন? কোথায় গেল সে? কতকাল যে তাকে দেখি নি। কেমন দেখতে হয়েছে? কী করছে কি আজকাল?'

'দাঁড়ান দাঁড়ান। একে একে প্রশ্ন করুন।···এসেছিলেন সকালের দিকেই। আপনি তখন পেনসনের ঘরে। দাঁড়াতে পারলেন না—বললেন

অনেক কাজ। তাঁর ঠিকানা রেখে গেছেন, বিশেষ ক'রে আপনাকে যেতে বলেছেন। দেখতে ভালই—as lovely as ever। আর করছেন? এক কোম্পানী করেছেন—ফিল্ম্‌ তুলবেন।'

'সর্বনাশ! ডুববে যে। এ বুদ্ধি আবার কে দিলে!'

'দেবার লোকের অভাব কি? কে যেন ওঁকে বুঝিয়েছে যে হাজার-কতক টাকা হ'লেই ছবি তোলা শুরু হবে—তারপর টাকা দেবার লোকের অভাব নেই, ডিস্ট্রিবিউটাররা আছে। ওঁকে নায়িকা করবে তারা। এ ছবি যদি সাক্‌সেসফুল না-ও হয়, ওঁর একটা ওপ্‌নিং পাবেন, চিরদিনের মত কেরিয়ার হয়ে যাবে। ওঁকে তারা বুঝিয়েছে, উনি প্রবীণ স্বামীকে বুঝিয়েছেন—কথাটা ত খুবই সোজা! শশীবাবুর কী সব দামী শেয়ার টেয়ার ছিল, তাই বেচে পনেরো হাজার টাকা দিয়েছেন। উনি এখন মহা-উৎসাহে তোড় জোড় ক'রে বেড়াচ্ছেন। সেই উপলক্ষেই আপনাকে খুঁজতে এসেছিলেন, যদি আপনিও কেরিয়ার ক'রে নিতে যান ত চলে যান সোজা—সাইড্‌ রোলের নাকি অভাব নেই। এমন কি উনি আমাকেও আশ্বাস দিয়ে গেলেন যে—আমিও যদি ধরপাকড় করি, দু-একটা খুচরো কাজ আমাকে দিতে পারেন। পাঁচ দশ টাকা তাতেও পাবো তবে শুটিং শুরু হ'লে মাঝে মাঝে গিয়ে খবর নিতে হবে।'

'ইস্‌-স্‌!' মুখে শুধু একটা আওয়াজ করে পূর্ণিমা। তারপর খানিকটা স্তব্ধ হয়ে থেকে বলে, 'আমার এক মামাতো ভগ্নিপতি ঐ ক'রে সর্বস্বান্ত হয়ে গেলেন। বাপ মরতে তিনচার লাখ টাকা পেয়েছিলেন—তাছাড়া জমিজমা অনেক কিছু ছিল। তিন চার খানা ছবি তুলে সব ডুবিয়ে এখন শুনছি কালীঘাটের কোন্‌ গলিতে বিস্কুট লজেন্সের দোকান খুলেছেন। ঐ ত ক-টা টাকা জয়ন্তীদির, কী-ই বা থাকবে। যে টাকার জন্য নিজের এতবড় সর্বনাশ করলে সেই টাকাও যদি না থাকে—'

বিমল বললে, 'আপনার মামাতো ভগ্নিপতির রূপযৌবন ছিল না, তাছাড়া তিনি স্ত্রীলোকও নন। মাপ করবেন—এটা জয়ন্তীদেবীর মস্ত বড় য়্যাসেট্‌। হয়ত ওদিক দিয়ে সত্যিই কিছু সুবিধে ক'রে নিতে পারেন।'

'সে সুবিধের ত বিশ্রীরকম মূল্য দিতে হয় শুনেছি। তাছাড়া ছবি শেষ হ'লে—দেখানো হ'লে, তবে ত ওর নাম হবে। আমার ভগ্নিপতির মুখেই শুনেছি, পরের টাকার ভরসায় বহু ছবিই খানিকটা তোলা হয়ে পড়ে আছে। শেষ হয়নি।' মাথা হেঁট ক'রে পূর্ণিমা বলে।

'কিন্তু এ ছাড়া ওঁর যে উপায় ছিল না মিস্‌ রায়। যখন খুব অভাব ছিল, তখন ভেবেছিলেন শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যই ওঁর যা-কিছু কষ্ট। কিন্তু সেটার যখন অভাব রইল না তখন দেখলেন যে অভাব যেমন নেই তেমনি জীবনে আর কোন রসও নেই। না আনন্দ, না উত্তেজনা, না আশা! সন্তান হবে না, প্রৌঢ় স্বামী—থাকল শুধু প্রসাধন ও বেশভূষা, প্রসাধন দেখবারও লোক নেই একজন। যে নারী বেশভূষা করতে ভালবাসে তার পক্ষে পুরুষের

সপ্রশংস দৃষ্টি ছাড়া বাঁচাই অসম্ভব যে।...তাছাড়া এধারেও দেখুন, সংসারে কোন পরিজন নেই, ঝি-চাকর আছে, হাতে কোন কাজ-কর্মও নেই। একা এক কর্মহীন দিনরাত্রি কাটানো—সে যে কী সাংঘাতিক dull এবং একঘেয়ে জীবন তা আপনারা কোনদিন ভাবতেও পারবেন না। এমনি এক-আধজনকে দেখবার সুযোগ হয়েছে আমার—কর্মাভাবে তাঁরা যে কী অকর্ম না করেন তার ঠিক নেই। শুধু ঐ monotony ভাঙ্গবার জন্যে। তাও তাঁদের কারুরই জীবন জয়ন্তীদেবীর মত বিবর্ণ বা আশাহীন নয়। এ যে ওঁকে করতেই হবে। ওঁর নিবুদ্ধিতার এই-ই স্বাভাবিক পরিণতি। এ পথে অর্থ না থাক—উত্তেজনা ত আছে।...আমরা খুব বেঁচে গিয়েছি মিস্ রায়, গরীবের জীবনে সব কিছুর অভাব আছে—উত্তেজনার অভাব নেই। নষ্ট করবার মত কর্মহীন প্রচুর অবসরও নেই। আপনি সহজে ওঁর দুঃখ বুঝতে পারবেন না!'

সে একটু হেসে কাগজের টুকরো এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এই নিন—ওঁদের নতুন অফিসের ঠিকানাটা। বেলা তিনটে থেকে সাতটা অবধি উনি নিজেই থাকেন।'

'ধন্যবাদ। তবে ও ঠিকানার বোধ হয় কোন দরকার হবে না।'

পূর্ণিমা অন্যমনস্ক হয়ে বসে বসে বহুক্ষণ ধরে কাগজটাকে নুটি পাকিয়ে এক সময় পায়ের কাছে রাখা ঝুড়িটায় ফেলে দিলে। তারপর একটা ফাইল টেনে নিয়ে জোর করে কাজে মন দিলে।

বিমলের সামনে ফাইল খোলাই ছিল কিন্তু সে আরও বহুক্ষণ কাজে মন বসাতে পারলে না। বেচারী জয়ন্তী, ওকে দেখলেই কে জানে কেন বিমলের ফুটন্ত ফুলের কথা মনে পড়ে যায়। কোথায় ওর মুখে চোখে একটা নিষ্পাপ শুভ্র পবিত্রতার ভাব আছে, শত প্রসাধন এবং বিলাসিতাতেও সেটা চাপা পড়ে না। হয়ত এর সবটাই ওর অনুমান অথবা কল্পনা—অথবা অকারণ পক্ষপাত। তবু আজও লাল শাড়ী এবং মূল্যবান প্রসাধনে, তাকে অভিজাত শ্রেণীর গোলাপের মতই মনে হচ্ছিল।

এ কী পথে গেলে জয়ন্তী, কেন গেলে!

মন থেকে একটা ক্লান্তি এবং পরিতাপ যেন কিছুতেই যায় না বিমলের!

ছুটির পর সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে পূর্ণিমা পিছন থেকে কথাটা মনে করিয়ে দিল, 'আপনি আজ আমার অতিথি, মনে আছে—কথা দিয়েছেন?'

আজও বিব্রত বোধ করে বিমল কিন্তু কে জানে কেন কোন রূঢ় বা কঠিন জবাব দিতে পারে না। বরং সবিনয়ে বলে, 'আজ থাক্ না—আর একদিন হবে। কথা ত আমি ফিরিয়ে নিচ্ছি না। তার চেয়ে বরং চলুন একটু মাঠে গিয়ে বসি, অনেকদিন বসা হয় নি। ভাগ্যে যদি থাকে ত চাইকি চানাচুর আর কলসীর চা-ও জুটে যেতে পারে একটু।'

পূর্ণিমা আর আপত্তি করল না। লক্ষ্য করলে বরং দেখা যেত যে বিচিত্র এবং অজ্ঞাত কোন কারণে একটা সুখেরই আবেশ লাগল তার চোখে মুখে,

কপালে ঈষৎ রক্তোচ্ছ্বাসই দেখা দিল।

রেস্তোঁরা কি কোন খাবারের দোকানের ভীড়ের মধ্যে কোন রকমে খাওয়াটাই হ'তে পারে, সেখানে সাহচর্য এমন কি সান্নিধ্যের আনন্দটাও পুরোপুরি পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। মাঠের এই বিপুল প্রসারতার মধ্যেই কেমন একটা অন্তরঙ্গতার হাওয়া আছে। বহুলোকের মধ্যেও অনায়াসে সেখানে দুই তিন বা চার জনে ঘনিষ্ঠ হতে বাধে না। সেই অবারিত অন্তরঙ্গতায় অপরাহ্নের এই অবসন্ন আলোতে দু'জনে সামনাসামনি বা পাশাপাশি বসে গল্প করার সম্ভাবনাতেই সে খুশী হয়ে উঠল। শুধু এই টুকুর জন্যেই ওর মন আজকাল যে উন্মুখ হয়ে থাকে সেটা ওর নিজের কাছেও আর অজানা নেই—এই কাছাকাছি বসে একান্তে একটু গল্প করার জন্যই। অথচ আজকাল এটাও যেন দুর্লভ হয়ে উঠেছে।...

বেছে বেছে একটা পরিষ্কার জায়গা দেখে ওরা বসল। পাশাপাশি নয়, সামনাসামনি। পথে আসতে আসতে ছোলাভাজা কিনেছে বিমল, ছোলাভাজা আর লংকাবাটা মিশোনো নুন কাগজে ক'রে। নিজের রুমালখানা ঘাসে পেতে ছোলাভাজাগুলো তাতে ঢেলে দিল সে।

'নিন, চালান। একটা চা-ওলা দেখতে পেলে বলবেন, ঐ যে যারা কলসী ক'রে চা বেচে!'

'ওগুলো বিষ।'

'কে বললে আপনাকে? ঐ যে চৌরঙ্গীর ওপর বড় দোকান—যার বয়রা ফরসা জামা পরে এসে দাঁড়ায়—তাদের চা তৈরি করা দেখেছেন কখনও? এক পাতা ক-বার ফুটোয় তারা, এবং কাপগুলো কেমন ভাবে ধোয়?...চা ক'রে ছেঁকে নিয়ে এরা সেটা দীর্ঘকাল ধরে গরম করছে—এছাড়া এদের কোন অপরাধ নেই। ভাঁড়ে দেয়, ওদের কাপের চেয়ে ঢের ভাল।'

একটু থেমে হেসে বললে, 'বা রে আমি বক্তৃতা করছি আর আপনি দিব্যি ছোলাভাজা চালিয়ে যাচ্ছেন!'

পূর্ণিমাও হাসল। মিষ্টি প্রাণভরা হাসি, বললে, 'মন্দ'বলেন নি। এ যেন সেই দুই সতীনের গল্প। জানেন সে গল্প? এক থালায় ছাতু মেখে দুই সতীনে খেতে বসেছিল। বড়টা চালাক, খেতে শুরু ক'রেই ছোটটাকে বললে, ও সতীন, কেমনে মলা বাপ? তোমার বাবা কেমন ক'রে মারা গেলেন? সে বেচারী সহানুভূতিশীল শ্রোতা মনে ক'রে মহা উৎসাহে হাত পা নেড়ে বলছে। বলতে বলতে তার কান্না পেয়ে গেছে, কাঁদছেও। এদিকেও বড়টি খপ্‌খপ্‌ ক'রে খেয়ে যাচ্ছে...শেষে ছোট সতীন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে যখন পাল্টা প্রশ্ন ক'রলে, তখন বড় কিন্তু সে দিক দিয়েই গেল না, শুধু বললে—ফুলল আর ম'ল।...এই দেখুন আমি আবা আপনার চেয়ে বেশী কথা বলে ফেললুম। ঠকলুম আমিই—আপনার কম খাওয়াটা পুষিয়ে গিয়েও বেশী খেয়ে নিলেন।

দুজনেই হেসে উঠল আবার। বেশ সরব হাসি।

ইতিমধ্যে এক কলসীওয়ালাকে দেখা গেল দূরে। বিমল উঠে গিয়ে তাকে ডেকে নিয়ে এল। দু' ভাঁড় চা নিয়ে জাঁকিয়ে বসে বললে, 'ছোটখাটো পিকনিক্ একটা—কী বলেন ?'

'তা বটে।' পূর্ণিমা চারিদিকে তাকিয়ে বললে, 'আমরা কবির জাত বলে গর্ব করি—কিন্তু এই মাঠটাকে ক বছরের মধ্যেই কী বিশ্রী ক'রে ফেললুম বলুন ত! যুদ্ধের সময়ও এত নোংরা হয় নি এধারটা।'

'রুচিবোধেরও একটা শিক্ষা আছে মিস রায়। সাহিত্য শিল্প সঙ্গীত—এসবও বুঝতে গেলে যেমন কিছু কিছু শিক্ষা লাগে—তেমনি সুন্দরভাবে বাঁচব, রুচিসম্মত পরিবেশে বাস করব—এই মনোবৃত্তিও শিক্ষা-সাপেক্ষ। শুধু তাই নয় ; কোন্‌টা সুন্দর ও রুচিসম্মত তাও শেখা দরকার। ইংরেজরা বহুদিন অভাবের হাত থেকে মুক্তি পেয়েছে, বহুকাল ধরে স্বাধীন ভাবে মাথা উঁচু ক'রে মানুষের মত বেঁচেছে, তাদের এসব শিক্ষার অবসর ছিল। আমাদের কী ঐতিহ্য তা ভুলে যাচ্ছেন কেন ?'

'তা শুনব না বিমলবাবু, এরই মধ্যে ঠাকুর পরিবার এদেশে জন্মেছেন।'

'ওটা ভগবানের আর্য-প্রয়োগ।'

এমনি চলে দু' একটা খুচরো আলাপ। পশ্চিম আকাশ থেকে শেষ রশ্মি বিদায় নেয়। জেগে থাকে শুধু একটা রক্তাভা। চৌরঙ্গীর পথে আলোগুলো উজ্জ্বল হয়ে উঠতে থাকে ক্রমশঃ। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যায় একটু একটু ক'রে।

তবু পূর্ণিমার উঠতে ইচ্ছা করে না। এ যেন একটা দুর্লভ অবসর। কেন দুর্লভ তা সেও জানে না। এই যা আলাপ ওদের হচ্ছে, তা অফিসেও হয় প্রত্যহ—অপ্রত্যাশিততা নেই কোথাও। তবু ভাল লাগে ওর।

অবশেষে বিমলই মনে করিয়ে দেয়, 'আপনার ত আবার ঘরকন্না আছে—উঠতে হবে ত ?'

'হ্যাঁ হবে। তবে কদিন থেকে ঝি আসছে, বাসনটা নিয়ে হয়ত বসতে হবে না আর।...এক রান্নাটা...দেরি দেখলে হয়ত মা-ই চড়াবেন।...উঠি এবার।... প্রতিদিনই ঘড়ি ধরে দিনরাত ছুটোছুটি, এ কী আর ভাল লাগে ? তাই এক-আধদিন এমনি ফ্রেঞ্চ্ লীভ নিতে হয়।...আপনারও ত টিউশনী আছে ?'

'আছে বৈ কি! না থাকলে কি আর চলে। ওটা বোধ হয় আমরণ থাকবে—'

দুজনেই উঠে দাঁড়ায়। চলতে চলতে হঠাৎ পূর্ণিমা বলে, 'আমাকে একটা টিউশনী দেখে দিতে পারেন ? খুব ভালোতে আমার লোভ নেই, মাঝারি গোছের একটা পেলেই বেঁচে যাই। আপনারা ত নিয়মিত করেন—নিশ্চয়ই মধ্যে মধ্যে খোঁজ খবর আসে। দিন না একটা দেখে। নিচের ক্লাসের ছেলেও ত পড়াতে পারি—'

'হঠাৎ এ খেয়াল আবার ঘাড়ে চাপল কেন ? একটু আগেই ঘড়ি ধরে ছুটোছুটি করার কথা বলছিলেন না ?...এ ত আরও বাড়বে। বরং সরকারী চাকরী বা গৃহস্থালী কাজে ফাঁকি চলে, গড়িমসিও চলে কিন্তু এঁরা যে কী

চীজ তা জানেন না—এই প্রাইভেট ছাত্রের অভিভাবকরা।'

'কিছু কিছু জানি বৈ কি। তাই ত এতদিন প্রাণপণে এড়িয়ে চললুম কিন্তু আর যে চলছে না। বাবা একেবারেই ইন্‌ভ্যালিড হয়ে পড়েছেন। তাঁর যা কষ্ট, চোখে দেখাও যায় না। অসুখ সারবে না তা জানি—তবু কতকটা রিলিফ দেবার জন্যেও ডাক্তার ডাকতে হয়—নিয়মিত ওষুধে ডাক্তারে যে কত পড়ছে তা শুনলে পাগল বলবেন আমাকে, অত খরচ করছি ব'লে। অথচ কীই বা করি তাও ত বুঝছি না। মার বাক্সেও সোনার একটা কুচিও নেই। এবার বাসনে টান পড়বে। দাদা গত পুজোয় তিনমাসের বোনাস পেয়ে ত্রিশটি টাকা দিয়েছিলেন—সেই যা বাড়তি আয়। তাঁরও নাকি সংসার চলছে না।...মালুটা রোজগার করতে শুরু না করলে বিন্দুমাত্র হাঁফ ছাড়তে পারব না।...সত্যি, দেখবেন একটু খোঁজখবর ক'রে? কোথাও আমার এমন কেউ নেই, যে এটুকুও করে। আমি কোথায় নিজে নিজে চেষ্টা করি বলুন ত!'

ততক্ষণে ওরা এস্‌প্লানেডের মোড়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। বিমল অনেকক্ষণ পরে এইবার পূর্ণিমার মুখের দিকে চেয়ে দেখল। সে কেমন একটা বিহ্বল শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে পথের দিকে। মেট্রোর বহু-বাতির উজ্জ্বল আলোটার প্রতিফলন এসে পড়েছে ওর মুখে। সেই আলোতে ওকে বড় করুণ—বড় ম্লান লাগল। সেই সঙ্গে—এই প্রথম বিমলের মনে হ'ল—সুন্দরও। চোখ দুটো ভাল ক'রে দেখা না গেলেও বেশ বোঝা যায় যে সে দুটো জলে ভরে এসেছে। হয়ত সেই জন্যেই সে বিমলের দিকে চাইতে পারছে না—চোখে চোখ পড়লে এখনি হয়ত ভেঙে পড়বে—

অকস্মাৎ বিমল যেন ওর প্রতি অপরিসীম একটা মমতা বোধ করল। অসহায়, নিতান্ত বেচারী মেয়েটি।...

সে যে কী করছে তা বোঝবার আগেই পূর্ণিমার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সামান্য একটু চাপ দিয়ে বিমল ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বললে, 'নিশ্চয়ই—আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব মিস রায়। প্লীজ, প্লীজ, বি ব্রেভ!'

তারপরই—সম্ভবত নিজের এই আকস্মিক হৃদয়াবেগের চেহারাটা নিজের কাছে ধরা পড়েই—যেমন হঠাৎ ওর হাতখানা ধরেছিল, তেমনি হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে—বলতে গেলে ছুটে গিয়ে একটা চলন্ত ট্রামে উঠে পড়ল সে।...

পূর্ণিমা সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইল—বহুক্ষণ ধরে। কী যে হয়ে গেল তা যেন সে বুঝতেও পারল না, শুধু একটা অসহ্য পুলক-বেদনায় সারা দেহটা রিন্‌ রিন করতে লাগল। হাতের যেখানটা বিমল হাত দিয়ে ধরেছিল সেখানটা দপ্‌ দপ্‌ করছে, অদ্ভুত একটা উষ্ণতা সেখানে। তার তাপ কোন এক বিচিত্র উপায়ে সে নিজেই যেন অনুভব করছে। তবু কী যে ঠিক পারছে আর কী যে পারছে না—তাও সে সবটা জানে না। দাঁড়িয়েই রইল সে—তেমনি অভিভূত হয়ে। অনেকক্ষণ পরে কেউ কেউ ওর মুখের দিকে বিস্মিত এবং জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে এইটে অনুভব করার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম ওর সম্বিত ফিরে এল।

বিস্ময়ের কারণটা আবিষ্কার করতেও দেরি হ'ল না। গালে হাত দিয়ে দেখল জল—চোখ দিয়েই পড়ছে, হয়ত তখন থেকেই পড়ছে। সেই বিমল চলে যাওয়ার সময় থেকেই। অপ্রতিভ হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের আঁচলেই চোখটা মুছে ট্রামের দিকে এগিয়ে গেল সে।

ট্রামের ভীড়ে কোলাহলে ঠেলাঠেলিতে অনেকটা প্রকৃতিস্থ হ'ল পূর্ণিমা। বাড়িতে গিয়েও আর বিন্দুমাত্র অবসর রইল না নিজের চিন্তায় নিজে ডুবে থাকার। চিন্তাও বিলাস হ'য়ে ওঠে সময়ে সময়ে—কিন্তু তার জন্য নির্জন অবসর চাই। বহুকাল পরে মা'র সেই কলিকটা উঠেছে, বাবাও একটু বেশী বিগড়েছেন আজ। মালু তাঁদের নিয়েই বিব্রত। ঝি উনুনে আঁচ দিয়ে চলে গিয়েছিল, সেটা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। নতুন ক'রে আঁচ দিতে হ'ল। বাবার নিস্ফল উষ্মা ও মা'র খেদোক্তি—এগুলো অঙ্গের ভূষণ হয়ে গেছে; কিন্তু আজ দুটোই যেন নতুন ক'রে আঘাত করল ওকে—নিজের অবস্থা সম্বন্ধে আবারও সচেতন ক'রে দিল। ওর এ সব সাজে না। অবসর নেওয়ার অবসর নেই।

তারপর যথারীতি এক হাতে কুটনো বাটনা রান্না রোগীর সেবা। মা'র গরম জলের ব্যাগ, বাবার পুরোনো ঘিয়ের মালিশ। তাঁর পথ্যও চাই ঠিক ন-টার মধ্যে। একেবারে অবসর মিলল রাত এগারোটার পর। মা ঘুমিয়ে পড়েছেন একটু। বাবা আর শুতে পারেন না—বালিশে ঠেস দিয়ে তিনিও তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছেন। মালু টেবিল-ল্যাম্পটা আড়াল দিয়ে বসে নিঃশব্দে অঙ্ক কষছে। এইবার ওর ছুটি।

খাওয়া হয় নি। খেতে অবশ্য হবেই—কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তে ইচ্ছা করছে না। পূর্ণিমা আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। ছাদে যেতে পারলে খুশী হ'ত কিন্তু ছাদটা বড়ই নোংরা হয়ে আছে। ভাড়াটেদের ব'লে ব'লে কিছুতেই পারে না—এর চেয়ে বেশী বলতে গেলে ঝগড়া করতে হয়।

খানিকটা ইতস্তত ক'রে ওপরে ওঠবার একটা সিঁড়িতেই এসে বসল সে। সকলকার চোখের বাইরে, কোলাহলের বাইরে একটুখানি অবসরও ওর চাই-ই। জীবনে কোন অপ্রত্যাশিত আনন্দদায়ক ঘটনা ঘটে গেলে প্রত্যেক মানুষই চায় অন্তত খানিকক্ষণ ধরে মনে মনে সেই বিস্ময় ও আনন্দানুভূতির রোমন্থন করতে। সে-অবসর যে পায় না—তার মনে হয় যে একটা কিছু বড় রকমের লোকসান ঘটল। পূর্ণিমারও আজ সেই মনোভাব, তার তাই আজ একটু-খানি নিঃশব্দ নির্জন অবসর চাই-ই। বেশি দেরি হ'লে যেন হারিয়ে যাবে এই বৈচিত্র্য, এই অভাবনীয়তার আস্বাদ। রাত পোহালে চলবে না।

অথচ এই অভাবনীয়তাটা যে কী, তা নিজের মনের কাছেও প্রশ্ন ক'রে স্পষ্ট জবাব শোনবার যেন সাহস নেই তার। সে কি বিমলের সহানুভূতি, সে কি ওর ঐ হাতের সামান্য স্পর্শটুকু,—সবটা জড়িয়ে—? না কি আরও

কিছু? তা সে জানে না। জানতেও চায় না। শুধু আজ এই প্রথম জানল যে তার দুঃখের কথা শোনবার, তার ব্যথাবেদনার সহানুভূতি জানাবার একটি মানুষ আছে পৃথিবীতে এবং সে ঠিক সাধারণ যে-কোন মানুষ নয়। জীবনের সব কিছু সমস্যায়, সব কিছু জটিলতায়, সব কিছু সংঘাতে যে লোকটির ওপর নির্ভর করতে চায় সে—এ সেই লোক। মানুষ দুঃখে দৈন্যে বিপদে নিজের কথা জানাতে চায় কাউকে, সহানভূতি চায় কারুর কাছ থেকে। সে রকম যে-কাউকে পেলেই খুশী হয়, কিন্তু বিশেষ কাউকে পেলে সে খুশির সীমা থাকে না—অন্তর উপচে ওঠে আনন্দে। বরং অনেক সময় বহুলোকের সহানুভূতি পেয়েও তার তৃপ্তি হয় না—বিশেষ একটি লোকের সান্ত্বনার অভাবে জীবন বিষাক্ত হয়ে যায়।

বিমল পূর্ণিমার সেই বিশেষ লোক। কেন—তা জানে না। এ-ও সে স্পষ্ট জানে না যে এতকাল এই লোকটিকে খুশী করতে, তার সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সে একরকম প্রাণপণ সাধনাই করেছে।

জানে না বলেই ঘটনাটার অপ্রত্যাশিততা তাকে এত বিচলিত এবং অভিভূত করেছে। তাই তার চমকে সারা দেহে-মনে ওর এই অদ্ভুত বিচিত্র এক অনুভূতি—তাই সে স্মৃতির রোমন্থনে ওর এই রোমাঞ্চ।...

অনেকক্ষণ পরে সেদিন সেই স্তব্ধ অন্ধকার রাত্রে নিজের মনোভাব সম্বন্ধে একটা দারুণ সংশয় ওর মনেও হয়ত দেখা দিয়েছিল।

কিন্তু অবচেতনার অতলান্ত সমুদ্র থেকে সে সংশয় পরিষ্কার কোন রূপ পরিগ্রহ করার আগেই কঠিন শাসনে তাকে সেই অন্ধকারেই ফিরিয়ে দিলে সে।

বিমল অসাধারণ। বিমলকে সে শ্রদ্ধা করে, ভক্তি করে। তার বেশী কিছু নয়।

দুর্বাসা প্রসন্ন হয়েছেন, পাথরের দেবতা পূজা গ্রহণ করেছেন, তাইতেই, সে এত খুশী, তাইতেই তার এত আনন্দ!

॥ ২০ ॥

বেয়ারা এসে খবর দিলে, এক বুড়োবাবু বড় গেট্‌টার কাছে অপেক্ষা করছেন, ছুটি হ'লে বিমলবাবু যেন তাঁর খোঁজ করেন।

বিমল যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হ'ল, একটু উৎকণ্ঠিতও হ'ল। বুড়োবাবু? কে বুড়োবাবু? বাবা নয় ত? কোন বিপদ-আপদ—?

সে বললে, 'কেমন দেখতে সে বাবু? নাম কি বললেন? এখানে নিয়ে এলে না কেন শ্রীনাথ?'

শ্রীনাথ বেয়ারা মুখটা বিকৃত ক'রে বললে, 'কালো-মত, খুব রোগা এক বাবু?'

'চোখে চশমা আছে? দেখতে পান চোখে?'

'হ্যাঁ—হ্যাঁ! দেখতে পান বৈ কি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফটকে লটকানো

নোটিশগুলো পড়ছেন।...আমি ত বললুম আসতে...তিনি কিছুতে এলেন না। বললেন, অফিসের কাজের সময় বিরক্ত করা ঠিক নয়। আমি দিব্যি এই বেঞ্চিতে বসে থাকব, কোন কষ্ট হবে না। দেরি হ'লেও এমন কিছু ক্ষতি হবে না। তুমি বাবা গিয়ে একটু খবর দাও, মানে অন্য কোন দোর দিয়ে না বেরিয়ে যান।'

কতকটা আশ্বস্ত হ'ল। বাবা নন। এমন কি অভিলাষ বাবুও নন নিশ্চয়ই—অফিসের সময় সম্বন্ধে তাঁর অত বিবেচনা থাকত না, তিনিও কেরাণী।

কৌতূহলের শেষ থাকে না তার। কিন্তু আজই একটা খুব জরুরী কাজ হাতে রয়ে গেছে—এখনই শেষ ক'রে দিতে হবে। দিল্লী থেকে বড় কর্তা এসেছেন, কনফারেন্স আছে। এই ফাইলটা লাগবে তাতে। সুতরাং এখন উঠে যাবার কোন উপায় নেই। অগত্যা সে কাজের ওপরই ঝুঁকে পড়ে। সাড়ে চারটে বেজে গেছে, ছুটিরও খুব বেশী দেরি নেই। হাতের কাজ শেষ হ'লেই উঠে পড়তে পারবে।

কাজ যতই জরুরী হোক—মনের একটা অংশ সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত পরিচিত বন্ধ ব্যক্তির নামের তালিকা রচনা ক'রে যেতে লাগল। এমনও সন্দেহ হ'ল, কোন ঘটক নয়ত? সে শুনেছে বুড়ো ঘটকরা এইভাবে অফিসে অফিসে পাত্রদের তাড়া ক'রে বেড়ায়। কিন্তু অনুমানের পিছনে পিছনে বহুদূর অবধি তার মন ছুটেই বেড়াল শুধু, কোন মীমাংসা হ'ল না। শুধু হাতের কাজটাতেই দেরি হয়ে গেল মিনিট কতক, বড় সাহেবের লোক এসে দু'বার ঘুরে গেল।

অবশেষে এক সময় কাজ শেষ হ'ল—ছুটির সময়েরও বেশ খানিকটা পরে। কোনমতে খাতাপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে বেশ একটু দ্রুত পদেই নেমে এল বিমল। কিন্তু নেমে এসে যাঁকে দেখতে পেল সে—এতক্ষণের এত অনুমানের ধারে-কাছেও তিনি ছিলেন না।

পূর্ণ মাষ্টার মশাই!

তাড়াতাড়ি হেঁট হয়ে প্রণাম ক'রে বিমল বললে, 'কী ব্যাপার মাষ্টার মশাই, হঠাৎ এমন সময়ে, এখানে? এমন ভাবে?'

পূর্ণবাবু একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ—মানে কাল রাত্রেই এসেছি। নাতনীর ওখানে কাটিয়ে এলুম অনেক ক'মাস। তিন চার মাস।'

'তা আমাকে খবর দিলে ত আমিই যেতে পারতুম। আপনি আবার এই শরীরে এতখানি পথ বাসে ট্রামে কেন আসতে গেলেন?'

'না, শরীরটা আমার ওখানে গিয়ে বেশ সেরেছে। সারে নি? আমি ত বেশ জোর পেয়েছি।...তা ছাড়া—ব্যাপারটা হ'ল কি জানিস বাবা, এত কথা বলবার আছে তোকে যে এখানে পৌঁছে আর যেন একটুও অপেক্ষা করতে পারলুম না। সকালেই যেতুম, তোর বাড়ীর ঠিকানা ঠিক জানি না ব'লেই—। যে দিন থেকে মনে ঠিক-পেলুম কথাটার, ঠিক বিশ্বাসটি জন্মাল, সেদিন থেকে

ক'টা দিন বলতে গেলে ছট্‌ ফট্‌ করেছি। এই চার পাঁচ দিন যে কী ক'রে কাটিয়েছি তা আমিই জানি।...মনে হ'ত যে ছুটে চলে আসি। রুণু আরও একমাস থাকবার জন্যে খুবই পেড়াপীড়ি করেছিল কিন্তু আমি কিছুতেই থাকতে পারলুম না। তোকে না বলা পর্যন্ত স্থির হ'তে পারছি না।'

বিমল হাসল। বললে, 'কী এমন কথা ?...তা চিঠিতে লিখলেই ত হ'ত। আর কিছুদিন ওখানে থেকে শরীরটা ভাল রকম সারিয়ে এলেই ভাল করতেন। মিছিমিছি—'

'এই বয়সে আর কত সারবে বাবা। তাছাড়া জামাই-বাড়ী, একমাস একমাস ক'রে কতদিন হয়ে গেল। আর কি ভাল দেখায়।...তবে কি জানিস, চিঠি লেখার কথাটা মনে পড়ে নি। খুবই অবসর ছিল, লিখলে লেখা যেত।'

ততক্ষণে পথে বেরিয়ে পড়েছেন ওঁরা। পূর্ণবাবু বললেন, 'একটু কোথাও বসতে হবে বাবা বিমল, অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি।'

'চলুন, ঐ মাঠটায় গিয়ে বসি। তা ওপরে যান নি কেন ?'

'না, না। সে ভাল নয়। অফিসের কাজের সময় গিয়ে, কাজে বাধা সৃষ্টি করব কেন। আমি ত অফিসের কাজে যাই নি, এমন কোন জরুরী কাজও নেই। মিছিমিছি ক্ষতি করা বৈ ত নয়—'

বিমল হাসল একটু, বলল, 'অফিসের কাজ সম্বন্ধে আপনার মত শ্রদ্ধা যদি আমাদের থাকত মাষ্টার মশাই !'

তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনি ইদানীং কোন সরকারী অফিসের মধ্যে গিয়ে বসেন নি—না ?'

পূর্ণবাবু বিস্মিত হলেন একটু, 'কেন বল্‌ত ? না, সেই ইস্কুল ছাড়বার পর থেকে আর যাই নি। তখন মাঝে মাঝে যেতে হ'ত ইন্‌স্‌পেক্টারের অফিসে। তাও অবিশ্যি যাকে অফিসের ভেতর যাওয়া বলে তা কখনও যাই নি। স্লিপ প্যাঠিয়ে ওঁর খাস কামরার বাইরে অপেক্ষা করতুম, ডাক পড়লে যেতুম।'

বিমল বলল, 'ও তাই। আপনি মনে করেন আমরা সবাই একমনে ঘাড় গুঁজে কাজ ক'রে যাই, না ? অত মনযোগ দিয়ে কর্তব্য পালন করলে আর ভাবনা ছিল না মাষ্টার মশাই। শুধু সরকারী অফিস কেন—প্রায় সব অফিসেই—আমরা কদিন পুরো সময় কাজ করি বলুন ত ! মাসে সাত-আটটা দিন হয় ত ঢের। আচ্ছা এমনিই এত চলে অফিসের মধ্যে যে এক-আধ দিন এক-আধ জন এলে গেলে কোন ক্ষতি হয় না। লোকে কি আর খুব মিথ্যা দুর্নাম দেয় ? এ-ত প্রায় সবাই জানে যে, সরকারী কাজের মা-বাপ নেই।'

ততক্ষণে ওরা পথ পেরিয়ে একটু ঘাসের খোঁজ পেয়েছে। পূর্ণবাবুর কষ্ট হচ্ছে দেখে বিমল সেইখানেই বসে পড়ল। অফিস-ফেরৎ বাবুর দল দু একজন একটু অবাক হয়ে তাকাল কিন্তু ওদের দুজনের কারুরই সেদিকে লক্ষ্য ছিল না। কৌতূহলটাই বিমলের সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠেছে সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সে বসে পড়েই প্রশ্ন করল, 'তারপর ? ব্যাপারটা কি বলুন ত ? এমন অস্থির হয়ে চলে এসেছেন, এমন কী জরুরী কথা ?'

'বলছি।' পূর্ণবাবু যেন দম নেবার জন্যই স্থির হয়ে বসলেন। কিছু দিন আগে বিমলের শক্ত কথাগুলো যেমন তাঁর হৃদয়াবেগে আলোড়ন জাগিয়েছিল, আজও তিনি তেমনি একটা আলোড়ন অনুভব করছেন। বহু দিনের বিস্মৃত বেদনা যেন আজও আর একবার সুপ্তি-সমুদ্র থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, স্মৃতির দুয়ারে পড়ছে ঘা। হঠাৎ তখনই কথা কইতে পারলেন না পূর্ণবাবু।

বিমল স্থির হয়ে বসে রইল। তার এই দরিদ্র অবহেলিত মাষ্টারমশাইকে শুধু সে শ্রদ্ধাই করে না—ভালও বাসে। তাই সে তাঁর চরিত্রের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এবং রহস্য জানে। কোন এক কারণে তাঁর অন্তরের মর্মমূল আহত হয়েছে, তাই এভাবে ছুটে এসেছেন। আঘাত এবং আবেগ সামলাতে সময় দিতে হবে।

মিনিট কতক পবে পূর্ণবাবু চোখ খুললেন। একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে নড়ে চড়ে বসলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'সেদিন—মানে যেদিন ওরা আমার ঐ—' বলতে বলতে থামলেন এক মুহূর্তে, বোধকরি নিজের সম্বন্ধে 'সংবর্ধনা' শব্দটা উচ্চারণ করতেই বাধছিল তাঁর, 'ঐ সংবর্ধনা সভার আয়োজন করেছিল, সেদিন তুই যে কথাগুলো বলে এসেছিলি—মনে আছে? তারপর থেকে আর সে কথাগুলো ভুলতে পারি নি রে। কদিন না পেরেছি ভাল ক'রে খেতে, না পেরেছি ঘুমোতে। অহোরাত্র শুধু ঐ কথাগুলোই ভেবেছি।'

বিমল হাত বাড়িয়ে ওঁর পায়ের ধুলো নিয়ে বললে, 'সে আমার অমার্জনীয় ধৃষ্টতা হয়েছিল মাষ্টার মশাই, আমার সেটা অপরাধ।'

পূর্ণবাবু এবার মুখ তুলে চাইলেন। হাসলেনও একটু। বললেন, 'ধৃষ্টতা বললি, অপরাধ বললি—কিন্তু ভুল বলতে পারলি না। আমি জানি তুই তোর জ্ঞান-বুদ্ধি-বিশ্বাসের ওপর জোর রেখে সত্যি জেনেই বলেছিলি কথাগুলো। তাই ত আমি অস্থির হয়েছিলুম।...তুই ত জানিস, কোন কাজ কি আচরণ ভুল বলে বা অন্যায় বলে বুঝলে তার সংশোধন কি প্রতিকার না হওয়া পর্যন্ত আমি স্থির থাকতে পারি না। তোর কথা সত্যি হ'লে আমার সমস্ত জীবনটাই যে ভুল হয়ে যায়।'

আবারও কয়েক মুহূর্ত থামলেন তিনি। হয়ত বা সেই সাংঘাতিক সম্ভাবনার পূর্ণ গুরুত্ব কল্পনামাত্র ক'রেই, শিউরে উঠলেন। তারপর বললেন, 'ভাবনার যেন কোন কূলকিনারা ছিল না। মনে মনে জানা অজানা কত কথাই তোলাপাড়া করেছি, সমর্থন খুঁজেছি নিজের আচরণের। কিন্তু আজ স্বীকার করতে দ্বিধা নেই—মনে কোন জোরই পাই নি। মনে হয়েছে তোর কথাই ঠিক। যে লেখাপড়া শেখাটা মানুষের জীবনে সব চেয়ে দরকারী কাজ বলে মনে হয়েছে—বুঝি তার সত্যিই কোন মূল্য নেই। যে জীবন তাকে যাপন করতে হবে সেই জীবনের উপযোগী হাতিয়ার সংগ্রহই তার দরকার। অন্নবস্ত্রের কথাটাই সবচেয়ে বড় কথা! কিন্তু ওখানে গিয়ে সে ভুল আমার

ভেঙেছে। আমি নিজের মনে জোর পেয়েছি। আজ আমি নিশ্চিন্ত।'

পূর্ণবাবু বিমলের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। কিন্তু বিমল কোন উত্তর দিলো না—তাঁর দিকে বিস্মিত চোখ মেলে নীরবে চেয়ে রইল শুধু।

খানিকপরে পূর্ণবাবুই আবার বলতে শুরু করলেন, 'ভুলটা আমার হঠাৎই ভাঙল। নাত-জামাইয়ের পাশের কোয়ার্টারে একটি ছেলে পড়াতে আসে। তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গিয়েছিল। সে ছেলেটির বই কেনবার নেশা আছে, সে আমাকে একখানা ইংরেজী মাসিক পড়তে দিয়েছিল। তাতেই হঠাৎ খবরটা পড়লুম। হিসেব দিয়েছে কোন্ দেশে শতকরা কত লোক লেখাপড়া জানে, আর সে অনুপাতে কত বই বিক্রী হয়। তাতেই জানলুম, আমেরিকাতেই সব চেয়ে বেশী লোক শিক্ষিত—অথচ সে হিসেবে সব চেয়ে ওদেশেই বই কম বিক্রী হয়। এই তোর টেক্‌নিক্যাল শিক্ষার মূল্য বাবা। ওতে শুধু মানুষকে পয়সা রোজগার করতেই শেখায়, তার চেয়ে বড় কিছু দেয় না।...যে শহরে আমি ছিলুম, সেখানে কারখানার কর্মচারীদের জন্যে কত ব্যবস্থাই না করেছে। ইন্দ্রপুরীর মত শহর, ভাল ভাল কোয়ার্টার,—রাস্তাঘাট, আলো, ইলেকট্রিক, জলের কল—কিছুর অভাব নেই। ক্লাব, সিনেমা, ইস্কুল—সব আছে। অল্প বয়সে কাজ শিখে ওখানে ঢুকে মোটা মোটা মাইনে পাচ্ছে। না আছে খাওয়া পরার কষ্ট, না আছে বসবাসের কোন অসুবিধে।...কিন্তু বাবা—বড় বড় মোটা মোটা মাইনের অফিসারদের বাংলো থেকে টাইম টেবল্ আর বুড়ী মা দিদিমা থাকলে একখানা পাঁজি, এ ছাড়া আর একটা বইও বার করতে পারবি না। সরস্বতী একেবারেই বিদায় নিয়েছেন!'

বিমল আজ আর উত্তেজিত হ'ল না। বরং আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠে উত্তর দিল, 'সরস্বতীকে বিদায় দেওয়াই যে একটা শোচনীয় ঘটনা এটাই যদি আমি না মানি? আপনি আমার মূল বক্তব্যটা ভুলে যাচ্ছেন মাষ্টার মশাই। লক্ষ্মী থাকাটাই আসল কথা—সরস্বতী না থাকলেও চলবে।'

'কিন্তু এতে ক'রে লক্ষ্মীকেই কি ধরে রাখতে পারবি?...ইংরেজের রাজ্যে সূর্য অস্ত যেত না। কিন্তু সে পৃথিবীব্যাপী সাম্রাজ্য কারা গড়ে তুলেছিল? তারা কেউই টেক্‌নিক্যাল ট্রেনিং-এর ধার ধারত না। সামান্য ইংরেজী, তার সঙ্গে যদি দু'পাতা ল্যাটিন গ্রীক শিখতে পারল ত সে মহা-পণ্ডিত ব'লে গণ্য হ'ত সেকালে। তোদের এখনকার মত চৌকস টেকনিক্যাল ট্রেনিং ছিল তাদের কল্পনারও বাইরে। কিন্তু সেই সব মূর্খের দল যা করে রেখে গিয়েছিল আজ শিল্পবিজ্ঞানে পারদর্শী ইংরেজ সে সব বিলিয়ে দিয়ে দেউলে হয়ে বসল! বলতে পারিস বিমল—আমেরিকানরা পৃথিবীর মধ্যে কোথায় কি সুবিধে করতে পেরেছে? পৃথিবীর উপকার করে বেড়াচ্ছে আর সর্বত্রই মার খাচ্ছে! সব জায়গাতেই সে উপহাসাস্পদ। বোকা জমিদারদের ছেলের মতই তার অবস্থা।... যখন এত কল-কারখানার ছড়াছড়ি ছিল না, তখন ইউরোপীয়ান পন্ডিতরা জ্ঞান-বিজ্ঞানে পৃথিবীকে যতটা সমৃদ্ধ করতে পেরেছেন—ততটা এখন কেউ পারছেন কি? শুধু মারণাস্ত্রই তৈরী হচ্ছে রং-বেরং-এর!'

'না তা ঠিক নয় মাষ্টার মশাই। পৃথিবী আজ এত এগিয়ে গেছে যে সাধারণ চলাটা আপনার হয়ত চোখে পড়ছে না—ছুটে চলা ছাড়া কোনটাকেই চলা বলে মনে হচ্ছে না আপনার!'

'তা হয়ত হবে। কিন্তু বাবা আমাদের দেশের কথা আমি ভাল ক'রেই ভেবে দেখেছি। ইংরেজের লিবারেল এডুকেশন না পেলে আমাদের খুবই ক্ষতি হ'ত। বাংলা দেশের দিকে তাকিয়ে দ্যাখ—উনবিংশ শতাব্দীর আগে বাঙ্গালী কি ছিল? ভাঁড়ুদত্ত আর মুরারি শীল—এই হ'ল আগেকার সাধারণ বাঙ্গালীর নমুনা। আর একটু এগুলে রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ, বড় জোর নন্দকুমার। নবদ্বীপের দু' একজন পণ্ডিত আর মহাপ্রভুকে বাদ দিলে সোজা এগিয়ে আসতে হবে উনবিংশ শতাব্দীতে। রামমোহন বিদ্যাসাগর ভূদেব মাইকেল রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ যার কথাই বল না কেন, ইংরেজের লিবারেল এডুকেশন ছাড়া কেউই বিকশিত হ'তে পারতেন কি?'

বিমল প্রশ্ন করল, 'কিন্তু রামকৃষ্ণ?'

'বীজ ভাল ক্ষেত্রে না পড়লে ফসল ভাল হয় না বাবা। ঠাকুর রামকৃষ্ণ সপ্তদশ শতকে জন্মালে কেউ তাঁকে চিনত না। নতুন আলো আর হাওয়ার মধ্যে এসে পড়েছিলেন বলেই বিকশিত হবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি। দেশের নবজাগরণের শুভলগ্নটিতে তিনি জন্মাতে পেরেছিলেন, এটা আমাদের কাছেও সৌভাগ্য বৈকি! আর বিবেকানন্দ! ইংরেজের শিক্ষা ছাড়া বিবেকানন্দ তৈরি হ'ত বলে আমি মনে করি না। এঁদের কথা বাদ দে, তোদের রাজনীতিক নেতারাও সুরেন বাঁড়ুয্যে, সি আর দাশ—সবই ঐ যুগের মানুষ, ঐ ক্ষেতের ফসল। সে যুগের বৈশিষ্ট্য শেষ হয়ে গেল বোধ হয় নেতাজীতে। আমাদের বাল্যকালে—তার অনেক পরেও—সুভাষবাবু যখন ছেলেমানুষ তখনও—কিশোর ছেলেরা স্বপ্ন দেখত তারা সন্ন্যাসী হবে, বিবেকানন্দ হবে, দেশের সেবা করবে। আজকের কিশোরেরা স্বপ্ন দেখে তারা বিড়লার মত শিল্পপতি হবে নয়ত ফিল্মের অভিনেতা হবে। ঠিক কি না বল—যদিও মাষ্টারী ছেড়েছি, ছেলেদের সংসর্গ ত্যাগ করি নি। পথের ধারে বসে থাকি, সব কথাই কানে যায়।...এ দুটো আদর্শে অনেক তফাৎ। এখনই ত সরকারী অফিসের কথা বলছিলি, দেখতেও ত পাচ্ছি নেতাদের কত শুভ সংকল্প নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, শিব গড়তে বানরে পরিণত হচ্ছে শুধু উপযুক্ত কর্ম্মীর অভাবে। যত দিন যাবে এ অভাব বাড়বে বাবা। সেবা কথাটাই উঠে যাচ্ছে দেশ থেকে—এটা যে কত বড় ক্ষতি, একদিন তোরা বুঝবি।'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বিমল বললে, 'আপনি কি তাহ'লে বলতে চান—আমরা পিছু হটব?'

'পিছু হটবার কথা বলব কেন বাবা। এগোব—তবে ভুল পথে নয়—এইটেই আমি বলতে চাই। শিল্প সাহিত্য সঙ্গীত—এগুলোকে বাদ দিয়ে শুধু খাওয়া-পরা-থাকার সাধনাটাই যে মানুষের বড় সাধনা এইটে আমি কিছুতে মানতে রাজি নই। আর ওগুলোকে যদি বাদ দিতে না চাই,

তাহ'লে সাধারণ শিক্ষাকে বাদ দিতে পারব না। সংস্কৃত পড়ে চাকরী পাব না হয়ত, তবু ওটা দরকার, যেহেতু কালিদাসকেও আমাদের দরকার। ইংরেজী ভাষার মধ্য দিয়ে বিশ্বের জ্ঞান-ভাণ্ডারে পৌঁছব, বিশ্বের কাব্য-দর্শন ইতিহাসে প্রবেশ করব বলেই তাদের গ্রামারও মুখস্থ করব।'

'খাওয়া-পরার প্রশ্নটাও বড় প্রশ্ন মাষ্টার মশাই! দেহটাও উপেক্ষণীয় নয়।'

'তা জানি বাবা, কিন্তু খাওয়া-পরাটা নিয়ে আমাদের কতটা মাথা ঘামানো উচিত সেটা কোন দিন তোরা ভেবে দেখেছিস? ওর কোন সীমা-রেখা নেই। সুখ এবং স্বাচ্ছন্দ্যের মাপকাঠি—টানলে ক্রমাগতই বেড়ে যাবে। একশবছর আগেকার মজুররা এখনকার ঐ ইনডাস্ট্রিয়াল টাউনকেই সাক্ষাৎ স্বর্গ বলে মনে করত। এত সুবিধার কথা স্বপ্নে দেখবারও উপায় ছিল না তাদের। আজকের কেরাণীদের অর্ধেক সুবিধা পেলে তখনকার কেরাণীরা সুখে অজ্ঞান হয়ে যেত। কিন্তু আজই কি তাদের তৃপ্তি আছে? নাৎজামাইয়ের ওখানে শুনে এলাই ধর্মঘট আসন্ন। আজও পৃথিবীতে এমন দেশ আছে—স্বাধীন দেশ—যেখানে মজুরদের হাসিমুখে দৈনিক এগারো ঘণ্টা খাটতে হয়। প্রতিবাদ করবার উপায় নেই। আমাদের দেশের লোক আট ঘণ্টা খেটেই বুকের রক্ত দিচ্ছে মনে করে। তারা খাটবার সময়টা আরও কমাতে চায়। আমার তারাপদ পণ্ডিত মশাইয়ের কুড়িগুণ মাইনে পান যে সব শিক্ষকরা, তাঁদের অসন্তোষ তারাপদ বাবুর চেয়ে ঢের বেশি! আমি এঁদের দোষ দিচ্ছি না, বিদ্রূপ ত করছিই না। শুধু বলছি যে প্রয়োজনবোধটাকেও ইচ্ছা করলে সংহত ও সীমাবদ্ধ করা যায়। তাহ'লে এই যে জীবনের দিকে আমরা ছুটে চলেছি, সে জীবনটাকে আর এত একান্ত আবশ্যক বা মূল্যবান বলে মনে হবে না।'

'আজ সারা পৃথিবীই যে এই দিকে ছুটে চলেছে মাষ্টার মশাই। তারা কি সকলেই নির্বোধ?'

'গান্ধীজিই কি খুব নির্বোধ ছিলেন? তোরাই ত তাঁকে জাতির জনক বলিস, তাঁর দৌলতেই তোরা স্বাধীনতা পেলি বলে বেড়াস! অতবড় দুঁদে সাম্রাজ্যবাদীদের সঙ্গে লড়াই ক'রে যে জিতল সে কি তাদের চেনে নি?…এই সভ্যতার আসল চেহারাটা ঠিকই তাঁর চোখে পড়েছিল। সেই জন্যে তোরা যাকে বলিস ইনডাস্ট্রিয়ালিজেশন—তিনি তার এত বিরোধী ছিলেন। আমাদের গ্রামের জীবনকে ধ্বংস করে এ এমন এক নাগরিক জীবন এনে দিচ্ছে যা আমাদের পক্ষে আদৌ শ্রেয় নেয়। আমি এই ক'দিনে কথাটা খুব ভেবে দেখেছি বাবা বিমল, এই কলকারখানা পৃথিবীর এমন কোন উপকার করে নি—কিন্তু অপকার করেছে ঢের। মালের প্রোডাকশন যেমন বেড়েছে, অমনি দরকার হয়েছে তার জন্য বিস্তৃত বাজার। সেই জন্যেই প্রয়োজন হয়েছে বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্য অধিকার করা। ইংরেজ আর ফরাসী, আগে ভাগে অর্ধেক দুনিয়াটা দখল করে নিয়েছিল বলেই জার্মানী আর জাপানের এত রাগ

ওদের উপর। ইংরেজরা খোলা প্রতিযোগিতায় কোন দিন পেরে ওঠে নি এদের সঙ্গে—নিজেদের রাজত্বে জোর ক'রে দাবিয়ে রেখেছিল শুধু। ইম্পিরিয়াল প্রেফারেন্স অনেকেরই চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল।···এই এত বড় দুটো বিশ্বযুদ্ধের মূলেও কি ঐ বিদ্বেষ ছিল না?···প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় হু-হু ক'রে কাজ বাড়াতে হয়েছিল। তার পর আমেরিকার কারখানায় যখন কাজ কমে এল—অমনি পড়ে গেল হাহাকার কত লোক আত্মহত্যা করল না খেতে পেয়ে, তার সীমাসংখ্যা নেই। তোরা তখন ছোট ছিলি তোরা জানিস না, আমরা খবরের কাগজে পড়েছি। সেইজন্য এবারের লড়াইয়ের পর সহজে হাত গুটোতে পারছে না—নানা উপায়ে লড়াইয়ের গরম বাতাস জীইয়ে রাখছে। এই যে সোভিয়েট রাশিয়া, চারিদিকে কেবল কারখানা বাড়িয়ে যাচ্ছে—শুধু মাল, শুধু মাল,—লোকগুলোকে খাটিয়ে পিষে তাদের যন্ত্রে পরিণত করছে—একদিন যখন তার নিজের অভাব মিটবে, তখন এই রাক্ষুসে কলকারখানাগুলো নিয়ে কী করবে বল্‌ত? এত মাল বেচবে কোথায়? লোকগুলোকে কী কাজ দেবে?···তখনই তার দরকার হবে বাইরের বাজার, সাম্রাজ্য। এখনই ত ছোটখাটো সাম্রাজ্য সে গড়ে নিয়েছে, মালও বিক্রীর চেষ্টা চলছে। এখন আছে খুব ছোট স্কেলে, তখন সেইটেই বেড়ে যাবে। আমাদের ভারতেরও এই হাল হবে একদিন। কোন দিন না কোন দিন নিজেদের দরকারকে ছাড়িয়ে যাবে মালের প্রোডাকশন! তখন?···না বাবা বিমল, ইন্‌ডাস্ট্রির অগ্রগতি, বৃহৎ শিল্পপ্রচেষ্টা—অর্থাৎ এক কথায় বড় বড় কলকারখানা স্থাপন—এটাই যে সমস্ত সমস্যার একমাত্র সমাধান তা আমি মানতে রাজী নই।'

পূর্ণবাবু কতকটা শারীরিক ক্লান্তিতেই, বোধ করি দম নেবার জন্য এইবার থামলেন একটু। পশ্চিম আকাশে অনেকক্ষণ ধরেই মেঘ জমছে, তাই হঠাৎ যেন চারিদিক অন্ধকার হয়ে এসেছে—ঘড়ির হিসেবে একটু বেশি তাড়াতাড়িই। এখন মুখ তুলে সেদিকে চেয়ে বিমল ব্যস্ত হয়ে উঠল, বললে, 'এখান থেকে উঠতে হবে মাষ্টার মশাই—ঝড় উঠবে বোধ হয়।'

কথাটা পূর্ণবাবুর কানে পৌঁছল না। প্রবল উত্তেজনায় অনেকক্ষণ বকে গেছেন, তার প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। সমস্ত দেহ থর থর করে কাঁপছে। তবু কিন্তু তিনি তখনও তাঁর নিজের বক্তব্যেই ডুবে আছেন।

একটু পরে বেশ একটু ক্লান্তসুরেই বললেন, 'যারা একদিন লিবারল এডুকেশন পেয়েছিল তারাই আজও ডেমোক্রেসি ডেমোক্রেসি ক'রে চেঁচাচ্ছে। নেহেরু গান্ধীজি—এঁরা ইংরাজের খাস প্রডাক্ট। যে শিক্ষা এঁরা পেয়েছেন সে শিক্ষাকে বিদায় দিচ্ছি আমরা—কোন কোন দেশ আগেই দিয়েছে। ফলে নতুন ধরনের অধীনতা, নতুন ধরনের সাম্রাজ্যবাদকেই কি ডেকে আনছি না? আজ কেউ কারুর কথা শুনতে প্রস্তুত নয়, সবাই চায় জোর করে অপরকে নিজের মতে আনতে। যে আমার দিকে নয়—সে আমার শত্রু। এ মনোভাব ভাল নয় বাবা, মোটে ভাল নয়। মানবজাতির কোন কল্যাণ এর

মধ্যে নেই। তুই কি বলতে চাস চল্লিশবছর পরেও আজ সোভিয়েট রাশিয়ায় জনসাধারণ জারের আমলের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ভোগ করছে ?...যন্ত্র-সর্বস্ব নাগরিক সভ্যতার মধ্যে মানুষের কল্যাণ নেই, এটা সেই সত্যদ্রষ্টা ঋষি, গান্ধীজি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন, তাই তিনি চরকা, খদ্দর, কুটিরশিল্পের ওপর অত জোর দিয়েছিলেন, সহজ সরল অনাড়ম্বর অথচ স্বাস্থ্যকর গ্রাম্য জীবন কল্পনা করেছিলেন—যেখানে রোগ থাকবে না, অভাব থাকবে না, অথচ কর্মহীন জীবনে বসে বসে শুধু পরের অনিষ্ট চিন্তা এবং পরচর্চা করবে না লোকে—সবাই খেটে খাবে। অভাব যেমন থাকবে না, তেমনি সহস্রবিধ বিলাসের সরঞ্জামও থাকবে না। পরস্পরের ফল নিজেরা ভাগ ক'রে নিয়ে সুখে থাকবে। ঐ কুটির থেকেই আবার সাহিত্য শিল্প দর্শন আসতে পারে—যা মানুষকে এতকাল ধরে অপর জন্তুর থেকে স্বাতন্ত্র্য ও শ্রেষ্ঠত্বের দলিল জুগিয়েছে। এই সব আধুনিক ইন্ডাস্ট্রিয়াল টাউনের ধারে-কাছেও তার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। ওখানে বড় জোর সরকার বা রাজনৈতিক দলের উৎসাহ দেওয়া ফরমাসী সাহিত্য শিল্প তৈরী হ'তে পারে, কারখানার ছাঁচে ঢালা অপর কোন মালের মতই।'

ঠাণ্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। মেঘ ডেকেছে ইতিমধ্যে। আকাশে আসন্ন দুর্যোগের সূচনা। বিমল একেবারে উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'কিন্তু আর নয়, উঠুন মাষ্টার মশাই, জল এল বলে।'

সে সযত্নে পূর্ণবাবুর হাত ধরে ওঠাল। হাত ধরেই নিয়ে যেতে হ'ল তাঁকে। এতক্ষণের উত্তেজনা বক্তব্যের সঙ্গেই নিঃশেষ হয়ে গেছে, অবসাদ এসে চেপে বসেছে, মনে শুধু নয়—দেহেও। পা ভারী হয়ে উঠেছে, কোন মতে টেনে নিয়ে চলতেই পারছেন না তিনি। খানিকটা গিয়েই ভাগ্যে একখানা রিক্সা পাওয়া গেল। রিক্সা করে ধর্মতলার মোড়ে পৌঁছে অতিকষ্টে একখানা বাসে উঠল ওরা। আর এক মিনিটও দেরি করলে অসুবিধার অন্ত থাকত না। কারণ বাস ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই প্রবল ঝড় উঠল—একটু পরে জলও শুরু হয়ে গেল।

বাসে বসবার জায়গা পাওয়া গেল না। বিমল পাশ থেকে ওঁকে জড়িয়ে ধরে রইল। পূর্ণবাবুও তন্দ্রাতুর শিশুর মতই সমস্ত দেহের ভারটা ওর ওপর ছেড়ে দিয়ে ক্লান্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

খানিকটা যাবার পরই হঠাৎ বোধহয় মনে পড়ে গেল কথাটা।

'তুই এদিকে যাচ্ছিস বাবা—তোর, তোর টিউশনী নেই ?'

'আছে—তবে আজ না গেলেও এমন কোন ক্ষতি হবে না। আপনাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে আসি।'

পূর্ণবাবু আর কোন প্রতিবাদ করলেন না। বোধকরি করবার উপায়ও ছিল না। পা দু'খানা তখন সত্যিই ভেঙ্গে আসছে তাঁর।

॥ ২১ ॥

পূর্ণবাবু সেদিন যখন কোনমতে বাড়ীতে পৌঁছে এক রকম নিঃশব্দেই শয্যা গ্রহণ করলেন—তখন তাঁর এবং বিমলের দুজনেরই মনে হয়েছিল এ ক্লান্তিটা সাময়িক, একটা রাত বিশ্রাম নিলেই সেরে যাবে। বিশেষত অনেক-দিন পশ্চিমে থেকে খানিকটা সুস্থ হয়েই এসেছেন, খুব একটা দেরি লাগবে না নিজেকে সামলে নিতে। মানসিক অবসাদেই দৈহিক প্রতিক্রিয়া বৈ ত নয়, স্নায়ু বিশ্রাম পেলে পেশীও সক্রিয় হয়ে উঠবে।

কিন্তু পূর্ণবাবু পরের দিনও উঠতে পারলেন না। তার পরের দিনও না। কে যেন তাঁর পা-দুটো থেকে সমস্ত শক্তি হরণ করেছে। শুধু পা দুটোই না কেন—হাতও নাড়তে ইচ্ছা করে না তাঁর, বিছানায় উঠে বসতেও যেন কষ্ট হয়। এ যে কী একান্ত অবসাদ—তা তিনি বোঝাতে পারেন না স্ত্রীকে। হয়ত নিজেও বুঝতে পারেন না ভাল ক'রে। উৎকণ্ঠিতা প্রিয়ম্বদা বার বার প্রশ্ন করেন, 'কী কষ্ট হচ্ছে বলো না, ব্যথা করছে হাঁটু? বুকে কোনও কষ্ট আছে?' কিন্তু পূর্ণবাবু ভাল রকম উত্তর দিতে পারেন না। কথা কইতেও ক্লান্তি বোধ হয় তাঁর, অপরিসীম ক্লান্তি। শুধু তিনি যেন ডুবে যাচ্ছেন কোন্ এক অতলে। আর এই ডুবে যেতেই যেন ভাল লাগছে। তাঁর সমস্ত শক্তি, সমস্ত বুদ্ধি, চেতনা—সব কিছুই একটা বিস্মৃতি, একটা পরিপূর্ণ সুপ্তির মধ্যে ডুবে গেলে যেন তিনি বাঁচেন। আর পারছেন না নিজের সঙ্গে লড়াই করতে।

কে জানে, হয় ত এই অবসন্নতা তাঁর দেহের মধ্যে ঘনিয়ে আসছে অনুভব ক'রেই তিনি সেদিন অমন ক'রে ছুটে গিয়েছিলেন বিমলের কাছে, কলকাতাতে পা দিয়েই হয়ত বুঝেছিলেন যে এখনই না গেলে আর তাঁর যাওয়াই হবে না। অথচ যাওয়াটাও যে সেদিন একান্ত দরকার ছিল। তাঁর আচরণে ভুল হয় নি, তিনি ভুল করেন নি, এটা প্রমাণ না করা পর্যন্ত যে তাঁর শান্তি নেই। জীবনের প্রচণ্ডতম ব্যর্থতাকে স্বার্থত্যাগের তাজমহল দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন এতকাল, সে তাজমহল যদি হাওয়ার প্রাসাদের মত হাওয়াতেই মিলিয়ে যায় ত তিনি বাঁচবেন কি ক'রে? এমন কি মরেও যে শান্তি হবে না তাঁর! এতবড় অনুশোচনার বোঝা নিয়ে পরলোকের পথেই কি চলতে পারবেন?···

অথচ সেই সংবর্ধনার দিনটিতে বিমলের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে এই দীর্ঘকাল যে সংশয়ের ভারে নিপীড়িত হচ্ছিলেন দিনরাত—তা থেকে মুক্তি পেয়ে নিতান্ত লঘুচিত্তে নিশ্চিন্ত মনে এবং সুস্থ দেহেই ত তিনি ফিরছিলেন। এ অবসাদ ত তাঁর আসবার কথাও নয়। তবে কি মূলেই কোথাও কোন গোলমাল থেকে গিয়েছিল?

বিমলকে তার ভুল বোঝানোর মধ্যে নিজের কৃতকর্মের যে সাফাই নিহিত ছিল সেটার আসল জোরটা কমে এসেছিল ভেতরে ভেতরে?···

কে জানে, পূর্ণবাবু যেন আর গুছিয়ে কিছু ভাবতেও পারেন না।

শুধু কেউ যখন থাকে না, প্রিয়ম্বদাও ম্লানমুখে গৃহকর্মে কোথাও ব্যস্ত থাকেন—তখন নিজের শিথিল চিন্তাশক্তিকে গুছিয়ে নিয়ে সেই দিনকার ইতিহাসটা ভাবতে চেষ্টা করেন, সব ঘটনাগুলোকে দুর্বল চেতনার মধ্যে আনবার চেষ্টা করেন—

সম্পূর্ণভাবে মনে আনবার চেষ্টা করল—সেই রুণুদের বাড়ী থেকে আসবার দিনটি।

কী ঝোঁকের মাথায়, কী বিজয়গর্বেই না ছুটে আসছিলেন তিনি! ট্রেনের কামরাটা খালি পেয়ে যেন বেঁচে গিয়েছিলেন। যে অকাট্য যুক্তিতে বিমলকে তিনি অভিভূত করবেন সেইগুলোই মনে মনে মহড়া দিতে দিতে আসছিলেন। আর কোন কথাই তাঁর মনে ছিল না—এমন কি এরই মধ্যে আসানসোলে কখন ট্রেন এসে থেমেছে, একটি বিধবা মহিলা কতকগুলি ছেলে-মেয়ে নিয়ে উঠেছেন, তা পূর্ণবাবু অত লক্ষ্যও করেন নি!

কিন্তু একসময়ে সচেতন হ'তেই হ'ল।

কেমন ক'রে যেন তিনি অনুভব করলেন যে ভদ্রমহিলা তাঁর দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন।

নিজের অজ্ঞাতেই বোধকরি একটা অস্বস্তি বোধ করেছিলেন, আর তার কারণটা অনুসন্ধান করতে গিয়ে চোখে পড়েছিল একজোড়া অত্যন্ত শান্ত চোখের দৃষ্টি।

অস্বস্তিটা বেড়েই গিয়েছিল। মনে হয়েছিল এমনি দৃষ্টির সঙ্গে তাঁর মনে যেন কার একটা স্মৃতি জড়িয়ে আছে।

তাছাড়াও কেমন যেন খারাপ লেগেছিল ব্যাপারটা—কোন মহিলা তাকিয়ে আছেন—এটা অনুভব করলে পুরুষ সব বয়সেই বুঝি অস্বস্তি বোধ করে।

নিতান্ত সাধারণ চেহারার ভদ্রমহিলা, বয়সও হয়েছে। এমন কি হয় ত আর প্রৌঢ়াও বলা চলে না। অন্তত দু'দিনবাদে চলবে না; বৃদ্ধার পর্যায়েই পড়বেন তখন। তবু—।

মহিলাটিই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন—দু'তিন-বার ওঁর চোখে চোখে পড়তে। লজ্জাই বোধ করেছিলেন একটু—সেটা তাঁর মাথা নিচু করার ভঙ্গীতে বুঝতে অসুবিধা হয় নি পূর্ণবাবুর।

পূর্ণবাবুর অস্বস্তি কিন্তু কমে নি। ঐ দৃষ্টির সঙ্গে কোন্ সুদূর অতীতে কোথায় যেন একটা যোগাযোগ ছিল, সে স্মৃতি ঝাপ্সা হয়ে গেছে, তবে তাঁর সমস্ত মন বলছিল যে সেটা সামান্য নয়। মনের মধ্যেকার খেইটা ধরতে পারছিলেন না—তবে যোগসূত্রটা খুব সামান্য নয়, এটা অনুভব করতে পারছিলেন।...

আর দুটি সাঁওতাল যাত্রী ছিল গাড়ীতে, তারা পরের স্টেশনেই নেমে গেল। এ ধারের একজোড়া বেঞ্চিতে তিনি একা এবং ওধারের বাকী জোড়ায় সেই মহিলা এবং তিনটি ছোট ছোট ছেলে-মেয়ে। বড়টি ছেলে, বাকী দুটি মেয়ে। ছেলেটি বছর-দশেকের হবে।

একটু পরে ছেলেটি পূর্ণবাবুর পাশে এসে বসল।

অলস কৌতূহলে, অথবা অন্যমনস্ক হবার জন্যই তিনি প্রশ্ন করলেন, 'তোমার নাম কি খোকা ?'

অপ্রতিভ চোখে তাকিয়ে ছেলেটি উত্তর দিল, 'পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী !'

'তাই নাকি ?' পূর্ণবাবু হেসে বললেন, 'তবে ত তুমি আমার মিতে ! আমারও নাম পূর্ণ।'

অন্যমনস্ক হয়েই পূর্ণবাবু মুখটা ফিরিয়েছিলেন ওদিকে। মহিলাটি যেন প্রাণপণে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন, নিচের দিকে—দ্রুত অপস্রিয়মান খোয়াপাথরগুলোর দিকে।

ছেলেটি উৎসাহিত হয়ে বলল, 'বা রে, বেশ ত মজা। দিদার কে গুরু ছিলেন, তাঁর নামও পূর্ণ। সেই জন্যেই নাকি আমার ঐ নাম রেখেছে।'

'দিদা ? মানে তোমার দিদিমা ?'

'না ঠাকুমা। এই যে, যিনি সঙ্গে যাচ্ছেন !'

আর প্রশ্ন করেন না পূর্ণবাবু। মহিলাটির ভাব দেখে মনে হয় তিনি যৎ-পরোনাস্তি লজ্জিত হয়ে পড়ছেন।...যেটুকু কৌতূহল প্রকাশ করেছেন, তাই হয়ত অশোভন হয়ে পড়ছে—

আরও দুটো তিনটে ছোট ছোট স্টেশন পেরিয়ে চলে যায়। ছেলেটিই নানাবিধ প্রশ্ন করে ওঁকে। ঐ যে নীল জামা পরা লোকটা ঐ তারের চাকার মত কী একটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—ওগুলো কি হয় ? এ ইস্টিশানগুলোর দাঁড়াল না কেন ? এ ইস্টিশানের লোক তবে কোন্ গাড়ীতে যাওয়া আসা করে ? সবুজ নিশেন দেখায় কেন ?

পূর্ণবাবুও ওদের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করেন। ক্লাস সিক্স্-এ পড়ে ছেলেটি। বোন দুটির একটি ক্লাস ফোর-এ, আর একটি সবে ইন্‌ফ্যান্টে ঢুকেছে।

কথায় কথায় ছেলেটিই বলে, ইনি ওর বাবার পিসীমা। ওদের আসল ঠাকুমা নেই, মা-ও মারা গেছেন বছর দুই আগে। এই দিদাই ওদের সব। ওরা কলকাতায় থাকে, পড়াশুনোর সুবিধের জন্যে—বাবা বার্ণপুরে চাকরী করেন। বাবার শরীর খারাপ হয়েছে শুনে দিদা দেখতে এসেছিলেন, ওদের নিয়ে। দশদিন ছিল ওরা। বাবা এখন সেরে গেছেন বেশ, তাই ওরা ফিরে যাচ্ছে। বাবাও আসবেন সামনের মাসে ছুটি নিয়ে।

অনর্গল বকে যায় ছেলেটি। নিজে থেকে কিছু তথ্য দেয়, আবার প্রশ্নও করে নানারকম। কিছু পূর্ণবাবুর কানে যায়, কিছু যায় না। শুধু যেন তিনি বড় বেশী অস্থির হয়ে ওঠেন ভেতরে ভেতরে। কিসের এ অস্থিরতা তাও বুঝতে পারেন না। নাম-জানা একটা আবেগ অকারণেই অন্তরে উদ্বেলিত হয়ে ওঠে।

পূর্ণর ছোট বোন উমা হঠাৎ বলে ওঠে, 'ক্ষিদে পেয়েছে দিদা।'

মহিলাটি যেন অনিচ্ছাতেই মুখখানা ভেতরে ফেরান। সম্ভবত বাইরের দিকে চেয়ে থাকাতেই, চোখে কয়লা পড়েছিল—দুটি চোখই অসম্ভব লাল,

চোখের পাতা দ্বটোও ভিজে। পূর্ণবাবু তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নেন কিন্তু তার ভেতরেই এটুকু তাঁর নজরে পড়ে—

ভদ্রমহিলা টিফিন কেরিয়ারে হাত দিতে গিয়েও কী ভেবে থেমে যান। ডাকেন, 'খোকা, এদিকে শুনে যাও।'

পূর্ণ যাবার আগে ফিস ফিস্ ক'রে বলে যায়, 'দিদা আমাকে কখনও নাম ধরে ডাকবে না। যার-তার সামনে বলবে খোকা। কী যেন দিদাটা!'

সে ওদিকে যেতে ভদ্রমহিলা পূর্ণবাবুর শ্রুতি-গোচর ভাবেই বললেন, 'খোকা তোমার ঐ দাদুকে বলো, আমি নিজে পরিষ্কার ভাবে খাবার তৈরী ক'রে এনেছি, পথেও কারুর ছোঁওয়া লাগে নি—উনি খাবেন কিছু?'

প্রস্তাবটা এতই অপ্রত্যাশিত যে পূর্ণবাবুর কথাটা বুঝতে বেশ একটু সময় লাগল। তারপর উনি অবশ্য একটা প্রতিবাদ করতে গেলেন কিন্তু খুব গুছিয়ে কিছু বলতে পারেলেন না। বললেন, 'আমি ত—মানে এসময় কিছু খাওয়ার অভ্যাস সেই—শরীরও তেমন—'

'খোকা ওঁকে বলো যে যেখান থেকেই আসুন—কোন্ সকালে খেয়ে বেরিয়েছেন, এতক্ষণে নিশ্চয় ক্ষিদে পেয়েছে। বাড়ী পৌঁছতে রাতই হবে। পথের খাবারও বোধ হয় উনি খান না।…গাড়ীতে ত ভীড়ও নেই তেমন—সামান্য কিছু খেতে দোষ কি?'

প্রস্তাবের অভাবনীয়তাতেই বোধ হয়—পূর্ণবাবু যেন কোন কথা কইতে পারলেন না। ছেলেমেয়েগুলোও কেমন একটু অবাক হয়ে গেছে। হয়ত অপরিচিত কোন লোকের সঙ্গে এতটা আত্মীয়তা ওদের দিদার স্বভাব-বিরুদ্ধ। পূর্ণবাবুও রীতিমত বিস্মিত হয়েছেন, তবে ওঁরা দুজনেই বার্ধক্যে পোঁচেছেন—নইলে অশোভনই মনে হ'ত মহিলার এই আচরণ।

পূর্ণবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও চেয়ে রইলেন ঐ দিকে। টিফিন ক্যারিয়ারের সঙ্গে কয়েকটি পাতাও এনেছেন গুছিয়ে; পাতাগুলি একটি ফরসা কাপড়ে মুছে নাতি-নাতনীদের আগে খেতে দিলেন। তারপর পূর্ণবাবুর খাবার সাজালেন তিনি ক্যারিয়ারেরই একটা বাটিতে। সঙ্গে অ্যালুমিনিয়ামের বড় জায়গাতে জল ছিল, একটা গ্লাসে তাই থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে এনে ওঁর সামনের বেঞ্চিরই একটা খালি জায়গাতে জল ছিটিয়ে ঠাঁই ক'রে দিয়ে অনুচ্চকণ্ঠে বললেন, 'হাতটা ধুয়ে নিন একটু।' তারপর ওদিক থেকে খাবারের বাটিটা এনে বসিয়ে দিয়ে ফিরে গিয়ে নিজের জায়গাতে বসলেন আগের মতই স্থির ভাবে। কেবল এদিকে আসবার সময় মাথার কাপড়টা অনেকখানি মুখের ওপর টেনে দিয়েছিলেন বলে—এবার ওঁর চোখ দুটো দেখা গেল না।

সম্পূর্ণ অপরিচিত এক মহিলার এই অকারণ আত্মীয়তায় বিরক্ত হবারই কথা—কিন্তু পূর্ণবাবু ঠিক ততটা বিরক্ত হ'তে পারলেন না। শুধু বিস্ময় বোধ করতে লাগলেন। আর মনে করবার চেষ্টা করতে লাগলেন কোথায় যেন এই ধরণের কাজকর্ম, এই ধরণের সেবা দেখেছিলেন এর আগে। যেন সবটাই একেবারে অপরিচিত নয়।

পূর্ণবাবুর ব্যবহারিক জ্ঞান খুবই কম। এক হাতে গ্লাসটা ধরে বাইরে হাত বাড়িয়ে হাত ধুতে গিয়ে জলটা উড়ে এসে গায়ে পড়ে অনেকখানি জামাসুদ্ধ ভিজিয়ে দিয়ে গেল। অপ্রতিভ ভাবে এদিকে একবার চেয়েই তিনি তাড়াতাড়ি খাবারের বাটিটা টেনে নিলেন কিন্তু খাওয়ায় সত্যিই তাঁর তখন বিশেষ কোন রুচি ছিল না। এমনিতেই তিনি এ সময়ে কিছু খান না, তার ওপর আজকের এই মনের অস্থিরতায় আরও খেতে পারলেন না। সামান্য কিছু খেয়েই হাত গুটিয়ে বাঁ-হাতে জলের গ্লাস মুখে তুললেন।

মহিলাটি সম্ভবত ঘোমটার মধ্যে থেকেও লক্ষ্য করছিলেন ওঁর খাওয়া। তিনি হয়ত আরও খাওয়ার জন্য অনুরোধ উপরোধ ক'রে বিরক্ত ও বিব্রত ক'রে তুলবেন—পূর্ণবাবুর এই রকম একটা আশঙ্কা ছিল। কিন্তু ভদ্রমহিলা সেদিক দিয়েই গেলেন না। জলের পাত্রটা নিয়ে এগিয়ে এসে তেমন অনুচ্চ কণ্ঠেই বললেন, 'আপনি হাতটা ঐ বাটিতেই ধুয়ে নিন, আমি ফেলে দেব।'

পূর্ণবাবু এই বয়সেও লাল হয়ে উঠলেন নিজের অকর্মণ্যতার লজ্জায়। তাড়াতাড়ি বললেন, 'না, না, আমি কলঘরে গিয়ে ধুয়ে আসছি। এটাও—'

এবার কণ্ঠে বেশ একটু জোর দিয়েই তিনি বললেন, 'না না, আপনি ঐতেই জল ফেলুন, তাতে কিছু দোষ হবে না।'

বিহ্বল, হতচকিত পূর্ণবাবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। হাত ধোওয়া শেষ হ'লে দেখা গেল মহিলাটি তার পরের পর্বটার জন্যও প্রস্তুত হয়ে এসেছেন। আঁচলের মধ্য থেকে একটি পাট-করা ফর্সা গামছা বার ক'রে সন্তর্পণে ওঁর পাশে বেঞ্চির উপরই আলগোছা রেখে দিলেন।

আর সঙ্গে সঙ্গে যেন এক ঝলক দমকা হাওয়ায় পূর্ণবাবুর স্মৃতির বন্ধকপাটটা—যার কঠিন দেহলিতে এতক্ষণ বৃথাই মাথা খুঁড়ে মরছিলেন উনি—অকস্মাৎ উন্মুক্ত হয়ে গেল। যেমন মেঘঘন-রজনীতে চার পাশের অন্ধকারকে জমাট একাকার বস্তু বলে মনে হয়—অথচ বিদ্যুৎস্ফুরণ হওয়া মাত্র বহুদূর অবধি সমস্ত পরিচিত বস্তু তার বিভিন্ন চেহারা নিয়ে জেগে ওঠে—তেমনিই পূর্ণবাবুর সমস্ত মন একটা বিদ্যুৎ-চমকে জেগে উঠল। সমস্ত বিস্মৃতির অন্ধকার ডিঙ্গিয়ে বহুদিনের বহু পরিচয় একসঙ্গে মানস-চক্ষুতে উদ্‌ভাসিত হয়ে—তিনি নিজেও যেন চমকে কেঁপে উঠলেন—

'তরুবালা!'

বিধবা মহিলাটির মুখখানা সেই কুঞ্চিত লোল চর্মের মধ্যেও লজ্জায় আর অভূতপূর্ব এক আনন্দ-আবেগে ঝলমল করে উঠল এবং এক বিচিত্র কারণে একই সঙ্গে তাঁর দুই চোখের কূল ছাপিয়ে নামল জল। সেই লজ্জা আর অশ্রু ঢাকতেই তিনি গলায় আঁচল দিয়ে পূর্ণবাবুর দুই পায়ে মাথা রেখে গাড়ির মেঝেতেই ভূমিষ্ঠ প্রণাম করলেন।

'চিনতে পেরেছেন এতক্ষণে?···আমি কিন্তু আপনাকে দেখেই চিনেছি!'

অশ্রু-বিকৃত কণ্ঠে চুপি চুপি বললেন তরুবালা। তারপর তাড়াতাড়ি গামছাটাতে চোখের জল মুছে নিয়ে ছেলেমেয়েদের বললেন, 'তোমরা কলঘর

থেকে হাত ধুয়ে এসে ওঁকে প্রণাম করো, ইনিও তোমাদের দাদু হন।

সেই বুঝি প্রথম অনুভব করেছিলেন পূর্ণবাবু তাঁর হাঁটু দুটো অবশ হয়ে আসছে। স্নায়ুগুলোর এমনি দুর্বলতা সেই মুহূর্তেই প্রথম বোধ হয়েছিল। কিছু যেন ধারণা করতে পারেন নি—বহুক্ষণ পর্যন্ত।...

তরুবালা ওঁর সামনে বসে নিঃশব্দে বহুক্ষণ ধরে কেঁদেছিলেন সেদিন। নাতিদের সামনে লজ্জায় পড়বার ভয়ে প্রথমটায় অল্প কিছুক্ষণ নিজেকে সম্বরণ করেছিলেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর সম্ভব হয় নি সামলানো।

তারপর বহুকথাই জেনেছিলেন পূর্ণবাবু। বহু ইতিহাস।

পূর্ণবাবু চলে আসার ছ' মাসের মধ্যেই বিয়ে হয়েছিল তরুবালার। কিন্তু বেশীদিন স্বামীর ঘর করা তার অদৃষ্টে ঘটে নি। বিয়ের সময়ই নাকি যক্ষ্মার লক্ষণ দেখা গিয়েছিল পাত্রের—'পরের মেয়ের ভাগ্যে হয়ত বাঁচবে' এই বিশ্বাসেই তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দিয়েছিলেন তার মা। কিন্তু বিবাহের অষ্টাহ কাটবার আগেই রক্ত দেখা দিল। তখন ওকে বাপের বাড়ী আসতে দিলেন না তাঁরা, তেরোবছরের মেয়েকে দিয়ে সেই মৃত্যু-পথযাত্রীর সেবা-শুশ্রূষা করিয়ে নিলেন। সাংঘাতিক রোগে সেবা করবার লোকের অভাব হবে বলেই বোধ হয় তাঁরা বিয়ে দিয়েছিলেন—কে জানে! কিন্তু সে যাই হোক—তখন বাপের বাড়ী আসতে দেন নি বটে, বিধবা হবার পর আর কাল-বিলম্ব করেন নি, শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়া মাত্র নিজেরা গাড়ী করে এনে বাপের বাড়ীর সামনে ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। প্রাণগোপাল বাবুর সঙ্গে দেখাও করেন নি একবার। অবশ্য সে নাকি লজ্জায়—তাঁরা আর মুখ দেখাবেন কোন মুখে?

তারপর থেকে এই সুদীর্ঘকাল সেই বাড়ীতেই কেটেছে—যে বাড়ীতে পূর্ণবাবু তাঁকে দেখেছিলেন সেই প্রথমদিন। বাবা থাকতে বিশেষ কোন কষ্ট হয় নি কিন্তু ছোট ভাইয়ের সংসারে এক সময় খুবই লাঞ্ছনা সইতে হয়েছে তাঁকে। অত দুঃখ দিয়েছিলেন ভগবান কিন্তু মৃত্যুটা দেন নি। ছমাস ধরে ঐ সর্বনেশে রোগের মধ্যে বাস করা সত্ত্বেও সে রোগের বীজাণু তাঁর প্রাণ-শক্তিকে জখম করতে পারে নি। তিনি বেঁচেই রইলেন। আত্মহত্যাও করতে পারেন নি—কারণ মা তখনও বেঁচে। বৌয়ের হাতে পড়লে মা বোধ হয় খেতেই পেতেন না। আর কোথাও যেতেও পারেন নি—ঐ একই কারণে। তারপরও নড়তে পারেন নি, কারণ মা আর ভাজ প্রায় একই সঙ্গে মারা গেলেন। ভাইপো তখন বালক মাত্র। নবগোপাল আর বিয়ে করে নি, বোধ হয় দিদির মুখ চেয়েই, কিংবা ছেলের কথা ভেবে—কে জানে!...সেই ভাইপোর বিয়ে দিলেন—সে বৌও বাঁচল না। এই তিনটি ছেলেমেয়ের ভারও আবার তাঁর উপর এসে পড়ল। হতভাগী একে একে সকলকে খাচ্ছেন—কেবল নিজে আকন্দর ডাল মুড়ি দিয়ে ঠিক বসে আছেন—মৃত্যু নেই শুধু তাঁরই!...

এই দীর্ঘ দুর্ভাগ্যের ইতিহাসের মধ্যে আরও একটি ছোট্ট কথা বলেছিলেন তরুবালা। নানা কথার ফাঁকে একসময় বলে ফেলেছিলেন—কিন্তু পূর্ণবাবুর

কানে তা এড়ায় নি। বরং সেই কথাটিই সহস্র হাহাকারের মত মর্মমূলে গিয়ে বেজেছিল।

তরুবালা বলেছিলেন, 'আশা কাকে বলে তা জানি না, ভগবানের কাছে কিছু চাওয়াও ছেড়ে দিয়েছি আজকাল, জানি আমার কোন ভিক্ষে তাঁর কানে পৌঁছয় না। এদান্তে শুধু দিনরাত ইষ্টকে এইটুকুই জানিয়েছি—মরবার আগে যেন আপনার সঙ্গে একবার দেখা হয়। জানিয়েছি কিন্তু আশা করি নি যে সত্যিই দেখা পাবো। কী ভাগ্যি ভগবান এই শেষ প্রর্থনাটা শুনেছেন! আর আমার কোন আর্জি নেই তাঁর কাছে। যেদিন তাঁর সময় হবে—টেনে নেবেন। একদিন ত নিতেই হবে। যত দুর্ভাগ্যই হোক, দুঃখ দেবার জন্যও চিরকাল কাউকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারেন না—এইটুকুই যা নিশ্চিন্ত।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন তরুবালা কথাগুলো শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে।

দেবতারও ঈপ্সিত ধন তরুবালা।

তাঁকে পেলে পূর্ণবাবুর জীবন ধন্য, সার্থক হয়ে যেত। সেদিন প্রাণগোপাল বাবুর কথা শুনে অফিসে ঢুকলে আজ এই দারিদ্র্য, এই অশান্তিও বহন করতে হ'ত না। তবে কি বিমলের কথাই—

নতুন গড়ে ওঠা বিশ্বাসের ভিত আবার নতুন ক'রে আলগা হয়ে যায় দেখে পূর্ণবাবু জোর ক'রে সে প্রসঙ্গ মন থেকে দূর করেছিলেন। কতকটা সেই জন্যেই, এ বিশ্বাসের প্রাসাদ ভেঙ্গে পড়বার আগেই ছুটে ছিলেন বিমলের অফিসে—।

বিমল খবর পায় নি অনেকদিন পর্যন্ত। সেদিনের পর সে যেতেও পারে কয়েকদিন। প্রধান কারণ সময়াভাব। তাছাড়া সেদিন পূর্ণবাবুর ক্লান্তি নিতান্তই সাময়িক বলে বোধ হয়েছিল। দীর্ঘকাল স্বাস্থ্যকর স্থানে থেকে সেরে এসেছেন, কাজেই বড় রকম কোন ভাঙ্গনের কথা কল্পনাও করা যায় নি তাঁর সম্বন্ধে।

সুতরাং প্রিয়ম্বদার চিঠিখানা পড়ে সে বেশ একটু অবাক হয়ে গেল। প্রথমটা বুঝতেই পারে নি কার চিঠি। একে অনভ্যস্ত হাত, তায় বয়সে ও উদ্বেগে হাত কেঁপে কেঁপে গেছে—সে লেখা পড়াও দুঃসাধ্য।

প্রিয়ম্বদা লিখেছেন—

কল্যাণীয়বরেষু, বাবা বিমল, আশা করি ভগবানের কৃপায় তোমাদের সব কুশল। বোধ হইতেছে আমার সর্বনাশের বেশী বিলম্ব নাই। একেবারে আচ্ছন্ন অবস্থা, তাহার ভিতর শুধু দুইটি নামই মাঝে মাঝে করেন—বিমল আর তরুবালা। তরুবালা কে তাহা জানি না। ইহার আগেও একবার ভারী অসুখের সময় বিকারের ঘোরে ঐ নামটি করিতেন। কিন্তু পরে জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর পাই নাই। যাহা হউক অতিকষ্টে তোমার ঠিকানা সংগ্রহ করিয়া এই চিঠি দিলাম। উঁনিই তিন চার দিন চেষ্টা করিয়া এই ঠিকানা

দিয়াছেন—হয়ত ভুল হইতেই পারে। যাহা হউক যদি চিঠি পাও এবং উঁহাকে শেষ দেখা দেখিবার ইচ্ছা থাকে ত পত্রপাঠ আসিও আশীর্বাদ লইও।

ইতি—হতভাগিনী প্রিয়ম্বদা

ঠিকানায় অবশ্য খানিকটা ভুলই ছিল। নিতান্ত অদৃষ্টক্রমেই চিঠিটা এসেছে। কিন্তু প্রিয়ম্বদা কে? কার কথা লিখেছেন ইনি?

অনেকক্ষণ ভাববার পর অকস্মাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা—ছেলেবেলাতেই কে যেন ঠাট্টা করেছিল, 'পূর্ণমাষ্টার মহাশয়ের বোয়ের নাম জানিস? প্রিয়ম্বদা। অনসূয়া প্রিয়ম্বদা! হি, হি। সত্যি সত্যি কেউ ঐ নাম রাখে?'

প্রিয়ম্বদা তাহলে কি পূর্ণমাষ্টার মশায়ের কথাই লিখেছেন?

সর্বনাশ, এরই মধ্যে কী এমন অবস্থা হ'ল? এই ত পনেরো-কুড়ি দিন আগেই—

অফিসারকে বলে তখনই বেরিয়ে পড়েছিল বিমল। কিন্তু তখনও তার বিশ্বাস হচ্ছিল না।

অবশ্য পূর্ণবাবুকে দেখবার পর আর কোন সংশয় রইল না। এই পনেরো কুড়ি দিনেই যেন পাত হয়ে গিয়েছেন, বিছানার সঙ্গে মিশিয়ে রয়েছেন। বুকটার কাছে একটু জায়গা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে ওঠা নামা করছে মাত্র। তা নইলে কোথাও কোন জীবনের লক্ষণ নেই। এমন কি বিমলকে দেখে প্রিয়ম্বদা যখন প্রায় হাহাকার ক'রেই কেঁদে উঠলেন, তখন সে শব্দও তাঁর কানে গেল বলে মনে হ'ল না।

'এমন কী ক'রে হ'ল? কেন হ'ল? কী এমন অসুখ করল ওঁর? আমাকে খবর দেন নি কেন?' ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন করতে থাকে বিমল।

'কী ক'রে হ'ল বাবা তা কি আমিই জানি! সেদিন সেই যে তুমি শুইয়ে দিয়ে গেলে—সেই ত শেষ। আর ত ওঠেন নি। অথচ এমনি কোন রোগও নেই। ভাগ্নে ডাক্তার এনেছিল—তিনি বলে গেলেন অস্বাভাবিক ক্লান্তি. স্নায়ু সব অবশ হয়ে এসেছে নাকি। অথচ কেন যে এমন হ'ল তাও ত জানি না। বেশ সুস্থ হয়েই ফিরলেন রুণুর ওখান থেকে, দেখে আমার আনন্দ হ'ল। হতভাগী আমার চোখ লেগেই বোধ হয় এমন হ'ল। কী কষ্ট হচ্ছে তাও যদি বলতে পারতেন। কথাই ত কইছেন না, ওদিকে তবু যা হয় একটু ছিল, এই কদিন ত আর কিছু খাওয়ানোও যাচ্ছে না একটু গ্লুকোজের জল আর লেবুর রস—তাও জোর করে খাওয়াতে গেলে অনেক সময় গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছে, গিলতে পারছেন না।'...

'আচ্ছা উনি যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানে কোন শক্-টক্—কি আর কোন কারণ...?'

'সেখানে কী হবে বাবা। উনি ত খুব আনন্দেই ছিলেন। নিজে এসেও সে কথা বলেছেন। রুণু ত খবর পেয়ে ছুটে এসেছে, দিনরাত কান্নাকাটি করছে। কিন্তু সেখানে কি হবে?'

বিমল বিছানারই এক প্রান্তে বসে পড়ে আস্তে আস্তে ওঁর পায়ে হাত রাখল।

'ডাকো না বাবা—ডাকো। এ ঘুম নয়। অমনিই দিনরাত, আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছেন।' বলতে বলতে নিজেই ডাকলেন প্রিয়ম্বদা, 'ওগো শুনছ, তোমার বিমল এসেছে যে! একবারটি চোখ চেয়ে দ্যাখো—'

অনেকক্ষণ ধরে ডাকবার পর পূর্ণবাবু চোখ চাইলেন। নিষ্প্রভ, শূন্য দৃষ্টি। পায়ের দিকে চোখ পড়তে বোধ হয় কে বসে রয়েছে এটা অনুভব ক'রে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। মিনিট-দুয়েক পরে বিহ্বল দৃষ্টিতে পরিচয়ের জ্যোতি ফুটে উঠল। একটু প্রসন্নতাও ফুটল মুখে। অতিকণ্টে বললেন, 'কে রে বিমল এলি?'

'হ্যাঁ মাষ্টারমশাই। কিন্তু আপনাকে বড্ড ক্লান্ত দেখাচ্ছে, আপনি বেশী কথা কইবেন না, আমি বরং যে ডাক্তার দেখছেন তাঁর কাছে একবার যাই!'

'না না।' প্রবল চেষ্টায় যেন ধাক্কা দিয়ে কথাগুলো বেরোয় পূর্ণবাবুর, 'আর সময় নেই। আমার কাছে আয়। খুব কাছে।'

বিমল ওপর দিকে খানিকটা সরে এসে একেবারে মুখের কাছে মাথা নামাল, কিন্তু ততক্ষণে পূর্ণবাবু আবার চোখ বুজেছেন। আবারও সেই একান্ত সুষুপ্তি।

মিনিট দুই এইভাবে কাটবার পর বিমল ভয় পেয়ে গেল। সে হয়ত উঠেই পড়ত, প্রিয়ম্বদা ইঙ্গিতে নিষেধ করলেন। কারণ পূর্ণবাবুর চোখের পাতা দুটি কাঁপতে শুরু করছে, চোখ মেলবার পূর্বলক্ষণ।

সত্যিই চোখ খুললেন আবার।

আগের কথাগুলো বলতে গিয়ে বোধ হয় আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাই আগের চেয়ে আরও ক্ষীণ শোনাচ্ছে ওঁর কণ্ঠ। একেবারে মুখের কাছে কান এনে বিমল শুনল—উনি বলছেন, 'বাবা তোকে যা বলেছি, তা বলার কোন অধিকার আমার নেই। আমার সব গুলিয়ে গেছে, কোন্‌টা সত্যি তা আর জোর ক'রে বলতে পারব না। এতদিন পরে, দীর্ঘ জীবনের শেষে পৌঁছে এইটুকুই শিখলুম যে কোন্‌টা কর্তব্য মানুষ বোধ হয় কখনও বোঝে না। ভগবান তাকে বুদ্ধির অহঙ্কার দিয়েছেন, বুদ্ধি দেন নি।···তাই মনে হয়, হৃদয় যা বলে সেইটে শোনাই ভাল। তাতে ভুল হ'লে ডবল অনুশোচনা থাকে না।'

অনেকক্ষণ ধরে থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে কথাগুলো বললেন পূর্ণবাবু। তার পর আবার সুগভীর শ্রান্তিতে চোখ বুজলেন। একেবারেই অবসন্ন হয়ে পড়েছেন।

বিমল তাড়াতাড়ি ওঁর বুকে হাত দিয়ে দেখল। না, এখনও নিঃশ্বাস আছে।

বহুক্ষণ সেই ভাবেই কাটল। প্রিয়ম্বদা একটু জল খাওয়াবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু পূর্ণবাবুকে হাঁ করানো গেল না।···

সন্ধ্যার একটু আগে ডাক্তার এলেন। আরও একটু পরে সোমেশ এসে পৌঁছল। রুণু, সোমেশ, রুণুর বাবা—বহু লোকই এলেন। কিন্তু কারুর উপস্থিতিই তিনি অনুভব করলেন ব'লে মনে হ'ল না। পাথরের মূর্তির মতই অনড় হয়ে পড়ে রইলেন। এখন যেন বুকটাও তেমন উঠছে নামছে না, গলার কাছটা ধুক্ ধুক্ করছে মাত্র।

ডাক্তার কোন ভরসাই দিয়ে যেতে পারেন নি। কিছু একটা করবার আছে কিনা—বিমলের প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'আশ্চর্য রোগী মশাই। আস্তে আস্তে সিংক্ করছেন।—কোন রোগ নেই, বিশেষ কোন কষ্টও আছে বলে মনে হয় না—আলোর তেল ফুরিয়ে আসছে, এই মাত্র।…কি আর করব। এখন এমন অবস্থা, ইঞ্জেকশনের শকটাও হয়ত সইতে পারবেন না—। খাওয়ার ওষুধ এক, তা যা দিয়েছি তা-ও ত পড়েই আছে, কিছুই ত খাওয়ানো যাচ্ছে না!'

রাত দশটা নাগাদ পূর্ণবাবু আর একবার চোখ খুললেন। বিমল, প্রিয়ম্বদা, রুণু, সবাই মাথা নামিয়ে আনলে ও'র মুখের কাছে—

অনেকক্ষণ পরে বোঝা গেল যে উনি সত্যিই কিছু বলছেন। খুব অস্পষ্ট, জড়ানো জড়ানো অসংলগ্ন কতকগুলো কথা। অন্তত ওরা কেউই বুঝতে পারলেন না।

পূর্ণবাবু বলছিলেন, 'নামবার আগে তরুবালা জিজ্ঞাসা করেছিল,—দুই চোখে ওর জল—বলেছিল, ঠিক ক'রে বলে যান, আপনি কি শুধু কর্তব্যের জন্যেই আমাকে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন? সত্যিই কি ওটা আপনার তপস্যা? না কি আমাকে পছন্দ হয়নি ব'লে, আমাকে ঘেন্না করতেন ব'লে? সারা জীবন ভেবেও আসল জবাবটা পাই নি।…আমি তাকে উত্তর দিয়েছি বাবা বিমল, উত্তর দিয়েছি। সে বললে এতদিনে আমি শান্তি পেলাম। আর আমার কোন দুঃখ নেই। কিন্তু আমি কি ক'রে শান্তি পাবো বাবা? মলে কি মানুষ শান্তি পায়? এ জীবনের স্মৃতি কি পরজন্মে পৌঁছয় না?…'

আরও কী যেন বললেন, কিন্তু সেগুলো আর বোঝা গেল না একটুও। তারপর একটু চুপ ক'রে থেকেই আবার যেন বহু চেষ্টায় চেয়ে দেখলেন। চোখ দুটি একবার যেন বিস্ফারিত হয়ে কাকে খুঁজল।—প্রিয়ম্বদার দিকে চোখ পড়তে যেন প্রাণপণ চেষ্টায় বললেন, 'ক্ষমা, ক্ষমা—'

তারপর আবার স্তব্ধ হয়ে গেল তাঁর কণ্ঠ।

অনেকক্ষণ পরে বোঝা গেল যে আর কোন দিন, আর কখনই তাঁর সে কণ্ঠে স্বর ফুটবে না। আর কোন দিন চোখ মেলে তিনি তাকাবেন না। ইতিমধ্যে কখন সকলের অজ্ঞাতে একান্ত নিঃশব্দেই তিনি বিদায় নিয়েছেন—তাঁর দীর্ঘদিনের এই বাসাটা থেকে!

॥ ২২ ॥

পূর্ণবাবুর মৃত্যুতে বিমলের মনের মধ্যে যেন মস্তবড় একটা ওলট-পালট হয়ে গেল। প্রচণ্ড একটা ঝড় বয়ে গেল যেন তার ওপর দিয়ে। পূর্ণবাবুকে সে শ্রদ্ধা করত, ভালও বাসত—এটা ঠিক। কিন্তু মধ্যে বহুকাল তাঁর সঙ্গে দেখা-শুনো ছিল না; তাছাড়া নিজের জীবনসংগ্রামে বড় বেশী ব্যস্ত ছিল সে—সে সংগ্রামের ধুলি আর ধুমে পূর্ণমাষ্টারমশাই কোন আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। তাঁর সেই সংবর্ধনা সভার সেই ছ পয়েণ্ট না আট পয়েণ্ট টাইপের তিন লাইন বিজ্ঞাপন চোখে না পড়লে জীবনে কোন দিন এমন ক'রে তাঁকে মনে পড়ত কিনা সন্দেহ। আর হয়ত দেখাও হ'ত না, তাঁর মৃত্যুতে এতখানি শূন্যতা, এতখানি অভাব বোধও হ'ত না। কিন্তু এই গত বছর-দুই কাল এমন ভাবেই আবার তিনি মনের এমন একটি ঘনিষ্ঠতম গণ্ডীর ভেতর এসে পড়েছিলেন যে আর কিছুতেই যেন তাঁকে ভোলা—এমন কি একটু আড়ালে সরিয়ে দেওয়াও সম্ভব নয়।

প্রথম দুটো দিন সে অফিসেই যেতে পারে নি। ঘরে ত থাকতে পারেই নি। সকালে গিয়ে একবার ক'রে প্রিয়ম্বদার সংবাদ নিত—বাকী সময়টা একা গঙ্গার ধারে ধারে ঘুরে বেড়াত। কিন্তু তৃতীয় দিনে এই নৈষ্কর্ম আরও অসহ্য বোধ হওয়াতে সে অফিসেই এসে হাজির হ'ল।

ওকে দেখে পরিচিত সবাই অবাক হয়ে গেলেন। কারণ ঝড়টা শুধু অন্তরকেই বিপর্যস্ত ক'রে যায় নি, দেহেও ছাপ রেখে গেছে। শুকনো মুখ, রুক্ষ শীর্ণ চেহারা এবং চোখের কোলে কালি—সবই একটা বিপর্যয়ের চিহ্ন বহন করছে। প্রথম দিন সে জুতোও পায়ে দেয় নি, খালি পায়েই ঘুরেছিল কিন্তু পরে ব্যাপারটা নিজের কাছেই বড় বেশী নাটকীয় মনে হ'ল। পূর্ণবাবুর সঙ্গে তার যা সম্পর্ক তা বাইরের কোন দেখানো-সম্মানের অপেক্ষা রাখে না। তবু, যথারীতি জুতো-জামা গায়ে থাকা সত্ত্বেও তাকে দেখেই মনে হ'ল যেন সে একটা অশৌচ বহন করছে।

সবাই অবিরাম প্রশ্ন-বাণে তাকে বিব্রত ক'রে তুললেন।

'ব্যাপার কি বিমলবাবু? কেউ মারা গেছেন না কি? কে মরেছেন—আত্মীয় কেউ?'

'এ কী চেহারা হয়েছে হে বিমল? খবর কি? বাড়ীতে কিছু বিপদ-আপদ?

'তোমার অসুখ করেছিল না কি বিমল ভাই? ইস্—এ কী অবস্থা করেছ শরীরের?' ইত্যাদি ইত্যাদি—

কতকটা এই ভয়েই দু'দিন অফিসে আসে নি সে। কাউকে কাউকে

যথাসাধ্য সংক্ষিপ্ত উত্তর দিয়ে, কাউকে বা একেবারেই এড়িয়ে কোনমতে নিজের সীটে গিয়ে বসে পড়ল। আরও দিন আষ্টেক পরে আসা হয়ত ওর উচিত ছিল, নিজের মানসিক এবং দৈহিক অবস্থাটা খানিকটা প্রকৃতিস্থ হ'লে। নেহাৎ বাড়ীতে থাকাও অসম্ভব বলেই—। বাবা ত স্পষ্টই বলেন 'আদিখ্যেতা! কবেকার বুড়ো মাষ্টারের জন্যে এত হা-হুতাশ করার কী আছে! মা বাপ প্রত্যক্ষ গুরুজন, তাদের ত গ্রাহ্যেই আনেন না বাবু! ইস্কুলের মাষ্টার হ'ল ওঁর বেশী আপন!' মা মুখে কিছু বলেন না বটে তবে তাঁর মনোভাবও অনেকটা এই রকম তা সে জানে। আর সে জন্যে খুব বেশী দোষ দেওয়াও যায় না তাঁদের—

ওর সব চেয়ে ভয় ছিল ওর সীটের সামনের টেবিলেই যে দুজন বসে—রেখা আর পূর্ণিমা—তাদের আত্মীয়তার আক্রমণকে। কিন্তু দেখা গেল যে অপ্রত্যাশিত ভাবেই সেদিক দিয়ে একটি প্রশ্নও এল না। পূর্ণিমা সে সব কথা উত্থাপনই করল না—বরং যেন নিরবচ্ছিন্নভাবেই ওদের প্রত্যহ দেখা হচ্ছে, এই ভাবে অফিসের প্রসঙ্গই দু' একটি তুলল। বরং আসা-মাত্র রেখাই কী একটা প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, বিমল লক্ষ্য করল, পূর্ণিমা চোখ টিপে নিষেধ করল তাকে।

পূর্ণিমার এই বিবেচনায় বিমল কৃতজ্ঞ বোধ না ক'রে পারল না। মনে মনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল সে। বাস্তবিক এতটা সহজবুদ্ধি এবং বিবেচনা পূর্ণিমার কাছ থেকে কখনও আশা করে নি। খুব কাছে যে থাকে তাকেও মানুষ কত পরে চিনতে পারে! হয়ত শেষ অবধি সম্পূর্ণ চেনা হয়ে ওঠে না—কত মহৎ পরিচয় প্রত্যহের মালিন্যে ঢাকা পড়ে থাকে চিরকাল! বিমল যেন নতুন করে এই সত্যটা সম্বন্ধে অবহিত হ'ল।

সেদিন অফিসের কাজ বিশেষ কিছু হবে—এ বিশ্বাসে অফিসে আসে নি সে, কিন্তু পূর্ণিমাই সুকৌশলে তাকে দিয়ে খানিক খানিক কাজ করিয়ে নিলে,—'এইটে যদি আপনি একটু দেখে দ্যান।...এই ফাইলটা তিনদিন ধরে আটকে আছে, আর দেরী করা ঠিক নয়।...আমিই সেরে নিতুম কিন্তু কতকগুলো পয়েন্ট আমি ঠিক ধরতে পাচ্ছি না।...আচ্ছা এই চিঠিটার কী জবাব দেব বলুন ত— ?'—এই ভাবেই। একটু একটু ক'রে কাজের মধ্যে এসে পড়ে বিমলেরও ভাল লাগল। সে খানিক পরে বেশ সহজভাবেই কাজ-কর্ম ক'রে যেতে লাগল।

ছুটির পর সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে পূর্ণিমা বললে, 'আমার একদিন খাওয়ানো পাওনা ছিল—মনে আছে আপনার? আজ সেইটে ক্লেম করছি! আজ আপনি আমার অতিথি।'

চা খাওয়া! আজ!

থমকে দাঁড়াল একটু বিমল। আজ এখন কোলাহলের মধ্যে গিয়ে বসে বসে কতকগুলো খাবার গেলবার মত মনের অবস্থা নয়। সে বরং আর এক-দিন হবে, আজ নয়।

কিন্তু এখন কীই বা করবে সে ? বাড়ী ফেরা অসম্ভব। সত্যশরণ বাবুর কাছে আগেই চিঠি লিখে তিনদিনের ছুটি নিয়েছে সে—অবশ্য তৎসত্ত্বেও যাওয়া যেতে পারত, তবে সেখানেও ত সেই নানা প্রশ্ন, নানা কৈফিয়ৎ। এক সেই একা একা উদ্দেশ্যহীন কর্মহীন ভাবে পথে পথে ঘুরে বেড়ানো। কিন্তু একা থাকতেও আর ইচ্ছা করছে না। বরং পূর্ণিমার সাহচর্য ঢের ভাল। ওর আচরণে একটি সংবেদনশীল অন্তরের পরিচয় পাওয়া গেছে আজ, আর যাই হোক তা লোকদেখানো সহানুভূতির মত পীড়া দেবে না।

সে মন স্থির ক'রেই ফেলে।

'চলুন, কোথায় যাবেন। আমি প্রস্তুত।'

পূর্ণিমা খুশী হয়ে ওঠে। উৎসাহের আধিক্যে সে রীতিমত তরতরিয়ে নেমে যায় সিঁড়ি দিয়ে, পথে নেমেও জোরে জোরে হাঁটতে থাকে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে পার্কস্ট্রীটের যে রেস্তোরাঁটিতে এনে হাজির করে, তার ব্যয়বহুলতার খ্যাতি এমন কি বিমলেরও অজানা নয়। সে বিব্রত এবং উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, 'কিন্তু এ কোথায় আনলেন মিস রায়, এদের যে বড্ড দাম। এ রীতিমত বড়লোকের জায়গা শুনেছি !'

'কত সাধ্য-সাধনায় আপনাকে অতিথি পেয়েছি, সাধারণ কোন রেস্তোরাঁয় নিয়ে যেতে ইচ্ছে করল না। আপনি একবার দয়া ক'রে রাজী হয়েছেন, আবার কবে এ সৌভাগ্য হবে তার ত ঠিক নেই !'

'তাই বলে অকারণ এত খরচা করবেন ? আর কোন ভদ্র জায়গা কি খোঁজ করলে মিলত না ?···আপনার বাজেটে ত বেশ বড় রকমের ঘাটতি পড়বে। চালাবেন কি ক'রে ?'

ওর আপত্তিতে আমল না নিয়ে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে পূর্ণিমা বললে, 'নতুন টিউশনী পেয়েছি একটা, ক্লাস সিক্স্-এর একটি মেয়ে বাড়ীতে এসে পড়ে যায়। পনেরো টাকা দিয়েছে কালই। সেটা যে টাকার টিউশনী, এখনও বাড়ীতে জানাই নি।···কাজ কর্মের ফাঁকে ফাঁকে পড়াই—বেগার, তাই সকলে ভেবেছেন। আমি অবশ্য তিল তিল করে এই বিশেষ দিনটির জন্যে কিছু জমিয়ে রেখেছিলাম, টিউশনীর টাকা থেকেও কয়েকটা নিয়েছি—আমার অবস্থা এখন রীতিমত স্বচ্ছল।' বলতে বলতে অকারণেই রাঙা হয়ে উঠল পূর্ণিমার মুখ।

তারপর বললে, 'আর কোথাও নিরিবিলি বসা যায় না। আপনার যা মনের অবস্থা, বেশী হট্টগোল আপনার ভাল লাগত না।'

তা ঠিক। বিমল আবারও মনে মনে কৃতজ্ঞ বোধ করে পূর্ণিমার কাছে। এই প্রথম পূর্ণিমার কথার মধ্যে আভাস পাওয়া গেল যে বিমলের মানসিক অবস্থার খবর সে জানে। ওর মনে যে এত সূক্ষ্ম বিবেচনাবোধ আছে তা কখনও কল্পনা করে নি সে।

দুজনে একটা কোণে নিরিবিলি বসে।

'কী খাবেন' অনাবশ্যক বোধে এ প্রশ্নও করে না পূর্ণিমা। 'বয়'কে ডেকে

দু-একটা সাধারণ খাবারের ফরমাস করে। অর্থাৎ দামী কোন খাবার বললে বিমল প্রতিবাদ করবে—ততটুকু ব্যস্ত করতেও চায় না সে ওকে।

বিমল ক্লান্ত ভাবে তার চেয়ারটায় যেন এলিয়ে পড়েছিল। সেদিকে চেয়ে চকিতের মধ্যে পূর্ণিমার চোখ ছলছলিয়ে এল কিন্তু সে প্রাণপণে উদ্গত অশ্রু দমন ক'রে বললে, 'আচ্ছা, একটা কথা বলব ? অনুরোধের সাহস নেই—কিন্তু বিবেচনা ক'রে দেখবেন ?'

'কী বলুন ত ?' বিমল অবাক হয়ে তাকায়।

'আচ্ছা, নাম ধরে ডাকলেই কি খুব একটা ঘনিষ্ঠতা হয় ? মানে অপ্রীতিকর কোন ঘনিষ্ঠতা ?···ছোট বোনদেরও ত নাম ধরে ডাকে মানুষ।···আপনি ঐ মিস্ রায় বলাটা বন্ধ করবেন ? আমার কানে যেন ওটা আঘাত করে। নাম ধরেই না হয় আপনি আজ্ঞে করবেন !'

যেন মরীয়া হয়েই বলে ফেলে সে—চরম সাহসে ভর ক'রে। সঙ্গে সঙ্গেই অপমানের আশঙ্কায় তার কানের ডগা থেকে ঘাড় পর্যন্ত অরুণবর্ণ হয়ে ওঠে।

কিন্তু আজ আর কোন রূঢ় কথা বিমলের মুখ দিয়ে বেরুল না, বরং একটা ম্লান অথচ সস্নেহ হাসিই দেখা দিল। সে কোমলকণ্ঠে উত্তর দিল, 'কেন, তুমি বলতে দোষ কি ?'

'সে সৌভাগ্য আমি কল্পনা করতেও সাহস পাই না যে।' পূর্ণিমার গলাটা কেঁপে যায় অনিচ্ছাতেও।

'আচ্ছা, আচ্ছা, সে হবে। হঠাৎ হয় ত একদিনেই হয়ে উঠবে না। এত-দিনের অভ্যাস বদলাতে সময় লাগবে ত—'

'দেখুন যেদিনই আরম্ভ করবেন সেদিনই বাধো-বাধো ঠেকবে। যা করবার এখনই করে ফেলা ভাল। প্লীজ। প্রসন্ন হয়েছেন ত আর মত ফিরিয়ে নেবেন না !'

কতকটা অনুনয়ের ভঙ্গীতেই হাত দুটো যেন টেবিলের ওপর জড়ো করে পূর্ণিমা। সেই সময় তার মুখের ভাবে যে এক রকমের সশঙ্ক আশা প্রকাশ পায়, সমস্ত দেহের ভঙ্গীতে যে দৈন্য ও অনুনয় ফুটে ওঠে—তা দেখে আবারও আজ বিমলের মনে ক্ষণকালের জন্য মোহের সঞ্চার হয়। সে টেবিলের ওপার থেকে হাত বাড়িয়ে ওর হাত-দুটোর ওপর সস্নেহে গোটা-দুই চাপড় মেরে বলে, 'হবে বলছি ত। অপ্রয়োজনে শুধু শুধু ডাকি কি করে !'

আনন্দে পূর্ণিমা যেন ঝলমলিয়ে উঠল। কিন্তু সে অল্পক্ষণের জন্যই, পরমুহূর্তেই মুখটা ম্লান করে বললে, 'এ সময়ে এ সব কথা তোলা হয়ত আমার পক্ষে উচিত হয় নি। মাপ করবেন।'

বিমলের মুখ থেকে সে ম্লান হাসিটুকুও মিলিয়ে গেল। কিন্তু পূর্ণিমার হাতের ওপর থেকে হাত সরাল না, বরং ঈষৎ একটু মুঠি-করার ভঙ্গীতেই ধরে রইল।

পূর্ণিমা একটু পরে আবার আস্তে আস্তে বললে, 'মাষ্টার মশাইকে আপনি

বড্ড ভালবাসতেন, না? সাধারণত আজকাল এরকম গুরু-শিষ্যের সম্পর্ক দেখাই যায় না।···আপনার এতখানি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা যিনি পেয়েছিলেন তিনি না জানি কী আশ্চর্য মানুষ ছিলেন!···'

এর উত্তরে কথা বলতে গিয়ে বিমল সামলে নিলে নিজেকে। অভ্যস্ত 'আপনি' শব্দই মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসছিল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সহজ ক'রে নিয়ে বললে, 'কিন্তু মাষ্টার মশাইয়ের মৃত্যুর খবর তুমি শুনলে কী করে?'

একটা অবর্ণনীয় আনন্দে পূর্ণিমার সমস্ত দেহটা শিউরে রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। এ তার জীবনে অভাবনীয় এক বিজয়গর্ব। কিন্তু সে সহজভাবেই উত্তর দিল, 'আমাদের অফিসের বাদল বলছিল। ও যেন কার কাছ থেকে শুনেছে। আপনি দু'দিন অফিসে না আসাতে আমি—আমরা সকলেই একটু উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলুম। বলাবলি করছি শুনতে পেয়ে বাদল বললে, কে এক ওর ছেলেবেলার মাষ্টার বুঝি মারা গেছে—সেই শোকে ও একেবারে নাকি মুষড়ে পড়েছে।···বাদলের যা অভিজ্ঞতা, নিজের চোখ দিয়েই দুনিয়ার সব কিছু দেখতে অভ্যস্ত ওরা—খবরটা দিয়ে অনায়াসে বলে বসল, ছোকরার সব তাইতেই যেন বাড়াবাড়ি।'

ইতিমধ্যে 'বয়' চা ও খাবার সাজিয়ে দিয়ে গেল। প্লেটে খান-দুই প্যাস্ট্রি তুলে ওর দিকে এগিয়ে দিতে দিতে পূর্ণিমা বললে, 'আপনার বোধ হয় এ ক-দিন খাওয়াও হয় নি।'

'না না খেয়েছি বৈকি। আমাকে ভুল বুঝো না তোমরা। ঠিক সবটাই হয়ত আমার শোক নয়।···একটা ঝড় বয়ে গেছে আমার মনের ওপর দিয়ে ঠিকই—কিন্তু সেটা শুধু এই মৃত্যুই নয়।···এতদিনের অভিজ্ঞতায় যে মতটাকে সত্য বলে ভেবে আঁকড়ে ধরে ছিলুম হঠাৎ একদিন, মাত্র কুড়ি বাইশ দিন আগে মাষ্টার মশাই এসে সব উলটে দিয়ে গেলেন। তিনি সাধারণ মানুষ নন, আমার কাছে নন অন্তত—তিনি দীর্ঘ দিন ধরে ভেবে যা সত্য বলে স্থির করেছেন তাই আমাকে বলেছেন! এসব ব্যাপারে কিছুই সামান্য ছিল না তাঁর কাছে, তা আমি জানি—। কাজেই তাঁর সেই কথাগুলোই যথেষ্ট বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে আমার মনে। নতুন ক'রে সব কিছুর মূল্য-মান নির্ণয় করা, জীবনের পরিচিত মূল্যবোধের ধারণা পালটে ফেলা তো সহজ কথা নয়! তার জন্যও প্রস্তুত হচ্ছিলাম—কিন্তু মৃত্যু-শয্যায় শুয়ে আবার সব উলটে দিয়ে গেলেন মাষ্টার মশাই, আমার উপরই বিবেচনার ভার দিয়ে গেলেন!···এ যে আমার কাছে কতখানি গুরুতর ব্যাপার, তা কেউ বুঝবে না পূর্ণিমা!'

আবার একটা প্রচণ্ড খুশির ঢেউ বয়ে গেল পূর্ণিমার ওপর দিয়ে, একটা অসহ পুলকের আঘাতে হৃদয়ের সব ক-টা তন্ত্রী রিনরিন করে উঠল কিন্তু সে প্রাণপণ চেষ্টায় স্থির হয়েই বসে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বললে, 'আপনি খাবার কিছু মুখে তুলুন, চা একেবারে জুড়িয়ে যাবে নইলে—'

'হ্যাঁ—এই যে!' তাড়াতাড়ি চামচে দিয়ে খানিকটা ওমলেট তুলে মুখে

দেয় বিমল। পূর্ণিমাও একটুখানি প্যাস্ট্রি ভেঙ্গে মুখে দিয়ে বললে, 'দেখুন অনেকদিন আমার একটা কথা মনে হয়েছে আপনার সম্বন্ধে—সাহস ক'রে বলতে পারি নি। বলব ?'

'বলো না—' কৌতূহলী হয়ে ওঠে বিমল।

'আমার কেমন মনে হয়, চাকরী করাটা আপনার একেবারেই বেমানান।··· আপনার উচিত ছিল মাষ্টারী করতে যাওয়া। আপনার মত চিন্তাশীল এবং সিরিয়াস টাইপের লোক শিক্ষকতা করতে গেলে সত্যি-সত্যিই দেশের ছেলে-মেয়েগুলো মানুষ হত!'

বিমল যেন অকস্মাৎ ছেলেমানুষের মত হয়ে ওঠে; সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলে, 'তুমি সত্যি বলছ! মাষ্টারী করতে গেলে ভাল হ'ত ? তাই যাবো ?··· এখনও ত সময় আছে!'

পূর্ণিমার মুখ নিমেষে ম্লান হয়ে ওঠে, 'ওমা। তাই ব'লে এখন যেন যাবেন না। দোহাই আপনার।'

'কেন ?'

'তাহলে আপনার সঙ্গে আর দেখাটুকুও যে হবে না। ঐ অফিসে আমি একা—আপনি নেই, সে আমি ভাবতেও পারি না।'

'ও, এই কথা!' বিমল হেসে ফেলে, 'আমি বলি না জানি কি।···তুমিই কি চিরকাল এই অফিসে চাকরী করবে! বিয়ে-থা ক'রে কোথায় চলে যাবে—আমরা আর পাত্তাই পাব না।'

জোর ক'রে যেন হালকা হয় সে!

কিন্তু পূর্ণিমার মুখখানা যেন নিমেষে বিবর্ণ, রক্তহীন হয়ে যায় কথাগুলো শোনার সঙ্গে সঙ্গেই। সে অন্যমনস্ক ভাবে ওমলেটের ওপর ছুরি চালিয়ে সেটাকে অকারণেই টুকরো টুকরো করে—কোন কথা বলে না।

অত্যন্ত কোন ব্যথার স্থানে ঘা দিয়েছে বুঝতে পেরে বিমল অনুতপ্ত হয়ে ওঠে।

রেস্তোরাঁ থেকে বেরিয়ে সাড়ে-সাতটা নাগাদ পূর্ণিমাকে যখন তার বাড়ীর বাস্-এ তুলে দিল বিমল, তখন কে জানে কেন, নিজেকে অনেকটা প্রকৃতিস্থ বোধ হ'ল ওর। কিন্তু তবু তখনই বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না। সংকীর্ণ দুটি ঘরে অতগুলি প্রাণী। ভাই-বোনেরা আজকাল সকলেই অল্পবিস্তর পড়ায় মন দিলেও—সে যেন বড় বেশী জনতা, বড় বেশী কোলাহল। তার চেয়ে এমনি উদ্দেশ্যহীন, কর্মহীন ভাবে খানিকটা পথে-পথে ঘুরে বেড়ানো ঢের ভাল।···

সে পায়ে পায়ে দক্ষিণ দিকে অর্থাৎ তার বাড়ীর উল্‌টো দিকেই এগিয়ে চলল।

কিন্তু খানিকটা চলার পরই দেখা হয়ে গেল—প্রায় ধাক্কা লেগে গেল—ওর বন্ধু কুমুদীশের সঙ্গে।

'আরে, এই যে বিমল! ভালই হয়েছে, তোর বরাত ভাল! আয় আমার সঙ্গে—'

সে একরকম ওকে টানতে টানতেই নিয়ে চলল আবার পার্ক স্ট্রীটের দিকে।

'আরে থাম্, থাম্—ব্যাপার কি? চললি কোথায়?' বিস্মিত বিমল প্রশ্ন করবার চেষ্টা করে।

'এই যে পার্ক স্ট্রীটের মোড়ে। একটা ট্যাক্সি নিতে হবে। নইলে সাড়ে আটটার মধ্যে বালিগঞ্জে পৌঁছানো যাবে না। সেই তে-কোণা পার্কের কাছে জায়গাটা। একটু আগেই যাওয়া ভাল।'

'তুই যা ভাই। আমার আজ আর ভাল লাগছে না।'

'আগেই ভাল লাগছে না? কোথায় যাচ্ছি বল্ দিকি?'

'কী জানি, কোন মিটিং হবে আর কি। কিংবা জলসা।'

'না হে বাপু, না। তুই বুঝি আজকাল খবরের কাগজও পড়িস না? খাস একজন ইংরেজ কবি ভারতে এসেছেন—সে খবরটা রাখো? জলজ্যান্ত living কবি। ইংরেজীতে কবিতা লিখে যিনি জীবিকা চালান! তাঁকে আমরা কজন মীট্ করব আজ এক জায়গায়। চল্—দেখে আসবি। মন খারাপ থাকে—মন ভাল হয়ে যাবে, চল্।'

বিমল আর বাধা দিলে না। শিক্ষা ও সাহিত্যের ব্যাপারে আজও তার যথেষ্ট অনুরাগ আছে। মন যদি ভাল হয় ত—বরং এইতেই হবে।

ট্যাক্সিতে উঠে কুমুদীশ ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললে, ভদ্রলোক এসে অবধি সভা-সমিতি যথেষ্ট করেছেন। এখন তিনি চান এদেশের ক'জন সাহিত্যিককে মীট্ করতে। সাহিত্য-পরিষদেও গিয়েছিলেন কিন্তু সে ফর্ম্যাল সভা, উনি চান নিভৃত 'ত্যেতাত্যেৎ' গোছের কিছু। সেই জন্যেই বালিগঞ্জে এক ভদ্র-লোকের বাড়ীতে একটু বসবার আয়োজন করা হয়েছে।

'বড় জোর শ'খানেক লোক হবে। আমাদের এক অধ্যাপক বন্ধু উদ্যোক্তা-দের মধ্যে আছেন, তাই আমি খবর পেয়েছি।'

বিমল একটু সংকোচের সঙ্গে বললে, 'তা এত প্রাইভেট ব্যাপারে অনিমন্ত্রিত আমার যাওয়া কি ঠিক হবে?'

'ওহে সদ্বিবেচক মশাই, নাহ'লে আমি নিয়ে যাবো কেন? ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি ঠিক করা হয়েছে যে সাহিত্যিকদের বেশীর ভাগকেই কোন খবর দেওয়া যায় নি। যার সঙ্গে যার অর্থাৎ ইণ্টারেস্টেড্ কোন লোকের দেখা হবে, সেই তাকে ধরে নিয়ে যাবে, এছাড়া ত কোন উপায় নেই! কিছুই যদি লোক না থাকে ত তিনিই বা কি ভাববেন!'

বিমল আর কিছু বললে না।

ক-দিন সে খবরের কাগজ পড়ে নি সত্যিই। পৃথিবীর কোন খবরই সে রাখে না। কেন যে তার এত দুশ্চিন্তা, মনের মধ্যে এ অস্থিরতা তাও ত বোঝে না। জগতের সকলের ভার কিছু ভগবান তার ওপর দিয়ে এখানে পাঠান নি। যে ক-জনের সম্বন্ধে তার প্রাথমিক দায়িত্ব—তাদের ভারই কি সে সুষ্ঠুভাবে বইতে পারছে? মিছিমিছি তার এত আকুলতা এবং ব্যাকুলতা

সত্যিই হাস্যকর।…

বালিগঞ্জে যেখানে কবির সংবর্ধনার আয়োজন হয়েছিল, সেটা নিতান্তই মাঝারি গোছের বাড়ি। বাড়ির পেছনে সামান্য একটু 'লন'—যে-কোনদিকে তাকালেই রং-করা বড় বড় নর্দমার নল চোখে পড়ে, কারণ সব বাড়িরই পিছন দিক এটা—এমন কি এই বাড়িরও। হয়ত ওদের দেশেও সহরে এমনি ব্যবস্থা ছাড়া উপায় থাকে না—কিন্তু বিমলের একটু লজ্জাই করতে লাগল। লনের মধ্যে শ' দেড়েক ভাঁজ-করা চেয়ার পাতা কিন্তু লোক এসেছে এখনও অবধি জনা-কুড়ি। চায়ের ব্যবস্থাও করা হয়েছে ছোট রকম।

এই কবির নাম বিমল জানে, ওঁর দু-একটি কবিতা পড়ারও সুযোগ হয়েছে তার। এমন খুব বড় দরের কবি নন, ওদেশ বলেই কবিতা লিখে খেতে পাচ্ছেন, এখানে হ'লে খবরের কাগজের অফিসে চাকরি খুঁজতে হ'ত। ভদ্রলোক আগে ঘোর কম্যুনিস্ট ছিলেন—এখন নাকি একেবারে উলটো। বর্তমানে পৃথিবী ভ্রমণে বেরিয়েছেন—কী উদ্দেশ্য কে জানে। কিংবা শুধু ভ্রমণই উদ্দেশ্য।

ঠিক সময়েরও দশ মিনিট পরে কবি এলেন। সন্ধ্যায় একটা প্রেস কনফারেন্স ছিল, সেরে আসতে দেরি হয়ে গেছে। সেজন্য আগেই সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। হাত জোড় করতে শিখেছেন ইতিমধ্যেই, নমস্তে শব্দটাও আয়ত্ত ক'রে নিয়েছেন।

দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ। সৌম্য মুখকান্তি। ভালই লাগল বিমলের। চা-পান শেষ হ'লে তিনি কিছু বলবেন, নিজের কবিতা থেকেও আবৃত্তি করবেন শোনা গেল। বিমল একটু সামনের দিকে এগিয়ে এসে বসল।

এখানকার দু-একটি বাঙ্গালী কবি কবিতা পাঠ করলেন। একজন নিজেরই তর্জমা করা পঙ্গু ইংরেজী অনুবাদও শোনালেন। তারপর কবি স্বয়ং উঠলেন। অনেক কথা বললেন তিনি। কথায় কথায় গান্ধীবাদের প্রসঙ্গ উঠল। তিনি বললেন, 'গান্ধীবাদ সম্বন্ধে অনেক কথাই শোনা ছিল, নিন্দা প্রশংসা দুই-ই। এখানে এসে ওঁর কতকগুলি বই উপহার পেয়ে পড়ে দেখেছি। ওঁর লেখা পড়তে পড়তে আমার আদিম ক্রীশ্চানিটী বা খ্রীষ্টধর্মের কথা মনে পড়ে যায়। তেমনি সহজ সরল, তেমনি স্বীয় বিশ্বাসে অটল। অনেকে দোষ দেন যে বড় বেশী উনি ঈশ্বর ঈশ্বর করেছেন—কিন্তু তাতে দোষ কি? What's wrong with God? প্রথম যুগে সরল, প্রায়-মূর্খ যে সব বিশ্বাসী খ্রীষ্টানের কথা পড়ি তাঁদের দ্বারা মানুষের বহু উপকার হয়েছে—এখনকার সংশয়বাদী পণ্ডিতরা তার শতাংশও কাজে লাগছেন না মানুষের!'

আরও অনেক কথা বললেন কবি। যা বললেন তার সারাংশ এই: যা কিছু একালের তা যেমন খারাপ হ'তে পারে না, তেমনি তার সবটাই ভাল, তা-ও মনে করার কোন কারণ নেই। আমরা হয়ত একদিকে এগিয়ে যাচ্ছি, তেমনি আর একদিকে পিছিয়ে পড়ছি। গান্ধীজি যদি ইনড্রাস্ট্রিয়ালিজেশনকে সমর্থন না ক'রে থাকেন ত বিস্মিত হবার কিছুই নেই। যন্ত্রবিস্তারই মানব-

সভ্যতার স্বাভাবিক প্রগতি তা কে বললে? বিলাত শেক্‌স্‌পীয়ার, শেলী, কীট্‌স্‌, ওআর্ডসওয়ার্থের দেশ—কিন্তু সেখানে কাব্য আজ মাত্র জনাকতকের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে; কাব্যের পাঠক নেই। এ হ'ল ইন্‌ডাস্ট্রিয়ালিজেশনের প্রত্যক্ষ ফল। আমরা হয়ত যন্ত্রশিল্পে এগোচ্ছি—তেমনি কারুশিল্পে পিছিয়ে যাচ্ছি। কেউ কেউ তাঁকে উপদেশ দেয়, তোমরা 'পিপ্‌ল্‌'-এর জন্য লেখ না কেন? গণসাহিত্য রচনা কর, পাঠক পাবে। কিন্তু তাঁদের উপদেশমত লিখলে—কবির মতে—একজন পাঠকও পাওয়া যাবে না। যাদের 'পীপ্‌ল্‌' বলা হয়,—তিনি ইংলণ্ডের কথা অন্তত জানেন—তাদের কাছে আজও শেলীর কবিতাই সবচেয়ে প্রিয়। কিন্তু শেলী পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 'পিপ্‌ল্‌'-এর একজন ছিলেন না।

আরও অনেক কথাই বললেন তিনি। সব কথা বিমল শোনেওনি ভাল ক'রে। সে ভাবছিল পূর্ণমাষ্টার মশাইয়ের কথা। তিনিও ইনডাস্ট্রিয়ালিজেশন সম্বন্ধে এই আশঙ্কাই প্রকাশ ক'রে গেছেন। গান্ধীবাদ সম্বন্ধেও, সেই অজ্ঞাত ও অবজ্ঞাত অর্ধাশনী সামান্য ইস্কুলমাষ্টার যা বলে গেছেন এতবড় পণ্ডিত ইংরেজ কবি—রাজনীতি যার কারুর চেয়েই কম জানা নেই—তাঁর মতের সঙ্গে আশ্চর্য রকম ভাবে মিলে যায় না কি?

তবে কি সেই বৃদ্ধের কথাই ঠিক!…

'কী ভাবছিস্‌? তন্ময় হয়ে?' কনুয়ের গুঁতো মেরে কুমুদীশ বলে ফিস্‌ ফিস্‌ ক'রে, 'লোকটা ধরেছে কিন্তু ঠিক। এদেশেও একদল লোক গণসাহিত্য গণ-সাহিত্য বলে চেঁচায়। তাদের কান ধরে এনে শোনাতে ইচ্ছে করে। এই নিয়ে আমার বন্ধুদের সঙ্গে প্রায়ই তর্ক হয়। আমি ত তা-ই বলি। রামায়ণ মহাভারতের চেয়ে গণসাহিত্য আমাদের দেশে তৈরী হওয়া সম্ভব নয়। যেমন ওদেশে বাইবেল…যে গরীব, যে শ্রমজীবী, যে দারিদ্র্যে দুঃখে নিষ্পেষিত সে রাজা রাজকন্যার কাহিনী শুনতে চাইবে—এইটেই ত স্বাভাবিক। চাষী-মজুরদের কথা মজুরদের কি চাষীদের কাছে ভাল লাগবার কথা নয়। তথাকথিত গণসাহিত্য পড়ে বাহবা দিই আমরা—মধ্যবিত্ত ও ধনী পাঠকরা। আমাদের কাছে ওটা বিস্ময়। সমাজের যারা অবহেলিত বলে পরিচিত, ব্যাকওয়ার্ড মাস, তাদের নিয়ে গল্প লিখলে সবচেয়ে বেশী বাহবা পাওয়া যায়—কিন্তু তারা সে বাহবা দেয়, না তারা সে-বই পড়ে? তাদের কাছে ঐ রাজারাজড়া বা দেব-দেবীর কাহিনীই সব চেয়ে ভাল লাগার কথা!'

কুমুদীশের বক্তৃতা দীর্ঘ হয়ে যেত হয়ত—কে একজন ওদিক থেকে চাপা ধমক দিলেন। কারণ কবি তখন স্বরচিত কবিতা শোনাতে শুরু করেছেন।

কিছুক্ষণ পরেই বৈঠক শেষ হ'ল। কুমুদীশ এগিয়ে গেল কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত কিছু আলোচনার সুবিধা পাওয়া যায় কিনা দেখতে। বিমল সেই ফাঁকে বেরিয়ে পড়ল সেখান থেকে। সে চায় কিছুক্ষণ নির্জনে কথাগুলো ভেবে দেখতে। লোকজনের ভীড় বা উত্তেজিত আলোচনা, কোনটাই তার সহ্য হবে না।

রাত প্রায় দশটা বাজে। ট্রাম বাস প্রচুর। একটু ইতস্তত করলে সে। পথ দীর্ঘ, বেশী রাত হ'লে বাড়ীর সবাই ভাববে। কিন্তু দু'একখানা বাস্-এর অবস্থা দেখে তার আর উঠতে ইচ্ছা হ'ল না। এখনও সমান ভীড়। কোন ভীড়ই ভাল লাগছে না।···সে সোজা হাঁটতেই শুরু করলে।

তাহ'লে সেদিন সেই মাঠের মধ্যে বসে পূর্ণ মাষ্টারমশাই যে কথাগুলো তাকে বলে গেছেন—সেই কথাই ঠিক! গান্ধীজিই ঠিক বুঝেছিলেন? সারা পৃথিবী যে উন্মত্ত আবেগে এগিয়ে যাচ্ছে যান্ত্রিক-শিল্প-প্রসারে—সেটা কি আগাগোড়া একটা বিরাট ভুল হচ্ছে? কাব্য সাহিত্য শিল্প এবং সেই সঙ্গে চিরকালীন মানবের যা সর্ব-প্রধান আশ্রয় ও সান্ত্বনা, সহজ সরল ঈশ্বর-বিশ্বাস সব কিছু ধুয়ে মুছে দেবে এই যন্ত্রদানব—তার জায়গায় ডেকে আনবে স্বার্থ-সংঘাত আর তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি যুদ্ধ ও মারণাস্ত্র! ··

কে জানে!···

'What's wrong with God ?···

এলোমেলো অসম্বন্ধ কথা সব মনে হচ্ছে কেন?

কিসের কথা ভাবছিল সে? পূর্ণবাবুর কথা? দেশ এবং জাতির উন্নতির ফলে যদি পূর্ণবাবুর মত লোক দু'চার-জনও না তৈরী হয়, তাহলে দেশের সেইটেই হবে দুর্ভাগ্য!···

না। এসব কথা ভাববার সময় তার নেই, সে মাথাটা নাড়া দিয়ে যেন নিজেকে চিন্তামুক্ত করতে চায়।···অতবড় চিন্তায় তার কি দরকার। কীই বা করতে পারে সে? কতটুকু পারে? তিনটে বোনের বিয়ে দিতে হবে তাকে। অন্ধ বাবা, রুগ্ন মা। ছোট ভাইটাকে জোর ক'রে লেখাপড়া ছাড়িয়েছে।··· যদি এখনও সম্ভব হয় ত তাকে পড়াবে। তার ঘাড়ে কারখানার কাজ চাপিয়ে দেবার হয়ত সত্যিই কোন অধিকার ছিল না বিমলের। ওর মতই যে অভ্রান্ত, এমন অহঙ্কারের ভূত কেন তার মাথায় চেপেছিল কে জানে!

পথ ক্রমশ জনহীন হয়ে আসছে। ক্বচিৎ দু একটা গাড়ী এবং ট্রাম বাস। ···উত্তর-পশ্চিম দিকে মেঘ জমেছে, মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণে তার ঘনকৃষ্ণ আড়ম্বরটা চোখে পড়ে।·· এখনও দীর্ঘ পথ তাকে চলতে হবে। শেষ অবধি বাস্-এই চাপতে হবে নাকি?

সে আরও জোরে হাঁটতে শুরু করল।

॥ ২৩ ॥

ঝড়টা ওঠবার আগেই বিমল কোনমতে বাড়ি এসে পৌঁছল। একেবারে এড়াতে পারে নি অবশ্য, গলির মোড়ে পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম ঝাপ্টাটা উঠে পড়েছিল, তার ফলে ধুলো আর জঞ্জালে মাথা-মুখ ভরে গেছে। মুখের মধ্যেও ঢুকেছে ধুলো।···শেষ-এটুকু ছুটেই এসেছে তবু। আর এক মিনিট

দেরি হ'লেই জলও এসে পড়ত—চৌকাঠ ডিঙোবার সঙ্গে সঙ্গেই বড়বড় ফোঁটায় বৃষ্টি নামল।

দীর্ঘ পথ জোরে হেঁটে আসতে হয়েছে, তার ওপর শেষটা ত ছোটাই—সদরের ভেতরে পড়ে নিঃশ্বাস নেবার জন্যই থামতে হ'ল তাকে। রীতিমত হাঁপাচ্ছে সে তখন—কোনদিকে তাকিয়ে দেখবার মত অবস্থা তার নয়। প্রথম নিঃশ্বাসটা ফেলে সে সবে পকেট থেকে রুমালটা বার ক'রে কপাল ও ঘাড়ের ঘাম এবং ধুলো মুছতে শুরু করেছে—কে একজন সেই অন্ধকারের মধ্যেই পায়ের ওপর হুমড়ী খেয়ে পড়ে প্রণাম করল এবং ব্যাপারটা কী ঘটে গেল ভাল ক'রে বোঝবার আগেই উঠে ওকে সজোরে জড়িয়ে ধরল।

'দাদা এতক্ষণে ফেরবার সময় হ'ল আপনার! আমি সেই সন্ধ্যে থেকে এখানে বসে আছি খবরটা আপনাকে দেব বলে। এখনও বাড়িতে কাউকে বলি নি। আপনাকেই আগে দেব বলে চেপে রেখেছি!'

অন্ধকারেও না চেনবার কোন কারণ নেই! এমনি ক'রে জড়িয়ে ধরা পুলকের এক বদভ্যাস।

বিমল হেসে বললে, 'ব্যাপার কি রে পুলক, ছাড় ছাড়। প্রাণ গেল যে! একটু দম নিতে দে। অনেকটা ছুটে এসেছি।...এত উচ্ছ্বাস কিসের? মাইনে বেড়েছে?'

পুলক আলিঙ্গনটা একটু শিথিল করলেও একেবারে ছাড়লে না। বললে, 'একটু আধটু নয় দাদা। একেবারে দু'শ' কুড়ি টাকা হয়ে গেল। আমি য়্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যান হয়েছি!'

'সে কি? কবে পরীক্ষা দিলি, আমাকে ত বলিস নি!'

'পরীক্ষা দিতেই হয় নি।...শুনুন না কী ব্যাপার। পরশু শুনলুম আমাদের ফোরম্যান হঠাৎ মারা গিয়েছেন। তিন চার দিন আগেই একটা স্ট্রোক্ হয়েছিল, তাইতেই মারা গেছেন। কাল শুনলুম সে জায়গায়—তাঁর যিনি য়্যাসিস্ট্যান্ট তাঁকেই প্রমোশন দেওয়া হবে, আর য়্যাসিস্ট্যান্টের জন্য বিজ্ঞাপন করা হবে কাগজে। অনেকক্ষণ ভাবলুম কথাটা শুনে। দু'পা এগুই—তিন পা পিছুই। শেষে চরম সাহসে ভর ক'রে ছুটির পর দেখা করলুম ইঞ্জিনিয়ার বড় সাহেবের সঙ্গে। একরকম মরীয়া হয়েই চলে গেলুম, কী আর করবেন, বড় জোর তাড়িয়ে দেবেন, এইত!...তিনি আমার কথা শুনে প্রথমটা বিরক্ত ভাবেই ভুরু কুঁচকে ছিলেন, তারপর কী ভেবে বললেন, "তুমি জানো যে য়্যাসিস্ট্যান্ট ফোরম্যানের কতকগুলো কোয়ালিফিকেশন, খানিকটা লেখাপড়া দরকার। আমরা এসব কাজে পরীক্ষা ক'রে লোক নিই!" আমি বললুম, "জানি স্যার। আমার কলেজের ডিগ্রী সার্টিফিকেট নেই কিন্তু পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছি। আমাকে আপনি দয়া করে প্রশ্ন করুন!" একটা কথা দাদা, আপনার আশীর্বাদে ইংরেজীতেই কথা বলছিলুম। বোধ হয় তাইতেই সাহেব একটু অবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন, একজন মজুরের মুখে ইংরেজী কথা আশা করেন নি।...তিনি তখন দু' একটা এমনি খুচরো প্রশ্ন

করলেন।…বরাতটাই ভাল ছিল, ঠিক ঠিক উত্তর দিয়ে ফেললুম। তখন তিনি আরও কয়েকটা কঠিন প্রশ্ন করলেন। দুটোর উত্তর দিলুম, একটা পারলুম না।…ওঃ, তখন যা মনের অবস্থা দাদা, ঘেমে গিয়েছিলুম, ভয়ে লজ্জায়।… সাহেব কিন্তু রাগ করলেন না, বরং কাছে এসে পিঠে হাত দিয়ে বললেন, "সাবাস্। তোমার লজ্জার কোন কারণ নেই, এ প্রশ্নের উত্তর অনেক পাস-করা ইঞ্জিনিয়ারও দিতে পারত না। তুমি এত লেখাপড়া করলে কোথায়? এসব ত কলেজে পড়তে হয়।…আর তাহ'লে মজুরের কাজই বা করছ কেন?" তখন ভরসা পেয়ে সব খুলে বললুম ওঁকে। উনি শুনে বললেন, "অল রাইট, তুমি এখন বাড়ি যাও। আমি এখনই ম্যানেজিং ডাইরেক্টারের কাছে যাবো, তোমার কেস্ তাঁকে জানাব—তারপর তাঁর ইচ্ছা"।'

এক নিঃশ্বাসে এই দীর্ঘ কাহিনী বলে বোধ করি দম নেবার জন্যেই থামল পুলক।

বিমল বললে, 'তারপর?'

'আমি কোন আশা রাখি নি দাদা। তাই কাউকে বলিও নি, আজ অফিসে গিয়েই শুনলুম ইঞ্জিনিয়ার সাহেব ডেকেছেন। বুক দুর দুর করতে লাগল, ঘেমে নেয়ে উঠলুম। সাহেবের ঘরে যেতেই সাহেব হাসিমুখে উঠে এসে আমার সঙ্গে হ্যাণ্ড শেক্ করলেন, বললেন, "যাও—তোমার চার্জ বুঝে নাও। আশা করি তুমি আরও উন্নতি করবে। তোমার কেস্ শুনে ডিরেক্টাররা সকলেই অবাক হয়ে গেছেন। তাঁরা তোমাকে দেখতে চান। এর পরের মীটিং-এর দিন তোমাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যাবো।"…ব্যস। আজ একেবারে নতুন পোস্টে কাজ ক'রে আসছি।'

পুলকও আবার হেঁট হয়ে ওকে প্রণাম ক'রে বললে, 'এ শুধু আপনার দয়াতেই সম্ভব হ'ল দাদা!'

এবার বিমলই ওকে বুকে চেপে ধরে বললে, 'আমার দয়ায় নয়, তোমার চেষ্টাতেই হয়েছে। এ তোমার পুরুষকার!'

সে ভেতরের দিকে এগোচ্ছিল—পুলক বাধা দিলে। বললে, 'আরও একটা কথা সেরে নিই দাদা।…আমি যে এই অসাধ্য সাধন করলুম, আমাকে কী দেবেন? বকশিশ?'

বিমল হেসে ফেলে বললে, 'বা রে, উলটো চাপ! তুই কোথায় আমাদের খাওয়াবি—না আমি দেব বকশিশ!'

'ছোট কেউ পরীক্ষায় পাস করলে গুরুজনরা তাকে নানারকম উপহার দেন—এ ত বহুকালের রেওয়াজ দাদা!'

'কী উপহার চাস বল।'

'দেবেন—যা চাইব?'

'সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় দেব!'

'প্রতিজ্ঞা করছেন ত?'

'হ্যাঁ রে হ্যাঁ—এখন কী ব্যাপার তাই বল্ তাড়াতাড়ি। রাত হয়ে যাচ্ছে।'

'অমলের এ কাজ একদম ভাল লাগছে না। সে চায় পড়তে, পাস করতে। হয়ত সে সময় এখনও চলে যায় নি। তাকে পড়তে দিন, যতদিন না সে লেখাপড়া শেষ ক'রে রোজগার করতে শেখে—তার ভার আমাকে বইতে দিন দাদা।···দোহাই আপনার, না বলবেন না!'

অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল বিমল। ওরই ছোট ভাই অমল, তার কথাই আজ সে বেশী করে ভাবছিল না?···বাইরে ভীষণ দুর্যোগ চলেছে, প্রকৃতির উন্মত্ত উদ্দাম মাতামাতি। কিন্তু তার চেয়েও তার অন্তরের দুর্যোগ বুঝি বেশী।

খানিক পরে প্রায় ভগ্নকণ্ঠে পুলক বললে, 'এটা কি আমার খুবই ধৃষ্টতা হচ্ছে? এটুকু ভিক্ষে আমাকে দিতে পারেন না?'

আস্তে আস্তে বিমল উত্তর দিলে, 'কিন্তু এটা ত দেওয়া নয় ভাই, এ যে নেওয়া! যত ক'রেই ঘুরিয়ে বল্ না কেন—সত্যি যা তা হচ্ছে এই যে, তুই আমাদের সাহায্য করতে চাস্।'

'আপনিই ঘুরিয়ে ধরেছেন দাদা। এত দুঃসাহস আমার জীবনে হবে না।···আপনি এইটুকু শুধু নিন—আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ থাকব আপনার কাছে!'

একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বিমল বললে, 'পুলক, আমি তোকে সত্যি কথাই বলছি, অমলকে আবার পড়াব—অবশ্য যদি সে রাজী থাকে—আজই একটু আগে মন স্থির করেছি। টাকাকড়ির কথাটা আমি এখনও ভাবি নি।··· আচ্ছা, যদি দরকার হয় তোর কাছ থেকেই নেব!'

॥ ২৪ ॥

পূর্ণিমার সেই দিন থেকে কেমন যেন একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। সে রোজই এসে একবার ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখে বিমলের চেয়ারটার দিকে। রোজই একটা যেন আশঙ্কা থাকে যে হয়ত এর মধ্যেই বিমল অফিস ছেড়ে কোথাও চলে গেছে —গিয়ে দেখবে সে চেয়ার খালি কিংবা অন্য কেউ বসেছে।

বিমল তার সে দৃষ্টির অর্থ বোঝে কিন্তু বিরক্ত হয় না। বরং একটা কৌতুক অনুভব করে। পূর্ণিমা সম্বন্ধে তার মত অনেকটাই বদলে গেছে, আজকাল ওকে দেখলে সে খুশীই হয়, একটা সস্নেহ প্রশ্রয় ফুটে ওঠে তার দৃষ্টিতে।

শুধু তাই নয়, পূর্ণিমারই অনুরোধে এস-এ-এস পরীক্ষাতেও বসতে হয়েছে তাকে। পূর্ণিমাই প্রত্যহ খোঁচাত। বিমলের সাহায্যে অরুণ গত বছর পরীক্ষা দিয়ে পাস করেছে—বিমলের পরীক্ষায় বসতে ভয় কি? এটা দিয়ে ফেলুক সে, যেমন করে হোক—না হয় প্রথম বছর না-ই পারল পাস করতে।

বিমল স্নিগ্ধ সকৌতুকে তার দিকে চেয়ে বলত, 'তুমি আমাকে আষ্টে-পৃষ্ঠে এই অফিসের সঙ্গে বেঁধে ফেলতে চাও, না ? এই পরীক্ষাটায় পাস করলেই কি আমি বাঁধা পড়ব।'

'না, আয় ত বাড়বে কিছু। ভবিষ্যতেও একটা উন্নতির আশা থাকবে—'

'উন্নতির জন্যেই কি আমি আর কোথাও যাবো—এই তোমার বিশ্বাস ?'

'জানি না। আমি আপনার সঙ্গে তর্কে পারব না। আপনি পরীক্ষাটাই দিন না। আপনি পরীক্ষা দিতে পারেন নি, এটা ত কেউ বলবে না!'

'কিন্তু আমার যদি উন্নতি হয়ে যায়—আমি হয়ত অন্য কোথাও চলে যাবো পূর্ণিমা, সে ও ত সেই একই কথা হবে। তোমার পাশের এই সীটটি জুড়ে চিরকাল বসে থাকব, এমনই বা ভাবছ কেন ?'

হেসে বলত বিমল। পূর্ণিমার দু' চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসত, সে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে বলত, 'তা বলে আমি আপনার উন্নতি কামনা করব না, এমন কথাই বা আপনি ভাবছেন কেন ?' ··

ওর কণ্ঠস্বরেই ওর অবস্থাটা টের পেত বিমল, কথা ঘুরিয়ে নিয়ে বলত 'তুমিও প্রাইভেটে বি. এ-টা দিয়ে ফ্যালো পূর্ণিমা। এসো একসঙ্গেই পরীক্ষার জন্য তৈরী হই!'

মুহূর্তের জন্য আশাতে আনন্দে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠত পূর্ণিমার, তারপরেই আবার ম্লান হয়ে গিয়ে বলত, 'সে কী আর হবে। মালুটা মানুষ হয়ে না উঠলে।—দিনরাতে বাড়তি পাঁচটা মিনিটও সময় পাই না যে!'

আর কথা বাড়াত না বিমল।

সেদিন ছুটির পর বিমলই প্রস্তাব করলে, 'চল মাঠে গিয়ে একটু বসা যাক—আজ বেশ খানিকটা সময় আছে হাতে!'

প্রস্তাবটা শুনে খুশিতে রাঙা হয়ে উঠল পূর্ণিমা। আজও সে ঠিক ছেলে-মানুষের মত খুশি হয়। যদিও ওরা ছুটির পর আজকাল মাঝে-মাঝেই মাঠে গিয়ে বসে, টিউশনীর আগে—একঘণ্টা কেন—আধঘণ্টা সময় পেলেও। এইটুকুই—পূর্ণিমার মনে হয় ওর জীবনে ওয়েসিস। সে সারাদিনের নিশ্ছিদ্র নিরবসরের মধ্যে সমস্ত সময়ই যেন মনের অবচেতনে এই সময়টুকুর অপেক্ষা করে। অবশ্য প্রায়ই ওদের অফিসের কাজ সেরে বেরোতে দেরি হয়ে যায়—দুজনের একজনের দেরি হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক, আর তাহ'লেই আড্ডার সুযোগ যায় নষ্ট হয়ে। সে সব দিনগুলো ফাঁকা ফাঁকা লাগে পূর্ণিমার। বিমলের বাহ্য কাঠিন্যের আবরণটা ভেঙ্গে যাবার পর ওর মিষ্ট, ভদ্র, সহানুভূতিশীল আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়েছিল। তাই পূর্ণিমার মনে হয়, ওর সামান্য মাত্র সাহচর্যেই মনের ক্লান্তি অনেকখানি দূর হয়ে গিয়ে একটা নবীনতার আস্তরণ পড়ে সেখানে।

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে আজও ছোলাভাজা কিনলে। চা-ওলা একটি প্রায় চেনাই হয়ে গেছে, সে ঠিক আসবে চা দিতে। সে আজকাল চা দিয়ে দু একটা সুখ-দুঃখের গল্পও ক'রে যায়। লেখাপড়া শিখতে পারে নি বলে তার ভারি

আফসোস। তবে সে ছেলেকে প্রাণপণে 'লিখাপাঢ়ি' শেখাচ্ছে। ছেলে পাটনা কলেজে পড়ে—যদি ভাল ভাবে পাস করে ত ডাক্তারি পড়াবে। ওদের গাঁয়ে একদম 'ডাগ্দার' নেই—কারুর অসুখবিসুখ হলে সাত 'কোশ' পথ ভেঙে সরকারী দাওয়া-খানায় যেতে হয়, তাও সেখানে অর্ধেক দাওয়াই মেলে না। ডাগ্দারও দেখেন না ভাল ক'রে। যারা কিছু দিতে পারে তাদেরই দেখেন। যদি বজরঙ্গজী 'কিরপা' করেন ত সেই দুঃখ সে ঘোচাবে—

এখানে এসেই চা-ওয়ালার কথা মনে পড়ল। আলোচনাটাও চলল সেই পথ ধরে।

কথার পৃষ্ঠে কথা: বিমল বললে, 'দ্যাখো—লোকটি অশিক্ষিত সামান্য লোক। কিন্তু সে চাইছে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়ে গাঁয়েই বসাতে, নিজের দেশের, গ্রামের উন্নতি। আমাদের মত কেবলই শহরের মুখ চেয়ে নেই।… বাঙ্গালীর পেটে কালির আঁচড় পড়লেই সে চায় শহরে এসে চাকরি করতে। শিক্ষিত লোক যদি গ্রামে না থাকে ত গ্রামের উন্নতি হবে কেমন ক'রে?'

পূর্ণিমা বললে, 'আপনি ত কখনই গ্রামে যান নি। কিন্তু আমি গিয়েছি। একবার—দিদিমার অসুখের সময় দু' মাস গিয়ে ছিলুম মামার বাড়ি। সে কী পরিবেশ—প্রাণ যেন হাঁফিয়ে ওঠে।'

'সেই পরিবেশটাই বদলাতে হবে। আর শিক্ষিত লোকেরা যদি না থাকে ত কোনদিনই সে কাজটা হয়ে উঠবে না যে!'

ততক্ষণে ওরা মাঠে নিরিবিলি একটু বসবার জায়গা পেয়েছে। অভ্যাস মত রুমাল পেতে ছোলাভাজাগুলো ঢেলে দিয়ে নিজেই সর্বাগ্রে কয়েকটা দানা মুখে পুরে বিমল বললে, 'তোমার সঙ্গে এই ব্যাপারেই একটু পরামর্শ করতে চাই পূর্ণিমা—'

পূর্ণিমা কয়েকটা ছোলাভাজা মুখে তুলতে যাচ্ছিল। কথাটা কানে যেতেই যেন কেমন আড়ষ্ট, কাঠ হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

ওর সেই আড়ষ্টতা এবং আতঙ্ক বিমলের চোখ এড়াল না। সে হেসে বললে, 'ভয় নেই—এখনই কিছু করছি না। কথাগুলো মন দিয়ে শোন আগে, তারপর অমন ক'রে তাকিও।'

পূর্ণিমা চোখ নামিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে ছোলাভাজাগুলো মুখে তুললে বটে কিন্তু কোন উত্তর দিলে না।

বিমল বললে, 'একটা সুযোগ পাচ্ছি। নিখিল বলে আমার যে ছাত্রটি আছে, তার বাবা সত্যশরণ বাবু ওঁদের দেশের ইস্কুলের সেক্রেটারী। ওঁর কাছে একদিন কথায় কথায় বলে ফেলেছিলুম যে যদি মাথার ওপর এতগুলো দারিদ্র না থাকত, তাহলে আমি সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে কোন পাড়াগাঁয়ে গিয়ে মাষ্টারী করতুম।…উনি হঠাৎ পরশু দিন একটা অফার দিয়েছেন। ওঁদের ইস্কুলের এখন যিনি হেড্মাষ্টার আছেন—আর বছর খানেকের মধ্যেই তিনি রিটায়ার করবেন। সে চাকরিটা উনি আমাকে দিতে চান। বলেন, আমরা ত দেশের কোন কাজেই লাগলুম না—আপনি যদি যান তবু হয়ত কয়েকটা ছেলে

মানুষ হতে পারবে।'

পূর্ণিমা অনেকক্ষণ পরে ধীরে ধীরে বললে, 'শুনেছি আজকাল নাকি বি-টি ছাড়া হেডমাষ্টার করার নিয়ম নেই!'

'একেবারেই যে নেই তা নয়। সেটা সত্যশরণ বাবুই কি ক'রে দেবেন বলেছেন, ওঁরাই ওয়ার্ধা ট্রেনিংটা নেবার ব্যবস্থা করবেন।'

আরও কিছুক্ষণ চুপ ক'রে রইল পূর্ণিমা। তারপর বললে, 'কিন্তু আপনার ফ্যামিলি?'

'সেদিকটায় একটু সুরাহা হয়েছে বলেই ত এ সব কথা ভাবতে পারছি। কনু এবারই পরীক্ষা দেবে, আর আমার বিশ্বাস ভাল ভাবেই পাস করবে। মণি ওর জন্যে কাজ ঠিক ক'রে রেখেছে। আষাঢ়েই ওদের বিয়ে হয়ে যাবে। ওধারে মণির লায়াবিলিটিও কমে আসছে। ওর বড় ভাগ্নেটি একটা অফিসে ঢুকেছে, বছরখানেক পরেই সে আলাদা বাসা করতে পারবে। মণি বলেছে যে ঐ বাসাটাই ওদের ছেড়ে দিয়ে মণি সহরতলীতে কোথাও গিয়ে থাকবে। তা হলে অন্তত অশান্তির ভয় থাকবে না। কনুর মাইনেটা ভাগ্নের সংসারে কনট্রিবিউট করলেই ওরা মণির মা-বাবার ভারও নিতে পারবে। মনু বিয়ে করবে না—তবে সে-ও-আসছে বছর পরীক্ষা দিতে পারবে বলে মনে হচ্ছে। লতুকে পুলক পড়াচ্ছে, মনে হয় লতুও অন্তত স্কুল-ফাইন্যালটা দিতে পারবে।'···

মজ্জমান ব্যক্তি তৃণখন্ড দেখলে আঁকড়ে ধরে—পূর্ণিমা ক্ষীণকণ্ঠে বললে, 'লতুর বিয়েও ত দিতে হবে!'

এবার বিমলের চুপ করে থাকার পালা। খানিকক্ষণ নিঃশব্দে বসে বসে কয়েকটা ছোলাভাজা নিয়ে নাড়াচাড়া করার পর একটু অপ্রতিভ ভাবে হেসে বললে,, 'আমরা সবাই স্বার্থপর—সুযোগ সুবিধা পেলেই আমাদের আসল চেহারাটা বেরিয়ে পড়ে। মুখে যতই পুলককে বলি যে আমার কাছে তার কৃতজ্ঞ থাকার কোন কারণ নেই—কিন্তু এর ভিতরই একদিন তার কৃতজ্ঞতার মূল্য চেয়ে বসেছি।···সমস্ত লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে সেদিন তাকে স্পষ্টই জিজ্ঞাসা ক'রে বসলাম, যদি তার বাবার কাছে তার সঙ্গে লতুর বিয়ের কথা পাড়ি ত তার আপত্তি আছে কিনা?···অভিলাষবাবু পুলকের জন্য মেয়ে খুঁজছেন সেটা শুনেই অবশ্য—। ওঁরা, ঠিক যাকে আমাদের পালটি ঘর বলে, তা নন। তবে অভিলাষবাবু মানুষটা মোটের ওপর ভালই—আধুনিক দৃষ্টিও আছে অনেকটা, হয় ত রাজীও করাতে পারব। পুলকের ওপর খুব অবিচার না হয়—মনে এ কথাটাও ছিল বৈকি। কারণ পুলক সত্যিই রূপবান, আর লতু—খুব বেশি হয় ত চলনসই। ওর মনটা জেনেই কথা পাড়ব ভেবেছিলাম—কিন্তু সে দায় থেকেও পুলক আমাকে অব্যাহতি দিলে। প্রণাম করে বললে, দাদা আপনি চিরদিনের মত সত্যিকারের দাদা হবেন আমার, এর চেয়ে আনন্দের কথা আর কিছু নেই। আপনি স্বচ্ছন্দে বাবার কাছে কথা পাড়ুন, তাঁকে রাজী করানর চেয়ে মাকে রাজী করানই কঠিন কাজ—সে ভারটা আমি বরং নিজেই নিচ্ছি!'

আবারও একটু অপ্রস্তুত ভাবে হাসল বিমল। তারপর বললে, 'অমলের ভারও পুলক নিতে চেয়েছিল, তবে তার দরকার হয় নি।··· এখন দেখছি আমিই ঋণী হয়ে পড়লাম ওর কাছে।'

কোন্ দূর থেকে যেন পূর্ণিমা বলে, 'আপনি অভিলাষবাবুর কাছে কথাটা পেড়েছিলেন?'

'না। এখনও ঠিক পাড়া হয় নি! তবে সেটা খুব কঠিন হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। এর ভেতরই পুলক তার মাকে অনেকটা রাজী করে এনেছে।··· তাই মনে হচ্ছে যে বছরখানেকের ভেতর আমি অনেকটা হাল্‌কা হ'তে পারব— অতটা দায়িত্ব আর থাকবে না। এদের ব্যবস্থা হয়ে গেলে—মা-বাবা আমার কাছে গিয়ে থাকতে পারবেন। আর যদি মনু পাস করে এবং কাজ-কর্ম একটা পায়—ত সেও থাকতে পারে ওঁদের নিয়ে।'

ইতিমধ্যে ওদের পরিচিত চা-ওয়ালা এসে গিয়েছিল। সে দু' ভাঁড় চা দিয়ে একটু গল্প করে চলে গেল। আবারও এদের মধ্যে নামল একটা কষ্টকর নীরবতা।

দূরে দুটি-তিনটি ছোকরা বসে ছিল। তাদের মধ্যে একজন একটা আধুনিক গান ধরেছে। বড় রাস্তা থেকে ভেসে আসছে বহু মোটরের হর্ন আর চলতি বাসের আওয়াজ। কোলাহলের শেষ নেই—তবু এই দুটি প্রাণীর কাছে ওদের এই বাক্যহীন নিস্তব্ধতা যেন দুঃসহ হয়ে উঠছে।

একটু পরে, নিজের অসাড় মনটাকে যেন চাবুক মেরেই সক্রিয় ক'রে তুলল পূর্ণিমা। সে ঘরের ওপর থেকে বিমলের রুমালখানা তুলে নিয়ে ঝেড়ে পাট করে ওর দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললে, 'নিন এটা পকেটে পুরুন। এবার উঠতে হবে!'

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই অকস্মাৎ বিমল এক কাণ্ড ক'রে বসল।

হয়ত সে এতক্ষণ ধরে এই কাণ্ডটাই করতে চাইছিল, মনে মনে এই কথা-গুলোরই রিহার্সাল দিচ্ছিল—ভরসা বা সাহসের অভাবেই এতক্ষণ তার এই নীরবতা; হয়ত পূর্ণিমার শেষের কথাগুলোতে—আজকের এই নির্জন অবসরের এখনই পরিসমাপ্তি ঘটবে, এমন সুযোগ আর হয়ত মিলবে না—এই সম্ভাবনার সচেতনতাই তাকে মরিয়া ক'রে তুলল শেষ পর্যন্ত—

রুমালসুদ্ধ পূর্ণিমার ডান হাতখানা নিজের দু'হাতের মধ্যে ধরে ফেলে, মাথাটা একটু নামিয়ে কেমন একরকম চুপি চুপি বললে, 'একা একা এ জীবনে দাঁড়িয়ে লড়াই করা বা এগিয়ে যাওয়া—দুই-ই বড় কষ্টকর পূর্ণিমা। জীবনে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা ভাগ ক'রে নেওয়ার একটা সাথী দরকার—পুরুষেরও, মেয়েরও।···তুমি, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

সন্ধ্যা নেমে এসেছে মাঠে। একটু একটু ক'রে সেই অবারিত মাঠেও ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। তবু পশ্চিম আকাশের রক্তাভা একেবারে বিদায় নেয় নি তখনও—কাছের জিনিস তখনও নজরে পড়ে।

বিমল কথাগুলো বলবার সময় পূর্ণিমার মুখের দিকে তাকাতে পারে নি,

মাটির দিকে চোখ রেখেই বলেছিল। এখন—কথা শেষ হ'তে ওর হাতখানায় অস্বাভাবিক একটা কম্পন অনুভব ক'রেই চোখ তুলে তাকাতে নজরে পড়ল—পূর্ণিমার সমস্ত মুখ যেন এই এক নিমেষেই রক্তহীন বিবর্ণ হয়ে উঠেছে ; তার দৃষ্টিতেও কেমন একরকম প্রাণহীন বিহ্বলতা। সে চেয়ে আছে বিমলের মুখের দিকেই—কিন্তু তাতে না আছে পরিচয়ের নিশ্চয়তা আর না আছে এতটুকু অনুভূতির চিহ্ন!

অনেকক্ষণ—বোধহয় এক মিনিটকাল বিমল বিস্মিত, কিছুটা উদ্বিগ্ন হয়ে চেয়ে রইল ওর সেই প্রায়-মৃত্যুপাণ্ডুর মুখের দিকে—তারপর তখনও-মুঠোর-মধ্যে-ধরা হাতখানায় একটু চাপ দিয়ে মৃদুকণ্ঠে ডাকল, 'পূর্ণিমা!'

আহ্বানের যেন একটা মর্মান্তিক আঘাতেই চমকে কেঁপে জেগে উঠল পূর্ণিমা। তারপর অকস্মাৎ—ব্যাপারটা কী ঘটে গেল বিমল তা বোঝবার আগেই—প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ল সে।...সামান্য নয়—আকুল, বুক ফাটা কান্না। যেন বহু দিনের বহু হতাশা একসঙ্গে বেরিয়ে আসতে চাইছে ওর অন্তর ভেঙ্গে, বুকের প্রাচীর বিদীর্ণ ক'রে। কান্নার আবেগে সে এক সময় সেই মাঠের ওপরই লুটিয়ে পড়ল।...

আর যাই হোক্—এতটার জন্য প্রস্তুত ছিল না বিমল! সে ঠিক বুঝতেও পারল না এর কারণ।...বিষম ব্যস্ত হয়ে উঠল সে। ভাগ্যে আশে-পাশে তেমন লোকজন নেই। কিন্তু এখনও অন্ধকার হয় নি—বহু লোকই মাঠে বেড়াচ্ছে, কেউ এদিকে এসে পড়তে কতক্ষণ?

সে ওকে প্রকৃতিস্থ করার জন্য বার বার উদ্বিগ্ন কণ্ঠে ডাকতে লাগল 'পূর্ণিমা, পূর্ণিমা—ওঠ। লক্ষ্মীটি অমন ক'রো না।...কেউ এসে পড়লে—লক্ষ্মীটি—পূর্ণিমা—'

সম্ভবত সে ডাক তার কানে পৌঁছল না—নিজের আবেগ তার সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই তখন অবশ করে দিয়েছে—অথবা কানে পৌঁছলেও নিজেকে সামলে নেবার শক্তি ছিল না, সে তেমনই আকুল হয়ে কাঁদতে লাগল। যতটা সম্ভব নিঃশব্দেই কাঁদছিল সে—কিন্তু তার আবেগের বিপুলতা বোঝা যাচ্ছিল বিমলের সামনে উপুড় হয়ে পড়া পিঠটা এবং কাঁধ দুটোর ফুলে-ফুলে ওঠা থেকেই—

আরও একটু ইতস্তত ক'রে বিমল তার মাথাটায় হাত দিয়ে একরকম জোর ক'রেই তুলে ধরল। ধুলো, ঘাসের কুঁচি, শুকনো কুটো চোখের জলের সঙ্গে মাখামাখি হয়ে মুখখানার অবস্থা যৎপরোনাস্তি করুণ হয়ে উঠেছে, সেদিকে চেয়ে ক্ষণকালের জন্য বিমলেরও চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে এল অকারণেই। কিন্তু সেও জোর ক'রে নিজেকে শাসন করলে। তার রুমালখানা তখনও পূর্ণিমার হাতেই ধরা ছিল, সেইটেই টেনে নিয়ে অপটু হাতে ওর মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, 'পূর্ণিমা, শান্ত হও, এমন হবে জানলে—। ছি ছি, কী হয়েছে বলো ত! কেউ দেখলে কি মনে করবে। একটু সামলে নাও নিজেকে।'

বহিঃপ্রকাশেই বেদনার প্রচণ্ডতা কমে। হয় ত সব হৃদয়াবেগেরই এই নিয়ম।

এতক্ষণের এই বিপুল অশ্রুবিসর্জনে পূর্ণিমারও বেদনা অনেকটা কমে এসেছিল। এইবার সে প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে একটু সামলে নিলে। যদিও কান্নার বেগ একেবারে দমন করা সম্ভব হ'ল না, বরং নিরুদ্ধ রোদনে তার সমস্ত দেহটা আরও বেশী করে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—তবু সে মুখ থেকে কাদা-ধুলোর দাগ ভাল ক'রে মুছে ফেলে অনেকটা ভদ্র হ'ল। আন্দাজে আন্দাজে চুলগুলোও যথাসম্ভব ঠিক ক'রে নিলে।

বিমল তাকে একটু অবসর দিয়ে আস্তে আস্তে বললে, 'আমাকে মাপ কর। আমি এতখানি কোন বেদনার জায়গায় আঘাত দিয়ে ফেলব বুঝলে কখনই কথাটা তুলতুম না। আমারই অন্যায় হয়েছে। হয়ত একটু বেশী স্বাধীনতা নিয়ে ফেলেছি, কেবলই নিজের দিক থেকে সবটা ভেবেছি। নিজের মূল্যেও বেশী ক'রে ধরেছি হয় ত। যাই হোক—তুমি শান্ত হও পূর্ণিমা। এমন ধৃষ্টতা আর কখনও হবে না—'

অসহায়, ব্যাকুলভাবে ওর দিকে একবার তাকাল পূর্ণিমা। ঝাপসা আলোতে সেটা ঠিক নজরে না এলেও সে ওর হাত-দুটো নিজের থর-থর-কম্পিত হাতে চেপে ধরতে ভুল বোঝার আর কোন সম্ভাবনাই রইল না। আকুল, অশ্রুবিকৃত-কণ্ঠে পূর্ণিমা বললে, 'কেন মিছিমিছি এসব কথা ব'লে আমাকে আরও দুঃখ দিচ্ছেন! ··আপনি কি কিছুই বুঝতে পারেন না···আমি যে—আমি যে আপনার বদলে ঈশ্বরকেও পেতে রাজি নই।··· আপনি আমাকে যে অনুগ্রহ করেছেন—তাতে আমি এই মুহূর্তে মরে গেলেও সুখে মরতে পারতুম। ··· কিন্তু আমি যে কী অসহায় তা আপনি জানেন না! · বৃদ্ধ রুগ্ন বাপ মা, নাবালক ছোট বোন—আমার যে হাত-পা আষ্টে-পৃষ্ঠে বাঁধা। সৌভাগ্য যেচে এলেও যে নিতে পারে না—তার মত দুর্ভাগ্য আর কেউ নেই! কেউ নেই!'

আবারও উচ্ছ্বসিত কান্নায় কণ্ঠ বুজে এল পূর্ণিমার, সারা দেহ কান্না চাপবার প্রাণপণ চেষ্টায় কেমন একরকম বেঁকে বেঁকে উঠতে লাগল কিন্তু এবার আর সে ভেঙে পড়ল না। বরং কোনমতে উঠে দাঁড়িয়ে, কোন রকম বিদায় সম্ভাষণ মাত্র না ক'রে অভিভূত স্তম্ভিত বিমলকে একটিও কথা কইবার অবকাশ না দিয়েই—একরকম ছুটে চলে গেল সে। মাঠ পেরিয়ে জনবহুল রাজপথের দিকে, সেই জমাট-হয়ে-আসা অন্ধকার থেকে উজ্জ্বল আলোকসজ্জার দিকে, যেন প্রাণপণেই ছুটতে লাগল সে। শুধু বহুলোকের মধ্যে এসে প্রকৃতিস্থ হওয়ার জন্যই নয়—দুর্ভাগ্যকে পেছনে ফেলে আসার একটা আশ্বাসও যেন তাকে এই দুর্নিবার আকর্ষণে ছুটিয়ে নিয়ে গেল!

॥ ২৫ ॥

পূর্ণিমা চলে যাওয়ার পরও বিমল বহুক্ষণ সেখানেই অনড় হয়ে বসে রইল। ওর সমস্ত মনের বল—এবং খানিকটা দেহের শক্তিও—যেন হরণ ক'রে নিয়ে গেছে ঐ মেয়েটি—যাকে কিছুদিন আগেও করুণার চোখে দেখত সে।

বাস্তবিক সে যে ঠিক এতটা ভরসা করেছিল পূর্ণিমার ওপর, তা এই

প্রস্তাবটা করার কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত কল্পনাও করে নি। অথচ এই মুহূর্তে নিজেকে একেবারেই অসহায় রিক্ত মনে হচ্ছে। যতখানি উদ্যম, যতখানি উৎসাহ নিয়ে এই ক-দিন ভবিষ্যতের কর্মজীবন সে কল্পনা করেছিল—তার যেন কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। এই বিপুল ভার কি সে পারবে একেবারে একাকী বহন করতে?

অবশ্য ঠিক নিজের কথাই সে ভাবছিল এটা বললেও বিমলের ওপর একটু অবিচার করা হয়।···পূর্ণিমার অসহায় অবস্থাটাও একটা যন্ত্রণাদায়ক কাঁটার মত তার বুকের মধ্যে বিঁধে খচ-খচ করছে। রূপকথার রাজকন্যার মতই পূর্ণিমা যেন কোন দৈত্য অথবা রক্ষপুরীতে বন্দিনী—সাহায্যের জন্য তারই মুখ চেয়ে আছে। অথচ তারও যে কিছুই করবার নেই এক্ষেত্রে। সেও একান্ত অসমর্থ—নিম্ন মধ্যবিত্তের সংসারে বাঁধা, নিজের দুর্ভাগ্যের বাইরে আর কোন দিকে তাকাবার তার অধিকার কোথায়? অপর কারুর দুঃখ-দুর্দশার কথা ভাবতে যাওয়াই যে তার পক্ষে হাস্যকর বাতুলতা।···না কোথাও কোন উপায় নেই। শুধু শুধু প্রতিকারহীন ক্ষোভে ক্ষত-বিক্ষত হওয়াই সার।···

অনেকক্ষণ সেইভাবে কাটল বিমলের—এলোমেলো চিন্তার গহন গভীরে ডুব দিয়ে। নির্জন অন্ধকার মাঠ, কিন্তু কিছুক্ষণ আগেও এখানে পূর্ণিমা ছিল—তার উপস্থিতি যেন এখনও একটা মৃদুগন্ধে তাকে ঘিরে আছে, হাত বাড়ালেই তার স্পর্শও সে অনুভব করতে পারবে সামনের ঘাসে। এখনও ওধারের খানিকটা অংশ হয়ত তার অশ্রুতে ভিজে। তাই এই চিন্তাগুলো বেদনাদায়ক হলেও সে চিন্তাবিলাস ছেড়ে ওখান থেকে তার উঠতেও ঠিক ইচ্ছে করছিল না।

কিন্তু উঠতেই হ'ল শেষ পর্যন্ত। একটা লোক কোথা থেকে এসে ধপাস্ ক'রে বসে পড়ল পাশে।

'দেশলাই আছে দাদা—একটা জ্বালুন ত, কী একটা কুড়িয়ে পেলুম—দেখি!

অন্ধকার মাঠের অন্ধকার কাহিনী, অনেক শুনেছে বিমল। সে একটু ত্রস্ত হয়েই উঠে দাঁড়াল। সংক্ষেপে 'না' ব'লে দ্রুত এগিয়ে চলল এস্‌প্ল্যানেডের দিকে।

তাকেও ঠকাতে আসে লোক, আশ্চর্য!

অথবা তাদের মত লোককেই ঠকানো সহজ। যে ডুবছে সে-ই নাকি কুটো আঁকড়ে ধরে, বিচার-বিবেচনার সময় পায় না।

পড়াতে যাওয়ার মত তখন মনের অবস্থা নয় বিমলের, রাতও অনেক হয়ে গেছে। সুতরাং সে-চেষ্টাও সে করলে না। লক্ষ্যহীন ভাবে চৌরঙ্গীর ফুটপাথটা ধরে হাঁটতে লাগল, হাঁটতেও যে খুব ভাল লাগছে তা নয়—কিন্তু বাড়ি ফেরাও এখন অসম্ভব!

'বিমলবাবু!'

হঠাৎ পরিচিত-কণ্ঠের ডাকে তার চমক ভাঙল একসময়। বহুদূর এসে পড়েছে সে, পার্কস্ট্রীটের মধ্যে এসে ঢুকেছে কখন।

একটু বিস্মিত হয়ে চারিদিকে তাকাতে নজরে পড়ল—পিছনে নয়, বহুদূরেও নয়, ঠিক তার সামনেই দাঁড়িয়ে হাসছে জয়ন্তী।

হাসছে, তবে বড় ম্লান সে হাসি।

'আরে, আপনি! নমস্কার নমস্কার!'

'তবু ভাল, আমাকে চিনতে পারলেন শেষ পর্যন্ত। কখন থেকে ত চেয়ে আছেন—আমাকে কি দেখতে পান নি?'

'সত্যিই পাই নি। মাফ্ করবেন।'

'আপনাকে এমন উদ্‌ভ্রান্ত দেখাচ্ছে কেন বলুন ত? খুবই ক্লান্ত দেখাচ্ছে। চলুন ঐ রেস্তোরাঁটাতে বসে একটু কফি খাওয়া যাক্।'

'চলুন।' বিমল খানিকটা অনিচ্ছাতেও রাজী হয়ে গেল। সত্যিই বড় ক্লান্তি বোধ হচ্ছিল তার।

রেস্তোরাঁতে ঢুকে একটা কোণ বেছে নিয়ে বসল জয়ন্তী।

এই রেস্তোরাঁতেই আরও একদিন এসেছিল বিমল। সে আর পূর্ণিমা।

পূর্ণিমা—

বিমল জোর ক'রে জয়ন্তীর দিকে মনটা ফিরিয়ে আনল।

লক্ষ্নৌয়ের চিকন-কাজ-করা শাদা শাড়ি এবং বহুমূল্য প্রসাধনে আজও তাকে দেখাচ্ছে একটি সুন্দর ফুলের মতই। কিন্তু ঠিক সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুল নয়। অনেক দিন আগে পুলক কোথা থেকে একটা বড় ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুল এনে দিয়েছিল, সেটা একটা ফুলদানীতে রাখা ছিল তার ঘরে—কয়েকদিনই। অনেকদিন ছিল সেটা, কিন্তু একদিন পরেই ওপরের পাপড়িটা একটু খসখসে হয়ে গিয়ে ফুলটা কেমন যেন মুষড়ে পড়েছিল। আজ জয়ন্তীকে দেখে বিমলের সেই ম্যাগ্‌নোলিয়া ফুলটার কথাই মনে পড়ল।

'তারপর, আপনার বিজনেস কতদূর? কী যেন ছবি তুলছিলেন—বেরিয়েছে সে ছবি? কেমন চলল?'

কফির পেয়ালাটাতে চামচ নাড়তে নাড়তে মাথা নত ক'রে জয়ন্তী বললে, 'ঠাট্টা করছেন বুঝি?'

'ঠাট্টা!' অপ্রতিভ হয়ে উঠল বিমল, 'সত্যিই, বিশ্বাস করুন, আমি সহজ-ভাবে প্রশ্নটা করেছি। আমি ও জগতের কোন খবরই রাখি না জানেন ত—নিজের সংসার এবং জীবন নিয়েই বিব্রত!...কেন, সে ছবিতে লাভ হয় নি?'

'সে ছবি শেষ হ'ল কোথায়?...ব্যাপারটা ভাল ক'রে না বুঝেই ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিলুম, সামান্য পুঁজি তলিয়ে গেল, কিছুই হ'ল না। যে লোকটি নামিয়েছিল—সে বহু ভরসা দিয়েছিল আগে, শেষ অবধি তার টিকিও দেখতে পেলুম না! মিছিমিছি ও'র অনেক কষ্টের টাকা সবটাই নষ্ট হয়ে গেল।... অনেক ঘোরাঘুরি করলুম, তাতে শুধু—। এ লাইনটাই বড় খারাপ

বিমলবাবু।…আমি আর ওঁর কাছে মুখ দেখাতে পারি না।…উনি অবশ্য কিছু বলেন না—কিন্তু ওঁর খুব কষ্ট হয় তা বুঝি। আরও যেন তাড়াতাড়ি বুড়ো হয়ে গেলেন এই ক-মাসে।…কী যে করব।…আমি অবশ্য হাল ছাড়ি নি, প্রাণপণে যুঝছি।…কিন্তু এখনও হাজারবিশেক টাকার দরকার।… ডিস্ট্রিবিউটারদের ভরসা করেছিলুম, তারা এখন নানা শর্ত দিচ্ছে, অমুককে নামাতে হবে অমুককে চাই। অথচ আমাদের ছবি বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে, এখন আর কাস্ট বদলানো কি সম্ভব?'…

আরও বহু কথা বলে গেল জয়ন্তী। কতক বিমলের কানে গেল কতক গেল না। ফিল্ম জগতের অধিকাংশ কথাই তার কাছে দুর্বোধ্য।…কফি শেষ হ'তে জয়ন্তীই দাম চুকিয়ে দিয়ে বাইরে আসতে আসতে বললে, 'এখন এমন মনের অবস্থা, একটা ভাল চাকরি-বাকরি পেলেও করতুম।…আমার ভবিষ্যৎ ভেবেই আরও যেন ওঁর পরমায়ু ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আমার একটা ব্যবস্থা হয়েছে জানলে উনি অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হতেন।…ওঁর জন্যেই এখন আমার বেশী ভাবনা।'

বলতে বলতে জয়ন্তীর দুই চোখ জলে ভরে এল।

এই প্রথম ওর সম্বন্ধে খানিকটা শ্রদ্ধা বোধ করল বিমল। সহানুভূতির সুরে বললে, 'কোন ভাল মার্চেণ্ট অফিসে চেষ্টা করে দেখুন না। আপনার ত বহুলোকের সঙ্গে জানাশুনো হয়ে গেছে ইতিমধ্যে—। সরকারী চাকরির চেয়ে মার্চেণ্ট অফিসের কাজেই আজকাল সুবিধে বেশী।'

'তাই দেখি।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে জয়ন্তী, 'আসবেন না একদিন আমাদের ওখানে। একটা রবিবার দেখেও ত এলে পারেন! আসবেন একদিন?'

কেমন যেন অনুনয়ের ভাব ওর সমস্ত ভঙ্গীতে।

'দেখি—।' বিমল সংক্ষেপে উত্তর দেয়।

॥ ২৬ ॥

এর পর কয়েকটা দিন বিমলের কাটল যেন একটা দুঃসহ বুকচাপা স্বপ্নের মধ্য দিয়ে। ঐ একান্ত যন্ত্রণাদায়ক চিন্তাটা থেকে মুক্তি পাবার জন্য মন ছটফট করে—অথচ কোথাও কোন পথ দেখতে পায় না মুক্তির। উপায়হীনতার পাষাণ-প্রাচীরে মাথা খুঁড়ে ভেতরে ভেতরে শুধু রক্তাক্ত ও ক্ষত-বিক্ষত হয়।

বিস্মিত হয় বিমল নিজের মনোভাবেও।

পূর্ণিমা যে কবে এমন ভাবে তার কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল তা সে একটুও টের পায় নি। অথচ আজ জীবন-পথে তারই অভাবের সম্ভাবনায় নিজেকে একান্ত অসহায় ও নিঃস্ব মনে হচ্ছে।

বিশেষ ক'রে সে দিন—ওদের সেই স্মরণীয় সন্ধ্যার পরের দিনে যে কাঁটা বিমলের বুকে বিঁধেছিল—তাকে অস্বীকার করার মত একটুকু ছলনার আশ্রয়ও সে খুঁজে পায় নি।

পূর্ণিমা এসেছিল দেরী ক'রে। ট্রাম বাসের বিভ্রাটে সেদিনও তাকে হেঁটে আসতে হয়েছিল—সে কথাটা রেখার সঙ্গে পূর্ণিমার প্রশ্নোত্তরে জানা গিয়েছিল, পরে। বিমল প্রশ্ন করে নি—কোনদিনই করে না আজকাল—পূর্ণিমাই অন্যদিন নিজে থেকে এসে বলে কিন্তু সেদিন বোধ হয় তার সঙ্গে কথা কইবার মত মানসিক শক্তি ছিল না ওর। বহুক্ষণ সময় লেগেছিল পূর্ণিমার—সহজ হয়ে কথাবার্তা বলতে। এমন কি অফিসের কাজের প্রসঙ্গ তুলে সহজ হবার সুযোগটাও সে নিতে পারে নি অনেকক্ষণ।

হ্যাঁ—এড়িয়েই গেছে সে বিমলকে। আর সেইটেই হয়ত স্বাভাবিক।

কিন্তু সে মুখ তুলে না চাইলেও বিমল ওর দিকে চেয়ে দেখেছিল বৈকি।

এমন বিবর্ণ যে মানুষের মুখ হয়—তা বিমল আজ ওকে না দেখলে কোনদিন কল্পনাও করতে পারত না। এতদূর হেঁটে আসার পরিশ্রম তাকে ক্লান্ত ও স্বেদসিক্ত করলেও এতটুকু আরক্ত করতে পারে নি! তার মুখের সেই একান্ত রক্তশূন্যতা—তার বসে পড়বার অবসন্ন ভঙ্গী এবং সমস্ত কথাবার্তার মধ্যে একটা বিষণ্ন হতাশার সুর—এক কথায় ওর উপস্থিতিটাই যেন চাবুকের মত তার মনে গিয়ে লেগেছিল। সেদিনকার সেই অব্যক্ত প্রতিকারহীন যন্ত্রণা সহজে ভোলবার নয়।

তারপর এই ক-দিন অহরহ ভেবেছে সে। পথ দেখতে পায় নি এটা ঠিকই কিন্তু হারও মানে নি। একটা কথা মনে মনে এই কদিনে নিশ্চিত বুঝতে পেরেছিল—পূর্ণিমাকে এতখানি আঘাত দিয়ে সে চলে যেতে পারবে না। কোন আদর্শের জন্যই নয়। কারণ তা'হলে যে শূন্য অন্তর নিয়ে তাকে যেতে হবে, আর যাই হোক তা দিয়ে তার সংকল্পিত কাজ সুসম্পূর্ণ হবার সম্ভাবনা থাকবে না কোনদিনই—

বিমল পৌঁছবার অনেক আগেই খবরটা পৌঁছে গিয়েছিল। সাধারণত অফিসে আসবার সময় সে ট্রামে-বাসে চড়ে না—সেদিন দেরি হয়ে গেছে বলেই বাস ধরবার চেষ্টা করতে গিয়ে আরও খানিকটা দেরি হয়ে গেল—অফিসে পৌঁছল অফিস বসবার ছাঁকা কুড়িটি মিনিট পরে।

অফিস—বিশেষ ক'রে তার সেক্শনটি তখন তারই আলোচনায় মুখর। সে ঘরে ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে যেন হৈ-চৈটা আরও বেড়ে গেল, বাদল এগিয়ে এসে তার পিঠে প্রচণ্ড একটা চাপড় মেরে বললে, 'ওসব শুনছি না দাদা—মোটামুটি ছাড়তে হবে। বেশী নয়, গোটা পঞ্চাশ হ'লেই এই ক-টা লোকের একরকম চলে যাবে!'

সুখবর ত বটেই—এবং কী সুখবর তাও আন্দাজ করতে অসুবিধে হ'ল না। তবু বিমল মুখে বিস্ময় প্রকাশ ক'রে বললে, 'কিন্তু হয়েছে-টা কি?

তোমাদের এই ক'টা লোকের জন্যে সামান্য পঞ্চাশটি টাকা জোগাড় করার কী এমন অকেসন ঘটল ?'

'আহা। কিছুই যেন জানেন না !' সুশান্ত বলে উঠল ওদিক থেকে।

বাদল বললে, 'তা নাও জানতে পারে অবশ্য। এই ত এল। পাসের খবর এসেছে—পাস করেছ বুঝলে ?'

'ও, এই।' তাচ্ছিল্যের সুরে বললে বিমল।

'এই মানে কি ? কটা লোক এক চান্স্-এ এ পরীক্ষায় পাস করতে পারে তাই শুনি ? এখনই ত একটা ইনক্রিমেন্ট বাঁধা—তারপর অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বড় সাহেব।...সরকার সালাম !'

আভূমিনত হয়ে সেলাম করবার একটা ভঙ্গী করে বাদল।

'থাম্—থাম্। বখামি করিস নি !' হাসি হাসি মুখে উত্তর দেয় বিমল !

'না না। উড়িয়ে দিলে চলবে না। সামনের শনিবারেই ভোজটা লাগানো হবে। মেনুও তৈরী। এখন টাকাটা কবে ছাড়বে বল—'

'হচ্ছে হচ্ছে।' বিমল এগিয়ে যায় তার সীটের দিকে। আসলে তার দৃষ্টি তখন খুঁজছিল একটি বিশেষ লোককে।...এ সংবাদে যার সবচেয়ে উল্লসিত হবার কথা—সে কৈ ?

পূর্ণিমার সীট খালি।

এখনও আসে নি পূর্ণিমা ! পঁচিশ মিনিট হয়ে গেছে !

অস্বাভাবিক দেরি এটা—ওর পক্ষে !

সে সাধারণত যা করে না তা-ই করে বসল। রেখাকে প্রশ্ন করল, 'পূর্ণিমা এখনও আসে নি আজ ? কী হ'ল তার ?'

'কে জানে !' কুট ক'রে কামড় দেয় রেখা, 'আপনার সঙ্গেই ত তার মেলামেশা বেশী। তার লেটেস্ট খবর আপনারই ত জানবার কথা !'

মুখ টিপে হাসে একটু সে—কথাটা শেষ ক'রে।

যতই সতর্ক থাক ওরা—ওদের ঘনিষ্ঠতাটা সহকর্মীদের চোখ এড়ানোর কথা নয় ! নিজের নির্বুদ্ধিতায় নিজেই বিরক্ত হয়ে ওঠে বিমল। তবে আর কথাও বাড়ায় না। গম্ভীর মুখে একটা ফাইল টেনে নেয়।...

খবরটা পাওয়া গেল দুটোরও পর। কে একজন অন্য সেকশন থেকে এসে খবরটা দিলে, 'শুনেছেন বিমলবাবু, আপনাদের সেকশনের পূর্ণিমা রায়ের খবর ?'

বুকের মধ্যেটায় ধ্বক্ ক'রে উঠল বিমলের ! মুখটা নিমেষে বিবর্ণ হয়ে গেল।

'কৈ না ত ! কী খবর ?' কোনমতে ঢোক গিলে প্রশ্ন করে সে।

'ভয় নেই—এমন কিছু নয়। জ্বর।...তাই নিয়েই নাকি অফিসে আসছিল, পথের ধারে মাথা ঘুরে বসে পড়ে। দৈবক্রমে সেটা ওদের পাড়ার মধ্যেই—আর ওদের যিনি দেখেন সেই ডাক্তারও সেখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনিই ওকে গাড়িতে করে তুলে নিয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছেন।'

'কে—কে বললে ?—মানে খবর দিলে ?' অতিকষ্টে কণ্ঠস্বর এবং ঠোঁট দুটোকে আয়ত্তে এনে প্রশ্ন করলে বিমল।

'সেই ডাক্তার বাবুটিই এইমাত্র ফোন করেছিলেন।'

খুবই সাধারণ ঘটনা। এমন কোন ভারী অসুখ কিছু নয়। সামান্য জ্বর—তার জন্যই একটু দুর্বলতা। কিন্তু তবু বিমল সারাক্ষণই কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। বার বার জোর ক'রে কাজে মন বসাতে গেল—বার বারই মন সেখান থেকে সরে এল। টাকা-আনা-পাইয়ের শুষ্ক নীরস হিসেব এবং হিসেব-পরীক্ষকের কঠিন বস্তু-তান্ত্রিক নোট্-এর মধ্যে বার বারই জেগে উঠতে লাগল নিরতিশয় ক্লান্ত এবং রক্তহীন একখানা মুখ। কাজে ভুল হয়ে যেতে লাগল বার বার, ফাইলগুলো কাটাকুটিতে অপরিষ্কার হয়ে উঠল।

শেষে বিরক্ত হয়ে উঠে গিয়ে বিমল মাথায় মুখে জল দিয়ে এল।

রেখা আবারও একটা কামড় দিলে, মুচকী হেসে বললে, 'বিমলবাবুর আজ হ'ল কি, কাজে যে মনই বসছে না।···আপনারও কি শরীর খারাপ হ'ল না কি ?···বরং সকাল ক'রে বাড়ী চলে যান!'

ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। আগে হ'লে বিমলও কড়া জবাব দিত। হয়ত সত্যিই উঠে চলে যেত। কিন্তু মনের মধ্যে সত্যি-সত্যিই কোথায় একটা অপরাধীর ভাব, একটা সঙ্কোচ অনুভব করছিল—সেটা অস্বীকার করার উপায় নেই। সে বিরক্ত ভাবে ভ্রূ কুঞ্চিত করলে একবার—কিন্তু কোন জবাবই দিতে পারলে না।···আর কতকটা সেই জন্যেই—পাঁচটার পরও আধ ঘণ্টা পর্যন্ত বসে ফাইলগুলো নিয়ে অকারণেই নাড়াচাড়া করলে। এটা রেখার কাছে একটা শোচনীয় পরাজয়ই বলতে হবে—তার পক্ষে অন্তত—কিন্তু, সেই একান্ত-রক্তহীন, ক্লান্ত, স্বেদাসিক্ত একটি মুখের সকরুণ অবসন্নতার জন্য মনে মনে নিজেকে সত্যিই অপরাধী বোধ করছিল। রেখার বিদ্রূপকে অবহেলা করার মত মনের জোর ওর আর ছিল না।

অফিস থেকে বেরিয়ে অনেকক্ষণ পথে পথে ঘুরল বিমল। পূর্ণিমার কাছে এখনই ছুটে যেতে ইচ্ছে করছে, এটা অস্বীকার ক'রে লাভ নেই।

একটা খবর নেওয়া অবশ্যই উচিত ওর। একটা সাধারণ ভদ্রতা। কর্তব্যও বটে।

কিন্তু কোথা থেকে যেন রাজ্যের দ্বিধা এবং সঙ্কোচ এসে জড়ো হচ্ছে। পূর্ণিমার বাবা-মা কিছু ভাববেন না ত ? যদি তাকে আবার এর জন্য কোন বক্রোক্তি শুনতে হয় ?·· অফিসে জানাজানি হ'লেও একটা ঠাট্টা-তামাসার ঝড় উঠবে নিশ্চয়। নিজের জন্য কিছু ভাবে না—কিন্তু বেচারী পূর্ণিমা—সে হয়ত মিছিমিছি কতকগুলো ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের লক্ষ্য হয়ে উঠবে।···

এমনি কত কি মনে হয়। তবে খানিকটা পরেই একটা আত্মধিক্কার জাগে মনের মধ্যে। সে এত দুর্বল হয়ে গেছে ? লোকের বিদ্রূপের ভয়ে বিবেককে

বিসর্জন দিতে বসেছে। ছি!

সে অকস্মাৎ সমস্ত জড়তা ও সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে এক সময় পূর্ণিমার বাড়ীর দিককার ট্রামে চেপে বসল।

এর আগে কখনও যায় নি বটে—কিন্তু ঠিকানাটা বহুবার শুনেছে ওর মুখে। একদিন ওদের রাস্তার মুখ অবধিও পৌঁছে দিয়ে গিয়েছিল। সুতরাং বাড়ীটা খুঁজে পেতে অসুবিধা হ'ল না একটুও।...

কড়া নাড়তেই একটি কিশোরী মেয়ে এসে দোর খুলে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। ভেতর থেকে—সম্ভবত পূর্ণিমার বাবাই প্রশ্ন করলেন, 'কে রে? কে ডাকে?'

বিমল সরাসরি প্রশ্ন করল, 'তোমার নাম মালু ত?'

মালু ঘাড় নাড়ল।

'তোমার দিদি কেমন আছেন? তাঁর খবর নিতে এসেছি। তাঁর অফিসেই কাজ করি আমি।...আমার নাম বিমল।'

মালুর মুখে পরিচয়ের আভাস ফুটে উঠল। বোঝা গেল যে ওর নামটা এদের কাছে একেবারে অপরিচিত নয়!

'আসুন। আসুন।...আচ্ছা একটু দাঁড়ান। বাবাকে বলছি।'

ভেতরে গিয়ে মালু ফিস্ ফিস্ ক'রে কী বলল। পূর্ণিমার বাবা হাঁপাতে হাঁপাতে উঠে এলেন, 'আসুন আসুন। · আর আমাদের যা অবস্থা—এই দু'খানা ঘরের ভেতরই সব। ঐ যে পূর্ণিমা ও ঘরে। আসুন!'

বড় ঘরটাতেই বাবা ও মা'র দু'খানা চৌকি এবং হরেক রকমের আসবাব। পাশের ছোট ঘরটাতে একটা বড় তক্তপোশে এরা দুই বোন শোয়। সেটাতেও রাজ্যের ডেয়ো-ঢাকনা। তারই মধ্যে থেকে একটা চেয়ার উদ্ধার ক'রে ঝেড়ে মুছে বিছানার পাশে টেনে দিয়ে মালু বলল, 'বসুন।'

বিছানার ওপর অবসন্ন ভাবে চোখ বুজে পড়েছিল পূর্ণিমা। তার সেই নেতিয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গীতে বিমলের বুকের মধ্যেটা আবারও ধ্বক্ ক'রে উঠল। এই ভঙ্গীটা তার বিশেষ পরিচিত।

বেশী দিনের কথা নয়, কয়েকমাস আগেই সে দেখেছে।

পূর্ণমাষ্টার মশাই। তিনিও ঠিক এমনি ভাবে পড়ে ছিলেন।...

পূর্ণিমার বাবাও ওর সঙ্গে সঙ্গে এঘরে এসে বিছানারই একপাশে বসে পড়েছিলেন। হয়ত বা উদ্বেগেই, তাঁর হাঁপানিটা আজ খুব বেড়েছে। হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'বলবেন না মশাই।...এই মেয়ের জন্যেই আমাদের আরও অশান্তি। বড্ড অবাধ্য। একশ বার বলেছি যে শরীরটা আগে। অত ছুটোছুটি পরিশ্রম করিস নি। কী দরকার—যা আছে তাইতেই চালাব। না হয় একবেলা খাবো। কিছুতেই মশাই কোন কথা শুনবে না।...জ্বর হয়েছে তার ওপর বাহাদুরী ক'রে অফিসে যাবার কী দরকার? এমনি ত শরীর তেমন মজবুত নয়।...আর ওর মা-টিও হয়েছে তেমনি। কত করে বললুম যে মেয়েকে অফিসে পাঠিও না। আমাদের বংশে কেউ কখনও মেয়ে পাঠায়

নি রোজগার করতে।···তা নয়—করুক চাকরী। চার হাতে খাবেন মেয়ের রোজগারে।···খাও এখন কত খাবে।···মেয়েকে না খেলে ওঁর শান্তি হবে না!'

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি কথা বলে সাঁই-সাঁই ক'রে হাঁপাতে লাগলেন।

এই ফাঁকে মালুর দিকে চেয়ে বিমল অনেকগুলি প্রশ্ন করল, 'এখন কেমন আছে? অমন ভাবে মাথা ঘুরে উঠল কেন? ডাক্তার কী বললেন?'

এই পরিবেশের মধ্যে বাইরের লোককে এনে বসানোর লজ্জাতেই মালু রাঙা হয়ে উঠেছিল, বাপের কাণ্ডকারখানায় সে রীতিমত ঘেমে উঠল। ঘাড় হেঁট ক'রে পূর্ণিমার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল এতক্ষণ, এখনও মুখ না তুলেই জবাব দিল, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন অতিরিক্ত exhaustion-এই নাকি এমনটা হয়েছে। জ্বরটা কোন চিন্তার কারণ নয়। শরীরটাই নাকি অতিরিক্ত দুর্বল। রক্তশূন্য হয়ে পড়েছে খুব।···ইদানীং মাসকতক ধরেই দিদিভাই বড্ড অবহেলা করছিল শরীরের ওপর—কিছুই প্রায় খেত না। দুধটুধ ত নয়ই, মাছ পর্যন্ত অর্ধেকদিন আমার পাতে তুলে দিত।·· আবার গত পনেরো ষোল দিন যে কী হ'ল—ভাত খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিল বলতে গেলে!'

কথা শেষ ক'রে মালু এবার মাথা তুলল এবং বেশ স্থির দৃষ্টিতেই বিমলের দিকে তাকিয়ে রইল।

অর্থাৎ বয়সে ছোট হলেও মালু বুদ্ধিতে খুব ছোট নয়। দিদিভাইয়ের ভাবান্তরের সঙ্গে আগন্তুক কুশলপ্রার্থীর একটা যোগাযোগ কল্পনা ক'রে নেবার মত বুদ্ধি তার যথেষ্ট আছে।

পূর্ণিমার বাবা এতক্ষণে খানিকটা দম নিতে পেরেছেন—হাঁপাতে হাঁপাতে তিনি আবারও বললেন, 'ভাল নয়, বুঝলেন, একদম ভাল নয়—এইসব সোমত্থ মেয়েদের কাজ করতে পাঠানো।···কী বলব বলুন, নিজে পড়ে আছি রোগে—স্ত্রী-বুদ্ধিতে সংসার চলছে। এক কর্তা মেয়ে আর এক কর্তা তার মা। স্ত্রীবুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী জানেন ত! ভগবান মেরেছেন আমাকে কিনা—নইলে অতবড় উপযুক্ত ছেলে থাকতে—'

কথা শেষ করতে পারলেন না—দু'হাতে বুক চেপে ধরে হাঁপাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

পূর্ণিমা এতক্ষণ চোখ বুজে তেমনি স্থির ভাবে পড়েছিল—যে ভাবে ঘরে ঢুকেই দেখেছিল বিমল। জেগে আছে, কি ঘুমিয়ে আছে বোঝাই যাচ্ছিল না। এইবার সে চোখ খুলল, ক্লান্ত মৃদুকণ্ঠে বলল, 'মালু, বাবাকে ও ঘরে নিয়ে গিয়ে বুকে একটু মালিশ ক'রে দে—কী করছিস দাঁড়িয়ে। দেখতে পাচ্ছিস না!'

মালু অপ্রস্তুত হয়ে তাড়াতাড়ি বাবার পাশে এসে দাঁড়াল। তিনি ইঙ্গিতে ওকে অপেক্ষা করতে বলে খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে একটু নিঃশ্বাসটা সহজ ক'রে নিয়ে মালুর হাত ধরে বিনা প্রতিবাদে ওঘরে চলে গেলেন।

কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই আবার চোখ বুজেছিল পূর্ণিমা।' তেমনি

স্থির—অবসন্নভাব।

বিমল বিছানার ওপর ঝুঁকে পড়ে আস্তে আস্তে ডাকল, 'পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমা আবার চোখ খুলল। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক্—বিমলের চোখে চোখ রাখতে পারল না। ওর হাতটার দিকে চেয়ে বলল, 'বলুন।'

'এখন কেমন বোধ করছ?'

'ভালই। কাল অফিস যেতে পারব।'

'না—এখন তোমাকে অফিস যেতে হবে না। লক্ষ্মী মেয়ের মত দু'চার দিন শুয়ে থাকো দিকি!' বেশ একটু আদেশের সুরেই বলে বিমল।

ওপক্ষ থেকে হয়ত একটা প্রতিবাদ আশা করেছিল বিমল কিন্তু পূর্ণিমা কোন উত্তর দিল না। শুধু অবসন্ন ভাবে আবার চোখ বুজল।

একটু পরে বিমল আবারও আস্তে আস্তে ডাকল, 'পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমার সমস্ত দেহটা একবার শিউরে উঠল কি?

উঠলেও তার কণ্ঠস্বরে অন্তত কোন চাঞ্চল্য ধরা পড়ল না। আগের মতই বললে, 'বলুন।'

'এমন করছ কেন?'

'কী করছি?' বিস্মিত হয়ে দুই চোখ বিস্ফারিত ক'রে তার দিকে তাকায় পূর্ণিমা।

'না খেয়ে খেয়ে এমন ভাবে শরীর পাত ক'রে ফেলছ কেন? আমাকে শাস্তি দেবে বলে?'

উত্তর দিতে গিয়ে হয়ত পূর্ণিমার দুই ঠোঁট কেঁপে উঠতে লাগল। সে প্রাণপণ চেষ্টায় খানিকক্ষণ দাঁত দিয়ে ওষ্ঠাধর চেপে নিজেকে সম্বরণ করল, তারপর শান্ত কণ্ঠেই বললে, 'আপনার সম্বন্ধে ও শব্দটা পর্যন্ত কল্পনা করাও আমার কাছে চরম ধৃষ্টতা—তা ত আপনি জানেনই। অত দুঃসাহস আমার নেই।'

বিমল এর উত্তরে ঈষৎ উত্তেজিত ভাবেই কী একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু মালু এসে পড়ায় থেমে গেল। মালু সরাসরি বিমলকে প্রশ্ন না করে পূর্ণিমার মুখের ওপর ঝুঁকে পড়ে বললে, 'মা বলছেন একটু চা ক'রে দিতে। দেব দিদিভাই?'

'দিবি?' উৎসুক ব্যগ্রভাবে পূর্ণিমা তাকায় মালুর দিকে, 'পারবি?'

'কেন পারব না। বা রে!'

বিমল কী একটা বাধা দিতে গিয়েও চুপ ক'রে গেল।

মালু চলে গেল—সম্ভবত চা করতেই। দুজনেই চুপ ক'রে রইল কিছুক্ষণ। তার পর পূর্ণিমা আস্তে আস্তে—তেমনি বিমলের জামার হাতটার দিকে চেয়েই বললে, 'আপনি যে আমার বাড়ীতে আসবেন—আমি কিন্তু আশা করি নি!'

'কেন?' বিমল আস্তে আস্তে পাশে-পড়ে-থাকা ওর বাঁ হাতটার ওপর নিজের একটা হাত রাখে। সামান্য একটু কেঁপে ওঠে পূর্ণিমা—কিন্তু আর

কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ পায় না ওর নিথর হয়ে পড়ে থাকার ভঙ্গীতে।

একটু পরে বিমল বলে, 'জানো—আমি পাস করেছি। আজই খবরটা এল—অথচ তুমি নেই।'

এই প্রথম একটা রক্তাভা খেলে গেল পূর্ণিমার বিবর্ণ পাণ্ডুর মুখে। খুশী হয়ে চোখ তুলে বলল, 'এ আমি জানতুম। আমি ঠিক জানতুম!'

'তুমি খুশী হয়েছ পূর্ণিমা?' হাতটার ওপর একটু চাপ দিয়ে প্রশ্ন করে বিমল।

'আমি?' আবার স্তিমিত হয়ে যায় ওর মুখ-ভাব। ছোট্ট একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে, 'হয়েছি বৈকি! আমার অনুমান ঠিক হয়েছে—এ আত্মপ্রসাদ কি কম!'

মালু এসে ঢুকল চা নিয়ে। চা আর একটি রেকাবীতে খান-দুই বিস্কুট। টেবিলের অভাবে আর একটা চেয়ারের ওপরই নামিয়ে—চেয়ারখানা টেনে দিতে দিতে সে বললে, 'আনাড়ির হাতের চা, খেতে পারলে হয়!'

বিমল হেসে বললে, 'আমরা পেতলের কলসীর চা খাই। অত খারাপ চা তুমি নিশ্চয়ই করো না।'

পূর্ণিমা ওর চায়ের কাপটার দিকে তাকিয়ে কেমন একরকম করুণভাবে বললে, 'আপনি আজ প্রথম আমার বাড়ী চা খাচ্ছেন—অথচ আমি নিজে ক'রে দিতে পারলুম না!···সত্যি, এত বিশ্রী লাগছে!'

'তাতে খুব ঠকলুম ব'লে ত মনে হচ্ছে না। মালু ভালই চা করেছে।' জোর ক'রে হাল্কা হয় বিমল। তারপর বলে, 'তুমি ভাল হও, তোমার হাতেও খাবো। ভয় কি!'

'হ্যাঁ, আপনি আবার এসেছেন!'

পূর্ণিমা আর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলে।

'তার মানে! এখন ত রোজই আসতে হবে। তোমার ডাক্তার ওষুধ, এদের বাজার হাট—আমি না এলে এসব করবে কে?'

নিজের কানকে যেন বিশ্বাস করতে পারে না পূর্ণিমা। খানিকটা অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বলে, 'না না, মিছিমিছি আপনি এত ব্যস্ত হবেন না। এ আমার কিছুই নয়। অফিস না যাই—ডাক্তারখানায় অন্তত যেতে পারব। ওপরের ভাড়াটেরা দেখাশুনা করেন—বাজার হাটের জন্যও ভাবনা নেই—'

মালু মৃদু ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে, 'খুব হয়েছে দিদিভাই, তোমার আর বাহাদুরীতে কাজ নেই। জানেন ডাক্তার কি বলেছে? পনেরো দিন এখন বিছানা ছেড়ে ওঠাই বারণ ওর। এমন কী বেশী কথাবার্তা কইতেও নিষেধ ক'রে গেছেন!'

বিমল কথাটা শুনেই সোজা উঠে দাঁড়াল।

'ইস্। আমারই বড় অন্যায় হয়ে গেছে মালু, মিছিমিছি তোমার দিদি-ভাইকে কতখানি বকালুম!'

পূর্ণিমা ব্যাকুল হয়ে বলল—'না-না—তেমন কিছু নয়। কী পাগলামি

করছিস মালু !...আর একটু বসুন না। আমি ত বেশী কথা কইছি না—'

বিমল ঘাড় নেড়ে বললে, 'তুমি চুপটি ক'রে শুয়ে থাকো। আমি আবার কাল ঠিক আসব!'

পূর্ণিমা আর কিছু বলার আগেই বিমল একেবারে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

আসার আগে বিমল ওদের ডাক্তারের নাম-ঠিকানা জেনে এসেছিল। অবশ্য তখন আর সময় ছিল না। কারণ নিখিলদের বাড়ী যেতেই হবে সেদিন —পরের দিন ওর কী একটা পরীক্ষা।

কোন মতে রাতটা কাটিয়ে পরের দিন সকাল বেলাই সে এ পাড়ায় এসে ডাক্তার বাবুটির সঙ্গে দেখা করলে।

ডাক্তারবাবু একটু বিস্মিত হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'মিস পূর্ণিমা রায়? ও আমাদের বিপিনবাবুর মেয়ে!...হ্যাঁ।...তা আপনি ওর কে হন?'

অকারণেই বিব্রত হয়ে ওঠে বিমল। বার-দুই ঢোঁক গিলে বলে, 'আমি ওর সঙ্গে এক-অফিসে কাজ করি। বন্ধু!'

'অ।...বড় স্ট্রেঞ্জ কেস্ মেয়েটির। জ্বরটা কিছু নয়। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ইচ্ছে ক'রে নিজেকে ক্ষয় ক'রে এনেছে। Case of extreme exhaustion. কতদিন ধরে যে ভূতের মত খেটেছে অথচ শরীরের কোন যত্ন নেয় নি, তার ঠিক নেই। এনিমিকও খুব। হার্টটার সাউণ্ডও মোটে ভাল নয়। ভাল নারিশমেণ্ট দরকার। আমি যাব একবার। একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে!...'

তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'কাল ওকে দেখে আমার মনে হচ্ছিল মেয়েটি বোধ হয় কোন মেণ্টাল শক্ পেয়েছে, খুব প্রচণ্ড। ওর যেন বাঁচবার ইচ্ছাও নেই তেমন!'

বিমল উঠে দাঁড়াল।

'তাহ'লে ওর পথ্য-টথ্য?'

'ফলের রস, গ্লুকোজ, দুধ—অল্প অল্প, এই-ই চলুক আপাতত। জ্বর না থাকলে ভাতও দিতে পারেন। তারপর—আমি ত যাচ্ছি, দেখে ব্যবস্থা করব।'

ওখান থেকে বেরিয়ে বিমল বাজারে গেল। কাল সত্যশরণবাবুর কাছ থেকে কয়েকটা টাকা চেয়ে এনেছে সে—আজকের প্রয়োজন বুঝেই। ঘুরে ঘুরে এক-রাশ ফল কিনলে—সেই সঙ্গে একটা ভাল ফুড। এদের জন্য কিছু বাজার করলে।...বাস্তবিক নিজের আচরণে নিজেই যৎপরোনাস্তি বিস্ময় বোধ করছিল বিমল। কোনদিন যে কোন একটি অনাত্মীয় মেয়ের সংসারের জন্য সে বাজার করবে—মাত্র কয়েকমাস আগেও এটা ছিল ওর স্বপ্নের অগোচর!

মালু ওকে দোর খুলে দিয়ে পেছনে মুটে দেখেই চেঁচামেচি ক'রে উঠল।

'এ কি! এ সব কী কাণ্ড করেছেন আপনি—না...না, এসব কিন্তু আপনার ভারি অন্যায়।'

'কে রে মালু।' হাঁপাতে হাঁপাতে বিপিনবাবুও বেরিয়ে এলেন।

'সত্যিই ত। না না—এসব কী দরকার।...দেখুন—'

আরও কী বলতে গিয়ে কাশির ধমকে চুপ ক'রে গেলেন তিনি।

বিমল হাত জোড় ক'রে বললে, 'আমিও আপনার সন্তানের মতই। কেন মিছিমিছি সঙ্কোচ করছেন। পূর্ণিমা আমার বন্ধু—ও ভাল হয়ে উঠুক, না হয় আমাকে দামই বুঝিয়ে দেবে। তাছাড়া ধরুন, যে-কোন পরকেই ধরে ত বাজার পাঠাতে হ'ত আপনাদের—আমি করলেই বা আপত্তি কি?'

ওর বিনীত ভঙ্গীতে বিপিনবাবু আর কিছু বলতে পারলেন না। পূর্ণিমার মাও এসে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি সেকেলে মানুষ, সোজাসুজি একজন পরের ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা কইতে তাঁর সঙ্কোচে বাধে। তিনি স্বামীকে উদ্দেশ করে বললেন, 'শোন দিকি কেমন মিষ্টি কথা, কান জুড়িয়ে যায়। ঐ জন্যে বলে আপনার চেয়ে পর ভাল। পেটের ছেলেও ত রয়েছে—কাল থেকে একবার খবর নিতেও এল না!'

মুটে রান্নঘরের রোয়াকে জিনিসগুলো নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। তার পয়সা চুকিয়ে দিয়ে বিমল আগের দিনের মতই পূর্ণিমার বিছানার পাশে চেয়ারখানা টেনে নিয়ে বসল।

পূর্ণিমা এতক্ষণ একান্ত ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত দৃষ্টি মেলে দোরের দিকেই তাকিয়ে ছিল। বিমল এসে বসতেই যেন ফেটে পড়ল সে। চাপা কঠিন কণ্ঠে বললে, 'এসব কি করছেন বলুন ত? কেন করছেন? আমাকে বাঁচিয়ে আপনার লাভ কি?...এসব সামান্য কথা নিয়ে—সামান্য জীবন নিয়ে আপনি মাথা ঘামাবেন না। আপনার বিরাট কর্মক্ষেত্র সামনে পড়ে আছে—বিপুল দায়িত্ব। ...আমাদের জীবন ঠিকই কাটবে—সহস্র মেয়ের জীবন যেমন এই শহরে কাটছে।...আপনি চাকরি ছেড়ে দিন, চলে যান আপনার কর্মক্ষেত্রে। দোহাই আপনার! আপনি আর পিছন ফিরে তাকাবেন না—কোন দিকে, কারুর দিকে।'

বহুদিনের সঞ্চিত ক্ষোভ ওর, বহুদিনের ব্যথা। কঠিন কণ্ঠও তাই এক-সময় অসহায় কান্নায় ভেঙে পড়ে, দুই চোখের কূল প্লাবিত ক'রে নামে অশ্রুর বন্যা।

স্থির হয়ে বসে থাকে বিমল। তারপর আশ্চর্য শান্ত কণ্ঠেই উত্তর দেয়, 'হ্যাঁ তাই যাবো। কোনদিকেই তাকাব না। কিন্তু তার আগে তোমার অন্তত ভাল হয়ে ওঠা দরকার পূর্ণিমা!'

'আমি? আমার সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক! আপনার মহৎ জীবনে আমার মত মেয়ের স্থান কোথায়?'

অশ্রুবিকৃত কণ্ঠেও ব্যঙ্গের সুর ফোটে।

'সম্পর্ক এখন নেই, কিন্তু সেই জন্যেই ত এত ব্যস্ত হচ্ছি। তোমার ওপর একটা অধিকার, তোমার সঙ্গে চিরকালের একটা সম্পর্কই যে দরকার। না—না, বাধা দিও না, বলতে দাও। সেদিনই ত তোমাকে বলেছি, একা কোন

ভাল কাজই করা যায় না। মানুষ একা বড় অসহায়, বড় দুর্বল। সেই জন্যেই আমাদের শাস্ত্রে সস্ত্রীক ধর্ম-আচরণের ব্যবস্থা—। তান্ত্রিক সাধকরা সাধনা-সঙ্গিনীকে বলেন শক্তি, জানো ত। উপযুক্ত শক্তি না পেলে সিদ্ধির আশা যে দুরাশা!'

পূর্ণিমা অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে প্রায় ফিস্ ফিস্ ক'রে বলে, 'কেন আপনি সেদিন থেকে আমাকে এমন ভাবে দগ্ধাচ্ছেন বলুন ত! ওসব স্বপ্ন-কল্পনা আমার জন্য নয়…এ কী আপনি কিছুতেই বুঝবেন না? আপনার কর্তব্য আপনার কর্মক্ষেত্র বৃহৎ, বিপুল। ওসব আমি বুঝি না। আমি বুঝি আমার এই ছোট্ট পরিসরে ছোট কর্তব্য। আপনার কাছে হয়ত এসবের মূল্য নেই—কিন্তু আমার কাছে আমারই মুখ-চাওয়া বৃদ্ধ অশক্ত মা-বাবার প্রতি কর্তব্য আগে।'

'কে বলেছে সে কর্তব্যে আমি বাধা দিতে যাচ্ছি।…তুমি উত্তেজিত হয়ো না পূর্ণিমা, তোমার শরীর খারাপ। এসব কথা তোমাকে বলা হয়ত তোমার এ অবস্থায় উচিত হচ্ছে না—কিন্তু না বললেও নয়। তুমি অকারণে মন খারাপ ক'রো না। তুমি আমার কাছে সব কর্তব্যের চেয়েও বেশী মূল্যবান। এই কথাটি আজ শেষবারের মত জেনে রাখো—বৃথা বাজে কথা নিয়ে মন খারাপ ক'রো না।'

আর একটু কাছে সরে আসে বিমল। পূর্ণিমার একটি শিথিল হাত নিজের হাতের মধ্যে তুলে নিয়ে আরও আস্তে, প্রায় চুপি চুপি বলে, 'আমাদের বিয়ে হ'লেই যে তোমাকে এই কর্তব্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবো—এমন কথা ভাবছ কেন? বিয়ে হবে আমাদের কিন্তু যতদিন না তোমার এই দায়িত্ব শেষ হচ্ছে ততদিন তোমাকে আমি দাবী করব না, কথা দিচ্ছি। তুমি যেমন চাকরী করছ, এখানে আছ, তেমনিই থাকবে। তোমার এখানকার কাজ শেষ হবার আগেই যদি আমার বিদেশ-যাত্রার ডাক আসে, আমার কর্মক্ষেত্রে আমি চলে যাবো কিন্তু তখন আমার সান্ত্বনা থাকবে—যেখানেই থাকো তুমি—তুমি আমারই আছ, তোমার শুভ কামনা, তোমার ভালবাসা এখন থেকেই আমাকে শক্তি জোগাবে, কর্ম-প্রেরণা জোগাবে।'

অবিশ্বাস্য—অবিশ্বাস্য। বার বার মনে মনে উচ্চারণ করতে থাকে পূর্ণিমা। কল্পনাতীত সৌভাগ্য এমন ক'রে মানুষের জীবনে আপনা থেকে আসে নাকি কখনও? এ নিশ্চয়ই ও ভুল শুনছে। এ ওর ব্যাধিরই একটা প্রকাশ—বিকারের ঘোর।

'অবশ্য আমি চেষ্টা করব তোমাকে সেখানেই কোন কাজ দিয়ে নিয়ে যেতে। যদি সত্যশরণ বাবুদের ইস্কুলেই যাই—ওখানে একটা মেয়ে ইস্কুল খোলবারও কথা আছে—সে সময় হয়ত তোমাকেও নিয়ে যেতে পারব। তোমার বাবা মা না হয় সেখানে তোমার কাছে গিয়েই থাকবেন। এ বাড়ীর বাকীটুকু ভাড়া দিলে মালু বোর্ডিং-এ থেকেই পড়তে পারবে।

পূর্ণিমার বিহ্বল দৃষ্টির দিকে তাকিয়ে বিমল বলে, 'অবাক হয়ে যাচ্ছ, না? ভাবছ এত কথা কবে ভাবলুম?…এই কদিন যে দিনরাত শুধু এই সব

কথাই ভেবেছি পূর্ণিমা। তুমি আমাকে যতটা হৃদয়হীন ভেবে মনে মনে আমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করছিলে, সত্যিই আমি ততটা নই।…তোমাকে এই ভাবে ভাসিয়ে দিয়ে গিয়ে আমি কোন কাজই যে করতে পারতুম না।…না, তোমাকে আমার চাই।…অনেক কাজ পূর্ণিমা, অনেক স্বপ্ন আমার। যে দিকে তাকাই দেখি অকারণ ঔদ্ধত্য, পরমত-অসহিষ্ণুতা—আর জ্ঞান ত দূরের কথা, জ্ঞানের আগ্রহেরও অভাব! আমরা দুজনে মিলে সারা জীবনে যদি দুটো চারটে ছেলেমেয়ের মনেও যথার্থ শিক্ষার আগ্রহ জাগাতে পারি—যে শিক্ষা দল মত স্বার্থ সকলের ওপরে মনুষ্যত্বে পৌঁছে দেয় মানুষকে, যদি পারি দুচার-জনকেও সেই মনুষ্যত্বের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে—তবেই আমাদের স্বপ্ন সফল হবে, আমাদের জীবন সার্থক হবে পূর্ণিমা।'

পূর্ণিমার চোখ দুটি এইসব কথা শুনতে শুনতে কখন আবার নিমীলিত হয়ে গেছে; সে সমস্ত সত্তা দিয়ে, বাকী সবকটি ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন অনুভব করছে এই অচিন্তিত-পূর্ব সৌভাগ্যের সুখছবি। তার দুই চোখের কোল বেয়ে এখনও জল নামছে, তবে তা যে আনন্দেরই অশ্রু—একথা তার মুখের দিকে চাইলে বুঝতে অসুবিধা হয় না।

মালু ঢুকল ডিম ভাজা ও চা নিয়ে।

বিমলের বসে থাকার ভঙ্গী, তার চোখে সুদূরের স্বপ্ন এবং পূর্ণিমার নিমীলিত চোখে অশ্রুর ঝরণা দেখে কী বুঝল সে তা সে-ই জানে। কিন্তু কোন প্রশ্ন করল না, সামান্য একটু হাসির আভাস মাত্র ঠোঁটের কোণে লুকিয়ে নিয়ে আবার বেরিয়ে গেল সে।

পূর্ণিমা চোখ খুলল এবার। আঁচলে দুই চোখ মুছে চুপিচুপি বললে, 'একটু চা খাও। আমার জন্য অনর্থক সকাল থেকে অনেক ছুটোছুটি করেছ!'

বিমল তখনও বোধকরি তার নিজের আঁকা ভবিষ্যতের ছবিতেই তন্ময় হয়েছিল, এবার যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠল।

'হ্যাঁ, এই যে নিই।' তাড়াতাড়ি মুখ তুলে মালুকে না দেখতে পেয়ে অপ্রতিভ ভাবে চায়ের পেয়ালাটা তুলে নিয়ে বললে, 'ইস, মালু কি মনে করলে!'

পূর্ণিমা সে কথার জবাব দিলে না। বিমলের জামার প্রান্তটা নিয়ে দুটো আঙুলে নাড়া চাড়া করতে করতে বললে, 'জানো, এই কদিন অহোরাত্র ভেবেছি কী ক'রে তাড়াতাড়ি মরতে পারি।…আজ এখন মনে হচ্ছে যেমন ক'রেই হোক বাঁচা দরকার। অন্তত তোমার স্বপ্ন সফল করতেও।'

স্নিগ্ধ-দৃষ্টিতে ওর দিকে চেয়ে বিমল বললে, 'এই ত লক্ষ্মী মেয়ের মত কথা।… এখন একটু ভাল করে বিশ্রাম নিয়ে আর ভাল ক'রে খেয়ে চটপট সেরে ওঠো দিকি।'

মালু বোধকরি বাইরেই ছিল কোথাও। ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনি একটু ভাল ক'রে বলে যান। কিচ্ছু খেতে চায় না…আপনি ত একরাশ ফল কিনে এনেছেন—খাবে কে?'

'আচ্ছা, আচ্ছা হয়েছে। তোকে আর বেশী গিন্নিপনা করতে হবে না। যা।' মৃদু ধমক দেয় পূর্ণিমা।

বিমল চায়ের পেয়ালাটা নামিয়ে রেখে একেবারে উঠে দাঁড়ায়। হাতের ঘড়িটার দিকে ওর নজর পড়ে গেছে।

'চলি এখন। অফিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে।'

বহুপথ ফিরে গিয়ে আবার বেরোতে হবে। সে রাস্তায় পড়ে সেই খর রৌদ্রের মধ্যেই দ্রুত হাঁটতে শুরু করে।

পাও নাই পরিচয়

উৎসর্গ

শ্রীমান সুভাষচন্দ্র ঘোষ (চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য)

কল্যাণীয়েষু—

॥ ১ ॥

ব্যক্তিগত আলাপ—পুরাতন পরিচয় ঝালিয়ে নেবার স্থান-কাল সেটা নয়।

রোগিণী যেখানে অসহ্য যন্ত্রণায় ছটফট করছে, বড় ডাক্তার এসে তাঁর যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছেন, জল ফুটছে ইলেকট্রিক কেটলিতে—অস্ত্রোপচারের সব আয়োজন প্রস্তুত, এখনই রোগিণীকে এ যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে না পারলে, হয়তো একেবারেই মুক্তি দিতে হবে—এই জীবন বা দেহের বন্ধন থেকে—সেখানে ঘরে উপস্থিত সকলের সমস্ত মনোযোগ সেই দিকেই যাওয়া উচিত ছিল।

দময়ন্তীর তা গিয়েও ছিল।

সে ঘরে ঢোকা মাত্র তার কাজে লেগে গেছে।

ডাঃ মিসেস সেনের সঙ্গে দীর্ঘ দিন কাজ করছে সে, অনেক 'কেস' করেছে তাঁর সঙ্গে—কী কী তাঁর প্রয়োজন, কোন্‌টার পাশে কোন্‌টা কিভাবে পর পর সাজিয়ে রাখতে হবে—এসব তার জানা হয়ে আছে।

সেই ভাবেই দ্রুত এবং নিপুণ হাতে যন্ত্রপাতি সাজাচ্ছিল সে, সেই দিকেই মন ছিল তার।

অরবিন্দ কখন ঘরে এসে ঢুকেছে, তা টেরও পায় নি।

একেবারে ঠিক পিছনে একটা দ্রুত নিঃশ্বাস নেবার শব্দে চমকে ঘাড় ঘুরিয়ে প্রথম দেখেছে সে—এবং চিনতে পেরেছে।

তবু সে চেনার কোন স্বীকৃতি দময়ন্তীর মুখে ফোটে নি।

শুভ্র পাথরের মতো মুখে তার হয়তো ঈষৎ রক্তিমাভা দেখা দিয়েছে—কিন্তু সেও, কয়েক মুহূর্তের বেশি, তা স্থায়ী হয় নি।

ভাবলেশহীন মুখের একটি শিরাতেও কোন আবেগের চিহ্ন দেখা যায় নি, সামান্য মাত্র ভ্রূকুটিও ফুটে ওঠে নি মর্মরমসৃণ ললাটে।

এতখানি আত্মদমনের শিক্ষা অরবিন্দর নেই।

সে নাম-করা ব্যারিস্টার।

বিপুল পশার তার।

সে কোন পক্ষে দাঁড়িয়েছে শুনলে, অপর পক্ষ ত্রস্ত হয়ে ওঠে—কিন্তু সে অন্য কথা।

সেখানে কখন কি মুখের ভাব ফোটাতে হবে—কখন কি অভিনয় করা দরকার—সে-শিক্ষা আদালতেই হয়, সেখানেই সে পাঠ নিয়েছে সে, দীর্ঘ কাল ধরে অভ্যাস করতে করতে মজ্জাগত হয়ে গেছে।

এ পাঠ—মনোভাব দমনের এই আশ্চর্য শিক্ষা—এ অন্য জিনিস, জীবনের

পাঠশালায় ভাগ্যের হাতে মার খেতে খেতে এর পাঠ নিতে হয়, দময়ন্তী যা নিয়েছে।

এ রহস্য অরবিন্দর জানবার কথা নয়।

তাই, অতর্কিতে পরিচয় অজ্ঞাত রাখার প্রয়োজন সত্ত্বেও—আপনিই মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল—'টুটু ?···এ—অশোকা তুমি ?'

এবার একটু ভ্রূকুটি দেখা দিল দময়ন্তীর মুখে, বিরক্তিমিশ্রিত বিস্ময়, সে চকিতে একবার অরবিন্দর চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'মাপ করবেন, আপনার বোধহয় একটু ভুল হচ্ছে। আপনি কাকে মীন করছেন, তা ঠিক জানি না। আমি দময়ন্তী লাহিড়ী।'

বোধ করি এই চড় খাওয়ারই প্রয়োজন ছিল—অরবিন্দর সম্বিৎ ফিরিয়ে আনতে, স্থান-কাল সম্বন্ধে সচেতন করতে।

সে সঙ্গে সঙ্গেই বলে উঠল, 'ওঃ !···সরি।···ক্ষমা করবেন।···আশ্চর্য সাদৃশ্য বলেই—'

শেষের দিকে কথাগুলো স্বগতোক্তির মতোই দাঁড়াল।

শেষও করল না অরবিন্দ মল্লিক।

প্রয়োজনও ছিল না শেষ করার।

কারণ ততক্ষণে দময়ন্তী আবার নিজের কাজে—ব্যস্ত শুধু নয়, তন্ময় হয়ে গেছে।

তার কান ও চোখ মিসেস সেনের তাঁবে চলে গেছে—কে একজন অপরিচিত ব্যক্তি সামান্য ভুলের জন্য কী ক্ষমা প্রার্থনা করছে বা যুক্তি দেখাচ্ছে, সেদিকে কান বা মন দেওয়ার অবসর নেই তখন।

হয়তো ইচ্ছাও নেই।

এমন ভুল তো হয়েই থাকে।

অরবিন্দও আর সে ঘরে দাঁড়াল না।

বেরিয়ে এসে একবার—ইতিমধ্যেই বহুবার-ঘাম-মুছে-ভিজে-যাওয়া রুমাল নিয়ে কপালটা মুছে নিয়ে, যেন ব্যাকুল ভাবে চারিদিকে তাকাল।

করিডরে কেউ নেই, নিচে ল্যাণ্ডিংয়ে ভৃত্যশ্রেণীর কয়েকজন পাংশুমুখে দাঁড়িয়ে আছে—মালেকার কী খবর জানবার জন্যে, কোন প্রয়োজন হতে পারে হয়তো—সে জন্যেও।

অরবিন্দর মুখের বিবর্ণতা ও স্বেদপ্রাচুর্যকে মালেকার সংকট অবস্থারই চিহ্ন বলে ধরে নিয়ে, তাদের একজন ব্যস্ত হয়ে উঠে আসছিল—অসহিষ্ণুভাবে হাতের ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত ক'রে সে এবার দ্রুত গিয়ে নিজের স্টাডিতে ঢুকল।

কতকটা ওদের কৌতূহলী দৃষ্টি থেকে অব্যাহতি পেতেই।

ঘরে ঢুকে অবসন্নভাবে নিজের চেয়ারটাতে বসে পড়েছিল। মিনিট-কতক সেই ভাবেই বসে রইল।

হাতটা কাঁপছে অল্প অল্প, পায়েরও জোরটা আশ্চর্যরকম ভাবে কমে

গেছে।···ড্যামড্ ন্যুইসেন্স!

অসহায়ভাবে ওপাশের গা-আলমারিটার দিকে চাইল একবার।

ওর মধ্যে বলাধানের উপকরণ প্রস্তুত আছে—দেহে এবং মনে এক নিমেষে বল এনে দিতে পারে এমন উগ্রবীর্য বিলিতি সুরা।

ডিকেন্টার ভর্তি আছে।

বিলেত থেকেই আনানো, এম্‌ব্যাসীর স্বাক্ষরিত। হাইকমিশনারের একটা কাজ ক'রে দিয়েছিল একবার, তারই পুরস্কারস্বরূপ প্রতি বছর ক্রীসমাসে এক কেস ক'রে উপহার পাঠান তাঁরা।

কিন্তু সে খেতে গেলে আবার উঠতে হয়।

ততটুকু শক্তিও যেন আর নেই।

প্রয়োজনও নেই অবশ্য।

অরবিন্দর মধ্যেকার দুঁদে ব্যবহারজীবী নিজেকেই ভ্রূকুটি ক'রে উঠল।

জোর ক'রেই হাতে জোর এনে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়াল।

ক'দিন ধরেই প্রয়োজনটা অগ্রগণ্য হয়ে উঠেছে বলে, টেবিলে কাঁচের নিচে বড় বড় হরফেই নম্বরটা লিখে রেখেছে অরবিন্দ।

দিল্লীর সব থেকে বিখ্যাত ও বিশ্বস্ত নার্সেস ইউনিয়নের টেলিফোন নম্বর।

মুখস্থও হয়ে গেছে প্রায়, একবার মাত্র সেদিকে চোখ বুলিয়ে নিয়েই ডায়াল করল নম্বর।

ওদিকে যিনি ধরলেন তাঁর কণ্ঠস্বরও পরিচিত।

'মিসেস হাস্‌কার? নমস্তে জী। ম্যয় মিঃ মল্লিক বোল রহা হুঁ—রিঙ্ক্ রোড সে।···জী, নেহি নেহি···উ তো ঠিক হ্যায়—বাত হ্যায় দুসরী।'

তারপর এক মুহূর্ত একটু থেমে ইংরিজিতে বলল আবার, 'আচ্ছা এই নার্সটি—কি যেন নাম—মিস লাহিড়ী—এঁকে বদলে দেওয়া যায় না? আর কেউ? নো নো, আমি এঁর এফিসিয়েন্সীতে কোন সন্দেহ প্রকাশ করছি না। জাস্ট একটা পার্সোনাল কারণ। কিছু করা যায়? আমি এঁর আজকের ফী দেব ঠিকই—এখনই আর কাউকে পাঠানো যায় না?'

ওদিক থেকে মিসেস অমৃত হাস্‌কারের পরিষ্কার কণ্ঠ ভেসে আসে, 'ইমপসিবল্। আপনি দ্য বেস্ট চেয়েছেন, আমিও দ্য বেস্ট পাঠিয়েছি। তাছাড়া ডাঃ মিসেস সেন ওকেই পছন্দ করেন সব চেয়ে বেশি।···আর এতক্ষণ তো বোধহয় অপারেশন শুরুই হয়ে গেছে, আপনার মুখে যা ক্রিটিক্যাল অবস্থা শুনেছি।···মোরওভার, ঠিক এই মুহূর্তে আর কেউ নেইও। একজনও নেই। সরি!···যদি বলেন তো কাল থেকে অন্য কাউকে ডেপ্যুট করতে পারি।'

'না, তার প্রয়োজন হবে না। ধন্যবাদ। প্রচুর ধন্যবাদ।'

অবসন্নভাবে যন্ত্রটা রেখে দিল অরবিন্দ মল্লিক, সুপ্রীম কোর্টের বিখ্যাত

ব্যারিস্টার-য়্যাট-ল।

টেলিফোন-যন্ত্রে ওপাশে যিনি কথা কইছেন তাঁর মুখভাব দেখার কোন উপায় নেই, নইলে অরবিন্দ দেখতে পেত—সন্দেহে ও কৌতূহলে মিসেস হাসকারের দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে, মুখভাব বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে।

কারণ এ বাড়িতে যাওয়ার জন্য তিনি যখন মিস লাহিড়ীকে ফোন করেন—তখন সে-ও ঠিক এইভাবেই বলেছিল, 'আর কাউকে পাঠানো যায় না ওখানে? না না, অন্য কোন কারণ নেই, জাস্ট একটা পার্সোনাল—কী বলব—ফ্যান্সি! আমার, আমার ঠিক যেতে ইচ্ছে করছে না এখন, একটু টায়ার্ড লাগছে।'

মিসেস হাসকারও এখনকার মতোই উত্তর দিয়েছিলেন, 'সরি, আর কেউ নেই, মানে পাঠানোর মতো একজনও খালি নেই। তুমি তো জানো, ডাঃ সেনরা দুজনেই এ ব্যাপারে বড় ফ্যাস্টিডিয়াস্, ওঁরা ইনএফিসিয়েণ্ট নার্স একদম সইতে পারেন না। বিশেষ তোমাকেই মিসেস সেনের পছন্দ বেশী। তাছাড়া, এ কেসও খারাপ—ওঁরা চেয়েছেন রেসিডেণ্ট নার্স একজন—দ্য বেস্ট। সেই জন্যেই তোমাকে—। যদি বল তো কাল থেকে না হয় অন্য কাউকে ডেপ্যুট করতে পারি—'

দময়ন্তী উত্তর দিয়েছিল 'নো, থ্যাঙ্কস্। তার দরকার হবে না। ধন্যবাদ। প্রচুর ধন্যবাদ।'

॥ ২ ॥

সন্দেহ যেটুকু থাকতে পারত—'লাহিড়ী' পদবীতেই সেটুকু কেটে গেছে।

অশোকাদের পৈতৃক পদবী লাহিড়ীই। আর…অনুতাপ-তিক্ত একটা অতি-প্রচ্ছন্ন হাসি ফুটে ওঠে অরবিন্দর মুখে—সে পদবী তো বদলাবার কোন কারণও ঘটে নি।

পদবীর পরিবর্তন হয় যে অনুষ্ঠানের দ্বারা—গোত্রান্তর ঘটে, সে অনুষ্ঠান ওর জীবনে তো হয়েই ওঠে নি।

নামটা পালটেছে অশোকা—পদবীটার মায়া কাটাতে পারে নি।

কে জানে, দময়ন্তী নামটাও পুরনো কিনা।

ওর ঠাকুর্দার দেওয়া কী একটা আলাদা নাম ছিল বটে—কয়েকবারই বলেছে অশোকা—অরবিন্দই অত খেয়াল করে নি তখন।

অশোকাই। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

এত ভুল হবার কারণ ঘটে নি।

অরবিন্দ মল্লিকের এত স্মৃতিভ্রংশ ঘটবে না নিশ্চয়ই, তাহ'লে আর আইনের ব্যবসা ক'রে লক্ষ লক্ষ টাকা উপার্জন করতে পারত না।

সুপ্রীম কোর্টের অন্য ব্যারিস্টার ও য়্যাডভোকেটরা এই জন্যেই আরও ঈর্ষিত।

মল্লিকের চোখে কিছুই এড়ায় না, কিছুই ভোলে না সে। ছোটখাটো কোন তথ্য তার স্মৃতি থেকে বিচ্যুত হয় না।

এক্ষেত্রে তো সে প্রশ্নও ওঠে না।

পাঁচ বৎসর ঘর করেছে একত্রে।

তার আগে প্রায় এক বৎসরের পূর্বরাগ—তখনও দিনরাতের বেশ কয়েক ঘণ্টা একসঙ্গে কাটত।

স্বামী-স্ত্রীর মতো।

মতো কেন—স্বামী-স্ত্রীই।

শুধু মন্ত্রটাই পড়া হয় নি। কিংবা রেজিস্ট্রারের খাতাতেও নাম লেখানো হয় নি।

হয় নি যে—সেও অশোকারই অনুগ্রহ। দয়ার দান বলতে হবে।

তার প্রতিদানে অরবিন্দই চরম বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।

অমার্জনীয় অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।

অরবিন্দ যা করেছে—ভদ্রসমাজে কাউকে বলার মতো নয়।

সে কথা শুনলে, আজ যারা সমাদরে ঘরে ডাকে, সামাজিক অনুষ্ঠানে অগ্রগণ্য অধিকার দেয়—তারাই কুষ্ঠরোগীর মতো পরিহার করবে।

সেখানেও অনুগ্রহই করেছে অশোকা!

নীরব উপেক্ষায় সরে গেছে শুধু অরবিন্দর জীবন থেকে, অপদার্থ ক্রিমিকীট ভেবে। ভদ্রকন্যার ক্রোধ বা প্রতিহিংসার অযোগ্য ভেবেই ক্ষমা ক'রে গেছে।

কোন গোলমাল করে নি, অরবিন্দকে অপদস্থ করার চেষ্টা করে নি—নালিশ-মকদ্দমা তো নয়ই।

ইচ্ছে করলেই করতে পারত। বিস্তর সাক্ষী ছিল তাদের জীবনযাত্রার।

অত কিছুও করতে হ'ত না—দিল্লীতে এসে যথাস্থানে এই তথ্যটুকু প্রকাশ করলেই—এই সুন্দরী স্ত্রী, এই বিপুল প্র্যাকটিস,—প্রাসাদতুল্য এই বাসভবন, ঐ বড় বড় গাড়ি—সর্বোপরি এই মর্যাদা, সমস্ত রাজনৈতিক দলই আজ তাকে দলে টানতে চাইছে, নির্বাচন, সমুদ্রে পাড়ি জমাবার জন্যে—এ সমস্তই স্বপ্নের মতো ভোজবাজীর মতো কল্পনার শূন্য দিগন্তে মিলিয়ে যেত।

এ তো অশোকা তাকে দানই করেছে বলতে হবে।

অরবিন্দ মল্লিক উঠে আলমারি খুলে ট্রে-সুদ্ধ টেবিলে নামাল।

ডিকেণ্টার, বিলিতি ছ'টা গ্লাস এবং সামান্য কিছু নিমকি বিস্কুট।

কোন বিশেষ মক্কেল যখন নিভৃতে পরামর্শ করতে আসে—সাহেব-সুবো বা ইয়োরোপীয়ানাধিক পাঞ্জাবী সাহেবরা, তখন এই উপায়েই আপ্যায়ন করে তাদের।

হাত দুটো এখনও কাঁপছে।

নার্ভস্ স্টেডী করা দরকার।

ড্যাম্‌ড্ ন্যুইসেন্স—এই অবস্থাটা।

পাশের ঘরে স্ত্রী জীবন-মৃত্যুর মধ্যে দোলা খাচ্ছে।

অতি সংকটাপন্ন অবস্থা।

ডাঃ সেন বলেই দিয়েছেন, 'আমি কোন গ্যারাণ্টি দিতে পারছি না আপনাকে। চান্সেস আর ইভ্‌ন্—ফিফ্‌টি-ফিফ্‌টি।'

সুন্দরী স্ত্রী, প্রিয়তমা স্ত্রী।

জীবনের সৌভাগ্যস্বরূপিণী। ওর দৌলতেই সব।

তা হোক। তবু এখন ওখানে গিয়ে দাঁড়াতে পারবে না অরবিন্দ মল্লিক।

সব কেমন যেন মাথার মধ্যে গুলিয়ে যাচ্ছে।

এই প্রথম বোধ করি অরবিন্দের জীবনে, এই রকম একটা অবস্থা অনুভব করল সে।

পা দুটোও যেন বিশ্বাসঘাতকতা করছে।

অস্বীকার করা যায় না—সমস্ত সিস্টেমটাই একটা শ্যক খেয়েছে তার, সবটাই কাঁপছে ভিতরে ভিতরে।···

পর পর দু-মাত্রা সেই তরল অগ্নি ভেতরে যাওয়ার পর অকস্মাৎ যেন ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল অরবিন্দ।

অশোকা—অশোকাই এর জন্যে ষোল আনা দায়ী।

অশোকার কতকগুলো ফল্‌স্ প্রেজুডিস আর অবস্টিনেসি।

অকারণ অর্থহীন কুসংস্কার এবং সেই অবোধ একগুঁয়েমী।

চুরির যে সুযোগ দেয়, বার বার লোভের বস্তু চোরের চোখের সামনে মেলে ধরে—চুরির জন্য সে চোরের সঙ্গে সমান দায়ী।

লোভী সে, খুবই লোভী। তা অরবিন্দ স্বীকার করছে।

কিন্তু লোভী নয় কে?

বেশীর ভাগ মানুষই তো লোভী।

এবং সে লোভের বস্তুও তো প্রধানত দুটি, কামিনী ও কাঞ্চন।

দেশে দেশে কালে কালেই এটা সত্য।

এই লোভ মানুষের মধ্যে প্রবল বলেই তো সেকালে সমাজ-বিধাতারা বিবাহ প্রথার প্রচলন করেছেন—এই বন্ধনের।

নইলে আগে তো নাকি এসব কোন ব্যবস্থাই ছিল না, যে যাকে খুশি সম্ভোগ করতে পারত।

আইনটা করতে হয়েছে তো প্রয়োজন বুঝেই।

বহুবিবাহ প্রথা রদ হয়েছে—তারও তো এই একই কারণ।

মানুষের লোভের আর কামনার শেষ নেই বলেই তো।

এসব সম্ভাবনা ভেবে দেখা উচিত ছিল অশোকার।

নিতান্ত গ্রাম্য মূর্খ মেয়ে সে নয়।

নিজেই খাঁচার দোর খুলে রেখেছিল, পাখির পায়েও কোন শিকল দেবার ব্যবস্থা করে নি—তাতে সে পাখি যদি পালিয়ে গিয়ে থাকে, শুধু পাখিকে দোষ দিলে চলবে কেন?

দোষ অবশ্য সে দেয় নি, প্রতিবাদী হয়ে তর্ক করতে আসে নি।

তবু—

অমন নিঃশব্দে নীরব উপেক্ষায়ই বা অভিযুক্ত করবে কেন?…

আরও দু-পাত্র পর পর খেতে হ'ল অরবিন্দকে, অদৃশ্য বিবেকের আনীত মামলার জবাব দিতে গিয়ে।

অশোকার এক সহপাঠিনী অরবিন্দর বন্ধুর বোন।

সেইখানে—সেই সহপাঠী বন্ধুর বাড়ি দেখা এবং আলাপ।

পরিচয়ের সূত্র এইটুকু।

অরবিন্দ তখন এম. এ. ও ল. পড়ছে একসঙ্গে, অশোকা বি. এ.।

অরবিন্দ খুব একটা সুশ্রী সুপুরুষ ছিল না কোন কালেই, বরং এখন তাকে অনেক ভাল দেখায়, তার চেহারাতে একটা বিশিষ্টতা এসেছে।

তখন যা ছিল তাকে সাধারণ ভদ্র চেহারা—এইমাত্র বলা যেত।

অসাধারণত্ব যেটা, যেটা প্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করত—সেটা ওর বুদ্ধির দীপ্তি, সে দীপ্তি শুধু চোখে নয়—সমস্ত মুখেই দেখা যেত, সেইটেই ওর ঔজ্জ্বল্যের আসল রহস্য।

বুদ্ধির প্রাচুর্য এবং তীক্ষ্ন মার্জিত কথাবার্তা ওর তখন থেকেই, যা পরবর্তীকালে ওর অসামান্য সাফল্যের কারণ।

কিন্তু অশোকাকে কেউ কেউ সুন্দরী বলত।

শ্বেতপাথরের মতো সাদা রঙ, ভেলভেটের মতো মসৃণ চামড়া—নিপুণ ভাস্করের হাতে খোদাই-করা মূর্তির মতো নিখুঁত মুখ চোখ।

কারও কারও তাতেই আপত্তি ছিল।

বড় বেশী নিখুঁত, বড় বেশী কাটা-কাটা।

অতি নিপুণ ভাস্করের হাতে তৈরী, এতটা না হলেই ভাল হ'ত বোধহয়।

আসলে ওকে দেখলে গ্রীক ভাস্কর্যের কথাই মনে হ'ত, সেইরকমই চেহারা—ইয়োরোপীয়ান ধরনের, সাধারণভাবেও ইয়োরোপীয়ান নয়, গ্রীক বলাই উচিত।

আমাদের দেশের পার্শী মহিলাদের মতো কতকটা। অনেকেই এ চেহারা ঠিক পছন্দ করেন না।

অরবিন্দ করেছিল।

কিন্তু শুধু চেহারা নয়। আকর্ষণের আরও কারণ ছিল কিছু।

শান্ত ভদ্র ভাবভঙ্গী, অথচ বেশ মর্যাদাব্যঞ্জক, ডিগ্‌নিফায়েড বললে যা বোঝানো সহজ হবে।

কথাবার্তায় বুদ্ধির প্রাখর্য নেই, কিন্তু অস্তিত্ব আছে। সে-বুদ্ধি উগ্রভাবে আক্রমণ করে না, কথা কইলে ভারি একটা স্নিগ্ধতা এনে দেয়।

কথা বলে আরাম বোধ হয়।

অরবিন্দর অন্তত তাই হয়েছিল।

মনে হয়েছিল নির্বোধ বাঙালী মেয়েদের মরুভূমে এই একটি ওয়েসিস।

এর পর যা হওয়া উচিত তাই হয়েছিল।

দুই আর দুয়ে চার হওয়ার মতোই।

অরবিন্দ নিজেই অশোকার বাবার সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তাঁকে মেসোমশাই ও স্ত্রীকে মাসিমা বলে সম্বোধন শুরু ক'রে দিল।

এইটেই তার প্রধান শক্তি, সে যা করব বলে ইচ্ছে করে তা সে অনায়াসে ক'রে নিতে পারে।

অপরের পক্ষে যেটা চেষ্টাকৃত কৌশল, ওর পক্ষে সেটা সহজাত।

সুতরাং বিজয়বাবু ও তাঁর স্ত্রীর চিত্ত জয় ক'রে, সেখানে একটি স্নেহের ও প্রশ্রয়ের আসন অধিকার করা অরবিন্দর পক্ষে ছেলেখেলার বেশি কিছু ছিলনা।

প্রণয়টা দুজনেই স্বীকার ক'রে নিয়েছিল—কোনরকম ভণিতা না ক'রেই।

দুজনেরই সহজ বুদ্ধি প্রবল ; যা পরিষ্কার, দিবালোকের মতো স্বচ্ছ—তাকে দেখতে না পাওয়ার ভান করবে, ওদের কেউই অত 'ন্যাকা' নয়।

এখন কথা উঠল বিবাহের। অরবিন্দও ব্রাহ্মণ—তবে রাঢ়ী শ্রেণীর, অশোকারা বারেন্দ্র।

অশোকা বলল, 'বোধহয় তাতে আটকাবে না। সেটুকু ঔদার্য আমার বাবার আছে। তুমি তাঁকে বলো।'

বলল অরবিন্দ।

কিন্তু প্রস্তাবটা শোনামাত্র বিজয়বাবু গম্ভীর হয়ে গেলেন।

গম্ভীর শুধু নয়—কেমন যেন বিমর্ষও।

অরবিন্দ তাঁকে ভুল বুঝল।

একটু উত্তপ্ত কণ্ঠেই প্রশ্ন করল : 'আপনি কি এখনও এই সব গোঁড়ামি মানেন নাকি ? এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যসীমা পেরিয়ে এসেও—?'

'গোড়ামি ?' প্রথমটা বুঝতে পারেন না বিজয়বাবু, একটু অবাক্ হয়েই তাকান অরবিন্দর মুখের দিকে।

কণ্ঠস্বরের অকারণ জ্বালাটা তাঁর ভালও লাগে না।

কিন্তু তার পরেই মনে পড়ে কথাটা, 'ও—তুমি রাঢ়ী-বারেন্দ্র সেই আপত্তি মনে করছ ? না না, ওসব কোন কথাই নয়, আমার ভাইপো একটি সৎচাষীর মেয়েকে বিয়ে করেছে—আমি তাকে ডেকে খাইয়েছি, আমার বাড়িতে ক'দিন থেকে গেছে। না-না, আপত্তি আমার কিছুতেই নেই। অন্য কথা।…সেটা—সেটা আমি বরং টুটুকেই বলব। সে যা ভাল বোঝে তাই করবে।'

'আপত্তি নয়—অথচ বাধা—কথাটা একটু হেঁয়ালি হয়ে উঠছে মেসোমশাই। ব্যাপারটা কি আমাকে বলা যায় না ?'

'বলা যায়—কিন্তু না-ই বা বললাম। এ আমাদের ফ্যামিলির ব্যাপার একটা—যে সব চেয়ে বেশী কন্‌সার্নড্—তাকেই বলি না প্রথমটায়, সে যদি তোমাকে বলা উচিত মনে করে বলব। তুমি বাবা আর শুনতে চেয়ো না—প্লীজ!'

অরবিন্দ একটু ক্ষুণ্ণই হয়েছিল সেদিন।

তবু বিজয়বাবুর এ অনুরোধের পর আর পীড়াপীড়ি করতে পারে নি।

প্রথমত স্বার্থ-অসিদ্ধির ভয়, দ্বিতীয়ত বিজয়বাবুর প্রায়-অনুনয়ের মতোই—শান্ত ও ভদ্র যুক্তির উত্তরে কোন উপযুক্ত প্রত্যুত্তর তখনই খুঁজে পায় নি।

॥ ৩ ॥

বিজয়বাবু অশোকাকে নিজেই ডেকে বলেছিলেন কথাটা।—রহস্যটা পরিষ্কার ক'রে দিয়েছিলেন।

উপন্যাসের মতোই অবিশ্বাস্য।

বহুবার পড়া কোন উপন্যাস।

কোন যুক্তি নেই, প্রমাণ নেই—তবু একেবারে কাকতলীয় বলেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

অন্তত বিজয়বাবু দিতে পারেন নি।

কে জানে কেন—অশোকাও পারল না।

বহুদিন আগের কথা। শতাধিক বৎসর আগের।

বিজয়বাবু থেকে তিন পুরুষ আগের। ও'র প্রপিতামহের কাহিনী।

বিজয়বাবুর পূর্ব-পুরুষরা জমিদার দিলেন।

খুব বড় রাজা-মহারাজা গোছের কিছু নয়—তবু, বরেন্দ্রভূমির অসংখ্য রাজতুল্য-প্রতাপশালী জমিদারদের মধ্যেও তাঁদের বিশিষ্ট একজন বলে গণ্য করা হ'ত।

সে জমিদারীর অধিকাংশই বিজয়বাবুর পিতামহ নষ্ট ক'রে গেছেন—বাকী যেটুকু ছিল ও'র বাবা বিক্রী ক'রে গোপনে স্বদেশী আন্দোলনে টাকা যুগিয়েছেন—পূর্ব-পুরুষদের সঞ্চিত বহু পাপ ও অত্যাচারের কিছুটা প্রায়শ্চিত্ত হবে—এই আশায়।

ফলে বিজয়বাবুরা কিছুই পান নি। সেই জন্যেই বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অনেক আগে—প্রায় কিশোর বয়সে কলকাতায় এসে জীবিকার পথ খুঁজতে হয়েছিল তাঁকে।

একরকম ভালই হয়েছিল অবশ্য—তাঁর যে ভাই বা জ্ঞাতিরা সে চেষ্টা না ক'রে নামসর্বস্ব জমিদারী, পৈতৃক গ্রামটুকুর কয়েক বিঘা জমি আঁকড়ে পড়ে ছিলেন, নিজেদের চারপাশে একটা মিথ্যা মর্যাদার স্বপ্নজাল রচনা ক'রে—

তাঁদের আজ দুর্গতির পরিসীমা নেই।

বিজয়বাবুর প্রপিতামহ এক অদ্ভুত ধরনের মানুষ ছিলেন।

তিনি তাঁর সমসাময়িক কালকে স্বীকার করতেন না, এক বিচিত্র মানসিকতায় তিনি চিরদিনই কয়েক পুরুষ পিছিয়ে থাকার চেষ্টা করতেন।

চলনে বলনে আচরণে পূর্ব-পুরুষদের জনশ্রুত মহিমার অনুকরণ করতেন।

বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখ থেকে যে-সব স্বেচ্ছাচারিতা, শক্তির যে মদান্ধ প্রকাশের কাহিনী শুনতেন, তখন সে স্থান-কাল কিছু না থাকা সত্ত্বেও, সেইগুলোই নতুন ক'রে পুনরভিনীত দেখতে চাইতেন তাঁর জীবনে।

নিজেকে সেই সময়কার, তাদেরই একজন ভাবতেন।

এর জন্য বহুবার বহু বিপদে পড়তে হয়েছে।

তখন ইংরেজ আমল সুপ্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। ওরা বুদ্ধিমান, নবাববাদশারা যে ভুল করেছিল, সে ভুল করে নি।

ইংরেজরা জানত যে এই সব প্রায়-স্বাধীন জমিদারদের পক্ষচ্ছেদ করতে না পারলে, এদের ইংরেজরাজের শক্তির আস্বাদ পাওয়াতে না পারলে—ওরা প্রবল বিপদের কারণ হয়ে থাকবে চিরকাল।

তাই তখন তারা কঠোর-হস্তে এই সব ভুঁইয়াদের দমন করতে শুরু করেছিল।

লেঠেল পাইক বরকন্দাজ প্রভৃতি ছদ্ম-সৈন্য রাখা রীতিমতো কঠিন হয়ে পড়েছিল।

আগে যারা বাবুদের হুকুমে দিনে-দুপুরে লোকের মাথা কেটে এনে গর্ব ক'রে বেড়াত—তাদের ধরে ফাঁসি দেওয়া দ্বীপান্তরে পাঠানো শুরু হয়ে গিয়েছিল।

ফলে সকলেই তখনকার বর্তমানকাল সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠতে বাধ্য হয়েছিলেন।

কেবল বিজয়বাবুর কর্তাবাবা বা প্রপিতামহ ছাড়া।

তিনিও সেই নবাবী আমলের প্রতাপ দেখাতে গিয়ে কম বিপন্ন হন নি, এক-একটা হঠকারিতার জন্য বার বার আদালতে যেতে হয়েছে, পাইক পেয়াদা লেঠেলদের জন্যে মুঠো মুঠো টাকা খরচ করতে হয়েছে—তাও সবাইকে বাঁচাতে পারেন নি, সেজন্য তাদের বৌ-ছেলে-মেয়েকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়েছে কিছু কিছু, তবু নিজের স্বভাব বদলাতে পারেন নি!

পারেন নি বাস্তবকে স্বীকার ক'রে নিতে।

পুরাকাহিনীর—ইতিহাস নয়, প্রবাদ ও জনশ্রুতির—যে মিথ্যা মোহকে বাস্তব সত্য বলে আঁকড়ে ধরেছিলেন, তার মায়াজাল কাটিয়ে বর্তমানের দিবালোকে বেরিয়ে আসতে পারেন নি, ভ্রান্তি ও মিথ্যাকেই প্রেয় ও শ্রেয় বলে মনে ক'রে গেছেন চিরকাল।

এই মিথ্যা মোহেই একবার একটা অতি গর্হিত কাজ ক'রে বসলেন তিনি —বড় (তাঁর বিশ্বাস-মতো) জমিদারের উপযুক্ত এবং অবশ্যকরণীয় জ্ঞানে।

তাঁর প্রজাদের মধ্যে এক বর্ধিষ্ণু ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়েছিল।

ভুলক্রমে আগে 'বাবুকে' জানানো হয় নি বা অনুমতি নেওয়া হয় নি।

একেবারে যখন নন্দনপদে নত-মস্তকে উপযুক্ত দীনতায় ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ করতে এলেন—তখন বাবু, অর্থাৎ বিজয়বাবুর কর্তাবাবা জ্বলে উঠলেন একেবারে।

তখনই তো ভদ্রলোককে বেঁধে সারাদিন রোদে দাঁড় করিয়ে রাখার হুকুম হ'ল—তারপর বলে বসলেন, 'ও বিয়ে হতে পারবে না!'

ভদ্রলোকদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল।

স-পরিবারে এসে পায়ে পড়লেন ওঁর।

সব ঠিক হয়ে গেছে, নাটোর জোয়াড়ির বর, তারাও নিতান্ত কেওকেটা নয়, জমিদার-বংশ তাদেরও—এখন এভাবে বিয়ে ভেঙে দিলে খুব অপদস্থ হ'তে হবে।

তারা তো অপমানিত হবেই—এঁদেরও মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না।

তাছাড়া, এরপর ও মেয়েকে কে বিয়ে করবে?

নানারকম দুর্নাম রটে যাবে, এঁরা বিয়ে বন্ধ করেছেন কেউ কি বিশ্বাস করবে? বলবে মেয়ের দোষ ছিল, বরপক্ষই ভেঙে দিয়েছেন সেজন্যে।

সে কথার উত্তরে বাবু অভয় দিলেন, 'কুছ পরোয়া নেই, ও মেয়েকে আমিই বিয়ে করব।'

সর্বনাশ!

ভদ্রলোক আরও বসে পড়লেন।

তাঁরা কুলীন, ব্রাহ্মণের কন্যাগত কুল, এইটি বড় মেয়ে—এর সঙ্গে জমিদার-বাবুর বিয়ে হলে—(বাবুর যে পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছে, সেটা অবশ্য ধর্তব্যের মধ্যে নয়) তাঁদের কুল থাকবে না।

আজ অবধি তাঁরা ভঙ্গ হন নি কোন পুরুষে।

কিন্তু সে কথা কে বলবে?

অবশ্য শেষ পর্যন্ত বলতে হ'লই—চোখ-কান বুজে, দুর্গানাম স্মরণ ক'রে।

কিন্তু দুর্গাও কিছু করতে পারলেন না, ফল হ'ল বিপরীত।

বাবু স্পষ্টই হুকুম দিলেন যে, কুল থাক্ বা না থাক্—তিনিই ঐ দিন বরবেশে ঐ মেয়েকে বিয়ে করতে যাবেন, এরপর যে কোন কথা বলতে আসবে—তার সপুরী এক-গাড়ায় যাবে।

এঁরা তখন একটা চালাকি খেলতে গেলেন।

যে তারিখে বিয়ে ঠিক হয়েছিল, তার দুদিন আগেও একটা বিয়ের দিন ছিল।

এমনি কি একটা সুবিধা-অসুবিধার প্রশ্নেই পরের দিনটা ঠিক করেছিলেন তাঁরা।

এখন বরপক্ষকে ব্যাপারটা জানাতে তাঁরাও রুখে উঠলেন। বললেন, 'বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচি!…পাঁচ হাজার টাকা আয়ের জমিদার—মেজাজ দেখাতে চান চাঁদ রায়ের মতো।…না-না, ও বেটাকে জব্দ করতেই হবে, যা বলবেন তাই করতে রাজী আছি আমরা।'

তখন স্থির হ'ল যে, আগের ঐ দিনটাতে চুপি চুপি বর পুরুত নাপিত—তিনজনে তিনখানা নৌকোয় ক'রে এসে সন্ধ্যের পর পেঁছিবে—তারপর বন্ধ ঘরের মধ্যে কোনমতে সম্প্রদানের কাজ সেরে রাত্রেই কনে নিয়ে তারা দেশে ফিরে যাবে।

শাঁখ বাজবে না, উলু দেওয়া হবে না, কাকে-বকেও টের না পায়।

স্ত্রী-আচারের তো প্রশ্নই উঠতে পারে না, কারণ তাহলেও কিছুটা জানা-জানি হবে, আর সে-কিছু নিঃশব্দে সারা যাবে না। জ্ঞাতি এমন কি প্রতিবেশীদের জানাতে গেলেও কথাটা ফাঁস হয়ে যেতে পারে।

এ একেবারে কাঁচাখেকো দেবতাকে নিয়ে কাজ, ফাঁসি তো পরে হবে—সে-সব ও পরোয়াও করে না, এখন টের পেলে সত্যি-সত্যিই সবাইকে খুন ক'রে বসবে।

কিন্তু বিয়ের পর? তখন তো জানতে পারবেই। বর সেজে এসে যদি দেখে কনে নেই—সে তো আরো ক্ষেপে যাবে! তখন?

এ প্রশ্ন তুললেন মেয়ের কাকা।

বাবা বললেন, 'সে যা হয় হবে। পারি আমরাও পরের দিন রাতারাতি নৌকো ক'রে বেরিয়ে আমার শ্বশুরবাড়ি চলে যাব, সে এর এক্তারের বাইরে, নাটোরের বড় তরফের এলাকা, সেখানে এর ট্যাঁ-ফোঁ চলবে না।—আর অত ভাবতে গেলে চলবে না, আগে মান পরে প্রাণ।…'

কিন্তু যতই গোপন রাখার চেষ্টা করা হোক ব্যাপারটা—কেউ জানতে পারবে না—তা সম্ভব নয়।

কথাটা যথাসময়ে বাবুর কানে উঠল!

তিনি চেঁচামেচি করলেন না, তখনই পাইক-পেয়াদা পাঠালেন না, তবে যারা তাঁকে চেনে তারা বজ্রগর্ভ মেঘের মতো অন্ধকার মুখ আর ক্রূর কঠিন দৃষ্টি দেখে বুঝল—আজ একটা প্রলয় না হয়ে যাবে না।

তিনি নিঃশব্দে সব ব্যবস্থা ঠিক করলেন।

বরের নৌকো ঘাটে এসে থামতেই এঁর লোকজন গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

মাঝি-মাল্লাদের তাড়িয়ে বরকে নৌকোর সঙ্গে বেঁধে—নৌকো ফুটো করে ডুবিয়ে দেওয়া হ'ল।

কনের ভাই ঘাটে এসে দাঁড়িয়ে ছিল—তাকেও ঐ নৌকোর সঙ্গে ডুবনোর কথা তুলেছিল কেউ কেউ—কর্তা নিষেধ করলেন।

হেসে বললেন, 'হাজার হোক আমার পঞ্চম পক্ষের শালা হ'তে যাচ্ছে, তা কি পারি? শেলেজের হাত শুধু হবে যে!'

না, অতটা করলেন না, তার হাত-পা বেঁধে ও'দের গারদখানায় পাঠাবার

হুকুম দিয়ে সেই রাত্রেই কনের বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন।

বললেন, 'সে বর তো এতক্ষণ আয়াইয়ের তলায় গিয়ে আগামী জন্মের বিয়ের কথা ভাবছে। আমি তোমাদের জন্যে ভেবে কূল পাই নে। তোমাদের মেয়ে আজ রাত কাটলেই তো দোপড়া হয়ে যাবে—তাই আমিই এলুম—তোমাদের কূল রাখতে পারব না হয়তো—জাত রাখবো।'

কান্নার রোল উঠুক আর যাই উঠুক, ওঁর হুকুম-মতোই কাজ করতে হ'ল—কারণ ততক্ষণে জন-পঞ্চাশেক লেঠেল এসে এদের বাড়ি ঘিরেছে।

বাঁচিয়ে দিল সেই মেয়েটাই।

বোধহয় তার ঘেন্না হয়ে গিয়েছিল সমস্ত ব্যাপারটায়, কিংবা বাবা যে কুল রাখার জন্য এত কান্ড করছেন সেই কুল নষ্ট হতে দেবে না বলেই; অথবা ঐ লোককে স্বামী বলে তার ঘর করবার ভয়ে।

কেউ কিছু বোঝবার বা বাধা দেবার কথা চিন্তা করারও আগে—পুজোয় বলি দেবার যে খাঁড়াটা ঠাকুরদালানে ঝোলানো থাকে—সেই খাঁড়াটা বসিয়ে দিল নিজের গলায়।

বাবু লেঠেল বরকন্দাজ—এমন কি থানা পুলিসও বোঝেন, এই ব্যাপারটার কোন অভিজ্ঞতা ছিল না তাঁর।

এরকম যে হতে পারে, এমনভাবে অনায়াসে কেউ তাঁর কবল থেকে তাঁকে 'দুয়ো' দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারে, তা তিনি কখনও ধারণাও করেন নি।

তিনি বোধ করি এই প্রথম হার মানলেন ও ঘাবড়ে গেলেন।

পা পা ক'রে পিছিয়ে বেরিয়ে এলেন সেখান থেকে।

সেই ওঁদের বংশে ভাঙনের সূত্রপাত।

থানা পুলিস তো হবেই—খুন আত্মহত্যা দু-দুটো ঘটনা চাপা দেওয়া যায় না।

আত্মহত্যার কারণ জানতে গিয়েই বরের ভাগ্যের কথা উঠল, সে-লাশও পাওয়া গেল।

মাঝি-মাল্লাগুলোকে মেরে তাড়ানো হয়েছিল—তারাও তাদের এলাকায় গিয়ে থানায় কেস লিখিয়েছে—সাক্ষীর অভাব নেই।

এর আগেও অনেকবার পুলিস এই লোকটিকে ধরবার চেষ্টা করেছে—ঠিক বাগে আনতে পারে নি।

এবার ভাল রকমেই কাবু ক'রে ফেলল

বিস্তর টাকা খরচ ক'রে যদি বা তিনি নিজে বাঁচলেন—দুটো লেঠেলকে বাঁচাতে পারলেন না—তাদের দ্বীপান্তর হয়ে গেল।

তবু তারাই ওঁর গলার ফাঁসটা বাঁচিয়ে দিয়ে গেল বলতে গেলে—নিজেদের ওপরই সব দায় তুলে নিয়ে।

সেও অবশ্য শুধু-হাত মুখে ওঠে নি তা বলাই বাহুল্য। বিস্তর টাকা গুনে দিতে হয়েছিল তার জন্যে।

এই মকদ্দমা চলেছিল প্রায় দু বছর।

এই দীর্ঘকাল ধরে দুর্ভাবনা ভোগ করার ফলেই বোধহয় একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি।

এরপর বেশীদিন আর বাঁচেনও নি।

সম্ভবত, এবার যে বাস্তবে নামতে হ'ল—স্বীকার করতে হ'ল যে জমিদারদের অখণ্ড প্রতাপের দিন চলে গিয়েছে—এই সচেতনতাই তাঁর পরমায়ু ক্ষয় ক'রে আনল আরও।

মৃত্যুর আগে আরও একটি কঠিন আঘাত পেতে হয়েছিল তাঁকে।

খুব ঘটা ক'রে বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন তিনি।

ভাল পাত্র, বড় জমিদারের একমাত্র ছেলের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল।

দেখতে ভাল, আরও বড় কথা—তখনকার দিনে যা জমিদারের ঘরে দুর্লভ ছিল—সচ্চরিত্রও।

সত্যি-সত্যিই বড় জমিদার, বিজয়বাবুদের মতো বিগত দিনের স্মৃতি-রোমন্থনকারী নয়।

কিন্তু সেই জামাই বিয়ের ঠিক এক মাসের মাথায় ঘোড়া থেকে পড়ে মারা গেল।

পুরনো ঘোড়া, অতি প্রিয় ও পরিচিত—কী যে হ'ল সে ঘোড়ার—মাঠে যে কিষাণরা কাজ করছিল তারা দেখেছে—সাংঘাতিক ভয়ে চার পা তুলে লাফিয়ে ফেলে দিল মালিককে, ছেলেটির পা তখনও রেকাবে আটকানো—সেই অবস্থাতেই দৌড়ে বাড়িতে গিয়ে থামল যখন—তখন আর মাথা বা মুখের কিছু চেনবার উপায় নেই।

ঐ সূত্রপাত।

কিন্তু তখনও কেউ এটার কোন বিশেষ অর্থ খোঁজবার চেষ্টা করে নি।

পরে করল। দেখা গেল এ বংশের যে যখন বড় মেয়ের বিয়ে দিয়েছে বা দিচ্ছে, সে বিয়ের নতুন বর বিয়ের একমাসের মধ্যেই—কোন না কোন ভাবে অপঘাতে মারা যাচ্ছে।

এমনি পর পর দু' তিনটে ঘটনা ঘটতেই লোকে মিলিয়ে নিতে শুরু করল।

তার পরেও কিন্তু এ ঘটনা আরও ঘটেছে বিজয়বাবুদের বংশে, এবং এখনও ঘটছে।

॥ ৪ ॥

দীর্ঘ কাহিনী শেষ ক'রে বিজয়বাবু অধুনাতন দুটি উদাহরণ দিলেন।

'তোর বড় জ্যাঠা, আমাদের বড় জ্যাঠতুতো ভাই অনেক কাণ্ড ক'রে পাকিস্তান থেকে টাকা পাঠিয়ে সুষির বিয়ে দিল—সুষমা ওর বড় মেয়ে—মনে নেই তোর?'

'হ্যাঁ—মনে আছে, এখানে তো হয় নি—কাশীতে হ'ল বলে আমরা কেউ

যেতে পারি নি—'

'ইচ্ছে ক'রেই কাশীতে দিয়েছিল বড়দা। বলে তীর্থে নাকি ফাঁড়া কেটে যায়, অভিশাপ লাগে না। বর কাশীতেই লেক্‌চারার ছিল বলে কোন অসুবিধেও হয় নি—আমরা ক'দিনের জন্যে ধর্মশালায় উঠে বিয়ে দিয়ে এসেছিলুম। আমি গিছলুম—বড়দা তো আসতে পারলেন না—শেষ পর্যন্ত ভিসা নিয়ে গিয়ে কি গোলমাল হ'ল। জামাইকে আমি হাতে ধরে অনুনয় ক'রে এসেছিলুম বিয়ের দিন থেকে একমাস কাশীর বাইরে কিছুতে না যায়—যত বিপদই আসুক বা যত দরকারই পড়ুক। যায়ও নি সে বেচারী, কিন্তু ঠিক এক মাসের মাথায়, ত্রিশ দিনের দিন—যেদিন আমি এখানে বসে ভাবছি যে আজকের রাতটা কাটলে, কালীঘাটে গিয়ে পুজো দিয়ে আসব আর বড়দাকে একটা টেলিগ্রাম করব—এতদিনে ঐ অভিশাপ কাটাবার একটা পথও পাওয়া গেল বুঝতে পারব—সেই দিনই সকালবেলা রামাপুরার মোড়ে ঐ গীর্জাটার কাছে বাস চাপা পড়ে মারা গেল।'

শুনতে শুনতে অশোকার শুভ্র ললাট বিবর্ণ রক্তহীন হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এছাড়া মানসিক চাঞ্চল্যের আর কোন লক্ষণ প্রকাশ পেল না এখনও, স্থির হয়েই বসে রইল সে—স্থির, প্রায়-নির্নিমেষ দৃষ্টি বাবার মুখের ওপর মেলে।

বিজয়বাবুর বলা তখনও শেষ হয় নি।

তিনি একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'রিসেণ্ট ঘটনাটা তো তুই জানিসই। খবরের কাগজেই দেখেছিস রত্নার কথা—বিয়ের পরের সপ্তাহেই হনিমুন করতে দার্জিলিং গেছল ওরা—ফিরল রত্না একা···আশ্চর্য এই, ওদের গাড়িটা স্কিপ্‌ ক'রে অত নিচে পড়ল, গাড়িটা গুঁড়িয়ে চুর হয়ে গেল, জামাইয়ের হাত-পাগুলো খুঁজে কুড়িয়ে আনতে হ'ল বলতে গেলে—ড্রাইভারকে চেনাই গেল না, কেবল রত্নাই বেঁচে উঠল—এই বৈধব্য ভোগ করবে বলে।'

'রত্না ?'

এই প্রথম চমকে উঠল অশোকা, অনেকক্ষণ পরে এই প্রথম কথা কইল, 'রত্না ? মানে আর্টিস্ট রত্না ? রত্না কি আমাদের কেউ হয় ? কৈ, কখনও শুনি নি তো ? আর চৌধুরীই বা কেন তাহলে ? স্ক্রীনের জন্যে পদবী পাল্‌টে ছিল ?'

'আমরা যে আসলে লাহিড়ী-চৌধুরী মা।'

ম্লান করুণ হেসে বললেন বিজয়বাবু, 'চৌধুরীটা আমরা বাবার আমল থেকে ত্যাগ করেছি—তিনি খুব বড় রকমের স্বদেশীওলা ছিলেন—ইংরেজদের ভাষায়—তা জানিস তো—প্রায় সর্বস্ব বেচে টেররিস্টদের টাকা দিয়েছিলেন, নিজেও জেল খেটেছেন কতবার—তাঁর একবার মাথায় গিয়েছিল যে প্রজাদের সব জমি তাদের দিয়ে টলস্টয়ের মতো প্রব্রজ্যা নেবেন। জ্ঞাতিদের চাপেই কিছু করতে পারেন নি। তাঁর ধারণা ছিল যে চৌধুরী উপাধিটাই ফিউডাল, তাই ওটাকে বর্জন করেছিলেন। সামহাউ—আমার জ্ঞাতি জ্যাঠা-কাকারা

সবাই ওটা মেনে নিয়েছিলেন। অবশ্য নামের সঙ্গে জমিদারত্বটুকু থাকা তখন প্রায় পরিহাস হয়ে উঠেছিল, ছেড়ে বেঁচেছিলেন সকলেই।'

'কিন্তু রত্না?' অশোকা একটু অসহিষ্ণু ভাবেই তাঁকে প্রসঙ্গের মধ্যে আনার চেষ্টা করেছিল, 'রত্না কি আমাদের কাজিন তাহ'লে?'

'রত্না আমার কাজিন। আমার ঠাকুর্দার চারটি বিবাহ ছিল, দুটি বৌ সর্বদা একসঙ্গে ঘর না করলে তাঁর শান্তি হ'ত না। প্রথম পক্ষ থাকতেই পর পর দুটি পক্ষ মারা যায়। রত্নার বাবা সেই শেষ বা চতুর্থ পক্ষের সন্তান। ছোট ঠাকুমা বড়লোকের মেয়ে ছিলেন, বিধবা হন যখন তখন তাঁর মোটে একুশ-বাইশ বছর বয়স। তিনি এখানে সামান্য আয়ের এতগুলি ভাগের ভরসায় বসে না থেকে সঙ্গে সঙ্গেই বাপের বাড়ি চলে যান সুসঙ্গ—ময়মনসিংহে। সেই থেকেই আমাদের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি—ঠাকুমা কি আমার কাকা—দেশের ভাগ নিয়ে কখনও মাথা ঘামান নি, বরং বাবার আমলে কিছু কিছু যখন বিক্রী করার প্রয়োজন হ'ল—যাওয়া মাত্র নাদাবীনামায় সই ক'রে দিয়েছেন। আর সেই ছোটকাকাই—তাঁর মাতামহরা চৌধুরী—তাঁদের সঙ্গে মিলিয়ে চৌধুরীটুকু রেখেছিলেন, লাহিড়ীটা বর্জন করেছিলেন। নইলে অন্য কোন দূর সম্পর্ক নয়, দশরাত্রির জ্ঞাতি। বাবার আপন বৈমাত্র ভাইয়ের মেয়ে। রত্না তো লেখাপড়া শিখে এম. এ. পাস ক'রে এ লাইনে এল, ইচ্ছে ক'রে। বেশ য়্যাকম্‌প্লিশ্‌ড্‌ মেয়ে। বিয়েও তো করেছে সজাতিতে, বারেন্দ্র অবশ্য নয়—ছেলের উপাধি চক্রবর্তী, আসলে ওরা চাটুজ্জে।...ছেলে ভাল এঞ্জিনীয়ার—জার্মানী-ফেরত, এখনই ষোলশ টাকা মাইনে পাচ্ছিল।'

কতকটা স্মৃতিচারণের ভঙ্গীতে বলতে বলতে বোধ করি আসল বক্তব্যের খেই হারিয়ে ফেলেছিলেন বিজয়বাবু, এবার মনে পড়তেই আবার সোজা হয়ে বসলেন, একটু বিষণ্ণভাবেই বললেন, 'এই ব্যাপার মা, এই জন্যেই অরুর প্রস্তাবটা আমার কাছে হরিষে বিষাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে। ওকে এত কথা বলে লাভ হ'ত না—এসব ও বুঝত না। তাই তোকেই আগে বললুম। ভেবে দ্যাখ তুই। বিয়ের বয়স হয়েছে—বিয়ের ইচ্ছেটাও স্বাভাবিক—করবিও হয়তো, এইজন্যে চিরদিন কুমারী থাকবি—সে কি আর সম্ভব—তবু যা করবি জেনেশুনে করাই ভাল। তুই তো তেমনি ফিন্যাপ্যাণ্ট ধরনের মেয়ে নোস, সব দিক ভেবে যা বলবি আমি তাতেই রাজী হবো। ভেবে দ্যাখ ভাল ক'রে—যদি অরুকে কনফিডেন্স-এ নিতে চাস তো নে, খুলে বল ওকে সব কথা, দ্যাখ ও কি বলে।'

বলেছিল অরবিন্দকে সব কথা অশোকা।

কিছুই গোপন করে নি, কিছু বাড়িয়েও বলে নি।

অরবিন্দ কিন্তু একেবারে উড়িয়ে দিয়েছিল কথাটা।

'স্টাফ্‌ অ্যাণ্ড ননসেন্স। রাবিশ। তুমিও কি এই সব প্রেজুডিসে বিশ্বাস করো? ও'রা সেকেলে লোক, আর কিছু না পেয়ে, বংশের অন্য

কোন মহান ট্র্যাডিশন ধরতে না পেরে এই কার্স-ট্র্যাডিশনটাকেই আঁকড়ে ধরেছেন। ওসব বাদ দাও দিকি। হ'তে পারে—এক-আধটা ঘটনা যে ঘটে নি তা নয়, রত্না চৌধুরীর ইন্‌সিডেণ্টটা আমিও পড়েছি কাগজে—কিন্তু ওসব হ'ল কাকতালীয় ব্যাপার। কাক তালগাছে এসে বসল, তাল পড়ল—তার কারণ এ নয় যে কাকটাই তালটাকে ফেলল। ওসব ভুলে যাও—লেট্‌ আস প্রোসীড উইথ আওয়ার প্ল্যান্‌স্‌।'

কিন্তু অশোকা গম্ভীর ভাবে ঘাড় নেড়েছিল।

অরবিন্দর উৎসাহ তার স্থিরবুদ্ধিকে বিচলিত করতে পারে নি।

বাপের ওপর অশোকার অগাধ বিশ্বাস চিরকাল।

আর যা-ই হোক, বাজে কথা বলার লোক তিনি নন, বিশেষ যেখানে তাঁর মেয়ের ভবিষ্যতের প্রশ্ন—সেখানে তো বলবেনই না।

বাধা দেবার ইচ্ছে থাকলে সোজাসুজিই বলে দিতেন।

এখনও বাধা দেবার কথা বলেন নি। ভেবে দেখতে বলেছেন এই মাত্র।

অশোকা বলেছিল, 'যদি একা আমার জীবনের প্রশ্ন হ'ত তো আমি এক মুহূর্তও ভাবতুম না। এ তোমার জীবনের প্রশ্ন। তোমার জীবন আমার কাছে, আমার থেকে ঢের বেশী মূল্যবান। বাবা বাজে কথা বলেন নি, এর সব ক'টা ঘটনাই কখনও না কখনও শুনেছি, সুষিদির ঘটনাটা তো মাত্র দু বছর আগের। সুষিদির দুরবস্থা চোখের সামনেই দেখছি। স্বামীকে তো পেলেই না, উল্‌টে সে শ্বশুর-শাশুড়ী এখন ওর ঘাড়ে পড়েছে। এক সেলাই কলের সেল্‌স্‌ উওম্যান হিসেবে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সামান্য কি মাইনে পায়, এ ছাড়া একটা কি টিউশনি করে। সোদপুরের কাছে ঘোলায় থাকে। বাবা যা পারেন যৎসামান্য কিছু সাহায্য করেন—কিন্তু তাঁরই বা সাধ্য কতটুকু!'

'কিন্তু তোমার সাধ্য তো ওর থেকে বেশী। তুমি গ্র্যাজুয়েট হবে দুদিন বাদে।'

অরবিন্দর কণ্ঠে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সুর।

অশোকা কিন্তু সে ব্যঙ্গ যে বিশেষ লক্ষ্য করল তা মনে হ'ল না।

আগের মতোই শান্ত দৃঢ়কণ্ঠে বলল, 'খাওয়া-পরার অভাব ছাড়াও মেয়েদের কিছু দুর্গতি থাকতে পারে—যা উপার্জনের দ্বারা দূর করা যায় না। তাছাড়া বললামই তো, আমার স্বার্থ, আমার ভবিষ্যতের চেয়েও তুমি ঢের বেশী মূল্যবান আমার কাছে।'

'তাই বলে, সামান্য একটা বাজে অর্থহীন কুসংস্কারের জন্যে তোমাকে আমি হারাব?'

বিষম উত্তেজিত হয়ে ওঠে অরবিন্দ নিমেষের মধ্যে, বোধহয় অশোকার শেষের কথাটায় আত্মঅহমিকায় সুড়সুড়ি লেগেছে তার, সেই কৃতজ্ঞতায় প্রেমটাও উদ্বেল হয়ে উঠেছে, 'এই বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, আনবিক যুগে এই কথা বিশ্বাস ক'রে দুটো জীবন নষ্ট করবে তুমি?'

'কে বললে নষ্ট করব? বিয়ে হবে না বলে আমরা পরস্পরকে হারাব,

এরকম কথা তুমি ভাবছই বা কেন ?'

'তার মানে ?'

হতবাক্ হয়ে যায় অরবিন্দ, নির্বোধের মতো তাকিয়ে থাকে অশোকার মুখের দিকে।

'মানে—আমরা জাস্ট ঘর ঘরব—য়্যাজ হাসব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ—এই আর কি! বি'য়ে হলে তো বৈধব্যের প্রশ্ন। বিয়েই যদি না হয়—বিধবা হওয়ার কথা তো উঠবে না!'

আরও অনেকক্ষণ সময় লাগল অরবিন্দর কথাটা বুঝতে এবং উত্তর দেওয়ার মতো শক্তি খুঁজে পেতে।

সে বেশ কিছুটা পরে বলে উঠল, 'যাঃ! কী বলছ যা-তা! কোন অনুষ্ঠান হবে না, রেজেস্ট্রিও না ?'

'রেজেস্ট্রিও তো বিয়ে। সেখানেও বৈধবোর প্রশ্ন আছে।'

'তাই কখনও হয় ? লোকে কি বলবে, সমাজ ?'

'সমাজ বলতে কি আর কিছু আছে! বিয়ে হয়েছে এই কথা বললেই হ'ল। পরিচয়টাই তো আসল। আমাদের বন্ধু-বান্ধবরা কেউ এত পিউরিটান নয় আশা করি যে এসব নিয়ে মাথা ঘামাবে।'

'কিন্তু আমাদের বাবা-মা ? তাঁরা রাজী হবেন কেন ?'

কেমন এক রকমের ক্ষীণ অসহায় শোনায় অরবিন্দর কণ্ঠ।

মজ্জমান ব্যক্তির তৃণাবলম্বনের মতই সে যে শেষ পর্যন্ত বাবা-মাকে টেনে আনছে, সেটা নিজেও বুঝতে পারে বোধহয়।

'বাবা-মার মতেই কি বিয়েটা করছিলে ?···তাঁদের মত কি ইতিমধ্যে নিয়েছ ? এই তো এখনই আমার বাবার মতের বিরুদ্ধেই বিয়ে করতে বলছিলে আমাকে!'

এবার কি অশোকার গলাতেও একটু ব্যঙ্গ উঁকি মারে কোথাও ?

ঠিক বুঝতে পারে না অরবিন্দ।

খানিকটা চুপ ক'রে থেকে বলে, 'কিন্তু ছেলেমেয়ে—তাদের কি পরিচয় দেবে ?'

'কেন ?' এবার তীক্ষ্ন হয় অশোকার কন্ঠ, 'তারা তোমার পরিচয় দিতে পারবে না ? তোমারও তো প্রেজুডিস কিছু কম দেখছি না, একটা কিছু অনুষ্ঠান না হলে, তুমি তোমার ঔরসজাত ছেলেকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতে পারবে না ?'

'না-না, তা কেন, বা রে! এসব কথা কেন আসছে!'

অসংলগ্ন হয়ে ওঠে অরবিন্দর কথাবার্তা।

'কথা তুমিই তুলেছ আমি তুলি নি···দ্যাখো, এই যে এত ফ্যামিলি চারপাশে দেখছি, এই যে এত আমার সহপাঠিনী, তোমার সহপাঠী বন্ধু বা বান্ধবী, এরা যে পিতৃপরিচয় দেয়—তার বাবা-মারা সমর্থন করে বলেই আমরা মেনে নিই, নয় কি ? কে কার বিবাহ-সভায় উপস্থিত থাকে বল ? রেজেস্ট্রি

বিয়ের তবু একটা কাগজ থাকে, হিন্দু বিয়ের তো তাও না। এদের যে সকলেই সত্যি সত্যি বিবাহের ফল তা কেউ হলপ ক'রে বলতে পারে? আমার এক মাস্টার মশাই একটা ব্যারাকবাড়িতে ছিলেন, তিনি বলেন তাঁর চারদিকে আঠারোটা ফ্যামিলি—গত সেন্সাসে খবর নিতে গিয়ে দেখা গেছে যে অধিকাংশই বিবাহিত দম্পতি নয়। মানে পরিচয় নাম পদবীর গোলমালেই ধরা পড়েছে। অথচ তারা সবাই সম্ভ্রান্ত লোক, বেশির ভাগই সরকারী চাকুরে, বড় বড় অফিসার—তাদের ছেলেমেয়েরা মিশনারী ইস্কুলে গভর্নমেন্ট ইস্কুলে পড়ছে—তাদের কিসে আটকেছে?'

অরবিন্দ নিজেকে যতই সংস্কারমুক্ত বাস্তবনিষ্ঠ যুক্তিবাদী বলে প্রচার করুক, বুদ্ধিমান তো বটেই—এতটা আধুনিকতা তার পক্ষেও গলাধঃকরণ করা কঠিন হ'ল।

সে আরও কিছু আপত্তি তুলতে চেষ্টা করল, আরও বহু যুক্তি প্রয়োগ করতে—কিন্তু অশোকা কোন কথাই শুনল না।

সে এক কথায় সমস্ত আলোচনা তর্ক-বিতর্ক যুক্তি-প্রতিযুক্তি প্রয়োগের পথ বন্ধ ক'রে দিয়ে পরিষ্কার বলল, 'তুমি তো জান আমি হঠাৎ কিছু ঠিক করি না, সাময়িক আবেগে বিশ্বাস নেই আমার। যা করি তা ভেবেচিন্তেই করি, সমস্ত প্রস্ আর কন্স্ একবারই ভেবে নিই—তারপর আর সহজে মত বদল করি না। আমাকে চাও কিনা তুমি, সেইটেই তোমার কাছে প্রধান বিচার্য হওয়া উচিত। ভাল ক'রে ভেবে দ্যাখো—য়্যাট অল আমাকে তোমার প্রয়োজন আছে কি না। তা যদি থাকে তাহলে আর এসব প্রশ্ন অনাবশ্যক। প্রয়োজন এবং আকুতিটাই সেখানে বড় কথা। তা যদি হয়—তাহলে আমার শর্তেই আমাকে নিতে হবে, আমি আমার মন জানি, আমার সমস্ত কামনা আবেগ আকুতি, যা বলো—তার চেয়েও তুমি আমার কাছে বড়। তোমার অনিষ্ট হবার, জীবন-সংশয় হবার আশঙ্কা আছে জেনেও আমি বিবাহের মধ্যে যেতে প্রস্তুত নই। সুতরাং আইদার দিস্—অর নট!'

এর পর সত্যিই কথা চলে না।

অরবিন্দর তখন মনে হয়েছিল, অশোকার সম্বন্ধে তার এই যে উন্মত্ত কামনা—এ-ই প্রকৃত ভালবাসা।

নির্ভেজাল, নিখাদ।

বিশেষ অশোকার এতখানি স্বার্থত্যাগ সে কামনা, সে প্রেম আরও বৃদ্ধিই পেয়েছিল।

সুতরাং রাজী হ'তে হয়েছিল তাকে, এই অদ্ভুত শর্তেই তার জীবনের মধ্যে অশোকাকে আনতে।

বলা বাহুল্য ওদের বাবা-মা সহজে রাজী হন নি, প্রবল আপত্তি করেছিলেন।

বিজয়বাবু ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে যথেষ্ট উদার—কিন্তু তবু এতটা বরদাস্ত

করা তাঁর পক্ষেও কঠিন।

বিশেষ অশোকার মা, তিনি বললেন, 'বেজাত কুজাতে বিয়ে করছে আজকাল—সে তবু একরকম, বিয়ে তো—যতই হোক। এ তো সোজাসুজি বেশ্যাবৃত্তি। কী বলছিস তুই?'

অশোকা উত্তর দিল, 'তোমরাই বলছ যেহেতু আমি তোমাদের বড় মেয়ে, সেহেতু বিয়ে হ'লেই আমি বিধবা হবো। তাহলে কি বলতে চাও—আমি চিরদিন এই সব বাসনা-কামনা বুকে ক'রে আইবুড়ো হয়ে থাকব?'

'এমন তো কত মেয়ে থাকছে আজকাল! আগেকার কুলীনের ঘরেও তো অমন আকছার থাকত!'

'সে তাদের জুটত না বলেই। আমার যখন জুটেছে, তখন আমি ছাড়ব কেন?'

মুখ গোঁজ ক'রে ওর মা উত্তর দেন, 'তা অরু তো বিয়ে করতেই চাইছে, ওর তো বিশ্বাস এটা বাজে কুসংস্কার—তাহলে বিয়েই কর।'

'নিশ্চিত এক মাসের মধ্যে বিধবা হবো জেনেও?···বাবা মিথ্যে কথা বলছেন—এতগুলো মিথ্যে ঘটনা বানিয়ে বলছেন—এ আমি বিশ্বাস করি না···সুতরাং এর পর বিয়ে করা মানে জেনে-শুনে একটা ভদ্রলোকের ছেলেকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া। সে আমাকে ভালবেসেছে বলে এত বড় শাস্তি তাকে দিতে পারব না।'

'তা সে তো—' ক্রুদ্ধা জননীর মুখ থেকে অত্যন্ত কদর্য ইঙ্গিতটাই প্রকাশ পায়, 'তা সে তো, তাতে তো আর একবার বিয়ের পথ বন্ধ হয় না—আজকাল তো এমন ঢের হচ্ছে।'

অশোকা যেন অকস্মাৎ আহত হবার মতোই তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে ওঠে, 'মা!'

আর্তনাদের মতো একটা চিৎকার ক'রে ওঠে সে।

আর কিছু বলতে পারে না।

যথেষ্ট বলবার মতো শব্দ যোগায় না তার মুখে।

কিন্তু সেই তীক্ষ্ণ কন্ঠে তীব্র অভিযোগের সুরেই কিছুটা কাজ হয়—ওর মা সচেতন হয়ে ওঠেন।

আর কথা না বাড়িয়ে মৃদুকণ্ঠে গজ গজ করতে করতে উঠে সেখান থেকে চলে যান।

॥ ৫ ॥

অরবিন্দ এসে বলে, 'বাবা-মা কিছুতেই রাজী নন। কোন কথাই কানে তুলতে চান না তাঁরা। আমার মাথার চিকিৎসা করার ব্যবস্থা করছেন।'

'তাহলে বাদ দাও।'

অবিচল ভাবে উত্তর দেয় অশোকা।

'বাদ দেব মানে ? কী বাদ দেব ? তোমাকে ?...না, সে ইমপসিব্‌ল্‌ !'

'তাহলে আর এসব কথা তুলছ কেন ? বিয়ে আমি তোমাকে করব না—কিছুতেই, সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত ও নিশ্চিত থাক।'

'আচ্ছা—ঐ যে বলে'—অপ্রতিভের মতো মুখ ক'রে বলে অরবিন্দ, 'তৃতীয় পক্ষ না কোন্‌ বিয়েতে আগে একটা ফুলগাছ না কলাগাছের সঙ্গে বিয়ে দেয় না ? তেমন কিছু একটা করলে কি হয় ?'

'সে ফুলগাছের সঙ্গে বিয়েটা হয় পুরুষের, আমাদের শাস্ত্রে পুরুষের বহু বিবাহে কোন বাধা নেই। মেয়েদের ও ফুলগাছই হোক কলাগাছই হোক—একবার বিয়ে হলে আর বিয়ে দেওয়া যাবে না, সে স্বৈরিণী হয়ে যাবে।...তা ছাড়া এভাবে নিয়তিকে ঠকানো যাবে কি বংশগত অভিশাপকে ঠেকানো যাবে তা আমি মনে করি না। যদি না যায় ? তোমার সম্বন্ধে এতখানি রিস্‌ক্‌ আমি নিতে রাজী নই।'

তবুও চুপ ক'রে আছে অরবিন্দ দেখে সে বলে, 'দ্যাখো এর মধ্যে যে লজ্জা বা অপমান সে তো আমারই বেশি। আমি যদি রাজী থাকি তো তোমার এত ভয় কিসের ? ঝুঁকি আমিই নিচ্ছি—তাই নয় কি ?'

তারপর একটু থেমে আবারও বলে, 'বাধার তো এই শুরু। সারা জীবন বহু বাধার সঙ্গে লড়াই করতে হয় বলেই তো বেঁচে থাকাটাকে জীবন-সংগ্রাম বলে গেছে কবিরা, লেখকরা। এতেই যদি এত ভেঙে পড় তো—এর পর কি করবে ?'

'ভেঙে পড়ছি কে বলল ? রাবিশ ! ওসব আমি পরোয়া করি না কি ? এখনই তো—বাবা যখন হিন্ট্‌স্‌ দিতে এসেছিলেন যে—এভাবে তাঁর মুখ ডোবালে তিনিও শোধ নেবেন—অর্থাৎ ভয় দেখাতে এসেছিলেন যে পার্সাস্ট্রিংয়ে গেরো দেবেন—টাকা-পয়সা কিছু দেবেন না—বিষয়-সম্পত্তিতে বঞ্চিত করবেন, তখন সোজা তাঁর মুখের ওপর বলে দিলুম, জীবন যদি নিজের মতো করে শুরু করি তো—নিজের পায়ে ভর দিয়েই করব—বাবার ওপর ভর দেব না। ভারি তো লাখখানেক টাকার বিষয়, তাও দু-তিন ভাগ হবে—এটুকু হিম্মৎ রাখি—অমন ঢের লাখ টাকা জীবনে রোজগার করতে পারব।... বাবা ভয় দেখিয়ে যখন সুবিধা করতে পারলেন না, তখন মাকে পাঠালেন। মা ঘুষ দিতে এসেছিলেন, বললেন, আমি যদি ওঁদের মতে বিয়ে করি, এখনই ওঁরা আমাকে পঁচিশ হাজার টাকা দিয়ে দেবেন—মানে যতদিন না আমার উপার্জন শুরু হয় আমি ইন্ডিপেন্ডেন্টলি সংসার করতে পারব—টাকার জন্যে যে ওঁদের সঙ্গে বনিয়ে চলতে হবে তার কোন মানে নেই।'

এই বলে গর্বের হাসি হাসবার চেষ্টা করল অরবিন্দ—কিন্তু তা ফুটল না। হাসিটা একটু দুর্বলই বোধ হ'ল।

শেষ পর্যন্ত নিজের ওপর ভর দিয়েই জীবন শুরু করেছিল অরবিন্দ। মনের জোরে কোন দৈন্য কোনদিনই ছিল না।

নইলে নতুন উকীল হয়ে আদালতে ঢুকে, তাও তখনও পুরোদস্তুর য়্যাডভোকেট হয় নি—কেউ এমন ভাবে সংসার ফেঁদে বসতে সাহস করে না।

কিছু টাকা বন্ধু-বান্ধবদের কাছ থেকে নিতে হয়েছিল, ফ্ল্যাট ভাড়া করার আগাম টাকা, গৃহস্থালী সাজাবার মতো আসবাবপত্র কেনা—অন্তত দু-এক মাসের জীবনযাত্রার খরচ, এসব হিসেব ক'রেই পা বাড়াতে হয়েছিল বৈকি—কিন্তু উপার্জনও শুরু করেছিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

একটা বড় আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে লিগ্যাল-য়্যাডভাইসারের চাকরি পেয়ে গিয়েছিল।

তাঁরা প্রথমটায় নাক তুলেছিলেন, এখনও ফুল-ফেজেড্ য়্যাডভোকেট নয় বলে, তাছাড়া তার এক সেকেলে ব্রাহ্ম ডিরেক্টারের কানে 'অবৈধ' সম্পর্কটার কথাও কি ক'রে উঠেছিল—তিনি 'ইম্মর্যালিটি'কে প্রশ্রয় দিতে চান নি—কিন্তু তৎসত্ত্বেও অরবিন্দ সে চাকরি বাগিয়েছিল।

এ রোগের ওষুধ সে জানত—সেক্রেটারীকে মাসিক একশো টাকা কমিশন কবুল ক'রে এবং মাইনেটা আগের লিগ্যাল য়্যাডভাইসারের থেকে দুশো টাকা কম—অর্থাৎ মোট পাঁচশো টাকা নিতে রাজী হয়ে চাকরি পেয়েছিল।

মাসে চারশো টাকা বাঁধা আয়—মস্ত বড় সহায় হয়েছিল সেদিন।

আরও কিছু কিছু উপার্জন হ'ত—নিয়মিত আদালত ঘুরে।

সেটা ওর সিনিয়রই পাইয়ে দিতেন।

তাতে খুব একটা সচ্ছল অবস্থায় না হোক, স্বচ্ছন্দে চলে যেত ওদের—সাধারণ ভদ্রভাবেই।

কিন্তু বেচারী অশোকাই পারল না কিছু করতে।

ও চেয়েছিল ওদের সংসারের খরচে সে-ও কিছু দেবে, স্বামীকে দেখিয়ে দেবে যে সে কেবল বোঝা নয়, আলমারিতে সাজাবার পুতুল নয়—কিন্তু পারল না।

একটা ইস্কুল-মাস্টারীও যোগাড় করতে পারল না।

যেখানেই যায়—'অবৈধ' শব্দটা যেন তাড়া করে ওকে।

কোথা থেকে যে খবরটা পৌঁছয়—বুঝতেই পারে না। এক একজন স্পষ্টই বলে দেন, কর্তৃপক্ষীয়রা—যে প্রকাশ্যে গণিকার জীবন যাপন করছে, তার পক্ষে মেয়েদের শিক্ষা দিতে আসার প্রস্তাবটাই ধৃষ্টতা।

আপিসে চাকরির চেষ্টাও করেছে, দু-এক জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে পাসও করেছে অর্থাৎ যেখানে একশো লোক নেবে সেখানে হয়তো ওর স্থান হয়েছে পঞ্চাশের ঘরে—বেশ ভাল মার্জিন, তবু শেষ পর্যন্ত কাজ পায় নি।

কেন পায় নি তার শতেক কারণের কথা কানে গেছে—তবু, কে জানে কেন, অশোকার মনে হয়েছে যে আসল কারণ ঐ 'অবৈধ' শব্দটা।

এই যুগেও মানুষের দুর্নীতির ভয় এত প্রবল আছে—তা জানত না অশোকা।

যেখানে অবৈধ সম্পর্ক প্রায় ঘরে-ঘরেই—বিবাহিত বলে যারা চলছে তাদের

মধ্যে শতকরা পাঁচজনই হয়তো কখনও পি'ড়িতে বসে নি বা রেজেস্ট্রিতে সই করে নি—সেখানেও মাঝখান থেকে যত অন্যায় ক'রে বসল ওরাই—বলে-কয়ে সত্যভাষণ ক'রে জীবন শুরু করতে গিয়েই চোরের দায়ে ধরা পড়ে গেল।

মিথ্যে কথা বলে—রেজেস্ট্রি হয়ে গেছে বলে প্রচার করলেই এসব কোন গোলমাল হ'ত না।

সত্য কথা বলতে গিয়েই এই দুর্দশা।

অবশ্য অরবিন্দ গোড়া থেকেই ওর এ চেষ্টায় বাধা দিয়েছে।

অশোকাও উপার্জন করবে একথা ও কখনও ভাবে নি, করে নি বলে ক্ষুন্ন তো হয়ই নি।

সে নিষেধই করেছে বার বার।

বলেছে, 'আমাকে তুমি চেন নি টুটু, আমি একাই একশো। তোমার ও দুর্বল হস্তের সাহায্যে আমার কিছুমাত্র প্রয়োজন হবে না। তুমি শুধু আমার পাশে থেকো, একটু মদত দিও, ভালবেসো—তাতেই হবে, সেই তোমার আসল কাজ।'

অবশ্য বন্ধুবান্ধবরা করেছে ঢের।

কেউ কেউ যে তাদের মধ্যেও নীতিবাগীশ ছিল না তা নয়, তারা বিমর্ষভাবে ঘাড় নেড়েছে, এমন ব্রিলিয়াণ্ট ছেলেটা মাটি হয়ে গেল বলে দুঃখ প্রকাশ করেছে, সদুপদেশ দিতে এসে 'স্নাবড্' হয়েছে—তারপর নিঃশব্দে সরে পড়েছে।

কিন্তু বেশির ভাগই ওদের এই নতুন এক্সপেরিমেণ্ট উৎসাহ প্রকাশ করেছে, উৎসাহিত করেছে।

আসা-যাওয়া ঘনিষ্ঠতা—বরং একটু বেশিই করেছে বোধহয়।

স্বাভাবিক ক্ষেত্রে যা হ'ত তার চেয়ে অনেক বেশি।

তারা যে 'কিছুই মনে করছে না' এইটে বেশী ক'রে বোঝাতে গিয়েই হয়তো কথাটা পদে পদে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে—তবু সেদিন তাদের সাহচর্য, উৎসাহ, স্বাভাবিক বা নর্মাল হবার চেষ্টা, অনেকখানি সাহায্য করেছে এদের মনোবল বজায় রাখার এটা অনস্বীকার্য।...

তারপর ধীরে ধীরে এরাও ভুলে এসেছে অবশ্য—এদের জীবনযাত্রার মধ্যে কোন ফাঁক বা ফাঁকি আছে কিনা।

সত্যি-সত্যিই কখন একসময় স্বাভাবিক ও সহজ হয়ে গেছে সবটা।

পাত্র-পাত্রী নিজেরাও ভুলে এসেছে ক্রমশ।

অরবিন্দ মিসেস মল্লিক বলেই পরিচয় দিয়েছে সর্বত্র—কিন্তু সেটাকে কখনও ইচ্ছাকৃত বা চেষ্টাকৃত বলে বোধ হয় নি আর, আগে যেমন হ'ত।

অন্তত আগে যেমন মনে হ'ত অশোকার।

এইভাবে পাঁচটি বছর কেটে গেছে।

সুদীর্ঘ পাঁচটি বছর।

অরবিন্দ এর মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে—নামকরা অ্যাডভোকেট হিসেবে।

মক্কেলের ভিড় বাড়তে আগের সে ছোট ফ্ল্যাটে থাকা সম্ভব হয় নি—অপেক্ষাকৃত বড় একটা ফ্ল্যাটে উঠে আসতে হয়েছে।

শেষ পর্যন্ত সে চাকরিটাও ছেড়ে দিতে হয়েছে, সময়াভাবে।

যদিও তাঁরা ওকে সহজে ছাড়তে চান নি—মাইনে বাড়িয়ে এবং কাজের দিন কমিয়েও আটকাতে চেয়েছিলেন।

এর মধ্যে একটি ছেলেও হয়েছে ওদের, সুন্দর, ফুটফুটে, স্বাস্থ্যবান।

প্রাইজ-বেবির মতোই।

ওদের অকৃত্রিম প্রণয়ের ফল।

অন্তত অশোকার তাই মনে হয়েছে।

মনে হয়েছে ওদের এ মিলনে পাপ নেই বলেই বিধাতা এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান সন্তান দিয়েছেন ওকে।

এ তাঁরই অনুমোদন ও আশীর্বাদ।

অশোকার মনে হয়েছে তার জীবনে সুখের ও আনন্দের পাত্র কানায় কানায় ভরে গিয়েছে, সে জীবন থেকে এর বেশি আর কিছু চায় না, চায়ও নি।

কেবল তার আর অরবিন্দর মা-বাবারা তাদের ত্যাগই করেছেন।

তবু বিজয়বাবু মধ্যে মধ্যে লোক-মারফৎ খবরাখবর করেন—অরবিন্দর মা-বাবা সেটুকুতেও রাজী নন।

ছেলের উন্নতি হয়েছে—হচ্ছে। এ সংবাদে তাঁরা আরও বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছেন অশোকার ওপর।

তবে তাঁরা গোপনে ভাল ভাল বিয়ের সম্বন্ধ পাঠিয়েছেন—'অর্ধেক রাজত্ব আর একটি রাজকন্যা' গোছের, সে-সংবাদ পেয়েছে অশোকা, অরবিন্দই বলেছে।

দুজনেই হাসাহাসি করেছে খুব এ নিয়ে।

এর মধ্যে কোন সত্যকার আশঙ্কার কারণ থাকতে পারে, তা কখনও মনে হয় নি কারও।

॥ ৬ ॥

কিন্তু বিধাতার অনুমোদন বা আশীর্বাদ—বোধহয় মেলে নি শেষ পর্যন্ত।

সে বার্তা এল অপ্রত্যাশিত ভাবে—অকল্পিত পথ বেয়ে।

অরবিন্দর প্রণয় সম্বন্ধে অশোকার কোন আশঙ্কা কখনই ছিল না। অরবিন্দর নিজের মন থেকেও যখন সব আশঙ্কা চলে যেতে বসেছে, ঠিক তখনই ঘটনাটা ঘটল।

ক্রমশ খ্যাতি বেড়েছে যত, বড় বড় মক্কেলও আসতে শুরু করেছে অরবিন্দর।

কলকাতার বাইরেও ডাক পড়তে শুরু হয়েছে।

এইভাবেই একটা বড় ফার্মের কেস পেয়ে দিল্লীতে এসেছে অরবিন্দ।

সেখানের বড় কাউন্সেল যিনি—তাঁকে কেস বুঝিয়ে দিতে হবে—অন্যতম জুনিয়ার হিসেবে কাজ করতে হবে।

মোটা টাকা—খরচ-খরচা সব তাদের।

প্রথম শ্রেণীর হোটেলে থাকার ব্যবস্থা—প্লেনে যাতায়াত।

প্রস্তাব এতই লোভনীয়—সব দিক থেকে—যে ছাড়া যায় না।

তবু একবার অশোকাকে জিজ্ঞাসা করেছিল অরবিন্দ, 'কী করব—যাব, না ছেড়ে দেব ?'

অশোকাই বলেছিল, 'না না, যাবে বৈকি ! এত বড় ওপনিং একটা, ছেড়ে দেবে !···চলে যাও।'

সে-ই সর্বনাশের সূত্রপাত।

অরবিন্দর নয়—অশোকার।

এই কেসে যে-সব সিনিয়র ব্যারিস্টার ছিলেন, তার মধ্যে মিঃ মালহোত্রা অন্যতম।

তাঁর বাড়িতে প্রায় প্রতি সন্ধ্যাতেই যেতে হ'ত।

পরের দিনের কাজ আগের দিন এগিয়ে না রাখলে চলে না।

কাগজপত্র সাজানো—আইনের রেফারেন্স ঠিক করা এগুলো সেরে রাখতে হ'ত।

কাজ সারা হ'লে মালহোত্রা বেরোতেন সামাজিক জীবন যাপন করতে। তাঁদের বিশেষ সামাজিক জীবন।

উঁচুদরের ক্লাবে, হোটেলে, পার্টিতে। সঙ্গে কোন-কোনদিন স্ত্রী কন্যাও যেত।

অরবিন্দর সঙ্গে পরিচয় হবার পর ওর তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তি, অসাধারণ সহজ জ্ঞান এবং আইনের মধ্যে অনুপ্রবেশের সহজাত ক্ষমতা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন মালহোত্রা, ও যে ভবিষ্যতে বহুদূর যাবে, অনেক উঁচুতে উঠবে সে বিষয়ে সন্দেহমাত্র ছিল না তাঁর।

তাই ওর সাহচর্য ভাল লাগত তাঁর।

নিজের সমকক্ষই জ্ঞান করতেন। ছোট চোখে দেখতেন না।

দু-একদিন পরেই তিনি অরবিন্দকে নিজের পারিবারিক জীবনের অন্তর্ভুক্ত ক'রে নিলেন।

অরবিন্দও ওঁর সঙ্গে ক্লাবে-পার্টিতে যেতে শুরু করল।

সেই-ই দেখা নীলিমা মালহোত্রার সঙ্গে।

ওদের সর্বনাশের সূচনা।

কী যে ছিল নীলিমার মধ্যে তা বলতে পারবে না অরবিন্দ।

এ প্রশ্ন সে সহস্রবার করেছে নিজেকে—উত্তর দিতে পারে নি।

আজ তো বলা সম্ভবই নয়—কারণ আজ নীলিমার চার্ম বা আকর্ষণী-শক্তি বলতে কিছুই নেই।

দিল্লীর আর পাঁচটা মেয়ের মতোই উগ্র আধুনিক সাজসজ্জা, রঙের পুরু প্রলেপ আর কৃত্রিম খোঁপার আড়ালে একটা কঠিন দেহ ও স্বার্থপর উদ্ধত মন—নীলিমা মল্লিক আজ এই-ই, এর বেশী কিছু নয়।

কিন্তু সেদিন বোধহয় আরও কিছু ছিল।

সেদিন অরবিন্দ মুগ্ধ শুধু নয়—উন্মত্ত হয়ে উঠেছিল।

কোন মেয়েকে দেখে যে কোন পুরুষ এমন অভিভূত এমন উন্মত্ত হয়—এর আগে এ সম্বন্ধে কোন ধারণা পর্যন্ত ছিল না তার।

নারীদেহ সম্বন্ধে কারও লালসা এত উগ্র হ'তে পারে—তা সে জানত না।

সে সত্যি-সত্যিই পাগল হয়ে উঠল প্রায়।

ভালমন্দ অগ্রপশ্চাৎ কোন বিবেচনাই আর রইল না।

মানবিকতাবোধ তো অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা চিন্তা একটা—যা অনেক প্রত্যক্ষ ও বাস্তব—সেই অশোকা এবং তার খোকন পর্যন্ত স্মৃতির কোন্ দূর দিগন্তে মিলিয়ে গেল যেন।

এরই মধ্যে একদিন মালহোত্রা প্রশ্ন করলেন, 'আর ইউ ম্যারেড্? বিয়ে করেছ তুমি?'

এক মুহূর্ত যেন সময় লাগল উত্তর দিতে।

জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্ত।

বহুদূর-প্রসারী ফলাফলবহ মুহূর্ত একটি।

এটুকুও লাগা উচিত ছিল না।

কারণ নীলিমাকে ছাড়া তার চলবে না, এ তো মনের মধ্যে স্থির হয়ে গেছে কবেই।

তবে ওটাও কি বিবেক নামক কোন কুসংস্কার? এই দ্বিধাটা?

কিন্তু সে ঐ এক মুহূর্তই।

তার পরই নির্দ্বিধায় বলে দিল, 'না। নট ইয়েট।'

মালহোত্রা নামকরা দুঁদে ব্যারিস্টার—মস্ত বড় বললে তাঁর বর্ণনা মাত্র হয়, ব্যঞ্জনা হয় না।

দুর্ধর্ষ কি প্রচণ্ড বললেই ঠিক বোঝায়—এমন তীক্ষ্ণধী ও তীক্ষ্ণভাষী লোক তিনি।

মানুষের মনের অতলে চলে যেতে এক লহমার বেশী সময় লাগে না তাঁর।

ঐ এক মুহূর্তের বিলম্বও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি।

তিনি নিজস্ব অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে ওর মুখের দিকে চেয়ে পুনশ্চ প্রশ্ন করলেন, 'এনি এন্‌ট্যাঙ্গল্‌মেন্ট?'

এবার আর ভুল করল না অরবিন্দ।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, 'নাথিং আন্‌ইউজুয়াল্!—অর সিরিয়াস!'

মালহোত্রা বিলেত-ফেরত ব্যারিস্টার—ধনী।

সামাজিক জীবও।

জীবনের সব রকম অভিজ্ঞতাই আছে তাঁর।

তাঁর কাছে ভালমানুষ সেজে 'একেবারে কিছুই জানি না' বলতে গিয়ে কোন লাভ নেই, এতখানি—এই ত্রিশ-একত্রিশ বছর পর্যন্ত খোকা সেজে থাকাটাকেই এঁরা অপদার্থতা বলে মনে করবেন। তাছাড়া যার এখনও বিলেতে যাতায়াত আছে, পাশ্চাত্ত্য প্রভাব যার জীবনে এখনও অগ্রগণ্য—সে একটু-আধটু যৌন অভিজ্ঞতাকে অপরাধ বা অন্যায় বলে ভাববে না নিশ্চয়।

সত্যিই তা ভাবলেন না মালহোত্রা।

খুশী হয়েই বলে উঠলেন, 'গুড্। সুখী হলাম শুনে। শোন—মাই বয়, তোমাকে আমি একটা ভাল অফার দিচ্ছি। তুমি জানো আমার ছেলেটা অত্যন্ত—কী বলব—সিলি! তার মাথায় ঢুকেছে ফিল্ম, মিউজিক এইসব; সে আইন-ব্যবসাকে অত্যন্ত ঘৃণা করে, যদিচ এ ব্যবসার টাকা না হ'লে তার ব্যবসার কী হ'ত, তা বলা কঠিন।' তীক্ষ্ণ-করুণ ব্যঙ্গ ফুটে ওঠে মালহোত্রার কণ্ঠে। বলেন, 'হাউএভার, যা বলছিলুম, আমার এই বিপুল প্র্যাকটিস আমার কাছ থেকে বুঝে নেবার কেউ নেই। মেয়েকে তৈরী করা যেত—অনেকেই করছে, কিন্তু সে-ও আমি দেখছি, নো গুড। ওটা একটা সেন্সেশন—মেয়ে কাউন্সেল, নাথিং এল্স্। মেয়েদের মাথাটাই একদম লজিক্যাল নয়, ওরা ওকালতি করবে কি? নির্বোধের জাত। তাই বলছিলুম, তুমি ওকে বিয়ে করবে? মানে আমার মেয়েকে? তুমি যে ওর প্রতি—কী বলব—আকৃষ্ট হয়েছ তা আমি লক্ষ্য করেছি। আমার মেয়ের য়্যাটিচুডও আন-রেস্পন্সিভ নয়। তুমি ওকে বিয়ে করলে তোমাদের দুজনকেই বিলেত পাঠিয়ে দেব—তুমি ব্যারিস্টার হয়ে আসতে পারবে! একবার নামের পাশে ঐ লেজুড়টুকু জুড়ে আসতে পারলে আর চিন্তা নেই—প্র্যাকটিসের জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। আশা করি তোমার এ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান আছে—আমার লাইব্রেরীটাই ওআর্থ টু ল্যাক্স্—য়্যাট দ্য লিস্ট ভ্যালুয়েশন!'

এ প্রস্তাব হাত বাড়িয়ে স্বর্গ পাবার মতোই মনে হয়েছিল অরবিন্দর।

কিন্তু সে মালহোত্রার বিপুল সম্পত্তি বা নিজের ভবিষ্যৎ উন্নতির চিন্তায় নয়—এটা যে-কোন শপথ ক'রেই বলতে পারে অরবিন্দ।

সেদিন এসব কোন বিবেচনাই তাকে ঐ অমানুষিক বিশ্বাসঘাতকতা বা প্রবঞ্চনার পথে ঠেলে দেয় নি।

টাকা তুচ্ছ জিনিস নয়, টাকার প্রয়োজন সে বোঝে, চিরদিন বুঝে এসেছে।

তেমনি নিজের ওপরও অগাধ বিশ্বাস তার—এই টাকা সে হেলায় রোজগার করতে পারবে, এ ভরসাও তার চিরদিনের।

না, টাকা নয়। এ অন্য স্বর্গ।

হয়তো সত্যকার স্বর্গ নয়। কল্পিত, তবু সেই স্বর্গের জন্যেই লালায়িত হয়ে উঠেছিল ওর মন।

সেদিন নীলিমাকে লাভ করার প্রশ্নটাই একমাত্র বিবেচ্য হয়ে উঠেছিল ওর কাছে।

সেই জন্যই—কোন দ্বিধা করে নি, চিন্তা করার জন্য সময় চায় নি—একবার নিজের মনটা তলিয়ে বুঝে দেখাও প্রয়োজন বোধ করে নি।

একেবারেই সাগ্রহে সম্মতি জানিয়েছিল।

এর পর দ্রুত নাটকের পট পরিবর্তন হয়েছে।

নানা ছুতোয় কলকাতা যাওয়াটা পিছিয়ে দিয়েছে অরবিন্দ।

পিছিয়ে দিয়েছে, তার কারণ নীলিমাকে ছেড়ে কোথাও যাওয়ার কথা চিন্তাও করতে পারে নি তখন।

মালহোত্রাও অত ভেবে দেখার সময় পান নি।

শুধু প্রশ্ন করেছিলেন যে, 'তোমার বাবা-মা? তাঁদের জানানো উচিত নয়?'

তার উত্তরে অরবিন্দ বলেছিল, 'আমি বহুদিনই তাঁদের সংস্রব ছাড়া।'

'তোমার এস্ট্যাব্লিশমেণ্ট তাহলে কাকে নিয়ে? সেখানে দেখে কে?'

ব্যস্ত ব্যারিস্টার অন্যমনস্কভাবে প্রশ্ন করেছিলেন।

'চাকর-বাকরই দেখে। আর কে দেখবে!'

তেমনিই—চেষ্টাকৃত অন্যমনস্কভাবে উত্তর দিয়েছিল অরবিন্দ।

ওধারে বন্দোবস্ত শেষ ক'রে একবার কলকাতায় আসতে হয়েছিল অরবিন্দকে।

কিন্তু ওর সৌভাগ্যক্রমেই বোধহয় সেই সময়ই ঠিক বিজয়বাবু পুরীতে গিয়ে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, অশোকার মা সেই সংবাদ দিয়ে মেয়েকে যেতে বলেছিলেন—মৃত্যুশয্যায় বাপকে দেখে যেতে বলা উচিত মনে ক'রে।

এ সময় আর সংস্কারকে হৃদয়ের ওপরে স্থান দিতে চান নি।

সেই টেলিগ্রাম পেয়ে অশোকা চলে গিয়েছিল ছেলেকে নিয়েই।

বাড়িতে ছিল ওদের ঝি, আর অরবিন্দর এক বন্ধুর ভাই রক্ষক হিসেবে।

অরবিন্দ বেঁচে গেল।

সে নিশ্চিন্ত হয়ে এখানের ব্যাপার মোটামুটি গুছিয়ে নিল।

অশোকাকে শ' পাঁচেক টাকা মনিঅর্ডার ক'রে পাঠিয়ে—টেলিগ্রামেই সে যে কেন যেতে পারছে না অর্থাৎ বিষম ব্যস্ত জানিয়ে—আরও হাজার দুই টাকা এখানে অশোকার ব্যাঙ্ক য়্যাকাউণ্টে জমা দিয়ে—ছ'মাসের বাড়ি ভাড়া আগাম চুকিয়ে দিয়ে আবারও একদিন দিল্লী রওনা হয়ে গেল।

ঠিক যেমন ভাবে সেকালের বাবুরা পুরাতন রক্ষিতাদের বিবেচনার সঙ্গে ত্যাগ ক'রে যেতেন—সেই ভাবেই।

নতুন বাবু না আসা পর্যন্ত তখনই না কোন আর্থিক অসুবিধায় পড়তে হয়।

যাবার সময় রেখে গেল একখানি দীর্ঘ চিঠি।

আইনে না ফেলা যায়, এই চিঠির দ্বারা আসন্ন বিবাহ তথা উন্নতিতে না বাধার সৃষ্টি হয়; সেইজন্য আইনজ্ঞ অরবিন্দ যথেষ্টই সতর্কতা অবলম্বন করেছিল।

এই চিঠিই বোধকরি অরবিন্দর প্রতিভার এক আশ্চর্য নিদর্শন।

তার অসাধারণ বুদ্ধির প্রমাণ।

ইতিমধ্যে সে যে-সব চিঠি অশোকাকে লিখেছিল—সেগুলো কোথায় থাকা সম্ভব তা অনুমান ক'রে সেগুলো খুঁজে বার ক'রে নষ্ট করে ফেলেছে আগেই।

যা লিখে রেখে গিয়েছিল তার মর্মার্থ হচ্ছে—দোষ সম্পূর্ণ অশোকারই।

তার খামখেয়ালির জন্যেই অরবিন্দর জীবনটা নষ্ট হতে চলেছিল।

এভাবে বিবাহিত জীবনের আওতার বাইরে 'ডিবচ্' বা লম্পটের জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়।

তার শিক্ষাদীক্ষা এ ধরনের স্বেচ্ছাচারের, এই শ্রেণীর কলঙ্কিত জীবন-যাপনের সম্পূর্ণ বিরোধী।

সে তার ভুল বুঝতে পেরে সে ভুল সংশোধনের ব্যবস্থা নিয়েছে—ঈশ্বরের দয়ায় উপযুক্ত জীবন-সঙ্গিনীও পেয়ে গেছে সে, মনে হচ্ছে এ যোগাযোগ ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ।

সে আশা করছে ও করবে যে, অশোকাও তার ভুল বুঝবে এবং এখনও যথেষ্ট সময় আছে—সংশোধনের চেষ্টা করবে।···

অশোকার পুরী থেকে ফিরতে বেশ একটু দেরী হয়ে গিয়েছিল।

বিজয়বাবুর করনারী থ্রম্বসিস—খুব নাকি খারাপ ধরণের, বাঁচার বিশেষ আশাই ছিল না।

সুখের সময় তাঁর কি প্রয়োজন হয়, কী করলে তিনি একটু আরাম বোধ করেন তা অশোকাই ভাল জানে।

বিয়ের আগে সে-ই বরাবর ক'রে এসেছে এসব।

ওর মা এই বিপদের দিনে তাই ওকেই আঁকড়ে ধরলেন—অশোকাও ছেড়ে আসতে পারল না।

কার ওপরই বা ছেড়ে আসে!

খবর পেয়ে ওর ভাই আর বোন অবশ্য এসেছিল।

কিন্তু তারা একেবারেই আনাড়ি, তাদের ওপর ভরসা ক'রে ঐ ধরনের রোগী ফেলে আসা যায় না।

বিজয়বাবু বিশেষ কিছু বলেন না, শুধু অশোকার ফেরার কথা উঠলে তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল পড়ে, শীর্ণ দুর্বল হাতে ওর হাতটা চেপে ধরেন।

তাতেই আরও নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

ওর বাবার এ অসুখের জন্যে সে-ই যে সব চেয়ে দায়ী—একথা অশোকার থেকে বেশি কে জানে?

মুখে কিছু বলেন নি বিজয়বাবু। ওর মায়ের মতো রাগারাগি বকাবকি করেন নি। তবু আঘাত পেয়েছেন বৈকি।

সে-দায়ের যদি কিছুটাও লাঘব হয়—অশোকা অন্তত খানিকটা স্বস্তি

পেতে পারে মনে মনে।

তাই বলে অযথা দেরী করে নি সে একটি দিনও।

যেদিন একটু সুস্থ মনে হয়েছে বিজয়বাবুকে—সেই দিনই সে রওনা দিয়েছে ওখান থেকে।

'জামাই' একলা আছে বুঝে এঁরাও বাধা দেননি আর।

তবু যেদিন গেছে আর যেদিন ফিরেছে—তার মধ্যে পুরো তিন সপ্তাহ কেটে গেছে।

ফিরে এসেই চিঠিখানা পেল।

খামে-আঁটা চিঠি, ড্রেসিং টেবিলের ওপর পড়ে আছে।

খামের ওপর নাম-ঠিকানা নেই, চিঠিতেও কোন সম্বোধন নেই।

সর্বপ্রকারেই আইন বাঁচিয়েছে অরবিন্দ মল্লিক।

সেদিন সেই জনহীন ঘরে এই চিঠি পাবার পর অশোকার মুখভাব কি হয়েছিল তা কেউ জানে না।

কী অনুভব করেছিল সে, ঠিক কোন ভাবটা প্রবল হয়ে উঠেছিল—ভেঙে-পড়া, হতাশা, না দিকদাহকারী জ্বালা—তাও কেউ দেখে নি।

ঘরে কেউ ছিল না, থাকলেও সে বুঝতে পারত না।

কারণ অশোকার পাথরের মূর্তির মতো মুখে মনোভাব প্রতিফলিত হয় কদাচিৎ।

শুধু অনেকক্ষণ একভাবে স্থির হয়ে বসে ছিল—এটা ঝি লক্ষ্য করেছে।

আরও লক্ষ্য করেছে, ছেলের কান্নাকাটি টানাটানিতে শেষ পর্যন্ত যখন উঠতে হয়েছে—তখন পা দুটো ঠিকমতো পড়ছিল না। হয়তো একটু কাঁপছে, মাথা ঘুরলে বা নেশা করলে যেমন কাঁপে বা টাল খেয়ে খেয়ে পড়ে, তেমনি।

এ ছাড়া আর কিছু নয়।

মর্মান্তিক আঘাত পাবার আর কোন লক্ষণ না।

তবে সে ভাবও দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

অসাধারণ মনের বলে নিজেকে স্বাভাবিক ক'রে নিয়েছে অশোকা।

ভেঙে পড়ে নি। লোকের কৌতূহল জাগ্রত করে হাস্যাস্পদ হয় নি।

সহজভাবেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখেছে, সহজভাবেই—যেমন অন্যদিন করে—ছোটখাটো বিশৃঙ্খলা যা নজরে পড়েছে, সেগুলো গুছিয়ে সাজিয়ে ঠিক করেছে।

যন্ত্রচালিতের মতোই ক'রে গেছে হয়ত—অভ্যস্ত হাত তার কাজ ক'রে গেছে—কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই করেছে।

কোথাও কোন অপ্রকৃতিস্থতা প্রকাশ পায় নি তার আচরণে বা চলনে-বলনে।

এই অভ্যস্ত কাজের মধ্যেই লক্ষ্য করেছে কী নির্ভুল ও নিপুণ ভাবেই অরবিন্দ তার নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরিয়েছে—অথচ ঝি বা যে বন্ধুর

ছেলেটি ছিল, তাদের সন্দেহের কারণ ঘটায় নি।

অরবিন্দর প্রতিভায় সেদিন মুগ্ধ না হয়ে ও পারে নি।

নিজের সহস্র দুঃখের মধ্যেও মনে মনে তারিফ করেছে।

আইনের বইয়ের মধ্যে যেগুলি দুষ্প্রাপ্য সেইগুলোই শুধু নিয়ে গেছে, বাকীগুলোতে হাত দেয়নি।

ব্যক্তিগত জিনিস যা, পোশাক প্রভৃতি—তাও সব নেবার চেষ্টা করে নি, দরকারীগুলো—পছন্দসইগুলোই নিয়েছে।

অনাবশ্যক ভার বাড়ায় নি, অকারণে সন্দেহের কারণ হয় নি।

এখানে বাসা চিরদিনের মতো ভেঙে দিয়ে গেছে— অথচ কাউকে টের পেতে দেয় নি।

যুদ্ধক্ষেত্রেই নাকি এইভাবে পশ্চাদপসরণ করে—হঠাৎই মনে পড়ল অশোকার, শত্রুপক্ষকে জানতে দেয় না যে তারা চলে যাচ্ছে—তাঁবু ঠিক থাকে, রাত্রের অন্ধকারে দরকারী অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে নিঃশব্দে পিছু হটে যায়!

এও তো একরকম যুদ্ধই।

'জীবন-সংগ্রাম'—কথাটা অশোকাই বলেছিল না? কাকে যেন বলেছিল—অরবিন্দকেই তো? ··

ঠিক, ঠিক।

সেই ভাষাটাই আজ বুঝি বুমেরাঙ্ হয়ে ফিরে এল।

হাসি, হ্যাঁ, হাসিই পেলো অশোকার।

সেইদিনই দৈবাৎ ইংরেজি কাগজখানা চোখে পড়ল।

জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের ও ব্যক্তিগত সংবাদের সে বিজ্ঞাপনগুলো সম্পাদকীয় পৃষ্ঠার বাঁ-দিকে থাকে—কোনদিনই পড়ে না—আজ বোধ হয় মনের অবচেতনে কৌতূহলটা ছিল বলেই, সেদিকটায় চোখ গিয়ে পড়েছিল।

দেখল, জনৈকা নীলিমা মালহোত্রার সঙ্গে জনৈক অরবিন্দ মল্লিকের বিবাহ হয়ে গেছে, তদুপলক্ষে কোন এক হোটেলে পার্টিও দেওয়া হয়েছে একটা।

খুবই নামকরা হোটেল।

সেই বিজ্ঞাপনেরই নিচে ছিল—ব্যক্তিগত সংবাদে, অরবিন্দ ও নীলিমা মল্লিক কয়েকদিন সুইৎসারল্যান্ডে মধুচন্দ্রিমা যাপন ক'রে ইউ. কে.-তে যাবেন, মিঃ মল্লিক সেখানে ব্যারিস্টারী পড়বেন—মিসেস মল্লিক জার্নালিজম্। অবসর সময় নাচেরও লেসন নেবেন। ইত্যাদি—

তারিখটা সেইদিনকারই।

কাগজখানা—নাটকের বা ছায়াছবির নায়িকার মতো—হাত থেকে খসে পড়ে নি অশোকার—শেষ পর্যন্ত ধরাই ছিল।

তারপরও বহুক্ষণ পর্যন্ত ধরা ছিল।

হয়তো সেই পৃষ্ঠাটাই।

চোখ ঝাপ্সা হয়ে গিয়েছিল বা হরফগুলো লেপে মুছে একাকার হয়ে

গিয়েছিল—এমনও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নি।

চোখে তো জল আসেই নি। বরং শুকিয়ে কাঠই হয়ে গিয়েছিল বোধহয় —চোখ দুটো শুধু নয়—অন্তরও।

॥ ৭ ॥

তারপর এই।

সাক্ষাৎ শুধু নয়—অরবিন্দ এই প্রথম খবরও পেল অশোকার।

হয়ত ঠিক এ খবরটার জন্য প্রস্তুত ছিল না সে।

এইভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে হচ্ছে অশোকাকে—করতে হবে—এ কথাও ভাবে নি।

নীলিমা সম্বন্ধে ওর মোহভঙ্গ হয়েছে বৈকি।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই হয়েছে।

এটুকু সময়ও মোহটা থাকার কথা নয়।

কী দেখে এত মুগ্ধ হয়েছিল—সেটাই বুঝতে পারত না তখন আর।

আগে যে ভেবে দেখে নি কেন এ পরিণাম সেটাও তো ভেবে পায় নি।

আশ্চর্য!

এই ধরনের মেয়েতে বরাবরই বিতৃষ্ণা ছিল তার।

দিল্লীর সাধারণ আধা-ইংরেজি ধরনের মেয়ে, যারা জন্মটাকে শুধু বদলাতে পারে না—বাকী সবেতেই নিজেদের ইংরেজ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে।

পোশাকে-আশাকে, হাসিতে, ভঙ্গিতে—বেলেল্লাগিরিতে।

অথচ ইংরেজ মেয়ের যেসব গুণ আছে, তার সিকিও নেই এদের।

ইংরেজ মেয়েরা কাজের লোক, কাজ বোঝে।

শুধুই ময়ূরের মতো পেখম মেলে ঘুরে বেড়ায় না।

অরবিন্দ বিলেতে বেশ কিছুদিন ছিল—বিস্তর ইংরেজ মেয়ে দেখেছে—ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছে।

যতই কড়া পাহারায় রাখুক নীলিমা—'নটঘট'ও যে কিছু হয়নি তা নয়।

তাদের সঙ্গে যত মিশেছে তত ভাল লেগেছে।

মুগ্ধ হয়ে গেছে কোন কোন ক্ষেত্রে।

দু'একটিমেয়ে, প্রধানত সত্যকার কোন কাজের অভাবেই উগ্র আধুনিক হয়ে উঠে কিছু কিছু পাগলামি করছে—কিন্তু সেটা সমগ্র জাতের পরিচয় নয়।

সে সব দেশে সব জাতের মানুষের মধ্যেই আছে।

ওদের দেখেই নীলিমাকে আরও খারাপ লেগেছে।

অন্তঃসারশূন্য অন্ধ অনুকরণকারক।

তার ওপর যেটা অতিরিক্ত—সেটা হচ্ছে দাম্ভিক, বদমেজাজী।

সে যে ধনী-কন্যা, তার বাপের পয়সাতেই যে অরবিন্দর চলছে, সে-সম্বন্ধে

যথেষ্ট সচেতন।

বেশী সচেতন—অতিমাত্রায়।

কিন্তু তখন আর কিছু করার নেই।

নির্জনে বসলে অশোকার মুখেই শোনা রবীন্দ্রনাথের একটা গান মনে পড়ত—'জেনে শুনে বিষ করেছি পান।'

তবে একটা সুরাহা ওর হয়েছিল বৈকি!

বিলেতে যেমন অন্য সঙ্গ বা সাহচর্য ছিল, এখানে ফিরে তেমনি কাজের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে গেল—নীলিমায় সঙ্গ দিনরাত সহ্য করার কোন প্রয়োজন রইল না।

কাজের মধ্যেই আশ্রয় পেয়ে গেল সে।

কূর্মের খোলার মতো কাজের বর্মের মধ্যে আত্মগোপন বা আত্মরক্ষা ক'রে বেঁচে গেল।

মালহোত্রা সাহেব তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ মাত্রাতেই পালন করেছেন—অরবিন্দকে পসারের জন্যে ভাবতে হয় নি একদিনও।

তিনি শুধু যে ওকে মক্কেল পেতে সাহায্য করেছেন তাই নয়—নিজের ভাল ভাল মক্কেলও ওকে দিয়ে দিয়েছেন, যা বলেছিলেন—নিজের কাজই কমিয়ে এনেছেন অনেকখানি।

এখন রিটায়ার করার পরের অবস্থার মতো—দু-একটা কেস করেন, অল্প যে দু'চারজন নাছোড়বান্দা মক্কেল কিছুতেই ছাড়ে না—তাদের মামলাগুলোই শুধু—তাছাড়া বাকী যা আসে সবই জামাইয়ের কাছে পাঠিয়ে দেন।

প্রথম প্রথম দু'একজন কিছু কিছু মৃদু আপত্তি করেছিল দুরূহ মামলা নবীন ব্যারিস্টারকে দিতে—তাতে তিনি আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, 'ওকে কেস দাও, তাহলে আমি ওর পেছনে থাকব—নইলে একেবারেই পাবে না।'

তাতেই কাজ হয়েছে। বাধ্য হয়েই তারা মামলা ছেড়ে দিয়েছে অরবিন্দর হাতে।

অবশ্য অরবিন্দও মালহোত্রা সাহেবের স্নেহ ও বিশ্বাসের পূর্ণ মর্যাদা রেখেছে।

প্রাণপণে খেটেছে। সাফল্যও লাভ করেছে।

আইনজ্ঞান যেন তার সহজাত—কর্ণের কবচ-কুণ্ডলের মতো—এ বিষয়ে আশ্চর্য প্রতিভা তার বরাবরই।

এখানে এসে ব্যারিস্টারী শুরু করার বছর দুইয়ের মধ্যেই নিজের সুনামে নিজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, শ্বশুরের পৃষ্ঠপোষকতা বা পক্ষপুটছায়ার প্রয়োজন হয় নি।

কাজের চাপে এখন সে মাথা তুলতে পারে না, রাত একটা দেড়টার আগে শুতে যেতে পারে না।

তবে এটাও আশীর্বাদই মনে হয় ভগবানের।

শুধু টাকা আসে বলে নয়—নীলিমার সাহচর্যটাও অনেকখানি এড়িয়ে

যেতে পারে।

একাকালের দয়িতার—বাঞ্ছিতার অবাঞ্ছিত সঙ্গ।

নীলিমাও অবশ্য নানা কাজে ব্যস্ত থাকে।

বহু শৌখিন সামাজিক কাজে জড়িত হয়ে পড়েছে ; বহু সমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়েছে।

নামকরা ব্যারিস্টারের মেয়ে, নামকরা ব্যারিস্টারের স্ত্রী—এই ধরনের মহিলাদের সমিতিতে নিতে সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠবে, এই তো স্বাভাবিক।

ফলে নীলিমাও স্বামীর সম্বন্ধে সচেতন থাকবার খুব একটা সময় পায় না।

তা ছাড়া তার অহংকারের আশ্রয় তো একটা আছেই।

তার স্বামী তার সম্বন্ধে মুগ্ধ না থেকে পারে—এ তো তার কল্পনার অতীত।

দূর প্রবাসে অশোকার কথা অবশ্যই মনে পড়েছে।

তীব্র লালসার প্রথম উন্মত্ততা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই।

অশোকার চেয়েও বেশী মনে হয়েছে খোকনটার কথা।

লেজিটিমেট কিনা সেটা অন্য বিচার—তারই ছেলে—আত্মজ।

ফুটফুটে, দেবশিশুর মতো ছেলে।

অনুতাপ বিশেষ বোধ করে নি—তেমন মানসিক গঠন অরবিন্দর নয়—একটা শূন্যতা বোধ করেছে, অশোকাদের সঙ্গের অভাব বোধ করেছে।

অনুতাপ বোধ করে নি বলাটা হয়তো একটু ভুল হ'ল।

সাধারণ লোক এক্ষেত্রে যা অনুভব করত তা নয়।

'বিবেকের দংশন' যাকে বলেন লেখকরা—সেইটে বোধ করে নি। অনুতাপ একটা বোধ করেছে বৈকি!

অন্য অনুতাপ—অশোকার বদলে নীলিমাকে বেছে নিয়ে, এর সঙ্গে জীবন জড়িয়ে যে ভুল করেছে—সেই অনুতাপ।

এত কিছু করার হয়তো প্রয়োজন ছিল না।

ওকালতীতে যেভাবে পসার হচ্ছিল—আর বছরখানেক ধৈর্য ধরে লেগে থাকলে নিজের সামর্থ্যেই ব্যারিস্টারী পড়তে যেতে পারত।

মালহোত্রার অনুগ্রহের প্রয়োজন হ'ত না।

তাছাড়া ব্যারিস্টারী না পাস করলেও টাকা রোজগার খুব একটা কম হ'ত না।

নিজের শক্তিতে, নিজের বুদ্ধিতে এটুকু আস্থা আছে অরবিন্দর। তার উন্নতি কেউ রুখতে পারত না।

মিছিমিছি এ দুঃসহ বোঝা ঘাড়ে চাপাতে গেল কেন সে!

তবে কৃতকর্মের জন্য দুঃখ বোধ করার অবসর খুব একটা পায় নি—এই রক্ষা।

কাজই বাঁচিয়ে দিয়েছে ওকে।

যত কাজ বেড়েছে—নিঃশ্বাস ফেলার পর্যন্ত সময় থাকে নি—নীরন্ধ্র নিরবসর কাজ—ততই এই সব অরুচিকর চিন্তা থেকে বেঁচে গেছে।

অবশ্য বিলেত থেকে ফিরে গোপনে খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছে বৈকি অরবিন্দ।

কলকাতা এসে ঘুরেও গেছে একবার।

এদের খবর নিতেই এসেছিল সে।

ছেলের খবর নিতেই আরও।

সে চেষ্টার ফলে দুটি তথ্য জেনেছে।

সে বাসা ছেড়ে দিয়েছে অশোকা একমাসের মধ্যেই।

অরবিন্দর অগ্রিম দেওয়া ভাড়ার মেয়াদ ফুরোবার জন্যও অপেক্ষা করে নি।

বাসা তুলে দিয়েই গেছে একেবারে।

কোথায় গেছে কি করছে তা কেউ জানে না।

অশোকার বাবা মা ভাই বোন কেউ না।

বন্ধুবান্ধবরাও না।

সকলের অলক্ষিতে, সকলের অজ্ঞাতে, যেন নিঃশব্দে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে কলকাতার সামাজিক জীবন থেকে—সামনের বড় অভিনেতাদের ভিড়ের আড়ালে রঙ্গমঞ্চ থেকে অনাবশ্যক প্রতিহারী দৌবারিকরা নিঃশব্দে সরে যায় —তেমনি।

নিজেকে মুছে নিয়েছে, নিশ্চিহ্ন ক'রে নিয়েছে পরিচিতদের জগৎ থেকে।

সে বা তার ছেলে কি করছে, কোথায় আছে—সে সংবাদ কেউ জানে না।

বেঁচে আছে কি না—কী খেয়ে, কোন্ অর্থে জীবন ধারণ করছে তাও না।

আরও একটি তথ্য জানতে পারল ব্যাংক থেকে।

অশোকাকে ত্যাগ ক'রে যাবার সময় যে সব উদার বিবেচনা সে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছিল তাকে নীরব উপেক্ষায় প্রত্যাখ্যান করে গেছে অশোকা।

একাধিক ব্যাঙ্কে অরবিন্দর হিসেব ছিল। তারই একটিকে নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল,—অরবিন্দর নাম না ক'রে—মাসে দুশো টাকা হিসেবে অশোকাকে দিতে অর্থাৎ অশোকার য়্যাকাউণ্টে জমা দিতে।

শুনল প্রথমবারের চেষ্টাতেই ব্যর্থ হয়েছে ব্যাংক।

ঐ ব্যাংক থেকে সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে ওখানের য়্যাকাউণ্ট ক্লোজড্ ক'রে দিয়েছে অশোকা।

এঁরা যে মনিঅর্ডার ক'রে পাঠাবেন—সে উপায়ও ছিল না।

অশোকা নিজের ঠিকানা দেয় নি, এবং এ টাকা সে নেবে না—বেশ দৃঢ়ভাবেই জানিয়ে দিয়েছে এঁদের।

অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবেই অরবিন্দর জীবন থেকে সরিয়ে মুছে নিয়েছে নিজেকে।

কোন সম্পর্কই আর রাখতে চায় নি।

'অভিমানে ভুলই করলে—' অরবিন্দ মনে মনে বলল এই খবর পেয়ে— 'এটা আমি আমার ছেলের খরচ হিসেবেই দিতে চেয়েছিলুম। তাতে ছেলেটা মানুষ হ'ত।...এটা ফিরিয়ে দিলে কেন?'

এ স্বগতোক্তির মধ্যে একটা অর্ধ বিদ্রুপের সুরই বেজেছিল সেদিন।

জীবন সম্বন্ধে অরবিন্দর হিসেব বা তার দৃষ্টিভঙ্গী ছাড়াও কোন হিসেব কি দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে—সেইটেই অরবিন্দর মাথায় ঢোকে না কোনদিন।

টাকা আনা পাইয়ের হিসেব, জীবনের আর্থিক বা বৈষয়িক উন্নতির হিসেবেই অরবিন্দ সব-কিছু মেপে এসেছে এতকাল।

সেই পরিমিত জ্ঞানেই সে ঐ মাসোহারাটা দিতে গিয়েছিল—এর মধ্যে যে কোন তীব্রতর অপমান থাকতে পারে—আরও মর্মান্তিক আঘাত—সেটা তার আত্মস্বার্থসর্বস্ব মাথায় ঢোকে নি।

য়্যাডিং ইনসাল্ট্ টু ইন্জুরী—'আঘাতের সঙ্গে অপমান যোগ করা'—এ কথাটাও মনে পড়ে নি।

সেইজন্যেই বিস্মিত হয়েছে সে!

অশোকাকে নির্বোধ ভেবেছে।

আজকের এ সাক্ষাৎ—এ যোগাযোগ একেবারেই আকস্মিক।

বিবাহের দীর্ঘকাল পরে নীলিমার সন্তান-সম্ভাবনা হয়েছে। এই প্রথম।

ন' কি দশ বছর হ'ল ওদের বিয়ে হয়েছে।

ভাল মনেও পড়ে না অরবিন্দর ঠিক কতদিন।

মনে রাখার চেষ্টাও করে নি অবশ্য।

মনে রাখার মতো এমন স্মরণীয় ঘটনা বলেও মনে করে না সে।

দেখতে হয়—সার্টিফিকেট আছে, বার ক'রে দ্যাখো—মিছিমিছি এসব অপ্রয়োজন সন তারিখের হিসেব মনে ক'রে রেখে লাভ কি?

শুধু শুধু অকারণে অনর্থক মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত করা।

বিশেষ যখন এমন কোন মধুর স্মৃতিবহ নয় তারিখটা।

যে তারিখের স্মৃতি নিজের নিবুদ্ধিতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয় শুধু।

সে যাই হোক—অনেকদিন হয়ে গেছে এটা ঠিক।

প্রথম প্রথম সন্তান যাতে না হয় সেই চেষ্টাই করেছে ওরা।

তারপর দুজনেই চেয়েছে একটি সন্তান।

অরবিন্দর মনে প্রথম সন্তান সম্বন্ধে যে হাহাকার ছিল, যে শূন্যতা— সেটাই ভুলতে চেয়েছে নতুন একটি সন্তানে।

আরও মনে হয়েছে—ছেলে কি মেয়ে কিছু হ'লে নীলিমাও হয়তো একটু কোমল হয়ে উঠবে, একটা কাজ খুঁজে পাবে—তার সাহচর্য সহনীয়—এমন কি হয়তো মধুর, শ্রান্তি-অপনোদক হয়ে উঠবে।

আরও একটা কথা মনের অবচেতনে উঁকি মেরেছে সেই সঙ্গেই—আরও একটা প্রশ্ন।

অশোকা যেমন ছিল ?

না, অশোকার স্থান নীলিমা অধিকার করতে পারবে না কোনদিনই—সে সম্বন্ধে কোন মোহ কি ভ্রান্ত ধারণা নেই ওর। তবু সেরকম যখন আর পাচ্ছেই না—কিছুটা পেতে দোষ কি ?

কিন্তু সে সন্তান আসে নি।

প্রথমে দুজনেই অপেক্ষা করেছে দৈব-অভিরুচির।

তারপর দুজনেই ব্যস্ত হয়েছে।

বিশেষ মালহোত্রা সাহেব, তিনি উঠে পড়ে লেগেছেন।

রকমারি পরীক্ষার কোনটাই বাদ যায় নি।

অরবিন্দকেও পরীক্ষা দিতে হয়েছে।

সে একথা কিছুতেই ওঁদের বলতে পারে নি যে তার একটি সন্তান হয়েছিল এর আগেই—সুস্থ, নীরোগ—সম্ভবত সে বেঁচেও আছে। আর যাই হোক, তার তরফ থেকে কোন অসুবিধা নেই।

বলা সম্ভব নয়।

মালহোত্রা এতটা ক্ষমা করবেন কি না ঘোরতর সন্দেহ আছে।

অবশ্য পরীক্ষাতে তা প্রমাণ হয়েছে। অরবিন্দর কোন ত্রুটি নেই। নীলিমাই বন্ধ্যা সাব্যস্ত হয়েছে।

তবে একেবারেই দুরারোগ্য নয়।

চিকিৎসাও চলেছে সেই মতো। তবু কোন ফল হয় নি—বিজ্ঞান সম্পূর্ণ হার মেনেছে ঈশ্বরের মর্জির কাছে।

অর্থের অহঙ্কারও।

টাকা থাকলে ঘটা করে চিকিৎসা করানো যায়, তবে তার যে ফল হবেই এর কোন নিশ্চয়তা নেই।

অবশেষে দৈবাৎই এবার সেই বহু আকাঙ্ক্ষিত বহু ঈপ্সিত সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

ভগবানেরই খেয়াল হয়েছে এতকাল পরে।

প্রসন্ন হয়েছেন তিনি।

মালহোত্রা—যিনি এতকাল নিজেকে নাস্তিক বলে গর্ব করতেন তিনি কালকাজীতে পুজো চড়িয়েছেন, স্বয়ং নীলিমাও লোক মারফৎ কাশ্মীরের দেবী 'তুল্লা-মুল্লা' বা ক্ষীর ভবানীকে পুজো পাঠিয়েছে।

কিন্তু দেখা গেল শেষ পর্যন্ত—ঈশ্বরের এটা করুণা নয়, পরিহাস ! প্রচণ্ড একটা তামাশা করা ওদের নিয়ে।

তৃষ্ণার্ত অধরের সামনে সুধাপাত্র ধরে আবার তা সরিয়ে নিলেন তিনি।

ট্যাণ্টালাইজ করার অর্থটা বুঝিয়ে দিলেন ওদের।

যে কারণে এতকাল সন্তান হয় নি, সেই কারণেই নাকি সুপ্রসবের

আশা কম।

প্রসূতির জীবন-সংশয় দেখা দিতে পারে।

মালহোত্রা ও অরবিন্দ কেউই চেষ্টার কোন ত্রুটি রাখেন নি।

দিল্লীতে যত ভাল ভাল 'গাইনী' আছেন তাঁদের সবাইকে দেখানো হয়েছে, মালহোত্রা বোম্বাই থেকে ডাক্তার আনিয়েছেন, অরবিন্দ কলকাতা থেকে।

ঔষধ-পথ্য, কখন কি অবস্থায় থাকবে—কোন ব্যবস্থারই কোন ত্রুটি হয় নি।

কিন্তু দিন যত ঘনিয়ে এসেছে ততই বোঝা গেছে—প্রথম যিনি দেখেছিলেন, ডাঃ মিসেস সেনের আশঙ্কাই ঠিক।

অবশেষে সেই আশঙ্কিত সংকটই দেখা দিয়েছে।

নীলিমার জীবন-মরণের প্রশ্ন।

আবিষ্কৃত হয়েছে যে সন্তান মারা গিয়েছে গর্ভেই—এখনই তাকে বার করতে না পারলে প্রসূতির বাঁচার আশা কম।

এমনিতেই তার যা রক্তের চাপ ভয়াবহ বেড়ে গেছে—বাচ্ছাটা মারা না গেলেও তাকে মেরে ফেলে সিজারীয়ানের দ্বারা মাকে বাঁচাতে হ'ত।

অর্থাৎ এখনই অস্ত্রোপচার করা প্রয়োজন।

সময়ের হিসেব এখন ঘণ্টা ধরে নয়—মুহূর্ত ধরে চলেছে।

অবশ্য দেরি করার কোন কারণও ছিল না।

অর্থের যেখানে অপ্রাচুর্য নেই—সেখানে আর অসুবিধা কি?

হাসপাতালে তো নয়ই—নার্সিং হোমেই দেবার কথা তুলেছিল অরবিন্দ—কিন্তু নীলিমা বেঁকে দাঁড়িয়েছে।

যা হবে এই বাড়িতে—যত টাকা লাগে এখানেই ব্যবস্থা করো।

অসহ্য যন্ত্রণার মধ্যেও স্বামীকে শুনিয়েছে সে, 'চিরকাল দেখে এলাম টাকাটাই তোমার কাছে সব। এত টাকা কি করবে তুমি? কবরও তো হয় না হিন্দুদের যে কবরে নিয়ে যাবে।...আর টাকার ভাবনাও তোমাকে ভাবতে হবে না—আমার বাবা যতদিন আছেন, তিনিই দেবেন।'

কিছুতেই বোঝাতে পারল না অরবিন্দ যে—টাকার জন্যে নয়, নীলিমার সুবিধার জন্যই সে নার্সিং হোমে নিয়ে যেতে চাইছিল, নার্সিং হোমে বাড়ির থেকে বেশি খরচাই পড়ত।

নীলিমার বিশ্বাস যারা গরীব তারাই হাসপাতাল বা নার্সিং হোমে যায়।

অগত্যা মিসেস সেনকে বাড়িতেই অপারেশনের ব্যবস্থা করতে বলা হ'ল।

তাঁর সঙ্গে আসবে অ্যানেসথেসিস্ট, কিন্তু সহকারিণী ডাক্তার—যিনি সব সময়ে সঙ্গে থাকেন—তিনি অসুস্থ।

ভাল নার্স চাই একটি—'দ্য বেস্ট দ্যাট দ্য নার্সিং ইউনিয়ন কুড স্পেয়ার।'

বার বার বলেছিলেন মিসেস সেন।

তাতেই মিসেস হাসকার দময়ন্তী লাহিড়ীকে খবর দিয়েছেন।

দময়ন্তীর কর্মনিপুণতা ও সজাগ সতর্কতা—সন্দেহাতীত।

তাছাড়া মিসেস সেনের প্রিয়পাত্রীও সে।

কিন্তু যেখানে যেতে হবে সেখানের নাম শুনেই দময়ন্তীর মুখ শুকিয়ে গেছে।

আপত্তিও করেছে সে।

কিন্তু সে আপত্তিতে কান দেওয়া তখন আর সম্ভব ছিল না মিসেস হাসকারের।

অরবিন্দ এসব কিছুই জানে না।

কল্পনাও করতে পারে নি।

জানল এইমাত্র, রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে।

তাহলে এই করছে অশোকা।

এইখানে এইভাবে জীবিকা অর্জন করছে সে।

কিন্তু খোকন? খোকন কোথায়? সে কি—সে বেঁচে আছে তো?

শূন্য ঘরে অসহায় ভাবে বার বার সেই শূন্যতাকেই প্রশ্ন করে সে।

দুঁদে ব্যারিস্টার অরবিন্দ মল্লিক।

॥ ৮ ॥

ডাঃ মিসেস সেন হাত মুছতে মুছতে এসে অরবিন্দর স্টাডীতে ঢুকলেন।

হাসি-হাসি মুখ তাঁর।

অনুযোগের মধ্যেও প্রশ্রয়ের সুর।

'এ কি, মিঃ মল্লিক আপনি এখানে? এত নার্ভাস আপনি? লুকিয়ে অন্ধকারে বসে বসে ঐগুলো খেয়ে যাচ্ছেন।…ছি ছি, শুনেছি আপনি জবরদস্ত ব্যারিস্টার—আপনার সামনে দাঁড়াতে বড় বড় কাউন্সেলের মুখ শুকিয়ে যায়—অথচ স্ত্রীর একটা অপারেশনেই কাৎ।…এই আপনার নার্ভ্‌স্‌।'

মিসেস সেনের বলার ভঙ্গী আর কন্ঠস্বরেই বোঝা যায়—খবর শুভ, অন্তত বিপদ যা, কেটে গিয়েছে।

অরবিন্দ তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'না—এই এমনিই…নইলে কী আর করতুম বলুন, ওখানে তো আর থাকতে দিতেন না আপনারা—'

'তা দিতুম না ঠিকই।' কৃত্রিম অভিযোগের সুরে বলেন ডাঃ সেন, 'কিন্তু আপনি খবরের জন্যে য়্যান্টিরুমে অপেক্ষা করবেন এইটেই আশা করেছিলুম। তবে ও এখন যতই যা বলুন—বোঝা গেল আপনি খুবই নার্ভাস। নইলে দময়ন্তীর মধ্যে কাকে যেন দেখেন! দময়ন্তীকে আমি গত চার বছর দেখছি, দময়ন্তী লাহিড়ীই ওর নাম। বড় ভাল মেয়ে, ভেরি এফিসিয়েন্ট—য়্যান্ড কোয়ায়েট। লেখাপড়া-জানাও—ওর মতো মেয়ে এ লাইনে কেন এল কে জানে।…হাউএভার চলুন, এখন যদি দেখতে চান দেখে আসতে পারেন—সি

ইজ অলরাইট নাউ। জ্ঞান অবশ্য এখনও ভাল আসে নি। এলেও এখনই আবার ঘুম পাড়াতে হবে—আদারওয়াইজ ভাল। কোন বিপদের আশঙ্কা নেই আর।'

উজ্জ্বল মুখে হাসেন ডাঃ মিসেস সেন।

সার্থকতার হাসি।

ইংরেজিতে যাকে বলে 'বীম' করা বলে।

বহুদিন বিলেতে থেকে এই ধরনগুলো শিখেছেন।

একটা কথা প্রায়ই বলেন। বিলেতেরই কোন্ ডাক্তারের মুখে শোনা।

বলেন, '**A doctor can cure sometimes, relieve often, comfort always!** আশা ভরসা উৎসাহ দিতে তো আর কোন কিছু লাগে না—সেটায় কার্পণ্য করব কেন?'

অরবিন্দ উঠে দাঁড়িয়েও একটু ইতস্তত করে।

যে প্রশ্নটা ঠোঁটের কাছে আসছে বার বার—লজ্জায় ঠিক করতে পারছে না—এ দ্বিধা সেই জন্যেই।

অবশেষে প্রায় মরীয়া হয়ে বলে ফেলে, 'এক্সকিউজ মি ডক্টর, কিন্তু—জাস্ট একটা কৌতূহল—কী চাইল্ড হয়েছিল?'

'মেয়ে—বেঁচে থাকলে একটি মেয়েই পেতেন। য়্যাম এক্সট্রিম্‌লী সরি মিঃ মল্লিক, কিন্তু একটা কথা আপনাকে বলে রাখা উচিত বলে মনে করি। নীলিমা—মানে মিসেস মল্লিকের যা দেহের অবস্থা—আর সন্তানের চেষ্টা না করাই বোধহয় ভাল। আমার তো মনে হয়—আবার সে সম্ভাবনা দেখা দিলে এইরকমই হবে। এবার মরে গেছে তাই—না হলেও মেরে ফেলতে হ'ত, নইলে ওঁকে বাঁচানো যেত না। ···যাই হোক, বড়জোর আর একটা রিস্ক নিতে পারেন—কিন্তু ওর যা টেণ্ডেন্সী, এমনিই প্রেসার বেড়ে যাবে চড়চড় ক'রে—যদি এবারের মতো কি আরও বেশী প্রেসার চড়ে যায় ধরুন—তখন তো ওকে আগে বাঁচাতে হবে।···আর বার বার এ অপারেশনের রিস্ক নেওয়াও খুব বিপজ্জনক। এত প্রেসার, হার্টেরও যা অবস্থা।···আসলে ওর কিড্‌নীটাই বোধহয়—।'

সব কথা অরবিন্দর কানে যায়ও না, সে কতকটা যন্ত্রচালিতের মতোই দরজা খুলে ডাক্তারকে আগে যেতে দিয়ে নিজেও বেরিয়ে আসে।

আসা উচিত। নইলে অশোভন দেখাবে। সকলকার কাছেই দৃষ্টিকটু ঠেকবে।

তেমনিভাবেই একসময় নীলিমার বিছানার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়।

ততক্ষণে দময়ন্তী ডাঃ সেনের যন্ত্রপাতি সব গুছিয়ে ফেলেছে, রোগিণীর চারিদিক থেকে যতদূর সম্ভব এই অস্ত্রোপচারের চিহ্ন বিলুপ্ত করেছে—বিছানা টেনে ছিমছাম ক'রে ফেলেছে।

নীলিমার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল অরবিন্দ।

জোর ক'রেই চেয়ে থাকতে হচ্ছে তাকে।

অন্য দিকে চোখ ফেরাতে পারছে না বলেই।

দময়ন্তী সহজ ভাবেই তার কাজ সেরে যাচ্ছে খুটখাট ক'রে, তার মুখে কোন উত্তেজনার চিহ্ন বা বিব্রত ভাব নেই।

সম্পূর্ণ স্বাভাবিক নির্লিপ্ততা—নিরাসক্তি। রোগিণীর শয্যাপার্শ্বে নার্সদের যেমন 'বিহেভ্' করা উচিত ঠিক তেমনিই করছে।

কানে গেল অরবিন্দর, ডাঃ মিসেস সেন বলছেন—'তুমিই সন্ধ্যে পর্যন্ত থেকে যাও। মিসেস হাস্কারকে আমি বলেছি নাইট নার্সকে একটু সকাল ক'রে পাঠাতে, তোমার স্ট্রেন বেশী হয়েছে তাও বলেছি।···কোন গোলমাল দেখলে জানিও। ইউ নো হোয়ার টু ফাইন্ড মি। তাহলে—চলি মিঃ মল্লিক। আমার তো মনে হয় আর কোন ট্রাব্ল্ পাবেন না। অবশ্য আমি একবার রাত ন'টা নাগাদ দেখে যাব। কোন চিন্তা নেই।

এর পর আর নীলিমার ঘরে থাকার কোন মানে হয় না।

অনেক চিন্তা করলেও কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং ডাক্তার মিসেস সেনের পিছু পিছুই বেরিয়ে আসতে হয়।

তাঁকে দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসে আবার নিজের স্টাডীতে ঢোকে।

কিন্তু ডাক্তারের কথাগুলো যেন সেখানেও তাড়া করে।

দশ বছর পরে একটা মরা মেয়ে।···আর ঝুঁকি না নেওয়াই ভাল। হ'লে আবার এমনিই হবে।

একটা অবর্ণনীয় অননুভূত তিক্ততা কণ্ঠ পর্যন্ত ফেনিয়ে ওঠে যেন।

'চমৎকার! এই বোধহয় ভগবানের বিচার। কখন কোথা দিয়ে আসে আমরা নাকি বুঝতে পারি না। এই তো বেশ বুঝতে পারছি। হাঃ।'

সামান্য একটু শব্দ ক'রে হাসে অরবিন্দ।

সে হাসির শব্দে নিজেই চমকে ওঠে আবার।

এ কি—সে আপন মনেই বকছিল নাকি এতক্ষণ? আপন মনেই হাসল শব্দ ক'রে?

মাই গড্! তার মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে নাকি?

য়্যাণ্ড দ্যাট ওল্ড ব্ল্যাবারিং নন্সেন্স টু!···ঈশ্বরের বিচার। ছোঃ!

আবারও একপাত্র তরল বহ্নি গলায় ঢেলে দেয় সে—নির্জলা।

অনেকক্ষণ আবার তেমনি বসে থেকেছে সে। কতক্ষণ তা মনে নেই।

শেষে একসময় মনে হয়েছে যে আর একবার স্ত্রীর খবর নিতে না যাওয়াটা অশোভন দেখাচ্ছে।

তখন যেন খানিকটা ভরসা সংগ্রহ ক'রে—সঙ্কোচ ঝেড়ে ফেলে ওঘরে গেছে আবার।

এই সঙ্কোচের পেছনে কিছু একটা আশাও ছিল কিনা—তা বলা শক্ত।

ওকে জিজ্ঞাসা করলেও বলতে পারত না, চমকে উঠত হয়তো।

নীলিমা তেমনি অর্ধ-অচৈতন্য। তার মধ্যেই বোধ করি যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছে।

পাশে একটি নতুন নার্স—সেই সঙ্গে একটি আয়া।

দময়ন্তী চলে গেছে।...

কখন গেছে, কাল আবার আসবে কিনা—সঙ্কোচে—অকারণ সঙ্কোচেই, নিজের মনে পাপ থাকলে সহজ ও স্বাভাবিক প্রশ্নও করতে পারে না মানুষ—জিজ্ঞাসা করতে পারল না কাউকে।

তবু তখনও মনে হয়েছে, একবেলার বেশী ডিউটি দেওয়া তো সম্ভব নয়—তাই চলে গেছে। নিশ্চয় কাল সকালে আবার আসবে।

পরের দিন সকালেও অন্য একজন নার্স এল।

দময়ন্তী নয়।

তার পরের দিনও এল না সে।

দময়ন্তী বোধহয় আর কোনদিনই আসবে না।

একবার ওরই মধ্যে কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেছিল সে মিসেস হাসকারকে—'সেদিন ঐ যাকে দিয়েছিলেন—দো আই ডিড্‌ন্‌ট্ লাইক হার—তবু একটা ধন্যবাদ দেওয়া উচিত ছিল—কিন্তু কৈ, তিনি তো এলেন না! আপনি ঠিকই বলেছিলেন—দ্য বেস্ট, এফিসিয়েন্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

তখনই শুনেছিল, দময়ন্তীর অন্য একটা কাজ আগেই ধরা ছিল—সেইখানে গেছে।

ঐ একবেলার জন্যেই পাঠানো হয়েছিল তাকে। অনেক ক'রে বলে-কয়ে।

মিস লাহিড়ীর আবার কতকগুলো ফ্যাড আছে—একই সঙ্গে নিম্নমধ্যবিত্ত ও বড়লোক দুই বাড়ির কেস এলে ও ইনভেরিয়েবলি গরিবের বাড়িই বেছে নেয়।

আর সহজে বাঙালীর বাড়ি যেতে চায় না। সেখানের পুরুষগুলো নাকি বড় 'টীজ' করে। ইত্যাদি—

অবশ্য দময়ন্তী আর আসে নি ভালই হয়েছে।

নীলিমার জ্ঞান হ'তে প্রথম যা কথা বলেছে সে—বাংলা শেখার পর স্বামীর সঙ্গে পরিষ্কার বাংলাতেই কথা বলে—'ইনিই কি তোমার সেই মেয়েমানুষ—রক্ষিতা—যার কথা ভাঁড়িয়ে বিয়ে করেছিলে আমাকে, বাবাকে বোকা বুঝিয়ে?...ও মাগীটা এসেছিল কেন—তুমিই আনিয়েছ বুঝি বলে-কয়ে? ভেবেছিলে আমি যদি মরে যাই, এইখানে এনে ওকে বসাবে গিন্নী ক'রে—?'

'ছিঃ নীলিমা,' মৃদু অনুযোগের সুরে বলে অরবিন্দ, কিন্তু কপালে ঘাম দেখা দেয় সঙ্গে সঙ্গে, সেই 'বাতানুকুলিত' ঘরেও—'আমি একটা ভুল করেছিলুম—টুটু আমার এক বন্ধুর বোন, তার সঙ্গে—। এ ভদ্রমহিলা ভেরি এফিসিয়েন্ট, তোমার জন্যে সেদিন অনেক পরিশ্রম করেছেন—এঁর সম্বন্ধে এরকম ভাষা ব্যবহার করা তোমার আদৌ উচিত নয়, ডেকে ধন্যবাদ দেওয়াই উচিত!'

'দ্যাখো, তুমি আর ন্যাকা বুঝিও না আমাকে। অনেক ঠকিয়েছ। ওকে দেখে তোমার মুখ সাদা হয়ে গিয়েছিল—ভাবছ আমি লক্ষ্য করি নি?...যতই

যন্ত্রণা হোক ওটুকু ভুল দেখি নি। ধন্যবাদ দেবে না ছাই দেবে। ভাগ্যিস আসে নি আর—নইলে জুতো মেরে তাড়াতুম।'

এ ধরনের রোগিণীকে অকারণ উত্তেজিত করা উচিত নয় বুঝে অরবিন্দ তাড়াতাড়ি বেরিয়ে আসে।

তাছাড়া এ প্রসঙ্গ পীড়াদায়ক শুধু নয়, বেশীক্ষণ আলোচনা করলে ধরা পড়বারও ভয় আছে।

নিজের ওপর সমস্ত কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলেছে যেন।

তবু নীলিমার ওপর রাগ হয় না তার কে জানে কেন—বরং একটা তিক্ত হাসিই ফুটে ওঠে ওর মুখে।

সে 'বার্গেন' করেছে তার জীবনে—জিন্দেগীর 'ব্যাপারে' সে এই মুনাফা ঘরে তুলেছে—দুঃখ ক'রে লাভ কি?

সুবিধার একটা দিক দেখার এই তো অসুবিধা।

আর—নীলিমাকে খুব একটা দোষ দেওয়াও যায় কি?

সবাই অশোকা নয়—নীলিমার জায়গায় অন্য মেয়ে হ'লেও সে এই কথাই বলত।···

অরবিন্দর ভাগ্যেই যদি এইরকম ঘটনা ঘটত—সে কী মনোভাব পোষণ করত সেই পুরুষ সম্বন্ধে?

আরও ক'টা দিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে, সংস্কার ও সংস্কৃতির সঙ্গে লড়াই ক'রে হার মানল।

অশোকার খবর চাই-ই তার—এজন্য যে যাই বলুক।

বলবার কেউ নেই অবশ্য, নিজের বিবেক ছাড়া।

এ অন্যায়, এ অশোভন—অশোকার প্রতি অবিচার—সবই সত্যি, তবু সে পারবে না একবার দেখা না ক'রে থাকতে।

বিশেষ ছেলে, তাদের ছেলে—খোকনের খবর চাই-ই তার।

মিসেস হাসকারকেই অনেক তোষামোদ ক'রে ঠিকানা বার করল অরবিন্দ।

তিনি কিছুতেই দিতে চান না, ব্যক্তিগত ঠিকানা দেওয়া রীতি-বিরুদ্ধ।

কী বলছেন মিঃ মল্লিক, তাকে ধন্যবাদ দিতে চান? সেই সঙ্গে কিছু পুরস্কারও?

তা বেশ তো, যা উপহার কি পারিতোষিক দিতে চান মিঃ মল্লিক, সে তো এখানেই রেখে যেতে পারেন—তাঁরা ওকে দিয়ে রসিদ লিখিয়ে মিঃ মল্লিকের কাছে পাঠিয়ে দেবেন।

যাই হোক শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল।

ব্যবহারজীবীর মিথ্যা ভাষণের ক্ষমতার কাছে হার মানতে হ'ল মিসেস হাসকারকে।

হাউজখাসে ওয়ার্কিং গার্লসদের হোস্টেল হয়েছে নতুন—সেইখানে থাকে দময়ন্তী।

সাধারণত ডিউটি ছাড়া কোথাও বেরোয় না—কারণ যে-কোন সময়ে টেলিফোনে ডাকলেই ওকে পাওয়া যায়।

আছে, কিছু মেয়েও হোস্টেলে আছে—এয়ার হোস্টেস্ জাতীয়—যাদের জন্যে সন্ধ্যের পর ছোট বড় মাঝারি অনেক গাড়ি এসে দাঁড়ায় অন্ধকারে, কোন কোন স্বল্প সৌভাগ্যবতীর জন্যে স্কুটারও আসে, আটটা নাগাদ নিয়ে বেরিয়ে যায় আবার দশটা সাড়ে দশটায় ফিরিয়ে দিয়ে যায়—কিন্তু দময়ন্তী লাহিড়ী সে ধরনের মেয়ে নয়, খুব সোবার ও কোয়ায়েট।

শুধু মাঝে মাঝে, ওর কে আত্মীয় থাকেন দেরাদুনে—দু-একদিন সেখানে গিয়ে কাটিয়ে আসে।

তবে গেলে সে আগে বলে যায়—ঠিক করে আসবে তাও জানিয়ে যায়।

কারণ দময়ন্তীর খুব ডিমাণ্ড—সবাই ওকে চায়—যদিও স্ট্রেঞ্জলি—সে বাঙালী বাড়ি পারতপক্ষে যেতে চায় না।

মারোয়াড়ী ও পাঞ্জাবীর বাড়িই বেশী পছন্দ তার। এম্‌ব্যাসী স্টাফও—দরকার হলে ওকে খোঁজে।

কারণ ওর এফিসিয়েন্সী। সত্যিই কাজের মেয়ে সে এটা ঠিক। ইত্যাদি—

অরবিন্দের নতুন বাড়ি থেকে হাউজখাস খুব দূর নয়।

হিসেব ক'রে ঘড়ি দেখে রাত সাড়ে আটটা নাগাদ গিয়ে হোস্টেলের কাছে দাঁড়াল।

হোস্টেল তখন অপেক্ষাকৃত জনহীন, কোলাহলহীন।

যাদের গাড়িতে ক'রে নিয়ে যাবার—যারা অল্পবয়সী, তরঙ্গবতী তাদের তখন নিয়ে চলে গেছে, বয়স্কা যারা তারা বিশ্রাম করছে।

রাস্তা নির্জন। হোস্টেলের সামনে কতকগুলো গুল্‌মোর গাছ, তারই ছায়ায় গাড়ি রেখে একেবারে গেটের সামনে অপেক্ষা করতে লাগল অরবিন্দ।

রাত আটটা পর্যন্ত দিনের ডিউটি, যেখানেই যাক—সাধারণত কোন বড়লোকের বাড়ি ডিউটি থাকলে গাড়ি ক'রে এসে নামিয়ে দিয়ে যায়, নইলে বাসএ আসতে হয়—আধঘণ্টা চল্লিশ মিনিটের বেশি দেরি হবে না। আজ দিনেই ডিউটি ছিল, সেটা ফোন ক'রে জেনে নিয়েছে অরবিন্দ।

দেরি হ'লও না, ন'টা বাজার মিনিট কতক আগেই রাস্তার মোড়ে গির্জাটার সামনে—খুট খুট ক'রে জুতোর আওয়াজ উঠল।

ফিরে দাঁড়িয়ে অন্ধকারেই চিনতে পারল অরবিন্দ।

দশ বছর দেখে নি—তবু অশোকার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গী আজও তার মনে আছে।

আজও তা তেমনি আকর্ষক তার কাছে। আজও তা রক্ত উত্তাল ক'রে তোলে ওর ধমনীতে।

গেটের একেবারে সামনে এসে পড়ে অশোকাও দেখতে পেল ওকে।

একবার একটু যেন গতিটা মন্থরও হয়ে এসেছিল—কিন্তু তার পরই আবার অভ্যস্ত নির্লিপ্ততায় এগিয়ে যেতে গেল।

কে দাঁড়িয়ে আছে, কেন দাঁড়িয়ে আছে তা জানার প্রয়োজন নেই ওর।

অথথা কৌতূহল ওর স্বভাববিরুদ্ধ।

এবার অরবিন্দই একেবারে সামনে এসে দাঁড়াল, 'আমি তোমার জন্যে অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে আছি অশোকা।'…

উত্তর এত দ্রুত, এত স্বাভাবিক ভাবে এল যে অরবিন্দই চমকে উঠল, 'কেন, কিছু প্রয়োজন আছে?'

'প্রয়োজন—হ্যাঁ, প্রয়োজনেই এসেছি একটু।'

'কারও অসুখ-বিসুখ? মিসেস মল্লিক তো ভালই আছেন, নন্দিনী মহাপাত্রের মুখে খবর পেলুম। সে-ই তো রাত্রে থাকে ওঁর কাছে—'

সহজ, অতি সহজ কথাবার্তা।

অতি স্বাভাবিক বলার ভঙ্গী।

অরবিন্দই বরং থতিয়ে গেল।

বেশ একটু আমতা আমতা ক'রে বলল, 'না—সে ভাল আছে। আমার একটু অন্য কথা ছিল—। বেশীক্ষণ সময় নেব না। আমার—আমার গাড়িতে গিয়ে বসতে আপত্তি আছে?'

'আছে বৈকি। এখানে এ দৃশ্য এত সাধারণ যে তার একটাই ব্যাখ্যা জানা আছে লোকের।…আর আমি সেভাবে ঠিক ব্যাখ্যাত হ'তে চাই না।'

অতি শান্ত অনুত্তেজিত ভাবেই বলল কথাগুলো। কিন্তু এর যে আর অন্যথা হবে না তাও বুঝতে অসুবিধা হ'ল না অরবিন্দর।

'তাহলে? তোমার হোস্টেলে কোথাও বসা যায় না?'

একটু বিপন্ন ভাবেই বলে অরবিন্দ। সে যেন আজ এই মেয়েটির—তার এককালের জীবন-সঙ্গিনীর কোন কূল পাচ্ছে না।

বড় অসহায়, বড় দীন—এবং হয়ত একটু নির্বোধও লাগছে নিজেকে ওর কাছে।

'আছে বৈকি। ভিজিটাররা এসে ইনমেটদের সঙ্গে দেখা করতে চান প্রায়ই, সেজন্যে ব্যবস্থাও রাখতে হয়। দুটো ঘর আছে। কিন্তু এর কি কোন প্রয়োজন আছে? যদি সামান্য কথা হয়—এখানেই তো বলতে পারেন। আর যদি বেশী কিছু দরকার থাকে—আজ মাপ করুন, আমি আজ বড় টায়ার্ড।'

সাধারণ সৌজন্যসূচক কথাবার্তা। অপরিচিতের মতোই।

'না না,—খুব দেরি করব না। তবু—প্লীজ, একটু কোথাও বসি চল।'

অনুনয়ের ভঙ্গী অরবিন্দর। যে ভঙ্গীতে একেবারেই অনভ্যস্ত সে।

কোন মক্কেল তাকে এভাবে দেখলে বিস্মিত হ'ত, চোখ রগড়ে ভাল ক'রে দেখত।

আর কথা বাড়াল না অশোকা।

কেবল তার ওষ্ঠ দুটি আরও দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠল, ভাস্করক্ষোদিত অপরূপ চিবুকের ভঙ্গীতে একটা কঠিন সঙ্কল্পের ভাব ফুটে উঠল।

এ ভঙ্গী খুবই পরিচিত।

তবে সেটা সেই আধো-আলোতে অরবিন্দর অত চোখে পড়ল না।

সৌভাগ্যবশত সেদিন ভিজিটার্স রুমে কোন ভিজিটার বা অতিথি আগন্তুক ছিল না।

সেটা অবশ্য ভিজিটার আসার সময়ও নয়—ভিজিটাররা বেশির ভাগ আসেন ছুটির দিন অপরাহ্ণে—নয়তো সকালে।

এসময় বেশির ভাগই কেউ বাসায় থাকে না—যারা থাকে তাদের এটা শুয়ে পড়ার সময়।

সামনা-সামনি চেয়ারে বসে কোলের ওপর ব্যাগ এবং ব্যাগের ওপর হাত দুটি জোড় ক'রে রেখে অশোকা বলল, 'বলুন।'

ভণিতা বা ভূমিকা করার সময় নেই।

বেশি সময় পাওয়া যাবে না।

যা বলতে হবে তা এখনই বলা আবশ্যক।

কাজ থাকলে সেরে নাও চট্‌পট—অশোকার বলার ভাবে এই কথাটাই সুপরিস্ফুট।

অরবিন্দও কাজের লোক—অকারণ ভূমিকা করার অভ্যাসও নেই তার।

সে চেয়ারটা অকারণেই ইঞ্চি-দুই সরিয়ে এনে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে বলল, 'খোকন—খোকন কোথায় আছে? সে—সে বেঁচে আছে তো?'

অনেকক্ষণ, প্রায় মিনিট দুই চুপ ক'রে রইল অশোকা, তারপর বলল, 'আপনি কার কথা বার বার বলছেন জানি না, আমি মিস লাহিড়ী, আমার কোন খোকন থাকতে নেই।'

'টুটু, আমি আজ—ভুল করেছি বলে তোমার দয়া উদ্রেক করার চেষ্টা করব না। অন্যায় করেছি ঠিকই। আমার কাছে এটা হয়তো ভুল, কিন্তু তার আর সংশোধনের উপায় ছিল না। তবু ছেলেটা যাতে মানুষ হ'তে পারে সে টাকার ব্যবস্থা ক'রে গিয়েছিলুম, ফিরে এসে দেখলুম তুমি তার এক পয়সাও নাও নি। তার পর থেকে বিস্তর খুঁজেছি—বাপ হয়ে তার সঙ্গে চরম শত্রুতা করেছি, আমার পক্ষ থেকে কিছু বলার নেই—কিন্তু এখনও যদি কিছু করার থাকে—'

'কিছুই করার নেই। সে ভালই আছে। তার শিক্ষার ব্যবস্থাও যতটা হ'তে পারে ততটাই হয়েছে।'

তেমনি শান্ত নিরুত্তেজিত কণ্ঠে উত্তর দেয় সে। শুধু অরবিন্দ লক্ষ্য করে—তার শুভ্র ললাট-কপোল অরুণবর্ণ হয়ে উঠেছে।

'কিন্তু—কিন্তু, সে কোথায় আছে, কী পড়ছে—কিছুই জানতে পারব না?'

একটু করুণভাবেই বলে অরবিন্দ, 'একবার দূর থেকে একটু চোখের দেখাও দেখে আসা যায় না?'

এবার যেন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে।

'দ্যাখো—অনর্থক এসব হাঙ্গামা বাধিয়ে লাভ কি বলতে পার ? সে তোমার জীবনে আর আসতে পারবে না। মাঝখান থেকে তার একটা যা হোক পরিচয় গড়ে উঠেছে—একটা সামাজিক আশ্রয়—তার জীবনের একটা পথ তৈরি হয়ে গেছে—সেই পরিচয়ে সেই পথেই সে এগিয়ে যাক না! মিছিমিছি এখন তাকে টানাটানি করতে গিয়ে—কোথাও কোন দিক থেকে যদি তোমার সঙ্গে সম্পর্ক প্রকাশ পায়—তার জীবনটা একেবারে নষ্ট হয়ে যাবে না কি ?…এখন তোমার পিতৃপরিচয় দিতে পারলেও তার কোন লাভ হবে না, বরং লোকসানই হবে।… সেই সঙ্গে আমারও।…কোন উপকারেই তো কখনও এলে না—এখন আর নতুন ক'রে অনিষ্টটুকু না-ই বা করলে।'

'তুমি ঠিকই বলেছ। আই ডিজার্ভ দিস রিবিউক! তবে আমি—তুমি যে কোন দিব্যি গালতে বলো আমি গালতে রাজী আছি—আমি তাকে কোন রকম এক্স্পোজারে বা অকওয়ার্ড অবস্থায় ফেলব না। কোনরকম আবেগময় দৃশ্যের অবতারণা ক'রে আমার সঙ্গে সম্পর্ক বা যোগাযোগও জানতে দেব না।…জাস্ট একবার দূর থেকে দেখে আসব কোন ছুতোয়—কাছেও যাব না। আর এ-ও তোমাকে কথা দিচ্ছি—তোমাকে না জানিয়ে তোমার অনুমতি না নিয়ে তার কোন উপকারের চেষ্টা করব না।'

তারপর একটু থেমে বলল, 'দেরাদুনে আছে এটা আমি আন্দাজ করেছি, যখন শুনেছি তুমি মাঝে মাঝে দেরাদুনে যাও—তাতেই মনে হয়েছে।… মিলিটারী অ্যাকাডেমিতে পড়ছে কি ?…তাহলে আমি অনায়াসেই—'

এবার—এই প্রথম—অশোকার ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

পাথরের মতো—কিন্তু পাথর নয়। এ ধৈর্যচ্যুতি স্বাভাবিক।

এবার যেন সাধারণ মানুষ স্বাভাবিক ভাবে কথা বলে।

তীক্ষ্নকণ্ঠে বলে ওঠে, 'কেন বলো তো তুমি আমাদের পেছনে এইসব গোয়েন্দাগিরি করছ ?…আমি তো তোমাকে কোনরকমে কোন অসুবিধেয় ফেলি নি—যদি বলো যে আমি দিল্লীতে থাকাটাই তোমার অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে—তাও আমি চলে যেতে রাজী আছি এখান ছেড়ে। শুধু, প্লীজ প্লীজ, লীভ মি য়্যালোন !'

অপরাধীর মতো ঘাড় হেঁট ক'রে বসে থাকে অরবিন্দ।

তারপর আস্তে আস্তে বলে, 'আমি তোমাকে কি ক'রে বোঝাব টুটু যে, তোমার জীবনে আর এতটুকু অশান্তি সৃষ্টি করার ইচ্ছে আমার নেই। বরং যদি কোন উপায়ে তোমার যা ক্ষতি করেছি—তার এতটুকুও কম্পেনসেট করতে পারতুম, নিজের যে কোন ক্ষতি স্বীকার ক'রেও—তো করতুম।…এখনও যদি চাও, আমিই সমস্ত বন্দোবস্ত ক'রে দিতে পারি—তুমি আমার নামে নালিশ করো যে হিন্দুমতে আমার সঙ্গে তোমার প্রপার বিয়ে হয়েছিল—আমি প্রকাশ্য আদালতে স্বীকার ক'রে নেবো সেকথা—আমার অদৃষ্টে যাই থাক !'

এ প্রস্তাবে ফল হ'ল বিপরীত।

অশোকার শান্ত দৃষ্টি যেন জ্বলে উঠল।

'মানে—এখন তুমি ঐ মেয়েটার হাত থেকে মুক্তি চাইছ—য়্যাট এনি কস্ট!...উঃ—কী পাষণ্ড তুমি! নিজের সামান্যতম সুবিধের জন্যে অন্য কারও সারা জীবন নষ্ট হয়ে গেলেও—তার বুক ভেঙে সামাজিক মৃত্যু হ'লেও তোমার কোন অনুশোচনা কি দুঃখ বোধ হয় না! আশ্চর্য!'

অরবিন্দ তার পরাজয় স্বীকার করে নেয়।

আর অপেক্ষা ক'রে লাভ নেই। আজকের এই আসাটাই ব্যর্থ হয়ে গেল।

আজ আর কথা এগোতে পারবে না।

কেবলই প্রতিটি কথার কদর্থ হয়ে যাচ্ছে।

এ অবশ্য স্বাভাবিকই—বহুদিনের বহু জ্বালা পুঞ্জীভূত হয়ে আছে অশোকার মনে—কোথাও কোন একটু পথ পেলে তা বেরিয়ে আসবে বৈ-কি!

সে উঠে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমি আজ যাচ্ছি। তোমাকে অকারণে উত্যক্ত করব না আর। আজ তুমি যদি আমার সব কথা বা সব আচরণের কদর্থ করো—তার জন্যে আমিই দায়ী। এটুকু বোঝার মতো মনুষ্যত্ব বোধহয় এখনও আছে।...তবে—এইটুকু হাতজোড় ক'রে আমি ভিক্ষা চাইছি—খোকনের কথাটা তুমি একটু ভেবে দ্যাখো।...গোয়েন্দা লাগালে তোমার কাছে আসতে হ'ত না—এটা আমিই জেনে নিতে পারতুম। কিন্তু অশোভন কিছু করব না আর তোমার সম্বন্ধে—এটুকু বিশ্বাস করো।'

অশোকার কোন উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না ক'রেই সে ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় এবার।

॥ ৯ ॥

সারা রাত বিনিদ্র কাটানোটা অশোকার আজ নতুন নয়।

এমন কি দীর্ঘকাল পরেও না।

ঘুম না হওয়াটাই তার প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক হয়ে উঠেছে।

সেই অরবিন্দর চলে আসা থেকেই।

ক'দিন আগে বহুকাল পরে যেদিন প্রথম দেখল অরবিন্দকে, সেদিনও সারারাত ঘুমোতে পারে নি।

তবে আজ বিনিদ্র কাটানোর মধ্যে একটু বিশেষত্ব আছে।

আজ সারা রাত ধরে ভেবে ভেবে একটি সত্য পুনরাবিষ্কার করল—এখনও সে অরবিন্দকে ভালবাসে।

ঠিক ততটাই বোধহয় ভালবাসে—সেই প্রথম জীবনে যেমন বেসেছিল।

ওর বাবার একটা কথা মনে পড়ল তার।

এই প্রসঙ্গে তিনি প্রায়ই বলতেন, 'ভালবাসার এইটেই মাপকাঠি বলে মনে করি—যে ভালবাসবে সে কখনও ভালবাসার পাত্রকে বিচার করবে না। বিচার

তো দুনিয়াসুদ্ধ লোক করে—তবে যে বেচারী অপরাধী—যে ভুল ক'রে ফেলেছে জীবনে, সে কোথায় যাবে ভালবাসার প্রশ্রয় বা আশ্রয় ছাড়া ?'

কথাটা শুনে আগে হাসত সে।

এর পরিপূর্ণ গভীর অর্থ উপলব্ধি করার মতো অভিজ্ঞতা তখন হয় নি বলেই হাসত।

ভাবত এটা বাড়াবাড়ি—যে আমার প্রতি কোন নিদারুণ অন্যায় বা অবিচার করেছে—তাকে আমি বিচার করব না ভালবেসে যাব—এ আবার কেমন কথা ? এ কি সম্ভব ?

আজ কথাটার অর্থ বুঝতে পেরেছে সে।

অরবিন্দ ওর প্রতি যে অবিচার ও অন্যায় করেছে—যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে ওর সঙ্গে, কোন মানবিক আইনেই তার মার্জনা নেই।

তবু, আজ সমস্ত চিন্তা ছাপিয়ে ওর কেবল অরবিন্দের সেই অপরাধী দৃষ্টি ও করুণ অসহায় কণ্ঠস্বরের কথাই বার বার মনে হচ্ছে কেন ?

মনে হচ্ছে, অসহায়তা শুধু নয়—ঐ ভঙ্গী ও কণ্ঠস্বরে এক বিপুল হতাশাই প্রকাশ পাচ্ছে। মস্ত বড় ব্যর্থতা একটা।

কিন্তু সে ব্যর্থতা, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী বুদ্ধি দাম্ভিক অরবিন্দর ঐ দীন বিনত ভঙ্গী ওরই বেদনার কারণ হয়ে উঠছে কেন ?

শুধু আজ নয়—সেদিন ঐ স্ত্রীলোকটাকে দেখার পরই যখন বুঝেছে যে এ মেয়েছেলেকে নিয়ে কেউ সুখী হতে পারে না, এরা কারও জীবনে শান্তি আনতে পারে না—তখন স্বাভাবিক প্রতিশোধের আনন্দ নয়, ওর প্রথম প্রতিক্রিয়া যেটা হয়েছে—একটিই চিন্তা—অরবিন্দর জীবনটা ব্যর্থ হয়ে গেল ! এই স্ত্রীকে নিয়ে না জানি বেচারী কত জ্বলেছে আর কত জ্বলছে !

সে দহনের ইতিহাস—প্রতিটি মুহূর্তে, পলবিপল একটু একটু ক'রে অশান্তিতে দগ্ধ হওয়ার বিবরণ—চোখে না দেখলেও অনায়াসে কল্পনা করতে পারে সে।

কারণ অনেক দেখেছে। তার কর্মসূত্রে বহু বাড়িতেই যেতে হয়েছে ; অন্তঃপুরেও।

এ দহনের জ্বালা যে কী তা সে ভাল রকমই জানে।

অথচ এই লোকটা তার যত অনিষ্ট করেছে তত বোধহয় কেউ কোন মেয়ের করে না।

স্ত্রী বা প্রণয়িনী তো নয়ই—অতিবড় শত্রুর সঙ্গেও বোধহয় এ শত্রুতা কেউ করে না।

এই সর্বনাশ। সর্ব বিনষ্টি।

ওর জন্যেই তার সমস্ত জীবন, সমস্ত সম্ভাবনা—তার মায়ের ভাষায় 'ইহকাল পরকাল' নষ্ট হয়ে গেছে।

আজ আর তার কোথাও কোন আশ্রয় নেই, জীবনের নৌকো ইহজন্মে আর কোন কূলে ভেড়ানো চলবে না।

কোথাও কোন আশার স্বপ্ন দেখা চলবে না।

কোন সুদূর ভবিষ্যতে সুখস্বপ্নও না।

তার বাবা-মা ভাইবোন—আত্মীয়-বান্ধব, তার সমাজ, তার নিশ্চিন্ত প্রতিষ্ঠিত জীবনের বিপুল সম্ভাবনা—সমস্ত ছেড়ে এসেছিল একদিন সে ঐ লোকটার জন্য।

দ্বিধা করে নি, ইতস্তত করে নি।

চিন্তা করার অবসর চায় নি।

এতখানি ত্যাগের কোন প্রশ্নই ছিল না, আর আজ তাকে এমন অনায়াসে ভাসিয়েও দিতে পারত না—যদি না ওর একটা কল্পিত সংকটের মুখ চেয়ে স্বেচ্ছায় খাঁচার দোর খুলে রাখত অশোকা।...

সেদিন ওর কথাই শুধু ভেবেছে।

ঐ অকৃতজ্ঞ লোকটার কথা। তার জীবনের, তার পরমায়ুর কথা।

নিজের সর্বনাশের সম্ভাবনার কথা একবারও ভাবে নি। শোনে নি কোন গুরুজনের নিষেধ।

কিন্তু ও লোকটা যখন গেল—কী অনায়াসেই না ছেড়ে চলে গেল, কত সহজে!

প্রেম, নির্ভরতা, বিশ্বাস কৃতজ্ঞতা—এগুলো তো অনেক বড় কথা—দীর্ঘকাল পশুপাখী পুষলেও যে মায়া জন্মায়—সে মায়ার জন্যেও এক লহমা ইতস্তত করে নি।

একপাটি ছেঁড়া জুতোও ফেলে দেবার আগে লোকে বোধহয় এর থেকে বেশী চিন্তা, বেশী ইতস্তত করে!

সে যে কী দিন গেছে অশোকার!

অতিবড় শত্রুরও না এমন দিন আসে কখনও।

এমন চরম অসহায়তার দিন।

বাবা-মার কাছে যাওয়া সম্ভব ছিল না কোনমতেই—এর পর ঐভাবে বাবার কাছে গেলে তাঁর মৃত্যু ঘটত, তাছাড়া তাঁদের সামাজিক জীবন নষ্ট হ'ত—তাঁরা ওকে নিয়ে কি করতেন?

ফেলতেও পারতেন না, আশ্রয়ও দিতে পারতেন না।

কোন্ অধিকারে কোন্ মুখে সে ওঁদের এমন বিপন্ন করত!

আর কোন্ মুখেই বা গিয়ে দাঁড়াত!

তাঁদের নিষেধ সতর্কবাণী অবহেলা করার প্রত্যক্ষ ফল স্বীকার ক'রে নিয়ে?

সে লজ্জা, সে অপমান মৃত্যুর অধিক।

বন্ধু-বান্ধব—ওর এবং অরবিন্দর—কলকাতা শহরে অভাব ছিল না।

কিন্তু তাদের আপাত-সহানুভূতির আড়ালে প্রচ্ছন্ন টিটকিরি এবং অপরিসীম বিজয়গর্ব—সেদিন ওর যা মানসিক অবস্থা—তাতে সহ্য হত না কোনমতেই।

আর কীই বা পথ ধরতে পারত ?

কোন চাকরি দেখে নিতে গেলে কোন আশ্রয় খুঁজতে গেলে সময় লাগবে, পরিচিতদের দ্বারস্থ হতে হবে—সে উপায়ও ওর ছিল না।

বড় জোর ক'টা দিন ঐভাবে ফ্ল্যাটের দরজা বন্ধ ক'রে থাকতে পারত।

তাও, ঐ কাগজের বিজ্ঞাপনটা ইতিমধ্যেই কার নজরে পড়েছে তার ঠিক কি !

একজনের নজরে পড়াই যথেষ্ট। সে গাড়িভাড়া ক'রে গিয়ে পাঁচজনকে জানিয়ে আসবে।

মানুষের স্বভাব এটা। বিশেষ কাউকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

কারও সঙ্গে দেখা হ'লেই সেই অজস্র জবাবদিহি, আর 'আহা' 'উহু' মৌখিক সহানুভূতি—তারপরই 'ঐ জন্যেই তো বলেছিলুম তোকে—' একটা প্রচ্ছন্ন বিজয়লাভের আনন্দ।

চাকরিও কি কেউ খুঁজে দিতে পারবে ?

আগেও তো অনেক চেষ্টা করেছে।

সেই দুর্নাম, সেই 'স্টিগ্‌ক' তো লেগেই আছে ওর নামের পিছনে, মিছি-মিছি এতগুলো লোকের করুণা-তথা-বিদ্রূপের পাত্র হয়ে লাভ কি ?

কথাটা বাবা-মার কানে পৌঁছবে, মামার বাড়ি, মাসীমাদের বাড়ি, বড় পিসীর ওখানে, সর্বত্রই ছড়াবে।

তাঁদের এমনিই যথেষ্ট অপমান লাঞ্ছনার কারণ হয়েছে সে—আবার নতুন ক'রে দুঃখ ও অপমানের কারণ হয়ে, জনসমাজে নতুন ক'রে হাস্যাস্পদ ক'রে তুলে লাভ কি ?

সন্তান হয়ে শুধুমাত্র তাঁদের দুঃখেরই কারণ হয়ে গেল চিরকাল।

স্বেচ্ছাবৃত এই সর্বনাশের ভাগ দিয়ে আর অধিকতর দুঃখে ফেলতে মন চায় নি।

তাতে ওর যদি কোন সুবিধা হ'ত—তাহলেও কথা ছিল।

কিছুই হবে না—এটা বেশ বুঝেছিল।

না। কোথাও কোন আশা বা অবলম্বন দেখতে পায় নি সে।

একমাত্র যে পথ খোলা ছিল তার সামনে—তা হ'ল আত্মহত্যার পথ।

নিশ্চিন্ত হবার উপায়, সকল জ্বালা থেকে অব্যাহতি পাবার।

কিন্তু ছেলেটা ?

ঐ নিষ্পাপ শিশু—যাকে অশোকারই নির্বুদ্ধিতা এবং একগুঁয়েমি পিতৃপরিচয়হীন ক'রে এ পৃথিবীতে নিয়ে এসেছে !

যার জন্মদাতাকে পর্যন্ত দায়িত্ব-পালনের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে ওরই বুদ্ধিহীনতা।

একমাত্র উপায় আছে, ওকে কোন অনাথ আশ্রমে দিয়ে দেওয়া।

সেই উদ্দেশ্যে কলকাতার মধ্যে এবং কাছাকাছি যে-সব অনাথ আশ্রম আছে

—ঘুরে দেখল।

কোন-কোনটায় সারা দিন ক'রে কাটাল।

সেখানের অবস্থা দেখে মন সায় দিল না।

এখানে থাকলে হয়তো হড় হবে—কিন্তু মানুষ হবে কি ? পরে ভদ্রসন্তান বলে পরিচয় দিতে পারবে কি ?

হয়তো বড় হবার আগে এখান থেকে পালিয়ে ভিক্ষাবৃত্তি নেবে, কিংবা চোর-গুন্ডার হাতে গিয়ে পড়বে।

পকেটমার হবে, কিম্বা অন্ধ বা বিকলাঙ্গ হয়ে অপরের উপার্জনের সহায় হবে।

না, সে সম্ভব নয়।

তবে ?

ছেলেটাকেও কি নিয়ে যাবে মৃত্যুর পথে—মা হয়ে ?

অনেক ভেবেছে।

সারারাত্রি বিনিদ্র বসে ভেবেছে, ছেলের মুখের দিকে চেয়ে।

শেষে একসময় মনে হয়েছে—শুনেছে যেন কার মুখে, সন্ন্যাসীরা কোন কোন মঠে বা ব্যক্তিগত ভাবেও—ছোট ছেলেদের নিয়ে মানুষ ক'রে চেলা বানিয়ে নেন, ঐসব চেলারাই একেবারে বাল্যকাল থেকে ব্রহ্মচর্য ও সন্ন্যাসের শিক্ষা নিয়ে তরুণ বয়সেই সন্ন্যাসী হয়ে যায়।

ভগবানের আরাধনায় তথা মানবসমাজের কল্যাণে আত্মোৎসর্গ করে।

মন্দ কি !

এই তো পারিবারিক সাংসারিক জীবন—এর থেকে ঐ শান্ত, আত্মসমাহিত, ঈশ্বরে-সমর্পিত-প্রাণ জীবন অনেক ভাল।···

ছেলেকে বাঁচাবারও এই একমাত্র পথ—যদি পারে, সম্ভব হয় যদি।

সেই ভেবেই সেদিন অশোকা—সামান্য টাকা যা হাতে ছিল, তাই নিয়ে—এখানকার আসবাবপত্র বই প্রভৃতি ঝিকে বুঝিয়ে দিয়ে বিক্রী ক'রে টাকাটা নিয়ে নিতে বলে—সোজা চলে গিয়েছিল ঋষিকেশ।

মনস্থির করার পর আর একদিনও এখানে থাকে নি।

এখানের বাতাস এখানের স্মৃতি—রুদ্ধ-ঘরে যেন শ্বাসরোধের কারণ হয়ে উঠেছিল।

ছেলেবেলায় বাবার সঙ্গে হরিদ্বার-ঋষিকেশ গিয়েছিল—ঐসব জায়গায় অনেক মঠ-আখড়া-কুঠিয়া প্রভৃতি আছে, বিস্তর সন্ন্যাসীও থাকেন—সেই সময়ই দেখেছে।

আর কোথায় কি আছে জানা ছিল না—প্রশ্ন ক'রে জানবে কারও কাছ থেকে এমন লোকও নেই।—কার কাছেই বা যাবে, সকলকে পরিহার করতেই তো চায়। সুতরাং সোজা ঋষিকেশই চলে এসেছিল।

তারপর একটা ধর্মশালায় নেবে—দু'একটা মঠে বা আখড়ায় দেখা করতে গেছে।

ওখানে গিয়েও খোঁজ করা খুব সহজ হয় নি।

অনেকেই একবার ছেলের ও একবার ওর মুখের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসি হেসেছে।

তবে এখানে সবাই অপরিচিত বলে সে অকথিত সংশয়ে বা কৌতুকে অত জ্বালা অনুভব করে নি।

আবারও খোঁজ করেছে, শেষে খোঁজ পেয়েছেও।

কিন্তু অতটুকু শিশু নিতে কোন মোহান্তই রাজী হন নি, ও তো এখনও দুগ্ধপোষ্য—কে ওর হেফাজত করবে এখানে ?

'মেয়েদের আখড়ায় গিয়ে দেখতে পারো'—পরামর্শ দিয়েছেন কেউ কেউ।

সে চেষ্টাও করেছে—তাঁদেরও সেই এক কথা।

ঐটুকু ছেলেকে কে মানুষ করবে।

এখানে সব আজন্ম ব্রহ্মচারিণীর দল, শিশুপালনে কারও কোন দক্ষতা নেই।

দু-একজন ছুট্‌কো ছাই-মাখা সন্ন্যাসী নিতে চেয়েছে—আগ্রহও প্রকাশ করেছে, কিন্তু তাদের ভাবভঙ্গী অশোকার ভাল লাগে নি।

উপার্জনের অন্য পথ না পেয়েই সন্ন্যাস নিয়েছে এরা।

সামাজিক প্যারাসাইট-এর দল !

টাকাগুলো হাতিয়ে নিয়ে ছেলেটাকে হয়তো ভিখিরীদের দলে বেচে দেবে —কিংবা পাকিস্তানে চালান দেবে।

ওরা ভিক্ষের সুবিধের জন্যে ইচ্ছে ক'রে কানা-খোঁড়া-বিকলাঙ্গ ক'রে দেয়। মাগো, সে দুর্গতির চেয়ে ওকে সুদ্ধ নিয়ে গঙ্গায় ডোবা ঢের ভাল !···

সেই উদ্দেশ্যেই—সেই চরম হতাশাতাড়িত হয়েই সেদিন ছেলেকে নিয়ে গঙ্গার ধারে গিয়েছিল কি না—তা আজও অশোকা জানে না। ত্রিবেণী ঘাট থেকে একটু নিচে গঙ্গার ধারে চুপ ক'রে গিয়ে বসেছিল সে।

সেই সময় গঙ্গাস্নান ক'রে উঠে আসছিলেন এক বৃদ্ধ সাধু।

সাধু বাঙালী, সম্ভবত রামকৃষ্ণ মিশনেরই কোন সন্ন্যাসী হবেন।

কিম্বা ঐরকম কোন সেবা-ব্রত প্রতিষ্ঠানের।

এমন পবিত্র অথচ এমন স্নেহকোমল প্রশান্ত দৃষ্টি সাধুটির—মুহূর্তের মধ্যে অশোকার মনে হ'ল তার এই সমস্যার যদি সমাধান কেউ করতে পারেন তো ইনিই পারবেন।

সে আর কিছু ভাবে নি, দ্বিধা কি সঙ্কোচ করে নি—সোজা উঠে গিয়ে সাধুর পায়ের কাছে শিশুটিকে শুইয়ে দিয়ে নিজেও গলায় আঁচল দিয়ে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করেছিল।

যেন এতদিনে সত্যকার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছে সে—এই নিষ্পাপ সন্ন্যাসীর চরণ দুটিতে !

সে সন্ন্যাসী—পরে তাঁকে রামপ্রসাদ মহারাজ বলে ডাকতে শুনেছিল

অশোকা অপর সাধুদের—'হাঁ-হাঁ' ক'রে উঠেছিলেন।

প্রথমটা একটু সন্দিগ্ধও হয়ে উঠেছিলেন অশোকার ভাবভঙ্গীতে—সে কথা পরে অকপটেই স্বীকার করেছেন।

কারণ এখন অনেকে অনেক মতলবে অনেক ফেরেববাজিতে ঘুরে বেড়ায়—সহানুভূতির সুযোগ নিয়ে বিষম বিপদে ফেলে।

তবে সে ঐ কয়েক লহমাই।

এর বেশী সময় লাগে নি।

বহুদর্শী, বহুদিনের নাম-করা জন-কর্মী রামপ্রসাদ মহারাজ অশোকার মুখের দিকে চেয়েই বুঝেছিলেন যে—এ সে রকম নয়।

সম্ভ্রান্ত ঘরের শিক্ষিতা মেয়ে।

এর বিপদ কল্পিত কিছু নয়। কু-মতলবে আসে নি।

তখন তিনি একধারে ওকে বসিয়ে শুনেছিলেন ওর সব কথা।

অশোকা কিছুই গোপন করে নি।

নিজের পরিচয়ও না।

নিজের বিপুল নির্বুদ্ধিতা ও তার পরিণাম, এখন কেন ও কী উদ্দেশ্যে হৃষিকেশে এসেছে এবং সে উদ্দেশ্য সাধনের চেষ্টায় কি ফল হয়েছে বিবৃত ক'রে—আজ কোন্ হতাশা তাকে শেষ পর্যন্ত গঙ্গার ধারে টেনে এনেছে তাও জানিয়ে, একসময় শেষ করল নিজের কাহিনী।

ওর কথা শুনতে শুনতে বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর চোখ ছল ছল করে এসেছিল।

ইহলৌকিক সমস্ত বাসনা কামনা ত্যাগ করেছেন বলেই বোধ হয় এত করুণা তাঁর জীবের প্রতি।

তাদের দুঃখ নিজের দুঃখের অধিক বুকে বাজে।

অশোকার এই শেষের কথাটায় শিউরে উঠলেন তিনি।

যেন মনে হ'ল অমঙ্গলের এই সম্ভাবনাটা দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে দিতে চাইলেন।

অন্তত সেই রকমই একটা ভঙ্গী করলেন।

ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, 'ছি ছি, এ কী বুদ্ধি তোমার মা! এই দেবশিশুর মতো ছেলে—এ তো ঠাকুরের পরিপূর্ণ করুণা তোমার ওপর, ও তো তাঁরই দান—একে নষ্ট করবে মনে করেছিলে! তোমার তো কোন অধিকারই নেই এ কাজ করার। আর এত হতাশ হবারই বা কি হয়েছে? আরও অনেক অল্প বয়সে অনেক মেয়ে বিধবা হয়—অবলম্বনহীন সহায়হীন—তারা ছেলে মানুষ করে না? তোমার তো এখনও হাল ছেড়ে দেবার মতো কিছু হয় নি—এখনও তো ভিক্ষা করার অবস্থায় আস নি—তবে এত হতাশ হচ্ছ কেন? আর সে অবস্থায় এলেই বা কি? সন্তানের জন্যে, তাকে মানুষ করার জন্যে ভিক্ষা কি দাসীবৃত্তি অবলম্বন করতেও দোষ নেই। তুমি যাকে পৃথিবীতে এনেছ তার কল্যাণের জন্যে প্রয়োজন হলে চরম আত্মত্যাগও করতে হবে। এসব পাগলামি ছাড় মা—তুমি ধর্মশালায় ফিরে যাও। আমি এইখানে এক কুঠিয়ায় আছি,

তাদের পঙ্গতের সময় হয়ে এল। আমি খাওয়া-দাওয়া সেরে তোমার ওখানে যাব। ওখানে থাকা চলবে না, আজই তোমাকে—এখানে চিনু নামে একটি বাঙালীর মেয়ে মন্দির করেছে—সারদামন্দির বলে, সেইখানে তুলে দেব। তারপর আমি দেখছি—কী করতে পারি।'

তবু এতটা যে তিনি করতে পারবেন, তা অশোকা আশা করতেও সাহস করে নি।

সুদূরে কল্পনাতেও আসত না তার।

ভেবেছিল কথার কথা। আপাতত একটা স্তোক দেওয়ার মতো।

কিছু করবেন হয়ত—তবে কতটা পারবেন সে সম্বন্ধে ধারণা অতি ক্ষুদ্র সীমার মধ্যেই আবদ্ধ ছিল।

আজ মনে হয় সত্যিই এ ঠাকুরের যোগাযোগ, তাঁরই দয়া।

নইলে রামপ্রসাদ মহারাজের সঙ্গেই তো দেখা হবার কোনো কারণ ছিল না।

উনি তখন কোন মঠে মিশনেই থাকতেন না।

ঋষিকেশের কাছে, এখন যেখানে রুশ-ভারত সহযোগিতায় য়্যান্টিবায়োটিকের বিপুল কারখানা হয়েছে—বড় কারখানার সমস্ত অশুচিতা, কদর্যতা ও কোলাহলের আয়োজন নিয়ে—সেইখানে আত্মবিজ্ঞান ভবন বলে প্রবীণ সাধুদের একটি তপশ্চর্যাশ্রম ছিল—আজও আছে অবশ্য—তবে নির্জন আর নেই—সেইখানে থাকতেন, জনবিরল গঙ্গাতীরে একা একটি কুঠিয়াতে তপস্যা করতেন। কদাচিৎ কখনও লোকালয়ে আসার কারণ ঘটত। বরং এক-আধবার হয়ত উত্তর-কাশী যেতেন।

কে জানে, এবারে ওঁর আসাটা অশোকার প্রতিই ভগবানের করুণা কিনা।

দৈবাৎই এসে পড়েছিলেন।

সেদিন নয়—তার আগের দিন এসেছিলেন এক রুগ্ণ সাধুকে নিয়ে এখানের হাসপাতালে ভর্তি করাতে।

কাজ সেরে চলে যাবেন—নিতান্ত বন্ধু এক সন্ন্যাসীর অনুরোধেই একটা দিন থেকে গিয়েছিলেন।

অশোকার এই প্রয়োজনে লাগবেন বলেই হয়তো।

সে প্রয়োজন সাধনও করলেন।

মাত্র এক দিন—চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই সব ব্যবস্থা ক'রে ফেললেন রামপ্রসাদ মহারাজ।

দেরাদুনে এক নিঃসন্তান ডাক্তার দম্পতি আছেন—এদেশী ব্রাহ্মণ, ঠাকুরের খুব ভক্ত।

তাঁরা ছেলেটির ভার নিতে রাজী হয়েছেন।

শুধু খাওয়া-পরাই নয়—তার শিক্ষা, এমন কি উচ্চশিক্ষারও।

অশোকা তার জন্য কোন খরচ দিতে চায়—সাময়িক বা নিয়মিত—তাঁরা

নেবেন, সে বিষয়ে কোন অহঙ্কার নেই তাঁদের—না দিতে পারে তাতেও কোন ক্ষতি হবে না।

ছেলে আজ থেকে তাঁদেরই হয়ে গেল—কিন্তু তাই বলে মাকে চিনবে না তা নয়।

ছেলেকে পর ক'রে দিতে চান না তাঁরা।

অনুগ্রহ নয়—সহানুভূতির কোন উচ্চ মূল্য দাবী করছেন না।

অশোকা যখন খুশি এসে দেখে যেতে পারে। ছেলে তাকেই মা বলে জানবে—যখন বড় হবে তখন সব কথাই তাকে বলা চলবে—শুধু এখন এই পরিচয়টা না ছড়ানোই ভাল, তাতে ছেলের শিক্ষার বা উন্নতির ব্যাঘাত ঘটতে পারে।

তাঁরা, সেই ডাক্তাররা, ওকে ভাগ্নে বলে পরিচয় দেবেন।···

শুধু ছেলে নয়—ছেলের মায়ের জন্যেও ইতিমধ্যেই একটা ব্যবস্থা ক'রে এসেছেন মহারাজ।

তার কথাও সন্ন্যাসীর চিন্তা এড়ায় নি।

অশোকা নার্সিং শিখবে?

যদি রাজী থাকে উনি এখনই সে ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে ওর শেখার ও হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেবেন।

নিশ্চিন্ত নিরাপদ আশ্রয়, ভবিষ্যতে স্বাবলম্বী হবার বিরাট সুযোগ।

থাকা-খাওয়ার কোন খরচ লাগবে না—বরং এক বছর পরে কিছু হাত-খরচাও পাবে।

দু বছর শেখার পর একটা পরীক্ষা দিতে হবে—পাস করলে চাকরিও করতে পারে—অন্যথায় কোন বড় শহরে বসে স্বাধীনভাবেও কাজ করতে পারে।

এখন অনেক জায়গায় নার্সদের ইউনিয়ন হয়েছে—তাদের সঙ্গে কিছু কমিশনের ব্যবস্থা করলে কাজের অভাব হবে না।

রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য।

রাজপুত্রের সোনার কাঠির জাদুদণ্ড বোলাবার মতো।

অশোকারও কথাটা বুঝতে, ধারণা করতে এবং বিশ্বাস করতে বেশ কিছুটা সময় লাগল।···

সেই ব্যবস্থাই হয়ে গেল।

নার্সিং শেখার ব্যবস্থাটা পেয়ে বেঁচে গেল অশোকা।

চাকরি মানেই সহস্র জবাবদিহি, পরিচয়ের হাঙ্গামা।

তাই বা কে দিচ্ছে!

এক হয়তো পারলে এই সাধুই দিতে পারেন।

তবে তার চেয়ে এই ভাল, অনেক ভাল।

'পীড়িত মানবের সেবা করা'—মহারাজ বললেন, 'এও তো এক রকম ঠাকুরেরই কাজ মা!'

বুঝল যে পূত-চরিত্র, পরহিতব্রতী যথার্থ সন্ন্যাসী বলেই—এঁকে সকলে শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে, তাই এঁর চার দোর খোলা।

যার কাছে যে-কোন কারণে প্রার্থী হয়ে যান—সে কৃতার্থ বোধ করে ওঁর সেবায় লাগতে পেরে।

এ ঈশ্বরেরই আশীর্বাদ। তিনিই ওকে হাত ধরে টেনে এনেছিলেন এই ঋষিকেশে, তিনি যোগাযোগ ঘটিয়েছেন।

সব দোর যখন বন্ধ ভাবছিল, তখন তার অসহায় আকুলতায় ঈশ্বরই এই দোর আবার খুলে দিয়েছেন।

সেই নিশ্চিন্ত হয়েছে অশোকা।

ছেলে সেই ডাক্তার দম্পতিরই চেষ্টায় মিলিটারী ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে।

তার কোন কিছুর জন্যেই অশোকাকে ভাবতে হয় নি আর।

তবু যখন যা নিয়ে গেছে—তাঁরা সাদরে তা নিয়েছেন, প্রত্যাখ্যান ক'রে নিজেদের অর্থের দম্ভ প্রকাশ করেন নি।

এখন তো অশোকা তাঁদের আত্মীয়ের মতোই হয়ে গেছে।

ডাক্তারের স্ত্রী নিজের বোনের মতোই দেখে, সেই পরিচয়ই দেয় সকলকে।

তাঁদের স্নেহে ওর আহত ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের জ্বালা অনেকটা নিরাময় হয়ে এসেছে।

হারিয়ে যাওয়া বাবার মতোই স্নেহময় মনে হয় এই ডাক্তারকে, তাঁর স্ত্রী ওর মায়েরও অধিক।

না, অশোকার আর কোন দায়িত্ব নেই সেদিকে।

শুধু যদি সে রামপ্রসাদ মহারাজের কিছু করতে পারত!

কোন উপকারেই সে লাগতে পারল না তাঁর।

যাঁর কিছুতে প্রয়োজন নেই—তাঁর কি করবে, কী ক'রে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাবে!

কোন-কিছু দিতে গেলে সাগ্রহে আনন্দ ক'রেই নেন, পরক্ষণেই আর কারও প্রয়োজন বুঝে তাকে দান ক'রে দেন।

তা কে জানে কোন বৃদ্ধ সাধু, 'কে জানে হাসপাতালের কোন সাধারণ রোগী।

বলেন, 'মা, ওর দরকার অনেক বেশি। তোমার জিনিসটা সদ্ব্যয়ে গেল—সেই ভাল হ'ল না? কি হ'ত—আমার কাছে থেকে মিছিমিছি নষ্ট হ'ত বৈ তো নয়!'

যার লোভ নেই, প্রয়োজনবোধ নেই,—আশা নেই বলে আশাভঙ্গের বেদনা যাকে আঘাত করে না, যার কিছুতেই অতৃপ্তি বা ক্ষোভ নেই, যে সমস্ত কিছুতে ঠাকুরের কল্যাণহস্ত চিন্তা করে—যে এই জীবনের সামান্যতম আনন্দের জন্যও তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ—তাঁকে উপকৃত করা কি খুশী করা অত্যন্ত কঠিন।

এই সন্ন্যাসীটিকে দেখে সেই মহৎ সত্য উপলব্ধি করেছে অশোকা।

॥ ১০ ॥

দুদিন ধরে ক্রমাগত ভেবে এই সত্যটুকু উপলব্ধি করল অশোকা যে, অরবিন্দকে দুঃখ দেওয়া, অর্থাৎ তার প্রার্থনা পূর্ণ না করা, ওর পক্ষে সম্ভব নয়।

চিরদিনই একবার কোন সিদ্ধান্ত নিলে, মন স্থির করতে পারলে আর বিন্দুমাত্র ইতস্তত করে না অশোকা।

আজও করল না।

সে একটি কাগজে সংক্ষেপে সমস্ত ইতিহাস লিখে খোকন কী নামে ইস্কুলে ভর্তি হয়েছে তাও জানিয়ে অরবিন্দর কাছে ডাকে পাঠিয়ে দিল।

তার মধ্যে কোন অনুরোধ রইল না, কোন অনুযোগ রইল না।

কোন প্রকার সম্বোধন কি স্বাক্ষরও রইল না ; প্রীতি-সম্ভাষণ তো নয়ই।

বহুদিন পরে তার 'স্বামী'কে লেখা এই প্রথম পত্র!

আবেগলেশহীন শুধুই একটা বিবৃতি মাত্র।

তাতে কোন দায়িত্বও অর্পণ করল না অরবিন্দর ওপর।

এই বিশ্বাসের কোন মূল্যও দাবি করল না।

কেবল সব শেষে কয়েকটি ছত্র যোগ করল—যাকে অবান্তর না বললেও অনাবশ্যক বলা যায়।

ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সতর্কবাণীর সামান্যতম প্রকাশ।

'ছেলের ভবিষ্যৎ যাতে বিপন্ন না হয়, অথবা তার আশ্রয়দাতাদের অসন্তুষ্ট কি ক্ষুণ্ণ হবার কোন কারণ না ঘটে—এটা আমি ঠিক আশা নয়—ভগবানের কাছে প্রার্থনা করব।—ছেলের বাবা তার প্রতি একান্ত হৃদয়হীন আচরণ করেছে কি দায়িত্বজ্ঞানহীনতার পরিচয় দিয়েছে—সেটাও তার বোধহয় না জানাই ভাল। তার ভবিষ্যৎ জীবনের ওপর এই জ্ঞান বিরুদ্ধ ক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারে—তার চরিত্র গঠনের দিক থেকে এতটা মানসিক আঘাত ক্ষতিকর। যে পিতৃপরিচয় সে ব্যবহার করতে পারবে না—তা জেনেও তো কোন লাভ নেই। সে পরিচয় যত গৌরবের হবে—ততই তার পক্ষে সে পরিচয় দিতে না পারাটা বেদনাদায়ক হয়ে উঠবে।'

এই চিঠি পাঠিয়ে ক'দিনের মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে যেন অব্যাহতি পেল।

মুক্তি পেল সংশয় ও কিংকর্তব্যবিমূঢ়তা থেকে।

সকল দ্বিধা, সকল অনিশ্চয়তার নিরসন ঘটল।

এইটেই তার লাভ।

তারপর কি হবে তা আর ভাবে না সে।

ছেলের সত্যিই কোন অনিষ্ট করল কিনা এর দ্বারা—তা নিয়েও মাথা ঘামায় না।

আজকাল সে মনের মধ্যে একটা বড় নির্ভরতা খুঁজে পেয়েছে।

যা আছে ভগবানের মনে তা হবেই, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।

তাঁর ইচ্ছা শুভ কি অশুভ সে বিবেচনার ভারও মানুষের ওপর নেই।

মানুষের চিন্তা জ্ঞান অভিজ্ঞতা সীমাবদ্ধ, সীমিত।

ঈশ্বর তার থেকে অনেক বড়, বহুদূর বিস্তৃত তাঁর দৃষ্টি, বহুদূর বিস্তৃত কাল নিয়ে তাঁর কাজ।

তাঁর বিচার আমাদের বুদ্ধি-বিবেচনা-বিচারের মধ্যে, চিন্তার মধ্যে গ্রহণ করতে যাওয়া—বুঝতে যাওয়াই মূর্খতা।

এটাও রামপ্রসাদ মহারাজেরই দান—ঈশ্বরের ওপর এই পরিপূর্ণ নির্ভরতাটা।

তাঁরই উপদেশে আশ্চর্য একটা শান্তি পেয়েছে সে।

দিন-আষ্টেক পরে আরও একবার মিঃ মল্লিকের গাড়ি এসে দাঁড়াল ওআর্কিং গার্লস্ হোস্টেলের সামনে, পুষ্পিত গুলমোর গাছটার তলায়।

নার্স দময়ন্তী লাহিড়ীর সাক্ষাৎ প্রার্থনা করেন মিঃ মল্লিক।

আজ আর কোন বৃথা বাদানুবাদ করল না অশোকা।

বিনাবাক্যেই ভিজিটার্স রুমে এনে বসাল, তারপর সেদিনের মতোই সামনে বসে কোলে-রাখা-ব্যাগের ওপর হাত দুটি জোড় ক'রে শান্ত দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল অরবিন্দর দিকে।

সে দৃষ্টিতে কোন কৌতূহল নেই, কোন প্রশ্নও নেই।

শুধুই যেন অপেক্ষা ক'রে আছে সে—অরবিন্দর কি বক্তব্য শোনবার জন্য।

অরবিন্দও বৃথা ভণিতা ক'রে সময় নষ্ট করল না।

অকারণ বাক্যজালের অবতারণা তারও স্বভাববিরুদ্ধ।

সে দেখে এসেছে ছেলেকে।

সত্যকিঙ্কর ভার্গব—তার ছেলের নামের শেষে ভার্গব পদবীটা দেখে একটু আঘাতই লেগেছিল অরবিন্দর, সেই সঙ্গে একটা লজ্জাও অনুভব করেছিল।

তার সে লজ্জা বুঝি তার প্রাপ্যও।

এ তারই কৃতকর্মের ফল, এঁরা যে একটা পদবী এবং পরিচয় দিয়েছেন সে-ই এঁদের যথেষ্ট অনুগ্রহ।

ছেলেকে দেখে যত সুখী হয়েছে—ঠিক ততই দুঃখিত হয়েছে।

বরং হয়তো বেশিই।

সুশ্রী স্বাস্থ্যবান স্মার্ট—বুদ্ধির আভা ঝলমল করছে চোখে-মুখে, সে বুদ্ধি—যাকে চালাকি বলে তা নয়—যথার্থ বুদ্ধি, সেই সঙ্গে ললাটে ও দৃষ্টিতে একটা ঔদার্যের স্নিগ্ধতা।

এ ছেলে বড় হ'লে মহানুভব ও উদার হবে, বহুলোকের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করবে।

শিক্ষিত কৃতবিদ্য তো হবেই।

মায়ের মতোই মনের জোর পাবে হয়তো।

তার মতো যে হয় নি—এতে অরবিন্দ মনে মনে ধন্যবাদই দিয়েছে ভগবানকে।

এতদিন পরে নিজের শক্তি ও বুদ্ধিমত্তা সম্বন্ধে যেন একটা সংশয় দেখা দিয়েছে অরবিন্দর।

কিন্তু এই ছেলেকে নিজের ছেলে বলে পরিচয় দিতে পারবে না ?

বুকে টেনে এনে আদর করতে পারবে না ?

এ ছেলে তাকে কোন দিন বাবা বলে ডাকবে না ?

এর সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করতে পারবে না ?

এতখানি ক্ষতি সে সইবে কি ক'রে! জীবনের বৃহত্তম ভুলের এই নিদারুণ শাস্তি!

এ কী হ'ল তার! এ কি করল সে!

কিসের জন্য কি হারাল!

এ হারানো যে কতখানি হারানো, ভগবান বুঝি সন্তানের পরিপূর্ণতার আঘাতেই বুঝিয়ে দিলেন তাকে।

এই শাস্তিই বুঝি প্রাপ্য ছিল তার—জীবনের সব চেয়ে বড় সার্থকতা দেখিয়ে কেড়ে নেওয়া।

নিজেরই জিনিস—গর্ব করার মতো সুখী হওয়ার মতো—অথচ তাকে নিজের বলার অধিকার নেই।

একদা যাকে পিতৃপরিচয়ে বঞ্চিত করেছিল সে—আজ পুত্র-পরিচয়ে বঞ্চিত ক'রে সে সেই অবিচারের শোধ তুলল।...

এই কথাই বলল অশোকাকে।

চিরদিন যে ভাবাবেগকে ঘৃণা ক'রে এসেছে, দুর্বলতা বলে এসেছে—সেই অরবিন্দর গলাও বার বার কান্নায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হ'ল—লক্ষ্য করল অশোকা!

খানিকটা সময় নিয়ে নিজেকে সামলে আরও বিস্তারিত ভাবে সব খুলে বলল।

ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিশন একটা ডকুমেণ্টারী ছবি তুলতে গিয়েছিল—সেই সঙ্গেই গিয়েছিল অরবিন্দ।

সাধারণ ভাবেই এর সঙ্গে ওর সঙ্গে আলাপ করতে করতে খোকনের সঙ্গে আলাপ করেছে।

কথা বলে প্রাণ জুড়িয়ে গেছে তার, শান্ত ভদ্র বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা।

তেমনি হাহাকারেরও সৃষ্টি হয়েছে।

জীবনে কি নিয়ে গর্ব করছে সে এখন—পয়সা নিয়ে, পসার নিয়ে ?

এ তো আরও অনেকেরই আছে।

ঐ তো মালহোত্রা সাহেবেরও আছে।

তাঁর ছেলেটা অপদার্থ—বসে বসে নতুন নতুন স্কীমে শুধু বাপের টাকাই ওড়াচ্ছে। বাবা নাম দিয়েছেন 'ব্লিংকিং ইডিয়ট'।

এই হচ্ছে গর্ব করার মতো ছেলে।

অথচ সে গর্ব করার পথ অরবিন্দই বন্ধ ক'রে দিয়েছে!

চুপ ক'রে বসে শুনল অশোকা।

সার্থক হয়েছে তার এতদিনের এত দুঃখ।

বড় হবার প্রয়োজন হয় নি, তার ছেলে এই বয়সেই তার প্রতি অবিচারের, তার জীবনের ব্যর্থতার শোধ নিয়েছে।

অশোকা আজ ধন্য, কৃতার্থ।

এত দুঃখের অনেকখানিই আজ অপনোদিত।

দুজনেই স্থির নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইল বহুক্ষণ।

তারপর একসময় খুব দুর্বল, যেন অপ্রতিভ কণ্ঠে প্রশ্ন করল অরবিন্দ, 'কিছুই কি করা যায় না টুটু? কিছুই করতে পারি না আমি?'

খুব শান্তভাবে উত্তর দিল অশোকা, 'তুমি আমাকে দয়া ক'রে মিস লাহিড়ী বলে ডেকো।...কিন্তু কি করবার আছে বলো? কি করতে চাও? কী জানতে চাইছ?'

'যে অন্যায় করেছি তার কি কোন প্রায়শ্চিত্তর প্রতিকারের পথ খোলা নেই?'

সেই অসহায় করুণ কণ্ঠ।

আজও তেমনি দোলা লাগল, তেমনি বাজল বুকে এ কণ্ঠস্বরের ব্যথা, তবুও শান্ত হয়েই তা সহ্য করল অশোকা।

বলল, 'আমি তো কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

'সেদিন তোমাকে যা বলছিলুম—তুমি একটা কেস করতে পারো না আমার নামে?'

'না। ওটাকে আমি অপরাধ বলে মনে করব। এক তো মিথ্যাভাষণ, মিথ্যাচরণ—তার ওপর একটা নিরপরাধ মেয়েকে শুধু শুধু লোকের চোখে হেয় অপদস্থ করা। ছিঃ!'

তারপর বলল, 'এ আঘাত যে কি মর্মান্তিক তা নিজেকে দিয়েই জানি। আরও একজনের সে দুঃখের কারণ হ'তে পারব না।

আরও কিছুক্ষণ নিঃশব্দে বসে রইল দুজনেই।

তারপর অরবিন্দ বলল, বেশ একটু চেষ্টা ক'রেই বলতে হ'ল রূঢ়ভাষী ব্যারিস্টারকে, 'আমি—আমি যদি এ বিয়ে নালিফায়েড করার ব্যবস্থা করি—তুমি, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?'

'না।'

আবারও সেই সংক্ষিপ্ত একটি শব্দ।

একটা শব্দ যে এতখানি অর্থবহ হ'তে পারে তা বিখ্যাত ব্যবহারজীবীরও

জানা ছিল না।

কেন 'না'—প্রশ্ন করার সাহস হ'ল না অরবিন্দর।

অনেকক্ষণ পরে একটু যেন ভয়ে ভয়েই বলল, 'ফর দ্য চাইল্ডস্ সেক ?'

'না। তাও না। প্রথমত আজকের বিয়েতে বারো বছর আগেকার ছেলে কেমন ক'রে তার পিতৃ-পরিচয় পায় তা আমার জানা নেই। তাছাড়া—তোমাকে বিয়ে করতে পারলে আগেই করতে পারতুম।'

'ও। তুমি কি এখনও সেই কুসংস্কার আঁকড়ে ধরে আছ ?'

ঈষৎ কি একটু অনুযোগ ফুটল অশোকার কণ্ঠে, অতি প্রচ্ছন্ন একটা তিরস্কার ?

'যে সংস্কার বা বিশ্বাসের জন্যে এত কাণ্ড করলাম, নিজের জীবনই নষ্ট করলাম—সে আমার কাছে এত সহজত্যাজ্য—এটাই বা ভাবলে কি ক'রে ?'

আবারও কিছুক্ষণ সেই অস্বস্তিকর নীরবতা।

অস্বস্তিকর অরবিন্দর কাছে অন্তত।

তার কলারটা ঘামে ভিজে ন্যাতা হয়ে গেছে, বার বার রুমালে মোছার পরও হাতের ঘাম শুকোচ্ছে না।

কিন্তু আর বেশীক্ষণ অপেক্ষা করা যাবে না।

এখানের দারোয়ান ইতিমধ্যেই দুবার দরজার কাছ থেকে উঁকি মেরে দেখে গেছে। এমন নিঃশব্দে বসে থাকার কি ব্যাখ্যা করবে কে জানে।

অশোকাও—বোধ করি তার এই দেখে-যাওয়া লক্ষ্য ক'রে—বিব্রতভাবে অরবিন্দকে দেখিয়েই—দেওয়ালের ঘড়িটার দিকে তাকিয়েছে।

হয়তো এখনই উঠে দাঁড়াবে।

এমন সুযোগ পরে আর পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। বার বার এমন ভাবে আসার কোন অজুহাত খুঁজে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং যা বলতে হবে এখনই।

তাই সে আরও কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করার পর প্রায় মরীয়া হয়েই বলে, 'কিন্তু—যদি তোমার ধারণা সত্য হয়—ডাজ ইট ম্যাটার ভেরি মাচ ? তোমার আর বেশী কি ক্ষতি করব—বরং কিছু ক্ষতিপূরণ ক'রে যেতে পারতাম।'

অশোকা এবার সত্যিই উঠে দাঁড়ায়।

তার অসীম ধৈর্যও শেষ সীমায় এসে পৌঁছয় কি ?

শান্ত কঠিন কণ্ঠে বলে, 'সেদিনও যে কারণ ছিল, আজও তা আছে। তুমি তোমার মন দিয়ে সারা পৃথিবীর মন মাপার চেষ্টা ক'রো না। তোমাকে এর আগেও বলেছি, আমি ভেবেচিন্তেই মন স্থির করি—আর সেটা অত সহজে অস্থির হয় না। আমার মনোভাব বদলেছে বলে আমি আজও জানি না।'

এই বলে, আর কোন বাদানুবাদের অবসর না দিয়ে একটা নমস্কারের ভঙ্গী ক'রে দ্রুত ভেতরে চলে যায়।

তারপরও, আরও বহুক্ষণ সেই ভাবেই বসে রইল অরবিন্দ—সে বসে

থাকাটা অত্যন্ত অশোভন ও দৃষ্টিকটু হচ্ছে বুঝেও।

স্তম্ভিত শব্দটা এতকাল শোনাই ছিল—আজ বুঝল।

সত্যিই তখন তার ওঠবার কি এতটা হেঁটে গাড়ি পর্যন্ত যাওয়ার অবস্থা ছিল না।

অশোকা যে অবিশ্বাস্য তথ্যটি এইমাত্র জানিয়ে গেল—তার পূর্ণ অর্থ মস্তিষ্কে প্রবেশ ক'রে ওর সমস্ত স্নায়বিক ব্যবস্থাকে অনড় ও অসাড় ক'রে দিয়ে গেছে—কিছুই আর করার ক্ষমতা নেই।

ছেলেকে দেখার পর, তাকে আপন বলে দাবি করার উপায়হীনতাই নিজের অপরাধের সব চেয়ে বড় দণ্ড ভেবেছিল অরবিন্দ।

এখন বুঝল সেও তুচ্ছ।

তার প্রতি অশোকার প্রেম যে আজও অবিচল ও অনির্বাণ আছে—এই সত্য আবিস্কারটাই তার বোধ হয় সব চেয়ে কঠিন শাস্তি। আর অপরাধের।

অশোকারও সব চেয়ে বড় প্রতিশোধ।

॥ ১১ ॥

সকাল বেলাই টেলিফোনে অনুরোধ এসেছিল—আজ যদি এবেলা কোথাও ডিউটি না থাকে—মিস লাহিড়ী কি বেলা চারটে নাগাদ মিঃ মল্লিককে একটু সময় দিতে পারবেন?

দশ মিনিটের বেশি ওঁর সময় নষ্ট করবেন না—মিঃ মল্লিক কথা দিচ্ছেন।

ঠিক চারটেতেই এসেছিলেন মিঃ মল্লিক।

এই সময়টায় হোস্টেলে কেউ থাকে না।

ঝি-দারোয়ানরাও বাগানে বসে গল্প করছে, প্রায় সব ঘরেই চাবি দেওয়া, অত পাহারা দেবার প্রয়োজনও নেই।

কোন কৌতূহলী দৃষ্টি অনুচ্চারিত কৈফিয়ত চাইবে না।

এটা অনুমান ক'রেই এই সময় দেখা করতে চেয়েছিল অরবিন্দ।

পাঁচটা বাজলেই অফিস-প্রত্যাগতদের ভিড় শুরু হবে।

তার আগে দ্রুত কথাবার্তা সেরে নেওয়া দরকার।

অশোকা এসে বসতে বিনা ভূমিকাতেই ব্রীফ-কেস থেকে একতাড়া দলিল বার করল অরবিন্দ।

সেগুলো আস্তে আস্তে টেবিলের ওপর দিয়ে তার দিকে ঠেলে দিয়ে বলল, আমি একটা কাজ করেছি তোমার অনুমতি না নিয়েই। এখন না হোক—আশা করছি আমার মৃত্যুর পর এগুলো ব্যবহার করতে তোমার কোন বাধা থাকবে না।...প্লীজ, প্লীজ টুটু—তুমি আমার ছেলের জন্যে এইটুকু করতে দাও, এতে অন্তত আপত্তি ক'রোনা · তুমি তো কতো পথের লোককে কত সময়

ভিক্ষে দাও, তারা যে কেউ আমার মতো অপরাধী নয়—তা তো জেনে দাও না। আমাকে আজ এই ভিক্ষেটুকু দাও।'

এ করুণ অনুনয় অরবিন্দর মতো লোকের পক্ষে একেবারেই অস্বাভাবিক। তার কণ্ঠস্বর তাই আরও বেশী বিকৃত, আরও বেশী করুণ শোনাল।

হয়ত অনুগত অশ্রুতেই বিকৃত।

প্রকাশ-উপায়হীন অনুশোচনাতে করুণ।

অশোকা কোন উত্তর দিল না।

শুধু দলিলগুলো টেনে নিয়ে খুলে দেখল। একটা এফিডেভিট। তাতে অরবিন্দ স্বীকার করেছে যে বছর পনেরো আগে অমুক তারিখে সে হিন্দুমতে বিজয় লাহিড়ীর কন্যা অশোকা লাহিড়ীকে বিবাহ করেছিল—যে এখন দময়ন্তী লাহিড়ী নামে পরিচিত, অমুক জায়গায় এত নম্বর ঠিকানায় বাস করে—কিন্তু ব্যক্তিগত কার্যসিদ্ধির জন্য সে বিবাহ গোপন ক'রে শ্রীমালহোত্রার কন্যা নীলিমা মালহোত্রাকে বিবাহ করেছিল এবং এখনও তার সঙ্গে স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করছে।

অশোকা লাহিড়ীর সঙ্গে তার বিবাহ সম্পূর্ণ বৈধ এবং আইনসম্মত। সেই বিবাহের ফলে তাদের যে পুত্রসন্তান হয়েছে, যে এখন সত্যকিঙ্কর ভার্গব নামে পরিচিত, সে তাদের সম্পূর্ণ বৈধ সন্তান ও আইনসঙ্গত ভাবে সে-পুত্রত্বের যা কিছু প্রাপ্য, তা পাবার অধিকারী।

দ্বিতীয় দলিলখানি উইল।

তাতে লেখা আছে, অরবিন্দ মল্লিক মরার পর তার যা কিছু স্বোপার্জিত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি আছে—এই সঙ্গে তার তালিকা দেওয়া রইল—সমস্তই তার প্রথম এবং বৈধ বিবাহের সন্তান, যে এখন সত্যকিঙ্কর ভার্গব নামে পরিচিত, যার অভিভাবক হিসাবে দেরাদুনের ডাক্তার শ্রীনন্দলাল দীক্ষিত দেখাশুনা করছেন সে-ই পাবে।

শ্রীমতী নীলিমা মালহোত্রা—যাকে অরবিন্দ প্রথম বিবাহ গোপন ক'রে বিবাহ করেছিল—তার পিতার কাছ-থেকে-প্রাপ্ত সম্পত্তিই বিস্তর আছে—তার একটা তালিকাও সিডিউল 'বি' হিসেবে দেওয়া রইল—সম্ভবত তার পিতার মৃত্যুর পরও সে কিছু পাবে—তাতেই তার বেশ চলে যাবে। সুতরাং তাকে আর অরবিন্দ কিছু দেবার চেষ্টা করছে না, শুধু তার প্রতি যে অবিচার করা হয়েছে সেজন্য বিনীতভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। ইত্যাদি—

দুটি দলিলই রীতিমতো রেজিস্ট্রি করা—সাক্ষীসাবুদ, রেজিস্ট্রারের দস্তখত, উপযুক্ত ব্যক্তির য়্যাটেস্টেশান—কিছুরই অভাব নেই কোথাও।

অভিজ্ঞ ও খ্যাতনামা আইনজীবি অরবিন্দ মল্লিক তার কৃত সর্বাধিক মূল্যবান দলিলে কোন খুঁতই থাকতে দেয় নি।

তার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত এ দলিল, অনুতাপ-জর্জরিত হৃদয়ের সামান্য একটু শান্তির ও আশ্বাসের ব্যবস্থা।

অনেকক্ষণ ধরে দেখল দলিল দুটো অশোকা।

দেখতে সময় লাগল—তার কারণ দেখতে দেখতে মাঝেমাঝেই দৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়ে আসছিল তার, অক্ষরগুলো একাকার হয়ে যাচ্ছিল চোখের সামনে।

পড়া শেষ হ'লে দলিল টেবিলে নামিয়ে রাখার পরে মুখ তুলে তার দীর্ঘায়ত চোখের স্থির দৃষ্টি ন্যস্ত করল অরবিন্দর মুখের ওপর।

বহুকাল পরে যেন ভাল ক'রে দেখল ওকে। তার পর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বলল, 'কে জানে এর কি ফল হবে। আমি আর কিছু ভাবতে পারছি না।'

অরবিন্দ চমকে উঠল।

এই সমস্তর মধ্যে থেকে অশোকার মন যে কোথায় বিচরণ করছে—কোন্ প্রশ্নে, তা সে কল্পনাও করতে পারে নি।

বলল, 'তুমি কি এখনও সেই কথা ভাবছ! না না—ওসব একদম মাথা থেকে বার ক'রে দাও।...আর এ তো আইনের প্রশ্ন—শুধু ছেলের জন্যেই—'

'তাই হোক।' অশোকা বলে, 'তোমার কথা না শুনে শুধু আমিই বিপদে পড়ি নি, তোমাকেও বিস্তর কষ্ট দিলুম। আর আমি জোর করব না। আমিই যে ঠিক বুঝেছি ঠিক করেছি—তাই বা কে জানে!...তবে এ দলিল দুটো তুমি রেজেস্ট্রি ক'রে মিঃ দীক্ষিতের কাছেই পাঠিয়ে দাও। উনি ওঁর কাগজপত্রের সঙ্গে সেফ ডিপোজিট ভল্টে রেখে দেবেন।...এর মানে কি—সে আমি আলাদা চিঠি লিখে তাঁকে জানিয়ে দেব।'

আর বসা যায় না।

অনর্থক আর বসে থাকার কোন অর্থই নেই।

প্রতিশ্রুত দশ মিনিট কখন কেটে গেছে।

একটু পরেই হোস্টেলের অন্য মেয়েরা হয়তো আসতে শুরু করবে।

আর সামান্য যে অবসরটুকু আছে এখনও হয়ত আর কটা মিনিট যদি তার কোন সদ্ব্যবহার করতে হয় তো—এখনই। আর বিলম্ব করা উচিত হবে না।

কিন্তু কী-ই বা করবে? কি করতে পারে? কতটুকু?

ঐ যে শ্বেতমর্মরের মতো শুভ্র সুন্দর হাত দুটি কালো টেবলক্লথের ওপর এলিয়ে পড়ে আছে—একবার সজোরে চেপে ধরবে?

খুব লোভ হচ্ছে তখন থেকেই।—

কিন্তু সে অধিকার সে হারিয়েছে যে বহুদিন।

ইচ্ছে ক'রেই হারিয়েছে, মূল্য না বুঝে।

আজ সেই পুরনো দাবি তুলতে গেলে অসহনীয় ধৃষ্টতাই শুধু হয়ে দাঁড়াবে না...অমার্জনীয় অপরাধ বলেও গ্রাহ্য হবে।

না, থাক।

অরবিন্দও একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ায়।

জোর ক'রে—লোভী মনটাকে যেন চাবুক মেরে সায়েস্তা ক'রেই উঠে

দাঁড়ায়।

বলে, 'আজ তবে আসি।...যদি এমন, মানে এইভাবে এক আধবার আসি—অন্যায় হবে?'

অশোকা এতকাল পরে আজ হাসে।

প্রসন্ন, ক্ষমার হাসি।

বলে, 'লাভ কি? উভয় পক্ষেই কতকটা যন্ত্রণার সৃষ্টি করা—এই তো? আর একটা নির্দোষ নিরপরাধ মেয়ের কাছে অপরাধ বাড়ানো। তুমি বরং ছুটির সময়—চাও তো ছেলেকেই দেখতে যেয়ো—মিঃ দীক্ষিতের বাড়ি।...তিনি তো পরিচয় জেনেই যাবেন, আর কোন অসুবিধা হবে না। তবে ছেলেকে এ পরিচয় এখন জানতে না দেওয়াই বোধ হয় ভাল।'

সে-ও উঠে দাঁড়ায় এবার।

কে জানে তারও আর কিছু বলবার ছিল কিনা—এমনি কোন অব্যক্ত ইচ্ছা।

কিম্বা এই সাক্ষাৎ-পর্বে এখানেই পূর্ণচ্ছেদ টানতে চেয়েছিল কিনা।

হয়তো অরবিন্দকে উঠতে দেখেই উঠে দাঁড়ায়।

শুধু দীর্ঘনিঃশ্বাসটা পড়ে না।

এটুকু আত্মসংযমের শিক্ষালাভ তার হয়েছে।

অরবিন্দর সঙ্গে সঙ্গে হোস্টেলের গেট পর্যন্ত এগিয়ে আসে।

আরও একবার ঐ হাত দুটি মুঠোর মধ্যে চেপে ধরার অদম্য আকাঙ্ক্ষা দমন ক'রে গাড়িতে গিয়ে ওঠে অরবিন্দ।

*   *   *

দিন দুই পরে ভোরবেলা বিছানার পাশে টেলিফোন বেজে ওঠে।

'হ্যালো, হ্যালো, মিঃ মল্লিক?'

আর্ত আকুল কণ্ঠের একটা ডাক।

ডাকছেন ঐ ওআর্কিং গার্লস্ হোস্টেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট মিসেস চাধা।

পরিচয়টা জেনে বুঝে মনে করতে—স্মৃতির সঙ্গে মিলিয়ে নিতে কয়েক মুহূর্ত সময় লাগে।

সদ্য ঘুম ভাঙার বিহ্বলতা কাটে নি তখনও ভাল ক'রে।

কিন্তু সে সময়টুকুও অপেক্ষা করতে পারেন না—বিপন্ন বিচলিত মহিলা।

তার আগেই খবরটা দিতে শুরু করেন।

খুব বিপদ, দময়ন্তী লাহিড়ী বলে নার্সটি সম্ভবত প্রচুর পরিমাণে স্লীপিং ট্যাবলেট খেয়েছে, আত্মহত্যার চেষ্টা বলেই মনে হচ্ছে। ওর বালিশের পাশে একটা খামে-আঁটা চিঠি পাওয়া গেছে—তার ওপর মিঃ মল্লিকের নাম ঠিকানা লেখা। শোনা যাচ্ছে মিঃ মল্লিক নাকি দু-একদিন ওর সঙ্গে দেখা করতেও এসেছিলেন। তাই অনুমান করছেন ওঁরা যে মিঃ মল্লিকের ঐ চিঠির মধ্যে এ রহস্যের সূত্র আছে কিছু। ডাক্তার এসেছেন, পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে—

মিঃ মল্লিক কি একবার আসবেন'

চিৎকার ক'রে ওঠে অরবিন্দ, বুকফাটা কান্নার মতো শোনায় প্রশ্নটা, 'বেঁচে আছে—না মারা গেছে ?'

'এখনও প্রাণ আছে। ডাক্তারবাবু চেষ্টা করছেন। কখন খেয়েছে, কতগুলো খেয়েছে—বোঝা যাচ্ছে না তো—'

মিসেস চাধা উত্তর দেন।

কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগেই অরবিন্দ যেন আর্তনাদ ক'রে ওঠে, 'প্লীজ, প্লীজ মিসেস চাধা—আপনি আরও ডাক্তার ডাকুন। খুব বড় ডাক্তার। দরকার হয় দু-তিনজনকে ডাকুন।···য়্যাম্বুল্যান্স—য়্যাম্বুল্যান্স ডাকছেন না কেন ?···হাসপাতালে নিয়ে যাওয়াই তো উচিত। ঐ তো কাছেই ইনসটিটিউটের হাসপাতাল। প্লীজ, টাকার জন্যে কিছু চিন্তা করবেন না। যত টাকা দরকার মনে করেন খরচ করুন। আমি এখনই যাচ্ছি। ওকে বাঁচাতেই হবে, প্লি'জ মাই ওয়াইফ! প্লি'জ মাই ওয়াইফ!'

পাশের খাটেই নীলিমা শুয়ে আছে, এত কোলাহলে তার যে ঘুম না ভাঙবার কোন কারণ নেই—সে কথাটা একবারও মনে পড়ল না অরবিন্দর।

আকাশলিপি

উৎসর্গ

ডাঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
করকমলে—

দায়ুদ খাঁ কররাণী যখন তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়ে পাটনায় বসে, তখন আকবর বাদশা ওপারে হাজিপুর কিলা দখল করে মধ্যরাত্রে তাতে আগুন ধরিয়ে দেন—এবং সেই আগুন দেখে অকস্মাৎ নিদারুণ ভয় পেয়ে দায়ুদ যুদ্ধের চেষ্টামাত্র না করেই পলায়ন করেন—এটা ঐতিহাসিক ঘটনা। কেন যে হাজিপুর কিলা অত কষ্টে দখল করে আকবর তাতে আগুন লাগিয়েছিলেন—আজও কোন ঐতিহাসিক সে কারণ খুঁজে পান নি। সেই বিচিত্র রহস্য থেকেই এই উপন্যাসের কল্পনা। গুরুন্দা বা তুকারয়ের ঘটনাবলী—যতটুকু ইতিহাসে পাওয়া যায়, তা এতে অবিকৃত আছে। বাকীটা অবশ্যই কল্পনা; নফিসা চরিত্র তো সম্পূর্ণই। মিয়া লুদী খাঁর প্রশংসায় মুঘল ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত পঞ্চমুখ—সুতরাং তাঁর মহৎ চরিত্র কল্পনা করা কিছু অসঙ্গত হয় নি। দায়ুদ তাঁকে আশ্রয়প্রার্থীর কাতর অনুনয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে হত্যা করেছিল—এ কথাও ইতিহাসে আছে। প্রসঙ্গত বলা যেতে পারে এই উপন্যাসের মধ্যের দুটি অংশ 'আকাশলিপি' ও 'স্বিচারিণী' নাম দিয়ে দুটি মাসিকপত্রে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু তার আগে, মধ্যে ও পরে বহু অংশ সংযোজিত হয়েছে। ও-দুটি অংশও সম্পূর্ণরূপে পুনর্লিখিত হয়েছে।

ইতি—

॥ ১ ॥

বহুক্ষণ ধরেই মেঘ জমছিল, কালো কালো, কষ্টিপাথরের রঙের ডেলা ডেলা মেঘ। অন্ধকার হয়ে এসেছিল চারিদিক—এবার সেই ঘনকৃষ্ণ মেঘের কোলে কোলে সমস্ত দিগন্ত-রেখা জুড়ে অদ্ভুত একটা আলো ফুটে উঠল। যেন কালো শামিয়ানার নীচে বাঁধা-রোশনাই-এর আলো জ্বলল।

লুদী খাঁ এ মেঘের চেহারা চেনেন। এ আলোর অর্থও তাঁর অজানা নয়। এখনই জল নামবে, বিপুল বর্ষণ। লুদী খাঁর মনে পড়ল গৌড়ের লোকেরা একেই বলে 'কানা-মেঘে ভর করে' বর্ষা নামা। মেঘের কোলে এই আলো দেখা দিলেই ওরা বলে 'কানা-মেঘ'—কেন কে জানে!

গুরু-গুরু-গুম্-গুম্!

পুঞ্জীভূত মেঘের মধ্যে কে বা কারা যেন দামামা-ধ্বনি করল। সেই গুরু গম্ভীর শব্দ প্রতিধ্বনিত হতে হতে—সামনের প্রান্তর ছাড়িয়ে, গঙ্গা পেরিয়ে বহুদূর ছড়িয়ে পড়ল। ...এ যেন আকাশেরও রণসজ্জা, ওই সজ্জিত মেঘ-বাহিনীরই দামামা-ধ্বনি যেন এটা। লড়াই শুরু হওয়ার আর দেরি নেই। সমস্ত 'বেহেস্তী ফৌজ' যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে।

আবারও মেঘ ডাকল, আবারও সেই প্রতিধ্বনি জাগল আকাশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে, দিক-চক্ররেখারও বাইরে ছড়িয়ে পড়ল সে শব্দ।

ভৃত্য রহমৎ এসে পিছন থেকে বলল, 'ভেতরে চলুন হুজুর, এখনই জল নামবে!'

'নামুক, একটু দেখি। অনেকদিন আকাশের দিকে চেয়ে দেখি নি রে—বহুদিন। কেবল বেইমান মানুষগুলোর দিকে চেয়েই খোদার দেওয়া চোখ দুটো নষ্ট করেছি। কী করলাম রহমৎ, তাই আজ ভাবছি—কী করলাম। কিসের জন্যই বা করলাম!...অর্থ, সম্মান, প্রতিপত্তি? কী তার মূল্য? আজ কোথায় কী? এর চেয়ে মরীচিকা বুঝি আর কিছু নেই।...তার চেয়ে যদি ঐ কাফের ফকীরগুলোর মত সর্বাঙ্গে ছাই মেখে কৌপীন সম্বল করে পথে পথে ভিক্ষা করে বেড়াতাম! তাতেও ঢের সুখ ছিল।...প্রকৃতি ওদের জন্যে অবারিত খুলে রেখেছেন তাঁর দ্বার, এই বিপুল প্রান্তর, নদী পাহাড়, অনন্ত সৌন্দর্য-ভাণ্ডার খোলা রেখেছেন। খাওয়া? যে কোন গৃহস্থ-বাড়ি গিয়ে দাঁড়ালেই ত এক মুঠো অন্ন জোটে।...চিন্তা নেই ভাবনা নেই, অহরহ ক্রূর বিশ্বাসঘাতক—সাপের চেয়েও ভয়ংকর মানুষের বিষ থেকে আত্মরক্ষা করতে করতে ক্লান্ত হতে হয় না—ওরা আমার চেয়ে ঢের বেশী সুখী·· বুঝলি!'

রহমৎ কী বুঝল কে জানে। এ সব কথা সে বুঝতে পারে না, কেন যে

মনিব আজ এমন পাগলের মত বকতে শুরু করেছেন তাও বুঝতে পারছে না। সে একটু ভীত দৃষ্টিতে তাকাল লুদী খাঁর মুখের দিকে।

লুদী খাঁ চুপ করেছেন। কথাগুলো কিন্তু সত্যিই তিনি রহমৎকে শোনাবার জন্য বলছিলেন না—ওগুলো সবই তাঁর চিন্তা ছাড়া কিছু নয়। মনের প্রতিধ্বনি মাত্র।...তাই কখন যে তিনি থেমে গেছেন তাও তিনি জানেন না। নিস্তব্ধ অভিভূত হয়ে চেয়ে আছেন শুধু সামনের দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের দিকে।...নদীর ওপারে মাঠে জল নেমে গেছে এর মধ্যেই, কুয়াশার মত ঝাপ্সা দেখাচ্ছে সে বর্ষা। অবাক হয়ে দেখছেন লুদী—যেন এর আগে বৃষ্টি নামা কখনও দেখেন নি।

'হুজুর !'

সভয়ে সসম্ভ্রমে আবারও ডাকল রহমৎ।

এধারেও আর বসে থাকা যায় না, বড় বড় ফোঁটা ফেলে বৃষ্টি এসে পৌঁছে গেছে এ পারেও। দেখতে দেখতে লুদী খাঁর ললাটে ও মাথার টুপিতে জলের কয়েকটি বড় বিন্দু এসে জমে গেল ঘামের রেখার মত।

লুদী দীর্ঘশ্বাস ফেলে তাঁবুর ভেতর উঠে এলেন। কিন্তু তাঁবুর পরদা ফেলতে নিষেধ করলেন। বললেন, 'ওটা খোলা থাক্, এইখান থেকেই একটু দেখা যাবে তবু।'

বাইরে জল বেশ চেপেই এল। বহু দূরের প্রান্তর জুড়ে বৃষ্টি নামল ঘটা করেই। ঝম্ ঝম্ ঝম্—একটানা ধ্বনি সে বর্ষণের। মাঝে মাঝে গুরু গুরু গুম্ গুম্ শব্দ আকাশের, আর তার বহুক্ষণব্যাপী প্রতিধ্বনি। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎস্ফুরণ।

'আঃ !' আপন মনেই একটা আরামের শব্দ করেন লুদী খাঁ।

কিসের আরাম তা তিনি জানেন না। তবে তিনি দেখছেন, প্রাণভরে দেখছেন। অন্তর জুড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর। জীবনের ভেতর দিকটা নিয়ে বড় ব্যস্ত ছিলেন তিনি—প্রায় জীবনভোর। তাই তার বাইরে যে এত শোভা এত সৌন্দর্য আছে—তা কখনও চোখে পড়ে নি। আজ নতুন করে দেখলেন। নইলে এমন বর্ষা কি আর তাঁর জীবনে আসে নি ? হয়ত বহুবারই এসেছে। কিন্তু চেয়ে দেখেন নি তিনি। অবকাশ হয় নি চাইবার।

আজ দেখতে পেয়ে তিনি কৃতার্থ। অন্তর ভরে যাচ্ছে তাঁর—একটা অনির্বচনীয় তৃপ্তি ও আরামে। মনে হচ্ছে এরপর আর-কিছুর জন্য কোন কারণেই ক্ষোভ থাকল না তাঁর মনে। অতি বড় শত্রুকেও তিনি আজ হাসি-মুখে ক্ষমা করতে পারবেন।

বাইরে প্রবল বর্ষণ চলেছে, জলের ছাট্ ভিতরে এসে বহুদূর পর্যন্ত মাটিতে পাতা মূল্যবান জাজিম ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। লুদী খাঁর দাড়িতে ও ভ্রূতেও জমেছে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জলকণা। অদ্ভুত সাদা দেখাচ্ছে দাড়িটা। তাঁর জামাও বুঝি ভিজে উঠল। কিন্তু সে দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই লুদী খাঁর। তিনি চেয়েই আছেন। দেখছেন—প্রাণভরে দেখছেন।

তাঁর মনের মধ্যেও বুঝি ঝড় উঠেছে আজ। এর চেয়ে ঢের বেশী দুর্যোগ তাঁর অন্তরে। সেই দুর্যোগের কথা ভুলতেই বুঝি এমনি করে প্রাণপণে কান পেতে আর চোখ মেলে আছেন বাইরের এই দুর্যোগের দিকে।

'জনাব।'

'কে, নফিসা! আয়, আয়।'

যেন বহুক্ষণের ঘুম ভেঙে যায় মিয়া লুদী খাঁর। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ ফিরিয়ে আনেন ভিতরে। কিছুক্ষণ বিহ্বলের মত এদিক ওদিক তাকান, সেই প্রায়-অন্ধকার তাঁবুটার ভেতরে, তারপর তাঁর নজরে পড়ে নফিসা তাঁরই চৌকীর পিছনে এসে দাঁড়িয়ে আছে।

রহমৎ কখন শেজ্-এর আলোটা জেবলে দিয়ে চলে গেছে। অথবা নফিসাই এনে রেখেছে ওটা—কে জানে! কিন্তু একেই আলোটা আছে বহু দূরে, বাতাস থেকে বাঁচাতেই বোধ করি খাটিয়ার ও-পাশে রাখা হয়েছে শেজ-এর বাতিটা, তার ওপর বাইরের দমকা ঝোড়ো হাওয়ার কল্যাণে সেই ক্ষীণ শিখাটাও কেবল কেঁপে কেঁপে উঠছে। সুতরাং সে আলোয় কিছু দেখতে পাবার কথা নয়,—আলোর অস্তিত্বই ত টের পান নি এতক্ষণ—তবু ভাল করে তাকিয়ে সেই কম্পমান সামান্য আলোতেই মিয়া লুদী খাঁর চোখে পড়ল নফিসার যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্ন মুখ এবং ছলছল দুটি চোখ।

সঙ্গে সঙ্গেই কোমল এবং কেমন-এক-রকমের স্নেহ ব্যাকুল হয়ে উঠল লুদী খাঁর এতক্ষণের স্থির ভাবলেশহীন মুখভাব। তিনি ডান হাতটা কাঁধের উপর দিয়ে পিছন দিকে বাঁকিয়ে নফিসার একখানা হাত ধরে টেনে এদিকে নিয়ে এলেন এবং চোখের ভঙ্গীতে তাঁর পাশে দিওয়ানের অবশিষ্ট শূন্য স্থানটা দেখিয়ে বললেন, 'আয়, বোস্।'

কিন্তু নফিসা সেখানে বসল না, আস্তে আস্তে ওঁর পায়ের কাছে—একটা পা নিবিড় আলিঙ্গনে জড়িয়ে—মাটির ওপরেই বসে পড়ল।

লুদী বাধা দিলেন না, টানাটানিও করলেন না, কারণ তাতে কোন ফল হবে না তা তিনি জানেন। তাঁর পায়ের কাছেই বসতে ও ভালবাসে, ওইটিই ওর প্রিয়স্থান। তিনি কিছুক্ষণ নিঃশব্দে ওর মাথার নিবিড় কালো চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে বিলি কাটবার পর বললেন, 'মুখ অত ভারী কেন রে নফিসা? চোখ দুটোও অত ছলছলে? কী হয়েছে—দেশের কথা মনে পড়ছে?'

নফিসা বসে বসে ওঁর পায়ে হাত বুলচ্ছিল, সে কোন জবাব দিল না। কেবল মাথাটা তার আরও ঝুঁকে পড়ল।

হাসলেন মিয়া লুদী একটু, তারপর খানিক থেমে আবারও প্রশ্ন করলেন, 'কই, বললি না?'

এবার মুখ তুলল নফিসা, অশ্রুভার-গাঢ়স্বরে বলল, 'আপনি কেন ওই সব কথা বলছিলেন? কেন এমন করে ভিজছিলেন শুধু শুধু—যদি আপনার

অসুখ করে ?’

‘ওঃ—এই !…তা কী বলছিলুম. আর কাকেই বা বলছিলুম ?’

‘ওই যে রহমতের কাছে কী সব যা-তা বলছিলেন ! আমার ভয় করে না বুঝি ?’

‘ও !’ আবারও মধুর হাসলেন লুদী খাঁ। আদর করে ওর চিবুকটা ধরে একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, ‘ভয় নেই, আমি পাগল হয়ে যাই নি এখনও। আর বোধহয় যাবও না। তার অনেক আগেই খোদার দরবারে ডাক পড়বে তা আমি জানি।’

চমকে উঠে আরও জোরে ওঁর পা জড়িয়ে ধরে নফিসা। ওর সেই কুসুম-সুকুমার যৌবন-আতপ্ত তনুর স্পর্শ অনুভব করে, লুদী খাঁও কি একটু শিউরে ওঠেন—এই বয়সেও ?

‘কী হল আবার ?’

এবার গরম গরম জল কয়েক-ফোঁটা ঝরে পড়ল তাঁর কোলে। দুই হাঁটুর খাঁজে মুখ গুঁজে নফিসা বলল, ‘কেন আপনি ওই সব ছাই-ভস্ম অলুক্ষুণে কথা মুখে আনছেন ? কেন, কেন ?’

‘যা যা। ছেলে মানুষ কোথাকার ! ডাক পড়বে বলে কি আজই ডাক পড়ছে ? বলছিলাম পাগল আমি হব না—জীবিত থাকতে, এই কথা ত !’

জোর করে ওর মুখটা তুলে ধরবার চেষ্টা করেন মিয়া লুদী, কিন্তু পারেন না। মুখটা আরও গুঁজে দিয়ে আরও ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে নফিসা।

কথাটা যে ঠিক ‘এই’ নয়—তা মিয়া লুদীও জানেন বৈকি !

খোদার দরবারে ডাক পড়বার যে আর বেশী বিলম্ব নেই, তা তিনি মনে মনে অনুভব করছেন আজ কদিন ধরেই। তাঁর এখানের কাজ সমাপ্ত হয়ে গেছে—মনের মধ্যে কে যেন এই কথাটা বলছে অহরহ। মৃত্যু আসছে বন্ধুর মত এগিয়ে, তার চরণধ্বনি শোনা না গেলেও সে আগমন কেমন করে যেন টের পাচ্ছেন অন্তরে অন্তরে।

শুধু কোথা দিয়ে—আর ঠিক কবে আসবে, এইটেই এখনও জানেন না।

দুঃখও নেই তাঁর মৃত্যুর জন্যে। এতটুকু ক্ষোভ নেই।

‘আজীবন সার দিনু জীবন প্রান্তরে—ফল লাভ কী হল আমার ?’ কবির ভাষায় এই প্রশ্ন যে তাঁরই পরম প্রশ্নের বাণীরূপ মাত্র।

অনেক করেছেন তিনি প্রভুবংশের জন্যে সত্যি সত্যিই সারা জীবন সার দিয়েছেন ওই বন্ধুর মরুপ্রান্তরে। তাই সার দেওয়াই বৃথা হয়েছে।

চিরদিনই মিয়া লুদি প্রভুভক্ত। যখন যে প্রভুর নোকরি করেছেন—সারা মন-প্রাণ দিয়েই করেছেন। তাঁর বুদ্ধি, তাঁর বিচক্ষণতা এবং তাঁর শৌর্যের সাহায্য না পেলে কররাণীরা আজ এই বিপুল রাজ্যখণ্ডের অধীশ্বর হতে পারত না। আদিল শাহ্ সুরের সভা থেকে যেদিন কররাণীরা প্রাণভয়ে পালিয়ে আসতে বাধ্য হয়—সেদিন তাজ খাঁকে উত্তর-ভারতের নিত্য রাষ্ট্র-বিপ্লব এবং নিত্য সহস্র বিরোধ থেকে দূরে এই পূর্ব প্রান্তে শান্ত গৌড়বঙ্গে রাজ্য

উপার্জনের পরামর্শ তিনিই দেন। হ্রস্ব-দৃষ্টি কররাণীরা তখনও দোয়াবে রাজত্ব করার আশা ছাড়তে পারেন নি—তাই তখন তাঁর কথায় কান দেন নি কেউ—কিন্তু হিমুর কাছে বার বার পরাজিত হয়ে যখন মাথা গোঁজবার জায়গাটুকুও আর রইল না—তখন শুধু বুদ্ধি নয়, তাজ আর সুলেমানকে তাঁর শৌর্যের ওপরও ভরসা করতে হয়েছিল। আজ সুলেমান কররাণীর নাম তামাম হিন্দুস্থানে পরিচিত। তিনি অপরাজেয়, প্রাচীন রাজা সলোমনের মতই তাঁর প্রজ্ঞা, ঈশ্বরের বরপুত্রের মত তিনি সৌভাগ্যবান—এই কথাই সকলে জানে। পূর্বে ব্রহ্মপুত্র এবং উত্তরে কামতাপুর থেকে দক্ষিণে উড়িষ্যা ও পশ্চিমে শোন নদের তীর পর্যন্ত সুবিস্তৃত রাজ্যের একচ্ছত্র নৃপতি হতে পেরেছিলেন তিনি। দুর্ধর্ষ চিলা রায়কে পর্যন্ত পরাজিত ও বন্দী করে সুলেমান সুদূর কামরূপে হাজোদের দেশেও তাঁর পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। কিন্তু সে কার জন্য ?

সে কি লদী খাঁর জন্যই নয় ? লদী খাঁর বুদ্ধিতে চিলা রায় বন্দী হয়েছিলেন, লদী খাঁর পরামর্শেই তিনি মুক্ত হয়েছিলেন। আর তার ফলে চিরদিনের মত রাজ্যের উত্তর সীমা নিরাপদ হয়েছে তাঁদের। ওদিক দিয়ে অন্তত শত্রু আসবার ভয় নেই। লদী খাঁই সুলেমানের অপরাজেয় হস্তী-যূথ গড়ে তুলেছেন, কারুর সতর্ক-বাণীতে কর্ণপাত না করে। লদী খাঁই সবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে সমস্ত পাঠান সর্দারদের রোষ ও বিদ্বেষ উপেক্ষা করে এদেশীয় কালাপাহাড়কে করেছিলেন সেনাপতি—তার ফলে সুলেমানের রাজকোষে সুবর্ণ ও মণিমাণিক্যের পাহাড় জমেছে। সারা হিন্দুস্থানের ত্রাস হয়ে উঠেছেন তিনি। মৃত্যুর আগে দিল্লীর বাদশাকে নস্যাৎ করে সুলেমান যে 'আলা-হজরৎ' হতে পেরেছিলেন—সে কার জন্য, লদী খাঁরই জন্যই কি নয় ? নির্বোধ উদ্ধত আত্মঘাতী পাঠান সর্দাররা কার কৌশলে এই দীর্ঘকাল এমন সংহত ও সংযত হয়ে কররাণীদের প্রাধান্য সহ্য করছে—শুধু তাই নয় —তাদের সিংহাসন রক্ষা করছে, সেও কি লদী খাঁর জন্য নয় ? যে মুহূর্তে লদী খাঁ সরে দাঁড়াবেন সেই মুহূর্তে এই রাজ্যের ভিত্তি খান্-খান্ হয়ে ভেঙে যাবে। সমস্ত প্রতাপ-প্রতিপত্তি ভেঙে পড়বে তাসের প্রাসাদের মত।

অবশ্য সুলেমান যত দিন বেঁচেছিলেন সে বিশ্বস্ততার মর্যাদা দিতে পশ্চাৎপদ হন নি। বলতে গেলে মাথায় করে রেখেছিলেন মিয়া লদী খাঁকে। ইদানীং উজীরের কোন কাজেরই কৈফিয়ৎ চাইতেন না সুলতান, তিনি জানতেন যা করেন লদী খাঁ তাঁরই কল্যাণের জন্য, আর না ভেবে চিন্তে অকারণেও কিছু করেন না।

কিন্তু উজীর ভাল হলেই চলে না শুধু—রাজাকেও ভাল হতে হয়।

সুলেমান চোখ বোজবার সঙ্গে সঙ্গেই কররাণী-বংশের সৌভাগ্য-সূর্যও চোখ বুজলেন যেন। সিংহাসনে বসল অপদার্থ বায়াজিদ। তার ঔদ্ধত্য, হঠকারিতা এবং উচ্ছৃঙ্খলতায় এত দিনের পাঠান ঐক্য খান্ খান্ হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত সুলেমান কররাণীর জামাতার হাতে নিহত হয়ে বায়াজিদ নিজের

অপদার্থ তার মূল্য শোধ করে গেল।

লুদী খাঁ নিজেও এই উন্ধত লোভী ও লম্পট তরুণের হাতে কম অপমানিত হন নি, কিন্তু তবু একথা কেউ বলতে পারবে না যে লুদী খাঁ তাঁর নিমকের অমর্যাদা করেছেন। বায়াজিদ যাই হোক—সে তাঁর প্রভুর পুত্র, ন্যায়ত প্রভু। তার মৃত্যুর শোধ না নিয়ে তিনি থাকবেন কী করে? তাই সহস্র গুণে যোগ্য জেনেও হানসুকে তিনি বধ করিয়েছিলেন এবং আর এক অপদার্থ—এই দায়ুদ কররাণীকে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন।

দায়ুদ আরও অপদার্থ, তা জেনেও একাজ করেছিলেন তিনি। দায়ুদ যাই হোক—সুলেমান কররাণীর পুত্র, এ সিংহাসন যে তার পিতারই! সেদিন খোদা বুঝি অলক্ষ্যে হেসেছিলেন লুদী মিয়ার এই কাণ্ড দেখে।

লুদী ভুলে গিয়েছিলেন যে মাটি তারই, যে এ মাটির মর্যাদা জানে। যে শাসন করতে পারে না সে শাসক নয় কখনও। বাপের ছেলে—শুধু এই পরিচয়ই এতবড় একটা দেশের শাসনকর্তা-রূপে পরিচিত হবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সুলেমান কররাণীর ছেলেকে হত্যার শোধ তাঁর জামাইকে মেরে নেওয়া লুদীর অন্তত ঠিক হয় নি। এ কথাটা লুদী বুঝলেন নিজের চরম মূল্য দিয়ে। যে দায়ুদকে সিংহাসনে বসানোর জন্য সুলেমানের জামাতাকে বধ করলেন তিনি, সে দায়ুদ সিংহাসনে বসেই সেই ঋণ শোধ করল হীন ষড়যন্ত্রে লুদী খাঁর প্রাণের চেয়েও প্রিয় জামাতা—দায়ুদেরই জাঠতুতো ভাই ইউসুফ্‌কে বধ করে।...আর কার পরামর্শে এই কাজ করল দায়ুদ—না লোহানীদের! যে লোহানীরা মূলত বায়াজিদকে হত্যা করার জন্য দায়ী?

একেই বুঝি বলে ন্যায়বিচার!

ঠিকই করেছ খোদা, ঠিকই করেছ।

ধন্য ধন্য তুমি!.. মোহে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে দৃষ্টি, তাই তোমার কাজের অর্থ প্রথমটা ধরা পড়ে না।.. আবার তুমিই এক সময় তোমার দিব্যজ্যোতি দিয়ে চোখ খুলে দাও, দেখিয়ে দাও তোমার অভ্রান্ত বিচার। ধন্য, ধন্য!

॥ ২ ॥

কিন্তু লুদী খাঁ নিমকহারামী করেন নি তবুও।

ইউসুফের শোক দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করেছেন। এক দিনও ক্ষণেকের তরেও রাষ্ট্রের কাজে অবহেলা করেন নি। দায়ুদের কল্যাণ বৈ অকল্যাণ চিন্তা করেন নি।

আজ নিজের গৃহ থেকে, আত্মীয়স্বজন থেকে এতদূরে এসে পড়ে আছেন সে-ও ত দায়ুদেরই কল্যাণের জন্য। এখনও দিনরাত সেই কর্তব্যই চিন্তা করে

যাচ্ছেন তিনি—সাধ্যমত।

খবর এসেছিল—গুজর খাঁ বিদ্রোহী হয়ে পাটনায় বায়াজিদের শিশু পুত্রকে সিংহাসনে বসিয়েছে, বহু পাঠান আমীরই ঝুঁকছেন ওইদিকে। এই বিপদ থেকে দায়ুদকে রক্ষা করতেই লুদী খাঁ ছুটে এসেছিলেন এখানে, কিন্তু পেঁৗছে শুনলেন যে এর চেয়েও বৃহত্তর বিপদ ঘনিয়ে এসেছে কররাণীদের মাথায়। দিল্লীশ্বর আকবর তাঁর বিশ্বস্ত সেনাপতি মুনিম খাঁকে পাঠিয়েছেন—কররাণীদের ঔদ্ধত্য ও স্পর্ধা দমন করতে।

আর এই বিপদ মূঢ় বায়াজিদ ও দায়ুদ শখ করে ডেকে আনল শেষ পর্যন্ত।

সুলেমান শক্তিমান ছিলেন। প্রচণ্ড শক্তিমান। হয়ত সেই জন্যেই নির্বোধ ছিলেন না। স্বাধীন নৃপতির মতই দেশ শাসন করেছেন তিনি কিন্তু কখনও সেকথা স্বীকার করেন নি। সর্বদা আকবরকে বাদশা বলে স্বীকার করেছেন, তাঁর নামেই 'খৎবা' পাঠ করিয়েছেন, মুদ্রা ঢালাই করেছেন। তাঁর শতাংশের একাংশ শক্তিও নেই এই অপদার্থগুলোর, অথচ সিংহাসনে বসার সঙ্গে সঙ্গে বাদশার আধিপত্যকে বাতাসে উড়িয়ে দেবার শখটুকু আছে। এর চেয়ে মূর্খতা আর কী হতে পারে! এটুকুও জানে না যে আগুনে হাত দিলে হাত পোড়ে!

ওরা না জানুক, লুদী জানেন।

গুজর খাও জানে বৈকি।

তাই দুজনের ঝগড়া মিটিয়ে হাত মিলোতে দেরি হয় নি। আকবর বাদশা এলে দায়ুদ বা বায়াজিদের ছেলে, কেউ থাকবে না। সুতরাং আত্মরক্ষার জন্যই এক হওয়া দরকার। বাইরের প্রবল শত্রুর সামনে দাঁড়িয়ে নিজেদের মধ্যে বিবাদ করার মত মূর্খতা আর কিছুই হতে পারে না।

শুধু দুজনে যে হাত মিলোলেন তাই নয়—প্রচুর উৎকোচে মুনিম খাঁকে বশ করলেন, যাতে বড় রকমের আঘাতটা শেষ পর্যন্ত এড়িয়ে যাওয়া যায়।

আর যেতও তা—যদি না নির্বোধ দায়ুদ আবারও তাঁকে ভুল বুঝত। তাঁকে—কররাণী-বংশের সব চেয়ে বিশ্বস্ত সেবক লুদী খাঁকে। ওদের বংশের চির শত্রু লোহানীদের সর্দার কতলু তাকে বুঝিয়েছে যে—জামাইয়ের মৃত্যুতে ক্ষিপ্ত লুদী খাঁ নিজেই সিংহাসন চান, তাই গুজর খাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়েই শুধু ক্ষান্ত হন নি—মুনিম খাঁর সঙ্গেও হাত মিলিয়ে ব্যবস্থাটা কায়েম করে নিচ্ছেন।

ওরে মূঢ়, সে ইচ্ছা থাকলে আজ তোকে আর সিংহাসনে বসতে হত না—হানসুকে হত্যা করার পর সে পথ উন্মুক্তই ছিল সম্পূর্ণ। তিনিই ত পথ থেকে কুড়িয়ে এনে তোকে বসিয়েছেন বলতে গেলে।

এমন কি, সে ইচ্ছা থাকলে হয়ত অপরাজেয় সুলেমানকে সরিয়ে দেওয়াও তাঁর পক্ষে অসম্ভব হত না। বুদ্ধির কাছে শৌর্য কতটুকু! সুলেমানের সিংহাসনকে তিনিই ত সযত্নে লালন করেছেন, রক্ষা করেছেন—বৃহত্তর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

চেনে নি, তাঁকে একটুও চেনে নি দায়ুদ। তাই তাঁকে দমন করতে সসৈন্যে এগিয়ে এসেছে এই দেয়া * নদীর সঙ্গম পর্যন্ত। তিনি যদি বেঁকে দাঁড়ান—ওই কটা সৈন্য নিয়ে ওই অপদার্থটার সাধ্য আছে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবার ?

কিন্তু না—আর না। তিনি শ্রান্ত।

নিক, ওরাই বুঝে-পড়ে নিক। তবে হ্যাঁ—এখনই নয়।

এই শেষবার তিনি রক্ষা করবেন কররাণীদের, আগে দায়ুদ খাঁকে যথোপযুক্ত শিক্ষা দেবেন, তারপর আকবর বাদশার সঙ্গে সন্ধি করে দায়ুদকে সিংহাসনে বসিয়ে নিজে মক্কায় চলে যাবেন চিরদিনের মত।

তারপর ?

তারপর ওরা বুঝবে। রাখতে পারে রাখবে—না হয় ভাসিয়ে দেবে সব কিছু। তিনি আর ভাববেন না। সুলেমানের বিশ্বাস আর স্নেহের ঋণ এই শেষবারের মত শোধ করে বিদায় নেবেন তিনি চিরদিনের জন্য।

'জনাব !'

'ও—নফিসা ! হ্যাঁ, কী রে ?'

আবারও যেন ঘুম ভাঙে তাঁর।

'আপনি কী সব ছাই-ভস্ম ভাবছেন আবার। শুধু শুধু ভেবে ভেবে শরীর খারাপ করে ফেলছেন। চলুন দেখি—শুয়ে পড়বেন আমার কোলে মাথা দিয়ে···আমি আপনার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেই ঘুম আসবে দেখবেন !'

'এখনও নমাজ পড়া হয় নি যে রে।'

'তবে সেরে নিন।'

'এই যে যাচ্ছি।'···

মনে পড়েছে কারণটা তাঁর, মনে পড়েছে। তিনি মরতেও পারতেন হাসি-মুখে। এ পৃথিবীতে তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে তা তিনি জানেন। দায়ুদ তাঁর প্রাণ নিয়ে সুখী হবে, শান্ত হবে—এ জেনে সানন্দেই তাঁর প্রাণ দেবার কথা। জরাজীর্ণ খাঁচাটাকে বাঁচাবার জন্য কোন হাঙ্গামা করারই কথা নয় তাঁর।

তবু যে তিনি করছেন, এখনও যে সব ফেলে চলে যেতে পারছেন না—তার কারণ বোধহয় এই মেয়েটা।···

চিরকাল এই গর্বই ছিল তাঁর সবচেয়ে বেশী যে—চিরজীবন তিনি মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হয়ে আছেন। যে কোন মুহূর্তে ডাক পড়লেই চলে যাবেন, কোনদিকে ফিরে তাকাবেন না। কিন্তু সে গর্ব বুঝি আর রাখতে পারছেন না।

এ কী বেড়ি পরালেন খোদা তাঁর পায় ! ফুলের বেড়ি—কিন্তু লোহার

---

* সরযূর অপর নাম দেয়া। যে সময়ের কাহিনী বলা হচ্ছে মিয়া লুদী তখন গঙ্গা ও সরযূর সঙ্গমের কাছে অবস্থান করছিলেন।

চেয়েও কঠিন হয়ে চেপে বসেছে যে! আর সে বেড়ি তিনি প্রায় স্বেচ্ছায়ই পায়ে পরলেন।

এই ত সেদিনের কথা। আজও স্পষ্ট মনে আছে।

রাজ্যের উত্তর সীমান্ত পরিদর্শন করতে গিয়ে কামতাপুরের হাটে দেখেছিলেন কতকগুলি ক্রীতদাসী বিক্রি হতে, তরুণী সুশ্রী ক্রীতদাসী। কেউ ইরাণী, কেউ তুরানি, কেউ আর্মানি। এদেশের পূর্ব সীমান্তের মেয়েদের সঙ্গে বিদেশী মুসলমানের সংমিশ্রণে দো-আঁশলাও ছিল কিছু কিছু।

ওতে কোন প্রয়োজন ছিল না লুদী খাঁর। এক লহমার বেশী তাই ফিরেও তাকান নি।

দুর্বার দুঃসাহসী লুদী খাঁ চিরদিনই একা একা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে ভালবাসেন—সকালে বিকালে খানিকটা করে এমনি না বেড়ালে শুধু যে শরীর ভাল থাকে না তাই নয়—বুদ্ধিও খোলে না। দরবারে ও প্রাসাদে সহস্র লোকের কচ্‌কচির মধ্যে তাঁর নাকি কোন কথা চিন্তা করার অবসর মেলে না—ঐ ছুটে বেড়াবার সময়টাই তাঁর ভাববার সময়। রাষ্ট্রের সমস্ত সমস্যাই নাকি ওই ভাবে একা দ্রুতবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে যেতে সমাধান করেন তিনি।

সেদিনও বেড়াতে বেরিয়েই মানুষ বিকিকিনির হাটে গিয়ে পড়েছিলেন তিনি—কিন্তু সেখানে থামেন নি—সে হাট পিছনে ফেলে বহুদূর চলে গিয়েছিলেন। ফিরতে দেরি হয়ে গিয়েছিল, কারণ অন্যমনস্ক হয়ে যেতে যেতে অনেকটা গিয়ে পড়েছিলেন। ফেরবার পথে আবার যখন হাট পেলেন, তখন সে হাট ফাঁকা—যে যার বেচা-কেনা শেষ করে চলে গিয়েছে। শ্রান্ত তৃষ্ণার্ত লুদী খাঁ পথ ছেড়ে একটু বাঁ-দিকে এগিয়ে গেলেন নদীর খোঁজে। হাটে দু-একটি দোকান ছিল, পুকুরও ছিল একাধিক। কিন্তু সেখানে জল খেতে প্রবৃত্তি হয় নি। তাছাড়া নদীর ধারে ঘোড়া ছেড়ে দিয়ে নিজেও একটু বিশ্রাম করবেন এই ছিল তাঁর ইচ্ছা—জল ত খাবেনই।

কিন্তু নদীর ধারে পেঁছিতে এক অদ্ভুত দৃশ্য চোখে পড়ল। দুটো পাঠান একটা তরুণী মেয়েকে নদীর ধারে ফেলে নানা রকমে পীড়ন করছে। পৈশাচিক পীড়ন। মেয়েটার হাত পা বাঁধা, গলায় শিকল। সেই অবস্থায় চলেছে সেই নির্যাতন। নিষ্ঠুরতায় ও বর্বরতায় যেন তারা স্বয়ং শয়তানের সঙ্গে পাল্লা দিতে চায়। অনেক ভেবে ভেবে বেছে বেছে যেন সেই নৃশংসতার পদ্ধতিগুলি মাথা খাটিয়ে বার করেছে তারা।

মেয়েটার মুখ—যতটা দেখতে পেলেন—যেন তাঁর কেমন ঝাপ্‌সা ঝাপ্‌সা ভাবে পরিচিতই বোধ হল। আর একটু দেখে মনে হল—সম্ভবত আজ সকালের হাটে দেখেছেন একে—দাসীর কাঠগড়ায়। একবার দেখেও বহুদিন মনে করে রাখতে পারেন লুদী খাঁ—তাই অন্যমনস্ক হয়ে দেখলেও খানিকটা মনে আছে তাঁর।

স্তম্ভিত হয়ে দেখলেন লুদী খাঁ খানিকটা। এ রকম কখনও শোনেন নি, কখনও ভাবেন নি। এ যেন সমস্ত রকম কল্পনার অতীত।

এতই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন যে প্রতিবাদ বা প্রতিকার ত দূরের কথা—হাত পা নাড়বারই ক্ষমতা লোপ পেয়েছিল তাঁর। একেবারে মেয়েটারই একটা অস্ফুট আকুল আর্তনাদে সম্বিৎ ফিরে পেলেন তিনি। দ্রুত কাছে এগিয়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ কী করছ তোমরা? তোমরা মানুষ না পশু!'

তারা কী সব কটূক্তি করে উঠল। এক জন নিতান্ত অবহেলার সঙ্গে উত্তর দিল, 'বেশ করছি। এ আমাদের কেনা বাঁদী। যা খুশী করব বলেই কিনে এনেছি। মেরে ফেললেই বা কী?'

আর একজন সঙ্গে সঙ্গেই ধুয়া ধরলে, 'তুমি তোমার কাজে যাও। নিজের চরকায় তেল দাও গে—'

লুদী খাঁর চোখ দুটো জ্বলে উঠল, তবু তিনি শান্ত কণ্ঠেই বললেন, 'বাঁদীই হোক, আর বান্দাই হোক, খোদার সৃষ্ট মানুষের ওপর এমন অকথ্য অত্যাচার করার অধিকার কারও নেই, তোমরা ছেড়ে দাও ওকে!'

প্রায় একসঙ্গেই আর একটা কুৎসিত কটূক্তি করে দুজনেই লাফিয়ে উঠল। দুজনেই বার করল হাতিয়ার।

শুধু যে ওরা লুদী খাঁকে চিনতে পারে নি তাই নয়—ওঁর শক্তি সম্বন্ধেও ধারণা করতে পারে নি। পক্ক-কেশ বৃদ্ধ দেখে অথর্বই ভেবেছিল হয়ত।

সেই দুটো নরপশুকে চিরকালের মত নিরস্ত্র করতে দুই লহমার বেশী সময় লাগে নি লুদী খাঁর। দুইজনেরই দুটি করে হাত কেটে ফেলে মেয়েটিকে বন্ধনমুক্ত করে লোকালয়ে নিয়ে এসেছিলেন তিনি।

সেই মেয়েই এই নফিসা। সকালের হাটে যে দো-আঁশলা মেয়েদের বিক্রি হতে দেখেছিলেন, এ তাদেরই এক জন।

বীর্যশুল্কে নারী গ্রহণ এমন কিছু অভিনব নয়—তাঁর মত প্রৌঢ়ের পক্ষেও। বরং তখনকার দিনে ব্যাপারটা সহজ ও স্বাভাবিক মনে হবারই কথা। এ ঘটনায় সকলেই তাই মনে করেছিল ব্যক্তিগত সেবিকারূপেই নফিসা তাঁর অন্তঃপুরে প্রবেশ করবে। কিন্তু লুদী খাঁর সে প্রবৃত্তি ছিল না। তিনি স্থির করলেন যে এই রূপসী মেয়েটি তিনি উপহার দেবেন তাঁর পুত্রাধিক জামাতা ইউসুফকে। সে রসিক লোক, এ উপহারে খুশীই হবে।

কিন্তু রাজধানীতে ফিরে এসেই ওই মর্মান্তিক সংবাদ পেলেন।

এতদিনের অক্লান্ত ও বিশ্বস্ত সেবার উপযুক্ত পুরস্কার দিয়েছেন সুলতান, লুদী খাঁর জামাতাকে বধ করে।...

সে কথা যাক—

সে কথা ভোলাই উচিত, ভুলেছেনও, লুদী খাঁ। খোদার মর্জি, নইলে অমন বীর পুত্র তাঁর, এমন শোচনীয় ভাবে মরবে কেন!...

না, ও কথা নয়—নফিসার কথা। নফিসার কথাই ভাবছিলেন তিনি।...

তারপর শোকার্ত লুদী খাঁ এই সর্বনাশা অপরূপা মেয়েটাকে দান করতে চেয়েছিলেন কোন ভাল আমীরের হাতে। এমন কি সৎপাত্র দেখে বিবাহ

দেবারও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু মেয়েটা অদ্ভুত। সে একেবারে বেঁকে বসল। আজ এখনও যেমন ওঁর পা দুটো প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছে, সেদিনও ঠিক অমনিই ধরেছিল আঁকড়ে। বলেছিল, ওরা পাহাড়ী মেয়ে, যে ওদের প্রাণ বা ইজ্জৎ রক্ষা করে—সে-ই ওদের মালিক। মালিক বদল করার রীতি নেই ওদের দেশে। নফিসাও করতে প্রস্তুত নয়। ওঁকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না—কারুর কাছে যেতে রাজি নয় সে। সুলতানের প্রাসাদ—এমন কি বেহেস্তেও যেতে চায় না, ওঁর পায়ের তলাই তার বেহেস্ত! আর যদি মালিক পায়ে না রাখেন ত ওঁর সামনেই সে নিজের প্রাণ নিজের হাতে বার করে দেবে। তারপর প্রাণহীন দেহটা তিনি যেন যেখানে খুশী পাঠান।

অনেক করে বুঝিয়ে বলেছিলেন লুদী খাঁ। অনেক লোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয় নি। বরং বলা চলে উলটো ফল হয়েছে। সেই থেকে একদণ্ডও সে ওঁকে চোখের আড়াল করতে চায় না—সর্বদা সঙ্গে সঙ্গে ফেরে ছায়ার মতন। সেই জন্যেই এই সুদূর প্রবাসে যুদ্ধক্ষেত্রেও সঙ্গে আনতে হয়েছে ওকে।

আর ওর জন্যেই—স্বীকার করতে লজ্জা নেই ওঁর—নতুন করে যেন জীবন সম্বন্ধে একটা মমতা বোধ করছেন।

॥ ৩ ॥

নফিসা ভালবাসে তাঁকে, একান্ত, একাগ্র ভাবে ভালবাসে। তা লুদী খাঁ জানেন। কিন্তু কীভাবে ভালবাসে সে—সেটা আজও ভাল করে বুঝে উঠতে পারেন নি তিনি।

সে কি তাঁকে বাপের মত দেখে?

না—ভাইয়ের মত?

না—প্রেমাস্পদের মত?

এক এক সময় এক এক রকম মনে হয় তাঁর। কেবল যখন মনে হয় সে তাঁকে প্রেমিকরূপেই পেতে চায় তখনই বিপুল সংশয় মনে জাগে—এও কি সম্ভব? প্রায় ষাট বছর বয়স তাঁর, আর ঐ মেয়েটা, বড় জোর উনিশ কি কুড়ি হবে—তার পক্ষে তাঁকে ওই ভাবে ভালবাসা কি সম্ভব? অথচ যে অভিব্যক্তি প্রকাশ পায় তার আচার-আচরণে, যে অকুণ্ঠ ব্যবহার তার—তাকে অন্য কোন সম্পর্ক দিয়েও ত ব্যাখ্যা করা যায় না!

সংশয়ের নিরসন হয় না কিছুতেই।

যে ভাবে সে নিরসন হতে পারত, সম্পর্কের যে অন্তরঙ্গ পরীক্ষায়—লুদী খাঁর বর্তমান মানসিক অবস্থায় সে পরীক্ষায় রুচি হয় নি।

থাক না। যে ভাবেই হোক সে ওঁকে ভালবাসে। এই পর্যন্তই থাক;

না। এই ত যথেষ্ট। কী হবে তার চেয়েও বেশী জেনে? রমণীর হৃদয়-রহস্য নিয়ে গবেষনা করবার আর প্রবৃত্তি নেই তাঁর।

'জনাব!'

'হ্যাঁ রে—এই উঠি।'

রাতের নমাজ এখনই সেরে নেবেন তিনি। তারপর শুতে যাবেন। সূর্যাস্তের পর কোন দিনই আহার করেন না, সে পাট নেই। আজ অবশ্য অপরাহ্নেও খাওয়া হয় নি—চাকর বার বার ডেকে ফিরে গেছে—কিন্তু তা না হোক, একদিন না খেলে কিছুই এসে যাবে না। তবে এও তিনি জানেন যে তিনি না খেলে ওই মেয়েটাও খাবে না। তাঁর সঙ্গে সে-ও রাত্রের খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তিনি শুতে গেলেই সে-ও কাছে গিয়ে বসবে, গায়ে মাথায় হাত বুলোবে, যতক্ষণ না ওঁর ঘুম আসে, তারপর ওঁরই পায়ের কাছে জড়-সড় হয়ে শোবে সে-ও। ওঁর পা-দুটিতেই যেন ওর সবচেয়ে লোভ!

'ওজু করবার জল দে নফিসা।'

উঠে দাঁড়িয়ে আর একবার বাইরের দিকে তাকান। এখনও অবিশ্রান্ত বর্ষণ চলেছে। নদী নালা বুঝি সব এক হয়ে যাবে। যে সব সৈন্যরা পরীখা কেটে আছে কিংবা নিচু জায়গায় তাঁবু ফেলেছে তাদের দুর্দশার শেষ থাকবে না। তাঁর এই জায়গাটা খুব উঁচু—তাঁর তাঁবু বা তাঁর আশে-পাশে যে কটা তাঁবু আছে সেগুলোতে জল ওঠবার ভয় নেই, সে দিক দিয়ে নিশ্চিন্ত—কিন্তু ওদের কী হবে কে জানে!

হয়ত তাঁর একবার যাওয়া উচিত ছিল, দেখে আসা প্রয়োজন ছিল ওদের অবস্থাটা—কিন্তু কে জানে কেন আজ আর ইচ্ছে করছে না বেরোতে। আজ থাক্। যা আছে খোদার মর্জিতে তাই হোক। লুদী খাঁ আর ভাবতে পারেন না।...

চিন্তাক্লিষ্ট উত্ত্যক্ত, শোকদগ্ধ চৈতন্যও আস্তে আস্তে সুপ্তিতে ডুবে যায়—নফিসার জাদু-করস্পর্শে। লুদী খাঁর বয়স হলেও আফগান রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে—এখনও তরুণী মেয়েদের যৌবনোষ্ণ স্পর্শ তাঁর রক্তকে চঞ্চল করে তোলে—কিন্তু নিজেকে সম্বরণই করেন মিয়া লুদী। মেয়েটাকে তিনি আজও চিনতে পারেন নি। পাছে ভুল করে বসেন, পাছে ওর চোখে ছোট হয়ে যান—এই ভয়ে সংযমের প্রবল প্রাচীর রচনা করেন কেবলই নিজের প্রবৃত্তির চার পাশে। সে প্রাচীরে মাথা কুটে মন ক্ষতবিক্ষত হয় বটে কিন্তু তেমনি সে তার পারিপার্শ্বিককেও ভুলে যায় সহজে, তাই সহস্র চিত্ত-বিক্ষোভের মধ্যেও চোখের পাতায় তন্দ্রা নামতে দেরি হয় না।

তন্দ্রাই—কিন্তু সে তন্দ্রা ক্রমশ গভীর ঘুমে পরিণত হয়। তাই লুদী টের পান না কখন বৃষ্টি থেমেছে। কখন নিস্তব্ধ প্রান্তর অশ্বপদশব্দে চকিত হয়ে উঠেছে তাও জানতে পারেন না। একেবারে ঘুম ভাঙে তাঁর রহমতের ডাকে। সুলতান দূত পাঠিয়েছেন জরুরী খৎ দিয়ে, সে এখনই একবার তাঁর

দেখা চায়।

'কে—কে দূত পাঠিয়েছে ?'

বিস্মিত লুদীর মাথাতে যেন কথাটা ঢোকেই না।

'মহামান্য সুলতান।'

'ও।'

খানিকটা চুপ করে বসে থেকে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ান।

'বসতে বল, আমি যাচ্ছি।'

নফিসা জড়িয়ে ধরে তাঁকে, 'দরকার নেই মালিক—রহমৎ বলুক যে আপনার শরীর ভাল নেই, কাল সকালের আগে দেখা হবে না। ···এত রাত্রে কী দরকার তাঁর ? আমার—আমার কেমন যেন ভয়-ভয় করছে !'

হেসে ওর মাথায় হাত বুলোন মিয়া লুদী।

'ভয় কী রে ? এ আমার এলাকা। এখানে একজন দূত আমার কী করবে !···তাছাড়া হাজার হোক সুলতান আমার মনিব, আমার প্রাক্তন মনিবের ছেলে।···তাঁর দূতকে ফিরিয়ে দেবার অধিকার আমার নেই !'···

তিনি রহমতের সাহায্যে দ্রুত পোশাক বদলাতে শুরু করেন।

দায়ুদের চিঠি এবং দূতের বক্তব্য একই।

সুলতান দায়ুদ কররাণী তাঁর কৃতকর্মের জন্য খুবই অনুতপ্ত। লুদী খাঁ পিতৃহীন সুলতানের পিতার মতই—আশা করা যায় যে তিনি নাবালক পুত্রের হঠকারিতা মার্জনা করবেন। বিষম বিপদ উদ্যত খড়্গের মতই কররাণীবংশের মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে, প্রবল শত্রু সামনে। এ সময় যদি সামান্য অভিমানবশে লুদী তাঁর এই সন্তানের ওপর বিরূপ হয়ে থাকেন ত কররাণী-বংশ শুধু নয়—পূর্ব ভারতের সমস্ত পাঠানরাই ধনে প্রাণে বিপন্ন হবে। লুদী খাঁ যদি দায়ুদকে ক্ষমা না করেন ত আত্মহত্যা ছাড়া দায়ুদের আর কোন উপায় থাকবে না। এখনও যদি লুদী তাঁর তীক্ষ্ন বুদ্ধি, অপূর্ব সংগঠনশক্তি এবং অপরিসীম শৌর্য নিয়ে এসে পাঠানদের পুরোভাগে বা শিরোভাগে দাঁড়ান, তাহলে আকবরকে প্রতিরোধ করা এমন কিছু কঠিন হবে না। গুজর খাঁ সমস্ত মনোমালিন্য ভুলে গিয়ে ওঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন লুদী খাঁ যদি আসেন, দায়ুদ ওঁর যা ক্ষতি করেছেন—যে কোন রকমে তা পূরণ করে দিতে রাজী আছেন।

এর পর আরও একটি বক্তব্য ছিল।

দায়ুদ খবর পেয়েছেন আকবরের সৈন্য কারা-মানিকপুর পার হয়ে এগিয়ে এসেছে। আজই এ বিষয়ে জরুরী পরামর্শ ও ইতিকর্তব্য স্থির করা প্রয়োজন। লুদী খাঁ অনুগ্রহ করে এখনই যদি একবার আসেন ত ভাল হয়। আর তা হলে দায়ুদ এ-ও বুঝবেন যে—লুদী তাঁকে ক্ষমা করেছেন।

লুদী নীরবে বসে সব বক্তব্য শুনে দূতকে অপেক্ষা করতে বলে ভেতরের ঘরে এলেন।

পর্দার পাশেই পাংশু বিবর্ণ মুখে দাঁড়িয়ে ছিল নফিসা। লুদী যেতেই সে সজোরে জড়িয়ে ধরল তাঁকে।

'তুমি যেও না। তোমাকে আমি যেতে দেব না মালিক।'

হাসলেন লুদী। ম্লান নয়—বরং প্রশান্ত বলা যেতে পারে সে হাসিকে। বললেন, 'তা হয় না নফিসা। কররাণীদের বহুৎ নিমক আমি খেয়েছি। সেই বংশের ছেলে বিপদে পড়ে আমার সাহায্য প্রার্থনা করেছে, অনুরোধ জানিয়ে—আমার পক্ষে একটি পথই খোলা আছে, সে অনুরোধ রক্ষা করা। ···দায়ুদ যদি ক্ষমা প্রার্থনা না করে, অনুনয় না করে আমাকে আদেশ জানাত তাহলেও আমাকে যেতে হত নফিসা। দায়ুদ যাই মনে করুক—আমি ত বিদ্রোহী হই নি। আজও সে আমার মনিব।'

'কিন্তু—কিন্তু ওরা তোমাকে মেরে ফেলবে মালিক। নইলে এতরাত্রে ওদের কিসের প্রয়োজন!'

'তুমি' এর আগে কখনও বলে নি নফিসা। সম্পর্কের এই অধিকতর অন্তরঙ্গ সুরটি লুদী সহস্র দুশ্চিন্তার মধ্যেও উপভোগ করেন বৈ কি!

মুহূর্ত কয়েক নীরব থেকে বলেন, 'সে সম্ভাবনা আছে নফিসা। তা-ই বেশী সম্ভব! কতলু লোহানী আর গুজর খাঁ—ওরা দু'জনেই আমাকে ঈর্ষা করে তা আমি জানি। ওরা জানে যে আমি জীবিত থাকতে দায়ুদের অনিষ্ট করতে পারবে না ওরা—তার রাজ্যখণ্ড ভাগ করে নিতে পারবে না। তাই নির্বোধ দায়ুদকে দিয়ে এ কাজ করানো বিচিত্র নয়, আর দায়ুদের পক্ষেও এইটেই স্বাভাবিক। বেকুফগুলো জানে না—সিন্ধুর মরুভূমে যে দিন জালালউদ্দীন জন্মগ্রহণ করেন সেদিন ওখানকার আকাশে যে গ্রহতারকার সমাবেশ হয়েছিল—এমন আর কোথাও কোন দিন হয় নি। সে সমাবেশে জাতক পৃথিবীজয়ী, দিগ্বিজয়ী হয়। তার সামনে উদ্ধত, মূর্খ, নির্বোধ পাঠানের দল অশ্বক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলি রাশির মত উড়ে চলে যাবে। এ ত আমি দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু সে বোঝার মত বিদ্যা ও বুদ্ধি ওদের নেই, ওদের পক্ষে আমাকে সরিয়ে দেবার চেষ্টাটাই স্বাভাবিক।···কিন্তু তাতে আমার দুঃখ নেই—আমি প্রস্তুতই আছি। শুধু বন্ধন বলতে এখন তুই-ই আছিস নফিসা।···তাই রওনা হবার আগে তোর একটা ব্যবস্থা করে যেতে চাই,···রহমৎ আমার বহুদিনের বিশ্বাসী চাকর, ওর সঙ্গেই তুই চলে যা। তুই ঘোড়ায় চড়তে জানিস, কোন অসুবিধা হবে না। গঙ্গার ওপারে হাজিপুরে আমার একটা ছোট বাড়ি আছে, সেখানে মাটির নিচে কিছু টাকাকড়িও পোঁতা আছে—রহমৎ সব জানে—'

নফিসা ওর পদ্মকোরকের মত হাত দিয়ে লুদী মিয়ার মুখটা চেপে ধরে।

'কী পাগলের মত যা তা বক্‌ছ মালিক! তোমার কী হয় তা না জেনে এখান থেকে আমি এক পা নড়ব না!'

'তারপর? যদি সত্যিই আমার অনিষ্ট হয় কিছু, তখন?'

'তখনই ত আমার দরকার। তুমি কি ভাবো মালিক, তোমাকে যদি ওরা

হত্যাই করে সে হত্যার শোধ নেব না আমি ? করবাণী বংশের সর্বনাশ না করে তোমার রক্তের দাম সুদসুদ্ধ উশুল না করে আমি শুধু চোখের জল ফেলতে ফেলতে তোমার সেই হাজিপুরের কোটরে গিয়ে ঢুকব ?'

'তুই কি করবি রে পাগলী। একা একা মেয়েছেলে,—তায় ছেলেমানুষ! না না, মিছিমিছি দেরি করিস নি। পরে যদি আর না যেতে পারিস—যদি তোদেরও কোন বিপদ হয় ?'

'আমরা পাহাড়ী মেয়ে মালিক। যার কাছে মানুষ সে বিক্রি করেছিল ক্রীতদাসী হিসেবে—তাই সেদিন সব সহ্য করেছি। ধর্মের ওপর আমরা কথা বলি না। কিন্তু তুমি আমাকে মুক্তি দিয়েছ, বার বার বলেছ, আমি স্বাধীন, আমি মুক্ত। সুতরাং আর কোন পরোয়া আমি করি না।... তুমি এইটুকু জেনে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে যাও মালিক যে, ওরা যদি তোমার সঙ্গে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করে ত, তার দশগুণ প্রতিফল ওরা পাবে। এই তোমাকে ছুঁয়ে আমি শপথ করছি—সে বেইমানীর শোধ না নিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হব না!'

গলার কাছে কি কিছু একটা ঠেলে উঠতে চাইছিল লুদীমিয়ার ? তাই কি গলাটা অত ভাঙ্গা ভাঙ্গা ঠেকছিল ?

'তাহলে আমাকে বিদায় দে নফিসা।'

নিজের সংকল্পের আবেগে কিছুকালের জন্য জ্বলে উঠেছিল নফিসা—এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর মুখের ওপর থেকে সে দীপ্তিটুকু নিঃশেষে মুছে গেল। যেন ব্যাকুল হয়ে উঠে একবার নিষেধ করতে গেল সে—কিন্তু তারপরই বৃথা জেনে সে চেষ্টা ত্যাগ করলে। শুধু স্খলিত, ভগ্নকণ্ঠে কেমন একরকম অসহায় ভাবে বললে, 'এখনই যাবে তুমি—সত্যিই চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ নফিসা। দূত অপেক্ষা করছে। তাছাড়া জরুরী কাজ বলছে—আর অপেক্ষা না করাই ভাল।'

'তবে যাও।'

বলে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায় নফিসা। হয়ত বা উদ্গত অশ্রু দমন করতেই। অথবা অভিমানভরেই—কে জানে!

একটু ইতস্তত করেন মিয়া লুদী। যেন কিছু বলতে চান ওকে, যেন একটু আদর করে যেতে ইচ্ছা হয় তাঁর যাবার আগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে ইচ্ছা সম্বরণ করে বাইরের দিকেই পা বাড়ান।

নফিসাও কিছু আশা করেছিল কি না কে জানে। হয়ত যাবার আগে বিদায়-সম্ভাষণ একটা, স্নেহের এতটুকু নিদর্শন! সামান্য একটু স্মৃতি, যৎসামান্য পাথেয়।...লুদী খাঁকে নিঃশব্দে চলে যেতে উদ্যত দেখে সে আশা ওর যেন খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়ে।

তবে তাই বলে এই, হয়ত বা শেষ মুহূর্তে, অভিমান করে থাকতে পারে না সে—পর্দা হাতে করে সরাচ্ছেন লুদী এমন সময় ছুটে এসে দুহাতে ওঁর গলা জড়িয়ে ধরে—এবং ছেলেমানুষের মতই ঝুলে পড়ে ওঁর ওষ্ঠে ললাটে ও

দুই চোখের ওপর উন্মত্তের মত চুমো খেতে থাকে!

'মালিক! মালিক! তোমার পায়ে পড়ি ছেড়ে যেও না আমাকে, এমন করে ছেড়ে যেও না!' অস্ফুট মিনতি চাপা আর্তনাদের মতই শোনায়।

লুদীও ওকে সবলে ও সজোরে চেপে ধরেন বুকে। বুক ভরে যায় তাঁর।

আজ তিনি প্রসন্ন, আজ তিনি তৃপ্ত। নিশ্চিন্তও। এতদিনের সংশয়ের অবসান হয়েছে তাঁর। আজ ওর বুকের মধ্যেটা কিতাবের মতই পড়তে পেরেছেন তিনি।

নফিসার কানে কানে বলেন, 'আর আমার কোন ক্ষোভ, কোন অতৃপ্তি রইল না নফিসা। যদি মরি তাতেও কোন দুঃখ নেই আর। এ জগতে যেমন বে-ইমানী দেখলাম—তেমনি ইমানদারী আর নিঃস্বার্থ ভালবাসাও তো দেখে গেলাম। ধন্য খোদা!'

॥ ৪ ॥

দায়ুদ খাঁ কররাণী হতাশ হয়ে তাকান ওপারের দিকে। নির্বোধের মতই বার বার প্রশ্ন করেন, 'এসে গিয়েছে? একেবারে এসে গিয়েছে?'

অথচ এসে যে গিয়েছে, তা ত তিনি খালি চোখেই দেখতে পাচ্ছেন।

গঙ্গার ওপারে হাজীপুর। কিলাটা ওঁর সামনা-সামনি। উনি যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন—একটা সরলরেখা টানলে বোধহয় সে রেখার প্রান্ত হাজীপুর কিলার দক্ষিণ দরওয়াজায় পৌঁছয়। কিলায় কররাণীদের পতাকা আর নেই—সেখানে আবার উড়েছে দিল্লীশ্বরের পতাকা। মুঘল পতাকা উড়ছে পৎপৎ করে। কিলার চারিদিক ঘিরে যে বিপুল সৈন্যদল উল্লাস-উৎসব জুড়েছে—তাদের মাথাতেও মুঘল সৈন্যেরই শিরস্ত্রাণ।

অর্থাৎ আকবর বাদশা নির্বিবাদে হাজীপুর এসে পৌঁছেছেন এবং কিলা দখল করেছেন।

আবারও বিমূঢ়ের মত প্রশ্ন করেন শ্রীহরি গুহকে; শ্রীহরির বুদ্ধির ওপর দায়ুদের বড় ভরসা, সে সামান্য আমিন থেকে দেওয়ান হয়ে উঠেছে এবং আজ সে ছাড়া তাঁর রাজকোষ ও রাজস্বের খবর কেউ রাখে না।—তাঁকেই উদ্দেশ করে বলেন 'কিন্তু আমার যে অনেক ফৌজ ছিল শ্রীহরি, তারা কি একটা লড়াইও করলে না। একেবারে বিনা চেষ্টায় ছেড়ে দিলে কিলাটা? কিলার মধ্যেও যদি বসে থাকত তো—সে কিলা দখল করতে ওদের তিন মাস লাগত!'

শ্রীহরি গুহের বহু গুণের মধ্যে একটা গুণ এই যে তিনি স্পষ্ট-বক্তা। স্বয়ং সুলতানের মুখের ওপর সত্য কথা বলতেও খুব একটা ভয় নেই তাঁর—কারণ হয়ত তিনি জানেন যে, যে-বস্তু ছাড়া রাজার রাজত্ব চলে না, সেই বস্তুর হিসাবটি তাঁর হাতে।

শঙ্কিত স্বরে শ্রীহরি বলেন, 'ফৌজ তো রেখেছিলেন জাহাঁপনা ঠিকই কিন্তু ফৌজদার বলতে যারা তারা তো সবাই এপারে—লড়াই করার হুকুমটা দেয় কে !…তাছাড়া আকবর বাদশা বড় সাংঘাতিক শত্রু জাহাঁপনা—এ মুনিম খাঁ নয় যে দুটো স্তোক দিয়ে ভোলাবেন। এ লোকটার অসাধ্য কাজ কিছুই নেই। সেই জন্যই স্বর্গত উজীর সাহেব ওকে চটাতে চান নি! আপনি তাঁকে মারলেন মারলেন—তাঁর বুদ্ধিতেও যদি চলতেন।'

লুদী খাঁর হত্যাটা—এইভাবে বেইমানী করে তাঁর করুণা এবং বিশ্বস্ততার সুযোগ নিয়ে ভুলিয়ে এনে, এমন কাপুরুষের মত নিরস্ত্র বৃদ্ধকে হত্যা করাটা শ্রীহরির আগাগোড়াই ভাল লাগে নি। শ্রীহরি বুদ্ধিমান—বুদ্ধিমানের মর্যাদা তিনি বোঝেন!

সম্ভবত এই কথাটাই দায়ুদও ভাবছিলেন, কিন্তু নিজের দুর্বলতাটা অপরের মুখে শুনতে চায় না কেউ—তিনি বিরক্ত হয়ে ধমক দিলেন, 'তুমি চুপ কর শ্রীহরি, যা বোঝ না তা নিয়ে কথা কইতে এসো না। রাজ্যটা আমার—না তোমার?'

'আজ্ঞে না। আপনারই। লুদী মিয়া অনেক মেহনৎ করে আপনাকে বসিয়েছিলেন এ তক্তে!'

'আবার!' দায়ুদ তীব্র ধমক দেন।

এবার শ্রীহরি চুপ করে যান। চাকরীর মায়া তাঁর নেই। গত কয়েক দিন ধরেই তিনি বিদায় চাইছেন সুলতানের কাছে—কিন্তু জানের মায়া আছে। হাজার হোক—গোঁয়ার পাঠান, তায় বোকা! ওরা না পারে কী?

কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকতেও পারেন না। অপেক্ষাকৃত নরম গলাতে বলেন, 'হুজুর অভয় দেন তো একটা প্রশ্ন করি, আপনার বড় বড় ফৌজদার আর পরামর্শদাতা—কতলু খাঁ আর গুজর খাঁ—কী বলছেন এ সময়?'

'তারা তোমার মত কাপুরুষ বাঙ্গালী কায়েত নয় শ্রীহরি—তারা ত এখনই লড়াই দিতে চায় তোমার ঐ আকবর শাকে!'

'বেশ তো, দিন না তাঁরা! তাঁদেরই হাজীপুর কিলা রক্ষার জন্য পাঠানো উচিত ছিল আপনার!'

ছিল যে—হয়ত দায়ুদও বোঝেন তা। কিন্তু কেমন করে স্বীকার করবেন যে—এই দুটি প্রধান অবলম্বনকে ছাড়তে সাহস হয় নি তাঁর—নিজেকে বড় অসহায় ঠেকেছিল!…শুধু সেই কারণেই ওপারে যেতে দেন নি তিনি ওদের। লুদী খাঁর মৃত্যুর পর এরা ছাড়া তাঁর বল-বুদ্ধি-ভরসা আর কেউ নেই যে!

না, একথা স্বীকার করা যায় না।

তাই যেটা করা যায় সেইটাই করলেন। শ্রীহরির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'তুমি এখন যাও শ্রীহরি, দরকার পড়লে তোমাকে ডেকে পাঠাবো। আমাকে একটু ভাবতে দাও।'

'যে আজ্ঞে।' কুর্নিশ করে বেরিয়ে যান শ্রীহরি, বেরিয়ে বাঁচেন। বাইরে বেরিয়ে নিজের অজ্ঞাতসারেই একবার গলাটায় হাত বুলিয়ে নেন। লুদী খাঁর

নৃশংস হত্যাকাণ্ড চোখের ওপর দেখার পর থেকেই তাঁর অস্বস্তির সীমা নেই। এরা বিশ্বস্ত সেবককে এই পুরস্কারই দেয়—আর লাভবান হয় বেইমানরা। বেইমানীর পাঠ এই বয়সে কি নিতে পারবেন শ্রীহরি ? ···

না, এখন তিনি ভালয় ভালয় বিদায় পেলে বাঁচেন। এসব হাঙ্গামা থেকে অনেক দূরে, সুদূর দক্ষিণবঙ্গে সুন্দরবনের মধ্যে তিনি নিভৃতে একটি নীড় বেঁধেছেন অনেকদিনই—মুক্তি পেলেই সেইখানে গিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারেন। চাই কি সেখানে কোনদিন স্বাধীনভাবে রাজত্ব করার চিন্তাও একেবারে দুরাশা বলে বোধ হবে না। কিন্তু—সে ঢের পরের কথা। তার আগে মুক্তিটা পাওয়া দরকার।···

শ্রীহরি বেরিয়ে যেতে দায়ুদ স্থির হয়ে একটা আসনে বসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। ছটফট করে উঠে এসে আবার গবাক্ষের ধারে দাঁড়ালেন। বহুদূরাগত শব্দ, অস্পষ্ট শোনা যাচ্ছে—তবুও ওপারের কোলাহলটা যে জয়ধ্বনি সে বিষয়ে সন্দেহ মাত্র নেই। 'আল্লা-হো-আকবর !' মুহুর্মুহু এই শব্দ উঠছে—আন্দাজে সেটাও বোঝা যায়।

ভয় পেয়ে গেছেন দায়ুদ, বড়ই ভয় পেয়েছেন।

হাঁটু দুটো যেন ভেঙ্গে আসছে, হাত দুটোও কেমন যেন স্থির হতে চাইছে না কিছুতেই। বুকের মধ্যে শীতল হিম আতঙ্ক জমাট বেঁধে আছে। ভয় যে পেয়েছেন সেটা মনে মনে অন্তত আর অস্বীকার করা যায় না।

অথচ এমনিতে, স্বাভাবিক ভাবে ভয় পাবার কোনই কারণ নেই। যতই হোক আকবর একা—ছেলেমানুষ। তাঁরও চারিদিকে প্রবল শত্রু। এমন কিছু অভিজ্ঞতা হয় নি তাঁর এই বয়সে। কয়েকটা যুদ্ধ জিতেছেন বটে কিন্তু সে সব যুদ্ধে কররাণীদের মত প্রবল প্রতিপক্ষ কেউ তেমন ছিল না। তাছাড়া এখনও তিনি নদীর ওপারে আছেন—এপারে আসতে গেলেই এঁদের সৈন্য ও অস্ত্রের সামনে পড়তে হবে। সেটা খুব সহজসাধ্য নয়। আর এপারে এলেই বা কি ? পাঠানরা তুর্কীদের চেয়ে কম বীর নয়। অপরাজেয় হস্তীযূথ এখনও তাঁর ঠিক আছে। নতুন আমদানী আগ্নেয়াস্ত্র ওদেরও যেমন আছে—তাঁরও তেমনি। তাঁর অধিকারে তিনি আছেন—ওরা এখানে আগন্তুক, সেটাও কম অসুবিধা নয়।

এ সবই জানেন তিনি—কিন্তু তবু—

ওই কিন্তুটাই যে বড় গোলমাল বাধিয়েছে।

কি কুক্ষণেই গুজর কতলুর কথা শুনে লুদী মিয়াকে মেরেছিলেন। লুদী যখন তাঁর কথা বিশ্বাস করে নিশীথরাত্রে একা নিরস্ত্র তাঁর সামনে এলেন তখনই বোঝা উচিত ছিল যে সে বৃদ্ধ সত্যিই তাঁর হিতৈষী, সত্যিই বিশ্বস্ত। আজ তিনি থাকলে এসব কথা দায়ুদকে ভাবতেই হত না। যাদের কথায় এ কাজ তিনি করলেন—তারা যে কত দুর্বল, নির্ভরতার কত অযোগ্য এখন মর্মে মর্মেই বুঝছেন দায়ুদ। কাঞ্চন ফেলে কাচে গেরো বেঁধেছেন তিনি।

তবু সেই লোকসানটাই তো সব নয়।

লুদীর মৃত্যুর পর সে দিন রাত্রের সেই স্বপ্নটা—

স্বপ্ন না সত্য তাই বা কে বলবে!

আজও, অনেক ভেবেও যে সে সমস্যার সমাধান করতে পারেন নি তিনি।

অসংখ্য হাবসী প্রহরী দিয়ে ঘেরা তাঁর শোবার ঘরে, তাঁর পালঙ্কের পাশে এসে দাঁড়াবে রক্ত-মাংসের কোন মানবী—এ কেমন করে বিশ্বাস করবেন তিনি! পরের দিন মেরে মেরে ক্ষতবিক্ষত করে দিয়েছেন ওদের—তবু ওরা হলফ্ করেই বলেছে যে তারা ঘুমোয় নি বা পাহারা শিথিলও করে নি—এবং কাউকেই তারা তাঁর ঘরে ঢুকতে কি বেরোতে দেখে নি।

সে প্রহরীদের সকলেই বিশ্বস্ত, বহু দিনের লোক তাঁর। আর সকলেই মিছে কথা বলবে, এই বা কেমন করে সম্ভব হয়।

তবে? কে সে? সত্যই কি অশরীরী কেউ?

অথচ স্পষ্ট মনে আছে দায়ুদের—শেজ্-এর ম্লান আলো হলেও তিনি ভাল করেই দেখেছিলেন—ছায়া পড়েছিল তাঁর সামনের দেওয়ালে। বহুলোকের মুখেই তিনি শুনেছেন প্রেতাত্মার ছায়া পড়ে না।

মুখের ওপর দমকা এক ঝলক হাওয়া লেগে—সম্ভবত তারই ওড়নার হাওয়া লেগে—ঘুম ভেঙে গিয়েছিল দায়ুদের। একাই শুয়েছিলেন তিনি—এখানে হারেম আনেন নি ইচ্ছা করেই, স্থানীয় স্ত্রীলোক সংগ্রহ করার মতও মনের অবস্থা নয়—একাই ছিলেন কদিন। হঠাৎ চোখ খুলে নির্জন ঘরের নিভৃত শয্যাপার্শে অপরূপ লাবণ্যবতী এক নারীমূর্তি দেখে ঘুমের ঘোরে তাই বুঝি প্রসন্ন হয়েই উঠেছিলেন। কোথায় আছেন কী অবস্থায় আছেন ইত্যাদি স্থান-কাল পারিপার্শ্বিক ভেবে নিয়ে ভয় পেতে দেরী হয়েছিল।

খোয়াব দেখছিলেন তিনি গৌড়ের রাজপ্রাসাদেই আছেন—আর সেই খোয়াবেরই জের জেরে ক্ষুধার্ত প্রসন্ন চিত্তে দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরতে গিয়েছিলেন সেই বিস্ময়মূর্তিকে!

পিছলে সরে গিয়েছিল সে।

এবং সাপের মত হিস্-হিস্ করে উঠেছিল! কী বলেছিল তা মনে আছে দায়ুদের, বেশ মনে আছে। বোধহয় শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। আজও নিরালায় চোখ বুজে বসলেই সেই ফিস্-ফিস্ শব্দ শুনতে পান—কিন্তু তা কি ফিস্-ফিস্ই করে তখনও? কানের মধ্যে যেন মেঘমন্দ্র স্বরে বাজতে থাকে সেই কথাগুলো: 'আমি তোমার অসংখ্য উপপত্নীদের কেউ নই দায়ুদ কররাণী, আমাকে ভুল বুঝো না। আমি তোমার নিহত উজীর মালিক মিয়া লুদী খাঁর আত্মার শেষ দীর্ঘনিঃশ্বাস, মূর্ত প্রতিহিংসা! তোমাকে সতর্ক করে দিতে এসেছি, সুলেমান কররাণীর অযোগ্য পুত্র, তোমার বেইমানীর শাস্তি নেবার জন্য প্রস্তুত হও।…যে রাজ্যের জন্য এত বড় জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা করলে—অকারণ বিশ্বাসঘাতকতা—তোমার সব চেয়ে হিতৈষী পিতৃ বন্ধুর সঙ্গে, সেই বিশাল রাজ্যখণ্ড তোমার খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যাবে—তাসের প্রাসাদের মত। দেশ থেকে দেশান্তরে জনপদ থেকে বনে-

কান্তারে কোন মতে প্রাণ বাঁচাবার জন্যে পালিয়ে কুকুর বেড়ালের মত বেড়াতে হবে তোমাকে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সহায় বলতে তোমার সেই চরম বিপদের দিনে কেউ থাকবে না। বেশী দেরীও নেই, ওই এসে পড়েছে আকবর শার বাহিনী, শুরু হয়ে গেছে তোমার শাস্তির প্রক্রিয়া। ঈশ্বরের অভিশাপ আগুনের আখরে ফুটে উঠবে আকাশের গায়ে, মুর্খ, পার ত সে দৈববাণী পড়ে দেখ। তোমার চরম পরিণতির ইতিহাসই দেখতে পাবে সেখানে! সাবধান!'

অবশ, অসাড় করে দিয়েছিল সে কণ্ঠস্বর। দায়ুদ কররাণী না পেরেছিলেন হাত পা নাড়তে, না পেরেছিলেন চীৎকার করে ডাকতে কাউকে।...

যেমন স্বপ্নের মধ্যে এসেছিল সে মূর্তি, তেমনিই মিলিয়ে গেল। স্বপ্না-লোকের গণ্ডির মধ্যে থেকে ঘরের কোণের গাঢ় অন্ধকারে যেন মিশে গেল সে চোখের পলকে—এক লহমার পরে আর কাউকে চোখে দেখতে পেলেন না।

সম্বিৎ ফিরে পেতে দেরি হয়েছিল বৈ কি!

আতঙ্কের অসাড়তা কাটিয়ে কণ্ঠস্বর ফিরে পেতে, বিছানায় উঠে বসবার ক্ষমতা ফিরে আসতে বেশ একটু সময় লেগেছিল। তারপর চীৎকার করে ডেকেছিলেন হাবসী খোজা প্রহরীদের, হাঁক-ডাকেরও অন্ত ছিল না, মার-ধোর নির্যাতন—কিন্তু তবু সে বর্ণনার কোনও জীবিত প্রাণীকে প্রাসাদের ভেতরে বা ধারে-কাছে কোথাও পাওয়া যায় নি।

যেন সত্যিই সে কোন মৃত আত্মার উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

বাতাসেই মিলিয়ে গেল বুঝি সত্যি সত্যিই।...

দায়ুদ জানলার কাছ থেকে ফিরে এসে বসেছিলেন নিজের আসনে—কিন্তু স্থির থাকতে পারলেন না। পাগলের মত উঠে পড়লেন আবার। দুর্বল স্খলিত পদেই অস্থির ভাবে পায়চারি করতে লাগলেন। যেন চিন্তাটা থেকে, সেই অসহ স্মৃতি থেকে পালিয়ে যেতে চাইছেন কোথাও, পারছেন না।

॥ ৫ ॥

ইয়াসিন নিজেকে বড় বিপন্ন বোধ করতে লাগল!

তাতারী প্রহরীদের সর্দার ইয়াসিন বহুকালের লোক, এই মনিবটিকে গত কয়েক বৎসর ধরেই দেখছে, কিন্তু আজও যেন চিনে উঠতে পারল না ঠিক।

আরাম সব লোকই চায়, তাও না হয় ওই 'ছোকরা' চাইল না—কিন্তু বিশ্রাম, সেটা তো প্রয়োজন!

আর যে উন্মাদনায় মানুষ বিশ্রামের কথা ভুলে যায়, সে রকম উত্তেজনা বা উন্মাদনা যে এ অনুভব করে, তাও ত মনে হয় না। কোন উত্তেজনাতেই ত

কোনদিন অধীর হতে দেখা যায় নি একে। আর তা ছাড়া সে কারণই বা কৈ ?

যুদ্ধ থেমে গিয়েছে। কিছু আগেই সম্পূর্ণ জয়লাভ হয়েছে মুঘল বাহিনীর, হাজীপুরের কিলা ওদের পদানত। সুতরাং যুদ্ধের উত্তেজনা আর নেই। জয়লাভের উন্মাদনা ? তাই বা কৈ ? এই তো চারিদিকে উন্মত্ত কোলাহল উঠেছে, বিজয়ী সৈন্যদল মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি দিচ্ছে এই লোকটিরই। 'আল্লা হো আকবর !' ধ্বনিতে ওপারের পাটনা শহর ছাড়িয়েও বহুদূর পর্যন্ত বোধহয় কম্পিত হচ্ছে—কিন্তু এই মানুষটিকে যে সে জয়ধ্বনির আনন্দ-উন্মাদনা স্পর্শ করেছে তা তো মনে হচ্ছে না, বিজয়-গৌরবের উগ্রসুরা এতটুকু তো মাতাতে পারে নি। বরং কোলাহল ও জনতার বাইরে একা এই ঢিপিটার ওপর এসে নির্লিপ্ত উদাসীনবৎ দাঁড়িয়ে আছে। মনে হচ্ছে নিতান্ত অপরিচিত কোন ব্যক্তি, একান্ত নিস্পৃহ কোন দর্শক মাত্র।

তবে ?

তবে এঁর বিশ্রামের কথা মনে হয় না কেন ?

অতি প্রত্যূষে সূর্য অনুদয়ে লোকটি যুদ্ধসাজ পরে ঘোড়ায় উঠেছেন, এখনও পর্যন্ত মাটিতে আর পা দেন নি। মাঝে ঘোড়া থেকেই হাতীতে উঠেছিলেন, বহুদূর অবধি দেখার সুবিধার জন্য—আবার পরে হাতী থেকে ঘোড়াতে নেমেছেন। এর মধ্যে কিছু আহার করেন নি, এতটুকু জলপান করেন নি—ভারী ভারী বর্ম ও শিরস্ত্রাণ খোলার কথা ত চিন্তাই করা যায় না।

মানুষটা কি লোহা দিয়ে তৈরী ?

আর দরকারই বা কি এত কষ্ট স্বীকারের ? কাজ ত চুকেই গেছে, এখন বিশ্রাম করলে এমন কি ক্ষতি হতে পারে ?

ইয়াসিন ভয়ে ভয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে থেকে ভয়ে ভয়েই কাশল একটু। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না।

আকবর শা ভীড় থেকে দূরে—এই ঢিপির মত উঁচু জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলেন, বোধ করি নির্জনে একটু চিন্তা করার জন্যই।

দূরে গঙ্গার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়েছিলেন আকবর। কিন্তু ঠিক গঙ্গার দিকেই কি চেয়েছিলেন এই নবীন বাদশা ? না—গঙ্গা পার হয়ে দৃষ্টি তাঁর স্থির-নিবদ্ধ ছিল পাটনা শহরের দিকে, যেখানকার কিলার মধ্যে দায়ুদ কররাণী নিজেকেই নিজে বন্দী করে রেখেছে।

গৌড়বঙ্গের এই পাঠান সুলতান বিজ্ঞ নৃপতি সুলেমান কররাণীর পুত্র—কিন্তু পিতার সহস্রবিধ গুণের এতটুকুও কি পায় নি সে! নির্বোধ। নিতান্তই নির্বোধ। আরও বহু দোষ আছে ওর স্বভাবের—কিন্তু আকবর শা মনে করেন রাজা বা শাসকের পক্ষে অমার্জনীয় দোষ ও দুর্বলতা হচ্ছে নির্বুদ্ধিতা। সাংঘাতিক—শুধু প্রজাদের পক্ষে নয়, সে রাজার নিজের পক্ষেও বটে। যে নির্বোধ তার সিংহাসনে বসবার কোন অধিকার নেই।

এই লোকটি সিংহাসনে বসে পর্যন্ত একটার পর একটা নির্বুদ্ধিতারই পরিচয় দিচ্ছে। সব চেয়ে বড় নির্বুদ্ধিতা হল তার পিতার উজীর, বন্ধু, পরামর্শদাতা এবং সর্বাধিক বিশ্বস্ত সেবক—লুদী খাঁকে হারানো। প্রথম তাঁর প্রিয় জামাতাকে হত্যা করে তাঁকে বিদ্বিষ্ট করে তুলল—তারপর আবার, সেই বিদ্বেষ শত্রুতায় পরিণত হতে পারে সন্দেহ করে তাঁকে হত্যা করল। আর হত্যা করল কী ভাবে, প্রভু বংশের প্রতি তাঁর বিশ্বস্ততা ও প্রভুপুত্রের প্রতি অকৃত্রিম স্নেহের সুযোগ নিয়ে, শরণাগত সেজে ভুলিয়ে মধ্যরাত্রে নিজের তাঁবুতে ডেকে এনে কাপুরুষের মত আঠারো জন লোক মিলে এক নিরস্ত্র বৃদ্ধকে আক্রমণ করে!

এই লোককে সিংহাসনে বেশী দিন বসতে দিলে খুদাই ক্ষমা করবেন না আকবর শা-কে!

ওর আর সব অপরাধ, সব দুর্বলতা আকবর শা সহ্য করতে পারতেন—কিন্তু এই কাপুরুষতা অসহ্য।

মরতে ওকে হবেই—অন্ততঃ সরতে হবে এই গদী থেকে।

আর অচির ভবিষ্যতে সে সরবেও, আকবর শা-ই ওকে সরাবেন, তা-তিনি জানেন। সেটুকু আত্মবিশ্বাস জহীরুদ্দীন বাবর শার পৌত্র জালালুদ্দীন আকবর শা রাখেন।

কিন্তু তবু—

ওই নির্বোধ মূর্খ সুলতানটার পাশে আজও যারা আছে, তারা সকলেই সুলেমান কররাণীর আমলের লোক, তাঁরই হাতে গড়া। প্রধান সেনাপতি গুজর খাঁ, কতলু খাঁ লোহানী—এরা স্বার্থপর বটে, কিন্তু কাপুরুষ নয়; সকলেই দুর্ধর্ষ বীর ও যোদ্ধা। এরা কেউই দায়ূদ কররাণীর মঙ্গল কামনা করে না—বরং সকলেই মনে মনে তার সিংহাসন কামনা করে—তা আকবর ভাল করেই জানেন—কিন্তু তেমনি এরা তো কেউ নির্বোধও নয়, এরা জানে যে প্রবল শত্রু সামনে, এ সময় গৃহবিবাদ কর্তব্য নয়, এ সময় সুলেমান কররাণীর সিংহাসনের নামে একতাবদ্ধ হওয়াই সুবিধা, আপাততঃ মুঘলের হাত থেকে সিংহাসনটা রক্ষা পেলে সে সিংহাসন থেকে ওই মূর্খ নির্বোধ দায়ূদটাকে টেনে নামিয়ে দিতে এতটুকু আয়াস স্বীকার করতে হবে না তাও তারা জানে।

আর সেই জন্যেই আকবর শার এই চিন্তা।

শত্রু খুব সহজ নয়।

সহজ নয় বলেই আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে এগোচ্ছেন তিনি। সেই জন্যই ওদিক দিয়ে গঙ্গা পার হবার চেষ্টা না করে তিনি সোজা এখানে এসেছেন এবং পাটনা আক্রমণের চেষ্টা না করে আগে এই হাজীপুর কিল্লা দখল করেছেন। এইখানে বসে, এই কিল্লার আশ্রয়ে থেকে পাটনা দখল করার অনেক রকম সুযোগ-সুবিধা পাবেন তিনি। প্রথম যখন তিনি হাজীপুর কিল্লা আক্রমণ করবার আদেশ দেন তখন তাঁর সেনাপতিরা একটু বিস্মিত হয়েই চেয়েছিলেন তাঁর মুখের দিকে। মুনিম খাঁর মুখে তো বেশ একটু অ-প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের

হাসিই ফুটে উঠেছিল। কিন্তু এখানে এসে কিলার অবস্থান ও ওপারে পাটনার ছাউনির অবস্থানটা মিলিয়ে দেখে সে বিস্ময় ও ব্যঙ্গের স্থলে মুগ্ধ সম্ভ্রমের ভাবই ফুটে উঠেছে। তাঁদের বাদশা ও মালিক তাঁদের চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ হলেও বুদ্ধিতে আদৌ কনিষ্ঠ নন—এ প্রমাণ তাঁরা প্রত্যহই পাচ্ছেন।

ইয়াসিন আবারও কাশল। এবার বেশ-একটু স-রবে।

কিন্তু আকবর ওপারের ছাউনির দিকে চেয়ে একেবারে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলেন ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার চিন্তায়। সে কাশির শব্দ তাঁর কানে গেল না।

ছাউনির দিকেই চেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর অন্তরের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যা তাঁকে একটার পর একটা বিজয়ে এগিয়ে যেতে, ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করতে সাহায্য করেছে—সে দৃষ্টি পাটনা ছাড়িয়ে আরও বহু দূরে, আরও দক্ষিণে চলে গিয়েছিল; ভবিষ্যতের সুদূর দক্ষিণে। বহু দূর ভবিষ্যৎ দেখতে পান তিনি, বহু লোকের মনের চেহারাটাও দেখতে পান। এটা বোধ করি খুদারই দেওয়া ক্ষমতা। তাই একেবারে বালক বয়সে সিংহাসনে বসেও সে সিংহাসন খোয়াতে হয় নি তাঁকে, ঠকেন নি কারুর কাছে। কখনও কারুর কাছেই পরাজিত হন নি—কী শক্তির যুদ্ধে, কী বুদ্ধির যুদ্ধে।

আজও হার মানবেন না—এ তিনি জানেন। আজও তিনিই বিজয়ী হবেন। তবে কোন পথে এগোবেন, কী উপায়ে তাঁর শক্তি ক্ষয় না করেও এই প্রবল শত্রুকে পরাজিত করবেন—এ-ই চিন্তা।

সেই পথটাই খুঁজছেন তিনি এই একান্তে দাঁড়িয়ে।

তাই তাঁর দৃষ্টি খোলা চোখের দ্বারপথে বেরিয়েও বাইরের কিছু দেখতে পাচ্ছে না—কোন্ অদৃশ্য পথে ফিরে এসে মনের গহনে ডুব দিয়ে সেই অন্ধকারের মধ্যেই বুদ্ধির আলোতে পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করছে!···

ইয়াসিনের কাশি সেই রুদ্ধ-ইন্দ্রিয় চিন্তার মধ্যে ঢোকবার কথা নয়।

ইয়াসিন এবার বেশ একটু বিরক্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু কী-ই বা করবে! এর চেয়ে বেশী কিছু করতে গেলে ধৃষ্টতা হয়ে উঠবে।

বিমূঢ় ভাবে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করতে করতে হঠাৎ একটা কথা ওর মনে পড়ে গেল। কে জানে কেন—বাদশার এই প্রিয় ঘোড়াটি তাকে মোটে দেখতে পারে না। সম্ভবতঃ একই লোকের দুই প্রিয়পাত্র পরস্পরকে সহ্য করতে পারে না—সেই সপত্ন-বোধই এই বিদ্বেষের হেতু। যাই হোক—আপাতত সেই সুযোগ নিতে দোষ কি?

ইয়াসিন আস্তে আস্তে একটা হাত রাখল ঘোড়াটার মাথায়, দুই চোখের মাঝামাঝি। সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে এক পা পিছিয়ে গিয়ে চিঁহি চিঁহি করে ডেকে উঠল সে—এবং প্রবল বেগে মাথা চালাতে লাগল।

এইবার ধ্যানভঙ্গ হল আকবরের। সব সময় মানুষের ডাক কানে পৌঁছয়

না মানুষের—কিন্তু প্রিয় পশুর এতটুকু অস্বস্তি সম্বন্ধেও সে নিমেষে সচেতন হয়ে ওঠে।

'কি রে, কি রে রুস্তম, কী হয়েছে?'

আকবর সস্নেহে মাথা চাপড়ে ওকে আদর করেন।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ইয়াসিনের উপস্থিতি সম্বন্ধেও অবহিত হয়ে ওঠেন।

'কী ইয়াসিন?'

'লড়াই তো ফতে হয়ে গেল জাঁহাপনা, সূর্যও তো প্রায় অস্ত যায়-যায়। এবার একটু বিশ্রাম করলে হত না? সারাদিন তো এতটুকু জলও পেটে যায় নি। একটু কিছু মুখে তো দেওয়া দরকার!'

'ও, সেই জন্যে বুঝি এখানে এসে দাঁড়িয়ে আছ আর আমাকে বিরক্ত করতে সাহসে কুলোয় নি বলে আমার ঘোড়াকে বিরক্ত করছ! তুই মেয়েছেলের বাড়া হয়ে পড়লি ইয়াসিন!…বিশ্রাম কি, যোদ্ধার কি বিশ্রামের কথা চিন্তা করলে চলে? তুই তো জানিস আমি সাত দিন সাত রাত অবিশ্রাম হাতী ও ঘোড়ায় চেপে গোয়ালিয়র থেকে আগ্রা পেঁছেছিলুম। সওয়ার বদল হয়েছিল—সওয়ারী কিন্তু ঠিক ছিল।…শুধু চলার পরিশ্রমই নয়—ঘুমোবারও তো অবসর জোটে নি। অত সহজে আমার ক্লান্তি আসে না—তুই নিশ্চিন্ত থাক। খাওয়া যে হয় নি, তা তুই বলতে মনে পড়ল। আমার এতক্ষণ সে কথা খেয়ালই ছিল না!'

'তা মনে যখন পড়েছে এবার—'

সসঙ্কোচে ভয়ে ভয়ে এই পর্যন্ত বলে উৎসুক মুখে তাকায় ইয়াসিন মালিকের মুখের দিকে।

'আর একটু পরে যাচ্ছি—তুই যা।'

ইয়াসিন মনিবের দুর্বলতা সবই এতদিনে জেনে ফেলেছে বৈকি!

তাই সে এবার মোক্ষম চালটিই দিলে, 'তাহলে অন্তত সওয়ারটাই বদল করুন, ঘোড়াটাও তো সেই ভোর থেকে কিছু খায় নি—তার ওপর এই দারুণ গরম ও গুমোটে সারাদিন ঘুরেছে, এক বিন্দু জলও খাওয়ান নি, ওটা মরে যাবে যে!'

'ইস তাই তো—' নিমেষে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আকবর। এক লাফে ঘোড়া থেকে নেমে পড়ে বললেন, 'ইস্, কথাটা তো মনেই ছিল না। বড় অন্যায় হয়ে গেছে। তুই ওকে নিয়ে চল্—আমিও যাচ্ছি।'

'কিন্তু হাঁটবেন কেন—আর একটা ঘোড়া—'

'ঠিক আছে। সারাদিন হাতী আর ঘোড়ায় চেপে চেপে হাতে পায়ে খিল ধরে গেছে। একটু হাঁটতে ভালই লাগবে এখন। রুস্তমকে আর এর ওপর ভার বইয়ে লাভ নেই!'

তিনি লাগামটি ছুঁড়ে ইয়াসিনের হাতে দিয়ে দিলেন।

যে উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়েছিলেন আকবর, সেটা একটা ছোটখাটো টিলার

মতই উঁচু। ওর ওপর দাঁড়ালে বহুদূর পর্যন্ত নজরে পড়ে।

সেখান থেকে নামতে গিয়ে আকবরের চোখে পড়ল, কিছুদূরে কী একটা হট্টগোল হচ্ছে, বেশ একটা কোলাহল, গোলমাল।

এবং সে গোলমালটা আর যাই হোক—ঠিক বিজয় উৎসবের হল্লা নয়। ওঁর অভিজ্ঞ কান দূর থেকেও হৈ-হল্লার বিভিন্ন শব্দের পার্থক্য বুঝতে পারে।

তিনি আরও কয়েক মুহূর্ত সেদিকে তাকিয়ে থেকে, নিমেষে সেই দিকে পা চালালেন। এত দ্রুত হাঁটতে লাগলেন যে ইয়াসিন প্রায় ছুটেও তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারল না। চারদিকে সব নিজেরই সৈন্য বটে, তবু বাদশার ঠিক চার পাশে যে রক্ষী থাকা প্রয়োজন সেটা ওঁর কখনও মনে থাকে না।

'কী হয়েছে?' ভীড় ঠেলে এগিয়ে গেলেন বাদশা।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কোলাহল থেমে গেল। জনতা দুই ভাগ হয়ে সরে শুধু পথই দিল না—অভিবাদনে আভূমি নত হল এক লহমায়।

বাদশার কণ্ঠস্বর বাহিনীর সকলেই জানে। চিনতে ভুল হবার কথা নয়।

তারপর মাথা যখন আবার সকলের উঁচু হল, বাদশার প্রসন্ন অনুমতি পাবার পর, একজন বললে, 'জাহাঁপনা—এই লোকটাকে আমরা ধরেছি, এ গুপ্তচর!'

'গুপ্তচর?' ভ্রু-কুঞ্চিত হয়ে উঠল বাদশার।

'হ্যাঁ জাঁহাপনা, গুপ্তচর! ··এ আমাদের বাহিনীর কেউ নয়—কি আমাদের চাকর সহিস রসদ-বাহিনী—কোন দলেরই নয়। অথচ দেখুন সশস্ত্র, একেবারে আমাদের মধ্যে ঢুকে পড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। আমরা ধরে ফেলেছি—।' অর্থাৎ কৃতিত্বটা না ভুলে যান বাদশা।

'ওর কি কৈফিয়ৎ?' বাদশা প্রশ্ন করেন।

এক সঙ্গে দু-তিন জন বলে উঠল, 'ধরা পড়ে এখন বলছে বাদশার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে এখানে এসেছে। তাঁর সঙ্গে ওর কথা আছে। কিছু গুপ্ত সংবাদ দেবে, তাতে নাকি আমাদের উপকারই হবে!'

সবাই হেসে উঠল। কারণ এ কৈফিয়ৎ বহু পুরাতন। এ অছিলা সর্বকালেই সমস্ত গুপ্তচর দিয়ে আসছে। একেবারেই ছেলেমানুষী কৌশল—আত্মরক্ষার।

'কৈ দেখি, ওকে সামনে আন।' আদেশ দিলেন আকবর শা।

পিছমোড়া করে বেঁধেছিল ইতিমধ্যে তাকে। সেই অবস্থাতেই ঠেলতে ঠেলতে সামনে নিয়ে এল।

তখন বেশ ঝাপ্‌সা হয়ে এসেছে দিনের আলো। শ্রাবণের সূর্যও অস্তাচলে ঢলে পড়েছেন, তাঁর শেষ রশ্মি দূর পশ্চিম দিকচক্রবালে ঘন বনানীর অন্তরালে মিলিয়ে এসেছে। পশ্চিম দিগন্তে সামান্য একটু রক্তিম আভা মাত্র জেগে তখনও।

তবু, সেই অস্পষ্ট ম্লান আলোতেই, একবার মাত্র তার দিকে তাকিয়েই বাদশা বলে উঠলেন, 'আরে, এ যে স্ত্রীলোক!'

সকলে নির্বাক—বেশ কিছুক্ষণ।

আর সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে বন্ধ অবস্থায় যতটা সম্ভব অভিবাদনে মাথা হেলিয়ে—গুপ্তচর বলল, 'জী জাঁহাপনা। আপনার বাঁদী!'

বিস্মিত হয়েছিল সবাই, শুধু বুঝি একা আকবর শা-ই বিস্মিত হন নি। তিনি সপ্রতিভ এবং বেশ একটু কঠোর কণ্ঠেই বললেন, 'কে তুমি, সত্য পরিচয় দাও। সত্য কথা না বললে—স্ত্রীলোক বলে ক্ষমা করব না।'

'খুদার দোহাই, আমি মিছে কথা বলছি না। আমি মিয়া লুদী খাঁর বাঁদী—নফিসা বেগম!'

'মিয়া লুদী খাঁ! কররাণীদের উজীর? বিখ্যাত রাজনীতিক মিয়া লুদী?'

'হ্যাঁ জনাব। আমি তাঁরই বাঁদী।'

'তা এখানে কেন এসেছিলে? কী দরকার?'

'সত্যিই আপনার খোঁজে এসেছিলাম। শুনলাম আপনি যুদ্ধক্ষেত্রেই কোথায় আছেন। তাই আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম।'

'প্রয়োজন?'

'প্রয়োজন!' মুহূর্তকাল মৌন থেকে নফিসা বলল, 'মূল প্রয়োজন প্রতিশোধ। আমার মালিকের অকারণ ও নিষ্ঠুর হত্যার—বোধ করি মানুষের ইতিহাসে সব চেয়ে ঘৃণিত এক বিশ্বাসঘাতকতার—প্রতিশোধ তুলতে চাই। কিন্তু আমি অবলা স্ত্রীলোক, আমার বাহুতে সে জোর নেই। তাই যার সে জোর আছে—এমন লোকেরই শরণাপন্ন হতে এসেছি জনাব! আমি উপায় জানি, পথ জানি—কিন্তু কাজটা ত করতে পারব না। সেটা আপনি পারবেন। তাই আপনাকে খুঁজছি।'

উপায়! পথ!

নিমেষে চোখ দুটো জ্বলে ওঠে আকবর শা-র। যে সুযোগ তিনি খুঁজছিলেন—তাঁর সৌভাগ্যতারকা কি তাহলে এই নারীরূপে সেই সুযোগ-সুবিধা পাঠিয়ে দিয়েছে!

মনে মনে কৌতূহলে অধীর হয়ে পড়লেও মুখের প্রশান্তি নষ্ট হল না তাঁর। তিনি বললেন, 'বেশ খুঁজে তো পেয়েছ, এখন বল তোমার কি বক্তব্য!'

'না জনাব, সে কথা অনেকের সামনে বলবার মত নয়। শুনলে আপনাকে নিভৃতে শুনতে হবে।'

সেই প্রায়ান্ধকারেই যতদূর সম্ভব বিস্ফারিত নেত্রে ওর দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন আকবর শা, তারপর শুধু বললেন, 'বেশ আমার সঙ্গে আমার তাঁবুতে এস। ছেড়ে দাও ওকে—'

'হুজুর—ও কিন্তু সশস্ত্র!' কে একজন ভয়ে ভয়ে বললে।

'জানি ইয়ার মহম্মদ।' বাদশা হাসলেন একটু: 'সশস্ত্র হলেও নারী! পুরুষের হাতে যা হাতিয়ার নারীর হাতে তা খেলনা মাত্র। তাতে ভয় পাওয়া যোদ্ধার অন্তত সাজে না!'

॥ ৬ ॥

নিজের তাঁবুতে পেঁছে মণিমাল্যমন্ডিত উষ্ণীষ খুলে নামিয়ে রেখে নফিসার দিকে ফিরে দাড়ালেন আকবর শা। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বললেন, 'বল এবার কী বলতে চাও !'

'জাঁহাপনা, আপনি বিনা যুদ্ধে পাটনা দখল করতে চান ?' স্পষ্ট এবং সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

এবার আকবরও একটু বিস্মিত হলেন।

একটু যেন সন্দেহও হল। এ নারী তাঁর মনের কথা জানলে কী করে ? অথবা জানতেই এসেছে। টোপ ফেলে দেখছে—সে টোপ তিনি গেলেন কি না!

তিনি একটু রুক্ষ স্বরেই বললেন, 'আমি কি চাই তা তোমার না জানলেও চলবে, তুমি কী চাও তাই বল !'

'জনাবালি, আমি ওই পাপিষ্ঠ দায়ুদ কররাণীর সর্বনাশ চাই। আমার জীবনের এখন এই একমাত্র ব্রত, একমাত্র তপস্যা।···আমার মালিক—আজ স্বীকার করছি, লজ্জা করব না—আমার প্রাণের মালিক, লুদী মিয়া দেবতা ছিলেন। তিনি স্বর্গত প্রভুর মুখ চেয়ে ঐ পাপিষ্ঠটার সব অপরাধ ক্ষমা করেছিলেন। তিনি চিনতেন ওকে, তাঁকে হত্যা করতেই মিথ্যা ছলনার সাহায্যে তাঁর করুণা উদ্রেক করে ভুলিয়ে ডেকে নিয়ে যাচ্ছে এ সন্দেহও করেছিলেন—তবু বিপন্ন প্রভুপুত্রের মিনতিতে স্থির থাকতে পারেন নি। সেই বিশ্বাস, স্নেহ এবং ক্ষমার মর্যাদা রাখল ওরা বহুজন মিলে নিরস্ত্র বৃদ্ধকে হত্যা করে—এ জ্বালা যে আমার যাবে না জনাব। আমার সমস্ত রক্তে আগুন জ্বলছে, অহরহই জ্বলছে—সে জ্বালার অবসান হবে ওর রক্তে মাটি ভিজেছে দেখলে।···কিন্তু এখনই নয়, সে ইচ্ছা থাকলে আমিও ওকে খুন করতে পারতুম।·· তার আগে ওর সর্বনাশটা দেখতে চাই। যে সিংহাসনের জন্য সে এই কান্ড করল, সেই সিংহাসন বার বার ধরতে যাবে, বার বার ফসকে যাবে ওর হাত থেকে—কুকুর বেড়ালের মত প্রাণভয়ে দেশ থেকে দেশান্তরে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াবে, আশ্রয় ভিক্ষা করবে কিন্তু আশ্রয় মিলবে না, যাদের বিশ্বাস করবে তারাই করবে ওর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা—আগে এই সমস্ত দেখতে চাই, নিজের চোখে। তারপর মৃত্যু। ওদের কাউকে ক্ষমা করব না আমি। গুজর খাঁ, কতলু লোহানী—সকলের সর্বনাশ আমি দেখব। দেখবই—আপনি সাহায্য করুন আর না করুন। খুদা আমাকে ততদিন পরমায়ু দিন—এখন তাঁর কাছে শুধু এই প্রার্থনা।'

আকবর মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন ওর কথা। তাঁবুর মধ্যেকার খুঁটিতে বাঁধা দুটি মশালের মত তেলের বড় আলো। তিনি আছেন সেদিকে পিছন

ফিরে, আলোটা পুরো গিয়ে পড়েছে নফিসার মুখে। একাগ্রদৃষ্টিতেই দেখছিলেন ওকে।

নফিসা থামবার অনেকক্ষণ পরে, আশ্চর্য কোমলকণ্ঠে, প্রায় চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন, 'তুমি মিয়া লুদীকে খুব ভালবাসতে, না ?'

'হ্যাঁ জাঁহাপনা। ভালবাসার কম-বেশি আমি জানি না—কিন্তু ওঁকে ছাড়া তখন আমি পৃথক অস্তিত্বই অনুভব করতে পারতুম না। সত্যিই বার বার মনে হত ওঁর চলার পথে আমি বুক পেতে দিই—তা দিলেও আমার বুকে ব্যথা লাগত না, বুক জুড়িয়ে যেত। তিনিই ছিলেন আমার দিনরাত, সুখ-দুঃখ—ইহকাল পরকাল আমার সব, আমার সব।'

বিহ্বল স্খলিত কণ্ঠে কথাগুলো বলে নফিসা। বলতে বলতে একেবারে গলা ধরে আসে ওর।

'কিন্তু তিনি তো—যতদূর শুনেছি বৃদ্ধ ছিলেন, তোমার বয়স তো কাঁচাই। বেশ কাঁচা।'

'কী জানি জনাব, বৃদ্ধ ছিলেন কি যুবক ছিলেন তা তো কোনদিন ভেবে দেখি নি। তিনি ছিলেন দেবদূত, দেহধারী দেবদূত। তাঁকে পূজা করেছি—ভালবেসে কৃতার্থ হয়েছি। তাঁর রূপ-যৌবনের কথা কোনদিন মনেই পড়ে নি যে!'

'কেন এত ভালবাসলে ? কী দেখেছিলে তুমি তাঁর মধ্যে ?'

'দেখেছিলাম তাঁর হৃদয়!…একদিন এক বীভৎস অপমানের হাত থেকে তিনি বাঁচিয়েছিলেন আমাকে। মৃত্যুর চেয়েও ঢের বেশী দুঃসহ সে অপমান আর নির্যাতন। কিন্তু তার জন্য এতটুকু কৃতজ্ঞতা দাবী করেন নি।…আমি তাঁর বাঁদী হতে চেয়েছি—স্বেচ্ছায়। তিনি তারপরও আমাকে মুক্তি দিতে চেয়েইছিলেন। তিনি ইচ্ছা করলে আমাকে যথেচ্ছ সম্ভোগ করতে পারতেন, সম্ভোগান্তে সাধারণ বাঁদীর মতই ভুলে যেতে পারতেন—আমি তাতেই কৃতার্থ হতাম। কিন্তু কিছুই করেন নি তিনি—সযত্নে রক্ষা করেছেন আর স্নেহ করেছেন। তাঁর সেই স্নেহচ্ছায়ায় আমার যে কটি দিন কেটেছে, সে কটি দিনই আমাকে বেহেস্তের স্বাদ দিয়েছে এ পৃথিবীতে জনাব। তার চেয়ে বেশী সুখ আমি বেহেস্তেও কল্পনা করতে পারি না।'

এ সবই কি মিথ্যা ? সবই কি ছলনা ?

এ সংশয় একটা ছায়া ফেলেছিল বৈকি বাদশার মনে। কিন্তু মনে মনেই তৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে ঘাড় নাড়লেন আকবর শা।

তা হতে পারে না। বৃথাই তিনি এতদিন মানবমনস্তত্ত্ব অনুধাবন করেন নি। এ নারীর জ্বালাও সত্য, প্রেমও সত্য।

সহসা তাঁর সেই কোমল ও মৃদু কণ্ঠ কোথায় চলে গেল।

তার বদলে বাদশাহী কণ্ঠই বেজে উঠল আবার, 'তা হলে এখন তোমার প্রস্তাব ?'

সে কণ্ঠে নফিসাও যেন তার স্মৃতি-স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠে। সে-ও সহজ

ভাবে উত্তর দেয়, 'আমি আমার প্রশ্নের জবাব পাই নি জনাব।'

'ধরে নাও যে আমি তাই চাই। বিনাযুদ্ধে জয়লাভ করতে চাওয়াটাই তো স্বাভাবিক।'

'আপনি—আপনি তা হলে ওই হাজীপুর কিলায় আগুন ধরিয়ে দিন বাদশা, সেই হুকুমই দিন।'

'আগুন ধরিয়ে দেব ? হাজীপুর কিলায় ? কী বলছ তুমি ? তা হলে এত কাণ্ড করে কিলা দখল করলুম কেন ?'

এবার আর বিস্ময় চাপতে পারেন না আকবর শা। বিস্ময়-বিহ্বল কণ্ঠেই প্রশ্নগুলি করেন।

'হাজীপুর কিলা আপনি দখল করেছেন পাটনা দখলের সুবিধা হবে বলে—তাই না ? সে সুবিধার জন্যই ওই কিলায় আগুন লাগিয়ে দিন বাদশা, আমি বলছি সুবিধা হবে।'

'হ্যাঁ, সুবিধা হবে ঠিকই—অপর পক্ষের।'

তীক্ষ্ন ব্যঙ্গের সুর ফুটে ওঠে ওঁর গলায়।

'জাঁহাপনা, শুনেছি আপনার তৃতীয় নয়ন আছে, আপনি নাকি মানুষের বুকের চামড়া ভেদ করে ভেতরটা দেখতে পান—আপনিও আমাকে অবিশ্বাস করছেন ? দোহাই আপনার, ভুল করবেন না, একবার জগতের লোককে দেখিয়ে দিন যে আপাতদৃষ্টিতে যা বাতুলতা, আসলে তা দূরদৃষ্টি মাত্র। খুদার দোহাই বাদশা—আমাকে বিশ্বাস করুন।'

'নফিসা বেগম, পৃথিবীতে কতকগুলো কাজ আছে যা শুধু অপরের মুখের কথায় করা যায় না। হাজীপুর কিলা জ্বালিয়ে দিলে আর কারুর কথাতেই তো আপনি গড়ে উঠবে না। তখন ভুল বুঝলেও কিলা ফিরানো যাবে কি ?'

'আমার জান জামিন। আমি বন্দী থাকব—যদি আমার কথা না ফলে, কাল আমাকে কোতল করবেন।'

'তাতে কি হাজীপুর কিলা ফিরবে ?'

আকবর শা স্থির তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন।

নফিসা স্তব্ধ হয়ে নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে—বহুক্ষণ। তার পর প্রায় চুপিচুপি বলে, 'তবে শুনুন সম্রাট, কয়েকদিন আগে আমি দায়ুদ কররাণীর শয়নগৃহে ঢুকেছিলাম। সকলের অজ্ঞাতে, অন্ধকারে মিশে। এর জন্য আমাকে বহু কাণ্ড করতে হয়েছে, বহু আয়াস। অনেক নীচেও নামতে হয়েছে কিন্তু তাতে ইতস্তত করি নি। প্রতিহিংসার সাধনা আমার—তার জন্য সব কিছুই করতে প্রস্তুত। সেদিন ইচ্ছা করলে ঘুমন্ত শয়তানটাকে বধ করতে পারতাম। তার জন্য আমার জীবন গেলেও তো ক্ষতি ছিল না জনাব, কারণ এ জীবনটার, এ দেহটার আর কোন মূল্যই নেই। মৃত্যু মানে শান্তি—হয়তো কিছুদিন অপেক্ষার পর রোজ কিয়ামতের দিন আবার মালিকের সঙ্গে মিলন।...কিন্তু ওকে বধ করলে আমার, আমার তৃপ্তি হবে না সম্রাট। ঘুমন্ত

বধ করলে লাভ কী? ও তো জানতেও পারল না, অনুশোচনায় দগ্ধ হবারও সময় পেল না! সে মৃত্যুতে আমার প্রাণে জ্বালা মিটবে না। তাই তাকে মারি নি, স্বপ্নের মত তার শিয়রে দাঁড়িয়ে স্বপ্নের সঙ্গেই মিশিয়ে দিয়েছিলাম আমাকে। সে ভেবেছে সে স্বপ্নই দেখেছে—তাকে বলে এসেছি তার সর্বনাশের আর বিলম্ব নেই। বিধাতার রুদ্ররোষ আগুনের অক্ষরে ফুটে উঠবে আকাশের গায়ে, সেই আকাশলিপিতেই নিজের নিয়তি দেখতে পাবে সে।··· এইটুকু বলেই বেরিয়ে এসেছি। সে খুঁজে পায় নি আমাকে। বহু খোঁজ করেছে। প্রহরীদের কঠোর শাস্তি দিয়েছে—অনেকের প্রাণবধও করেছে আমার জন্যে।···কিন্তু সব বৃথা—স্বপ্ন না সত্য তাও জানতে পারে নি।··· সে ভয় পেয়েছে বাদশা, খুব ভয় পেয়েছে। আমি জানি, খবর নিয়েছি। দিনে আহার নেই তার, রাত্রে তন্দ্রা নেই চোখে। ভয়ে বিবর্ণ বিশীর্ণ হয়ে গিয়েছে। পাটনা দুর্গের অন্ধকার প্রকোষ্ঠে নিজেকে লুকিয়ে রেখেছে —আলোর ভয়ে ভীত পেঁচার মত। শুধু একটু আগুন—একটু বেশী করে আগুন জ্বালুন, তা হলেই হবে। বিনা যুদ্ধে সে পাটনা ছেড়ে চলে যাবে, একটি লোকও মরবে না আপনার, সামান্য ক্ষয়ক্ষতিও হবে না। বিশ্বাস করুন।'

প্রায় ভিক্ষার মত হাত জোড় করে শেষের কথাগুলো বলে নফিসা বেগম।

আকবর স্তব্ধ হয়ে থাকেন আরও অনেকক্ষণ। তারপর বলেন, 'শির জামিন?'

'শুধু শির কেন জনাব—ইজ্জৎ পর্যন্ত। যদি আমার কথা না ফলে আপনার নিম্নতম ভৃত্যের বাঁদী হয়ে থাকব চিরকাল।'

'বেশ, তাই হবে। আজ রাত্রে তুমি আমাদের শিবিরে বন্দিনী হয়ে থাকবে। যদি তোমার কথা ঠিক ঠিক ফলে—কাল মুক্তি পাবে।'

'স্বচ্ছন্দে।'

নফিসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

আকবর শা ডাকেন, 'ইয়াসিন!'

ইয়াসিন এসে দাঁড়ায়।

'এই গুপ্তচরকে বন্দী করেই রাখতে হবে, পাহারাদারদের বল। তবে কোন দুর্ব্যবহার না কেউ করে। খাদ্য জল দেবে। শোবার ব্যবস্থাও করে দিও। আর মুনিম খাঁকে ডেকে দাও।'

ইয়াসিন বিপন্নমুখে একবার এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাথা-টাথা চুলকে মরীয়া হয়ে বলে, 'কিন্তু এখন একটু বিশ্রাম করলে হত না জনাব।'

'আঃ! ইয়াসিন, তুই বড় বেশী অভিভাবক হয়ে পড়েছিস। যা বলছি শোন্। বিশ্রামের আমার দরকার নেই।'

'একটু শরবত?' তবুও ছাড়ে না ইয়াসিন।

'ইয়াসিন!' ধমক দিয়ে ওঠেন বাদশা।

কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে যায় ইয়াসিন।

॥ ৭ ॥

অকস্মাৎ মধ্য রাত্রে আগুন জ্বলল।

অতর্কিতে একেবারেই সহসা সহস্র শিখায় জ্বলে উঠল সে আগুন।

হাজীপুর কিলায় আগুন ধরেছে। সমস্ত কিলাটা জ্বলছে দাউ দাউ করে।

সে লেলিহান শিখা অগ্নির শিখর রচনা করেছে যেন অন্ধকার নৈশ আকাশে। তার ভয়াবহ লাল আভা চারিদিকে বহুদূর পর্যন্ত নদী বন জনপদকে আলোকিত করে এক ভয়ঙ্কর রূপ দান করেছে।

শব্দও উঠেছে একটা। সে শব্দে ঘুম ভেঙেছে সকলের। বিহ্বল হতচকিত হয়ে কেউ বেরিয়ে এসেছে বাইরে, কেউ বা নিজের অলিন্দে দেহলীতে দাঁড়িয়ে নির্বাক হয়ে তাকিয়ে আছে। সকলেই শঙ্কিত, সকলেই দিশাহারা। কারণ জানতে পারছে না, তাই আরও ভয়। অজানা ভয় বেশী ভীতিপ্রদ মানুষের কাছে। পাটনার ঘাটে ঘাটে অসংখ্য নাগরিক এসে দাঁড়িয়েছে, শের শা'র গড়া নতুন শহরের নতুন বাসিন্দা তারা। কেমন করে তাদের ধারণা হয়েছে যে এ আগুনে তাদেরও কোন অজ্ঞাত অমঙ্গল লুকিয়ে আছে।...

মুঘল-শিবিরেও বিস্ময়ের অন্ত নেই। কেন এ অদ্ভুত খেয়াল হল বাদশার তা কেউ জানে না। কেনই বা এত কাণ্ড করে কিলা দখল করলেন আর যদি করলেন তো এত আয়াসের পর কেনই বা সে কিলায় আগুন ধরিয়ে দিলেন, স্বেচ্ছায় এ বিপুল ক্ষতি স্বীকার করলেন—তা তাদের বুদ্ধির অতীত। যখন সহসা কিছুক্ষণ পূর্বে হুকুম এল যে কিলা থেকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হবে তাদের, এবং বেশ কিছুটা দূরে সরে যেতে হবে, তখনও বোঝে নি কেউ যে বাদশার মনে কী আছে!

তবে কি বাদশা আকবর সত্যই পাগল হয়ে গেছেন?

এ কী মূর্খতা!

অনুচ্চারিত এ প্রশ্ন অনেকেরই কণ্ঠে—শুধু উচ্চারণের ভরসা নেই।

তারাও চেয়ে আছে নির্বাক হয়ে প্রজ্বলিত ঐ সহস্রশিখা-বহ্নির দিকে।

চেয়েই রইল তারা।

তাদের চোখের সামনেই সে আগুন জ্বলতে জ্বলতে ক্রমশ একসময় নিস্তেজ হয়ে এল।

সে বিপুলকায় অভ্রংলিহ বহ্নিশিখার আকৃতি হ্রস্ব হয়ে এল।

ঈষৎ-প্রধূমিত জ্বলন্ত বৃহৎ অঙ্গারখণ্ডে পরিণত হল ক্রমে হাজীপুরের কিলা।

রাত্রিও ভোর হয়ে এল ততক্ষণে।

॥ ৮ ॥

সে দিন কি সত্যিই দেখেছিলেন কাউকে ? অথবা দায়ূদের নিজেরই অনুতপ্ত মনের রচিত দুঃস্বপ্ন ?

সেইদিন থেকে আজও ঠিক করতে পারেন নি।···

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে ঘরে।

সে সম্বন্ধে সচেতন হওয়া মাত্র শিউরে উঠলেন দায়ূদ কররাণী।

অন্ধকার তিনি আর মোটে সহ্য করতে পারেন না। সেই রাতের পর থেকে অন্ধকার দেখলেই মনে হয় সে গাঢ় অন্ধকারে অশরীরী দুঃস্বপ্নের মত মিশিয়ে আছে সেদিনের সেই ছায়ামূর্তি।

ক্রুদ্ধ চিৎকারে ভৃত্যকে হুকুম করলেন আলো আনতে। একটা নয়, অনেক। অনেকগুলো বাতিদান।

তারপর তলব করে পাঠালেন গুজর খাঁ ও কতলু লোহানীকে।

গুজর আর কতলু ঘরে ঢুকে দেখলেন, পিঞ্জরাবদ্ধ সিংহের মত পায়চারী করছেন দায়ূদ। কিন্তু ক্রোধ বা ক্ষোভের চেয়েও তাঁর মুখে আতঙ্কের ছাপটাই স্পষ্ট। যেন বিশ-পঁচিশটা বাতির কম্পিত শিখায় যে ছায়া পড়ছে দেওয়ালে, সেই নিজের ছায়াটাকেই বেশী ভয় ওঁর।

ওরা বুঝতে পারে না, ওরা জানেও না—কেন আজ ক'দিন দিনরাত সর্বদা একটা ভয়ের মধ্যে আছেন দায়ূদ !

অনুমান করে যে কৃতকর্মের অনুশোচনা। ওরা হাসে মনে মনে।···

কতলুকে দেখে বিনা ভূমিকাতেই দায়ূদ বলেন, 'আমরাই ওদের আক্রমণ করব কতলু খাঁ, আপনারা প্রস্তুত হোন।'

'সে কী—নদী পেরিয়ে ? এই বর্ষার গঙ্গা ?'

'হ্যাঁ। তা কী হয়েছে ! আপনাদের এত নৌকো আছে, হাতী আছে, তবু পারবেন না ?·· না পারেন অবসর নিন। গুজর খাঁ—আপনার কী মত ? আপনি তো এতদিনের অভিজ্ঞ সেনাপতি, আপনিও কি ভয় পাচ্ছেন ?'

অকারণ রূঢ় ও কর্কশ হয়ে ওঠে দায়ূদের কণ্ঠ।

গুজর খাঁ বহুদিনের লোক, অভিজ্ঞ সেনাপতি সত্যিই। সুলেমান কররাণীর আগে থেকে তিনি পূর্বভারতের আফগানদের মধ্যে সর্বপ্রধান যোদ্ধা ও রণনীতিবিদ হিসেবে সম্মানিত। অপমানে তাঁর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। ভ্রূ কুঞ্চিত করে তিনি বললেন, 'এ ভয় বা সাহসের কথা নয় জাঁহাপনা—এ হচ্ছে নির্বুদ্ধিতার কথা। ওরা নদী পেরিয়ে আক্রমণ করতে এলে ওদেরই সহস্র অসুবিধা, আমরা তখন সহজে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারব ওদের ওপর, আমাদের ফাঁদে এসে পড়বে ওরা। আর আমরা যদি সে কাজ করি তো

আমাদেরও সেই অসহায় অবস্থায় গিয়ে পড়তে হবে, ওদের দয়ার ওপর নিজেদের ভাগ্য সঁপে দিতে হবে বলতে গেলে। আর তা আমরা করবই বা কেন, কী এমন গরজ আমাদের।'

'যদি সামনে গঙ্গা পেরোতে অসুবিধা হয় ওদিক দিয়ে ঘুরে যাব আমরা। একদল এখানে থাকবে, যাতে ওরা না বুঝতে পারে আমাদের গতিবিধি—বাকী সৈন্য নিয়ে আমরা নিঃশব্দে ওদিক দিয়ে গঙ্গা পেরিয়ে সিমারিয়া ঘাটে গিয়ে উঠব, সেখান থেকে ওদের পিছনে পৌঁছতে দেরি হবে না। তারপর অতর্কিতে লাফিয়ে পড়ব ওদের ওপর।'

'কিন্তু এত কাণ্ড করার কি প্রয়োজন হয়ে পড়েছে খুব?'

কতলু লোহানি বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করেন।

'আপনি চুপ করুন। অপদার্থ কাপুরুষ!...সেই বৃদ্ধ লুদী মিয়ার যে বুদ্ধি ও সাহস ছিল, তার এক কড়াও নেই আপনাদের। আপনাদের পরামর্শে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মেরেছি। সে থাকলে কি আজ আমাকে ভাবতে হত এসব? কত বড় বড় কথা বললেন, কত স্তোক দিলেন—অথচ আপনাদের চোখের সামনেই বিনা-যুদ্ধে হাজীপুর দখল করে নিলে মুঘলরা।'

'কিন্তু—' কতলু বিস্মিত হন যেমন তেমনি কেমন একটু অপ্রতিভও হন। হয়তো সেই বিশ্বস্ত ও বিশ্বাসকারী বৃদ্ধের চরম দিনের ও অন্তিম ক্ষণের কথা মনে পড়ে যায়। সেই সঙ্গে সেই লজ্জাকর হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের যোগাযোগটাও। মাথা নিচু করে বলেন, 'কিন্তু—আমরা তো ওপারে গিয়ে হাজীপুর রক্ষা করতে চেয়েছিলুম জনাব, আপনিই তো ছাড়লেন না!'

'ও, নিজেরা না গিয়ে বুঝি কিছু করা যায় না? যা কিছু লড়াই আপনারাই করেন? তা হলে অতগুলো লোক পুষেছেন কেন?'

অসহিষ্ণু গুজর খাঁ ইঙ্গিতে কতলুকে নিরস্ত করলেন।

'তা আপনি এখন কী করতে চান?'

'আমি এই অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে আর থাকতে চাই না। যা বললাম, সেই ভাবেই আপনি হুকুম দিন গে, আপনাদের ভয় হয়—আপনারা এখানেই থাকুন, পালাবার অনেক সুযোগ সুবিধা আছে এখানে—আমি নিজেই সৈন্যবাহিনী পরিচালনা করব। সুলেমান কররাণীর ছেলে আমি, যুদ্ধ-বিদ্যায় একেবারে গোমুর্খ নই।'

অপমানে গুজরের মুখ অরুণবর্ণ ধারণ করল। একবার তিনি কোষবদ্ধ তরবারির দিকে হাতও বাড়ালেন। কিন্তু প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করেই বোধ হয়—প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে সামলে নিলেন। সুলতান না হয়ে অপর কেউ হলে দু-দুবার 'ভয়' শব্দটা বরদাস্ত করতেন না গুজর খাঁ কিছুতেই। এক্ষেত্রে একে মনিব—তায় এটা রাষ্ট্রবিপ্লবের কাল। সব বুঝে অপমানটা আপাতত গলাধঃকরণ করতে হল।

তা ছাড়া ইতিমধ্যে, ওঁর উষ্মা অনুমান করেই, কতলু খাঁও সুলতানেরই অলক্ষ্যে হাতটা চেপে ধরেছে গুজর খাঁর।

গুজর খাঁ এবারে উঠে দাঁড়িয়ে শুষ্ক স্বরে বললেন, 'বেশ, আমি আপনার নির্দেশমত সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতের হুকুম দিচ্ছি। আপনি কটার যাত্রা করতে চান?'

কিন্তু উত্তর দিতে গিয়ে সহসা দায়ুদের যেন কন্ঠরোধ হয়ে গেল। নিমেষে যেন পাষাণে রূপান্তরিত হলেন তিনি।

নিমেষই—

সেই এক নিমেষের মধ্যেই ঘরের বাকী দুজন লোকও পাথর হয়ে গেল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই।

পঁচিশটা বাতির আলো খুব কম নয়—কিন্তু এখন যে প্রখর দিবালোকের মত আলোয় এ ঘর ভরে গেছে, লাল হয়ে উঠেছে পঙ্খের-কাজ-করা সাদা দেওয়ালগুলো, লাল হয়ে উঠেছে তাঁদের সাদা পোশাক ও ঘরের আসবাবপত্র, —সে আলো, পঁচিশ কেন পাঁচ শ বাতিতেও হত না।

সুলতানের দৃষ্টি অনুসরণ করে ওঁরাও দুজন জানলা দিয়ে বাইরে তাকালেন।

নদীর ওপারে হাজীপুর কিলায় আগুন লাগানো হয়েছে। ধু-ধু করে জ্বলছে সমস্ত কিলাটা। সেই আগুনেরই আলো এ-পারের বহুদূর পর্যন্ত—পাটনা শহরের বহু প্রাসাদ অট্টালিকা—তার পিছনের আকাশ অবধি আলোকিত করে তুলেছে।...

দমক বাতাসের মত ঘরে ঢুকলেন শ্রীহরি: 'জনাব, জনাব শুনেছেন, ওরা হাজীপুর কিলায় আগুন লাগিয়ে দিয়েছে?...ব্যাটারা অকারণে এমন লোকসান দিতে গেল কেন বলুন তো! কিলাটা ওদের কী অনিষ্ট করছিল?'

কিন্তু কোন কথাই দায়ুদের কানে গেল না। সত্যিই যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। চোখের পলক পর্যন্ত পড়ছিল না। নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে ছিলেন সেই ক্রমোত্থিত লেলিহান অগ্নিশিখার দিকে—

কয়েকটি নির্বাক নিষ্ক্রিয় মুহূর্ত—তারপরই—অকস্মাৎ একটা চিৎকার করে উঠলেন দায়ুদ কররাণী। বুকফাটা আর্তনাদের মতই শোনাল সেটা।

সামনে ভূত দেখলে মানুষ চিৎকার করতে পারে কি না—তা গুজর খাঁ জানেন না। কিন্তু, তাঁর মনে হল খাঁচায়-পোরা কোন পশুকে উন্মুক্ত অস্ত্র বা জ্বলন্ত লোহশলাকা নিয়ে বধ করতে এলে সে বোধ হয় এমনি ভাবেই—এমনি বিকট, বীভৎস আর্তনাদ করে উঠত।

একবার—দুবার, পর পর কয়েক বারই এমনি চিৎকার করে উঠলেন সুলতান। বদ্ধ উন্মাদের মতই তাঁর ভাবভঙ্গী হয়ে উঠেছে ততক্ষণে—

গুজর খাঁ ও কতলু ছুটে গিয়ে দু দিক থেকে ধরে ফেললেন ওঁকে।

'জনাব, জনাব,—জাঁহাপনা!...কী করছেন, ও কী করছেন! শান্ত হোন।'

'অ্যাঁ—?'

বিহ্বল বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকান ওদের মুখের দিকে দায়ুদ কররাণী। যেন

হয়েছে বোঝবার চেষ্টা করেন। তারপরই তাঁর সারাদেহে একটা প্রবল কম্পন শুরু হয়। কাঁপতে কাঁপতে বসে পড়েন সামনের দিওয়ানটায়—

তারপর কেমন একরকমের অস্ফুট স্বরে, কান্নার মত গলায় বলেন, 'আমি—আমি যুদ্ধ করতে পারব না গুজর খাঁ।···আমি—আমি পালাব।· এখনই কয়েকটা নৌকো ঠিক করতে বলুন আপনি, আমি আজই—এখনই রওনা হব। ওরা টের পাবার আগেই আমি বহুদূরে চলে যেতে চাই।'

'কী ছেলেমানুষি করছেন জনাব? শান্ত হোন।···কী এমন হয়েছে যে এত ভয় পেতে হবে? বলতে গেলে আমাদের একটি সৈন্যও মরে নি, একটি অস্ত্রও নষ্ট হয় নি। ওরা আসতে চায় আসুক না—এলেই তো কিছু আর ওরা জিতে যাচ্ছে না। আমরা একটা চেষ্টা করে দেখি অন্তত।' বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করেন গুজর খাঁ

'যা পারেন আপনারা করুন। আমি পারব না গুজর খাঁ—অন্তত এখন পারব না। আমাকে মাপ করুন।···এ আপনি বুঝবেন না—আমি এখনই গৌড়ে ফিরে যেতে চাই।···না, না—আমি বরং উড়িষ্যায় চলে যাই সোজা—কী করব জানি না, যেতে যেতে ভাবব।'

পাগলের মত উঠে দাঁড়ান সুলতান।

টলতে টলতে এসে জড়িয়ে ধরেন শ্রীহরিকে: 'তুমি আমার একটা উপায় করে দাও শ্রীহরি, এখানে আর একদণ্ড থাকলেও আমি পাগল হয়ে যাব—'

গুজর খাঁ আরক্ত-নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকেন। কতলু লোহানী প্রশ্ন করেন, 'এখানের কী ব্যবস্থা হবে তা হলে? আপনি পালিয়েছেন শুনলে কি আর কেউ যুদ্ধ করবে?'

'জানি না। আমি কিছু জানি না, জাহান্নামে যাক সব। শ্রীহরি, চল আমরা যাই—'

শ্রীহরি কী একটা বলতে চেষ্টা করেন—কিন্তু সে অবসর মেলে না। পাগলের মত টানতে থাকেন দায়ুদ তাঁকে।

যেতে যেতে আর একবার পিছন ফিরে গঙ্গার দিকে তাকান সুলতান।

অগ্নিশিখা তখনও ঊর্ধ্বোন্মুখ। সহস্র শিখা বিস্তার করে নাচছে সে আগুন।

সেই বিপুল বহ্নিশিখায় কী দেখলেন সুলতান? দেখলেন কি দুঃস্বপ্নে দেখা বিশ্বাস-অবিশ্বাসে রচিত কোন অশরীরী নারীমূর্তি?

আবারও বিকট আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি।

তারপর ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে—শ্রীহরিকে টানতে টানতে।

*   *   *   *

আকবরও সারারাত বাইরে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

কিন্তু তাঁর দৃষ্টি আগুনের দিকে তত ছিল না। আগুনের রক্তিমাভা-প্রতিফলিত পাটনার দিকেই চেয়ে ছিলেন তিনি উৎসুক হয়ে।

হয়তো অপর পারে দণ্ডায়মান ভীত, হত-চকিত, স্তম্ভিত, স্তব্ধ জনতা

ছাড়া আরও কিছু নজরে পড়েছিল তাঁর, হয়তো পড়ে নি।...

হয়তো দূরভবিষ্যতেরও খানিকটা দেখতে পেয়েছিলেন তিনি।

এই আলোয় নিজের সৌভাগ্যসূর্যেরই অরুণাভা দেখেছিলেন।...

সকালের আলো ফুটে ওঠবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মুনিম খাঁ এসে দাঁড়ালেন।

মুঘল পক্ষের অশীতিপর বৃদ্ধ সেনাপতি মুনিম খাঁ। খান-ই-খানান্‌।

'কী খবর, খাঁ সাহেব ?'

'আজব কাণ্ড জাঁহাপনা। দায়ুদ কররাণী কাল রাত্রেই কয়েকটা নৌকো করে পাটনা ছেড়ে পূব দিকে পালিয়েছে। সে চলে যেতে তার সেনাপতিদেরও মন ভেঙে গেছে, তারাও নাকি এখন পালাবার আয়োজন করছে। কিছুই প্রায় নিয়ে যেতে পারে নি দায়ুদ কররাণী—সমস্তই পড়ে আছে পাটনায়। হাতী, ঘোড়া, হাতিয়ার, টাকা, রসদ, কামান—সব। শুধু কিছু লোক নিয়েছিল সঙ্গে—তা-ও ভয়ে তাড়াহুড়োতে আগে বেড়ে যেতে গিয়ে নিজেদের মধ্যেই ধাক্কাধাক্কি হয়ে কয়েকটা নৌকো ডুবেছে, তার ফলে বহু লোক নদীতে ডুবে মারা গেছে।

এক নিঃশ্বাসে এতগুলি সংবাদ দিয়ে, বোধ করি বা বাহবার আশাতেই বাদশার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন মুনিম খাঁ।

বাহবার লোভ কিন্তু বাদশারও কম ছিল না।

তিনি বিজয়গর্বদীপ্ত চোখে মুনিম খাঁর দিকে চেয়ে বললেন, 'তা হলে সেনাপতি মুনিম খাঁ, কাল আমার হুকুমটা শুনে যতটা নির্বোধ, যতটা উন্মাদ ভাবছিলেন আমাকে, এখন দেখা যাচ্ছে ততটা নির্বোধ বা বাতুল আমি নই—কী বলেন ?'

মুনিম খাঁ মাথা নত করেন।

নিজের তাঁবুতে ফিরে এসে আকবর শা গত সন্ধ্যার বন্দিনীকে তলব করলেন।

নফিসা বিবি এসে দাঁড়াতে ইঙ্গিতে রক্ষীদের সরিয়ে দিলেন বাদশা, তারপর নিজে বন্দিনীর সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'নফিসা বেগম, তুমি মুক্ত। কিন্তু মুক্তি ছাড়া কিছু পুরস্কারও দিতে চাই। বল, কী চাও তুমি ?'

'পুরস্কার ?'

বিচিত্র হাসি ফুটে ওঠে নফিসার মুখে, 'না শাহানশাহ, আর কোন পুরস্কারেই আমার প্রয়োজন নেই। যা চেয়েছিলাম তা পেয়েছি। হাজীপুরের কিলাই তো আমাকে বকশিশ করেছেন জনাব।'

আকবর চুপ করে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন খানিকটা।

কী অপরিসীম বেদনার ইতিহাস না ফুটে উঠল ঐ ম্লান হাসিতে! কী নিবিড় নিঃসীম প্রেমের ইতিহাস প্রকাশিত হল ঐ কাজলকালো চোখ দুটির সকরুণ চাহনিতে!

সে দিকে চেয়ে বাদশার দৃষ্টি কি বারেক উৎসুক, বাসনার্ত হয়ে উঠল ?

হলেও তাঁর কথায় তা প্রকাশ পেল না, শুধু ধীরে ধীরে বললেন, 'তুমি প্রবীণ লুদী খাঁকে যে ভালবাসা দিয়েছ, তার কিছুও আমি পেলে ধন্য হয়ে যেতাম নফিসা।'

এ কথার উত্তর দিতে গিয়ে নফিসার ঠোঁট দুটি শব্দ প্রকাশের ব্যর্থ প্রয়াসে প্রথমটা কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাঁপল শুধু, তারপর মাটির দিকে তাকিয়ে কোন মতে সে বলল, 'মালিককে মনের সবটাই নিঃশেষে দিয়ে না দিলে আপনার সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করে আমিও কৃতার্থ হতাম জাহাঁপনা।'

॥ ৯ ॥

ইতিহাসে লেখা আছে—১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই অগস্ট আকবর শাহ মাত্র কয়েক ঘণ্টা যুদ্ধের পরই হাজীপুর কিলা দখল করেন এবং শত্রুপক্ষকে ভয় দেখানোর জন্য তাতে আগুন ধরিয়ে দেন।

সেই আগুন দেখে সত্যিই ভয় পেয়েছিলেন দায়ুদ কররাণী। বিষম ভয়। নিজের পরিণতি সম্বন্ধে একেবারেই হতাশ হয়ে পড়ে সেই রাত্রেই নৌকায় চেপে বাংলা দেশের দিকে পালিয়েছিলেন তিনি। একে অন্ধকার রাত, তায় ভরাবর্ষার পরিপূর্ণ খরস্রোতা গঙ্গা—তারই মাঝে দ্রুত পালাতে গিয়ে বেচারীর কত অনুচর যে নদীতে পড়ে প্রাণ হারাল তার ইয়ত্তা নেই।

গুজর খাঁ কি কতলু লোহানীও আর যুদ্ধের চেষ্টা করেন নি। তাঁরা পালিয়েছিলেন স্থলপথে। কিন্তু কিছুই প্রায় সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন নি। পরের দিন আকবর বাদশা যখন পাটনার শূন্য কিলায় প্রবেশ করলেন তখন বিপুল অর্থ, অসংখ্য হাতী, কামান ও যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম সেখানে পড়ে আছে—অথচ একটি আফগানও নেই তা রক্ষা করার জন্য.…

তারপর সুরজগড়, মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগাঁও ; একটির পর একটি দখল করল মুঘল-বাহিনী। দায়ুদ তেলিয়াগড়ি গিরিবর্ত্মের কাছে একবার শেষ চেষ্টা করেছিলেন যুদ্ধ দেবার। কিন্তু শত্রু যখন সত্যিই সামনে ও পিছনে এসে পড়ল তখন তিনি আবারও পালালেন—বিনাযুদ্ধে। হয়তো অজ্ঞাত কোন আতঙ্কেই।

বলতে গেলে হেঁটে যেতে যেটুকু দেরি। ২৫শে সেপ্টেম্বর মুঘল-বাহিনী কররাণীদের রাজধানী টান্ডায় প্রবেশ করল। দায়ুদ বাংলার আশা ছেড়ে উড়িষ্যার দিকে পালিয়ে গেলেন।

ইতিহাস শুধু ঘটনাটা বলে চুপ করে গেছে। আজও তার কারণটা দিতে পারে নি। ঐতিহাসিকদের দৌড় যে-সব বিবর্ণ ধূলিমলিন পুঁথিপত্র পর্যন্ত

—সেখানে কারণটা লেখা নেই।

বিস্ময়—হ্যাঁ, বিস্ময়ের কথা বৈকি।

সুলেমান কররাণীর অযোগ্য পুত্র দায়ুদ। দায়ুদ মদ্যপ, লম্পট, হঠকারী, অত্যাচারী, ক্রোধী, নির্বোধ; কিন্তু দায়ুদ কাপুরুষ, দায়ুদ অস্ত্র ধরতে ভয় পান, এমন কথা কেউ বলে নি কখনও। অথচ সেই দায়ুদই—নিজের বিপুল এবং তখনও-পর্যন্ত-অপরাজেয় বাহিনী নিয়ে নিজের অধিকারে সুরক্ষিত অবস্থায় বসে, তখনও তাঁর পক্ষের একটি লোকও মরে নি বা একটি হাতিয়ারও ব্যবহার করতে হয়নি, তবু—শুধু গঙ্গার অপর পারে একটিমাত্র অগ্নিকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেই—ভয়ে আতঙ্কে অমন দিশাহারা হয়ে পালাবেন কেন? একেবারে বিনাযুদ্ধে, শত্রুর দিক থেকে আক্রমণের কোন আভাস পাবার আগেই?

কথাটা অবিশ্বাস্য বলেই মনে হয়।

আজ নয় শুধু, সেদিনও অবিশ্বাস্য ঠেকেছিল অনেকের কাছেই।

দায়ুদ কররাণীর বাপের আমলের সেনানায়ক গুজর খাঁ, কতলু লোহানী—এঁদের কাছেও।

চলন্ত পাহাড়ের মত সুশিক্ষিত হস্তিযূথ—যা তখনও পর্যন্ত ভারতে অদ্বিতীয়, অসংখ্য বীর পাঠান-সৈন্য, দুর্ধর্ষ সেনাপতি, পরিখা-বেষ্টিত দুর্গ; এক কথায় অবস্থা সেদিন সবই ছিল দায়ুদের অনুকূলে। তবু—বিনাযুদ্ধে শুধু নয়, যুদ্ধের চেষ্টামাত্র, যুদ্ধের কথা চিন্তামাত্র না করে—কেন যে দায়ুদ সেই মধ্যরাত্রে, কী এক অজ্ঞাত অবর্ণনীয় ত্রাসে অমন করে পালালেন, এবং পালাতে গিয়ে তাড়াহুড়োয় বহু বিশ্বস্ত অনুচর, এমন কি প্রিয় স্বজনও হারালেন—সে কথা আজও যেমন কেউ জানে না, সেদিনও তেমনি কেউ জানত না।

সে অদ্ভুত আচরণের কারণ সেদিন ওঁরাও জানতে পারেন নি—গুজর খাঁ, কতলু খাঁর দলও।

সে আচরণ সেদিনও যেমন দুর্জ্ঞেয় ছিল, আজও তেমনি আছে।

যেমন আছে মুঘল-সম্রাট আকবর বাদশার আচরণও।

তিনিও যে কেন সেদিন, অত কাণ্ড অত আয়াসের পর, বহু-কষ্টে-অধিকৃত হাজীপুর কিলায় আগুন ধরিয়ে দিলেন, এবং দিলেন সেই দিনই মধ্যরাত্রে—তা কেউ জানতে পারে নি। সে দিনও না—আজও না।

বিস্মিত হয়েছিলেন সকলেই, এমন কি অশীতিপর বয়স্ক রণকুশলী রাজনীতিজ্ঞ সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খাঁ পর্যন্ত। তরুণ মনিবকে তিনি সেদিন প্রথমটা অপ্রকৃতিস্থই সন্দেহ করেছিলেন। এমন কি তারপরও—যখন সত্যসত্যই নিজের চোখে দেখলেন দায়ুদ খাঁকে অমন উদ্‌ভ্রান্তের মত পালাতে, পালাতে গিয়ে একেবারে সর্বস্বান্ত হতে, তখনও—হাজীপুর কিলায় আগুন ধরাবার জন্যই যে দায়ুদ খাঁ অত ভয় পেয়েছিলেন, আর ভয় পাবেন জেনেই যে আকবর ঐ অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন করেছিলেন—এটা কিছুতেই

মানতে চান নি—কাকতালীয়বৎ বলেই উড়িয়ে দিয়েছিলেম কথাটা। আর সেই জন্যই আসল কারণটা জানতে তাঁর কৌতূহলের শেষ ছিল না—শেষ দিন পর্যন্ত তিনি তার জন্য সমান উৎসুক, ব্যগ্র ছিলেন।...

সে কথা ইতিহাসে লেখা নেই।

বহু ঘটনার ঘূর্ণিবাত্যায়, বহু যুদ্ধবিগ্রহের রক্তবন্যায়, মুঘল-পাঠান-বর্গী-পর্তুগীজ-ফরাসীস-ইংরেজ—বহুলক্ষ সওয়ারের বহুলক্ষ অশ্বক্ষুরে উৎক্ষিপ্ত ধূলিরাশিতে সে সামান্য, বিস্মৃতির-বাতাসে-উড়ে-যাওয়া ইতিহাসের পাতাটুকু কবেই বিবর্ণ হতে হতে একেবারে বর্ণহীন হয়ে কোথায় চাপা পড়ে গেছে—ইতিহাসের ছাত্র বা গবেষক কারুরই চোখে পড়ে নি তাই।

* * * *

দায়ুদ কররাণী সে-রাত্রে এমনই ভয় পেয়েছিলেন যে আকবরের বাহিনী এবং তাঁর মধ্যে দূরত্বের বিপুল ব্যবধান রচিত হবার আগে আর থামতে সাহস করেন নি। পালাতে পালাতে বহু শহর বা জনপদ শুধু নয়, আশ্রয় নেবার মত বহু সুরক্ষিত স্থানও ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। আসল কথা, ভয়ে দিশা-হারা হয়েছিলেন তিনি—তাই কোনদিকে ফিরে তাকাতে পারেন নি। কেবলই পালিয়েছেন আর পালিয়েছেন। চল, চল—দূরে কোথাও, আরও দূরে, আরও দূর কোন নিরাপদ স্থানে। থেমো না, থেমো না—এখানে নয়—এখনও নয়।

এমনি করেই একে একে মুঙ্গের, ভাগলপুর, কহলগাঁও বিনা যুদ্ধে, বিনা বাধায় মুঘলদের হাতে ছেড়ে দিয়ে গেলেন দায়ুদ খাঁ। তিনি ঘুরে দাঁড়াবার কথা চিন্তা করলেন একেবারে রাজমহলের পাহাড় ডিঙিয়ে তেলিয়াগাঢ়ি গিরিপথ পার হয়ে গুরুন্দায় পৌঁছে। ওখানকার বিস্তীর্ণ প্রান্তরে পড়ে প্রথম বলতে গেলে থমকে দাঁড়ালেন তিনি—প্রথম নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করলেন একটু।

নিজের অবস্থার দিকেও তাকালেন একবার—বোধ করি এই প্রথম অবসর মিলল।

এমনি করে পালাতে পালাতে বহু ক্ষতি হয়েছে তাঁর—বহু সৈন্য পথশ্রমে বা পথকষ্ট-জনিত রোগে মারা গেছে, বহু সেনা ও সেনানায়ক সর্দার তাঁকে ত্যাগ করে গেছে—তাঁর সম্বন্ধে হতাশ হয়ে ভাগ্যান্বেষণেই অন্যত্র গেছে তারা—এমন কী তাঁর নিজের স্বজনও অনেককে হারিয়েছেন ইতিমধ্যে। আর্থিক ক্ষতি যে কত হয়েছে তা বোধ করি হিসাবেও আসে না। টাকাকড়ি, অস্ত্র-শস্ত্র, হাতী-ঘোড়া, তাঁবু, রসদ—আরও কত কী! একটা খুব বড় যুদ্ধেও এত ক্ষয়-ক্ষতি হত কিনা সন্দেহ।

তবু—এখনও যা আছে, হয়তো ফিরে দাঁড়ানো যায়। এখনও ভালমত একটা জায়গা বেছে নিয়ে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াতে পারলে—যুদ্ধ একটা দেওয়া যায়। আর কিছুদিন পরে সে অবস্থাও থাকবে না হয়তো। এখনই যেন সকলকার মনোবল ভেঙে এসেছে; আজও যারা তাঁর চার পাশে আছে, তাদের কেউই হয়তো থাকবে না দুদিন পরে। শ্রীহরি গুহ বহুদিন থেকেই বিদায়

চাইছেন, কতলু লোহানী উড়িষ্যায় গিয়ে নিজের স্বতন্ত্র ঘাঁটি বা রাজ্যখন্ড গড়ে তোলবার জন্য উন্মুখ, গুজর খাঁও ছটফট করছেন। সাধারণ সেনা-নায়করাও কেউ আর এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভরসায় থাকতে রাজী নয়।

দায়ুদ ভয় পেয়েছিলেন ঠিকই—কিন্তু সেটা আকস্মিক ভয়। আর আকস্মিক বলেই অমন বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। তা নইলে তিনি সত্যিই কাপুরুষ নন।

তিনি মন স্থির করে ফেললেন। যুদ্ধই করবেন তিনি এবার।

শত্রুর সঙ্গে—এবং ভাগ্যের সঙ্গেও—মুখোমুখি দাঁড়াবেন।

মরতে হয় মরবেন, এমন করে মার খেয়ে ছুটে বেড়াতে রাজী নন তিনি। এ হীনতা মৃত্যুর অধিক।

এবং শেষ পর্যন্ত যদি যুদ্ধই দিতে হয় তো এমন জায়গা আর কোথায় পাবেন? প্রকৃতিই এখানে যেন ব্যূহ-রচনার অর্ধেক ভার নিয়েছেন নিজের হাতে—নিজের হাতে প্রাচীর রচনা করে রেখেছেন। সামনে দুর্লঙ্ঘ্য পাহাড়, শত্রুকে আসতে হলে সংকীর্ণ গিরিপথে আসতে হবে—একে একে, অল্পে অল্পে। সে তার সম্পূর্ণ শক্তি নিয়ে আক্রমণ করতে পারবে না। আর অল্পে এলে অল্পেই বিনষ্ট হবে—বেশী কোন আয়াসের বা ভয়ংকর যুদ্ধ করার প্রয়োজন হবে না।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই দায়ুদ কাজ শুরু করে দিলেন।

সেনানায়কদের নিয়ে মন্ত্রণা করতে বসলেন। গুজর খাঁ, কতলু লোহানী, কালাপাহাড়, ইয়ার বেগ—সকলকে ডেকে পাঠিয়ে তাদের বুদ্ধি চাইলেন, কিন্তু দেখা গেল তাঁর নিজের বুদ্ধিও এ বিষয়ে একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয়—কারণ তাঁর নকশা তাঁর নির্দেশই সকলে অনুমোদন করতে বাধ্য হলেন।

দায়ুদ খাঁ যতই হোক সুলেমান কররাণীর ছেলে—যুদ্ধ তাঁর রক্তেই আছে।

সেনানায়করা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। যুদ্ধ ক'রে জয়-পরাজয় যাহোক একটা কিছু নিষ্পত্তি হওয়ার অর্থ বোঝেন তারা—বিনাযুদ্ধে পালিয়ে বেড়ানোর অপমান যে অসহ্য।

ঠিক হ'ল এইখানেই পরিখা কেটে, মাটির গড় তুলে তাঁরা অপেক্ষা করবেন শত্রুর।

॥ ১০ ॥

খান-ই-খানান মুনিম খাঁর কানে যথাসময়েই খবরটা পেঁছিল।

তিনি চিন্তিত বোধ করলেন।

পাঠান-সৈন্যরা এমনিতেই উপেক্ষা করার মত শত্রু নয়—তার ওপর এখানে সমস্ত রকম প্রাকৃতিক সুযোগ ওদের দিকে।

তিনি তাঁর অধস্তন সেনানায়কদের ডেকে পাঠালেন। মন্ত্রণাসভাও বসল—কিন্তু তারাও কোন সুপরামর্শ দিতে পারলে না। বরং, তাদের কথাবার্তা শুনে মুনিম খাঁর মনে হ'ল, তারা অনেকেই ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার পক্ষপাতী। নিতান্ত চক্ষুলজ্জাতেই মুখ ফুটে বলতে পারছে না কথাটা।

মুনিম খাঁর নিজেরও যে সে প্রস্তাবে খুব বেশী আপত্তি ছিল তা নয়—কিন্তু এই ক'বছরেই তিনি তাঁর তরুণ মনিবটিকে হাড়ে-হাড়ে চিনেছেন। আকবর শার ভ্রূকুটি ও বিরক্তির সম্মুখীন হওয়ার চেয়ে আফগান সর্দারদের বর্শার সামনে দাঁড়ানো অনেক সহজ।

সুতরাং সমস্যাটা পূর্বেও যা ছিল, এত সলা-পরামর্শের পর এখনও তাই রইল। বরং মুনিম খাঁ আরও চিন্তাকুল, আরও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে উঠলেন।

এই ভাবেই যখন নিষ্ক্রিয় ও একান্ত অনভিপ্রেত আলস্যে দিন কাটছে—হঠাৎ একদিন মুনিম খাঁর বড় তাঁবুর প্রবেশ-পথে এক বিচিত্র পসারিনী এসে দাঁড়াল।

তরুণী পসারিনী। সুশ্রী, এমন কি সুন্দরীও বলা যেত—যদি না অতিরিক্ত খোলা জায়গায় বাস বা অনবগুণ্ঠিত অবস্থায় সূর্যকিরণে ঘোরাফেরা করার জন্য তার দুগ্ধশুভ্র কান্তিতে ঈষৎ তাম্রাভ ছোপ লাগত, আর মুখের পুষ্পপেলব সুকুমার ত্বকে সামান্য একটু কাঠিন্যের আভাস জাগত।

বিচিত্র সে পসারিনী। রূপ এবং যৌবন—দুটোরই প্রাচুর্য সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ সজাগ ও সচেতন। আর সেই অমোঘ ও অব্যর্থ অস্ত্রেই পথ কেটে কেটে মুঘল-শিবিরের প্রান্ত থেকে এই মধ্যবিন্দুতে এসে পৌঁছেছে। তা নইলে অপরিচিতার গতিবিধি সন্দেহ জাগাবারই কথা রক্ষী ও প্রহরীদের মনে। কিন্তু অমন সুরূপা তন্বী তরুণী মেয়েকে অবিশ্বাস করতে কারই বা মন চায়! কাজল-কালো চোখের মিনতি, রক্তগোলাপের পাপড়ির মত ওষ্ঠাধরের প্রান্তে করুণ-মধুর হাসিই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ছাড়পত্র। আর সেই ছাড়পত্রের জোরেই এসে পৌঁছেছে সে।

কিন্তু তাই বলে তার গায়ে কাউকে হাত দিতে দেয় নি সে-মেয়ে। কোমরে গোঁজা বাঁকা কিরীচ একটা ছিল ঠিকই, কিন্তু তাও খুলতে হয় নি—শুধু তার বঙ্কিম ভ্রূর কুঞ্চনে এবং অপূর্ব গ্রীবার অনবদ্য অবর্ণনীয় ভঙ্গীতে বুঝিয়ে দিয়েছে যে, সে যেটুকু সুষমা তার রূপে কটাক্ষে এবং মিষ্টহাসিতে বিতরণ করে যাচ্ছে, তার চেয়ে বেশী কিছু যেন কেউ প্রত্যাশা না করে। বেশী দিল্লাগি বরদাস্ত করতে রাজী নয় সে। একবার সান্ত্রীদের একজন সর্দার একটু বেশী সাহস প্রকাশ ক'রে ফেলাতে সে মুখেও বলেছিল, 'দ্যাখো খাঁ-সাহেব, আমরা পাহাড়ী মেয়ে, যা দিই তা স্বেচ্ছায় দিই। জোর ক'রে কিছু আদায় করতে পারবে না আমাদের কাছ থেকে!'

'কেন—বাধা কী? তোমার জোর আমাদের চেয়ে বেশী, এমন ধারণাই বা তোমার হল কেন? তোমার ঐ ছোট্ট কিরীচের চেয়ে আমার তলোয়ারের

খায় আর তার দুই-ই বেশী, এটা মানো তো ?'

'কিন্তু খাঁ-সাহেব, তোমার ঐ তলোয়ার খাপ থেকে বেরোবার অনেক আগেই আমার এই কিরীচ তোমার বুকে গিয়ে ঢুকবে—এটা তোমার জানা নেই, তাই জোরটা কোথায় খুঁজে পাচ্ছ না।'

এই ব'লে একটু মুচকি হেসে, সত্যিই সর্দারের চোখের পলক পড়বার মধ্যেই এক আশ্চর্য কৌশলে কিরীচখানা খুলে ছুঁড়ে দিল সামনের পাহাড়ী-শালের একটা বড় খুঁটিতে—সেটা প্রায় অর্ধেকটা পর্যন্ত কাঠে বিঁধে আটকে রইল। এবং বিস্মিত বিহ্বল খাঁ-সাহেব আর-একবার পলক ফেলতে না ফেলতেই প্রায় নিঃশব্দ লঘুপদে অথচ বিদ্যুৎগতিতে ছুটে গিয়ে কিরীচখানা খুলে নিয়ে আবার অতি সহজে নিজের কোমরে গুঁজে একটু মুচকি হেসে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা নত ক'রে বলল, 'দেখলে খাঁ-সাহেব ? ঐ খুঁটির বদলে তোমার বুকে বিঁধলেও তুমি বুঝতে পারতে না—মানে, বুঝতে বুঝতে কাজ শেষ হয়ে যেত। আর শুকনো শাল বলে অর্ধেকটা বিঁধে ছিল, তোমার ঐ খাসি-ঘি-দুধ-খাওয়া বুকে সবটাই বিঁধত—হয়ত হাতল-সুদ্ধ।'

বিস্ময়ের ধাক্কাটা সামলাতে খাঁ-সাহেবের একটু সময় লাগল, তিনি ঢোক গিললেন একবার—কিন্তু তবু অত সহজে হাল ছাড়লেন না। হেসে বললেন, 'তা না হয় স্বেচ্ছাতেই কিছু দিয়ে যাও বিবি, ধর আমি তোমার দোরে ভিক্ষার্থী।'

'খাঁ-সাহেব, পাহাড়ী মেয়ের মনের গতি পাহাড়ী নদীর মতই—তার বেগ সামলানো সকলের কাজ নয়। সে বেগে পাহাড়-পাথর ভেঙে চুর হয়ে যায়, মানুষ তো কোন্ ছার! আমার আশা এবারের মত ছেড়েই দাও সাহেব।'

সে আবার মুচকি হেসে, আবারও সেলামের ভঙ্গীতে মাথাটা একটু হেলিয়ে চোখের নিমেষে মায়া-কুরঙ্গীর মতই অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। খাঁ-সাহেব বাধা দেবার কথাটা ভাবতেও পারেন নি।

কিন্তু সর্বত্র সব বাধা অনায়াসে লঙ্ঘন করে এলেও স্বয়ং মুনিম খাঁর দোরে পৌঁছে পসারিনী সত্যিকারের বাধা পেল। আনওয়ার খাঁ বহুদিনের বিশ্বাসী লোক—মুনিম খাঁর দীর্ঘজীবনের অনেকখানিরই খবরদারী করে এসেছে সে। বয়স তারও সত্তরের কাছাকাছি, কিন্তু এখনও সে দুটো তেজী আরবী ঘোড়ার রাশ এক হাতে টেনে রাখতে পারে। তা ছাড়া আনওয়ার খাঁর আর-একটি মহৎ গুণ—নারী-কটাক্ষ সম্বন্ধে তার কোন দুর্বলতা নেই, বিদ্বেষী নয়—বিদ্বেষ বরং জয় করা যায়—সম্পূর্ণ উদাসীন সে। বিবাহ করে নি, অন্য কোন রকমেও তার কোন ঘনিষ্ঠতা নেই কোন মেয়ের সঙ্গে। কতকটা সেই কারণেই মুনিম খাঁ তাকে বরাবর নিজের তাঁবু পাহারা দেবার ভার দিয়ে রাখেন। পৃথিবীতে পুরুষের কাছে অন্তত—সব প্রলোভনের বড় প্রলোভন কোন্‌টি—এ অভিজ্ঞতাটা খান-ই-খানানের এই আশি বছরের জীবনে ভাল ক'রেই হয়েছে।

সুতরাং আনওয়ার খাঁকে কিছুতেই বিচলিত করা গেল না। না সে

পসারিনীর করুণ-মধুর হাসিতে, না তার কণ্ঠের অশ্রুঝরা মিনতিতে, আর না বিদ্যুৎভরা কোপকটাক্ষে—কিছুতেই যখন কিছু হল না, তখন সত্যি-সত্যিই কেঁদে ফেলল মেয়েটি। কিন্তু তাতেও যে বিশেষ কাজ হবে বলে মনে মনে কোন ভরসা পেল না।

অথচ এমন কোন কঠিন প্রার্থনা নয় তার। সে একবার শুধু নিভৃতে দেখা করতে চায় খান-ই-খানানের সঙ্গে।

আর আনওয়ার খাঁর তাতেই ঘোরতর আপত্তি।

নিভৃতে দেখা হওয়া অসম্ভব। এমনিও, আদৌ দেখা করতে দেওয়া হবে কিনা, সেটা আনওয়ার খাঁ ঠিক করবে প্রয়োজনের গুরুত্ব বুঝে। কী ওর প্রয়োজন খুলে বলুক, তারপর সে বিবেচনা ক'রে দেখবে—মনিবের সামনে নিয়ে যাওয়ার মত গুরুতর কোন ব্যাপার কি না!

শুধু আনোয়ার খাঁ-ই নয়, তার চারপাশে আরও কয়েকটি সশস্ত্র প্রহরী। তীর ধনুক বর্শা—মায় নতুন-আমদানী বন্দুকও আছে তাদের কাছে। ওর সম্বল বলতে তো ঐ কিরীচ একখানি। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মেয়েটি বলল, 'আচ্ছা, তোমরা কেউ একজন গিয়ে মালিককে একটিবার বলই না যে, এমনি একটি মেয়ে তাঁর সঙ্গে একটু নিভৃতে দেখা করতে চায়। ভরসা না হয়—আমাকে নিরস্ত্র ক'রে হাত দুটো পিছমোড়া ক'রে বেঁধেই নিয়ে চল না তোমরা—তা হলে তো আর কোন অনিষ্ট করতে পারব না—ইচ্ছে থাকলেও। এতে এত ভয়ের কী আছে?'

'ভয়ের কথাই হচ্ছে না,' রূঢ়কণ্ঠে বলল আনওয়ার খাঁ, 'তোমার মত হরেক বাউরা লোক যদি এসে এমনি আজব আজব বাহানা করে—আর আমরা সেই কথা মালিককে শোনাতে যাই তো তিনি বলবেন কী? বলবেন, এমনি বিরক্ত হবার জন্যেই কি তোমাদের তন্‌খা দিই? না, আমরা এ কথা তাঁকে শোনাতে পারব না।'

পসারিনী বুঝল—তার তূণের সব অস্ত্রই এখানে নিষ্ফল হবে—কোনটাই কাজে লাগবে না। এর বাইরেটা মানুষের মত হলেও, ভেতরটা একেবারে পাথর। এখানে কিছু সুবিধা হবার আশা নেই।

সে অনেকক্ষণ সেইখানেই নিঃশব্দে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর আর-একটি ছোট নিঃশ্বাস ফেলে সরে এল সেখান থেকে।

অনির্দেশ্য তার পথ। কোন্‌ পথে কোথায় যাবে কে জানে! কতকটা লক্ষ্যহীন ভাবেই চলতে চলতে অসংখ্য তাঁবুর মধ্যেকার আঁকা-বাঁকা পথে এক-সময় আবার অদৃশ্য হয়ে গেল সে।...

আনওয়ার খাঁ আতর-মাখানো গোঁফে 'তা' দিয়ে নিল একবার।

॥ ১১ ॥

সেইদিনই সন্ধ্যার কিছু আগে মুনিম খাঁ, কতকটা যেন সমস্ত ব্যাপারের ওপর বিরক্ত হয়েই, হঠাৎ ঘোড়ায় চেপে বেরিয়ে পড়লেন।

আশি বছর বয়স, কিন্তু এখনও তাঁর মত অশ্বারোহী এ অঞ্চলে কেউ নেই—তা তিনিও জানেন। ঘোড়ার ওপর সওয়ার হলে এখনও তাঁর রক্তে যেন যৌবনের আমেজ লাগে, সব চিন্তা বিরক্তি ক্লান্তি মুছে যায় মন থেকে। আসলে সেই কারণেই বেরিয়ে পড়লেন তিনি, নইলে বেড়াতে যাবার অভ্যাস তাঁর নেই।

দেহরক্ষীরা সকলেই প্রস্তুত ছিল—কিন্তু সঙ্গে নিলেন মাত্র চারজনকে। বললেন, 'হাঙ্গামা করবার দরকার নেই, এই গঙ্গার দিকটা একটু ঘুরে আসব শুধু। আমাদের শিবিরের মধ্যে দিয়েই তো যাব—এত হৈ-চৈ করার কী আছে? অমনি আমাদের লোকজন কেমন ভাবে আছে সেটাও দেখে আসা হবে। একটু চুপি-চুপি না বেরোলে সে কাজটা সারা হবে না। বেশী লোক নিলেই হৈ-চৈ—সকলে হুঁশিয়ার হয়ে যাবে।'

সার সার তাঁবু—ছোট বড় মাঝারি। তার ফাঁকে ফাঁকে বড় ছোট মাঝারি নানা গাছ। পথ গিয়েছে এরই ভেতরে ভেতরে ঘুরে ঘুরে। মুনিম খাঁ খানিকটা দমক-চালে চলতে চলতে বিরক্ত হয়ে অপেক্ষাকৃত একটা সরল রেখা পেয়ে বেরিয়ে এসে পড়লেন একেবারে নদীর দিকের প্রান্তে। এখানটা এখনও অনেক ফাঁকা আছে, সেনারা মাঠেই পড়ে থাকে—এত লোকের জন্য তাঁবু রাখা যায় না। কিছু কিছু ঝোপড়ার মত বাঁধা রয়েছে পাতা-লতা দিয়ে, কিন্তু সে খুব বেশী নয়। ফাঁকা জায়গায় পড়ে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন মুনিম খাঁ।

কিন্তু খানিকটা গিয়েই তাঁর নজরে পড়ল দূরে এক জায়গায় বহুলোক জড়ো হয়েছে—বেশ জমাট ভীড়।

তখন দিনের আলো আর বিশেষ নেই, ইতিমধ্যেই বেশ গাঢ় অন্ধকার নেমেছে ঘনপল্লব আমগাছগুলোর শাখাপ্রশাখায়—তার বাইরেও আবছা আবছা দেখা যায় মাত্র, ভাল ক'রে কিছু নজরে পড়ে না।

'কী ব্যাপার ওখানে দেখে এস তো কেউ। দিলাওয়ার খাঁ, তুমি যাও।'

থমকে দাঁড়িয়ে আদেশ দিলেন মুনিম খাঁ।

দিলাওয়ার খাঁ ঘোড়া ছুটিয়ে বেরিয়ে গেল।

কদর আলি বলে আর একজন সঙ্গী বলল, 'বোধ হয় কেউ কিছু তামাশা-টামাশা দেখাচ্ছে জনাবালি, দেখছেন না এরই মধ্যে ওরা মাঝখানটায় চার-চারটে মশাল জেলেছে।'

কাছের দৃষ্টি কিছু আচ্ছন্ন হলেও দূরের দৃষ্টি এখন মুনিম খাঁর খুব পরিষ্কার। তিনি ঘাড়টা উঁচু করে দেখলেন কদর আলির কথাই ঠিক। ভ্রূ কুঁচকে বললেন, 'এসব তামাশা-ওয়ালাদের শিবিরে ঢুকতে দেয় কে?...এই করেই শিবিরের খবর বাইরে যায়। আসলে ওরা গুপ্তচর সব।'

দিলাওয়ার খাঁ ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন না তিনি—ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে গেলেন সেই দিকে।

খেলাটা নিশ্চয়ই খুব জমে উঠেছিল—এঁদের পায়ের আওয়াজ তাই কারুর কানে গেল না। তারা যেমন অখণ্ড মনোযোগে পরস্পরের সঙ্গে ঠেলাঠেলি ক'রে পরস্পরের কাঁধে ভর দিয়ে উঁকি মেরে দেখবার চেষ্টা করছিল তেমনিই দেখতে লাগল। ফিরে চাইল না বলেই স্বয়ং খান-ই-খানানের উপস্থিতিও কেউ টের পেল না, নইলে অবশ্য খেলা ভেঙে যেত তখনই।

মুনিম খাঁও নিজের উপস্থিতিটা তখনই জানিয়ে দেবার কোন চেষ্টা করলেন না বরং ইঙ্গিতে নিরস্তই করলেন অনুচরদের। ঘোড়ার ওপর থাকায়, ওঁদের দেখতে কোন অসুবিধা হ'ল না—মুনিম খাঁ বেশ খানিকটা দূর থেকেই স্পষ্ট দেখতে পেলেন।

গাছ আর খুঁটি মিলিয়ে চার কোণে চারটে মশাল জ্বালা হয়েছে, তারই মধ্যেকার অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত জায়গাতে নাচছে একটি মেয়ে।

কিন্তু—আর একটু ভাল করে দেখেই মুনিম খাঁ বুঝতে পারলেন—মেয়েটা শুধুই নাচছে না। সাধারণ নাচউলী নয় সে, ওরই মধ্যে কী সব খেলাও দেখাচ্ছে।

নিশ্চয়ই জাদুকরী বেদেনী।

অভ্যস্ত ও অভিজ্ঞ চোখ মুনিম খাঁর, সেই স্বল্পালোকেই চিনলেন, পূবদেশের পাহাড়ী মেয়ে—কিন্তু একেবারে খাঁটি ঐ দেশেরও নয়—ইরাণী রক্তও কিছু আছে ওর দেহে। তাই পশ্চিমের ত্রুটিহীন তীক্ষ্নতার সঙ্গে পূর্বের নমনীয় পেলবতা মিশে দুর্লভ শ্রী দান করেছে মেয়েটিকে। পরম রমণীয় শুধু নয়, একান্ত লোভনীয়ও সে। রূপসী, প্রাণচঞ্চলা, নৃত্য-নিপুণা, লাস্যময়ী নারীরত্ন।

মুনিম খাঁ সাধ্যমত আর একটু এগিয়ে গেলেন।

ছুরির খেলা দেখাচ্ছিল নর্তকী।

দু হাতে তিনখানা ছোরা নিয়ে খেলছিল সে। নাচতে নাচতেই খেলছিল, একটা ক'রে ছোরা সর্বদা শূন্যেই থাকছে—আর দু হাতে দুটো ক'রে ক্রমান্বয়ে লুপছে সে। আরও আশ্চর্য, ধরছে সে প্রত্যেকবারই ছোরার ডগাগুলো। ধারাল ছুরির ফলা মশালের আলোয় চক্‌চক্‌ ক'রে উঠছে—অর্থাৎ খেলাঘরের ছোরা নয় কোনটাই। ধরছে আর ছুঁড়ে দিচ্ছে—এত দ্রুত এত নিপুণতার সঙ্গে যে, দু হাতে তিনটে ছোরা লুফতে কোন অসুবিধাই হচ্ছে না। নির্ভুল হিসাবে একটা ঠিক শূন্যেই তার ভারসাম্য বজায় রেখে যাচ্ছে।

মুগ্ধবিস্ময়ে চেয়ে রইলেন মুনিম খাঁ।

যেমন হাতের কসরত, তেমনি সুঠাম দেহের হিল্লোল। সবটাই নিখুঁত ছন্দে বাঁধা যেন।

হাতও বন্ধ নেই—নাচও না।

কেমন ক'রে এ সম্ভব—চোখে দেখেও বুঝতে পারেন না তিনি। এ কি সাধারণ মানবী, না বেহেস্তের হুরী!

তিনি চোখে ঠিক দেখছেন তো?

এর ভেতরই, সানন্দ বিস্ময়ের আমেজ কাটতে-না-কাটতে, বখৎ খাঁ কানে কানে বলল, 'এই মেয়েটাই দুপুরবেলা গিয়ে আপনার তাঁবুর সামনে হল্লা করছিল, জনাব। বলে, আপনার সঙ্গে সে আড়ালে একলা দেখা করবে।'

'তারপর?' উত্তেজিত ভাবে মুনিম খাঁ ওর হাতটা চেপে ধরেন, 'কই, তোমরা কেউ বল নি তো সে-কথা!…বারও নি তো আমার কাছে।'

বখৎ খাঁ মনিবের এতটা আগ্রহ আশা করে নি। সে একটু ভয়ে-ভয়েই বললে, 'ওর কী দরকার কিছুতেই খুলে বলতে রাজী না হওয়ায় আনওয়ার খাঁ ওকে যেতে দেন নি—'

'আনওয়ার খাঁ পয়লা-নম্বরের বেঅকুফ্। আর তাকে এত মুরুব্বিয়ানা করতেই বা বলছে কে! কথাটা আমাকে জানালেও তো পারত।'

অত্যন্ত অপ্রসন্নমুখে বলেন মুনিম খাঁ। অনুপস্থিত আনওয়ার খাঁর অদৃষ্টে যা আছে তা তো আছেই—আপাতত নিজেদের উপস্থিতিটা গোপন করতে পারলে বেঁচে যেত বখ্ত খাঁ। কারণ মেয়েটিকে ফিরিয়ে দেবার সময় তারাও ছিল—এ কথাটা ওঁর মাথায় যেতে বেশী দেরি হবে না।

কিন্তু মুনিম খাঁ তাঁর বিরক্তির খেসারৎ আদায় করার বিশেষ সময় পেলেন না—ইতিমধ্যেই এক বিচিত্র ঘটনা ঘটল।

উপস্থিত দর্শকরা কেউ প্রধান সেনাপতির আগমন টের না পেলেও, নর্তকীর চোখে সেটা এড়ায় নি। সে প্রথম থেকেই ওঁদের লক্ষ্য করেছিল—এবং সম্ভবত চিনতেও পেরেছিল।

কিন্তু সামান্য মাত্র আভাসেও সে-কথা বুঝতে না দিয়ে অকস্মাৎ এক কাণ্ড ক'রে বসল সে, পলকের মধ্যে হাতের ভঙ্গী পালটে ছোরা তিনখানা শূন্যে না ছুঁড়ে মুনিম খাঁর দিকে লক্ষ্য ক'রে ছুঁড়ল।

কিন্তু আঘাতের উদ্দেশ্যে নয়, নৈপুণ্য দেখানোর জন্যই।

সুনিপুণ অভ্যস্ত হাতের অভ্রান্ত লক্ষ্য ভুল হ'ল না। সেই অগণিত দর্শকের মাথা ডিঙিয়ে সে-ছোরা নিমেষের মধ্যে মুনিম খাঁর দুই পাশ ও মাথার উপর দিয়ে পিছনের একটা আমগাছে গিয়ে বিঁধল।

মুনিম খাঁও টের পেলেন না ব্যাপারটা—চোখে দেখতে তো পেলেনই না, কারণ ঘটনাটা ঘটল এক লহমারও ভগ্নাংশকাল মধ্যে, চোখের তারার ওপর যতটুকু ছায়াপাত করলে দৃষ্টিতে পৌঁছয়, ততটুকুও রইল না তারা কোথাও। শুধু হাওয়া কাটাবার তিনটে শব্দে ও কানের ডগায় লাগা বাতাসের ঝাপটা অনুভব মাত্র করলেন, কী দুটো পদার্থ তাঁর কানের চামড়ার অতি নিকট

দিয়ে চলে গেল।

বেশ কয়েক লহমা সময় লাগল ব্যাপারটা বুঝতে।

ঘাড় ঘুরিয়ে ছোরাগুলো দেখে বুঝলেন।

ততক্ষণে নর্তকী আভূমি নত হয়ে অভিবাদন জানাচ্ছে।

হৈ-চৈ পড়ে গেল বইকি!

এটাকে গুপ্তচরের আক্রমণ মনে ক'রে মুনিম খাঁর দেহরক্ষীরাও শিউরে চিৎকার ক'রে উঠল—নিজেদের অজ্ঞাতেই। দিলাওয়ার খাঁ ভীড় সরিয়ে ছুটে যাবার চেষ্টা করল।

দর্শক সেনারাও ঘাড় ঘুরিয়ে দেখেছে, এবং চিনতে পেরেছে তাদের প্রধান সেনাপতিকে।

চারিদিকে হৈ-চৈ, ছুটোছুটি, ঠেলাঠেলি। প্রত্যেকেরই প্রত্যেককে পাশ কাটিয়ে চোখের আড়াল হবার চেষ্টা। কে জানে এই কাণ্ডর পর খান-ই-খানানের মেজাজ কোথায় ওঠে!

চেঁচামেচি গণ্ডগোলের অন্ত থাকে না।

কিন্তু মেয়েটি এতটুকু বিচলিত হয় না। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকে সে—হাসিমুখেই।

আর বিচলিত হন না মুনিম খাঁ।

তিনি ভুল বোঝেন নি। তাঁকে লক্ষ্য করাই উদ্দেশ্য হ'লে, সে লক্ষ্য ভেদ করতে যে মেয়েটির দেরি হ'ত না তা তিনি বুঝেছেন।

তিনি হাত তুলে নিরস্ত করেন রক্ষীদের। চেঁচিয়ে ওঠেন, 'হুঁশিয়ার, দিলাওয়ার খাঁ! হুঁশিয়ার! সামহারকে!...ওর গায়ে হাত দিও না কেউ।'

এ আবার কী!

দিলাওয়ার খাঁ বিভ্রান্তভাবে তাকায় মালিকের দিকে। সবেগে ঘোড়া ছুটিয়েছিল সেদিকে, এখন প্রাণপণে রাশ টেনে সামলাবার চেষ্টা করে। ভাগ্যিস, হাতের বর্শা আগেই ছোটে নি। সুন্দরী নারী না হয়ে পুরুষ হ'লে দিলাওয়ার খাঁ প্রমাণ ক'রে দিত দূর থেকেই—তার অব্যর্থ লক্ষ্যের সুখ্যাতি।

কিন্তু এত কেউ ভাববারও সময় পায় না—কারণ তার আগেই ভীড় ঠেলে এগিয়ে যান মুনিম খাঁ। ভীড়ও খুব ঠেলতে হয় না অবশ্য—সামনে যারা ছিল, তারা তখন পেছনে যাবারই সাধনা করছে। দেখতে দেখতে নর্তকীর চারিদিকের জমিন ফাঁকা সাফ হয়ে গেল।

সে মেয়েটি কিন্তু স্থির হয়েই দাঁড়িয়ে আছে—হাসি-হাসি মুখে, দুই হাত বুকের ওপর আবদ্ধ করে।

মুনিম খাঁ কাছে যেতে সে আরও একবার আভূমি নত হয়ে সেলাম করল, 'বন্দেগী জনাব!'

মুনিম খাঁ কিন্তু সে অভিবাদনের জবাব দিলেন না। মশালের আলোতে যতটা দেখা যায়, আপাতকঠোর দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখলেন তাকে অনেকক্ষণ

ধরে। তারপর বলবেন, 'এ কাজ করলে কেন ?'

'আপনার নজরে পড়বার জন্যে, জনাব। আজ দু'দিন ধরে আপনার দেখা পাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছি।'

'হুঁ। যদি তোমার হাতের লক্ষ্যে ভুল হ'ত, যদি আমার গায়ে লাগত ?'

'লাগত না, জনাব। আপনি আমার চোখ বেঁধে ঐ ছোরা তিনখানা আমার হাতে দিন—আর আপনি ঐ আগের মতই দূরে দাঁড়িয়ে সামান্য একটু শব্দ করুন, কি ঘোড়ার পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করুন, আমি আবারও ঠিক ঐভাবেই ওগুলো ছুঁড়ব, আপনার গায়ে আঁচড়টুকুও লাগবে না। এককালে অনেক যত্ন ক'রে এই খেলা শিখেছিলুম এক বুড়ো চীনা পাহাড়ীর কাছ থেকে—এখনও আমার এ-ই জীবিকা। ভুল হ'লে চলে কখনও ?'

মুনিম খাঁ আরও কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দেখলেন তাকে।

পশ্চিম-আকাশে তখন দিনের দীপ্তি একেবারেই ম্লান হয়ে এসেছে। এক-সময়কার ঐশ্বর্য-সমারোহ এখন স্মৃতিতে মাত্র পর্যবসিত। সূর্যের আর চিহ্ন নেই, শুধু দিগন্তরেখার অনেক উঁচুতে একটা সাদা মেঘে তার একটু আভাস তখনও পাওয়া যায়, নীচের দিকের খানিকটা অংশ তখনও লাল হয়ে আছে। কিন্তু সে বহুদূর, তার আলো এখন শুধু আমগাছগুলোর ডগাতেই যা একটু লেগে আছে—নীচে সেই গাছগুলোর শাখা-প্রশাখার তলায় তলায় অন্ধকার বেশ জমাট বেঁধে উঠেছে।

হঠাৎ চারিদিকের গাছপালা পত্রপল্লব দুলিয়ে একটা ঝিরঝিরে বাতাস উঠল। মুনিম খাঁ অন্যমনস্কের মত একবার মুখ তুলে তাকালেন আকাশের দিকে, পশ্চিম-দিগন্তের মেঘখানার দিকেও—তারপর আবার চোখ নামিয়ে আনলেন নর্তকীর মুখে।

মশালের আলো। তা হোক, অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে এ আলোর ঔজ্জ্বল্যও কিছু বেড়েছে বইকি। চার-চারটে মশালের আলোতে দেখতে কিছু অসুবিধা হয় না।

এ মেয়েটা তাঁর স্মৃতির শান্ত সরোবরে হঠাৎ একটা বড় রকমের ঢেউ তুলেছে। আলোড়িত হচ্ছে তার জল। অনেক দিনের ভুলে-যাওয়া কী একটা কথা মনে করবার জন্য আকুলিবিকুলি করছে তাঁর মস্তিষ্ক।

অবশেষে গলাটা সাফ ক'রে নিয়ে যতটা সম্ভব রূঢ় করবার চেষ্টা ক'রে প্রশ্ন করেন, 'তুমি কে ? ঠিক-ঠিক বল।'

'আপনার এ বাঁদীর নাম নফিসা। এর বেশী পরিচয় এখানে দিতে পারব না, জনাব। নিভৃতে যদি দেখা পাই তো বলব।'

নফিসার কণ্ঠস্বর সহজ কিন্তু দৃঢ়।

এ ধরনের কণ্ঠস্বর মুনিম খাঁ চেনেন। এ স্পর্ধা নয়, শক্তির প্রকাশ। একে ভয় দেখিয়ে কিছু করানো যাবে না।

কিন্তু—

চীন থেকে আনা দর্পণে বহুবার নিজের মুখ দেখেছেন মুনিম খাঁ।

নিত্যই দেখেন। ললাট, চিবুকের ভঙ্গী, আর গলায় ঐ খাঁজটার সঙ্গে তাঁরও দেহের ঐ অংশগুলোর অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছেন। বার-বারই চোখে পড়ছে সেটা। আঘাত করছে তাঁর দৃষ্টিকে।

তাছাড়া এমনি দেহ-সুষমা, এমনি নৃত্য-লালিত্য, দাঁড়িয়ে থাকার এমনি মহিমময় ভঙ্গী—এর আগে কোথাও কি দেখেন নি তিনি?…

ঘোড়া ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, 'বেশ, আমার সঙ্গে তাঁবুতে এস। দিলাওয়ার খাঁ, বখৎ খাঁ—দুপাশে থেকে সাবধানে নিয়ে এস ওকে—দেখো, না পালায়।'

॥ ১২ ॥

বাইরের গাঢ় অন্ধকার থেকে তাঁবুর মধ্যে এসে প্রথমটা চোখ ঝলসে গেল নফিসার। তাঁবু বড়—দরবারী তাঁবু। খান-ই-খানান এখানে স্বয়ং বাদশার প্রতিনিধি—সেইরকমই আসবাব তাঁর তাঁবুতে। হোক না যুদ্ধক্ষেত্র, তবু আরামের আয়োজনে ত্রুটি নেই।

অবশ্য চার-চারটে ঝাড়ে চব্বিশটা তেলের আলো—এর সঙ্গে আরামের সম্পর্ক নেই। বৃদ্ধ সেনাপতিকে রাত্রেও কাজ করতে হয়, আলো তাঁর একটু বেশীই দরকার।

আরামের আয়োজন অন্যত্র। প্রশস্ত চারপাইতে নরম পুরু বিছানা, সমস্ত মাটিটা দামী জাজিমে ঢাকা। সুন্দর ধূপের গন্ধ। আলনায় ভাল ভাল পোশাক সাজানো—আরামের সঙ্গে আড়ম্বরের অপূর্ব মিলন।

একটা ছোট্ট চাপা দীর্ঘশ্বাস পড়ল নফিসার।

বড় সেনাপতি, বড় উজীর সে-ও দেখেছে। তিনি ইচ্ছা করলে আরও আড়ম্বর আরও বিলাসের মধ্যে থাকতে পারতেন—কিন্তু তাঁর রুচি ছিল অন্যরকম। সাধারণ ভাবেই থাকতেন—সাদাসিধা আয়োজনের মধ্যে।

তবু অনেক দিন পরে এই তাঁবুতে ঢুকে—সেই তাঁবুর কথাই মনে পড়ে যায়।

বেশীদিনের কথাও তো নয়। কিছুদিন আগেও এমনি এক তাঁবুতেই বাস করেছে সে। কিন্তু সেখানে ছিল একেশ্বরী, প্রায় মালেকা। এখানে ভিখারিণী, আগন্তুক, সন্দেহভাজন।

চোখের কোণে এতদিন পরেও দু ফোঁটা অবাধ্য অশ্রু ঠেলে ওঠে ওর।

মনের মধ্যেকার অভিমানটা কিছুতেই মরতে চায় না—আশ্চর্য! এত দুঃখ, অদৃষ্টের এত পরিবর্তনের পরেও না!…

ইতিমধ্যে কোমরবন্ধটা খুলে খাওয়াসের* হাতে দিয়ে বিছানাতেই আরাম

*খাস খানসামা।

ক'রে বসেছেন মুনিম খাঁ। পাশেই একটা রেশমের আস্তরণ-ঢাকা কাঠের চৌকি—তাতেই কখন তলোয়ারখানা খুলে রেখে দিয়েছেন নফিসা লক্ষ্যও করে নি। যখন চারিদিকের আসবাব ও আলো থেকে চোখ ফিরিয়ে সে মুনিম খাঁর দিকে তাকাল, তখন একটা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে তিনি ওর দিকেই চেয়ে আছেন নিঃশব্দে।

একটু পরে ওঁর খাওয়াস আর-একটা চৌকির ওপর মদের পাত্র রেখে দিয়ে বেরিয়ে গেল—বোধ হয় মালিকের চোখের চাহনিতে সেই নির্দেশই পেয়েছিল। এইবার মুনিম খাঁ রক্ষীদেরও আঙুলের ইঙ্গিতে বাইরে যেতে বললেন। তারা বিস্মিত হলেও সে বিস্ময় প্রকাশ করতে বা দেরি করতে সাহস করল না—তাবুর পরদাটা সাবধানে টেনে নামিয়ে দিয়ে সবাই বেরিয়ে গেল।

এইবার মুনিম খাঁ চোখের ইশারায় নফিসাকেও বসতে বলে সংক্ষেপে প্রশ্ন করলেন, 'এইবার বল, তুমি কে?'

'জনাব, আমি বাঁদী-ই—সত্যি-সত্যিই বাঁদী। আমার এমন কোন মহৎ পরিচয় নেই। মিঞা লুদী খাঁ ছিলেন আমার মালিক।'

'লুদী মিয়া! সুলেমান কররাণীর উজীর লুদী মিয়া?'

'জী।'

'তা তুমি এভাবে এখানে ঘুরছ কেন? আমার সঙ্গেই বা তোমার কী দরকার?'

সন্দেহে কুটিল হয়ে ওঠে মুনিম খাঁর ভ্রু।

তাহলে কি শেষ পর্যন্ত আনওয়ার খাঁ-দের সন্দেহই ঠিক?

কররাণীদের গুপ্তচর?

কিন্তু সন্দেহটা মুখে প্রকাশ করার অবসর মেলে না। তার আগেই নফিসা বলে ওঠে, 'জনাব, যা ভাবছেন তা নই আমি। আজ আমার চেয়ে দায়ুদ কররাণীর শত্রু আর-কেউ নেই এ-পৃথিবীতে।'

'কিন্তু সে-কথা কেমন ক'রে বিশ্বাস করব?' খাঁটি ইস্পাতের মতই যে কঠিন হ'তে পারে মানুষের কণ্ঠস্বর তা সে-মুহূর্তে মুনিম খাঁর কণ্ঠ না শুনলে বিশ্বাস করা সম্ভব নয়।

'যে-কোন কসম খেতে বলবেন—খেতে রাজী আছি।'

'কসম? ঝুটা কসমের সাজা তো পরলোকের জন্যে তোলা থাকে, বিবি। যারা গোয়েন্দাগিরি ক'রে ইহলোকেই সুখ-সুবিধা গুছিয়ে নেয়, তারা পরলোকের ভাবনায় অত কাতর নয়।'

কঠিন আনন্দহীন একপ্রকারের হাসি হাসেন মুনিম খাঁ।

'জনাব, আপনি জানেন লুদী মিয়াকে কী ভাবে মেরেছিল দায়ুদ কররাণী?'

এবার মুনিম খাঁর বহু-বলি-রেখাঙ্কিত ললাট একটু একটু ক'রে যেন

প্রসারিত হয়। হ্যাঁ, জানেন বইকি তিনি। বহুদিনের বিশ্বস্ত ভৃত্য লুদী মিয়া। সুদূর দিল্লীতে পর্যন্ত তাঁর বুদ্ধির ও বিশ্বস্ততার খ্যাতি প্রচারিত ছিল। বস্তুত, তাঁর বুদ্ধির এবং পরামর্শের ওপর নির্ভর ক'রেই সুলেমান কররাণী তাঁর সিংহাসন সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপিত করতে পেরেছিলেন। মহানুভব মানুষ ছিলেন লুদী মিয়া।...নির্বোধ হঠকারী দায়ুদ কররাণীকে তিনিই দয়া ক'রে সিংহাসনে বসিয়েছিলেন। তার জ্যেষ্ঠ বায়াজিদকে হত্যা ক'রে যে-লোকটা গৌড়বাংলার সিংহাসন নিয়েছিল—তাকে লুদী মিয়াই অপসারিত করেন। শৌর্যের আইনে সে-সিংহাসন ছিল সেদিন লুদী মিয়ারই প্রাপ্য। কিন্তু তিনি তা নেন নি। প্রাক্তন প্রভুর ছেলে হিসাবে ঐ অপদার্থটাকেই বসিয়েছিলেন। সে ঋণ শোধ করেছিল হতভাগ্য নির্বোধটা লুদী মিয়ার পুত্রতুল্য জামাইকে খুন করিয়ে।

তবু লুদী মিয়া তাতে দুঃখিত হলেও নিমকহারামি করেন নি। বিরক্ত হয়েছিলেন—বিশ্বস্ততা হারান নি। কিন্তু মানুষের এতখানি মহত্ত্ব দায়ুদের মত লোকের জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত; সে তাঁর আচরণকে ভুল বুঝে অস্বস্তি অনুভব করতে লাগল। অবশেষে শয়তান-সহচর বেইমান গুজর খাঁ আর কতলু খাঁর পরামর্শে—প্রবল শত্রু অর্থাৎ মুনিম খাঁ যখন রাজ্যের দ্বারে উপস্থিত—তখন তাঁকেই সরিয়ে দিল সে—রাজ্যজয়ের সর্বস্ব-পণ-করা এই চরম শতরঞ্জ-খেলায় বোড়ের বুদ্ধিতে দাবাকেই খুইয়ে বসে রইল। তারই কল্যাণের জন্য লুদী মিয়া মুনিম খাঁর সঙ্গে যখন সন্ধির কথাবার্তা চালাচ্ছেন, তখন মিথ্যা প্রয়োজনের অজুহাতে একা নিঃশঙ্ক ও নিঃসঙ্গ পিতৃতুল্য বৃদ্ধ পিতৃবন্ধুকে নিজের তাঁবুতে ডেকে এনে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করল। লুদী মিয়াও কি সে-আশঙ্কা করেন নি? অবশ্যই করেছিলেন, মুঘল ঐতিহাসিকরা পর্যন্ত যাঁকে হিন্দুস্থানের সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী বলে স্বীকার করেছেন—তিনি কি এই সামান্য ছলটুকু বোঝেন নি? নিশ্চয় বুঝেছিলেন, কিন্তু শির দিলেও ইমান দেন নি, সুলেমান কররাণীর নিমকের অমর্যাদা করেন নি। প্রভুর আদেশ পালন করতে জেনেশুনে মৃত্যুর গহ্বরে পা দিয়েছিলেন।...

'জানি বইকি। সবই জানি আমি।' অপেক্ষাকৃত কোমলকণ্ঠে ঈষৎ সম্ভ্রমের সুরেই বলেন মুনিম খাঁ, 'ওঁকে খুন ক'রে নিজের তগদিরকেই খুন করেছে মূর্খ দায়ুদ কররাণী। এতবড় নির্বুদ্ধিতা বোধ হয় দুনিয়ার আর-কেউ কখনও করে নি।...তা তুমি এখন কী চাও? আশ্রয়?'

একটু প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের সুর কি ছিল মুনিম খাঁর কণ্ঠে? অথবা সামান্য আশা? আশ্রয় চাইলেই কি খুশী হন তিনি?

নফিসা ঘাড় নাড়ে—'না, জনাব। খোদার তৈরী বিশাল দুনিয়া থাকতে আশ্রয়ের জন্য কাতর হব কেন? আশ্রয় চাই না। চাই প্রতিহিংসা। দায়ুদ কররাণীর সর্বনাশ চাই, তাই আপনার কাছে এসেছি।'

আবার একটা সাংঘাতিক সংশয় ছায়াপাত করে মুনিম খাঁর মনে।

কে জানে কার সর্বনাশ সত্যিই চায় এ মেয়ে! ও‘কেই ভোলাতে এনেছে কিনা—তারই বা ঠিক কী!

মুনিম খাঁ নিঃশব্দে তাঁর ঘন শ্বেত ভ্রূ দুটোর মধ্য দিয়ে চেয়ে রইলেন ওর দিকে, মুখ দেখে মনের খবরটা আঁচ করবার জন্য।

কিন্তু ওর মুখের দিকে চাইলেই মনটা এমন ক'রে সুদূর অতীতে ফিরে যেতে চায় কেন—বিস্মৃতির সমুদ্র মন্থন ক'রে স্মৃতিকে পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়ে কেন?

নফিসা আর-একটু সরে এসে বসেছে। সে চারিদিকে তাকিয়ে দেখল। বিরাট তাঁবু—তার ঠিক মধ্যকেন্দ্রে বসে আছে ওরা। বাইরে থেকে ওদের কথা কেউ শুনবে—সে সম্ভাবনা কম।

তবু উত্তেজিত কণ্ঠ যতদূর সম্ভব নামিয়ে বলে, 'আমাকে ভুল বুঝবেন না জনাব, সন্দেহও করবেন না। দরকার হয়, আমাকে কয়েদ রাখুন। আমার শির জামিন রাখছি।...কিন্তু দয়া ক'রে আমার কথা শুনুন।...এখন যেভাবে গড়খাই কেটে বসেছে দায়ুদ, সোজা গিয়ে তাকে আক্রমণ করতে পারবেন না। বিস্তর লোকক্ষয় হবে, হয়ত শেষ পর্যন্ত হার মানতে হবে। অন্য পথ আছে, রাজমহলকে বেড়ে ডাইনে রেখে ঘুরে যান। সামনে কিছু লোক থাকুক, তাঁবু-টাঁবু পড়ে থাক্। আপনারা সেই পথ ধরে চলে যান একেবারে পিছনে। খোলা জায়গায় দুশমনের ওপর একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়বারও সুবিধা হবে, তা ছাড়া হঠাৎ ঐ আক্রমণে ভয় পেয়ে দিশাহারা হয়ে যাবে ওরা, লড়াই করতেই পারবে না।'

'এর পরামর্শ তুমি বৃদ্ধ মুনিম খাঁকে না দিলেও পারতে বাঁদী, এ সোজা বুদ্ধিটা মাথায় না এলে বৃথাই এতকাল লড়াই ক'রে শির পাকালুম কেন? তিন-চারজনকে পাঠিয়েছিলুম আমি, তারা সকলেই ফিরে এসে জানিয়েছে, এমন কোন পথই নেই ওদিকে, যাতে এতবড় ফৌজ নিয়ে যাওয়া যায়।'

স্পষ্ট বিদ্রূপ এবার খান-ই খানানের কণ্ঠে।

শুনতে-শুনতেই অসহিষ্ণু বিরক্তিতে ঠোঁট কামড়ে ধ'রে রক্তাক্ত ক'রে ফেলেছিল নফিসা, এবার সে স্থান-কাল-পাত্র বক্তার পদমর্যাদা সব ভুলে তর্জনী তুলে মুনিম খাঁকে নিরস্ত করল, তারপর তেমনি চাপা উত্তেজিত কণ্ঠেই বলল, 'যাদের পাঠিয়েছিলেন জনাব, হয় তারা বেইমান—নয় অন্ধ। পথ আছে, সে পথের ছক আমি এঁকে এনেছি একেবারে, সে আমার বুকে-বুকেই ঘুরছে।'

কাঁচুলির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে একটা সাদা-মত কী জিনিস বার ক'রে সেইখানে বসেই মুনিম খাঁর কোলে ছুঁড়ে দেয় সে।

বিজয়গর্ব তার চোখে।

বার বার গোস্তাকি! মুনিম খাঁর মত কড়া মেজাজের লোকের পক্ষে এর একটাও সহ্য করাই বিস্ময়ের কথা। কিন্তু কে জানে কেন তিনি সহ্যই করলেন আজ। বরং সাগ্রহে সাদা বস্তুটা তুলে নিয়ে চোখের সামনে মেলে ধরলেন।

খানিকটা সাদা কাপড়। কানি-ই বলা যায়। তাতে লাল রঙ দিয়ে অনভ্যস্ত হাতে আঁকা-বাঁকা একটা নক্‌শা আঁকা। তবু পাহাড় ও গ্রামের নাম-গুলো দেখে চিনতে অসুবিধা হয় না। পথ একটা সত্যিই দেখানো হয়েছে।

'কিন্তু এই পথ যে সত্যি-সত্যিই আছে কেমন ক'রে জানব?'

'আমার সঙ্গে কোন বিশ্বাসী লোক দিন—আমি আগে নিয়ে গিয়ে তাকে চুপি-চুপি দেখিয়ে আনি।'

'মানলাম পথ আছে হয়ত। কিন্তু তুমি যে আমাদের সঙ্গে বেইমানি করছ না কেমন ক'রে বুঝব? এখান থেকে রওনা হ'লেই তোমার ইশারামত ওরা যদি আমাদেরই পেছন থেকে আক্রমণ করে?'

'আমাকে জামিন রাখুন।'

'তোমার জামিনের মূল্য কতটুকু? তুমি যে নিজের জান দিয়ে ওদের উপকার করতে আসো নি—কেমন ক'রে বুঝব?'

এবার সত্যিই বিপন্ন বোধ করে নফিসা। একটা সুগভীর ক্লান্তির ভাবও বুঝি দেখা দেয় ওর মুখে। ব্যর্থ উত্তেজনায় ও হতাশায় চোখে জল এসে যায় ওর। সে স্খলিত ভগ্নকণ্ঠে বলে, 'কেমন করে বোঝাব তাহলে যে, আমি তা নই, সত্যিই আমি দায়ুদের সর্বনাশ চাই। কেমন করে বিশ্বাস করাব যে, আমার মালিকের মত মানুষের সঙ্গে যে ঘর করেছে, সে বেইমানী করতে পারে না। এটুকু কি আপনি লুদী মিয়ার সম্বন্ধে শোনেন নি? কী মহানু মানুষ ছিলেন তিনি!…জনাব, জনাব—বুক চিরে যদি দেখাবার হ'ত তো দেখাতুম কী আগুন জ্বলছে আমার বুকে! দায়ুদের সর্বনাশ ছাড়া এ আগুন নিভবে না কিছুতেই।'

'কিন্তু সত্যিই কি তুমি তাঁকে এত ভালবাসতে?…তিনি তো প্রৌঢ় ছিলেন, তোমার চেয়ে বয়েসে অনেক বড়!'

'জনাব, ভালবাসা কি হিসেবের পথ ধরে চলে? তিনি যুবা কি বৃদ্ধ, রূপবান কি কুৎসিত কোনদিন তো ভেবে দেখি নি। আমার কাছে তিনিই ছিলেন সব—খোদার চেয়েও বড়, নিজের জীবন-মরণ ইহকাল-পরকাল সব-কিছুর চেয়ে বড়। পৃথিবীর সবচেয়ে রূপবান তরুণকেও আমি তাঁর সঙ্গে বদল করতে রাজী ছিলুম না।'

'কিন্তু কেন? কেমন ক'রে তাঁকে এত ভালবাসলে তুমি? তাঁর কী এমন মহত্ত্বের পরিচয় পেয়েছ তোমার জীবনে?'

অকারণ ঔৎসুক্য মুনিম খাঁর কণ্ঠে।

হয়ত মনের কোণে এই হতভাগিনী নারীর আকুতিতে কোথায় একটা ঈর্ষাও বোধ করছেন—তাই এই ঔৎসুক্য, এই কৌতূহল।

তাঁর আশি বছরের জীবনে বহু বাঁদীই রেখেছেন তিনি, তাদের কারও কারও সঙ্গে যে সদ্ব্যবহার করেন নি তাও তো নয়, তবু তারা কেউই তো এমন করে ভালবাসে নি তাঁকে।…তাদের সঙ্গে শুধুই স্বার্থের সম্পর্ক, দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক ছিল।

নফিসা কিন্তু তখনই কোন জবাব দিতে পারল না।

জবাব দিতে গিয়ে বহু দিনের বহু কথা, বহু স্মৃতি মনের মধ্যে ভীড় ক'রে আসে, ব্যথার বন্যা জাগে মনে। সে বন্যা কণ্ঠ রোধ ক'রে দাঁড়ায়। বাক্যহত হয়ে বসে থাকে সে।

অবশেষে অনেক—অনেকক্ষণ পরে তার বাষ্প-গাঢ় কণ্ঠে স্বর ফোটে।

একটু একটু ক'রে বলে তার অন্তরে-লালিত সেই পরমাশ্চর্য কাহিনী।

তার কাছে অন্তত এর চেয়ে বড় কথা কিছু নেই। সব কথার চরম ও পরম কথা।

পাহাড়ী-মায়ের মেয়ে সে। তার বাবা নাকি কোন্ বড় তুরাণী ওমরাহ্। না—বাঁদী নয়, ক্রীতদাসী নয়—তার মা পাহাড়ের পথে সেই বীর তুরাণীকে দেখে স্বেচ্ছায় নিবেদন করে দিয়েছিল তার জীবনের সর্বোত্তম পুষ্প—তার কৌমার্য ও যৌবন।

সেই ঘটনার ফলস্বরূপ নফিসাকে পেয়ে ওর মা দুঃখিত হয় নি—লজ্জিতও হয় নি। কিন্তু মার কাছে বেশীদিন থাকতে পায় নি সে। ওর যখন দশ বছর বয়স তখনই মা মারা গেল। সেই সময় একদল ইরাণী বেদের হাতে পড়ে। তাতে ও দুঃখিত হয় নি—তখন মনে হয়েছিল—ওদের ঐ সকল সংস্কার—সকল বন্ধনহীন মুক্ত জীবনই সবচেয়ে শ্রেয়।

কিন্তু সে জীবন ওর অদৃষ্টে ছিল না। বেদেদের সঙ্গেই সুদূর হিমালয়ের সানুদেশ ছেড়ে চলে আসে সে বাংলার বন্দর সাতগাঁয়ে, সেখানে ঐ বেদের দলের সর্দার মোটা টাকার লোভে ওকে বেচে দেয় এক হাবসী দাস-ব্যবসায়ীর কাছে। বেদেদের কাছে থাকতে এবং তার আগে ওদের পাহাড়ে-মুলুকেও নানারকম খেলা আর নাচ শিখেছিল সে, তার ওপর দেখতেও নাকি সে ভাল—তাই তার মোটা দাম উঠল।

এর পর হাতবদল হতে হতে সে গিয়ে পড়ল আবার উত্তর-বাংলায়। কামতাপুরের হাটে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল পণ্যরূপে। তখনকার যে মালিক, সে নিতান্ত প্রয়োজনে প'ড়ে খুব কম টাকাতেই বিক্রি ক'রে দিল তাকে দুই আফগানের কাছে—তারা ভাগ ক'রে কিনেছিল তাকে।

কিন্তু কিনেছিল তারা—ব্যবসা করতে নয়, সম্ভোগ করতেও নয়—বিচিত্র এক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে।

নদীর ধারে নিয়ে গিয়ে হাত-পা বেঁধে মাটিতে ফেলে তাকে নানারকম শারীরিক যন্ত্রণা দিচ্ছিল। অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে উদ্ভাবিত, বহু চিন্তার ফল সে-সব পৈশাচিক অত্যাচার। তাইতেই তাদের উল্লাস—ওর ঐ অসহ যন্ত্রণাই তাদের সম্ভোগ। আজও সে কথা মনে হলে মানুষ জাতটার ওপরই ঘেন্না হয়ে যায়, এ জীবন যে খোদার সৃষ্টি তা বিশ্বাস হতে চায় না।

কিন্তু না—লুদী মিয়াও তো এই মানুষের মাঝেই জন্মেছিলেন।...

সেদিন ওকে সেই লাঞ্ছনা থেকে, সেই মর্মান্তিক যন্ত্রণা থেকে—মৃত্যুর অধিক সেই দুঃসহ অপমান থেকে ওকে রক্ষা করবার কেউ ছিল না। অপমান আর

লজ্জা—দৈহিক কষ্টের থেকে সেইটেই ওর বেশী হচ্ছিল।

না, ইচ্ছে করে কাঁদে নি সে—কিন্তু হাজার হোক মানুষের দেহ, সে অমানুষিক দৈহিক যন্ত্রণায় সহ্যের সীমা অতিক্রম করেছিল তার, তাই আর্তনাদ বেরিয়েছিল গলা দিয়ে—বুক ফেটেই বেরিয়েছিল বোধ হয় সে চীৎকার। সেই শব্দ শুনেই দূরের পথ থেকে খুঁজতে খুঁজতে এসেছিলেন লুদী মিয়া। সেই পথে ফিরছিলেন বেড়িয়ে—সঙ্গে না ছিল কোন লোক, না ছিল বিশেষ কোন অস্ত্রশস্ত্র। তবু একা সেই দুজন লোকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন তিনি এবং সেই গ্লানিকর যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা থেকে তাকে উদ্ধার করেছিলেন।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেল নফিসা।

বোধ করি তার মানসপটে সেদিনের ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে তার মালিকও উজ্জ্বল ভাস্বর মূর্তিতে ফুটে উঠলেন সেই মুহূর্তে। আর সেই সঙ্গে উদ্বেলিত আবেগে ও অশ্রুতে কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল তার।

নিথর নিস্তব্ধ হয়ে বসে শুনছিলেন মুনিম খাঁ। নফিসার মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে বিচিত্র তাঁর দৃষ্টি; অদ্ভুত একটা আলো যেন জ্বলছে, সেই প্রায়-স্তিমিত দুটি চোখে।

এবার তিনি কথা বললেন। বললেন, 'কিন্তু এ তো মানুষ মাত্রেরই কর্তব্য নফিসা। এ এমন কিছু দেবদুর্লভ আচরণ নয়।'

খুবই কোমল শোনাল তাঁর কণ্ঠস্বর। মুনিম খাঁর পক্ষে আশ্চর্য কোমল।

নফিসা জবাব দিলে। আবেগে ও উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল তার গলা, সেই স্খলিত আবেগ-কম্পিত কণ্ঠে বললে, 'হ্যাঁ, মানুষের কাজই করেছিলেন তিনি। কিন্তু তারপর অপর মানুষে যা করত—যা করলে কিছু-মাত্র দোষ দিত না কেউ—তা তিনি করেন নি। ন্যায়ত ধর্মত তিনিই তখন আমার মালিক, অনায়াসেই আমাকে তিনি তাঁর বাঁদীরূপে ব্যবহার করতে পারতেন—করলে আমি কৃতার্থ হয়েই যেতাম। কিন্তু তিনি করেন নি। নিরাপদ জায়গায় নিয়ে এসে আমাকে স্বাধীনতা দিতে চেয়েছিলেন, আমার আত্মীয়দের খোঁজ ক'রে আমাকে তাদের কাছে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। শুধু তাই নয়—আমি যখন সে স্বাধীনতা নিতে রাজী হলুম না তখন তিনি আমাকে কোন ভাল পাত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবারও প্রস্তাব করেছিলেন। আমিই রাজী হই নি—তাঁকে ছেড়ে যেতে চাই নি। তাঁর দুটি পা-ই পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে লোভনীয় আশ্রয়, বার বার এই কথা বলাতে তবে তিনি ক্ষান্ত হয়েছিলেন সে-চেষ্টা থেকে।...তারপরও কয়েক মাস তাঁর কাছে কাছে ছিলাম, ছায়ার মতই থেকেছি তাঁর আশেপাশে, কিন্তু—। জনাব, আয়নায় মুখ দেখেছি, মুখ দেখেছি বহু লুব্ধ পুরুষের চোখে—দেখতে আমি যে সুশ্রী, আমি যে লোভনীয় এটুকু আমি জানি। এটা দুর্বিনয় নয়, নিছক সত্য—কিন্তু তবু মালিক আমার প্রতি কোনদিন এতটুকু লোভ প্রকাশ করেন নি; এতটুকু দুর্বলতা এতটুকু লালসা প্রকাশ পায় নি তাঁর আচরণে। তিনি

স্নেহ এবং প্রশ্রয় দিয়েই গেছেন—পরিবর্তে চান নি কিছু।'

আবারও অন্তনিরুদ্ধ আবেগে বুজে এল তার কণ্ঠস্বর।

একটু থেমে নিজেকে সামলে নিয়ে আবার বলতে শুরু করল, 'আমার সেই মালিককে খুন করেছে দায়ুদ কররাণী। মিথ্যাবাদী কাপুরুষ চরম বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়ে অসহায় জানোয়ারের মত খুঁচিয়ে মেরেছে তাঁকে। তিনি জানতেন, তিনি বুঝেছিলেন যে দায়ুদ তাঁর মৃত্যু চায়, তার চিঠি মিথ্যা ছল মাত্র—তবু মনিবের আদেশ ব'লেই জেনেশুনে সেই মৃত্যুর গুহায় পা দিয়েছিলেন। জীবনের শেষমুহূর্ত পর্যন্ত বিশ্বস্তভাবে মনিব-বংশের সেবা করে গেছেন। প্রাণ দিয়েছেন কিন্তু ইমান দেন নি।'

'কী লিখেছিল দায়ুদ কররাণী?'

'লিখেছিল যে সে তাঁর জামাইকে হত্যা করার জন্য অনুতপ্ত, কিন্তু লুদী মিয়া তো তার বাপেরই মত, সহস্র অপরাধ ক্ষমা করেছেন চিরকাল—এ অপরাধও যেন নিজগুণে ক্ষমা করেন। এখন এই আসন্ন বিপদের সময় তিনি যদি না দেখেন তো আর কোন উপায় নেই। সে খুবই বিপন্ন, চারিদিকে সর্বনাশ তার। লুদী মিয়া যদি দয়া ক'রে একবার তখনই যান তো সে প্রথমত তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে তার ঘোরতর পাপ থেকে মুক্ত হতে পারে—দ্বিতীয়ত এই দারুণ বিপদের দিনে তাঁর বুদ্ধিতে ও শৌর্যে রক্ষা পেতে পারে।'

'তারপর?'

তারপরও বিচিত্র ইতিহাস। নফিসা বলল একটু একটু ক'রে।

চরমযাত্রার আগে তাঁর বাঁদীর কথা ভোলেন নি মালিক, তিনি ওকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে রেখে যাওয়ার সব ব্যবস্থাই করেছিলেন। কিন্তু নিজের সুখ, নিজের নিরাপত্তা নিয়ে বেঁচে থাকতে চায় নি নফিসা। সেই দিনই তাঁর সামনেই সে প্রতিজ্ঞা করেছে যে, দায়ুদ কররাণীর সর্বনাশ না করা পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত হবে না, নিরাপদ হবে না। মৃত্যু? না, শুধু মৃত্যুতে ওর পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে না। নইলে বহুদিন আগেই সে দায়ুদের রক্তে মালিকের তর্পণ করতে পারত। সে চায় ওর চরম সর্বনাশ। পথের কুকুরের মত এক স্থান থেকে আর-এক স্থানে সে ঘুরে বেড়াবে—যে রাজ্যের লোভে এত বড় পাপ করলে সেই রাজ্য একটু একটু ক'রে হারাবে, সর্বস্বান্ত হয়ে, ভাগ্যতাড়িত হয়ে বেঁচে থেকে প্রায়শ্চিত্ত করবে—এই চায় নফিসা।

সেইজন্যেই আজ সে ওঁর কাছে এসেছে।

মুঘলবাহিনীর জয়লাভে ওর সেই প্রতিহিংসাই তৃপ্ত হবে। তাই ওর এই চেষ্টা—ওর এই সাধনা পথ খোঁজবার—এবং সে পথের সন্ধান খান-ই-খানানের কাছে পৌঁছে দেবার।

এই পর্যন্ত বলে নফিসা আবার নীরব হল। উত্তরের—আশ্বাসের আশায় উৎসুক ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে।

॥ ১৩ ॥

মুনিম খাঁ অভিভূতের মতই শুনছিলেন।

কিন্তু তবু তাঁর সমগ্র মন কি ছিল ঐ কাহিনীতে ?

দুটি চোখ মেলে ছিলেন তিনি নফিসার মুখের ওপর, কিন্তু দৃষ্টি কি ছিল সেইখানেই ?

না। বর্তমান কাল এবং স্থান ছাড়িয়ে—এই তাঁবু, এই উপত্যকা, ঐ নদী-প্রান্তর পার হয়ে—বহু দূরে কোন শৈলসানুর গহন অরণ্য-পথে উধাও হয়ে গিয়েছিল তাঁর মন—বহুদূরে অতীতের স্মৃতি-রোমন্থনে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।

এবার মনে পড়েছে তাঁর। সেই চোখ, সেই চিবুকের সুকুমার গঠন, গ্রীবার আশ্চর্য ভঙ্গীটি—সেই কোমল ভঙ্গুর দেহযষ্টি। অবিকল সে-ই।

প্রথমেই কেন এ মিলটা তাঁর চোখে পড়ে নি, তাই ভেবেই বিস্মিত হচ্ছেন মুনিম খাঁ।

কারণ সে-মেয়ে তো এত সহজে মন থেকে মুছে যাবার মত নয়। সে তাঁর দীর্ঘজীবনের অসংখ্য নর্মলীলার অন্যতমা ক্রীড়াসঙ্গিনী নয়—বাঁদী বা ক্রীতদাসী তো নয়ই। তাকে পাওয়া তাঁর জীবনের একটা বিরাট লাভ—কোন বড় যুদ্ধজয়ের চেয়েও বড় বিজয়লাভ তাঁর।

সে কোন পুরস্কারের লোভে আসে নি তাঁর সেবা করতে, কোন ভবিষ্যতের আশা রেখে ধরা দেয় নি। কেউ জোর করেও ধরে আনে নি।

স্বেচ্ছায়, মুগ্ধ হয়ে, ভালবেসে সে তাঁর কাছে এসেছিল—প্রায় ষাট বছরের বৃদ্ধের কাছে। মেহেদী দিয়ে ছোপানো হলেও কেশ-শ্মশ্রুর শ্বেতাভা সেদিন চাপা ছিল না, বয়স গোপন করারও কিছুমাত্র চেষ্টা করেন নি তিনি। অসংখ্য যুদ্ধ তার কিছু কিছু ব্রণচিহ্ন রেখে গিয়েছিল তাঁর দেহের সর্বত্র—মুখেও। অর্থাৎ যাকে রমণী-মনোহর বলে, তা আর তখন আদৌ ছিলেন না তিনি।

তবু সে এসেছিল। স্বেচ্ছায় তার জীবনের, তার প্রথম উন্মীলিত যৌবনের সব-কিছু তাঁর পায়ে সঁপে দিয়ে যেন ধন্য হ'তে, কৃতার্থ হ'তে।

সে-ও এক যুদ্ধযাত্রারই ইতিহাস।

একদল আফগানের উৎপাতে তরাইয়ের সরল বন্য আদিম অধিবাসীদের জীবন দুর্বহ হয়ে উঠেছে খবর পেয়ে তিনি গিয়েছিলেন তাদের খোঁজে। গিয়ে দেখেছিলেন ওদের সরলতা ও সাংসারিক জ্ঞানহীনতার সুযোগ নিয়ে আফগানগুলো সেখানে এক মহাত্রাসের রাজ্য সৃষ্টি করেছে। এমন কোন অত্যাচার নেই যা তারা করে নি—শুধু তাদের শস্য ফল দুধ ঘি যে নির্বিচারে এবং নির্বিবেকে ভোগ করছে তাই নয়, তাদের দিয়ে ক্রীতদাসের মতই

নিজেদের কাজ করিয়ে নিচ্ছে, নিজেদের সর্ববিধ আরাম ও ভোগ-বিলাসের আয়োজন করিয়ে নিচ্ছে। সম্ভোগ করছে তাদের নারীও। পাহাড়ীদের রাগ বা অনুরাগ কোনটাই কারুর চেয়ে কম নয়, তারাও যথেষ্ট হিংস্র, গভীর অরণ্যে তাদের সর্বদা বন্য-জন্তুদের সঙ্গে বাস করতে হয় ব'লে তাদের মত অস্ত্রশস্ত্রও তাদের ঢের আছে—কিন্তু বেচারীরা তার আগে কখনও কামান বন্দুক দেখে নি। এই আজব অস্ত্র বুঝি দেবতারাই দিয়েছেন ওদের, আকাশের বজ্র স্বয়ং দেবদূত ধরে এনে দিয়েছেন ওদের হাতে—এমনি একটা বিশ্বাসে অভিভূত হয়ে পড়েছিল ওরা। ভগবানের ইচ্ছাতেই ওদের বহুদিনের পুঞ্জীভূত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হচ্ছে ভেবে বাঁধা পশুর মতই পড়ে মার খাচ্ছিল—এইভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল।

এই অত্যাচার দেখে আর এই করুণ কাহিনী শুনে মুনিম খাঁ জ্বলে উঠেছিল—সাধারণত এইসব বন্য বর্বরদের জন্য শাহী সেনাপতিরা এত কষ্ট করেন না—কিন্তু তিনি করেছিলেন। অস্বাস্থ্যকর পাহাড়ী পথে, ঘন নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে নিজে ঘুরেছিলেন সৈন্যদের সঙ্গে—সেই বদমাইশ আফগান-গুলোকে একেবারে সমূলে উচ্ছেদ করবার জন্য।

সে সময় ওখানকার আদিবাসীরা ওঁকে দৈব-প্রেরিতই মনে করেছিল। বলতে গেলে পূজা পেয়েছিলেন তিনি তাদের কাছ থেকে।

নৈনীও এসেছিল তাঁকে পূজা করতেই।

তার মত পূজা। একেবারে সর্বস্ব নিবেদন ক'রে, নিঃস্ব হয়ে পূজা করতে।

অবশ্য খুব বেশী লোভ আর ছিল না মুনিম খাঁর।

তিনি ওকে নিরস্ত করতেই চেয়েছিলেন। বুঝিয়েছিলেন অনেক—কিন্তু নৈনী তা শোনে নি।

তরুণী সুশ্রী নৈনী। স্নেহে প্রেমে আবেগে অপরূপা।

তার ওপর ছলছল-সজল চোখে সে সেদিন তাঁর কাছে ভিক্ষার্থিনী হয়েই দাঁড়িয়েছিল।

ফেরাতে পারেন নি তাই। ফেরাবার প্রয়োজনও বোধ করেন নি।

দুনিয়ার এই নির্বান্ধব কোণে, সভ্যতার বাইরে এই সুদূর গহণ অরণ্যে এমন অনাঘ্রাত আরণ্য-পুষ্পমাল্য যদি সেধে আসে তাঁর গলায় তো তিনি ফেরাবেনই বা কেন? কী এমন গরজ তাঁর?

তা ছাড়া সে তো তাঁকে কৃতার্থ করতে আসে নি, নিজেকে নিবেদন ক'রে কৃতার্থ হ'তেই এসেছে।

সত্যিই ও-রকম সেবা, ও-রকম ভালবাসা জীবনে আর দেখেন নি মুনিম খাঁ। এমন আবেগ-থরথর ঐকান্তিক ভালবাসা কোন কিশোরী মেয়ে বাসতে পারে একজন প্রৌঢ়কে, প্রৌঢ়ই বা কেন—ষাটের সীমানায় যে পা দিয়েছে সে তো প্রৌঢ়ত্বও অতিক্রম করেছে—তা কোনদিন কল্পনাও করেন নি মুনিম খাঁ। এ কথা বিশ্বাসও করতেন না হয়ত কোনদিন—নিজের জীবনেই

এ ঘটনা না ঘটলে।

অতি অল্পদিনই তাকে পেয়েছিলেন। ফেরবার সময় সঙ্গে আনতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সে আসে নি। বলেছিল, লোকালয়ে সে থাকতে পারবে না। তা ছাড়া সে জংলী, বুনো—তাকে দেখে শহরের মেয়েরা হাসাহাসি করবে, ঠাট্টা করবে। মুনিম খাঁ বিব্রত বোধ করবেন। আরও বড় কথা—সেখানে সে হারিয়ে ফেলবে তাঁকে। নিজের মূল্য ভালই বোঝে নৈনী। বেশী লোভ তার নেই। যা পেয়েছে তাতেই সার্থক সে,—বাকী জীবনটা সে এই আশ্চর্য দিন এবং আশ্চর্য রাত্রিগুলির স্মৃতি নিয়েই বেশ কাটাতে পারবে।

সেদিন ওকে ছেড়ে আসতে হয়ত একটু ব্যথাই অনুভব করেছিলেন মুনিম খাঁ—কিন্তু জোর করেন নি। যুক্তিটা বুঝেছিলেন। এমন সর্বস্ব-হারানো ঐকান্তিক ভালবাসার মূল্য শহরে লোকালয়ে, সভ্যতার মধ্যে তিনি দিতে পারবেন না—আর এ ভালবাসা অবহেলাও সইবে না।

তার চেয়ে এই ভাল।

তাঁরও যে ক'টি দিন এই অত্যাশ্চর্য অভিজ্ঞতায় কাটল সেই ক'টিই স্মরণীয় হয়ে থাক্ জীবনে।

বাস্তবিক সে অভিজ্ঞতা অবিস্মরণীয়। তিনি প্রশ্ন করতেন নৈনীকে বার বার, 'তুমি কী দেখে এমন ভালবাসলে নৈনী, কী আছে আমার? বুড়ো হয়ে গেছি, চুল দাড়ি ভুরু পর্যন্ত পেকে গেছে, সর্বাঙ্গ অস্ত্রের দাগে কুৎসিত বিকৃত হয়ে উঠেছে—তোমার মত সুরূপা মেয়ে তো ইচ্ছে করলেই অনেক নওজোয়ান পেতে পারত!'

সে ওঁর মুখ চেপে ধরত তার পদ্মপল্লবের মত কোমল দুটি হাত দিয়ে।

তন্ময় হয়ে ও'র মুখের দিকে চেয়ে থেকে বলত, 'কী দেখে ভালবেসেছি তা তো জানি না। তুমি সুন্দর কি কুৎসিত, নওজোয়ান কি বুড়ো, কোনদিন তো ভেবে দেখি নি—তুমি বীর, তুমি সেনাপতি, তুমি এসেছ আমাদের দুঃখ দুর্দশা লাঞ্ছনায় কাতর হয়ে অশেষ কষ্ট স্বীকার করে আমাদের রক্ষা করতে—দেবদূতের মত, দেবতার মত, এ-ই আমি জানি। দেবতাদের দেখতে পাই নে—তোমাকে দেখছি, স্পর্শ করতে পাচ্ছি এই তো ঢের, এই তো পরম সৌভাগ্য। সূর্যকে দেখে কে না মোহিত হয়—কিন্তু সে-ও তো কম বুড়ো নয়। শুনেছি এ-দুনিয়াটা যতদিনের, সুরয-ভগবানও তত দিনের। হয়ত কিছু বেশীই বয়স হবে ও'র। কিন্তু তবু আমাদের দেশে কুমারী মেয়েরা ঋতুস্নান ক'রে উঠে ও'র দিকেই চায় সর্বপ্রথম, ও'র মত তেজস্বী স্বামী হবে, সেই স্বামীর ঔরসে তেজস্বী ছেলে হবে—সব মেয়েই তাই কামনা করে।···সুরযকে পাই নি—আমার অত লোভও নেই—কিন্তু তোমাকে তো হাতেই পেয়েছি, তোমার সেবা ক'রেই জীবনটা ধন্য ক'রে নিই।'

অনেক দিনের কথা হ'ল বইকি।

তখন মনে হয়েছিল কোনদিন যা ভুলবেন না, তা-ই একটু একটু ক'রে

বিস্মৃতির ধুলোয় চাপা পড়ে গেছে। বহু যুদ্ধ-বিগ্রহ ষড়যন্ত্র—বহু রাজকার্য, নিজের পদোন্নতির বহু প্রয়াস, ঘরে বাইরে নিরন্তর বহু শত্রুর সঙ্গে বিরোধ ও আত্মরক্ষার জন্য সদাসর্বদা সজাগ থাকার চিন্তার মধ্যে কবে কোথায় ডুবে তলিয়ে গেছে সেই একমুঠো ফুলের মত এতটুকু একটা বুনো পাহাড়ী মেয়ে!

আরও বহু স্ত্রীলোকও তো এসেছে জীবনে।

স্ত্রী, বাঁদী নর্তকী—বিলাস-সঙ্গিনী।

তাই খুব গরজও ছিল না হয়ত সেই ক'টা দিনের অভিজ্ঞতা মনে ক'রে রাখবার। মাঝে মাঝে কোন কোন কর্মহীন দিনের বিস্মৃত প্রদোষে এক-আধবার হয়ত মনে পড়েছে—ভাববার চেষ্টা করেছেন যে নৈনী এখন কী করছে, আর-কাউকে বিয়ে-থা করে ঘরকন্না পেতেছে কিনা—কিন্তু তেমন অবসরই তো তাঁর জীবনে দুর্লভ।

আজ এই মেয়েটিকে দেখে পর্যন্ত তাই তাঁর স্মৃতিসমুদ্রে একটা আলোড়ন উঠেছিল, সেই প্রথম মুহূর্ত থেকেই একটা চিন্তা বার বার তাঁকে উন্মনা অন্য-মনস্ক ক'রে দিচ্ছিল যে—এর এই চেহারা, এর গঠন, এর অঙ্গের বিভিন্ন ভঙ্গী একেবারে অপরিচিত নয় তাঁর—কোথায় একটা পরিচয়, একটা যোগাযোগ আছে তাঁর সঙ্গে। কেবলই ভেবেছেন আর স্মৃতির দুয়ারে মাথা কুটেছেন। এটুকু বুঝতে পেরেছেন যে যোগাযোগটা একেবারে সুদূরও নয়—কারণ স্মৃতির আলোড়নের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চিত্তে একটা আবেগেরও আলোড়ন উঠেছিল, যা মোটেই তাঁর পক্ষে সহজ বা স্বাভাবিক নয়।...নৈনীকে যদি এমন ক'রে ভুলে ব'সে না থাকতেন তো, এত দেরি হ'ত না তাঁর যোগাযোগটা খুঁজে বার করতে।...

সহসা মুনিম খাঁ সামনের দিকে ঝুঁকে বসলেন, আশ্চর্য কোমলকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'বেটী, তোমার মায়ের নাম কী ছিল বলতে পার?'

'পারি বইকি। মাকে সবাই নৈনী বলে ডাকত।'

চোখ বুজলেন মুনিম খাঁ।

অনেকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন তিনি।

'মাফ কর নৈনী, মাফ কর। তোমাকে এমন ভাবে ভোলা আমার উচিত হয় নি—এমন ভাবে ভুলে থাকা। অন্তত তোমার সন্তানের দায়িত্ব আমার নেওয়া উচিত ছিল।'

আসলে তিনি ও-কথাটা চিন্তাই করেন নি। নৈনীও তাঁকে ঘুণাক্ষরে জানায় নি যে সে সন্তানসম্ভবা। হয়ত তিনি আরও বেশী ব্যস্ত হতেন, হয়ত সন্তানের জন্যই তাকে জোর ক'রে টেনে আনতেন—এই কারণেই জানায় নি নৈনী।

কিন্তু তাঁর খবর নেওয়া উচিত ছিল, এ সম্ভাবনার কথাটা তাঁর বোঝা উচিত ছিল!...

অনেকক্ষণ পরে চোখ খুললেন মুনিম খাঁ।

তখনও আশায় ও আশাভঙ্গের আশঙ্কায় কণ্টকিত হয়ে একদৃষ্টে তাঁর দিকে

নিষ্পলকে চেয়ে আছে নফিসা।

মুনিম খাঁ উঠে দাঁড়ালেন, কাছে এগিয়ে এসে হেঁট হয়ে সস্নেহে ওর মাথায় একটা হাত রাখলেন। তারপর বললেন, 'আমি তোমাকে বিশ্বাস করলাম বেটী। আমার যথাসাধ্য তোমাকে আমি সাহায্য করব। সমস্ত মুঘলবাহিনীই তোমার এই প্রতিহিংসা-যজ্ঞে সহায়তা করবে।...কাল ভোরেই আমি লোক দেব—সে লোক তোমার সঙ্গে গিয়ে পথ দেখে আসবে—কাল রাত্রেই আমরা সেই পথ ধ'রে গিয়ে ঘিরে ধরব দায়ুদ কররাণীকে। তুমি নিশ্চিন্ত থাক। এবার আর তার পরিত্রাণ নেই।'

কৃতজ্ঞতায় ছলছল ক'রে উঠল নফিসার চোখ।

সে ওঁর পায়ে হাত দিয়ে বলল, 'আপনার এ অনুগ্রহ কখনও ভুলব না, জনাব।'

মুনিম খাঁ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন কতক্ষণ। বোধ হয় যে-প্রস্তাবটা মনের মধ্যে এসেছিল তা প্রকাশ করতে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন, অথবা প্রকাশের ভাষা খুঁজছিলেন মনে মনে। বললেন, 'একটা কথা বলব বেটী?'

'বলুন জনাব—আপনি আমাকে বেটী ব'লে সম্বোধন করেছেন—আজ থেকে আপনি আমার বাবারই মত। বাবাকে তো কখনও দেখি নি, সে ক্ষোভ ছিল, আজ থেকে সেটাও মিটল।...আমার কাছে আপনার সঙ্কোচের কোন কারণ নেই।'

'বলছিলাম কী, তোমার যা ব্রত তা আমাদের দ্বারাই সফল হবে।... মিছিমিছি তোমার আর পথে পথে এমন ক'রে ঘুরে বেড়িয়ে লাভ কী? তোমাকে বেটী বলেছি যখন, তা ছাড়া তুমি হিন্দুস্থানের সবচেয়ে সাচ্চা আদমী লুদী মিয়ার অন্তঃপুরিকা—তোমার এমন ভাবে বেড়ানো ঠিক নয়। তার চেয়ে তুমি আমার কাছেই থাক না? আমার মেয়ের মতই থাকবে। কেউ এতটুকু অসম্মান করতে কোনদিন সাহস করবে না।' কথাগুলো ব'লে কেমন একরকম ছেলেমানুষের মতই উৎসুক ভাবে চেয়ে রইলেন ওর দিকে।

জবাব দিতে দেরি হ'ল নফিসার।

বোধ হয় বহুদিনের-শুকিয়ে যাওয়া রুক্ষ মরু-অন্তরে এতখানি স্নেহের বর্ষণ পেয়ে যে সহস্রশিখা বাষ্প জেগেছে—সেই বাষ্পই তার কণ্ঠ ও দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে।

অনেকক্ষণ পরে কথা কইল সে। প্রায় চুপি-চুপি বলল, 'আপনার এ অকারণ স্নেহ আপনারই যোগ্য। কিন্তু চিরকালের বন্য প্রকৃতি আমার— হারেমের নিষ্ক্রিয় জীবনে বেশীদিন বন্ধ থাকতে পারবে না।...যদি দয়া করেন তো এইটুকুই ব্যবস্থা ক'রে দিন—যাতে আমি ইচ্ছামত মধ্যে মধ্যে আপনার কাছে আসতে পারি—বিপদে পড়লে বা পরিশ্রান্ত হ'লে, আপনার এই নিরাপদ আশ্রয়ে দু'দিন এসে বিশ্রাম করে যেতে পারি। তাহলেই আমাকে আশার অতীত অনুগ্রহ করা হবে জনাব।'

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে মুনিম খাঁ বললেন, 'তাই হবে, বেটী। আমার

নিশানী দেওয়া থাকবে তোমার কাছে—যখনই প্রয়োজন হবে এস—কেউ বাধা দেবে না। তবে এইটুকু অনুরোধ—প্রয়োজন পড়লেই চলে এস, এতটুকু দ্বিধা কি সংকোচ কোর না। তুমি আমার মেয়ে—এটা কেবল কথার কথা নয়, মনে প্রাণে বিশ্বাস কোর।'

শেষের দিকে কেমন যেন ধরা-ধরা শোনায় মুনিম খাঁর গলাটা। একটু থেমে আবার বলেন, 'আজ তাহলে এইখানেই বিশ্রাম কর, বেটী। কাল ভোরেই উঠতে হবে।···আমার এই তাঁবুর পেছনেই জানানা-তাঁবু আছে—সেখানে নিয়ে যাক তোমাকে। দরকার হয় তো স্নানের জলও পাবে। খানাও তৈরী। খেয়ে একটু ঘুমিয়ে নাও।'

তিনি ওর উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই ডাকলেন, 'আনওয়ার খাঁ!'

আনওয়ার খাঁ এসে অভিবাদন ক'রে দাঁড়াল।

নফিসাকে সেও চিনতে পেরেছে। সে যাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল তারই এই সগৌরব প্রত্যাবর্তনে রীতিমত ক্ষুব্ধ ও বিচলিত হয়েছে সে। একটু বিদ্বেষও অনুভব করছে এই জাদুকরী বেদেনীটার ওপর (বখৎ খাঁর কাছে সবই শুনেছে সে)। সে নফিসাকে সম্পূর্ণ অবহেলা দেখাতেই যেন একটু এগিয়ে এসে ওর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল।

মুনিম খাঁ অতটা লক্ষ্য করেন নি, আনওয়ারের মুখের ভ্রূকুটিও না।

তিনি সহজ কণ্ঠেই বললেন, 'আনওয়ার, এঁকে সঙ্গে ক'রে জানানা-তাঁবুতে নিয়ে যাও। স্নানের জল দেবে, পোশাক কিছু দরকার থাকলে ব্যবস্থা ক'রে দেবে। খানা ও বিছানার ব্যবস্থা ক'রে দেবে। এঁর কোনরকম অসম্মান বা অসুবিধা না হয়। ইনি আমার মেয়ের মত—আমার মেয়ে থাকলে তাঁকে যেমন সম্মান করত, সকলে, সেই রকমই যেন করে—বেশ ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিও সকলকে।···তুমিও সকাল ক'রে বিশ্রাম করতে যাও, কাল খুব ভোরে সূর্য-অনুদয়ে এঁর সঙ্গে তুমি যাবে—ইনি তোমাকে একটা রাস্তা চিনিয়ে দেবেন। বুঝেছ? সব কথা ঠিক ঠিক ইয়াদ রেখো।'

আনওয়ার খাঁ মনে মনে, তার যত পীরের নাম শোনা ছিল, সকলকেই স্মরণ করার চেষ্টা করল।

এ মেয়ে যে নিশ্চয়ই জাদু জানে। হিন্দুস্থানের কালা জাদু।

হয়ত বা ডাইনীই হবে। আনোয়ার শুনেছে ওরা হামেশাই সুন্দরী মেয়ের রূপ ধরে মাথা খেতে আসে লোকের। পূবে কামরূপ না কী একটা মুলুকআছে, সেখানকার মেয়েরা নাকি চোখের চাহনিতেই পুরুষমানুষকে ভেড়া ক'রে ফেলে।

এ মেয়ে নিশ্চয়ই সেখানকার কোন মন্ত্র-জানা ডাইনী।

নইলে তার এতদিনের এত পোড়-খাওয়া এমন জবরদস্ত মনিবকে এক-লহমায় এইরকম ভেড়া করে ফেলতে পারে!

খোদা তাকে রক্ষা করুন।

ভালয়-ভালয় যদি আবার কোনদিন দিল্লীতে ফিরতে পারে—বড় পীর-সাহেবের দরগায় সিন্নি চড়াবে।

॥ ১৪ ॥

দায়ূদ কররানী আবারও পালালেন। বিনাযুদ্ধেই পালালেন।

মুঘলবাহিনী অতর্কিতে এসে পড়েছিল সত্য কথা। এভাবে এ-পথে এমন ক'রে দুশমন এসে পড়তে পারে তা আফগানরা কখনও ভাবে নি। বস্তুত, এদিকে যে একটা পথ আছে তাও তারা জানত না।

কিন্তু তাহলেও—এমনভাবে পালাবার মতো ভয়াবহ ঘটনা সেটা নয়।

যুদ্ধ তো হয়ই নি—মুঘলরা আক্রমণও করে নি। শুধু এসে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল মাত্র, হয়ত আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। যা এসেছে তা ছাড়াও পিছনে আরও কিছু লোক আসছে, এটাও বোঝা গিয়েছিল।

কিন্তু তাতেই কি এত ভয় পেয়েছিলেন দায়ূদ ও তাঁর সেনাপতিরা?

এমন কিছু ভয় পাবার কারণও কি ছিল?

যারা যুদ্ধ করে—যুদ্ধ-ব্যবসায়ী, তাদের কাছে তো এটা অতি সম্ভাব্য ঘটনা।

তা ছাড়া এরা কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ত ছিল, কিন্তু অসহায় ছিল না একেবারেই।

গভীর পরিখা কাটা চারিদিকে, তার সামনে সামনে সেই মাটিই উঁচু ক'রে ক'রে প্রাচীরের মতো করা; অত্যন্ত সুরক্ষিত অবস্থা। যুদ্ধের উপকরণও সামান্য নয়, সুশিক্ষিত বিপুল হস্তিবাহিনী, নূতন কামান, গোলা-বারুদের ভান্ডার পূর্ণ। লড়াই বাধলে কোন্ পক্ষ শেষপর্যন্ত হারত তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। মুঘলদেরও ভয়ের কারণ কম ছিল না।

তবু লড়াই করলেন না দায়ূদ কররানী। ভয়ে বিহ্বল হয়ে পালাবার, পিছু হঠবারই হুকুম দিলেন। বিরক্তিতে ক্ষোভে অসহায় ব্যর্থ রোষে সেনানায়কদের ভ্রূ কুঞ্চিত হ'ল—নিজেদের ঠোঁট নিজেরাই কামড়ে রক্তাক্ত ক'রে ফেললেন—তবু কিছুতেই তাঁরা দায়ূদকে ঘুরে দাঁড়িয়ে আঘাতের বদলে প্রত্যাঘাতে রাজী করাতে পারলেন না।

কারণ?

সেনাপতিদের জানবার কথা নয় সে কারণ।

দায়ূদের এ আচরণের কারণ দায়ূদই জানেন শুধু।

দায়ূদ সেদিন সেই মুহূর্তে শুধু মুঘলবাহিনীই দেখেন নি। তা ছাড়াও কিছু দেখেছিলেন।

দেখেছিলেন একটা আগুন।

মুঘলবাহিনীর পিছনে—দূর দিগন্তে আকাশের উত্তর-পূর্ব প্রান্ত আচ্ছন্ন ক'রে একটা আগুন জ্বলে উঠেছিল, তার লোলুপ লেলিহান শিখা বিস্তার

ক'রে।

তখনও সেটা খুব ভোর। ফরসা হয় নি ভাল ক'রে চারিদিক। রাত্রির স্মৃতি তখনও গাছপালায় পাহাড়ে অরণ্যে নিবিড় হয়ে লেগে আছে। প্রত্যূষের সেই প্রায়ান্ধকার আকাশে বেশ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছিল অনল-শিখার প্রজ্বলন্ত রক্তাভ রূপ।

শেষরাত্রে শত্রুসৈন্যের আকস্মিক আগমন-বার্তায় ঘুম ভেঙে বিস্মিত বিহ্বল হয়ে ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে প্রথমেই তাঁর চোখে পড়েছিল ধাবমান মুঘলবাহিনী নয়—তার বহু পিছনে সেই অগ্নিশিখা।

ঘুমের ঘোর তাই—হয়ত বা দুর্মতিরও অন্ধতা—নইলে দায়ূদ সেই বহ্নিকাণ্ডকে অত বড় ক'রে দেখতেন না। নইলে, দৃষ্টি সহজ থাকলে, বুঝতেন এমন কিছু বড় একটা আগুন জ্বলে নি কোথাও, বনের মধ্যে কোন চাষী বা মজুর শুকনো পাতা জড়ো ক'রে তাতে আগুন লাগিয়েছে, হয়ত বনপথ পরিষ্কার করার জন্যই।

কিন্তু অত খুঁটিয়ে দেখার মত অবস্থা তখন দায়ূদের নয়।

সামনে শত্রুসৈন্য—তার পিছনে আকাশের পৃষ্ঠপটে এই বিচিত্র বহ্নিলিপি। এইটুকুই তো যথেষ্ট।

অমোঘ, নিষ্ঠুর সে লিপির ভাষা, শুধু দায়ূদই পড়তে পেরেছিলেন তা।

যেমন পেরেছিলেন আর একদিন রাত্রে, পাটনায়—যখন ওপারে হাজিপুর কিলায় আগুন লেগেছিল—তখন।

সেদিন ভয়ে বিহ্বল হয়েছিলেন তিনি—দিগ্বিদিক্জ্ঞানশূন্য হয়েই পালিয়েছিলেন, সব কিছু ছেড়ে। নিতান্ত ছেলেমানুষের মতই ভয় পেয়েছিলেন।

সে বিহ্বলতা, সে ছেলেমানুষির দণ্ডও দিয়েছেন ঢের। বহু মূল্যবান জিনিস তিনি হারিয়েছেন সেই রাত্রে, বহু মূল্যবান প্রাণ। যা গেছে তা আর কোনদিন ফিরবে না—অনেক সঞ্চয়, জীবন-যাত্রা-পথের অনেক পাথেয়। পাথেয় আর সাথী। বিশ্বস্ত সেবক-সেবিকা।

না, বড়ই ভুল করেছিলেন সেদিন, বড় ভুল করেছিলেন। সে ভুলেরও দণ্ড হয়ত বাকী জীবনভোর বইতে হবে।

আজ তাই আর অত বিহ্বলতা প্রকাশ করলেন না দায়ূদ কররাণী। শুধু পিছু হঠবার হুকুম দিলেন—সপ্তগ্রাম হয়ে সিংভূমের পথে সুবর্ণরেখা ডিঙিয়ে তিনি উড়িষ্যা চলে যাবেন। সম্ভবত অত দূরে গিয়ে মুঘলরা তাঁকে উত্ত্যক্ত করতে চাইবে না। অত জঙ্গলে যাওয়ার উদ্যম বা ইচ্ছা তাদের থাকবে না। কিছুকাল অন্তত নিরাপদে থাকতে পারবেন তিনি।

গুজর খাঁ কতলু খাঁর দল বোঝালো তাঁকে। এখনও কিছুই হয়নি—লড়াই একটা হোক। বরং দায়ূদ তাঁর হারেম এখনই পাঠিয়ে দিন কোনও নিরাপদ স্থানে। না হয় উড়িষ্যাতেই পাঠান। কিন্তু এমনভাবে বিনাযুদ্ধে ওদের কাছে হার মানলে আফগান শক্তি আর কোনদিন মাথা তুলতে পারবে

না। বিহার তো গেছেই গৌড়বাংলাও যাবে চিরদিনের মত।…অথচ যদি দৈবাৎ কোনরকমে এ লড়াইয়ে জিতে যান দায়ূদ তো সসম্মানে একটা সন্ধি করতে পারবেন—অন্তত গৌড়বাংলা তাঁদের থাকবে।

কিন্তু দায়ূদ শুধুই ঘাড় নাড়েন।

পাংশু বিবর্ণ উদ্বিগ্ন তাঁর মুখ। কেমন একটু অন্যমনস্কও।

এতটা ঝুঁকি নিতে তিনি রাজী নন আর।

তাঁর সেই একই নির্দেশ।

পালাও। পিছু হঠ। খুব চুপি চুপি কাজ হাসিল কর—দুশমন না জানতে পারে।

অগত্যা পিছুই হঠতে হল। যে প্রধান, যে নায়ক সে যদি পিছু হঠে তো অনুগামীরা আগে যেতে পারে না।

পড়ে রইল পরিখা, পড়ে রইলো তাঁবু। খুচরো বহু জিনিসই পড়ে রইল। মায় হাতী-ঘোড়াও কিছু কিছু ফেলে যেতে হল। হাতিয়ারগুলোও সব গুছিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না। এবারও বহু জিনিস দুশমনের হাতে গিয়ে পড়বে।

পিছু হঠবার হুকুম দিলেই সৈন্যবাহিনীর মনোবল ভেঙে দেওয়া হয়—আতঙ্কের কারণ না থাকলেও তারা খানিকটা আতঙ্কগ্রস্ত হয়। ফলে সময় থাকলেও সব গুছিয়ে নিতে পারে না তারা—মানের চেয়ে 'জান্'টা বড় হয়ে ওঠে, কোনমতে প্রাণটা নিয়ে পালাবার জন্য উৎসুক উন্মুখ হয় তখন।

অত তাড়া কিন্তু সত্যিই ছিল না—কারণ মুনিম খাঁ তাদের আক্রমণ করেন নি।

নফিসা তাঁকে নিষেধ করেছিল। কেন করেছিল তা কিছু খুলে বলে নি। শুধু বলেছিল, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, মুঘলরা এদিক দিয়ে গিয়ে পড়লেই ওরা পালাতে শুরু করবে, মিছিমিছি আপনি লড়াই করবেন কেন? অনর্থক কতকগুলো প্রাণ আর রসদ গুলি গোলা নষ্ট।'

তাকে বিশ্বাস করেছিলেন মুনিম খাঁ।

এই বিচিত্র মেয়েটা তাঁকে ক্রমশই অভিভূত ক'রে ফেলেছে। ওর অদ্ভুত শক্তি—আশ্চর্য উদ্যম আর কর্মদক্ষতা। এই দু'দিনেই ওর যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে বুঝেছেন, নিজেই একটা যুদ্ধ-পরিচালনার ক্ষমতা রাখে ও।

ওর কথার ওপর তাই তিনি পুরোপুরি ভরসা করেছিলেন। অধস্তন সেনাপতিরা বিস্মিত হয়েছিল তাঁর এই আচরণে। সুবর্ণ সুযোগ চলে যাচ্ছে। অতর্কিত আক্রমণের ফলে বিহ্বল অবস্থা থাকতে থাকতে ওদের ওপর হাম্‌লা করা দরকার। নইলে—ওদের যদি তৈরী হবারই সময় দেবেন তো এত কাণ্ড করার কি প্রয়োজন ছিল? ওরা শত্রু হিসেবে আদৌ সামান্য নয়—যদি তৈরী হয়ে নিতে পারে তাহলে কি খুব সহজ হবে ওদের হারানো?

কিন্তু মুনিম খাঁ ওদের কথায় কান দেন নি। হাতীর ওপর বসে দ্রু

কুঞ্চিত ক'রে একচোখে একটা দূরবীন লাগিয়ে ওদিকে চেয়েছিলেন স্থির হয়ে। এ সময় নফিসাকে কাছে পেলে ভাল হ'ত, কিন্তু নফিসা কাল রাত্রে তাঁদের যাত্রা শুরু হতেই কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে আর তার পাত্তা পাননি। মুনিম খাঁর মনটা ক্ষণে-ক্ষণেই এই যুদ্ধক্ষেত্র, এই আসন্ন বিপদ এবং রাজনীতির জটিলতা ছেড়ে, ভবিষ্যৎ কর্তব্যের বিরক্তিকর সমস্যা ছেড়ে চলে যাচ্ছে সেই মেয়েটির কাছে। অনেক দুঃখ পেয়েছে বেচারী, অনেক লাঞ্ছনা। এখন যদি তাঁর কাছে থাকতে রাজী হ'ত! অন্তত তাঁর জীবনের বাকী ক'টা দিন!

সেই ক'দিনের মধ্যে তার ভবিষ্যতের একটা ব্যবস্থা ক'রে দিতে পারতেন।

অদ্ভুত মেয়ে! তাঁর ঔরসজাতা বলেই শুধু নয়—ওর সমগ্র পরিচয়টাই বিচিত্র!

এ মেয়েকে কাছে পাওয়া—এর সেবা, সাহচর্য, পরামর্শ পাওয়া সৌভাগ্যেরই কথা।

কোথায় যে গেল মেয়েটা! কে জানে, আর কোনও দিন তাঁর কাছে ফিরে আসবে কি না!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেই মুনিম খাঁ আবারও দূরবীনটা তুলে নেন চোখে।

সুদূর অতীত এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যত থেকে মনটাকে ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করেন সমস্যা-জটিল বর্তমানেই।

না, মেয়েটা ঠিকই বলেছিল। খান-ই-খানানের অভিজ্ঞ ও অভ্যস্ত চোখ ওদের স-সন্তর্পণ পশ্চাদ্‌গতি টের পায় ঠিকই। পিছুই হঠছে ওরা, প্রাণপণে চলে যাওয়ার চেষ্টাতেই ব্যস্ত হয়ে পড়েছে।

তাজ্জব, ভারি তাজ্জব!

এত আয়োজন, এত তোড়জোড়—লড়াইয়ের এত 'সামান', এত জঙ্গী ফৌজ থাকতে একবার চেষ্টাও করলে না! অথচ এরা কাপুরুষ নয়। সে প্রমাণ বহুবারই পেয়েছেন মুনিম খাঁ।

নিতান্তই ভাগ্য। ভাগ্যই ওদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে।

এখন দেখা যাচ্ছে ওদের মন্দভাগ্যই ওদের সবচেয়ে বড় দুশমন। মুঘলরা নিমিত্ত মাত্র।

মুনিম খাঁ হাতীর পিঠে স্থির ও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে রইলেন প্রায় সারা-দিনই।

॥ ১৫ ॥

অন্তঃপুরিকারা নিরাপদে চলে গেছেন। তোশাখানাও বিশ্বাসী ইউসুফজাই সেনাদের পাহারায় পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। খাজানা ও খাজাঞ্চীখানা নিয়ে গেছে উজবেগী দেহরক্ষীরা। তোপখানাও চলতে শুরু হয়েছে এবার। দায়ুদ কররানী অনেকটা নিশ্চিন্ত এখন। বাকী আছে শুধু সাধারণ সিপাহীরা—তা তারা ঠিকই যাবে, তাদের জন্য অতটা উদ্বেগ নেই।

কিন্তু গতবারের মত—অর্থাৎ পাটনার মত—দায়ুদ নিজে সর্বাগ্রে যাবার চেষ্টা করেন নি এবার। কে জানে কেন, তিনি এখনও পর্যন্ত এখানেই থেকে গেছেন। যুদ্ধসীমার বাইরে, নিরাপদ পথের ধারে তিনি কয়েকজন মাত্র তাঁর দেহরক্ষীকে নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। কেন করছিলেন তা কেউ জানে না, হয়ত তিনি নিজেও না। দেহরক্ষীরা ভাবছিল—তোশাখানা ও খাজাঞ্চীখানা নিরাপদে না সরানো পর্যন্ত নিশ্চিত হতে পারছেন না বলেই সুলতান অপেক্ষা করছেন। যদিও এগুলো পাঠানোর কোন কাজেই তিনি লাগছেন না—তার জন্য যোগ্যতর কর্মচারীরাই আছে—তিনি শুধুই ভ্রূ কুঞ্চিত ক'রে শূন্য দিগন্তের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছেন।

এদিকে প্রভাত মধ্যাহ্নে এবং মধ্যাহ্নও একসময় অপরাহ্নে ঢলে পড়ল। দেহরক্ষীরা চঞ্চল হয়ে উঠেছে। সারাদিনই তাদের এইভাবে কেটেছে—ঘোড়ার পিঠের ওপরই বলতে গেলে। মধ্যে মধ্যে দু-একজন ক'রে নেমে একটু-আধটু পায়চারি ক'রে নিয়েছে বটে, মধ্যে খাবারও খেয়ে নিয়েছে এমনি ভাবেই—তবু সারাদিনের এই কর্মহীন, উদ্দেশ্যহীন প্রতীক্ষা তাদের অসহ্য লাগছে। সারা শরীর আড়ষ্ট হয়ে উঠেছে একভাবে বসে থেকে থেকে। তা ছাড়া একটু পরেই সন্ধ্যা নামবে, চারিদিকে জঙ্গল—এখন একটা কোথাও নিরাপদ আশ্রয় খোঁজ না করলে সারারাত সশস্ত্র ও সশঙ্ক কাটাতে হবে হুঁশিয়ার হয়ে। রাত্রে রওনা দেবার মত পথ এসব নয়।

সবচেয়ে কষ্টকর অবস্থায় পড়েছেন শ্রীহরি গুহ। তিনি যুদ্ধ-ব্যবসায়ী নন—নেহাতই কেরানী। হিসেবের খাতা সামনে পেলেই তাঁর প্রতিভা খোলে ভাল। তলোয়ার একটা কোমরে গোঁজা আছে বটে, কিন্তু কার্যকালে তা চালাতে পারবেন না—সে-কথা তিনিই ভাল জানেন। তিনি যা চালাতে পারেন তা কলম, ঐ বস্তুটি হাতে পেলে একলহমায় ভেল্কি দেখিয়ে দিতে পারেন। তাঁকে যে মিছিমিছি সুলতান কেন আটকে রাখলেন তা এখনও বুঝতে পারছেন না। ঘোড়ার পিঠ থেকে অবশ্য অনেকক্ষণই নেমে পড়েছেন—তবু বসে বসে তাঁর মাজা টনটন করছে। খাজাঞ্চীখানার সঙ্গে গেলে শুধু যে গাড়িতে চেপে যেতে পারতেন তাই নয়—এতক্ষণ বহুদূরে কোন স্থানে

পৌঁছে আরাম করতে পারতেন। ঘোড়া ও বলদের জন্যও অন্তত—এতক্ষণে কোন নিরাপদ আশ্রয় খোঁজ করতে হ'ত, একটু বিশ্রামের আশা ছিল। কিন্তু এ তো—যা তাঁর এই অর্বাচীন মনিবের কাণ্ড দেখা যাচ্ছে—সারারাত হয়ত এইভাবেই কাটাতে হবে। ওঁর তো মাতালের কাণ্ড, ঘোড়ার পিঠেই খুব সম্ভব মদের কুপি বাঁধা আছে, এর পর কেউ ঢেলে দেবে আর উনি খেতে শুরু করবেন। আর ও-বস্তু পেটে পড়লে লোকে পৃথিবীর সব কিছুই ভুলে যায়, তা সামান্য মাজার ব্যথা! কিন্তু শ্রীহরির ওসব বিশেষ অভ্যাস নেই—খেলেও একটু-আধটু কখনও-সখনও দৈবাৎ খেয়েছেন—আর খেলেই বা এই মাঠের মধ্যে তাঁকে দিচ্ছে কে? তিনি এই মাজা-টনটনানি নিয়ে করেন কী? উঃ, কী যে দুর্মতি হল সুলতানের—খাজাঞ্চীর স্থান খাজাঞ্চীখানায়, এটা কিছুতেই মাথায় গেল না!

অথচ দায়ুদ আজ যেন বেশী ক'রে আঁকড়ে ধরেছেন শ্রীহরিকে।

তাঁর আর সমস্ত পারিষদদের মত শ্রীহরি কখনও মুখে লম্বা-চওড়া কথা বলেন না—বড় বড় ভরসাও দেন না। বরং ভয়ই দেখান। দায়ুদের যে পতন শুরু হয়েছে তা তিনি বোঝেন একমাত্র শ্রহরির মুখের দিকে চেয়েই। শ্রীহরি কিছুদিন থেকেই ছুটি চাইছেন। তিনি বলেন, মুঘলরা সমস্ত বাংলাদেশটাই নেবে, আকবর বাদশার জন্মলগ্নে নাকি একাদশে বৃহস্পতি আছেন। সে বস্তুটা কী তা দায়ুদ জানেন না—তবে এটা বোঝেন যে,সে একটা প্রকাণ্ড সৌভাগ্যের লক্ষণ। পাঠানশক্তি থাকবে না—তাই সময় থাকতেই তিনি সরে পড়তে চান। তা বলে তিনি এখনই ছুটে গিয়ে মুঘলদের পায়ে পড়তেও চান না। আসলে তিনি বিশ্রাম চান। তাঁর বয়সও হল ঢের। শুরবংশের আমল থেকে চাকরি করছেন, সুলেমান কররাণীকে রাজস্বের হিসাব নিয়ে যে কোনদিন মাথা ঘামাতে হয় নি—সেও তাঁরই দৌলতে। সুতরাং আর কেন? ঢের দিন চাকরি করেছেন—এবার একটু বিশ্রামও দরকার। আর সে স্থানও তিনি ঠিক করেছেন। পাখিরা দুপুরে থাকতে-থাকতেই সন্ধ্যার নীড় রচনা ক'রে রাখে, তিনিও সেই পক্ষিধর্মই গ্রহণ করেছেন। বাংলার একেবারে দক্ষিণে, বলতে গেলে সমুদ্রের কাছাকাছি, অসংখ্য নদীপরিবেষ্টিত খানিকটা জমি দেখে রেখেছেন। পরগনা ধুমঘাট। সেখানে অনেক দিন আগে থেকেই প্রজা বসতি ক'রে লোক রেখে বেশ একটু জমিদারী পত্তন করেছেন। তাঁর ভাই বসন্ত সেটা দেখাশুনো করে। স্ত্রী-পুত্র-কন্যাকে বহুদিন আগেই পাঠিয়ে দিয়েছেন তিনি, দায়ুদ সিংহাসনে বসার পরই। যেন এই ভবিষ্যৎ সেদিন তিনি নখদর্পণে দেখতে পেয়েছিলেন।...অদূরে গিয়ে জনপদ পত্তন করার কারণও খুব স্পষ্ট। প্রথমত অত নদী চারদিকে, মুঘলদের পক্ষে যাওয়া সহজ নয়, তা ছাড়া ওসব নোনা দেশ, এমনিই তারা যেতে চাইবে না। শরীর টিকবে না।

শ্রীহরির এই স্পষ্ট ও সত্য-ভাষণের জন্যই দায়ুদ ওঁকে পছন্দ করেন। কেমন ক'রে তাঁর ধারণা হয়েছে তাঁর চারিদিকের অসংখ্য মিথ্যাচারীর মধ্যে

শ্রীহরিই সাচ্চা লোক। তিনি যে টাকা-পয়সা উপরি রোজগার করেন—তাও গোপন করেন না। শ্রীহরি বলেন, 'জাহাঁপনা তো জেনেশুনেই আমাকে ত্রিশ তঙ্কা বেতন দিচ্ছেন। এতে যে আমার চলা সম্ভব নয় তা কি জানেন না আপনি?'

আজকাল দায়ুদ তাই এমন ভাবে আঁকড়ে ধরেছেন শ্রীহরিকে, লুদী মিয়া চলে যাবার পর তাঁর শুভ বা কল্যাণ চিন্তা করার লোক আর-কেউ নেই, অন্তত স্পষ্ট কথা ও সত্য কথা বলার মত একটা লোক কাছে থাক্।

ফলে শ্রীহরির হয়েছে প্রাণান্ত।

তিনি না পারছেন পালাতে, না পাচ্ছেন ছুটি।

সত্যি-সত্যিই কিন্তু মনিবকে এই অবস্থায় ফেলে চলে যাওয়া যায় না—নিজে থেকে ছুটি না দিলে। ওঁদের বংশের অনেক নিমক খেয়েছেন তিনি। তিনি বুদ্ধিমান—কিন্তু নিমকহারাম নন।...

অবশেষে একসময় তিনিই কথাটা পাড়লেন।

গলা-খাঁকারি দিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালেন।

'জাহাঁপনা কি রাতটা তাহলে এখানেই কাটাতে চান।'

'রাত?' কতকটা বিহ্বল নেত্রে চান দায়ুদ শ্রীহরির মুখের দিকে।

'আজ্ঞে হ্যাঁ, রাত্রের কথাই বলছি। রাতটাও কি এই ভাবে কাটাবেন?'

'কেন বল তো?'

'তাহলে তার একটা আয়োজন আছে। এখনও খুব বেশী অন্ধকার হয় নি, এখনও চোখ চলছে। চেষ্টা করলে কিছু শুকনো কাঠ-কুটো জোগাড় করা যাবে।... চকমকি পাথরও একটা গাঁ থেকে জোগাড় করতে হবে। এদের কাছে তো ওসব নেই শুনছি। আগুন তো একটু করা দরকার।'

'আগুন!' চমকে ওঠেন দায়ুদ কররাণী। তাঁর গলা দিয়ে আর্তস্বর বেরোয় একটা। যেন আর্তনাদই করে ওঠেন।

'আগুন কী হবে?'

'বাঘ তাড়াতে হবে, জনাব। একটু আগুনের ব্যবস্থা রাখা দরকার।'

'বাঘ?'

'হ্যাঁ। বাঘ—এদিকের শের মুঘলের চেয়ে কম ভয়ানক নয়, জাঁহাপনা। ওদের হাত থেকে বাঁচতে গিয়ে শেষে কি বাঘের হাতে প্রাণ দেব?'

এইবার যেন একটু একটু ক'রে দায়ুদের মাথায় কথাটা গেল। এতক্ষণ সমস্ত সময়টাই অন্যমনস্ক ছিলেন—এবার মনটা ফিরিয়ে নিয়ে এলেন বর্তমান পরিবেশে।

ইস্, সত্যিই দিন আর নেই। অনেক বেলা হয়ে গেছে।

অস্নাত অভুক্ত রক্ষীর দল নিষ্ক্রিয়তাতেই যেন আরও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

সূর্যের দিকে চেয়ে দেখলেন একবার। ইতিমধ্যেই দূর পাহাড়ের মাথার ওপর ঢলে পড়েছে। দেখতে দেখতে অন্ধকার হয়ে যাবে এখনই। তারপর—।

দায়ুদ একটু ইতস্তত করলেন। বিপন্নমুখে একবার তাকালেন অনুচরদের

দিকে। তারপর বললেন, 'শ্রীহরি,' তুমি এক কাজ কর।···আচ্ছা, আমাদের তাঁবু ফেলবার জায়গা কোথায় ঠিক হয়েছে?'

'আজ্ঞে কোথাও ঠিক হয় নি। হবে কী করে? আপনি তো কোন হুকুম দেন নি।'

'সেগুলো কোথায়?'

'দুটো তিনটে হাতীর পিঠে বোঝাই দিয়ে পাঠানো হয়েছে। কথা আছে, বেলা তৃতীয় প্রহরের মধ্যেই আমরা যদি ওদের ধরে ফেলতে না পারি তো—সেই সময় ওরা যেখানে পেঁছিবে, তারই কাছাকাছি একটা ভাল জায়গা দেখে অপেক্ষা করবে।'

'তাহলে তুমি এখনই এদের নিয়ে রওনা হয়ে যাও। এখন খুব জোরে ঘোড়া হাঁকালে তুমি একপ্রহর রাত হবার আগেই তাদের ধরে ফেলতে পারবে। সেখানে গিয়ে তাঁবু খাটিয়ে রাতটার মত বিশ্রামের আয়োজন ঠিক কর, রসুই-টসুইও একটু তদারক কর—আমি একটু পরে আসছি।'

এবার বিস্মিত হবার পালা শ্রীহরির।

'আপনি এখানে একা থাকবেন? একা?'

'এখানে ঠিক থাকব না হয়ত।—একটু ঘুরে যাব।···আমার—আমার একটু কাজ আছে—'

'কোথায় ঘুরবেন আবার আপনি? চারদিকে দুশমন, সন্ধ্যাবেলা, জঙ্গলের পথ।··· শের আছে, ভালু আছে। না না, আপনি চলুন। নয়তো আমরাও চলি আপনার সঙ্গে—যা ঘোরবার ঘুরে একসঙ্গেই পেঁছিব।'

'না—না—এত ক্লান্ত হয়ে গিয়ে তখন আর তাঁবু ফেলবার জন্য অপেক্ষা করতে পারব না। তোমরা এগিয়ে যাও। আমি একাই থাকব। আমার কিছু হবে না।'

'না জনাব। একা রেখে আপনাকে যাব না। এ জঙ্গলের পথে একা কোথাও যেতে দেব না। সাফ কথা আমার কাছে।'

শ্রীহরির কণ্ঠে আন্তরিক দৃঢ়তা।

তাঁর এই দৃঢ়তায় কে জানে কেন দায়ুদের চোখে জল এসে যায় অকস্মাৎ। আছে তাহলে, এখনও প্রভুভক্ত বিশ্বস্ত সেবক দু-একজন আছে। সত্যকার শুভানুধ্যায়ী দু-একজন। তারা তাহলে একেবারে পরিত্যাগ করে নি ওঁকে!

অথচ এ বিশ্বস্ততার তিনি যোগ্য নন।

সবচেয়ে বিশ্বস্ত এবং শুভানুধ্যায়ী যে ওঁর বংশের, তাকে তিনিই হত্যা করিয়েছেন—অকারণে, অন্ধ মূঢ়তায়।

দায়ুদের মরাই উচিত। তাঁর জন্য অন্তত এইসব লোকের বিচলিত হওয়ার কারণ নেই।

তবু তিনি শ্রীহরিকে কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর আন্তরিকতার সামনে নতি-স্বীকার করতেই হল ওঁকে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'যদি নিতাই একা যেতে না দাও তো গোলাম কাদের থাক্। তোমরা এগিয়ে

যাও। আমার একটা খোজ নিয়ে যেতেই হবে শ্রীহরি, নইলে স্বস্তি পাব না। আমার এক গোপন শত্রুর খবর নিতে হবে। কিন্তু একা যাওয়াই দরকার, গোপনে। বেশী লোক থাকলে সুবিধা হবে না। দুশমন হুঁশিয়ার হয়ে যাবে। ...যাক, একলা যখন ছাড়বেই না—একজন থাক।'

গোলাম কাদেরও বহুদিনের লোক। ছেলেবেলায় বলতে গেলে ওর কোলেপিঠেই মানুষ হয়েছেন দায়ুদ। শুধু শক্তি নয়, যথার্থ নিরাপত্তার জন্য মানুষের চারিদিকে স্নেহের প্রাচীরই দরকার হয়—এটা এতদিনে সুলতান জেনেছেন।

শ্রীহরি আর কথা বাড়ালেন না। সকল প্রভুধর্মের চেয়েও আত্মরক্ষা বড় ধর্ম। তাঁর শরীর এখনই ভেঙে পড়তে চাইছে, এরপর আবার ঘোড়া হাঁকিয়ে এতটা পথ যাওয়াই হয়ত অসম্ভব হয়ে পড়বে। তিনি সংক্ষেপে সুলতানের আদেশ সকলকে জানিয়ে, গোলাম কাদেরকে ইঙ্গিতে এখানেই থাকতে বলে, বাকী সকলকে নিয়ে তখনই রওনা হয়ে গেলেন। দেখতে দেখতে তাঁদের ঘোড়ার ক্ষুরের শব্দ দূর বনপথে মিলিয়ে গেল। এখানে রইলেন শুধু দায়ুদ ও গোলাম কাদের।

॥ ১৬ ॥

সকালে উত্তর-পূর্ব দিকে তাকিয়ে তন্দ্রাজড়িত চোখে শুধু কি মুঘলবাহিনী আর তার পিছনে একটা আগুন দেখেছিলেন দায়ুদ কররাণী?

না।

আরও কিছু দেখেছিলেন। আর সেইটেই কিছুতে ভুলতে পারছেন না।

সেই আগুনের শিখার পটে দেখেছিলেন মিয়া লুদী খাঁকে।

স্পষ্ট, জীবন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছিলেন। ঘোড়ার পিঠে সওয়ার, হাসি-হাসি মুখ। যেমন সস্নেহ সকৌতুক প্রশ্রয়ের একটা হাসি তাঁর মুখে লেগে থাকত—তেমনি হাসিটুকুও যেন চোখে পড়েছিল সে-মূর্তির দিকে তাকিয়ে!

অতদূর থেকে অমনভাবে দেখতে পাবার কথা নয়—তবু স্পষ্টই দেখতে পেয়েছিলেন—এটাও ঠিক।

মুঘলবাহিনীর অগ্রগামী সর্পিল রেখার পিছনে, আগুনের কাছাকাছি সে দাঁড়িয়ে ছিল—সেই ছায়ামূর্তি। ছোট্ট এতটুকু দেখাবার কথা। তবু মনে হয়েছিল, তিনি যেন সামনাসামনি দেখছেন লুদী মিয়াকে।

এতবড় বিরাট মূর্তিতেই কি দাঁড়িয়েছিলেন তিনি? তা কি সম্ভব?

চোখের ভ্রম?

অনুতপ্ত উদভ্রান্ত মস্তিষ্কের কল্পনা?

সেইটেই তিনি যাচাই ক'রে দেখতে চান। কাছে গিয়ে, নিজের চোখে।

আর সেই সঙ্গে আগুনের কারণটাও। কিসের আগুন ওটা? নাকি আগুনটাও কল্পনা? অথবা নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর সামান্য আগুন একটা?

কই, আর তো কেউ একবারও বললে না আগুনের কথা।

অত ভয়ের মধ্যে, অত বিরক্তিকর কথা-কাটাকাটি জবাবদিহির মধ্যেও সেটা লক্ষ্য করেছিলেন দায়ুদ, উন্মাদও যেমন এক-একটা জিনিস সহজ মানুষের মতই লক্ষ্য করে—তেমনিই।...একথাটাও একবার মনে হয়েছিল তাঁর। তবে কি তিনি পাগলই হয়ে যাচ্ছেন? আর ঐ আগুনটা সেই উন্মত্ততারই একটা লক্ষণ? সেদিন থেকে—পাটনার সেই ঘটনার পর থেকে মনের মধ্যে স্থির হয়ে আছে ছবিটা, ভয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছে চিরদিনের মত? ভয় পেলেই একটা আগুন দেখছেন?

না কি সত্যি-সত্যিই তাঁর পাপের ফল?

খোদার অভিশাপ?...

সেইটেই জানতে চান তিনি। কারণটা দেখতে চান নিজের চোখে।

ভয় পেয়েছিলেন সেদিন, আজও পেয়েছেন।

নামহীন, আকারহীন, কারণহীন আতঙ্ক অনুভব করেছেন।

তবু তিনি কাপুরুষ নন ঠিক।

অল্পবয়সে অতিরিক্ত মদ্যপান ও লাম্পট্যের ফলে হয়ত তাঁর স্নায়ু কিছু দুর্বল—কিন্তু তবু পাঠানেরই রক্ত তাঁর ধমনীতে, তিনি সুলেমান কররাণীর পুত্র।

ভয়ের বাসা স্নায়ুতে—সাহসের বাসা তাঁর রক্তে।

তিনি এর একটা চূড়ান্ত মীমাংসা করে ফেলতে চান আজই। এমন করে একটা অকারণ ভয়ে ছুটাছুটি করে বেড়ানোর অর্থ হয় না—এমন করে সকলকার কাছে, তাঁর কর্মচারীদের কাছে অপদস্থ হওয়ার। এমন শূন্যে-ভেসে-থাকা আতঙ্কে আর অভিভূত হতে চান না তিনি।

ঐখানে যাবেন তিনি, আগুনটা যেখানে জ্বলেছিল।

দিকটা ঠিক আছে। তাঁর পথটা ঘুরে এদিকেই এসে পড়েছে।

এই জঙ্গলটার মধ্যে দিয়ে ওখানে গিয়ে পড়লে কেউ টের পাবে না। মুঘলরা নিশ্চিন্ত হয়ে আনন্দ করছে, শিবির ফেলতেও ব্যস্ত। তাছাড়া মধ্যে ঘন জঙ্গল এবং একটা নদীর ব্যবধান আছে। এখানে ওদের আসবার সম্ভাবনা নেই।

দায়ুদ মুহূর্তের মধ্যেই ভেবে নিলেন কথাগুলো। বিচার ক'রে দেখলেন অবস্থাটা। তারপরই ঘোড়াকে ইঙ্গিত করলেন এগিয়ে যেতে।

সন্ধ্যার বেশী দেরী নেই। তাড়াতাড়ি করা দরকার।

আগুনটা যেখানে জ্বলছে বলে মনে করেছিলেন—তার একটা আন্দাজী হিসাব ছিল মনে মনে। সূর্যের দিকে চেয়ে দিকটা ঠিক ক'রে নিয়ে সেইদিকেই চললেন দায়ুদ কররাণী। গোলাম কাদেরের দেখাদেখি তিনিও তলোয়ার

খাপে পুরে পিঠে-বাঁধা বর্শাটা খুলে নিয়েছেন। এসব জঙ্গলের পথে লম্বা হাতিয়ার থাকাই সুবিধা। সাবধানের বিনাশ নেই।

যথাসম্ভব দ্রুতই যাচ্ছিলেন। বনের পথ—শাখা-প্রশাখায় ঢাকা। নীচে মাটিতে আগাছার জঙ্গল কম, এসব অঞ্চলে দক্ষিণ-বাংলার মত ঘন আগাছা থাকে না—কিন্তু তেমনি বন্য-লতার উপদ্রব। শক্ত শক্ত লতাগুলো এ-গাছ থেকে ও-গাছে প্রসারিত হয়ে পথ বন্ধ ক'রে রেখেছে। তা ভেদ ক'রে যাওয়া রীতিমত কঠিন। এক এক জায়গায় ওপর থেকে ঝুলে পড়েছে—মাকড়শার মতই জাল রচনা ক'রে রেখেছে যেন।

সন্ধ্যার বেশী দেরী নেই। একটু পরেই অন্ধকার ঘনিয়ে আসবে, পথ দেখা শক্ত হবে তখন। সঙ্গে আলো বা আগুনের কোন আয়োজন নেই। এত দেরি করা কিছুতেই উচিত হয় নি। যদি অন্ধকার হয়ে যায় তো সারারাত এই জঙ্গলেই কাটাতে হবে, আর সেটা খুব নিরাপদ হবে না।

এইসব ভেবেই অসহিষ্ণু বিরক্তিতে এগোচ্ছিলেন দায়ুদ। আজকের মত ফিরে গিয়ে কাল সকালে আবার আসাই হয়ত উচিত—এটাও ভাবছেন এক-একবার, কিন্তু থামতেও পারছেন না। তেমন বিপদজনক অন্ধকার ঘনিয়ে আসবার আগেই না হয় ফিরবেন, মনকে এই প্রবোধ দিচ্ছেন—তার আগে পর্যন্ত দেখতে দোষ কী?

তবু—আশায় আশায় এগিয়ে গেলেও—এত সহজে যাত্রা শেষ হবার আশা করেন নি দায়ুদ। অথচ তা-ই হয়ে গেল।

যেতে যেতে হঠাৎ এক জায়গায় এসে একটু চমকে যেতে হল। সচেতন হয়ে উঠলেন দায়ুদ—কই, সেই কষ্টদায়ক কঠিন লতাগুলো তো আর তেমন বাধা দিচ্ছে না। গাছের দিকে তাকিয়ে দেখলেন—সত্যিই একটা লতাও এখানের কোন গাছে ঝুলছে না। আশেপাশের গাছগুলোর দিকে আরও ভাল ক'রে তাকালেন—মনে হল শুকনো ডালপালাগুলো কোন মানুষই ভেঙে নিয়েছে।

ঝাপসা হয়ে এসেছে দিনের আলো। গাছপালার ছায়ায় আরও ঝাপসা লাগছে।···নজর খুব বেশী চলে না। দায়ুদ গাছগুলোর তলায় তলায় গিয়ে ভাল ক'রে দেখলেন।

মানুষের হাতের ছাপ সুস্পষ্ট।

গোলাম কাদের প্রভুর নীরব প্রশ্নটা বুঝল। বললে, 'কোন মানুষই এসে ভেঙে নিয়ে গেছে জাঁহাপনা—কোন কাঠুরে হয়ত এসেছিল কাঠ কাটতে।'

গহন অরণ্য। পায়ে-চলা পথের চিহ্ন পাওয়াই কঠিন। এতক্ষণ ধরে খুব কষ্ট করেই সে-চিহ্ন খুঁজতে হয়েছে। কদাচিৎ কেউ আসে এখানে। কিন্তু যে-ই আসুক সে বনের একেবারে প্রান্ত থেকে কাঠ কাটতে কাটতে ভেতরে এগোয়, এ-ই নিয়ম। এমন নির্জনে একেবারে জঙ্গলের মধ্যে এসে শুকনো লতা আর ডালপালা ভাঙবে কেন?

দায়ুদ চিরদিনই ঝোঁকের মাথায় কাজ ক'রে বসেন। আজও একটা

অসম-সাহসিক কাজ করলেন। ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

সেই গভীর বনের মধ্যে, প্রায়ান্ধকার অপরাহ্ণে পায়ে হেঁটে এগোনো মানে আত্মহত্যারই চেষ্টা করা। সাপ আছে, বাঘ আছে—ভালুক থাকাও বিচিত্র নয়। গোলাম কাদের কী বলতে গেল, কিন্তু দায়ুদ সে সময় দিলেন না। একটু অসহিষ্ণুভাবেই বললেন, 'নেমে এসে ঘোড়া দুটোকে কোন গাছের সঙ্গে বেঁধে ফেল। এখানটা একটু পায়ে হেঁটেই ঘুরতে হবে।'

মনিবকে বিলক্ষণ চেনে গোলাম কাদের। তাঁর জন্মাবধিই তাঁকে দেখছে বলতে গেলে। সুতরাং প্রতিবাদের চেষ্টা না করে নেমেই পড়ল। ঘোড়া দুটোকে গাছে বেঁধে পাংশু বিবর্ণ মুখে খোদাকে স্মরণ করতে করতে দায়ুদের পিছু পিছু চলল।

কিন্তু গোলাম কাদের যত তাড়াতাড়িই করুক—ঘোড়া দুটোকে বাঁধতে অবশ্যই কিছু দেরি হয়েছিল।

ততক্ষণে দায়ুদ খানিকটা এগিয়ে গেছেন।

একটা বড় পুরনো সেগুনগাছের গুঁড়ি ঘুরে অপেক্ষাকৃত একটু খোলা জায়গায় এসে পড়েছেন তিনি। আর সেখানে আসতেই নজরে পড়েছে মাঝামাঝি স্তূপাকার করা শুকনো কাঠ-কুটো লতাপাতার রাশি, আর খুব সম্ভব সেই পর্বতপ্রমাণ ইন্ধন থেকেই এক বোঝা সংগ্রহ করে নিয়ে বিপরীত দিকে যাচ্ছে—একটি মেয়ে।

ঝাপসা আলো—মেয়েটিও পিছন ফিরে আছে, তবু দায়ুদ চমকে উঠলে। অকস্মাৎ নিশ্চিন্ত আরামের মধ্যে বিছা কামড়ালে যেমন মানুষ যন্ত্রণা পেয়ে চমকে ওঠে, তেমনিই চমকে উঠলেন।

চিনেছেন, চিনেছেন।

এ-ই তো সেই স্বপ্নে-দেখা সর্বনাশিনী, মৃত্যুদূতী!

মূর্তিমতী প্রতিহিংসা!

চমকে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অস্ফুট একটা শব্দও বোধ করি বেরিয়ে গিয়েছিল ওঁর মুখ দিয়ে।

নির্জন নিস্তব্ধ শান্ত বনমধ্যে সামান্য শব্দই বহুদূরে যায়—প্রতিধ্বনি জাগাতে জাগাতে এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে।

মেয়েটির কানেও গেল সে-শব্দ।

অন্যমনস্ক ছিল হয়ত খুব বেশী—নইলে জুতোর শব্দও—তা সে যত সন্তর্পণেই দায়ুদ চলুন না কেন—পাবার কথা।

কিন্তু এই শব্দেই সে-ও চমকে উঠল।

চমকে উঠে ফিরে চাইল।

আর যাই হোক—এই ঝাপসা আঁধারে এই গহন বনে অন্তত দায়ুদ কররাণীকে দেখবার আশঙ্কা করে নি সে।

আলো যতই কম হোক, চেনবার অসুবিধা হয় নি তারও।

নিমেষে পাথর হয়ে গেল মেয়েটি।

এবং সে বিমূঢ়তা সামলে সম্বিৎ ফিরে পাবার আগেই দায়ূদ কররাণী প্রায় চোখের নিমেষে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন ওর—একটা হাত বজ্রমুষ্টিতে চেপে ধরে কঠোর কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, 'তুমিই তাহলে আজ ভোরে আগুন জেবলেছিলে? এইসব কাঠ-কুটো নিয়ে গিয়ে?···আমাকে ভয় দেখাতে?··· বল বল, জবাব দাও।'

দুই চোখে আগুন দায়ূদ কররাণীর। অসহ ক্রোধে দুই রগের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে, সমস্ত মুখ অরুণবর্ণ। উত্তেজনায় ঠকঠক করে কাঁপছেন তিনি।

এতদিনের এত অপমান রক্তের তৃষা নিয়ে জেগে উঠেছে মাথার মধ্যে— প্রতিশোধ কামনায়।

তখনই মুরগীর ঘাড় ছেঁড়ার মত মেয়েটাকে ধরে দু টুকরো ক'রে ফেলতে পারলে শ্বস্তি পান তিনি।

এতদিনের এত লাঞ্ছনার মূলে এই তুচ্ছ মেয়েটা—আর তার ভয় দেখানোর উপকরণও এত হাস্যকর রকমের তুচ্ছ! এটা মনে হলেই আরও অপমান বোধ হয় যে!

তিনি মেয়েটার হাত ধরে ঝাঁকানি দেন গোটাকতক।

পিছনে গোলাম কাদের এসে দাঁড়িয়েছে, হাতে বর্শা। বাঁ-হাতখানা কোমরের তলোয়ারে।

মেয়েটা বুঝল যে পালাবার উপায় নেই। কিন্তু সে বিচলিতও হল না —শুধু অপূর্ব কৌশলে মাথাটা নেড়ে কাঠের বোঝা ফেলে দিল, তারপর বুক আর মাথা সোজা করে দায়ূদের চোখের ওপর চোখ রেখে বলল, 'হ্যাঁ, আমিই জেবলেছি আগুন। আরও জবালাতুম রাত্রে। আপনি এখনও এ অঞ্চলে আছেন শুনেছিলুম।'

স্তম্ভিত হয়ে যান দায়ূদ ওর এই স্পর্ধায়।

'তুমি! তুমিই দিয়েছিলে আগুন? সত্যি-সত্যিই?'

বিহবল ভাবে প্রশ্ন করে যান দায়ূদ।

হাতে হাতে ধরে ফেলেছেন, তবু যেন বিশ্বাস হয় না।

'হ্যাঁ, আমিই।'

'কিন্তু তা কী ক'রে হবে? পাটনায়—'

'আকবর শাকে আমিই পরামর্শ দিয়েছিলুম হাজীপুর কিলায় আগুন লাগাতে।' বিজয়িনীর কণ্ঠে বিজয়গর্ব চাপা থাকে না—আপাত-শান্ত স্বরের মধ্যে তা ধরা পড়ে।

'তুমি?···তাহলে তুমিই—'

'হ্যাঁ জনাব, আমিই আপনাকে ঘুমের মধ্যে হুঁশিয়ার করে দিয়ে এসেছিলুম।'

'কিন্তু কেন, কেন তুমি এ শয়তানী করতে গেলে আমার সঙ্গে? কেন,

কেন? উঃ! তোমাকে টুকরো টুকরো করে কাটলে—একটু একটু করে আগুনে পোড়ালেও যে আমার এই ক্ষতির দাম শোধ হবে না।'

আরও গোটাকতক ঝাঁকানি দেন ওকে।

হাত ছেড়ে দু হাতে দুটো কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দেন।

দায়ুদ খাঁর মুখচোখের চেহারা দেখে মনে হয় সত্যি-সত্যিই উনি বুঝি ওকে টুকরো-টুকরো করে ফেলবেন।

কিন্তু তবুও ব্যস্ত হয় না মেয়েটা।

শান্ত অচঞ্চল কণ্ঠে বলে, 'জনাব, আমি লুদী খাঁর বাঁদী—তাঁর অকারণ নিষ্ঠুর হত্যার প্রতিশোধ নেব, এই আমার প্রতিজ্ঞা।'

অকস্মাৎ শিথিল হয়ে পড়ে দায়ুদ কররাণীর হাত দুটো। চমকে উঠেন তিনি আবারও। মানুষ কার সামনে ভূত কল্পনা করলে যেমন চমকায়—হয়ত তেমনিই চমকে ওঠেন।

একটা আতঙ্ক অনুভব করেন। যেমন সে-রাত্রে করেছিলেন পাটনায়—যেমন কতকটা আজও করেছেন ভোরবেলায়, অগ্নিশিখার পৃষ্ঠপটে লুদী খাঁর মূর্তি অঙ্কিত দেখে—

সর্বাঙ্গ-শিথিল-করা হিম-শীতল আতঙ্ক একটা।

অনেক—অনেকক্ষণ পরে ভগ্ন স্খলিত কণ্ঠে প্রায় চুপি-চুপি বলেন দায়ুদ, 'লুদী মিয়া? লুদী মিয়া?'

বহুদিন পরে নফিসার মুখ হাসিতে বিস্তারিত হয়।

নিঃশব্দ হাসি—কিন্তু তবু তা বিজয়েরই হাসি, তৃপ্তিরই হাসি।

মাথা হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন দায়ুদ কররাণী। কতক্ষণ থাকেন তা তাঁর খেয়ালও হয় না।

অন্ধকার নিবিড় হয়ে আসছে শাল-সেগুন-মহুয়ার জঙ্গলে। একটু পরে হয়ত আর পথ খুঁজে পাবার ক্ষীণ আশাও থাকবে না।

গোলাম কাদের সেই কথাটাই স্মরণ করাতে আস্তে আস্তে ডাকে, 'জাঁহাপনা!'

সে-ডাকটা ঠিক হয়তো কানে পৌঁছয় না। তবু মানুষের গলায় শব্দ পেয়েই সচেতন হয়ে ওঠেন।

গোলাম কাদেরকে উত্তর দেন না, বোধ হয় কাউকেই দেন না—আপন মনেই বলেন কতকটা—কেমন একরকম চুপি-চুপি ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলেন, 'তুমি ঠিকই করেছ বাঁদী, তুমি ঠিকই করেছ।'

তারপর যেন সচকিত হয়ে চারিদিক তাকান একবার। এতক্ষণে বুঝি গোলাম কাদেরের উপস্থিতি চোখে পড়ে। তেমনি অর্ধভগ্ন কণ্ঠে বলেন, 'এই যে যাই। চল্—'

গোলাম কাদের বিস্মিত হয়। সব কথা না বুঝলেও এটা অন্তত সে বুঝেছে যে, এই মেয়েটা নিতান্ত গর্হিত কিছু করেছে। আরও সেই কারণেই,

ওকে ধরতেই মালিকের জীবন-বিপন্ন-করা এই অভিযান। অথচ অপরাধিনীকে হাতে পেয়ে শাস্তি না দিয়ে বা অন্তত কয়েদ না ক'রে চলে যাওয়াটা কী রকম প্রস্তাব ?…

বিস্মিত হয় নফিসাও। একটু বিচলিতও হয় সে। অবাক হয়ে তাকায় দায়ুদের মুখের দিকে। আজ এতক্ষণের মধ্যে এই প্রথম তার দৃষ্টি থেকে বুঝি উদ্ধত স্পর্ধা ও বিদ্বেষ মিলিয়ে আসে। সে আস্তে আস্তে বলে, 'কই, আমাকে শাস্তি দিলেন না ?'

দায়ুদ খাঁ একটু ম্লান হাসেন। সঙ্কোচের হাসি। তারপর বলেন, 'না, বাঁদী—তোমার কোন দোষ নেই। আমার কৃতকর্মের ফল আমাকে ভোগ করতে হবে বইকি!…আমি নির্বোধ, তাই যে আমার সবচেয়ে বড় ভরসা তাকেই আগে ক্ষুইয়ে বসে আছি—নিজেই ইচ্ছে ক'রে। তার ফল সর্বত্রই ভোগ করছি—সর্ব ক্ষেত্রেই।—যা পেয়েছি এ আমার প্রাপ্যই।…তুমি ঠিকই করেছ বাঁদী—আর তুমিই বা কী করবে—লুদী মিয়ার আত্মাই এ শোধ নিচ্ছেন।'

সকালে আকাশের গায়ে আঁকা সে-ছায়ামূর্তির কথাটাই বুঝি মনে পড়ে দায়ুদ কররাণীর।

নফিসা প্রতিবাদ করে। কে জানে কেন, তার কণ্ঠে আর কিছুতেই উগ্রতা ফোটে না—ফোটে না স্পর্ধা। তবু সে গলায় জোর দিয়ে বলে, 'আবারও আপনি মৃত ব্যক্তির উপর অবিচার করছেন সুলতান, লুদী মিয়া সে-মানুষ ছিলেন না। তিনি আপনাকে মৃত্যুর সময়ও নিশ্চয় ক্ষমা করে গেছেন। তাঁর আত্মা অন্তত আপনার ওপর প্রতিশোধ তোলবার জন্য ঘুরে বেড়াবে না।'

'তাও ঠিক।' অত্যন্ত দীন ভাবেই স্বীকার করেন দায়ুদ, 'তুমি ঠিকই বলেছ। এ খোদারই অভিশাপ। অভিশাপও নয়—ন্যায়বিচার। তিনিই করিয়েছেন। তোমাকে দিয়ে।…না বাঁদী, আজ আর তোমার বিচার অন্তত আমি করব না।'

গোলাম কাদের ইতিমধ্যে ঘোড়া দুটো খুলে এনেছে। দায়ুদ তাঁর ঘোড়ায় সওয়ার হন।

'কিন্তু মনে রাখবেন জনাব, আমি যতদিন বেঁচে থাকব—আপনার অনিষ্টই ক'রে যাব।'

'সে ভয়ও আর করি না। স্বয়ং খোদার কাছে শাস্তি নেবার জন্যই প্রস্তুত হয়েছি—তোমার কথা আর ভাবব না।…তবে হালও ছাড়ব না, ভেঙে পড়ব না। যতক্ষণ জ্ঞান থাকবে চেষ্টা ক'রে যাব মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়াবার।… কিন্তু আশা আর কিছুই রাখি না। বিদ্বেষও নেই কারুর ওপর। তোমার ওপর তো নয়-ই।'

দায়ুদ রওনা হবার জন্য ঘুরে দাঁড়ান।

অকস্মাৎ একটা কাণ্ড করে বসে মেয়েটা।

এতক্ষণ ধরে ভেতরে ভেতরে প্রচণ্ড লড়াই চলছিল ওর—আবেগের সঙ্গে

যুক্তির, বিবেকের সঙ্গে প্রতিজ্ঞার।

অবশেষে আবেগেরই জয় হয়। নারী মাত্রেরই মনে বোধ হয় তাই হয়—চিরকালই হয়েছে আর চিরকালই হবে।

সে বলে ওঠে, 'দাঁড়ান, জাহাঁপনা। ওদিকে গেলে আজ রাত্রের মধ্যে আর বন থেকে বেরোতে পারবেন না। এদিকে একটা পথ আছে, এখনই বনের বাইরে গিয়ে পড়তে পারবেন। আসুন—আমি সে-পথে পৌঁছে দিচ্ছি।'

একবার মুহূর্তের জন্য একটা কুটিল সন্দেহে মনটা সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে দায়ুদের। অভ্যস্ত জীবন ও পরিচিত পরিবেশের সহজাত সন্দেহ।

কিন্তু জোর ক'রেই সে সন্দেহকে দমন করলেন দায়ুদ।

গোলাম কাদের যে যৎপরোনাস্তি উদ্বিগ্নভাবে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে—তা লক্ষ্য ক'রেও গ্রাহ্য করলেন না তিনি।

বেশ সহজকণ্ঠেই বললেন, 'চল।'

আজ তিনি যেন তাঁর ঈশ্বরেরই সামনাসামনি দাঁড়িয়েছেন, প্রাপ্য শাস্তির জন্য প্রস্তুত হয়েই। তাই ভয় আর-কাউকেই নেই তাঁর, কিছুতেই নেই।

শুরু হল সেই অপূর্ব যাত্রা।

পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল নিয়তির মত সেই নারী, সেই মূর্তিমতী প্রতিহিংসা—লুদী মিয়ার রহস্যময়ী বাঁদী নসিফা। দায়ুদ কররানীকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দিতে।

তখন একেবারেই অন্ধকার হয়ে গেছে চারিদিক, এমন কি দু হাত আগে নফিসাকেও দেখা যায় না। অবস্থা বুঝে শেষ পর্যন্ত সে দায়ুদের ঘোড়ার লাগামটা নিজের হাতে টেনে নেয়—অনায়াসে, অবলীলাক্রমে।

না হলে যে আর উপায় ছিল না তা গোলাম কাদেরও বোঝে। নিজেরা রওনা হলে আজ রাত্রে এ বনের বাইরে পৌঁছানো যেত না কিছুতেই—যদিও নির্মেঘ আকাশে অসংখ্য তারা ইতিমধ্যেই ফুটতে আরম্ভ করেছে—তবু তারা দেখে দিক ঠিক ক'র যাওয়া—এ গভীর ছায়াম্ধকার বনে সম্ভব হত না। শের কী ভালুকের হাতেই জানটা দিতে হত।...

বন শিগগিরই শেষ হয়ে আসে। সত্যিই এদিকে একটা পথ পাওয়া যায়।

পথের ওপর উঠে ঘোড়ার লাগামটা ছেড়ে দিয়ে আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে দেয় নফিসা, 'ঐদিকে সোজা গেলেই পাকুড়ের রাস্তা পাবেন, আপনার তাঁবু আর সেবকরা গেছে ঐদিকে। আশা করি আর কোন অসুবিধা হবে না।'

'না, তা হবে না।...বাঁদী, তুমি বিচিত্র, তোমাকে বুঝতে পারলুম না। হয়ত পারবও না।...তুমি নিজে বলেছ তুমি লুদী মিয়ার বাঁদী। সামান্য বাঁদী মালিকের মৃত্যুর জন্য এমন সর্বস্ব-পণ-করা প্রতিহিংসার আয়োজন করে না।...কেনই যে আমার সর্বনাশের জন্য এত কাণ্ড করেছ, আবার আজ কেনই যে আমার ওপর শোধ নেবার সব আয়োজন থাকতেও গরজ করে বাঁচাতে গেলে—তা তুমিই জান।...কিন্তু একটা কথা—তোমার মালিকের

মৃত্যুর পূর্ণ শোধ যদি এই মুহূর্তে তুলতে চাও তো অনায়াসে তা তুলতে পার। একটি মাত্র দেহরক্ষী আমার—তাকেও সরিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমারই অস্ত্রে আমাকে বধ করতে পার, আমি বাধা দেব না।'

নফিসা হাসল। অদ্ভুত এক রকমের হাসি। অন্ধকারে তা দেখতে পেলেন না দায়ুদ, কিন্তু কণ্ঠস্বরে সে-হাসির আভাস পেলেন। নফিসা বলল, 'না জনাব, মৃত্যুটা কোন শোধই নয়। শোধ তুলব বলেই যত্ন করে বাঁচালাম। ...যান এখন, নিরাপদে আপনার লোকজনের মধ্যে ফিরে যান। কোনও ভয় নেই।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলেন দায়ুদ।

'বাঁদী, তোমার নামটা তো জানা হল না!'

'এ বাঁদীর নাম জেনে আপনার কী হবে জনাব? লুদী মিয়ার বাঁদী—এই পরিচয়ই তো যথেষ্ট।'

'তা বটে। লুদী মিয়াই ধন্য! উপযুক্ত ছেলেও যা পারে না অনেক সময়, তাঁর এক বাঁদীই তাই করল। তাঁর হত্যার শোধ তুলল।...চল, গোলাম কাদের।'

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে একটা পায়ের চাপ দেন তার বুকে।

শিক্ষিত ঘোড়া ইঙ্গিতমাত্র ছুটতে শুরু করে।

দেখতে দেখতে সেই গাঢ় অন্ধকারে মিলিয়ে যায় দুই অশ্বারোহী, শুধু নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তরে চার-জোড়া ক্ষুরের শব্দ বহুদূরে আর বহুক্ষণ ধরে প্রতিধ্বনি তুলতে থাকে।

তারপর একসময় তাও মিলিয়ে যায়।

ক্লান্ত নফিসা সেই পথের ধুলোর ওপরই বসে পড়ে।

॥ ১৭ ॥

গুরুন্দার যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বিনা যুদ্ধে যেদিন আফগানরা পিছু হটে এল—সেদিন মুঘল সেনাপতির উল্লসিত হয়ে ওঠবারই কথা। কিন্তু তা তিনি হলেন না। বরং কেমন যেন হয়ে গেলেন। সেদিন থেকে তাঁর মতিগতি তাঁর আচরণ কেমন যেন দুর্বোধ্য হয়ে উঠল। সবাই বলতে লাগল, ভীমরতি। বলতে লাগল, মৃত্যুর পূর্ব-লক্ষণ। মরণকালে মানুষের বিপরীত বুদ্ধি হয়, এ নাকি তাই। কানাকানি গা-টেপাটেপিটা ক্রমে প্রকাশ্য হাসাহাসিতে পরিণত হতে দেরি হল না। প্রধান সেনাপতি খান-ই-খানানের আচরণ তাঁর নগণ্যতম সিপাহীর কাছেও নিত্য বিদ্রূপ ও আলোচনার বস্তু হয়ে উঠল।

আর হওয়াই তো উচিত।

কোন বিরাশি বছরের বৃদ্ধ যদি একটা উনিশ-কুড়ি বছরের অনাত্মীয় অপরিচিত বিদেশী মেয়ের সংবাদের জন্য একেবারে পাগল হয়ে ওঠেন—গুরুতর রাজকার্য ভাসিয়ে দিয়ে তারই সন্ধান করার জন্য সমস্ত রাজশক্তি প্রয়োগ করেন তো সে আচরণকে ভীমরতি ছাড়া কীই বা বলা যায় ?

মুনিম খাঁ ঠিক সেই কাজই করেছেন।

গুরুন্দার যুদ্ধে—অথবা বলা যায় বিনা যুদ্ধেই—হেরে গিয়ে যখন দায়ুদ কররাণী সাতগাঁ হয়ে হুগলীর পথ ধরে মেদিনীপুর চলে গেলেন—তখন সামান্য চেষ্টা করলেই তাঁকে বন্দী করা যেত, আফগান বিরোধিতার মূলে সুদ্ধ উপড়ে ফেলা চলত। গুরুন্দা থেকে দায়ুদের বাহিনী পিছু হঠেছে প্রকাশ্য দিবালোকে—অসংখ্য সুসজ্জিত মুঘল সৈন্যের সামনে দিয়ে—তবু মুনিম খাঁ তাদের পিছু নেবার বা তাদের দিক লক্ষ্য করে একটা অস্ত্র নিক্ষেপ করারও হুকুম দেন নি।

তখনও নয়—তার পরেও নয়।

দু-পা এগিয়ে গেলেই বিপর্যস্ত করা যেত দায়ুদ খাঁর বাহিনীকে—কিন্তু একটি পাও কেউ এগোতে পারে নি। তিনি গুরুন্দার প্রান্তরে দাঁড়িয়ে আগের-দিন-দেখা একটি জাদুকরী বেদেনী মেয়ের সন্ধানের জন্যই বেশী উদ্বিগ্ন, বেশী ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। যেন সেই খবরটার ওপর তাঁর জীবন-মরণ নির্ভর করছিল। ও আফগান সৈন্য রইল কি গেল—দায়ুদ খাঁ নিরাপদে পালালেন কিংবা ধরা পড়লেন—সেটা তাঁর কাছে গৌণ, তুচ্ছ হয়ে উঠেছিল।

অনেক পরে—বোধকরি অধীনস্থদের সেনানায়কদের বিশেষ অনুযোগেই শেষ পর্যন্ত তিনি মুহম্মদ কুলী বর্লাসের সঙ্গে একদল সেনা পাঠিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন বর্ধমানে গিয়ে অপেক্ষা করতে—তিনি নাকি শিগগিরই গিয়ে পড়বেন এবং গিয়েই সব ব্যবস্থা করে ফেলবেন।

কিন্তু তিনি যান নি। সম্ভবত কথাটা মনেও ছিল না।

তিনি যা করছিলেন, তা এক বিচিত্র ব্যাপার। হিন্দু মুসলমান যেখানে যত জ্যোতিষী পাওয়া যায় সকলকে মোটা মোটা বকশিশের লোভ দেখিয়ে রাজধানী টাণ্ডায় এনে জড়ো করছিলেন এবং তাদের সকলকে একই প্রশ্ন করছিলেন—একটি বিশেষ বর্ণনার বিশেষ নামধারিণী বাঁদী এখন কোথায় আছে কেউ তার সন্ধান দিতে পারে কি না।

বলা বাহুল্য, প্রায় কারো গণনার সঙ্গেই কারো গণনা মেলে নি—একজন হয়ত বলেছে, সে-বালিকা উড়িষ্যায় গেছে ; আর একজন হয়ত তাকে বিদ্রূপ করে নিজের অভ্রান্ত গণনা পরীক্ষা করার আহ্বান জানিয়েছে—বলেছে, সে-মেয়ে এখনও তিনপাহাড়ের কোন গিরিকন্দরেই অপেক্ষা করছে। কেউ বা বলেছে, সে দিওয়ানা হয়ে তপস্যা করতে গেছে নিজামুদ্দীন আউলিয়ার দরগায় ; কেউ বা বলেছে, সে এক রাজপুত্রকে বিবাহ করে মনের সুখে ঘরকন্যা করছে।

প্রথম প্রথম প্রায় সবাইকার কথাই নির্বিচারে বিশ্বাস করেছেন আকবর বাদশার প্রিয় সেনাপতি খান-ই-খানান মুনিম খাঁ। সেই মত খোঁজ-খবরও করিয়েছেন; কিন্তু কোন খবরই পান নি। তাই ইদানীং ঘোষণা করেছেন যে তাঁর বড় জায়গীর পুরস্কারের কথাটা ঠিকই আছে তবে গণনা সত্য না প্রমাণিত হলে গণৎকারের প্রাণ যাবে। ফলে আর কোন জ্যোতিষীই প্রায় টাণ্ডার ত্রিসীমানায় থাকতে চাইছে না।

'দিল্লী হানোজ দূরস্ত্।' দিল্লী অনেক দূরে। আগ্রাও কম নয়।

আকবর বাদশা কিছুকাল দিল্লীতে থাকেন, কিছুকাল আগ্রায়। কখনও বা আরও দূরে যুদ্ধাভিযানে ব্যস্ত থাকেন। তবু সেখানেও খবর পৌঁছয়—সব খবরই পৌঁছয়; এমনিই নির্ভুল ব্যবস্থা তাঁর।

এ খবরও পৌঁছল।

রাজা টোডরমলকে পাঠালেন বাদশা। না, মুনিম খাঁকে ডিঙিয়ে শাসক হিসাবে নয়—মানীর মান তিনি জানেন—পাঠালেন তাঁর সহকারী সেবক হিসেবে।

টোডরমল গৌড়বঙ্গের মাটিতে পা দেবার আগেই শুনতে পেলেন অনেক কথা—টাণ্ডায় পৌঁছেও কিছু কিছু শুনলেন, কিন্তু কার্য সম্বন্ধে সবাই একমত হলেও কারণটা কেউই ভাল রকম বলতে পারলেন না—ভীমরতি ছাড়া।

ভীমরতিই নাকি একমাত্র কারণ।

অথচ মুনিম খাঁর সঙ্গে কথাবার্তায় সে রকম বিশেষ লক্ষণও দেখতে পেলেন না রাজাসাহেব। রহস্যটা রহস্যই রয়ে গেল।

তখন অবশ্য সে রহস্যভেদের সময়ও ছিল না। এখনই যুদ্ধযাত্রা করতে হবে—নইলে উড়িষ্যায় পাকাপোক্ত হয়ে বসে ক্ষমতার শিকড় বিস্তার করার সময় পেলে আফগানদের সেখান থেকে উচ্ছেদ করা শক্ত হবে।

কথাটা যে মুনিম খাঁও না বোঝেন তা নয়। কিন্তু—

'কিন্তু'ও অনেক।

ইতিমধ্যেই বাংলাদেশের শ্যামল-হরিৎ ক্ষেত্র মায়া বিস্তার করেছে মুঘল শার্দুলদের মনে ও মস্তিষ্কে। এখানকার বিচিত্র ও অসংখ্য রকমের পাখীর গান, সুগন্ধি ফুল এবং অগণিত নদীনদ তার মোহ দিয়ে আচ্ছন্ন করেছে ওঁদের উদ্যম ও কর্মশক্তিকে। এখানে মধুমাখা স্নিগ্ধ বাতাস নিদ্রার আরামের জাল বিস্তার করেছে ওঁদের চারিদিকে।

আসল কথা কেউই আর হাঙ্গামে যেতে চান না। প্রাচুর্যের মধ্যে, আরামের মধ্যে দুটো দিন হেসে-খেলে কাটাতে চান। এ মাটির বুঝি এ-ই দস্তুর।

সেই কথাই বললেন মুনিম খাঁ রাজা টোডরমলকে।

'কেউ যে যেতে চাইছে না লড়াই করতে রাজা সাহেব। আমি একা কী করতে পারি?'

এ কথা রসনাগ্রে এসেছিল বইকি রাজার যে—'আপনি এগিয়ে গেলে ওরা পিছনে যেতে বাধ্য হত'—কিন্তু সে কথা বললেন না। তার বদলে তিনিই সেনানায়কদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা শুরু করলেন।

চতুর তীক্ষ্ণধী রাজা জানতেন, বর্তমান আরামের মোহ কাটাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুরা একটু বেশী করে পান করাতে হয়। তিনি সেই পথেই গেলেন—বেশীর ভাগকে লোভ দেখিয়ে—দু-একজনকে বা ভয় দেখিয়ে নড়ালেন শেষ পর্যন্ত রাজধানী থেকে।

প্রথমেই এলেন তিনি বর্ধমান। সেখান থেকে গোঘাটের পথে একসময় গড়মান্দারণও পেঁাছলেন। এইখান থেকেই মেদিনীপুরের সোজা রাস্তা শুরু হয়েছে, এই পথেই শত্রুও গেছে একদা উড়িষ্যায় আশ্রয় নিতে।

গড়মান্দারণে কয়েকদিন বিশ্রাম করার ইচ্ছা ছিল মুঘল সেনাধিনায়কদের, কিন্তু টোডরমল রাজী হলেন না। তিনি প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রওনা হলেন মেদিনীপুরের দিকে, দ্রুত এগিয়ে কলিয়াতে এসে পেঁাছলেন। এইখানে এসে আফগান বাহিনীর গতিবিধিরও খবর মিলল।

শোনা গেল দায়ূদ খাঁও এগোচ্ছেন—ডেবরায় ছিলেন, এগিয়ে এসেছেন গড়হরিপুর পর্যন্ত। সেইখানেই পরিখা কেটে বসে অপেক্ষা করছেন এঁদের।

বর্তমান দাঁতন স্টেশনের সাড়ে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণ-পূর্বে গড়হরিপুর। নিবিড় শালের জঙ্গল দিয়ে ঘেরা। সে জঙ্গলও একটু-আধটু নয়—অরণ্য ভেদ করে বহু ক্রোশ পথ অতিক্রম করলে তবে সেখানে পেঁাছনো যাবে।

টোডরমল কিন্তু একটুও ইতস্তত করলেন না।

তিনি জানতেন—যে নেতা তার ইতস্তত করার অধিকার নেই; সেনানায়কের এক মুহূর্তের দ্বিধা সেনাদের অগ্রগমন-পথে পর্বত-প্রমাণ বাধা ও আতঙ্কের সৃষ্টি করে।

তিনি ঈষৎ ঘুরে মেদিনীপুর পেঁাছলেন। ঐখান থেকে একেবারে গড়হরিপুরে ঝাঁপিয়ে পড়বেন—এই ইচ্ছা।

কিন্তু তার আগেই এক অঘটন ঘটল—বীর ও সাহসী সেনাপতি—সূচ্যগ্র-বুদ্ধি সামরিক নেতা মুহম্মদ কুলী বর্লাস মারা গেলেন। আর এই ঘটনাকে ঈশ্বরের স্পষ্ট নির্দেশ মনে করে সাধারণ সিপাহী ও সিপাহ্‌সলাররা বেঁকে বসল। তারা স্পষ্টই বললে, 'পাঠানরা অনেকদিন হেরেছে—এবার ওদের জেতবার পালা। খোদার তাই মর্জি। আমরা বেশী এগোলে খোদার কোপে পড়তে হবে।'

অনেক সাধ্যসাধনা করলেন টোডরমল—হাতে-পায়ে ধরলেন বলতে গেলে—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। যারা বেঁকে ছিল তারা বেঁকেই রইল।

টোডরমল সেখানে অপেক্ষা করাও যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না—ফিরে এলেন গড়মান্দারণে। সেখান থেকে বর্ধমানে দূত পাঠালেন পত্র দিয়ে—মুনিম খাঁ একবার নিজে এসে দাঁড়ান সসৈন্যে—নইলে এদের মনোবল একেবারে ভেঙে পড়ছে।...

লিখলেন—তবে আশাভরসা খুব একটা ছিল না। কিন্তু দেখা গেল মুনিম খাঁরও আর বিশেষ আপত্তি নেই বর্ধমান ছেড়ে আসতে। কারণ—কারণটা শুধু তিনিই জানেন—ওখানে পীর কুতুব শার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছে, ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষ—কোন প্রশ্ন করার আগেই ওঁর কপালের দিকে চেয়ে বলেছেন, 'তুমি যাকে খুঁজছ বাবা, তাকে পাবে দক্ষিণের দিকে যুদ্ধক্ষেত্রে। তুমি এগিয়ে যাও—সে নিজেই এসে দেখা দেবে।'

ঠিক সেই বিশেষ ক্ষণটিকেই টোডরমলেরও পত্র গিয়ে পৌঁছল।

তৎক্ষণাৎ যাত্রার আয়োজন করতে আদেশ দিলেন খান-ই-খানান। তিন দিনের মধ্যে তিনি সসৈন্যে রওনা হবেন—কোন মতে যেন দেরি না হয়।

টোডরমলের অনুরোধ বিধাতার নির্দেশ বলেই মনে করলেন তিনি।

আবার গড়মান্দারণ থেকে যাত্রা শুরু হল।

কিন্তু পথ সেই একই—নিবিড় শালবনের মধ্য দিয়ে ; পথ বলতেও বিশেষ কিছু নেই—বন কেটে পথ করে নিতে হচ্ছে প্রতিপদেই। শুধু দিকটা ঠিক আছে, আর আছে মধ্যে মধ্যে সরু পায়ে-চলা পথ। স্থানীয় দু-একজন ক্ষীণজীবী বাঙালী চাষীও সংগ্রহ হয়েছে রাস্তা চিনিয়ে দেবার। কিন্তু কামান আর তাঁবুর গাড়ি, জল ও খাবারের গাড়ি যাবার মত চওড়া রাস্তা চাই—আর ততটা রাস্তা পেতে গেলে গাছ কাটা ছাড়া উপায় নেই। প্রাচীন অভ্রভেদী শাল ও পিয়াশাল, সম্ভবত এই দক্ষিণ-বঙ্গ সৃষ্টির প্রথম থেকে—নদীর পলিতে অঙ্কুর দেখা দেবার দিনটি থেকেই—তারা এমনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে, কোন কাঠুরিয়ার লৌহকুঠার স্পর্শ করে নি তাদের অঙ্গ আজও পর্যন্ত। সে গাছ কাটাও খুব সহজ বা অল্পায়াসসাধ্য নয়।

কিন্তু তবু যদি তা-ই একমাত্র বাধা হত !

টোডরমলের গড়মান্দারণ ফিরে যাওয়া, বর্ধমানে লোক পাঠানো এবং মুনিম খাঁর গড়মান্দারণ পৌঁছনো—এর মধ্যে বহু সময় কেটে গেছে। দায়ুদ কররাণীর অভিজ্ঞ ও রণকুশলী দুই প্রধান সেনানায়ক কতলু লোহানী এবং গুজর খাঁও ইতিমধ্যে চুপ করে বসে নেই। তাঁরা জানেন যে জঙ্গলের পথ ছাড়া কোন দ্বিতীয় পথ নেই মুঘলবাহিনীর অগ্রসর হবার ; সেই পথকে কণ্টকাকীর্ণ করাই সুবিধা। তাঁরা সমস্ত বনপথে সৈন্য ছড়িয়ে দিলেন। তারা দীর্ঘ সময় পেয়ে গাছে ওঠানামার কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে—প্রায় বানরের মতই ক্ষিপ্র ও নিঃশব্দ গতিতে উঠতে নামতে পারে এখন। ফলে মেঘনাদের মত অদৃশ্য থেকে লড়াই করতে শিখেছে তারা—ইন্দ্রজিতের মতই দুর্ধর্ষ হয়ে উঠেছে। শীতকাল পড়াতে তাদের পক্ষে বনে থাকারও খুব সুবিধা হয়েছিল—সাপখোপ মশার ভয় নেই—ভয় বলতে বাঘ-ভালুক। তা তারাও সাধারণত শস্ত্রধারী মানুষকে এড়িয়েই চলে।

এখন মুঘলবাহিনীর ত্রাস হয়ে উঠল এই জঙ্গলচারী আরণ্যবাহিনী, চোখে দেখা যায় না তাদের—আগমনের কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। কোথা থেকে

অলক্ষিতে অতর্কিতে এসে পড়ে, এক জায়গায় কতকগুলো লোককে মেরে তাদের হাতিয়ার কেড়ে অথবা এদের খাদ্যভান্ডার লুঠ করে আবার চকিতে কোথায় মিলিয়ে যায়। না যায় তাদের ধরা, না পাওয়া যায় তাদের খবর।

এমনি চলে দিনের পর দিন—প্রত্যহ।

অথবা সত্যি কথা বলতে গেলে দিনে বহুবার।

চতুর টোডরমল সে সংবাদ গোপন করার চেষ্টা করেন—দীর্ঘ বাহিনীর মধ্যে কোন এক অংশে বিশ-পঞ্চাশজন গেল কি রইল সে সংবাদ শেষ অংশের কি প্রথমাংশের পাবার কথা নয়—চিহ্ন পর্যন্ত দ্রুত ঢেকে ফেলা যায়। কিন্তু তবু কথাটা চাপা থাকে না কিছুতেই। জনশ্রুতি জনরব আরও বেশী আতঙ্কের সৃষ্টি করে। দৃশ্য শত্রুর চেয়ে অদৃশ্য শত্রুকে অনেক বেশী শক্তিশালী, অনেক বেশী ভয়ংকর বোধ হয়।

আবারও কানাঘুষো ওঠে। আবারও দেখা যায় অসন্তোষের চাপা গুঞ্জন।

অবশেষে এক সময় আবারও সবাই বেঁকে দাঁড়ায়। তারা এমন ক'রে জঙ্গলের মধ্যে প্রাণ দিতে আসে নি—তারা আর এক-পাও এগোবে না এই দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্য দিয়ে।

প্রথমে মৃদু গুঞ্জন—তারপর প্রকাশ্য অনুযোগ। ক্রমে সে শব্দ-তরঙ্গ দাবির গর্জনে পরিণত হয়।

চারিদিক থেকে শব্দ উঠতে থাকে—'সন্ধি কর। সন্ধি কর। মিটিয়ে নাও দায়ুদ কররাণীর সঙ্গে এই অনর্থক ঝগড়া। সে উড়িষ্যায় সুখে থাক্, শান্তিতে থাক্।'

এইবার রাজা টোডরমল চোখে অন্ধকার দেখলেন। তিনি রাজপুত—সন্ধি করতে তিনি শেখেন নি। কিন্তু একা কী করতে পারেন?

তিনি ও মুনিম খাঁ স্বয়ং—বড় মনসবদার তো বটেই, ছোট ছোট সিপাহ্-সলারদেরও হাতে-পায়ে ধরলেন, সম্ভব অসম্ভব বহু প্রলোভন দেখালেন পুরস্কারের—কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। তাদের সেই এক কথা।

'মিটিয়ে ফেল। সন্ধি কর। আর আমরা এক পাও এগোতে রাজী নই এই যমের দক্ষিণ দোরে।'

॥ ১৮ ॥

রাজা টোডরমল অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন সংবাদদাতার মুখের দিকে। দুবার তিনবার শুনেও যেন কথাগুলোর মর্মোপলব্ধি হল না তাঁর—তাকিয়েই রইলেন তাই।

বিপদের দিনে এমন অনুকূল হাওয়া যে এইভাবে অপ্রত্যাশিত দিক থেকে বইবে—তা তিনি কোনদিন কল্পনাও করতে পারেন নি। অসম্ভব জেনেই

বুঝি ইষ্টদেবী ভবানীকে পর্যন্ত এমন অনুরোধ জানান নি। তবে নাকি 'তিনি' যখন দেন তখন এমনি ভাবে—আশা ও কল্পনার অতীত ভাবেই দেন!

রাজা যুক্ত দুই কর ললাটে ঠেকালেন। এতদিনের পূজা বুঝি এইভাবে সফল হল। মা প্রসন্ন হলেন এবার।

আশ্চর্য! কাল যখন অকস্মাৎ এই ফাল্গুনের আকাশে উত্তর-পশ্চিম কোণে কাল-বৈশাখীর মেঘ দেখা দিয়েছিল তখন তিনি বিরক্তই হয়েছিলেন। ভাগ্যের কাছে অনুযোগ করেছিলেন মনে মনে—বিপদের ওপর এই বিপদ দেখা দেবার জন্য। সৈন্যদের তাঁবু নেই, পত্রের আচ্ছাদনও এখানে নিরাপদ নয়—যথেষ্ট শীতবস্ত্র পর্যন্ত তাদের সঙ্গে নেই—এ অবস্থায় অসময়ে এই ঝড় বৃষ্টি তাদের মনোবল আরও বেশী করে নষ্ট করবে এই ছিল তাঁর আশঙ্কা।

কিন্তু তখন কে জানত যে এই আপাত-দুর্ভাগ্যই অপ্রত্যাশিত অলৌকিক সৌভাগ্য বহন করে এনেছে তাঁর জন্য—তাঁদের জন্য। দুর্যোগই সুযোগ হয়ে উঠেছে।

তিনি আরও একবার প্রশ্ন করলেন, 'সন্ন্যাসিনী, দেওয়ানা? তুমি ঠিক জান? কী সে—হিন্দু না মুসলমান—না এ-দেশের কোন অরণ্যচর আদিম জাতি?'

'সে যে কী তা বলতে পারব না হুজুর।' ওঁর বিশ্বস্ত অনুচর রামসুভগ সিং নিবেদন করে, 'তার পরনে রক্তবস্ত্র, কপালে রক্তচন্দনের তিলক—অথচ গলায় মুসলমান ফকির দরবেশের মত মালা। আদিম জাতি—না হুজুর, তা অন্তত নয়। কারণ এ রূপ বাদশার হারেমেও দুর্লভ। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছিল—সাক্ষাৎ ভবানী বুঝি নেমে এসেছেন মাটিতে।'

'জয় মা! নিজের মনের গোপন ধারণার সঙ্গে কথাটা আকস্মিক ভাবে মিলে যেতে রাজা টোডরমলের গায়ে কাঁটা দিল। তিনি আবারও জোড়হাত কপালে ঠেকালেন।

তারপর বললেন, 'সে সন্ন্যাসিনী একা এসেছিল? বয়স কত?'

বয়স কত তা বলতে পারব না—মুখ দেখে ঠিক বুঝতে পারলুম না। তবে কাঁচা—খুবই কাঁচা তাতে সন্দেহ নেই। কুড়ি একুশের বেশি নয়।'

'বল কী রামসুভগ! অল্প বয়স, অসাধারণ সুন্দরী বলছ—সে এই এতগুলো অশিক্ষিত বর্বর সিপাহীর মধ্যে একা এসেছিল? আর ঢুকলই বা কী করে? ঢুকতে দিলে কে?'

'কী করে ঢুকল তা বলতে পারব না হুজুর,—কে যেন একজন বললে তার কাছে খান-ই-খানানের দেওয়া নিশান ছিল। তবে না থাকলেও ক্ষতি নেই! তার দেহে এমনই একটা জ্যোতি ছিল, চোখের চাহনিতে এমনই নির্ভয় যে দেখে মনে হল সে মেয়ে একা লক্ষ দানবের মধ্যেও এমনি অকুতোভয় যেতে পারে। ভয় কী জিনিস তা সে জানে না—ভয়ের রাস্তায় কখনও হাঁটে নি। আর কোন পাপীর সাধ্য নেই তার কেশাগ্র স্পর্শ করে, কারও সাহসে কুলোবে না হুজুর অতিবড় সাহসীরও না।'

আবারও মনে মনে ইষ্টকে স্মরণ করলেন রাজা টোডরমল।

এ দেবীর দয়া—প্রত্যক্ষ দয়া। তিনি নিজে না আসুন—তিনি আসবেনই বা কেন?—তাঁর কোন ডাকিনী যোগিনী সহচরীকে পাঠিয়েছেন এই দারুণ সংকটে ত্রাণ করতে।

'কী বললেন সে দেবী রামসুভগ—তুমি নিজে কানে শুনেছ তাঁর কথা?'

'শুনেছি বইকি হুজুর। মুসলমান সিপাহীদের আড্ডায় যখন গিয়েছিলেন তখন অবশ্য আমি ছিলুম না—তবে শুনলুম যে বলেছেন, কররাণীদের পাপের ভার পূর্ণ হয়েছে—খোদা নারাজ হয়েছেন তাদের ওপর। এবার যদি মুঘল ফৌজ ওদের ওপর হামলা না করে তো খোদা ওদের ওপরও নারাজ হবেন। তিনি চান ওদের দিয়েই কররাণীদের ধ্বংস করতে।…আরও বলেছেন, খোদার যে এই ইচ্ছা তা আজ তিনি নিজেই জানাবেন—অসময়ে তুফান উঠবে আজ—বৈশাখ মাসের মত তুফান।'

'তারপর?' রুদ্ধ নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করেন রাজা।

'তারপর আমাদের দিকে এসেছিলেন। আমাদের বললেন, শিব ভগবান আর দেবী ভবানীর কোপে পড়েছে কররাণীরা—ওদের এবার নিস্তার নেই। মুঘল বাদশা আকবর অন্তরে মহাশৈব—পূর্বজন্মের সামান্য পদস্খলনে বিধর্মীর ঘরে জন্ম নিয়েছেন। এ-জন্মে ওঁর সম্ভোগের অবসান করবেন ভগবান—তাই সসাগরা পৃথিবীই তিনি ওঁকে দেবেন এবার। বললেন, তাঁর কথা বিশ্বাস না হয়, বিকেলেই প্রমাণ দেবেন তিনি। একেবারে অসময়ে—ফাল্গুনের আকাশে কালবৈশাখীর তুফান তুলবেন।'

'সিপাহীরা কী বললে সে কথা শুনে?'

'প্রথমটা কেউই বিশ্বাস করে নি—মাসুম খাঁ কিল্লাদার তো তেড়ে মারতেই উঠলেন ওঁকে—বললেন যে, টোডরমলের ঘুষ খেয়ে যাত্রা গাইতে এসেছে। আরও হয়ত কিছু অপমান করতেন কিন্তু এমনভাবে চাইলেন সে-দেবী ওঁর দিকে যে, কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন কিল্লাদার।—তবু বিশ্বাস ঠিক কেউই করে নি।'

মাসুম খাঁ কিল্লাদার। এবারই বাদশা তাকে এক হাজারী থেকে তিন হাজারী মনসবদার করেছেন। বিশেষ অনুগৃহীত ব্যক্তি বাদশার।

নিয়তি!

তিন হাজারী মনসবদারকে কী করে পথের ভিখারী করতে হয় তাও টোডরমল জানেন। মনে মনে বিদ্যুৎচমকের মত সেই বিশেষ খতের মুসাবিদা করে মুখে শুধু বললেন, 'হুঁ। তারপর?'

'হাসাহাসি করেছিল অনেকেই। তিনি যতক্ষণ ছিলেন ততক্ষণ বিশেষ কেউ মাথা তুলতে পারে নি বটে, কিন্তু তিনি অন্তর্হিত হতেই হাসির হল্লা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অনেকেই ঐ কথাটা ভেবেছিল—মনে করেছিল বুঝি আপনিই পাঠিয়েছেন ওকে শিখিয়ে-পড়িয়ে। তবে আমাদের দিকের কেউ কেউ বলেছিল তেমনি বটে যে, শেখানো লোক হলে অমন করে ভবিষ্যদ্বাণী করে

যায় কেন ? জানে তো দু প্রহর পরেই চালাকি ধরা পড়ে যাবে।…এর মধ্যে আর-কিছু আছে, দেখই না একটু।…তা ছাড়া—মানুষটাও যেন কেমন-কেমন, সাধারণ মেয়েছেলে কিংবা মাইনে-করা গুপ্তচর হলে কি আর অমন নির্ভয়ে এতগুলো বুনো পুরুষের মধ্যে এসে দাঁড়াতে পারে ! দেখলে না—ওর গায়ে হাত দেবার কথা কারও মনে পর্যন্ত পড়ল না !…এমনি কথা-কাটাকাটি চলছিল —হঠাৎ হুজুর, আপনার এই বান্দারই প্রথম নজরটা পড়ে যায় আকাশের দিকে —একেবারে সেই বায়ু কোণে শাল জঙ্গলের মাথায় সামান্য কালো-মত এক টুকরো মেঘ। আপনি বোধ হয় ঘুমোচ্ছিলেন তখন—তখনও বেশ রোদ— পুরো এক প্রহর বেলা আছে—'

'ঘুম ! মায়ের কোল ছাড়বার পর দুপুরে ঘুমিয়েছি বলে মনে পড়ে না রামসুভগ।…আর এখন ? এখন তো রাতেও ঘুম আসে না, তা দিনের বেলায় !…তা নয়—সে মেঘ আমিও দেখেছি। তখন তো—'

চুপ ক'রে যান রাজা বলতে বলতেই।

সত্যিই দেখেছেন। হয়ত রামসুভগ দেখবার আগেই দেখেছেন।

বেশ মনে আছে। বিরক্তিতে সমস্ত অন্তর তিক্ত হয়ে গিয়েছিল—তবু মনে মনে তারিফ না করেও পারেন নি।

সামান্য একটি বিন্দুর মত কালো—দেখতে দেখতে সে কালি বহুদূরে অবধি আকাশে ছড়িয়ে পড়ল। নিকষ কালো হয়ত তাকে বলা যায় না— কারণ কষ্টিপাথরের রঙ সে নয়—তবু আর-এক ধরনের পাথরের মতই ভয়াবহ রকমের কালো। ডেলা-ডেলা, কবিদের ভাষায় পুঞ্জ-পুঞ্জ সেই মেঘে ছেয়ে গেল আকাশের সমস্ত উত্তর-পশ্চিম দিকটা। তারপর দ্রুত এগোতে লাগল সেই মেঘ—যেন মেঘেরই মধ্য থেকে নতুন মেঘ জন্ম নিচ্ছে— ছায়াপথের ঘূর্ণায়মান বহ্নিপিণ্ড থেকে যেমন বহ্নিময় অসংখ্য নক্ষত্র জন্ম নেয় তেমনিই—কোথা থেকে এত মেঘ আসছে তা কেউ জানে না—গড়িয়ে গড়িয়ে এগোচ্ছে মেঘগুলো—এগোচ্ছে তো এগোচ্ছেই—অথচ ওধারের মেঘ একটুও কমছে না, আকাশের চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না কোথাও—ওদিকেও দুই দিক ব্যেপে তারা বিস্তার লাভ করছে শুধু।

অনেকক্ষণ ধরে দেখেছিলেন সে মেঘ রাজা টোডরমল। অন্যমনস্ক, চিন্তাকুল, বিপন্ন—তবু দু চোখ ভরে দেখেছিলেন বাদশার বাদশা ভগবানের সে খেলা। জানতেন যে এখনই প্রলয়ের দুর্যোগ ভেঙে পড়বে মাথায়, তবু নড়তে পারেন নি।

তারপর এক সময় উঠল সেই ঝড়।

আগে দূর থেকে শোনা গেল একটা গর্জন,—তারপরই সমস্ত বন কাঁপিয়ে তীব্রবেগে সেই বাতাস এসে পৌঁছে গেল। আর্তনাদ করে উঠল যেন গাছপালাগুলো, হাহাকার জাগল বনস্পতিদের শাখা-প্রশাখায়—যন্ত্রণায় নুয়ে নুয়ে পড়তে লাগল বিরাট গাছগুলোর মাথা। ঝড়ের সম্ভাবনাতেই পাখিগুলো আকাশে উঠেছিল—এখন তারা সেই ঝঞ্ঝাবলয় ছাড়িয়ে ওপরে ওঠবার চেষ্টা

করল—কিন্তু পারল না। পাখা ঝাপটে আছড়ে এসে পড়তে লাগল মাটিতে—কেউ বা তাদের চিরকালের নিরাপদ ও পুরাতন আশ্রয় গাছের গুঁড়িতে এসেই পড়ল—কেউ মরল, কেউ বা জীবন্মৃত হয়ে পড়ে রইল।

চলল ঝড়ের মাতামাতি, প্রচণ্ড গর্জন বাতাসের। বন্য জন্তুদের ভীত আর্তস্বরে আর শাখাপ্রশাখার ধাক্কা-খাওয়া বাতাসের শব্দে চলল প্রতিযোগিতা। রাজা টোডরমলের দরবারী তাঁবুও কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগল—কড়কড় শব্দ উঠল ওর দড়ির বাঁধনে—মনে হল সে বস্ত্রাবাস বুঝি টেনে ছিঁড়ে উপড়ে নিয়ে গিয়ে ফেলবে এখনই কোথাও, উধাও করে নিয়ে যাবে এই খ্যাপা বাতাস।

ঝড়—উন্দাম, প্রলয়ংকর। সেই সঙ্গে বজ্রপাত, মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ-স্ফুরণ। তেমনি গুরু গুরু ডাক আকাশের।

একটু পরেই নামল জল। শুরু হয়ে গেল বড় বড় ফোঁটার মুষলধারে বৃষ্টি। স্থলজল-এক-করা প্রবল বর্ষণ। মনে হল এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড, ভগবানের গোটা সৃষ্টিটাই বুঝি ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। মনে হল—এর বুঝি শেষ হবে না—এই দুর্যোগের শেষ হবে একেবারে তাঁদের শেষ করে।

দেখেছিলেন সে দুর্যোগ টোডরমল আগাগোড়াই—বিরক্তিতে ক্ষোভে হতাশায় বুঝি এক সময় তাঁর চোখে জলও এসে গিয়েছিল—কিন্তু এই দুর্যোগ যে সুযোগ হয়েই এসেছে, এই বর্ষা যে নেমেছে ভবানীর আশীর্বাদরূপেই—তা তো একবারও ভাবেন নি।

মনে মনে আর একবার নিজের ইষ্টদেবীকে স্মরণ করে টোডরমল প্রশ্ন করলেন, 'ঝড় যখন উঠল, জল নেমে এল চারিদিক ভাসিয়ে—তখন ঐ মূর্খ অবিশ্বাসীগুলো কী বললে রামসুভগ?'

'ওঃ, তখন যদি তাদের মুখের চেহারাটা দেখতেন একবার। ··আমি ইচ্ছে করে মাসুম খাঁদের দিকে গিয়েছিলুম। দেখি মুখ শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে লোকটার—সেই জলকাদার মধ্যেই বসে পড়ে পশ্চিম দিকে ফিরে দোয়া মাগছে খোদার কাছে। কসুর মাপ করতে বলছে।'

'ঠিক হয়েছে। কিন্তু রামসুভগ—সে দেবী গেলেন কোনদিকে, সেটা লক্ষ্য করেছিলে? কাছাকাছি কোথাও আছেন কিনা?'

'এমন যে হবে তা তো ভাবি নি রাজা সাহেব—তাই ওদিকে অত খেয়ালও রাখি নি। তারপর তো ঐ দুর্যোগ, তখন নিজের জান বাঁচানোই দায় হয়ে উঠেছিল, কে কার খবর রাখবে বলুন! রাত্রেও আর সময় পাওয়া যায় নি, জলে কাদায় অন্ধকারে কোথায় খুঁজব?···আজ ভোরে উঠে অনেককেই প্রশ্ন করলুম, কিন্তু কেউই কোন খবর দিতে পারলে না। কেউই দেখে নি, খবর রাখা দরকার তাও কেউ বোঝে নি, প্রায় আমার মতই অবস্থা সকলকার।'

'হু।' একটু চুপ করে থেকে টোডরমল একেবারে উঠে দাঁড়ালেন।

'আমার ঘোড়াটা তৈরি করতে বল তো রামসুভগ। এখনই একবার বেরোব।'

'আপনি—আপনি কি তাঁকে খুঁজতে যাচ্ছেন রাজা সাহেব?' সসঙ্কোচে

প্রশ্ন করে রামসুভগ সিং।

'না-না—তাঁকে কি আর খুঁজে পাব? তিনি যে কাজ করতে এসেছিলেন—সম্পন্ন করে নিজের স্থানে ফিরে গেছেন।...আমি যাচ্ছি আমার লোকজনের অবস্থা দেখতে। কালকে যা কষ্ট গেছে ওদের ঝড়-জলে—ওদের খবর নেওয়া আমার কর্তব্য। তাছাড়া—সত্যিই মতি বদলাল কিনা ওদের সেটাও একটু দেখি বাজিয়ে!'

টোডরমল উঠে দাঁড়ালেন।

খবরটা কানে গিয়েছিল খান-ই-খানান মুনিম খাঁয়েরও।

তাঁর ওপরও প্রতিক্রিয়া হল কতকটা ঐ রকমেরই।

রাজা টোডরমলের মত তিনি ইষ্টদেবীকে স্মরণ করলেন না—কিন্তু খুশিতে যেন দিশাহারা হয়ে উঠলেন। দুই চোখ আনন্দে সজল হয়ে উঠল—যে লোকটি খবর এনেছিল তাকে তৎক্ষণাৎ একটা মোহর বকশিশ করলেন। এ ছাড়া তখনই ব্যবস্থা করলেন দ্রুততম অশ্বারোহী একজনকে বর্ধমানে পাঠাবার—পীর কুতুব শাহের আস্তানায় নানা ভোজ্যবস্তু নিয়ে পৌঁছে দিয়ে আসবে সে—সেই সঙ্গে দেবে একশখানা মোহর—পীর সাহেবের নজরানা।

আর একবার মুচকি হাসির একটা তরঙ্গ উঠল তাঁর অনুচরদের ঠোঁটের কোণে কোণে—চোখে চোখে অর্থপূর্ণ ইঙ্গিতের একটা বিদ্যুৎ খেলে গেল। অর্থাৎ মাথাটা সত্যিই খারাপ হয়ে গেছে লোকটার।

কিন্তু মুনিম খাঁ তা লক্ষ্য করলেন না। অনুচরদের মনোভাব কিংবা মুখভাব নিয়ে মাথা ঘামাতে অভ্যস্ত নন তিনি কোনদিনই।

তিনি ঘোড়া বার করবার আদেশ দিলেন।

বললেন—তাঁর সিপাহীদের অবস্থা তাঁর নিজের চোখে দেখা কর্তব্য—তাদের এই দুঃখ দুর্দশার দিনে পাশে গিয়ে না দাঁড়ালে তিনি তাদের কিসের সেনাপতি?

॥ ১৯ ॥

রাজা টোডরমল মুখে যা-ই বলুন না কেন—মনের কোণে তাঁর একটু ক্ষীণ আশা ছিলই—সেই দেবী-স্বরূপিনী, তাঁর ও মুঘলদের মূর্তিমতী সৌভাগ্য-লক্ষ্মীকে দেখবার।

কিন্তু সে আশা কেমন করে সফল হবে সে সম্বন্ধে কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না তাঁর। তাঁর সেনানিবেশের মধ্যে অবশ্য এতক্ষণ তিনি নেই—তা হলে তো তিনি শুনতেই পেতেন সে খবর।

তবে?

তবে যে কী—তা তিনি জানেন না। তবু মনের নিভৃত একটি অংশে আশাটা পোষণ করছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। তাই মধ্যাহ্নের কিছু পরে যখন মোটামুটি সমস্ত বড় সেনানিবেশগুলো পরিদর্শন শেষ হয়ে গেল তখন তিনি অন্তরে একটা অপরিসীম ক্লান্তি অনুভব করলেন।

দৈহিক ক্লান্তি? না, তা সম্ভব নয়। রাজা টোডরমল তিন দিন তিন রাত অশ্বপৃষ্ঠে থাকলেও ক্লান্তি বোধ করেন না।

এটা সম্পূর্ণ মানসিক—হয়ত বা ঠিক ক্লান্তিও নয়—একটা হতাশা-জনিত অবসাদ।...

সেনানিবেশের যে প্রান্তে এসে তাঁর পরিদর্শনের কাজ শেষ হল—তার সামনে জঙ্গলটা যেন হঠাৎ আরও নিবিড় হয়ে গেছে। শালবনের নীচের দিকটা সাধারণত পরিষ্কার থাকে—এখানটা ঘন আগাছায় ঢাকা। রাজা টোডরমলের মনে হল ওর ভেতর নিশ্চয় কোন ঝরনা আছে। এ ধারণা হওয়ার আরও কারণ—সামনে এক জায়গায় বনের ঘন সবুজ রেখাটা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। সম্ভবত ওটা একটা পাহাড়ের মত কিছু হবে।

রাজা ঘোড়া থেকে নেমে পড়লেন।

মধ্যাহ্ন বহুক্ষণ পার হয়ে এসেছেন—অপরাহ্ণ বললেই হয় এখন। তাঁর মধ্যাহ্ন-সন্ধ্যার সময় গেছে উত্তীর্ণ হয়ে। যদি ঝরণাই থাকে তো সে কাজটা এখানে সারা যেতে পারে। নইলে নিজের তাঁবুতে ফিরতে আরও বহু বিলম্ব হবে।

তিনি ঘোড়ার লাগামটা এক দেহরক্ষকের হাতে দিয়ে একাই সেই ঘন জঙ্গলটার মধ্যে ঢুকলেন। ইঙ্গিতে তাদের সেইখানেই অপেক্ষা করতে বলে গেলেন। এ-দিকটা তাঁদের দিক—এখানে শত্রু আসবার সম্ভাবনা নেই। দেহরক্ষীরাও তাই উদ্বিগ্ন বোধ করল না বা ব্যস্ত হল না।

আগাছার জঙ্গল ঠেলে একটুখানি ভেতরে যেতেই টোডরমল বুঝলেন তাঁর অনুমানে ভুল হয় নি। সামনেই একটি ছোট্ট ঝরনা! অতি ক্ষীণ অতি সামান্য তার জলরেখা, বালির মধ্য দিয়ে ঝিরঝির করে বয়ে যাচ্ছে—তবু ঝরনাই। স্বচ্ছ শীতল জল। চারদিকে বালি আর পাথরের ছোট ছোট উপল—তাই কালকের অত দুর্যোগের পরও জল ঘোলা হতে পারে নি।

সে জল দেখে টোডরমল প্রথম অনুভব করলেন যে তিনি শুধু ক্লান্ত নন তৃষ্ণার্তও।

ওরই মধ্যে একটা পরিচ্ছন্ন জায়গা দেখে তিনি জুতো আর উষ্ণীষ খুলে একটা পাথরের ওপর রেখে জলের ধারে এসে বসলেন। হাত-পা ধুয়ে মাথায় মুখে জল দিলেন। মধ্যাহ্ন-উপাসনার অনেক হাঙ্গামা—আপাতত সংক্ষেপে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করে একটু জলপান করা দরকার। সেই উদ্দেশ্যে দু হাত জোড় করে ইষ্টদেবীকে প্রণাম করতে যাবেন—সহসা নজরে পড়ল—তাঁর থেকে কয়েক হাত দূরে একটু উঁচুতে অপূর্ব রূপসী একটি মেয়ে—সম্ভবত স্নান করে উঠেই বেশ পরিবর্তন করছে।

সামান্য একটি নিমেষ মাত্র। লজ্জায় রাজা টোডরমলের দুই কান লাল হয়ে উঠল। অনিচ্ছাতেই হঠাৎ চোখ পড়ে গেছে, তবু অপরিচিতা নারীর অসম্বৃত দেহ দেখা লজ্জার কথা। তিনি তাড়াতাড়ি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে প্রণামে মন দিলেন।

প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই কথাটা মনে পড়ে গেল।

এ কি তবে সেই দেবী? অথবা দেবীর প্রেরিত কোন সহচরী—দেবদূতী?

কিন্তু রামসুভগ সিংয়ের বর্ণনার সঙ্গে তো কিছুই মিলছে না!

সে রক্তবস্ত্র, রক্তচন্দন অথবা মুসলমানী দেওয়ানার মত মালা—কিছুই তো নেই!

তবু, একমনে যখন সেই দেবীর কথাই চিন্তা করছেন, হাত জোড় করে যখন ইষ্টদেবীকে প্রণাম করতে যাচ্ছেন তখনই বা ওকে দেখতে পেলেন কেন?

আশায়, আনন্দে, সংশয়ে উত্তেজিত হয়ে রাজা টোডরমল উঠে দাঁড়ালেন!

কিন্তু ওদিকে চাইতেও ঠিক ভরসা হয় না, সহজ ভদ্রতায় বাধে। দেবী হলে কিছু বাধা নেই, যদি কোন সাধারণ মানবী হয়?

ছি-ছি! সে ক্ষেত্রে সে লজ্জা তিনি রাখবেন কোথায়?

কিন্তু বেশীক্ষণ তাঁকে ইতস্তত করতেও হল না—কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মেয়েটিই এগিয়ে এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

'আমার অপরাধ নেবেন না জনাব! শালীনতা বা সৌজন্যের অভাবও মনে করবেন না। নির্জন অরণ্য—কেউ আসবার সম্ভাবনা নেই দেখেই আমি স্নান করতে নেমেছিলাম।'

যেন গুরুতর একটা আঘাত পান টোডরমল। অনেকখানি আশাভঙ্গ হয় যেন।

মাথা হেঁট করেই উত্তর দেন, 'না মা, অপরাধ আমারই। কিন্তু আমি আগে দেখি নি—কাউকে দেখব আশাও করি নি।...আমি, আমি এখনই চলে যাচ্ছি—'

খিলখিল করে হেসে উঠে মেয়েটি বলে, 'বাঃ রে, এখন আপনার যাওয়ার দরকারই বা রইল কী? আমার তো স্নান হয়েই গেছে।...তা ছাড়া আমি আপনাকেই যে খুঁজছিলাম জনাব।'

'আমাকে?'

এবার বিস্মিত হয়ে ওর মুখের দিকে তাকান টোডরমল। ভাল করেই চেয়ে দেখেন।

অপরূপ সুষমাময় মুখের স্নিগ্ধ কৌতুক। তবু তার ভেতরই একটি সকরুণ বিষাদের ছায়াও টোডরমলের বহুদর্শী অভিজ্ঞ চোখে এড়ায় না।

'আমাকে?' আবারও প্রশ্ন করেন তিনি, 'আমাকে তুমি চেন?'

'চিনি বইকি! বাদশার প্রিয়পাত্র, বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজা টোডরমলকে কে না চেনে!'

অধিকতর বিস্মিত হন রাজা।

'কিন্তু তোমার পরিচয় তো পেলাম না মা ?'

'না-ই বা পেলেন জনাব। দেবার মত পরিচয় আমার কিছু নেইও।'

'তোমার পরিচয় আমি জানি না—অথচ তুমি আমার সব পরিচয় জেনে রইলে—এতে একটু অসুবিধা হয়ে থাকল যে।...যদিচ তোমার বর্ণনার মধ্যে অতিশয়োক্তি একটু আছে। নবাব বাদশার প্রিয়পাত্র কে কতক্ষণ থাকে তা বলা শক্ত। আমি শাহানশা দিল্লীশ্বরের একজন দীন সেবক—এইটুকুই আমার যথার্থ পরিচয়।'

'আপনার বিনয় আপনারই যোগ্য রাজাধিরাজ। কিন্তু বৃথা বাক্যে সময় চলে যাচ্ছে—আপনার পূজার বিঘ্ন ঘটছে। পূজা না শেষ হলে আপনি তো একটু বিশ্রামও পাবেন না!'

বড় বেশী জানে মেয়েটি। বড় বেশী।

কুটিল একটা সংশয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে আসে রাজার।

তিনি বলেন, 'কিন্তু আমাদের সেনানিবেশের এত কাছে—এই নির্জন বনে তুমি কী করছিলে—সেটা আমার জানা দরকার যে! তুমি যে শত্রুর গুপ্তচর নও—তা কী করে বুঝব? তাছাড়া তুমি আমাদের খবর অনেক রাখ দেখছি—এটা আমাদের পক্ষে অস্বস্তিকর।'

মেয়েটি আবারও হাসল। বলল, 'শত্রুর গুপ্তচর হলে সংবাদ সংগ্রহ করেই সরে পড়তাম জনাব—আপনাদের এত কাছে নিশ্চিত হয়ে স্নান করতে নামতাম না। তাছাড়া—সন্দেহ হয় আমাকে কয়েদ করুন। আমার তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু তার আগে আমার বক্তব্যটা নিবেদন করে নিতে চাই—'

'বেশ, বল।' কুঞ্চিত ভ্রূ কিন্তু আর সরল হয় না রাজার।

'আপনার সৈন্যরা এবার অনেকটা ভরসা পেয়েছে, তারা পাঠানদের আক্রমণ করতে হয়ত রাজী হয়ে যাবে। কিন্তু এই পথেই যদি আবার এগোতে যান—সেই একই বিপদে পড়তে হবে। এ-বনের প্রতিটি অন্ধি-সন্ধি জানে ওরা, ঠিক জায়গায় বুঝে ওত পেতে থাকবে। আকস্মিক আক্রমণে নাস্তানাবুদ করবে, অকারণে আপনার লোকক্ষয় হবে, আবার আপনার লোকদের মন ভেঙে পড়বে।'

'কিন্তু এছাড়া আর পথও তো নেই।'

কথাগুলো বলেন বটে—কিন্তু বলেন কতকটা অন্যমনস্কভাবেই। ভ্রূকুটি গভীরতর হয় টোডরমলের। চারিদিকে একবার তাকিয়ে দেখেন। যেন আশেপাশেই শত্রুর উপস্থিতি আশঙ্কা করেন।

'আছে পথ জনাব। আমি সে পথ জানি। কিছু লোক এখানে থাক্—শত্রুপক্ষ না টের পায়, তারপর আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি। এ জঙ্গল বেড়ে ওদিক দিয়ে গিয়েছে যে পথ, এর বাঁ দিক দিয়ে—সেই পথ ধরে গেলে আপনারা নানজুরা পৌঁছবেন। একটু ঘুর হবে বটে—পথও অনেকটা, কিন্তু নানজুরা থেকে গড়হরিপুর মাত্র এক ক্রোশ। পিছন থেকে অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়বেন শত্রুর ওপর—ওরা পালাতে পর্যন্ত পারবে না। কারণ ওরা এই দিকেই

পরিখা কেটেছে, এই দিক দিয়েই আপনাদের আশঙ্কা করছে—পিছনে ওদের আত্মরক্ষার কোন আয়োজন নেই।'

টোডরমল অনেকক্ষণ ধরে ওর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন। মানব-চরিত্রে বহু অভিজ্ঞতা তাঁর—সে অভিজ্ঞতা বলছে, ও-মুখে ছলনা নেই। অথচ এ বিশ্বাসই বা করা যায় কী করে?

তিনি কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, 'তুমি যে আমাদের সঙ্গে প্রতারণা করছ না তা কী করে বুঝব?...তুমি এই পথে নিয়ে গিয়ে আমাদের শত্রুর কবলে ফেলবে না তার কোন প্রমাণ আছে?'

'প্রমাণ!' মুখভাব সামান্য একটু কঠিন হয় মেয়েটির। বলে, 'সদিচ্ছা বিশ্বাস করানোটাই এ পৃথিবীতে শক্ত দেখছি। মানুষের উপকার করতে গিয়েও আগে প্রমাণ দিতে বসতে হবে! আশ্চর্য!...প্রমাণ! প্রমাণ দিয়ে দিয়ে আমি ক্লান্ত রাজা সাহেব।...বলছি তো আমাকে আটকে রাখুন। আর আমি যদি পথ দেখিয়ে নিয়ে যাই তো সঙ্গেই যাব—'

'তাতে সুবিধা কী? অতর্কিতে শত্রুর সামনে যদি পড়ি, নিজেদের সামলাতেই ব্যস্ত থাকব। তুমি যা বুদ্ধিমতী, মানবচরিত্রের এ রহস্যটাও জান নিশ্চয়।'

চুপ করে থাকে মেয়েটি। তারপর যেন মরীয়া হয়েই বলে, 'বেশ। এক জন সিপাহী দিন আমার সঙ্গে, আমি পথ দেখিয়ে দিচ্ছি—যদি সে নিরাপদে ফিরে আসে আপনার বিশ্বাস হবে তো?'

'হয়ত হবে। কিন্তু সেটাও খুব নিশ্চিত প্রমাণ নয়। যদি আগে থাকতে সেই রকমই ইশারা থাকে তো একজন গেলে কিছুই বুঝবে না।'

এইবার বোধ হয় মেয়েটির ধৈর্যচ্যুতি হয়। সে বলে, 'দেখছি আপনার বাদশা বয়সে আপনার চেয়ে তরুণ হলেও ঢের বেশী মানুষ চেনেন। তাঁকে বিশ্বাস করানো সেই জন্যে অনেক সহজ। তাছাড়া তাঁর আত্মবিশ্বাস আছে। আপনার মত সর্বদা সন্দেহে কাঁপেন না।'

একটা কী যেন মনে পড়ে টোডরমলের। কী যেন—

কী একটা গল্প তিনি শুনেছেন। কে এক রহস্যময়ী নারীকে গুপ্তচর সন্দেহে ধরা হয়েছিল। অথচ তারই কথাতে নাকি শেষ পর্যন্ত বাদশা হাজীপুর কিলায় আগুন ধরিয়েছেন। আর সেই আগুন দেখেই নাকি দায়ুদ কররাণী পালিয়ে যান। পাটনা শহর, বিস্তর অস্ত্রশস্ত্র হাতি ঘোড়া টাকা-কড়ি—একেবারে কোন আয়াস না করেই এঁদের হস্তগত হয়।

সেই সঙ্গে আরও একটা কী জনশ্রুতি যেন ঝাপসা-ঝাপসা মনে পড়তে চায়—অথচ ভাল করে পড়ে না।

যন্ত্রের মত উত্তর দেন টোডরমল—প্রাণপণে সেই মনে-না-পড়া কথাটা মনে করার চেষ্টা করতে করতে, 'তিনি বাদশা, মালিক। আমার দায়িত্ব ঢের বেশী মা। আমি নোকর মাত্র।'

মেয়েটি ঘুরে দাঁড়ায়। ওঁর দিকে পাশ ফিরে দাঁড়িয়ে বলে, 'আমারই ভুল

হয়েছিল রাজা সাহেব। আপনার ওপরওলা খান-ই-খানানের কাছে কথাটা বললে তিনি এক লহমাও ইতস্তত করতেন না।...বেশ, আমি চললাম, পথের কথা বলে দিয়ে গেলাম। আপনি বরং মুনিম খাঁকেই বলবেন। আমার বর্ণনা দিয়ে বলবেন যে এমনি একটি মেয়ে আফগানদের গুপ্তচর হয়ে এসে আমাদের পথ ভুলিয়ে নিয়ে যেতে চাইছিল—। তারপর তিনি যা বলেন তাই করবেন।'

মেয়েটি চলে যাবার উপক্রম করতে টোডরমল বিদ্যুৎগতিতে ওর পথ রোধ করে দাঁড়ালেন, 'একটা কথা। কাল শুনেছি কে এক সন্ন্যাসিনী দেবী এসে আমাদের শিবিরে শিবিরে ঘুরে সিপাহীদের উৎসাহ দিয়ে গেছেন, তিনি নাকি কালকের অকাল কালবৈশাখীও ভবিষ্যদ্বাণী করে গিয়েছিলেন। তুমিই কি সেই সন্ন্যাসিনী ?"

মেয়েটি আবারও হাসল। বলল, 'আমি দেবী তো নইই, আর সন্ন্যাসিনীও যে নই তা তো দেখতেই পাচ্ছেন। আমি আপনাদের কাছে অস্পৃশ্যা—যবনী ক্রীতদাসী মাত্র। বাঁদীর নাম নফিসা। আদাব জনাব!'

নফিসা চলে গেল। ঝরনার পথ ধরে উঁচু টিলাটায় উঠে গেল সে।

দেখতে দেখতে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল।

টোডরমল চিন্তিতমুখে ঝরণার ধারে বসলেন।

ইষ্ট প্রণাম সেরে—দুই আঁজলা সেই সুমিষ্ট কাকচক্ষু জল পান করে কিছুটা সুস্থ হলেন।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই মনে পড়ে গেল কথাটা—যেটা মনে করার জন্য এতক্ষণ চেষ্টা করছেন।...

এইখানে এসেই গুজবটা শুনেছিলেন। তখন বিশ্বাস করেন নি। বিশ্বাস করেন নি বলেই ভুলে গিয়েছিলেন সম্ভবত।

খান-ই-খানান মুনিম খাঁর কথা।

কে এক অপরিচিতা তরুণী বেদের মেয়ের জন্য নাকি মুনিম খাঁ পাগল হয়ে উঠেছেন কিছুদিন থেকে। ইদানীং গুরুতর রাজকার্য যুদ্ধ সব-কিছু ছেড়ে শুধুমাত্র তাকে খোঁজ করার জন্যই নাকি সমস্ত শক্তি, সমস্ত উদ্যম নিয়োজিত করেছেন। তেলিয়াগঢ়ির কাছে যুদ্ধ-শিবিরেই নাকি তার দেখা পান প্রথম, সে-ই রাজমহলের পাহাড় ঘুরে পথটা দেখিয়ে দেয়—তাইতেই নাকি বিনা রক্তপাতে গুরুন্দার অবরোধ দখল করেন মুনিম খাঁ।

সে সময় যে পরাজিত শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করা হয় নি—তারও নাকি এই কারণ। সে সময়ে মুনিম খাঁ তাকেই খুঁজছিলেন, শত্রুর কথা ভেবে দেখতে পারেন নি।...

তবে কি এ-ই সেই রহস্যময়ী ?

কিন্তু কালকের সে সন্ন্যাসিনীই বা গেলেন কোথায় ?

এঁর সঙ্গে কি তাঁর কোন সম্পর্কই নেই ?

জঙ্গলের ঘন পত্রাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে নিজের ঘোড়ায় উঠতে যাবেন, পিছনে একাধিক ঘোড়ার পায়ের আওয়াজ পেয়ে টোডরমল চমকে উঠলেন।

কোমরের তলোয়ারে হাত দিয়ে ঘুরে দাঁড়াল সবাই। কিন্তু প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই অভিবাদনে মাথা হেঁট করতে হল।

খান-ই-খানান মুনিম খাঁ।

মাত্র চারজন দেহরক্ষী নিয়ে ছুটে আসছেন।

টোডরমলের আর ঘোড়ায় চড়া হল না। তিনি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলেন প্রধান সেনাপতির।

জঙ্গলের পথে যতটা দ্রুত আসা যায় প্রায় ততটাই আসছিলেন মুনিম খাঁ। এঁদের দেখে প্রাণপণে লাগাম টেনে ঘোড়ার বেগ সংযত করলেন।

উত্তেজনায় বৃদ্ধের মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। কিসের একটা আশায়ও যেন দুটি চোখ জ্বলছে। কাছে এসে টোডরমলকে চিনতে পেরে কোন রকম ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন, 'রাজা সাহেব, এই পথে কোন দিওয়ানা ফকিরনীকে দেখেছেন ?...কাল থেকে সে আমাদের ফৌজী শিবিরে শিবিরে ঘুরছে—শুনেছেন তার কথা কারও মুখে ?'

'না জনাব, আমিও তাঁর খোঁজেই এসেছিলাম। কিন্তু কোথাও তাঁর কোন খবর পেলাম না।'

'পেলেন না ? আপনি নিজে খবর নিয়েছিলেন—তবুও পেলেন না ? তাই তো !'

স্পষ্ট হতাশা মুনিম খাঁর কণ্ঠে।

'তাকে যে—তাকে যে আমার বড় দরকার !'

'তাকে পাই নি বটে—কিন্তু মাত্র কিছুক্ষণ আগে এক অদ্ভুত নারীর দেখা পেয়েছি জনাব। মনে হল সে আপনাকে চেনে। তার কথাটাও আপনাকে বলা দরকার।'

'নারী ? আর এক নারী—আমাদের শিবিরে ?—আসে কেমন করে এত মেয়েছেলে ? কেউ কি পাহারা দেয় না ?'

রুষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করেন মুনিম খাঁ। হতাশার ক্ষোভটা বিরক্তির আকারে কারও ওপর প্রয়োগ করতে পারলে বাঁচেন যেন তিনি।

একজন সেনানায়ক সঙ্গেই ছিলেন, তিনি বললেন, 'ওই ফকিরনীকেই কাল শুধু আসতে দেওয়া হয়েছিল জনাব—ওঁকে দেখে তেমন কোন সন্দেহ হয় নি বলেই—তা ছাড়া শুনেছি কী একটা নিশানীও উনি দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাও নজরে নজরেই রাখা হয়েছিল। বরাবরই একজন সান্ত্রী সঙ্গে ছিল। কেবল বিকেলে ঝড়টা উঠতেই আর নজর রাখা সম্ভব হয় নি।...কিন্তু আর কাউকে তো—।'

'থাক্। ঢের হয়েছে।...একটা অকর্মণ্যতা ঢাকতে গিয়ে নতুন অকর্মণ্যতার পরিচয় দিও না।...হ্যাঁ, কী বলছিলেন রাজা সাহেব ? কী বলেছে সে মেয়ে-

ছেলে ?'

'দয়া করে যদি একটু নির্জনে আসেন তো ভাল হয়। সে কথা সকলের সামনে আলোচনা না করাই বোধ হয় ভাল।'

কৌতূহলী মুনিম খাঁর চোখে যেন নতুন করে আশার সঞ্চার হয়।

তিনি ঘোড়া থেকে নেমে গাছপালা সরিয়ে ঘন জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করেন টোডরমলের সঙ্গে।

জঙ্গলের ধারে পৌঁছে টোডরমল সংক্ষেপে বিবৃত করলেন মেয়েটির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার বিবরণ। কিন্তু তাঁর শেষ কথা হবার আগেই উত্তেজিত খান-ই-খানান ওঁর হাতটা চেপে ধরলেন: 'সেই! সেই! সে মেয়েটি কোথায় গেল রাজা সাহেব? কোথায় গেল সে?···ছেড়ে দিলেন তাকে? ছেড়ে দিলেন? তাকে খুঁজে পাবার জন্য যে আমি সারা দুনিয়া তোলপাড় করছি!'

টোডরমলের বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

তিনি অকারণে একটু কুণ্ঠিতও হয়ে পড়েন। বলেন, 'তা তো আমি জানি না জনাব। অপরিচিতা মেয়ের মুখে এ-ধরনের প্রস্তাব—বিশ্বাস করবার তো কথা নয়···তবু তার কাছে আমি তার বিশ্বস্ততার সামান্য একটু প্রমাণই চেয়েছিলাম, একেবারে উড়িয়ে তো দিই নি—'

'এ মেয়ে আমাদের যথার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী রাজা সাহেব—এ-ই কাল ফকিরনীর বেশে এসে আমাদের সৈন্যদের উৎসাহ দিয়ে গেছে। আপনি বুঝতে পারলেন না—নইলে সে এর মধ্যে আসবে কেমন করে।···ইস, আমি যে কথাটা শুনেই বেরিয়ে পড়েছিলাম রাজা সাহেব, তাকে ধরব বলে। তাকে যে আমার বড় দরকার।'

এই আকুলতার মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন অনুযোগ ছিল তাতে ঈষৎ বিরক্ত বোধ করলেন টোডরমল। বললেন, 'এত ইতিহাস তো আমার জানবার কথা নয় জনাব। সাধারণভাবে এ প্রস্তাব শুনলে যা করা উচিত আমি তাই করেছি।'

'না না—আমি আপনাকে দোষ দিচ্ছি না রাজাসাহেব।' একটু অপ্রতিভভাবে বলেন মুনিম খাঁ,—'এ আমার নসিবের দোষ!···কিন্তু সে গেল কোথায়?'

'এ দিকে—এই টিলাটার ওপর দিকে চলে গেছে সে।···চলুন না খুঁজে দেখি—কত দূর আর যাবে?'

'চলুন। কিন্তু তাকে ধরতে পারব বলে মনে হচ্ছে না। গত ক-মাস সে আমাদের সঙ্গে-সঙ্গেই আছে তবু তাকে ধরতে পারি নি। সে আমাদের দেখে, আমরাই দেখতে পাই না।···সে নিজে ধরা না দিলে ধরা যাবে না রাজা সাহেব।'

তবু তাঁরা দুজনেই যান। ঝোপঝাড় সরিয়ে লতাপাতা ডালপালার আবরণ ভেদ করে সে-টিলার প্রত্যেকটি পাথরই খোঁজ করেন বলতে গেলে—টিলার ওপারে নেমে যান তার সন্ধানে—কিন্তু কোথাও খুঁজে পান না তাকে। সে রহস্যময়ী নারী যেন বাতাসে উবে গেছে।

অবশেষে ফিরে এসে খান-ই-খানান তাঁর দেহরক্ষীদের হুকুম দেন—এখনই এই শিবিরের সর্বত্র, মুঘল সেনানিবেশের চারিদিকে বনের মধ্যে—যতটা নিরাপদে খোঁজ করা যায় খোঁজ করতে। অন্তত পাঁচশ লোক যেন বেরিয়ে পড়ে এখনই। যে ধরে আনতে পারবে বা সন্ধান দেবে তাকে তিনি একশ মোহর বকশিশ করবেন। তবে তাকে কোন রকম অসম্মান না করা হয়—তাঁর নিজের কোন অন্তঃপুরিকা হলে তারা যেভাবে সম্ভ্রমসূচক আচরণ করত—তেমনিই যেন করে।

হুকুম দিলেন, লোকও লেগে গেল—কিন্তু এ অনুসন্ধানের ওপর মুনিম খাঁ কোন ভরসা রাখলেন বলে বোধ হল না। তাঁর মুখ-চোখে যেন একটা সুগভীর ক্লান্তি—একটা অবসন্নতা।

বোধ করি একটা হতাশাও।

দুজনে নীরবে নিজেদের তাঁবুর দিকে ফিরলেন।

খান-ই-খানানের প্রাপ্য মর্যাদা হিসেবে রাজা টোডরমল তাঁর তাঁবুর প্রবেশপথ পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। অবশেষে একেবারে সামনে গিয়ে মুনিম খাঁ ঘোড়া থেকে নামতে টোডরমলও নেমে পড়লেন। তারপর দস্তুর-মাফিক বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে খান-ই-খানান যখন তাঁবুতে ঢুকতে যাবেন তখন সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে টোডরমল প্রশ্ন করলেন, 'তাহলে এখন আমাদের কর্তব্য কী জনাব? আপনি কি মনে করেন ওই—ওই মহিলার নির্দেশ শোনাই আমাদের উচিত?'

'অবশ্যই। এ সম্বন্ধে আর কোন দ্বিতীয় প্রশ্নের অবকাশ আছে নাকি? আপনি ওর কথা হদিসের মতই সত্য বলে মনে করতে পারেন।...বিশ্বস্ত জন-দুই লোক এখনই পাঠিয়ে দিন—এই জঙ্গল ঘুরে যেমন বলেছে তেমনি গিয়ে নানজুরা পর্যন্ত ঘুরে আসুক। যদি পথ ঠিক থাকে তাহলে পরশু ভোরেই আমরা রওনা হব।'

যে কৌতুকটা মনের মধ্যে উদগ্র হয়ে উঠেছিল তা আর গোপন করতে পারলেন না টোডরমল। বললেন, উনিই যদি কালকের সেই সন্ন্যাসিনী বা দেবী হন—তাহলে উনি বললেন কেন উনি মুসলমানী আর বাঁদী!...ওঁর সত্য পরিচয়টা—যদি বাধা না থাকে—বলবেন?'

'ও মিথ্যা কথা বলে না রাজা সাহেব—যা শুনেছেন তা ঠিকই শুনেছেন। ও বাঁদী, ওর নাম নফিসা।'

'কিন্তু তাহলে তিনি অমন ভবিষ্যদ্বাণী করলেন কী করে?'

'সেটা আমিও জানি না। হয়ত সাধারণ অভিজ্ঞতা, হয়ত বাতাসের গতি দেখে, আকাশের রঙ দেখেই টের পায় ওরা। শুনেছি এমন আরও কেউ কেউ বলেন, সে সব ঠিক আমি জানি না। তবে এটা জানি যে সে মিথ্যা বলে না এবং তার মত শত্রু আফগানদের আর নেই। সুতরাং আমরা নির্ভয়ে ওর কথামত কাজ করতে পারি।'

কৌতূহল তবু থেকেই যায়।

'কিন্তু এইটুকু ছাড়া আর কোন কথাই কি জানা যায় না ওর সম্বন্ধে জনাব ?'

'আর যেটুকু জানি—আর-একদিন সেটা আপনাকে বলব রাজা সাহেব। আজ মাফ করবেন। বড়ই ক্লান্ত আমি।...আর সন্ধ্যারও তো বেশী দেরি নেই—নামাজের সময় হয়ে এল।'

খোজা প্রহরীরা তাঁবুর পর্দা সরিয়ে অপেক্ষা করছিল অনেকক্ষণ থেকেই—খান-ই-খানান আর-একবার আঙুলটা কপালে ঠেকিয়ে ভেতরে ঢুকে গেলেন।

তাঁর চলে যাওয়ার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন টোডরমল। এবার তিনিও ঘোড়ায় চাপলেন। সত্যিই সন্ধ্যার আর বড় দেরি নেই। প্রথম ফাল্গুনের অপরাহ্ন বহুক্ষণ ম্লান হয়ে এসেছে—বাতাসে ঈষৎ শীতের আমেজ ঘোষণা করছে রাত্রিরই আসন্ন আবির্ভাব।

তিনিও ক্ষুৎপিপাসার্ত। তাঁরও সন্ধ্যা-পূজার সময় হয়ে এসেছে।

টোডরমল নিজের তাঁবুর পথ ধরলেন!

॥ ২০ ॥

একই সঙ্গে দুটো খবর পেলেন দায়ুদ খাঁ কররাণী। গুপ্তচর চিরকাল সব রাষ্ট্রব্যবস্থারই অঙ্গ—চিরদিন ছিল এবং চিরদিন থাকবে। কিন্তু তাদেরও শক্তির সীমা আছে। দিওয়ানা নারীর অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণীর সংবাদটা যখন এসে পৌঁছল, তার মাত্র একদণ্ড আগেই খবর পেয়েছেন তিনি—সামনের কয়েক পংক্তি সৈন্য ঠিক রেখে অধিকাংশ সেনা নিয়ে দীর্ঘতর বর্তুল পথ ঘুরে মুঘলরা নানজুরা পৌঁছেছে। নানজুরা এখান থেকে মাত্র এক ক্রোশ উত্তর-পশ্চিম।

প্রথম সংবাদটার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না দায়ুদ একেবারেই। এ-পথের খবর তিনিও জানতেন না, কোন গুপ্তচরই জানায় নি তাঁকে। বাধা দেবার ব্যবস্থা দূরে থাক্—তিনি সেদিকে কোন পাহারা পর্যন্ত রাখেন নি। তাই প্রথমটা এই সংবাদে বিহ্বলই হয়ে পড়েছিলেন।

কিন্তু দ্বিতীয় খবরটাতে আর বিস্ময় বোধ করলেন না। এমন কী প্রথম সংবাদটাও এবার পরিষ্কার হয়ে গেল তাঁর কাছে। বরং মনে হল এটাই আগে ভাবা উচিত ছিল তাঁর। দুই আর দুইয়ে যেমন চার হয় তেমনিই এ দুটো সংবাদে অবশ্যম্ভাবী কার্য-কারণ সম্পর্ক।

খবরটা শুনে একটু হাসলেন দায়ুদ খাঁ কররাণী। বিচিত্র, দুর্বোধ্য হাসি—একটু বা সকরুণও। তবে আর দ্বিধা করলেন না, এটাও ঠিক। তাঁর ভাগ্য আরও একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রত্যক্ষ করলেন যেন। কিন্তু ভয় পেলেন না। ভয় আর তিনি পাবেন না। অজ্ঞাতকেই বেশী ভয় মানুষের, জ্ঞাত সর্বনাশের সামনে অনায়াসে দাঁড়াতে পারে অনেকেই।

ভাগ্য তিনি টের পেয়েছেন। ওই সর্বনাশিনী যখন আবার মুঘলের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তখন তিনি হারবেনই। কিন্তু এর আগের বারের মত বিনাযুদ্ধে হার মানবেন না বা পালাবেন না। হাজীপুর কিলায় আগুন লাগবার দৃশ্য দেখে যেভাবে আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে পালিয়েছিলেন, যে ভাবে গুরুন্দার মাঠ থেকে পিছু হটেছিলেন অকারণে, আজও সে কথা মনে পড়লে লজ্জা বোধ হয় তাঁর—নিজের অনুচর কর্মীদের দিকে তাকাতে পারেন না যেন। সে লজ্জার কারণ আর তিনি ঘটতে দেবেন না। হারতে হয় মানুষের মত হারবেন—মরতে হয় বীরের মত মরবেন, সুলেমান কররাণীর ছেলের মতই।

ভয় তিনি টের পেয়েছেন। আর নয়।

ওই মৃত্যুরূপিণী সর্বনাশিনী নারী তাঁকে অনেক খেলাই দেখিয়েছে—এবার তিনি ওকে কিছু খেলা দেখাবেন। মৃত্যুই আসুক আর সর্বনাশই আসুক, তার মুখের সামনে তুড়ি মেরে চলে যাবেন তিনি। তাকে উপেক্ষা করে যাবেন।...

উদ্বিগ্ন, চিন্তাকুল অনুচররা সুলতানের মুখের দিকে চেয়ে রুদ্ধনিঃশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে সংবাদটার প্রতিক্রিয়ার।

কিন্তু সুলতানের সে সম্বন্ধে কোন সচেতনা আছে বলে মনে হল না। তাঁর চোখ তখনও সংবাদদাতার মুখের ওপর নিবদ্ধ বটে—দৃষ্টি যে তাতে নেই তা যে-কেউ দেখলেই বুঝতে পারে।

তাঁর দৃষ্টির সামনে তখন একমাত্র সেই সর্বনাশিনী।

বহু বিপদ, বহু লজ্জা, বহু অপমানের কারণ যে—সমস্ত সর্বনাশের মূল—তবু আজ নিজের মনের দিকে তাকিয়ে অনুভব করলেন দায়ুদ—তার সম্বন্ধে তাঁর মনে আজ যেন কোন উষ্মা, কোন ক্ষোভ, কোন অনুযোগ নেই। তাকে তিনি ক্ষমাই করেছেন। অবশ্য যদি তাকে ক্ষমা করার কোন অধিকার তাঁর থাকে।...

অবশেষে গুজর খাঁই স্তব্ধতা ভঙ্গ করলেন। গুজর খাঁ সুলেমান কররাণীর আমলের রণকুশলী সেনাপতি, আফগানবাহিনীর প্রধান ভরসা।

গুজর খাঁ বললেন, 'তাহলে এখন কী করবেন জাহাঁপনা?'

'করব!' যেন তন্দ্রা থেকে জেগে ওঠেন দায়ুদ কররাণী।

তারপর উপস্থিত সকল শ্রোতাকে বিস্মিত করে দিয়ে তিনি বলেন, 'যুদ্ধ করব। এমনভাবে অপেক্ষা করে আর বসে থাকব না। যা হয় এসপার-ওসপার হয়েই যাক।...আমরাই আগু বেড়ে ওদের আক্রমণ করব। এখন বলুন আপনারা, কীভাবে এগোন উচিত হবে।'

কিছুক্ষণ সকলেই স্তব্ধ হয়ে থাকেন। তারপর কথা বলেন কতলু খাঁ লোহানী—বলেন, 'যদি আগু বেড়ে যুদ্ধ দিতে হয়—তুকারয়ের মাঠই হচ্ছে প্রশস্ত। আমরা যদি একটু তাড়াতাড়ি কুচ করে যাই, তা হলে ওরা টের পাবার আগেই পৌঁছব। পিছনে একটা টিলা আছে,—পাশে ছোট পরিখাও আছে—ওখানে গিয়ে ব্যূহ রচনা করার সুবিধা হবে। আমরা ভাল করে

বসতে পারলে ওরা বিশেষ সুবিধা করতে পারবে না—ওরা আসতে আসতে আমরা ওদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ব।'

'তুকারয়!' মুহূর্তকাল মৌন থাকেন দায়ুদ কররাণী। তারপর গুজর খাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলেন, 'আপনি কী বলেন গুজর খাঁ সাহেব?'

'মন্দ কী। অনেক প্রাকৃতিক সুবিধা আছে বটে।'

'তবে তাই হোক। আমরা আজই রাত্রে রওনার ব্যবস্থা ঠিক করে ফেলতে পারি সেই-মত হুকুম দিন। খুব হুঁশিয়ার কিন্তু—যাত্রার আগে আমাদের গন্তব্যস্থানের কথা কেউ টের না পায়।'

এই বলে আর একটু থেমে কতলু খাঁর মুখের দিকে চেয়ে একটু যেন কুণ্ঠিত ভাবেই বললেন, 'একটা কথা কিন্তু—আমার হারেম, আমার দরকারী কাগজপত্র এবং কিছু কিছু ধনরত্নও আমি সরিয়ে দিতে চাই। আপনি আপনার লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বিশ্বাসী জনকতককে বেছে নিয়ে এই কাজের ভার দিন—যারা প্রাণ দেবে তবু আমার এতটুকু লোকসান করবে না।'

আজকের দিনে সবচেয়ে বেশী করে তাঁর মনে পড়ছে শ্রীহরির কথা। বিশ্বস্ত হিতাকাঙ্ক্ষী শ্রীহরি। সে থাকলে আজ কিছুই ভাবতে হত না। কিন্তু সেও আজ নেই। হয়ত বা আকাশের লেখা আগেই পড়তে পেরে সে সরে দাঁড়িয়েছে। মেদিনীপুরে পড়বার মুখেই সে বিদায় নিয়ে চলে গেছে সুদূর সুন্দরবনে। মানুষের চেয়ে বাঘকে ভয় কম—এই কথাই বলে গেছে সে।

'কোথায় পাঠাতে চান?' কতলু খাঁ প্রশ্ন করেন।

'একেবারে কটক।'

এবার যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন কতলু খাঁ! এতক্ষণে যেন তাঁর অভ্যস্ত ও পরিচিত মনিবকে খুঁজে পান খানিকটা। যে-লোক এতকাল কোনরকম যুদ্ধ দেবার আগেই পালিয়ে আসছে বার বার—তার মুখে আগু বেড়ে শত্রুকে আক্রমণ করবার কথা শুনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ হচ্ছিল তাঁর।

'ঠিক আছে। আপনি ওঁদেরও প্রস্তুত হতে বলুন। আমি গাড়ি পাল্‌কির ব্যবস্থা করছি।'

॥ ২১ ॥

তুকারয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর মুখোমুখি পৌঁছেও কেন যে মুনিম খাঁ ঐটুকু ইতস্তত করেছিলেন, কেন যে তখনই দুশমনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বার হুকুম দেন নি—তা আজও কেউ জানে না।

তিনি নাকি জ্যোতিষীর দোহাই দিয়েছিলেন! পাঁজির হিসেবে তিথি-নক্ষত্র-ফল নাকি সেদিন মুঘলদের অনুকূলে ছিল না। কিন্তু সেই যুদ্ধক্ষেত্রে কোথা থেকে এমন জ্যোতিষী আর তার পাঁজিপুঁথি এল কেউ জানে না।

অধীর অসহিষ্ণু টোডরমল ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে রইলেন, তুম্বরীল খাঁ নিজের ঠোঁট নিজে কামড়ে কামড়ে রক্তাক্ত করে ফেললেন, তবু মুনিম খাঁর কাছ থেকে সেই বিশেষ আদেশটি বেরোল না।

তাঁর উৎসুক দুটি চোখ বার বার যেন কাকে খুঁজে নিজেদের শিবিরের ওপর দিয়ে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। ব্যাকুল দৃষ্টি বার বার দূর-দিগন্তের ঘন সবুজ বনরেখায় ধাক্কা খেয়ে ফিরতে লাগল—তিনি যেন কাউকে আশা করছেন, কারুর নির্দেশ, কারুর উপদেশ—ইঙ্গিত। সেই ইঙ্গিতটা না পাওয়া পর্যন্ত তিনি হুকুম দিতে পারছেন না কিছুতেই।

কিন্তু দায়ুদ খাঁ কররাণী মুঘলদের অনুকূল তিথি-নক্ষত্রের জন্য অপেক্ষা করলেন না। তিনি হুকুম দিলেন নিজের সৈন্যদের অগ্রসর হবার। হুকুম দিলেন গুজর খাঁকে সর্বাগ্রে তাঁর করি-বাহিনী নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বার।

দায়ুদ খাঁর এই সাহস এবং শৌর্যে বিস্মিত হল অনেকেই। বিশেষত যে পুরাতন সেনানায়ক সর্দাররা তাঁর পিতার আমল থেকে তাঁকে দেখেছেন—যাঁরা পাটনা ও গুরুন্দাতে তাঁকে ছায়ায় ছায়ায় কাঁপতে দেখেছেন ফাল্গুন-শেষের শুকনো বাঁশপাতার মত—তাঁদের বিস্ময়ের সীমা রইল না। তাঁরা এই অঘটনটা খোদার দয়ার ওপরই আরোপ করে নিশ্চিন্ত হলেন। যিনি ইচ্ছামাত্র মূককে বাচাল করতে পারেন, অন্ধকে চক্ষুষ্মান করতে পারেন—তাঁর পক্ষে কাপুরুষকে সাহসী করা এবং নির্বোধকে বুদ্ধিমান করা এমন কি আর কঠিন কাজ!

হয়ত তাই। হয়ত ঈশ্বরেরই দয়া।

অথবা তাঁর ন্যায়বিচার। তাঁর রোষ।

সেদিনের সে বিচিত্র যোগাযোগ হয়ত তাঁরই সংঘটন।

তবে যুদ্ধের ফলাফল যাই হোক—অন্তত কাপুরুষতার লজ্জা থেকে তো মুক্ত হতে পারলেন তিনি।

এমন কি যুদ্ধের শেষেও দায়ুদ খাঁ কররাণী সেদিনের সে প্রেরণাকে ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলেই মনে করেছিলেন।...

যুদ্ধের আগের দিন। অপরাহ্ণের আবছা আলোতে নিজেদের সৈন্য সংস্থাপন নিজের চোখে দেখতে ও তদারক করতে বেরিয়েছিলেন দায়ুদ খাঁ। মুঘলরা তখনও এসে পৌঁছয়নি—তবে আসবার দেরিও নেই এ খবরটা পেয়েছেন তিনি। তাদের আগমনের আভাসস্বরূপ প্রথম অশ্বপদ-শব্দের দিকে কান পেতে আছেন সকলেই। আর হয়ত ক-দণ্ডের মধ্যেই ওরা পৌঁছে যাবে।

এই অবস্থায় নিজেদের ব্যূহের একেবারে সীমানা দিয়ে যাচ্ছিলেন দায়ুদ। সুতরাং ত্রস্ত ও উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি বার বার দূরের বনরেখার দিকেই গিয়ে পড়ছিল। কে জানে—শত্রুর কোন অগ্রগামী ক্ষুদ্র দল এসে পড়তে কতক্ষণ!

সেইভাবে চাইতে চাইতেই হঠাৎ তাঁর নজরে পড়ল একটি কৌতূহলী শিবা সহসা তার অরণ্যের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে বাইরের প্রান্তরে এসে তাঁদের দিকে

চেয়ে আছে।

সঙ্গে সঙ্গে দায়ূদ খাঁর শিকারী রক্ত উত্তেজিত হয়ে উঠল। বাল্যে আর কিছু না করুন—শিকারটা করেছেন। এ সংস্কার তাঁর সমস্ত অস্তিত্বে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ধনুকে তীর যোজনা করলেন।

কিন্তু শিয়ালটাও ততক্ষণে স্থির হয়ে নেই, সে নিজের বিপদ বুঝতে পেরে বনের দিকে দৌড়তে শুরু করেছে। তার পিছনে পিছনে দায়ূদ খাঁও—স্থান কাল, বনের ছায়ায় শত্রুর উপস্থিতির সম্ভাবনা সব ভুলে—ছুটতে লাগলেন।···তবু হয়ত সে জীবটি অনায়াসেই গাছের ছায়ায় অদৃশ্য হত, যতই তৎপর হোন দায়ূদ, শিয়ালের সঙ্গে ছোটা তাঁর সাধ্যে কুলোত না—কিন্তু ঠিক বনের প্রান্তে পৌঁছতেই আর-একটি তীর যেন আকাশ থেকে এসে বিঁধল তার পিঠে, সে-তীর শুদ্ধ মাটিতে গেঁথে গেল সে।

স্তম্ভিত হয়ে গেল দায়ূদ—কিছুটা আতঙ্কিতও।

বনের মধ্যে থেকে যে তীর ছুঁড়েছে সে নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের লোক—মুঘলদের। দেহরক্ষী কজন সঙ্গে আছে বটে, কিন্তু তারা অনেক পিছনে। দায়ূদ কোষ থেকে তরবারি বার করতে করতেই ঈষৎ চকিতচোখে চেয়ে দেখলেন—সামনেই একটা সেগুনগাছের ডালে এক নারীমূর্তি!

একবার মাত্র দেখা হলেও সেই ভয়ংকর রাত্রের সে নারীকে ভোলেন নি তিনি। এ তাঁর জীবনের অভিশাপ, মূর্তিমতী সর্বনাশ। এই নারীর জন্যই তিনি ভয়ে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন—এর জন্যই তাঁর যত লজ্জা, যত লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়েছে।

চোখোচোখিও হল বইকি!

সন্ধ্যার আবির্ভাব সূচিত হয়েছে কিন্তু তার আঁধারের আঁচল দিগন্তরেখাকে সম্পূর্ণ ঢেকে দিতে পারে নি—এখনও পশ্চিম আকাশে দিবসের শেষ স্মৃতিটুকু জেগে আছে। সে আলোতে পরস্পরকে চিনতে অসুবিধা হল না কারুরই।

আর চিনতে পেরে খিলখিল করে হেসে উঠল সে মেয়েটি। অবজ্ঞার হাসি, বিদ্রূপের হাসি।

তার মধুক্ষরা কণ্ঠের সে হাসি অরণ্যের স্তব্ধতায় প্রতিধ্বনির তরঙ্গ তুলে ছড়িয়ে পড়ল সেই প্রান্তরের এক দিক থেকে আর-এক দিকে—বহুদূর অবধি।

দায়ূদ কররাণীর সঙ্গী ইয়ার বেগ তাঁর বর্শা উঁচু করে ধরলেন, গুজর খাঁর চোখে ঘনিয়ে এল নিরুদ্ধ রোষের প্রলয়বহ্নি!

দায়ূদ খাঁর মুষ্টিও ধনু ও শায়কে বজ্র-বদ্ধ হয়ে উঠল একবার! কিন্তু তিনি প্রাণপণে নিজেকে দমন করলেন। সেই সঙ্গে হাতের ইঙ্গিতে নিরস্ত করলেন সঙ্গীদেরও। এ তাঁর প্রাপ্য। ওই নারীর কাছে এ লাঞ্ছনা ও অপমান—তাঁর কাছে খোদারই বিচার।

মাথা হেট করে চলে এলেন সেখান থেকে।···

কিন্তু সম্ভবত সেই জ্বালাই তাঁকে স্থির থাকতে দিল না।

তাঁর চিরকালের অভ্যাস ত্যাগ করে সমস্ত সতর্কতাকে বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে তিনিই এবার আক্রমণ করলেন মুঘলদের। অবরোধের মধ্যে বা পরিখার মধ্যে নিজেদের বাঁচবার বা নিজেদের ব্যূহকে সুদৃঢ় করবার চেষ্টামাত্র করলেন না।

ওকে দেখিয়ে দেবেন—ওই পিশাচীকে যে—মরতে বা মারতে কিছুতেই দায়ুদ খাঁর ভয় নেই। তিনি পুরুষ-বাচ্চা, পুরুষ। কাল ওকে ছেড়ে দিয়েছিলেন অনুগ্রহ করেই—নারীর প্রতি পুরুষের চিরকালীন অনুগ্রহ ও অনুকম্পা।

॥ ২২ ॥

১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা মার্চ। প্রত্যূষকাল।

আফগানবাহিনী অতর্কিতে ঝাঁপিয়ে পড়ল মুঘলদের উপর।

কিন্তু মানুষে মানুষকে আক্রমণ করল না। মুঘল সৈন্য সভয় বিস্ময়ে তাকিয়ে দেখল, বৃহদাকার পর্বতপ্রমাণ বীভৎসাকৃতি দৈত্য কতকগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের ওপর। কী এ? কী এগুলো?

এ-ই হল গুজর খাঁর কৃতিত্ব। এই সকল দানবাকৃতি পর্বতগুলিকে নিয়ে তিনি বহুদিন অপেক্ষা করেছেন—বহুদিন ধরে এদের পুষেছেন। কৃতিত্ব দেখানোর অবসর পান নি।

আসলে এ সেই সুলেমান কররাণীর বিখ্যাত করি-বাহিনী।

কিন্তু শুধু হাতি নয়—হাতি দেখে আর কোন সৈন্য ভয় পায় না—তা গুজর খাঁও জানেন—তিনি আর একটু মাথা ঘামিয়েছেন।

তিব্বত ভোটরাজ্য আর অন্যান্য পাহাড়ী অঞ্চল থেকে বহুদিন ধরে তিনি সংগ্রহ করেছেন—য়াক্ গরু, ভল্লুক আর পাহাড়ী ছাগলের চামড়া—ধূসর, কৃষ্ণ, তাম্রাভ, নানাবর্ণের—কিন্তু প্রত্যেকটিই লোমশ, লোমবহুল। সেই চামড়া আজ কাজে লেগেছে—আজ জড়ানো হয়েছে প্রতিটি হাতির মাথায়, শুঁড়ে ও দুই দাঁতে। এমন ভাবেই জড়ানো হয়েছে যে সেগুলো অন্য পশুর চামড়া বলে চেনা যায় না—সহসা দেখলে মনে হয় দানবগুলোর এ সহজাত বর্ম। ভয়ংকর, ক্রূর, জিঘাংসাময় একরকমের রাক্ষস এগুলো—আর এই এদের উপযুক্ত দেহসজ্জা।

ধীরে ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল রাক্ষসগুলো।

শান্ত নীরব পদক্ষেপ; এদের সকল-শক্তি-আয়োজিত সমস্ত রকমের বাধা সম্বন্ধেই তারা যেন ভ্রূক্ষেপহীন, উদাসীন। অবাধ, অমোঘ তাদের গতি। সামনের সশস্ত্র মানুষগুলোর প্রতি চরম উপেক্ষা আর অবহেলা।

অতর্কিত আক্রমণ আসন্ন—এই সংবাদ পেয়েই মুঘলরা দ্রুত এক রকম করে

ব্যূহ রচনা করে নিয়েছিল। তাদের আশা ভরসা সবচেয়ে বেশী ঘোড়-সওয়ারদের ওপরই ; তারাই ওদের মধ্যে সবচেয়ে জঙ্গী, সবচেয়ে সাহসী, শক্তিশালী। তাই তাদেরই দিয়েছিল সকলের আগে—পুরোভাগে। বর্শা, তরবারি, তীর-ধনুক—তার সঙ্গে ছিল কারুর কারুর হাতে নতুন আমদানী আধুনিক অস্ত্র—বন্দুক পর্যন্ত। ঘোড়সওয়ার আগে তার পিছনে ছিল পদাতিক—প্রাচীরের আড়ালে আত্মগোপন করার মত।

কিন্তু অশ্বারোহীদের অবস্থাই কাহিল যে! আরও অবস্থা কাহিল তাদের ঘোড়াগুলোর জন্যই।

পাহাড়ের মত বিপুল আর দানবের মত ভয়ংকর ওই জীবগুলোকে ওইভাবে এগোতে দেখে ঘোড়ারা গেল বিষম ভয় পেয়ে।

তার ওপর অকস্মাৎ একবার ওই জীব বা রাক্ষসগুলো উঠল গর্জন করে।

বৃংহিতিমাত্র, কিন্তু মুঘলবাহিনীর অধিকাংশই কখনও হাতির ডাক শোনে নি। যারা শুনেছিল তাদেরও সে কথা এখন এই আতঙ্কের মধ্যে মনে পড়ল না। সে-ডাক মনে করে রাক্ষসগুলোকে হাতি বলে চেনবার মত অবস্থা নয় তাদের। তাছাড়া ঘোড়াগুলো তাদের ভাববার অবসরও দিল না। তারাও চিৎকার করে উঠল ভয়ে—তারপর সামনের পা দুটো শূন্যে তুলে পিঠের সওয়ারগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দেবার চেষ্টা করল বারকতক—কিছু কিছু লোক তাইতেই খতম হয়ে গেল—তারপর সে চেষ্টা ছেড়ে পিছু হঠে ও সোজা পিছন ফিরে পালাতে শুরু করল। তাদের পায়ের চাপেই বহু পদাতিক ঘায়েল হল। ফলে তারাও আর সহ্য করতে না পেরে পড়ল ছত্রভঙ্গ হয়ে। আর একবার ছত্রভঙ্গ হলে যা হয় তাই হল—ভয়ে দিশেহারা হয়ে যে যেদিকে পারল পালাতে লাগল।

সেনাপতিরা প্রথমটা তাদের ফেরাতে চেষ্টা করলেন প্রাণপণে। কিন্তু বন্যার স্রোত একার শক্তিতে সামলানো যায় না—বাধা দিতে গিয়ে তাঁরাই ভেসে চলে গেলেন। গেলেন না শুধু একজন কিছুতেই। তিনি রাজা টোডরমল। স্বস্থানে অবিচলিত থেকে অল্পসংখ্যক দেহরক্ষী নিয়েই প্রাণপণে লড়তে লাগলেন।

কিন্তু তাঁর দিকে বিশেষ মনোযোগও দিল না কেউ। এক সিকান্দার বেগ তাঁকে সামলাতে লাগলেন, বাকী সকলে বিজয়োল্লাসে মুঘলদের পিছু পিছু ছুটতে লাগল। এত অনায়াসে জয়লাভ করবে তারা, তা কেউ ভাবে নি।

যেমন বিনা যুদ্ধেই এতকাল হেরে এসেছে—তেমনি প্রায় বিনাযুদ্ধেই এবার জিতল।

সামনে লুঠ—সেই আগ্রহেই পিছু নিল তারা মুঘলদের। হয়ত প্রচ্ছন্ন প্রতিশোধ-স্পৃহাও ছিল। এতকালের অপমানের প্রতিশোধ। তবু লুঠের আগ্রহই বেশী—বহুদূরে পিছিয়ে গিয়েছে মুঘলরা—তাদের অরক্ষিত জনশূন্য তাঁবু সামনেই পড়ে—বহু ধনরত্ন তাতে। আর কিছু কিছু নারীও—

ছুটেছিলেন ওসমান খাঁও—কতলু খাঁ লোহানীর পরমাত্মীয়, বীর তরুণ সেনানায়ক। চোখে তাঁর প্রতিশোধের আগুন—মুখে উত্তেজনার আনন্দের

আশার রক্তিমা। অনেকক্ষণ মাথা নত করে থেকেছেন—অকারণে, নিজের বিনা অপরাধে। আজ তাঁর শোধ নেবার পালা। আজ চাকা উল্টে গেছে। এতদিনের এত অপমানের মূল্য কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেবার দিন আজ।

কিন্তু সেই বিদ্যুৎগতির মধ্যেই সহসা কে আরও দ্রুত ঘুরে এসে দাঁড়াল পথ রোধ করে!

কে এ, কার এত স্পর্ধা!

ভীষণ ভ্রূকুটি ঘনিয়ে এল ললাটে, দৃষ্টির বহ্নি উঠল দ্বিগুণ দীপ্ত হয়ে।

কিন্তু এ কে—সামনে?

ওসমান খাঁ অবাক হয়ে চেয়ে রইলেন। এই শবাস্তীর্ণ রণক্ষেত্রে আর যাই হোক—রূপসী নারীকে দেখবার আশা করেন নি। হয়ত আছে তারা কোন তাঁবুর সঙ্গে পড়ে এখনও, কিন্তু সে সব তাঁবু এখান থেকে বহুদূরে। ওসমান খাঁর সে লক্ষ্যও ছিল না, সেদিকে তিনি যানও নি। তিনি সোজা শত্রুরই পশ্চাদ্ধাবন করছিলেন—তাঁর লক্ষ্য ছিল স্বয়ং খান-ই-খানান মুনিম খাঁ।

কিন্তু এ নারী—অশ্বপৃষ্ঠে নারী এই তো যথেষ্ট বিস্ময়—তার ওপর বলতে গেলে যুদ্ধক্ষেত্রের মধ্যস্থলে এই নারীর অভ্যুদয়—অবাক করে দেবারই তো কথা।

এ কে? শত্রুপক্ষের নারী? আশ্রয়প্রার্থিনী? না কি গুপ্তচর?

কে এ? কী চায়?

তাঁকে ইঙ্গিত করে থামাল কেন?

অশ্বের উন্মত্ত গতি সংহত করলেন অতি কষ্টে। কিন্তু ললাটের মেঘ বজ্রগর্ভ হয়েই রইল। ভ্রূকুঞ্চিত করে চাইলেন এই সাহসিকার দিকে।

ঘোড়া থামতে থামতেও অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। স্ত্রীলোকটি ঘোড়া ঘুরিয়ে এনে সামনে দাঁড়াল তাঁর। তারপর কোন ভূমিকা না করেই বলল, 'মূর্খ, এত দ্রুত কোথায় চলেছ। মরণের বড় সাধ—না?'

এ আবার কী কথা? এ তো ঠিক গুপ্তচরের মত, ছলনাময়ীর মত কথা নয়! তবু 'মূর্খ' সম্বোধনে আরক্ত হয়ে উঠল তরুণ বীরের মুখ।

কতলু খাঁ লোহানীর পুত্রতুল্য তিনি—অন্যরকম সম্বোধন ও সম্ভাষণেই অভ্যস্ত। এই স্পর্ধার সমুচিত উত্তর দেবার জন্য তাঁর হাতের পেশীগুলো চঞ্চল হয়ে উঠল। কিন্তু নিজেকে সম্বরণ করলেন তিনি। ক্রোধের চেয়ে কৌতূহলের শক্তিই বুঝি বেশী। প্রাণপণে উষ্মা দমন করে প্রশ্ন করলেন শুধু, 'তার অর্থ?'

'তার অর্থ এই যে—তোমাদের উচিত এখন কিছুদিন যুদ্ধ লড়াই ছেড়ে দিয়ে মুঘলদের পায়ের তলায় বসে শিক্ষা করা—রণকৌশল আর রাজনীতি কাকে বলে তাই!···তোমাদের কি এতদিনেও চৈতন্য হল না যে বিনা যুদ্ধে হার মেনে পালাবার মত কাপুরুষ আর যে-ই হোন মুনিম খাঁ নন।···এ সমস্তই ছল। নিজেরা ছত্রভঙ্গ হবার ভান করে তোমাদের ছত্রভঙ্গ করে দেবে—তারপর

চারদিক থেকে ঘিরে ধরবে তোমাদের। কতদূর চলে এসেছ তা বুঝতে পারছ? চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছ। এর পর পারবে ব্যূহ তৈরী করতে বা ঠিকমত প্রত্যাঘাত করতে?···যাও—এ ছেলেমানুষি কোর না—ফের। এখনও সময় আছে, যতটা সম্ভব জমাট বেঁধে থাক, সম্ভব হলে ঠিকমত সেনা সাজিয়ে নাও, আক্রমণের আর বেশী দেরী নেই—বলে দিলাম।'

বিস্ময় তার আবির্ভাবে, বিস্ময় তার রূপে, বিস্ময় তার কথা বলার ভঙ্গীতে।

বিদ্যুতের মত তার চাহনি। আগুনের মত তার কথা।

বিহ্বলভাবে ওসমান শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কে?'

'দায়ূদ কররাণীর একজন হিতাকাঙ্ক্ষিণী—এই পরিচয়ই যথেষ্ট।'

বক্তব্য শেষ হওয়ার পর এক মুহূর্তও দাঁড়াল না সে—ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে চকিতে মিশে গেল সেই জনারণ্যে।

ওসমান খাঁ সত্যই ছেলেমানুষ। তিনি তখনই ঘোড়ার মুখ ফেরালেন। কিন্তু বাহাদুরি নেবার লোভটা সামলাতে পারলেন না। কতলু খাঁকে খুঁজে বার করে তাঁকে বুঝিয়ে দিলেন যে কাজটা তাঁদের কত ছেলেমানুষি ও অন্যায় হচ্ছে—তবে এটা কিছুতেই মুখ ফুটে বলতে পারলেন না যে বুদ্ধিটা আসলে তাঁর নয়, এটা অপরে দিয়েছে তাঁকে, আর যে দিয়েছে সে নারী—তার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে।

কথাটা কতলু খাঁর প্রাণে লাগল। তিনি ওসমান খাঁকে খুবই বাহবা দিলেন। তারপর তিনিও যথানিয়মে দায়ূদ খাঁকে খুঁজে বার করে এই সম্ভাবনার কথাটা আশঙ্কাটা জানালেন।

তবে তিনিও এটা বলতে পারলেন না যে এ ব্যাপারে তাঁর চোখ খুলে দিয়েছে এক তরুণ বালক। বলতে পারলেন না যে, যে-কথাটা তাঁর মত অভিজ্ঞ সেনাপতির আগেই ভাবা উচিত ছিল, সে কথাটা আদৌ তাঁর মাথাতে যায় নি।

অনেক সময় বয়স্করাও ছেলেমানুষের মত আচরণ করে বসেন—লোভ দমন করতে পারেন না। সামান্য একটু যশ, সামান্য একটু প্রশংসার মোহও পেয়ে বসে তাঁদের, আর সে জন্য প্রচ্ছন্ন মিথ্যাচরণ করতেও বাধে না।

ওসমান কতলু খাঁকে সত্য কথা বললে এবং কতলু খাঁও সেই কথাটা যথাযথ দায়ূদ খাঁকে জানালে হয়ত দায়ূদ খাঁ অন্য ব্যবস্থাই করতেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাঁরও এ আশঙ্কাটা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হল। তাই তিনি অন্য কোনও সম্ভাবনার কথা বিবেচনা না করেই চারিদিকে হুকুম পাঠালেন—আফগান সৈন্যরা ফিরে এসে আবার নিজেদের স্থানে ব্যূহ রচনা করুক। আক্রমণ আসন্ন।

॥ ২৩ ॥

বিরাশি বছরের বৃদ্ধ সেনাপতি মুনিম খাঁ সহজে হাল ছাড়েন নি, দুর্বার বন্যাস্রোতকে প্রাণপণেই বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলেন—যতক্ষণ সম্ভব তাঁর একক শক্তি দিয়ে সে স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন, আর তার জন্য ক্ষতবিক্ষতও বড় কম হন নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন স্রোতে গা ভাসাতে বাধ্য হয়েছিলেন তখন আর সহজে থামতে পারেন নি। ঘোড়ার রাশ ঘোড়ার ওপর এলিয়ে দিয়ে ভাগ্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। ঘোড়া একদমে প্রায় আড়াই ক্রোশ ছুটে চলে এসে থেমেছিল। মুনিম খাঁ পালাতে পালাতে এতটাই পিছনে এসে পড়েছিলেন।

একেবারে এই পর্যন্ত এসে—বোধ করি ঘোড়াটাই ক্লান্ত হয়ে থামল।

মুনিম খাঁও হঠাৎ উপলব্ধি করলেন যে এতটা পিছনে আসার প্রয়োজন ছিল না। আফগানরা তাদের পিছু পিছু আসা বহুক্ষণই বন্ধ করেছে। একটু পরে আরও খবর পেলেন টোডরমল এখনও প্রাণপণে বুঝছেন এবং দায়ূদ খাঁ আবারও ব্যূহ রচনা করে প্রস্তুত হচ্ছেন হয়ত বা আত্মরক্ষার জন্যই—তাঁদের তরফ থেকে আক্রমণ আশঙ্কা করে।

ততক্ষণে মুঘলফৌজও আতঙ্কের প্রথম ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে। বোধ করি লজ্জিতও হয়েছে কতকটা। এবার বৃদ্ধ খান-ই খানানকে ফিরতে দেখে তারাও ফিরতে শুরু করল।

আবারও শুরু হল লড়াই।

ক্ষণিকের বিজয় গৌরব—খুবই সামান্য ক্ষণের—হয়ত বা এক প্রহরের বেশী নয়, তবু তাই যেন আফগানদের বাহুতে নতুন শক্তি, তাদের বুকে নতুন প্রেরণা এনে দিয়েছে। তারা এবার প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করল। গুজর খাঁ রইলেন বাহিনীর মধ্যভাগে, স্বয়ং দায়ূদ খাঁ দক্ষিণে এবং কতলু লোহানী নিলেন বাহিনীর বামভাগ পরিচালনার ভার।

দায়ূদ খাঁ অবশ্য বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না—কারণ তাঁর সামনে, অর্থাৎ মুঘল বাহিনীর বামভাগে ছিলেন রাজা টোডরমল। তাঁর প্রচণ্ড তেজে আগেই সিকান্দার বেগ পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছেন ; তবু তখন তিনি ছিলেন সামান্য কজন দেহরক্ষী মাত্র বেষ্টিত হয়ে—এখন বিপুল একদল মুঘল ফৌজ এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পিছনে। এবার আর তাদের হাতির ভয় নেই, ঘোড়াগুলোও সম্ভবত বুঝে নিয়েছে যে ঐ সচল পাহাড়গুলো তাদেরই জ্ঞাতিগোত্রের মধ্যে পড়ে—নেহাত রাক্ষস-টাক্ষস জাতীয় কিছু নয়। বরং এখন মুঘল তীরন্দাজের সুতীক্ষ্ণ তীরে হাতিগুলোই পিছু হঠতে শুরু করেছে।

কতলু লোহানীও তাঁর দিকে খুব সুবিধা করতে পারছিলেন না—তাঁর

নিজের জীবনই দু-দুবার একটুর জন্য বেঁচে গেল। কিন্তু মধ্যভাগে গুজর খাঁ দারুণ কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছিলেন। তাঁর প্রচণ্ড বিক্রমের সামনে কোন মুঘলসেনাপতিই দাঁড়াতে পারছিলেন না—তিনি দু দিকেই মুঘলবাহিনীকে যেন উপেক্ষা করেই বহুদূর পর্যন্ত তাদের ব্যূহের মধ্যে চলে এসেছিলেন।

ক্রমে মনে হল যে আবারও বুঝি মুঘলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়বে।

গুজর খাঁ একাই আজকের যুদ্ধে মাত করছেন সবাইকে—তাঁর কাছে কেউই দাঁড়াতে পারছেন না। বেগতিক দেখে স্বয়ং মুনিম খাঁ এগিয়ে এলেন—বৃদ্ধ হলেও তাঁর শৌর্য বা সাহস কারুর থেকে কম নয়—কিন্তু মনে হল তিনিও আবার পিছু হঠতে বাধ্য হবেন। মুঘলবাহিনীর দক্ষিণে শাহাম খাঁ শেরের বিক্রমেই যুঝছিলেন—তাঁর জন্যই কতলু লোহানী এতক্ষণ সুবিধা করতে পারেন নি—এখন গুজর খাঁ তাঁর বহু পশ্চাতে মুঘল ব্যূহের ভেতরে চলে গেছেন দেখে তাঁরও মনোবল যেন ভেঙে পড়ল। সময় থাকতে নিজের দলবল নিয়ে নিরাপদ স্থানে চলে যাবেন কিনা ভাবতে লাগলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে—চরম সংকটক্ষণে এক অঘটন ঘটল।

কোথা থেকে একটি তীর সাঁ করে গুজর খাঁর মাথার উপর দিয়ে হাওয়া কেটে চলে গেল—বোধ করি তাঁর শিরস্ত্রাণ ছুঁয়েই—আর ব্যাপারটা কী হল দেখবার জন্য যেমন তিনি মুখ তুলে উপর দিকে চাইবেন সেই এক লহমার মধ্যে আর-একটি তীর এসে বিঁধল তাঁর গলায়।

একেবারে গলা ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল সেটা। সঙ্গে-সঙ্গেই গুজর খাঁ হাতির পিঠে এলিয়ে পড়লেন।

বর্ম ও শিরস্ত্রাণে ঢাকা দেহের ঐ স্থানটুকুই ছিল অনাবৃত—মুখ না তুললে সেখানটা বেঁধা যেত না। যে মেরেছে সে তা জেনেই আগের তীরটি ওঁর মাথার ওপর দিয়ে ছুঁড়েছিল।

সকলে, যারা কাছাকাছি ছিল অন্তত, সবিস্ময়ে দেখল—তীর ছুঁড়েছে মুঘল ফৌজের কেউ নয়, এমন কি সে কোনও পুরুষও নয়—নিতান্তই এক নারী, আওরৎ।

আর সেই সামান্য নারীরই অভ্রান্ত হিসাব এবং অব্যর্থ লক্ষ্যে মুঘলবাহিনী সে যাত্রা বেঁচে গেল।

কারণ গুজর খাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে যেন আফগানবাহিনীর সমস্ত উদ্যম, সমস্ত পরাক্রম গেল শেষ হয়ে। এক ফুঁয়ে প্রদীপ নিবিয়ে দেবার মতই তাদের সমস্ত তেজ ঐ একটি মাত্র শায়কে নিবে গেল। একটা নামহারা অজ্ঞাত আতঙ্ক যেন ঘনিয়ে এল তাদের মুখে চোখে। এদিকে ওদিকে দু-একজন ঘুরে দাঁড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে একটু পরেই ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

সে আশ্চর্য বার্তা সেই প্রচন্ড যুদ্ধের মধ্যেও চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। টোডরমলও শুনলেন। তিনি হাত তুলে নিজের ইষ্টদেবীকে প্রণাম জানালেন।

শুনলেন মুনিম খাঁও। তাঁর চোখ জ্বলে উঠল। আশায় ও আনন্দে।

তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে টোডরমলের দিকে এগিয়ে গেলেন, ক্রমে তাঁর কাছেও পেঁছিলেন।

সেই রণব্যস্ততার মধ্যেই মুখ ফিরিয়ে টোডরমল মুনিম খাঁকে বললেন, 'আর ভয় নেই জনাব। সেই দেবী আমাদের সঙ্গেই রয়েছেন, আমাদের সাহায্য করছেন। শুনেছেন তো—স্বয়ং নৃমুণ্ডমালিনী মহিষাসুরমর্দিনী ভবানী ধনুর্বাণ হাতে বধ করেছেন গুজর খাঁকে। আরও শুনলুম যে তারই জন্য নাকি আফগানরা আপনাদের পিছু নিয়ে যেতে যেতে ফিরে এসেছে। তাঁরই কৌশলে।'

'সবই শুনেছি রাজা সাহেব। সে আপনার দেবী কিনা জানি না—তবে এইটুকু জানি যে সে আমার বেটী। তাকেই খুঁজছিলাম এত দিন। সে সম্পদে কাছে আসে নি, বিপদের দিনে বৃদ্ধ পিতার পাশে এ দাঁড়িয়েছে ঠিক।'

'আপনার বেটী?' যুদ্ধ, বিপদ, এমন কি প্রাণের আশঙ্কাও ভুলে ঘুরে দাঁড়ালেন টোডরমল।

'হ্যাঁ, আমার বেটী। কিন্তু—খুব হুঁশিয়ার রাজা, খবরদার! সামনে দুশমন।'

দুজনই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। শত্রু তাঁদের অনবধানতার সুযোগ নিতে চাইছে। এখন এতটুকু অন্যমনস্কতার অর্থ হল মৃত্যু। সুতরাং কথাটা স্থগিত রাখতে হল তখনকার মত।...

আফগানরা যে পিছু হঠতে শুরু করেছে ক্রমশ সেটা দিনের আলোর মতই স্পষ্ট হয়ে উঠল। পিছনের একটা বিপুল অংশ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছে অনেক আগেই। ওসমান খাঁ সাংঘাতিক আহত, কতলু খাঁর অবস্থাও ভাল নয়—তিনি যে আর বেশীক্ষণ ঘোড়ার পিঠে বসে থাকতে পারবেন তা মনে হয় না। এক কথায় আজকের এই লড়াইয়ে আফগানদের আর কোন আশা কোথাও অবশিষ্ট রইল না।*

কথাটা সকলের কাছেই পরিষ্কার হয়ে এল—কেবল দায়ুদ কররাণীর কাছে ছাড়া।

তিনি মানতে রাজী নন এ পরাজয়।

তিনি তখনও লড়ে যাচ্ছেন। তিনি ও তাঁর মুষ্টিমেয় সঙ্গী, অনুচর। তাঁকে যেন ভূতে পেয়েছে আজ। ভূতগ্রস্তের মতই লড়ে চলেছেন, একা—কোন দিকে না চেয়ে। এতকালের সমস্ত কাপুরুষতার লজ্জা ও অসম্মান তিনি যেন আজ দূর করতে চান। বহু হিতৈষী ওরই মধ্যে তাঁকে অনেক

---

* এই কতলু খাঁ ও ওসমান খাঁর জীবনের পরবর্তী ঘটনা অর্থাৎ মুঘল-আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতার শেষ অধ্যায় অবলম্বনেই বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী রচিত। ওসমান খাঁর জীবনাবসানের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় পূর্বভারত থেকে আফগান-শক্তি লোপ পায়। প্রসঙ্গত আর-একটি কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে—এই কাহিনীতে উল্লিখিত শ্রীহরি গুহই যশোরেশ্বর মহারাজা প্রতাপাদিত্যের জনক।

বোঝাবার চেষ্টা করল—এখন নিরাপদ স্থানে পিছু হঠাই যে সবচেয়ে বড় রণ-কৌশল হবে তাঁর পক্ষে—সে কথাটা নবীন-প্রবীণ বহু সেনানায়কই তাকে সেই তুমুল কোলাহলের মধ্যে কানে ঢোকাতে চাইল ; কিন্তু তিনি কোন কথায় কান দিলেন না, কোন দিকে ফিরে চাইলেন না। এ সময় দুঃসাহস যে চরম নির্বুদ্ধিতারই নামান্তর—এই সহজ সত্যটা থেকে প্রাণপণে চোখ ফিরিয়ে রইলেন।

তাঁর কঠোর প্রতিজ্ঞা, হয় তিনি জিতবেন—নয়ত এইখানেই প্রাণ দেবেন।...

বলা বাহুল্য মুঘলরা এ নির্বুদ্ধিতার সুযোগ নিতে ছাড়ল না।

অপর সব দিকেই পাঠান-বিরোধিতা স্তিমিত হয়ে এসেছে, শত্রুর বিষদাঁত গেছে ভেঙে—এখন সমস্ত শক্তি একটি কেন্দ্রবিন্দুতে সংহত করতে বাধা নেই। সমস্ত বিশিষ্ট যোদ্ধাই এবার দায়ুদ খাঁকে ঘিরে দাঁড়াল।

এবং—যখন পালাবার সমস্ত পথ রুদ্ধ হয়ে এসেছে প্রায়—পিছন ফিরলেই সে দিক থেকে এই বিপুল শত্রুবাহিনীর ক্ষুধিত শার্দুলের মত ঝাঁপিয়ে পড়বার সম্ভাবনা প্রায় প্রত্যক্ষ, তখন বোধ করি দায়ুদের জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হল।

কিন্তু তখন আর কোনও উপায় আছে কি ?

ভীতিবিহ্বল দৃষ্টি মেলে চারিদিকে চাইলেন দায়ুদ। চারিদিকেই অগণিত শত্রুসৈন্য, শত্রুপক্ষের সমস্ত রণকুশলী শূর ঘিরে দাঁড়িয়েছে তাঁকে।

নিজেরই দুঃসাহস, হঠকারিতার ফল।

নিজের পথ নিজেই বন্ধ করেছেন।

এখন আর বুঝি কোন উপায় নেই ফেরবার। ক্লান্ত হতাশ দায়ুদ খাঁ মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন।

কিন্তু সে দিনটা বুঝি অঘটনেরই দিন। মানুষের ভাগ্য-নিয়ামক গ্রহনক্ষত্র-গুলো বুঝি মানুষের সব সাধারণ হিসাব উলটে দেবার জন্যই সেদিন বিশেষ একটি সৃষ্টিছাড়া ক্ষেত্রে এসে জড়ো হয়েছিল।

আবারও এক অঘটন ঘটল।

দায়ুদ খাঁর পিছন থেকে তাঁর অনুগামীদের ঠেলে সরিয়ে অশ্বারূঢ়া এক নারী এসে তাঁর সামনে দাঁড়াল।

কোথা থেকে কেমন করে সে এল তা কেউ জানতে পারল না, কেউ লক্ষ্যও করে নি। যেন মাটি ফুঁড়ে আবির্ভূতা হল সে।

সাধারণ মুসলমান নারীর বেশ, তবু—চিনল হাজার হাজার মুঘল সিপাহী ও সিপাহসলার—সেদিনের সেই সন্ন্যাসিনীকে ; রাজা টোডরমল চিনলেন নির্ঝরিণীতীরের সেই তরুণীকে। আরও বহু লোক চিনল আজকের গুজর খাঁর নিধনকারিণীকে।

সেই একই মেয়ে।...

অন্তত একশটি তীর এবং সমসংখ্যক বর্শা উদ্যত হয়েছিল দায়ূদ খাঁকে লক্ষ্য করে—সে তীর ও বর্শা তেমনই মধ্যপথে স্থির হয়ে থেমে গেল। বিচিত্ররূপিণী, সম্ভবত দিওয়ানা এই তরুণীর কার্যকারণের কোন অর্থ খুঁজে না পেয়ে সকলে বিস্মিত মূঢ় দৃষ্টি মেলে শুধু চেয়ে রইল তার দিকে।

গুজর খাঁর নিধনকারিণী, মুঘলদের কল্যাণকামিনী এই নারী আজ এসে দাঁড়িয়েছে দায়ূদ খাঁর রক্ষাকর্ত্রীরূপে! এর চেয়ে দুর্বোধ্য, এর চেয়ে আপাত-অর্থহীন আর কী হতে পারে!···

রক্ষাকর্ত্রী তাতে কোন সন্দেহ নেই—কারণ সে মেয়ে ওঁকে আড়াল করেই দাঁড়িয়েছে। উদ্যত-আয়ুধ অসংখ্য অসুরের সামনে নির্ভয়ে বুক পেতে দাঁড়িয়েছে সে—যদিচ তার নিজের হাতে কোন হাতিয়ারই নেই।···

সবচেয়ে বিমূঢ় হয়েছিলেন মুনিম খাঁই।

আজ যে তাঁকে রণক্ষেত্র থেকে পালাতে হয়েছিল সে লজ্জা তিনি ভুলতে পারেন নি—সেই লজ্জাই এখন প্রতিশোধ বাসনায় তাঁর বুকে জাগিয়েছে এক প্রবল জিঘাংসা। তাই তাঁর বর্শাই সবচেয়ে সাংঘাতিক এবং অব্যর্থ ভঙ্গীতে উদ্যত হয়েছিল। কিন্তু তাঁর হাতই নেমে এল সর্বাগ্রে।

ক্রোধ ক্ষোভ হতাশা বিস্ময়—একই সঙ্গে তাঁর কণ্ঠে মূর্ত হয়ে উঠল, যেন হাহাকার করে উঠলেন তিনি, 'বেটী! বেটী! এ কী করছিস মা!'

আর সেই শব্দেই সম্বিৎ ফিরে পেলেন রাজা টোডরমল। তিনিও চেঁচিয়ে উঠলেন, 'মা ভবানী, এ কী তোর লীলা।'

কিন্তু কারও কোন উচ্ছ্বাস বা আকুতিতেই সে নারী এদের দিকে ফিরে চাইল না। এদের উপস্থিতিটাই যেন স্বীকার করল না সে। এমন কি—মনে হল—এতগুলি সমুদ্যত মারণাস্ত্রকেও সে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। যেন সেগুলো নিতান্তই উপেক্ষণীয়, তুচ্ছ কোন খেলার সামগ্রী। পক্ষীমাতার পক্ষবিস্তৃতির মতই দুই হাত বিস্তার করে এই সমস্ত বিপদ ও মৃত্যুভয় থেকে সে দায়ূদ খাঁকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছিল—এখন কতকটা যেন এদের প্রতি চরম এবং উদ্ধত অবহেলাতেই এদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল, ঘাড়টা যতদূর সম্ভব দায়ূদের দিকে ফিরিয়ে বলল, 'পালাও পালাও দায়ূদ খাঁ কররাণী—এই বেলা পালাও। আত্মহত্যা শৌর্য নয়—এ দুঃসাহস দেখানোর কোন অর্থ নেই। ভবিষ্যতে ঢের সুযোগ পাবে মুঘলদের সঙ্গে নিজের শক্তি যাচাই করার। ফের, ফের—ঘোড়ার মুখ ফেরাও।'

অভিভূত হয়ে পড়েছিলেন দায়ূদ খাঁও। সেই মুহূর্তে ওঁর হাত-পাও যেন নিজের আয়ত্তের বাইরে চলে গিয়েছিল—তবু, সম্ভবত ওর কণ্ঠের আর্তিতেই তিনি ঘোড়ার মুখ ফেরালেন। একবার করুণ, অসহায়, কিছুটা বিমূঢ় দৃষ্টিতেই তাকালেন নফিসার মুখের দিকে—তারপর বললেন, 'সেদিনের ঋণ কি এইভাবে শোধ করলে নফিসা? কিন্তু তার তো দরকার ছিল না। আমিই যে ঋণী, অপরাধী। তোমার হাত থেকে সর্বনাশ এবং মৃত্যুই হাত পেতে নিতে চাই—অনুগ্রহ নয়।'

'আঃ, দায়ুদ খাঁ !···আমি যে আর পারছি না সামলাতে। যাও, যাও, কাব্য করার সময় এ নয়—অভিমান করার তো নয়ই—। তুমি এখন যাও। পেছন ফের।'

দায়ুদ খাঁ আর ইতস্তত করলেন না। ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে পিছনে ছোটালেন তাকে।

হয়ত মনিবের চরম বিপদ বুঝেই তাঁর বাপের আমলের ইউসুফজাই দেহরক্ষীর দল দু ভাগে ভাগ হয়ে গেল আপনা আপনিই। এক ভাগ চলল তাঁর সঙ্গে সঙ্গে, তাঁকে ঘিরে নিয়ে নিরাপদ দূরত্বে পালাবার জন্য লড়াই করতে করতে—আর-এক ভাগ ব্যবধান রচনা করে দাঁড়াল তাঁর গতিপথ ও তাঁর দুশমনের মধ্যে। আত্মহত্যার জন্যই প্রস্তুত তারা—জান দিয়ে মনিবের নিমক শোধ করবে।

মুঘলরা চেষ্টার ত্রুটি করল না অবশ্য, কিন্তু প্রথমত সন্ন্যাসিনী বা দিওয়ানা ঐ অপরিচিতা নারীর অসমসাহসে—সম্পূর্ণ নিরস্ত্র অবস্থায় উদ্যত অস্ত্রের সামনে অকুতোভয় বুক পেতে দাঁড়ানোয়—সকলের মনেই একটা আতঙ্ক-মিশ্রিত সম্ভ্রমের উদয় হয়েছিল ; দ্বিতীয়ত ইউসুফজাই দেহরক্ষীদের আত্মনিবেদিত প্রাণপণ যুদ্ধ—এই দুই কারণ লঙ্ঘন করে এগোতে এগোতে দায়ুদ কররাণী চলে গেলেন ওদের নাগালের বাইরে বহুদূরে। তাঁকে আর কোন মতেই ধরা গেল না।

॥ ২৪ ॥

ব্যাপারটা ঠিক কী ঘটল তা বুঝতে মুনিম খাঁর একটু দেরি হয়েছিল। যখন বুঝলেন তখন আর মেয়েটিকে কোথাও খুঁজে পেলেন না। সেই উদ্বেলিত জনসমুদ্রে সামান্য বুদ্বুদের মতই কোথায় মিশে গিয়েছে সে। এপক্ষে কি ওপক্ষে, এদিকে এসেছে কি ওদিকে গেছে, লড়াই করছে কিংবা দূরে কোথাও দাঁড়িয়ে আছে—তা আর তখন অনুমান করারও উপায় নেই। উভয় পক্ষের সেই প্রায় মরণ-বাঁচন প্রাণপণ যুদ্ধের ফাঁকে সে যেন একেবারে উবে গিয়েছে।

ভীষণ বিচলিত হলেন মুনিম খাঁ। পাগলের মত চেঁচামেচি করতে লাগলেন। আফগানদের পরাজয়ও যেন তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর হয়ে উঠল, মনে হল সেটা যেন আদৌ কোন বিবেচনার বিষয় নয়। দিকে দিকে লোক ছুটল, প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করলেন, কল্পনাতীত অসম্ভব অঙ্ক ঘোষণা করলেন পুরস্কারের—অন্যথায় তিনি এই অকর্মণ্য ক্লীব লোকগুলোর ওপর দিয়ে চরম প্রতিশোধ তুলবেন এমন ভয়ও দেখালেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। লোভ বা ভয় কোনটাই সেই সামান্য একটি মেয়েকে তুকারয়ের প্রান্তর থেকে খুঁজে ধরে আনতে পারল না।

বহুদিনের বহু অনুসন্ধানের সামগ্রী—বহু পথচাওয়া বহু উৎকণ্ঠা উদ্বেগ ঔৎসুক্যের লক্ষ্যবস্তু এমন করে হাতের মুঠোর মধ্যে এসে বার বার পিছলে চলে যাচ্ছে—এ ব্যর্থতা ও আশাভঙ্গের ক্ষোভ মানুষকে পাগল করবারই কথা—বিশেষত মুনিম খাঁর মত বিরাশি বছরের বৃদ্ধকে।

ক্ষোভে দুঃখে হতাশায় তিনি ক্ষেপেই উঠলেন যেন। হুকুম দিলেন, কাউকে বন্দী করবার দরকার নেই— আফগানদের দেখা মাত্রই যেন বধ করা হয়। তিনি যেন পরদিন সকালে শুধু দুশমনের মৃত মুখই দেখতে পান—কোন জীবিত শত্রু না তাঁর চোখে পড়ে।…

বলা বাহুল্য— সেই আদেশ-মতই কাজ হল। ভীত, বিভ্রান্ত, রণশ্রান্ত আফগানেরা দলে দলে নিহত হতে লাগল। তাদের তখন পালাবার মত শক্তি বা বুদ্ধি কিছুই বিশেষ আর অবশিষ্ট ছিল না—হয়ত বা ইচ্ছাও। কতকটা যেন চরম ক্লান্তিতেই শত্রুর উদ্যত খড়্গের নীচে মাথা পেতে দিতে লাগল তারা—মরে অব্যাহতি লাভ করতে লাগল।

তাদের সে রক্তে সেদিন তুকারয়ের লাল রুক্ষ পাথুরে মাটিও সরস হয়ে উঠল। সরস আর রক্তিম। মাটির সে রক্তিমা বুঝি আকাশের রক্তবর্ণছটাকেও ম্লান করে দিল—তাই সূর্যদেব যেন কতকটা সেই লজ্জাতেই তাড়াতাড়ি বনের আড়ালে মুখ ঢাকলেন। কিন্তু দিনশেষের রাঙা রোদটুকু মুছে গেলেও রণপ্রান্তরের সেই শোণিতবর্ণাভার প্রতিফলনেই যেন আকাশের পশ্চিম দিগন্ত আরও বহুক্ষণ লাল হয়ে রইল।…

রাত্রির অন্ধকার নেমে আসার পরও বহুক্ষণ ধরে চলল সেই মৃত্যুমহোৎসব। ঠিক কত মানুষ যে মারা হল, তা কেউই তখন বুঝতে পারে নি। বুঝল—যখন পরের দিন সকালে মুঘল ফৌজ ছিন্নমুণ্ডের আটটি গগনচুম্বী স্তূপ উপহার দিলে তাদের প্রধান সেনাপতি খান-ই-খানানকে। যেমন—বহুকাল আগে তাঁর বর্তমান মনিবের পূর্বপুরুষ তৈমুরকে তাঁর বাহিনী উপহার দিয়েছিল আটটি নরমুণ্ডের পাহাড়।

তফাতের মধ্যে সে আটটি পাহাড় নাকি আশি হাজার নরমুণ্ড দিয়ে রচিত হয়েছিল—আর এ আটটি স্তূপে হয়ত আট হাজারের বেশি ছিল না। তবু তা একই রুচির সাক্ষ্য বহন করছে বৈকি!

কে জানে—হয়ত মুনিম খাঁ সে বীভৎস দৃশ্যে লজ্জিত হয়েছিলেন, হয়ত হন নি। কিন্তু তিনি তাঁর অনুগামী অনুচরদের যে সেজন্য কোন তিরস্কার করেন নি এটা ঠিক। সম্ভবত—তাঁর চিত্ত-বিক্ষোভ এবং আশাভঙ্গের গ্লানি খানিকটা দূর হয়েছিল—এতগুলি মানুষের মৃত্যু-সঙ্গমে স্নান করে উঠে।

॥ ২৫ ॥

যুদ্ধশেষে মুনিম খাঁর তাঁবুতেই মন্ত্রণাসভা বসেছিল। দূর থেকে জয়োন্মত্ত রক্ত-পিয়াসী সৈন্যদের কোলাহল ভেসে আসছে। ভেসে আসছে আহত মৃত্যু-পথযাত্রীদের আর্তনাদ। ক্ষেত্রবিশেষে তীব্র ও তীক্ষ্ণ—কোথাও বা একটানা একঘেয়ে গোঙানির মত। এই অপূর্ব আবহসঙ্গীতের মধ্যে পুরু জাজিমে ক্লান্ত শরীর এলিয়ে বসেছেন মুনিম খাঁ। তারই কিছু দূরে একটা চৌকিতে খান-ই-খানানের অনুমতি নিয়ে বসেছেন রাজা টোডরমল। কারণ তাঁর উরুতে সাংঘাতিক চোট লেগেছে—মাটিতে বসা মুশকিল। অন্য সেনানায়করা সামনে আর-একটা কার্পেটের ওপর এসে বসেছেন। সকলের মুখেই প্রসন্ন তৃপ্তির ছাপ, খালি মুনিম খাঁর ছাড়া। প্রধান সেনাপতির ললাট চিন্তাকুল, চিত্তবিক্ষোভের চিহ্ন সেখানে স্পষ্ট।

মন্ত্রণাসভা বেশীক্ষণ চলার প্রয়োজন ছিল না। প্রশ্ন এক ঃ এখন কী করা হবে ?

উত্তর দুটি মাত্র ঃ হয় শত্রুর পিছু নিতে হবে—নয়ত এখানে বসে শক্তি সংহত করতে হবে নিজেদের।

মুনিম খাঁর নিজের বোধ হয় ইচ্ছা ছিল দুটো দিন এখানেই থাকেন—কিন্তু কে জানে কিসের সঙ্কোচে কিছুতেই মুখ ফুটে সে কথাটা বলতে পারলেন না বাকী সব সেনানায়কদেরই এক কথা—এ সুযোগ ছেড়ে দেওয়া ঠিক হবে না। সাপকে একটা লাঠি মেরে ছেড়ে দিলে তার বিষ যায় না—বরং সে ক্রুদ্ধ হয়ে থাকে, সুযোগ পেলেই প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করে। তাছাড়া এ-ই সুযোগ—শত্রুর বিষদাঁত চিরদিনের মত ভেঙে দেবার। শত্রুর শেষ, ঋণের শেষ, রোগের শেষ এবং আগুনের শেষ যে রাখে সে আহাম্মক। শত্রু শেষ করার এ সুযোগ ছেড়ে দিলে চরম আহাম্মকি হবে।

মুনিম খাঁর ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি বস্ত্রাবাসের শুভ্র বস্ত্রখণ্ডে নিবদ্ধ ছিল। সেই ভাবেই কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে প্রশ্ন করলেন, 'রাজাসাহেব কী বলেন ?'

'এ সম্বন্ধে কি কোন দ্বি-মতের অবসর আছে খান-ই-খানান ? শত্রুকে আবার শক্তি সঞ্চয়ের অবসর দেব কী দুঃখে ? তাহলে এত কাণ্ড করলামই বা কেন ?'

আরও কিছুক্ষণ চুপ করে বসে থেকে মুনিম খাঁ বললেন, 'তাহলে কি এখনই রওনা হতে চান ? দুটো দিন বিশ্রাম করবার অবসর দেবেন না ফৌজকে ?'

'কী এমন বিশ্রাম তারা করল জনাব। একটা দিনের যুদ্ধ বই তো নয়।

আচ্ছা, আর-একটা দিনই না হয় সময় দিন তাদের।'

'বেশ, তাই হোক। সেই মতই নির্দেশ দিন তাহলে আপনারা।' একটু অনিচ্ছুক কণ্ঠেই বললেন যেন মুনিম খাঁ।

এর পর আর সেনানায়করা কেউই বেশীক্ষণ অপেক্ষা করলেন না, কারণ প্রায় সকলেই তখন ক্ষুৎ-পিপাসায় কাতর, ক্লান্ত, আহত। রীতিমাফিক যেটুকু সৌজন্য প্রকাশ করা প্রয়োজন, যেটুকু কুশল প্রশ্নের আদান-প্রদান আবশ্যক—সেইটুকু করেই সকলে বিদায় নিলেন।

কেবল উঠলেন না টোডরমল।

তিনিও ক্লান্ত, তিনিও আহত। কিন্তু তার চেয়েও বেশী তিনি কৌতূহলী। আজ কিছু পূর্বেকার ঘটনাটা তাঁকে গভীর ভাবে নাড়া দিয়েছে, তাঁর কৌতূহলকে একটি বিশেষ আঘাতে জাগ্রত করেছে।

তাঁর দেবী বিধর্মী শত্রুকে রক্ষা করার জন্য রণক্ষেত্রে আবির্ভূতা হবেন—বিস্ময় ও কৌতূহলের এইটেই তো যথেষ্ট কারণ। শ্রদ্ধা নষ্ট করার, পূর্ব ধারণা পরিবর্তিত করার পক্ষেও হয়ত যথেষ্ট। আর তা নষ্ট হতও—যদি না ঐ মানুষটিরই পূর্ব পূর্ব কীর্তিগুলো তিনি নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করতেন। শুধু পূর্ব পূর্বই বা কেন—সর্বশেষ কীর্তিও তো সামান্য নয় খুব। শত্রুকে চরম বিপদ থেকে রক্ষা করার পরও সহস্র চক্ষুর সামনে থেকে চোখের নিমেষেই কি তিনি অন্তর্হিতা হন নি?

এর ওপর আবার মুনিম খাঁর আপাত-উন্মত্ত দুর্বোধ্য আচরণ—এটার সঙ্গেও তো ঐ দেবী বা সন্ন্যাসিনীর কার্যকারণের কোন যোগাযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তবে কি মুনিম খাঁ তাঁকে চেনেন?

তবে কি সত্যিই সে ওঁর আত্মীয়া? অথবা সত্যই বিধর্মী ক্রীতদাসী সে?

এ রহস্যটা পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন।

চাকর এসে ওঁদের চর্ম-পাদুকা শিরস্ত্রাণ খুলে নিয়ে গিয়েছিল আগেই। এখন স্বর্ণভৃঙ্গারে জল এনে ধরল হাত পা ধোবার, ভিজা গামছায় হাত পা মুখ মুছিয়ে নিয়ে গেল—শরবত নিয়ে এল স্বর্ণপাত্রে ওঁদের জন্য। মুনিম খাঁর ইঙ্গিতে হিন্দু ভৃত্যই রাজা সাহেবের জন্য শরবত এনেছিল কিন্তু তিনি তা পান করলেন না। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ইষ্টপূজা শেষ না করে তিনি কিছুই খাবেন না। এমনিই মুখহাত ধুয়ে অনেকটা ক্লান্তি দূর হয়ে গেছে—আর এখন ব্যস্ত হবার প্রয়োজনও নেই। শরবতের পাত্র ললাটে ঠেকিয়ে মুনিম খাঁর সম্মান রক্ষা করলেন মাত্র।

মুনিম খাঁও বেশী পীড়াপীড়ি করলেন না। নিজে নিঃশব্দে নিজের শরবতটুকু পান করে নিয়ে ইঙ্গিতে ভৃত্যদের চলে যেতে নির্দেশ দিলেন। তারপর তাকিয়ার ওপর আর একটু এলিয়ে পড়ে বললেন, 'বলুন রাজা সাহেব, এবার আপনার কী হুকুম!'

'গোস্তাকী মাফ করবেন খান-ই-খানান, কিন্তু ঐ যে—মানে ঐ বালিকাটি

ঠিক কে বলুন তো? ও কি সত্যিই আপনার পরিচিতা? ওর সমস্ত আচরণ এমন দুর্বোধ্য ও পরস্পর-বিরোধী যে আমি কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারছি না। ও কি মুঘলদেরই হিতাকাঙ্ক্ষণী, না কি পাঠানদের? নিজের ইচ্ছায় যুদ্ধক্ষেত্রে ঘুরছে, না ওদের গুপ্তচর—কিছুই ঠিক করতে পারছি না। সমস্তটা হেঁয়ালী এবং অস্পষ্ট লাগছে।'

মুনিম খাঁ তাকিয়ায় এলিয়ে পড়ে চোখ বুজে ছিলেন। সেইভাবেই শুনলেন টোডরমলের সমস্ত কথাগুলো—শান্তভাবে নীরবে। আরও কিছুক্ষণ চোখ বুজে রইলেন, তারপর বললেন, 'ওর আচরণর কোন কৈফিয়তই আপনাকে দিতে পারব না রাজা সাহেব; তা আমার কাছেও সমান দুর্বোধ্য। আর সেই জন্যই আজ এতটা বিচলিত হয়ে পড়েছিলাম—হয়ত কিছু কিছু অসৌজন্য এবং অশোভনতাও প্রকাশ করে ফেলেছি। কিন্তু সবটা শুনলে এ বৃদ্ধের দুর্বলতাটুকু মাপই করবেন।...ও আপনাকে মিথ্যা বলে নি রাজা টোডরমল, আমিও বলি নি। ওর এই দুই পরিচয়ই সত্য। আমার বেটীও বটে—কিন্তু এই ওর ললাটলিপি—হয়ত আমারও অপরাধ।'

টোডরমল স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন, তেমনিভাবেই বসে রইলেন তাঁর ক্ষুরধার বুদ্ধি ও প্রতিভা-দীপ্ত দৃষ্টিবিহ্বল হয়ে উঠেছে। বোঝাপড়া করার, প্রশ্ন করার বা কোন জবাব দেবার শক্তিটুকুও যেন আর অবশিষ্ট নেই।

অনেকক্ষণ পরে টোডরমল কোনমতে শুধু প্রশ্ন করলেন, 'তার মানে?'

এবার মুনিম খাঁ সোজা হয়ে বসলেন। টোডরমলের দিকে কেমন এক রকম বিষাদাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, 'সে হয়ত এমন কোন কলঙ্কের কথা নয় রাজা সাহেব—তবু আজ সে কাহিনী বলতে লজ্জাই অনুভব করছি। লজ্জা যত, দুঃখও তার চেয়ে কম নয়। নিজের নির্বুদ্ধিতা ও অবিবেচনার জন্যই দুঃখ। যা আমার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার হতে পারত—তাই আমার কাছে দুঃস্বপ্ন হয়ে উঠেছে—আর তার জন্য আমার সামান্য একটু অবিবেচনাই দায়ী।'

'আপনার যদি কষ্টই বোধ হয় সে কাহিনী বলতে তবে থাক্ জনাব। না-ই শুনলাম সে কথা। পৃথিবীতে অনেক কাজেরই তো অর্থ বা সামঞ্জস্য খুঁজে পাই না, এটারও না হয় না পেলাম!'

'না, শুনুন। শোনাই ভাল। আমার নির্বুদ্ধিতা থেকে হয়ত কিছু শিখতেও পারবেন। তা ছাড়া আজ—আজ আমারও একটু পরামর্শ দরকার রাজা-সাহেব। আপনি ছাড়া কারো কাছে এ কথা বলতেও পারব না। পরামর্শ দেবার মতও আর কেউ নেই তো!...আপনিই বা সব না শুনলে যুক্তি দেবেন কেমন করে?'

এই বলে একটু থেমে, আর কিছুক্ষণ চোখ বুজে থেকে আস্তে আস্তে বিবৃত করলেন মুনিম খাঁ, আশ্চর্য অবিশ্বাস্য-এক কাহিনী।

অখণ্ড মনোযোগের সঙ্গে বসে শুনলেন টোডরমল—অভিভূত হয়ে। সারাদিনের অপরিসীম ক্লান্তি, ক্ষতের জ্বালা, পিপাসা—কিছুই যেন বোধ

রইল না তাঁর—এমনই বিচিত্র সে কথা। দূরের উন্মত্ত কোলাহল ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসছে। মুমূর্ষুর আর্তনাদও পড়েছে ঝিমিয়ে—হয়ত বা এঁদের মনোযোগ এই সমস্ত স্থান-কাল-পাত্রের বাইরে আর-এক অলৌকিক জগতে চলে গিয়েছিল বলেই এঁদের কানে সে কোলাহল আর তেমনভাবে প্রবেশ করছিল না। সামান্য শামাদানের অতি ক্ষীণ আলোতে এক বৃদ্ধ এবং এক প্রৌঢ় ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে কথা কইতে কইতে আজকের এই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে বহুদূরে চলে গিয়েছিলেন, সুদূর এবং অদূর অতীতের বিস্ময়কর এক ঘটনার রাজ্যে। একজন বক্তা, অপরজন শ্রোতা—কিন্তু শ্রোতার কৌতূহল, মনোযোগ এবং প্রয়োজনমত প্রশ্নই বক্তার উৎসাহে যোগান দেয়—এ-ক্ষেত্রে তাঁর কোনটারই অভাব হয় নি। এঁদের এখানে যে কল্পলোক সৃজিত হয়েছিল, তা দুজনেরই সৃষ্টি—তাতে কোন সন্দেহ নেই।

একটু একটু করে সবই বললেন মুনিম খাঁ।

বললেন সেই বালিকাটির বিচিত্র জীবনেতিহাস।

বললেন নিজেরও কলঙ্ক ও সুখস্মৃতির আশ্চর্য কাহিনী।

নফিসার অবিশ্বাস্য জীবন-কথা।

এ-ই সে নফিসা। আজ যাকে রণক্ষেত্রে দেখেছেন রাজা টোডরমল—কাল যাকে গিরিনির্ঝরের ধারে অরণ্যের নিভৃত প্রান্তে দেখেছিলেন। সে-ই কালকের সন্ন্যাসিনী, আজকের দেবী।

তেলিয়াগঢ়ির শিবিরে সে যখন আসে মুনিম খাঁর কাছে—তখনই তিনি দৈবাৎ ওর পরিচয় পান। না, অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই—নিশ্চিত প্রমাণ পেয়েছেন তিনি অন্তরে বাইরে।

তিনি পরিচয় পেয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ওকে জানতে দেন নি। সে-ই আর এক নির্বুদ্ধিতা। মুখে এসেছিল বহুবার; শুধু লজ্জাতে, অনুশোচনাতেই বলতে পারেন নি কথাটা। ওর মায়ের প্রতি, ওর প্রতি যে অবিচার করেছেন সেই লজ্জায়, সেই অনুশোচনায়।

তিনি ওকে শুধু সস্নেহে কাছে ধরে রাখতে চেয়েছিলেন নিরাপদ আশ্রয়ের লোভ দেখিয়ে। কিন্তু পর পরই—তার কাছে আশ্রয়ের লোভ কতটুকু থাকতে পারে—সেইটেই ভেবে দেখেন নি তিনি। নফিসা সে লোভ করে নি। গুরুন্দায় সে-ই শেষ দেখেছিলেন তিনি ওকে—তারপর এই আজ।

যখন জানতেন না চিনতেন না—তখন অত মায়াও ছিল না! কিন্তু আত্মজা বলে জানবার পর, তার ব্যক্তিত্বের, তার বুদ্ধির, সর্বোপরি তার হৃদয়ের পরিচয় পাবার পর তিনি তাকে কাছে পাবার জন্য, পিতৃস্নেহের ছত্রচ্ছায়ায় তার তাপিত প্রাণকে আচ্ছাদিত করে শান্তি দেবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কিন্তু কোথাও আর তার খোঁজ পাওয়া গেল না—যেন ধরিত্রীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সে।

প্রকৃতপক্ষে তাকে খুঁজে বার করার জন্য পাগলই হয়ে উঠেছিলেন—আজ স্বীকার করতে আর ইতস্তত করবেন না মুনিম খাঁ—তার জন্য রাজকার্যেও অবহেলা করেছেন ; কতকটা সেই জন্যই সময়ে যুদ্ধযাত্রা করতে পারেন নি।

তারপর এই প্রথম খোঁজ পেলেন তার। খোঁজ ঠিক পাওয়া হয়ত সেটা নয়—তবে বর্ণনা শুনেই অনুমান করতে পেরেছিলেন। আর সে অনুমান ভুলও হয় নি।···

উপন্যাসের মতই অবিশ্বাস্য এই কাহিনী বলে যেন শ্রান্ত হয়ে চুপ করলেন খান-ই-খানান। চোখ বুজে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

একটুখানি তাঁকে সামলে নেবার সময় দিয়ে মনে-মনে অধীর রাজা সাহেব প্রশ্ন করলেন, 'আপনি যা বললেন তাতে তো এ-ই মনে হয় যে, আপনার কন্যা নফিসার চেয়ে বড় শত্রু দায়ুদের আর কেউ নেই, দায়ুদের সর্বনাশ-কামনাই তার একমাত্র লক্ষ্য—কিন্তু আজকের এই আচরণের সঙ্গে তো সেই পূর্ব ইতিহাসের কোন সামঞ্জস্য থাকছে না! এটা যেন কেমন অদ্ভুত ব্যাপার হল না ?'

'সেইটেই আমিও তো বুঝতে পারছি না রাজা সাহেব—' ম্লান কণ্ঠে উত্তর দেন মুনিম খাঁ, 'এ কী হল !···আর সেই কারণেই আমি একবারটি তার দেখা চাইছিলাম—সামনাসামনি হতে পারলে আমি এর কৈফিয়ত নিতাম। সে মিথ্যা বলত না কিছুতেই।'

'কিন্তু দুদিন অপেক্ষা করলেই যে তার দেখা পেতেন—তারও তো কোন নিশ্চয়তা নেই।'

'তা ঠিক। তবু—।···এবার, এবার আমি তাকে নিজের পরিচয় দিতাম, রাজা সাহেব। নতজানু হয়ে তার ক্ষমা ভিক্ষা করতাম। বৃদ্ধ বাবাকে সে ক্ষমা করত নিশ্চয়। আমার শেষ জীবনটা তাকে কাছে কাছে রাখতাম। যে কটা দিন আরও বাঁচি—যে ক্ষতি তার করেছি যৎসামান্য পূরণের চেষ্টা করতাম। কিন্তু সে সুযোগ বোধ হয় আর পাওয়া যাবে না। জানি না—খোদার কী মর্জি—তবে এটা ঠিক, অন্যায় সে কিছু করবে না রাজা সাহেব। আপাত-দৃষ্টিতে যা দুর্বোধ্য অর্থহীন মনে হচ্ছে—কোথাও নিশ্চয় তার কোন একটা কৈফিয়ত আছে।'

'তা তো আছেই।' সামান্য হেসে জবাব দেন টোডরমল—বৃদ্ধ পিতার আকৃতিতে করুণাই অনুভব করেন তিনি মনে মনে—'এও হতে পারে যে, মৃত্যুতে সব জ্বালার অবসান হবে মনে করেই সে দায়ুদকে বাঁচাতে চেয়েছে ! আরও কিছুদিন বাঁচিয়ে রেখে আরও যন্ত্রণা দেওয়াই হয়ত উদ্দেশ্য। সর্বনাশের অনুভূতিটা ধীরে ধীরে উপলব্ধি করুক দায়ুদ—এই হয়ত ইচ্ছা।'

'ঠিক বলেছেন রাজা সাহেব, ঠিক বলেছেন।' সোজা হয়ে উঠে বসেন খান-ই-খানান, উৎসাহে চোখ দুটো তাঁর জ্বলতে থাকে—উৎসাহে আর কতকটা টোডরমলের প্রতি কৃতজ্ঞতায়—'ঠিক বলেছেন। আমিই অন্ধ, তাই

এটা দেখতে পাই নি, ওর প্রতি অবিচার করেছিলাম, মনে মনে ক্ষুণ্ণও হচ্ছিলাম একটু! মূর্খ আমি।...এই তো—এই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি ওর উদ্দেশ্য।'

এক নিঃশ্বাসে উত্তেজিত কণ্ঠে এত কথা বলে আবার যেন একটু মিইয়ে যান মুনিম খাঁ—'কিন্তু তার দেখা তো পেলাম না রাজা সাহেব! আর কি সে কোনদিন আসবে না? এই বৃদ্ধের শেষ জীবনটা স্নেহ দিয়ে, সেবা দিয়ে, উৎকণ্ঠা দিয়ে মধুর স্নিগ্ধ করে তুলবে না!...হায়, হায়, কেন সেদিন পরিচয়টা দিলাম না!'

শেষের দিকে গলা ভেঙে আসে মুনিম খাঁর।

'পাবেন বইকি। নিশ্চয়ই দেখা পাবেন। আমাদের বাহিনী থেকে দূরে সে কখনই থাকে না—এই তো একাধিক বার তার প্রমাণ পেলেন।'

'পাব? পাব? ইনসানাল্লাহ্!'

ঊর্ধ্বদিকে দৃষ্টি মেলে বোধ করি বা খোদাকেই স্মরণ করতে চান মুনিম খাঁ। তাঁর চোখে জল এসে যায়।

॥ ২৬ ॥

নফিসা সেদিন রণক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে যা বলেছিল ওসমানকে—হয়ত তার সবটাই ছলনা নয়—হয়ত সেটা তার মনের কথাও।

ওর মনের মধ্যে কেমন করে সব ওলট-পালট হয়ে গেছে। আজ সে নিজেই তার হদিস পায় না।

শৈশবের কথা তার মনে নেই, কিন্তু মার কোল ছাড়বার পর যে-সব পুরুষ তার চার পাশে দেখেছে সে, তারা কেউ মানুষ নামের যোগ্য নয়। লোভী, কুৎসিত রকমের লোভী, ইতর—পুরুষের কলঙ্ক তারা। তার গা ঘিনঘিন করত ওদের দেখলে। তাদের লোলুপ বীভৎস মনের চেহারা দেখে দেখে কেমন যেন তার ধারণা হয়েছিল যে, সব পুরুষমানুষই বুঝি এমনি!

তাই মিয়া লুদীকে প্রথম দেখে চমকে উঠেছিল সে।

তাঁকে দেবতা বলে বোধ হয়েছিল। সে যে কিছুতেই তাঁকে ছাড়তে চায় নি—তার মূলে সেই ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা-বোধ। কিছু বা বিস্ময়। পুরুষ এমন উদার মহৎ, এমন শক্তিশালী হয়?

সেই ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতাই তাকে ক্রমশ আত্মসম্মোহিত করে ফেলেছিল। সে নিজেকে বুঝিয়েছিল যে সে মিয়া লুদীকে ভালই বেসেছে, সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছে। এ জীবনে আর কাউকে ভালবাসা তার সম্ভব নয়।

সেই ভালবাসার পাত্রকে হারিয়েই সে এমন পাষাণী হয়ে উঠেছে, এমন প্রতিহিংসাপরায়ণা, ক্রূর—এই ছিল তার বিশ্বাস।

তার প্রাণাধিক, তার প্রাণাস্পদ, তার মালিকের অকারণ হত্যার শোধ তুলবে,—হত্যাকারীর সর্বনাশ করবে—এই হয়েছিল তার ব্রত। সে ব্রতের, সে মন্ত্রের সাধন করতে গিয়ে তার শরীর যায় সেও ভাল। বস্তুত তার যে শরীর আছে, তার দেহেও যে বসন্ত আর যৌবনের পদার্পণ ঘটে—সে দেহও যে নিজ ধর্ম পালনের জন্য উন্মনা হয়ে ওঠে—এ তো ভুলেই গিয়েছিল সে।

আরও ভুলে গিয়েছিল যে সেই শরীরের মধ্যে মন বলে খোদার সৃষ্ট আর এক আজব পদার্থ আছে—যা কোন কৃতজ্ঞতা বা শ্রদ্ধা ভক্তির পথ ধরে চলে না। বেপরোয়া স্ব-তন্ত্র। তার পথ সর্পিল, গতি কুটিল। তার ক্ষেত্র সীমাহীন। তার ধর্ম অসময়ে অপাত্রে এবং অস্থানে নিজেকে সমর্পণ করা—বিলিয়ে দেওয়া—হারিয়ে দেওয়া।

নেশার ঘোরে চলেছিল সে এক দিকে চেয়ে। একচক্ষু হরিণের মত দৃষ্টি ছিল নিরাপদ দিকটাতেই নিবদ্ধ। তাই বিপদ যে অন্য দিক দিয়ে কখন এসে পৌঁছে গেছে টের পায় নি।

সে বিপদ ছিল তার অন্তরে।

আসল শিকারী বুঝি তার যৌবন-পীড়িত তার মন।...

একেবারে চমকে উঠল সে সেই দিনই—যেদিন ক্লান্ত ক্লিষ্ট অনুতপ্ত দায়ুদ কররাণী বীরভূমের গভীর অরণ্যে তার সামনে একান্ত দীনভাবে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিলেন—বুক পেতে দিয়েছিলেন তার অস্ত্রের সামনে। নিয়তির মত সর্বনাশিনী নারীকে বিশ্বাস করে তার হাতে জীবন, সিংহাসন, সমস্ত ভবিষ্যৎ ছেড়ে দিয়েছিলেন।

চমকে উঠেছিল সে।

চমকে উঠেছিল দায়ুদ কররাণীর আচরণে নয়—নিজের মনের গতি দেখে। হয়ত বা ভয়ই পেয়েছিল একটু।

হাতের মধ্যে পেয়ে অতবড় শত্রুকে ছেড়ে দিয়েছিল তাই? না, তা নয়। হয়ত নিজের হাতে বধ করার ইচ্ছা কোনদিনই ছিল না তার।

চমকে উঠেছিল সে অন্য কারণে।

দায়ুদ কররাণীর সেই অপরাধীর দীন ভঙ্গী, নিজের অস্ত্র তার হাতে তুলে দিয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা—সর্বোপরি তার করুণ হতাশ কণ্ঠস্বর সেদিন নফিসার বুকে শেলের মত বিঁধেছিল।

করুণা অনুভব করেছিল সে ঐ চরম শত্রু সম্বন্ধে।

করুণা-উদ্বেলিত এক প্রকারের আবেগ।

শিকারী যদি নিজের শিকার সম্বন্ধে করুণা অনুভব করে তাহলে সমস্ত খেলাটাই মাটি হয়ে যায় যে! ভয় পেয়েছিল সে সেই কারণেই। নিজের ভবিষ্যৎ ভেবে ভয় পেয়েছিল।

যে প্রতিহিংসাকে জীবনের একমাত্র অবলম্বন করে সে আর সব-কিছু ভুলে ছিল, সেই প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তিই যদি না থাকে তো সে থাকবে কী নিয়ে? তার আর রইল কী?

দীন, অনুতপ্ত, প্রায় নিঃসঙ্গ ও নিরস্ত্র কররাণী—তারই করুণায় ও আনুকূল্যে, তারই প্রদর্শিত পথে বিজয়ী বীরের মত চলে গিয়েছিলেন—আর তাঁর সেই পায়ের ধুলোর ওপর বসে পড়েছিল হতভাগিনী তার সব-কিছু হারিয়ে।

তার প্রতিহিংসাই তো এখন তার জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, একমাত্র অবলম্বন—তা-ও কি আজ তাকে ছেড়ে চলে গেল ?

অবশ্য বেশীদিন নিজেকে এভাবে মোহগ্রস্ত থাকতে দেয় নি নফিসা। এই জড়তা, মানসিক এই দৈন্য ঝেড়ে ফেলে দিয়ে আবার সে নিজের কাজে লেগে গিয়েছিল। কিন্তু তার ভরটা যায় নি। ওর অন্তরে আগের সেই একাগ্রতা সেই তন্ময়তা যেন আর খুঁজে পায় না, কোথায় যেন মনের জোরটাই গেছে কমে। এই সত্যটা যত সে অনুভব করে ততই যেন দমে যায় মনে মনে। আর ততই পরমুহূর্তে জোর করে নিজেকে সঞ্জীবিত করে, মনকে চাবুক মেরে কাজে লাগায়।

তার মালিককে মনে করবার চেষ্টা করে।

সৌম্য, শান্ত, উদার, স্নেহশীল তার মালিক। অন্যায় করে অকারণে যাঁকে মেরেছে তাঁর দুশমনেরা। তার দেবতা। তার দয়িত।

কিন্তু কে জানে কেন—তাঁর চেহারাটা আর তেমন মনে পড়ে না। বরং যাকে সে কিছুতেই মনে করতে চায় না, মনকে চোখ রাঙিয়ে যার ছবি মন থেকে মুছে দিতে চায় সে—সেই একটি একান্ত ক্লিষ্ট দীন মুখ কোথা থেকে এসে যেন মনের অগোচরই মনের সামনে দাঁড়ায়।

শিউরে ওঠে নফিসা। নিজেকে গালাগালি দেয়। বেইমান বলে, অকৃতজ্ঞ বলে। শাসন করতে চায় নিজেকে। অকারণে উপবাস করে, কঠোর কৃচ্ছ-সাধনে নিজের এই যৌবন-পীড়িত দেহটাকে নষ্ট করবার চেষ্টা করে—কিন্তু তবু কিছুতেই যেন কিছু হয় না।

ও লোকটা পাপিষ্ঠ, বিশ্বাসঘাতক, হত্যাকারী। ওকে কিছুতেই মনে করবে না সে। মনে আনবে না তার ক্লিষ্ট দীন মুখ। বেইমান, বেসরম ঐ ঘাতকটার প্রতি এতটুকু মেহেরবানি রাখাও পাপ।

কিন্তু যতই চাবুক মারে নিজেকে, নিজের মনকে—ততই এসে দাঁড়ায় মনের সামনে—না, তার মালিক নয়, ঐ নর পশুটাই।

আশ্চর্য হয়ে নিজের ভাবগতিক দেখে নফিসা।

তার কান্নাই পায় এক এক সময়। কাঁদেও। কিন্তু সে অশ্রু না পারে বিস্মৃত স্মৃতির পটকে ধৌত উজ্জ্বল করতে, আর না পারে অবাঞ্ছিত স্মৃতি-চিত্রকে ঝাপসা অস্পষ্ট করতে। নিজের কান্না নিজেকেই পীড়িত করে শুধু।

তবু কাজ করে যায় নফিসা। এবং সফলও হয় বইকি।

এ যেন তার মধ্যে দুটো মানুষ কাজ করছে।

একজন চাইছে সর্বপ্রযত্নে পূর্বপ্রতিজ্ঞায় অটল থেকে দায়ুদ কররাণীর

সর্বনাশ-সাধনের ব্রত পালন করে যেতে, আর-একজন মনে মনে লালন করছে সেই এক দীন অসহায় অনুতপ্ত দায়ূদের স্মৃতি, ব্যথা বোধ করছে তার আসন্ন বিপদের কথা চিন্তা করে।

তাই একজন যখন নষ্টসাহস ছত্রভঙ্গ মুঘলবাহিনীকে ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করে, গুজর খাঁকে হত্যা করে কররাণী বংশের সর্বনাশের পথ প্রশস্ত করে দেয়—আর-একজন তখনই সেই বংশেরই প্রতিনিধি-স্থানীয় ব্যক্তির ভবিষ্যৎ চিন্তা করে উদ্বিগ ব্যাকুল হয়ে ওঠে। ওসমানকে সে ছলনা করতেই গিয়েছিল এটা যেমন সত্য, তেমনি মনের কোন নিভৃত প্রদেশে সে ওদের জন্য উদ্বিগ্নও হয়ে উঠেছিল এটাও কম সত্য নয়।

আর এই দোটানায় পড়ে আসল মানুষটা অন্তরে অন্তরে যেন ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত হয়ে ওঠে—

অবশেষে যখন সত্যিই চরম মুহূর্ত এগিয়ে আসে তখন আর স্থির থাকতে পারে না। প্রথমজন হার মানে—দ্বিতীয়ারই হয় জন্ম। সে প্রথমজনকে বোঝায়, 'আর কেন, তোমার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েছে—এবার আমার কথা শোন, লোকটাকে বাঁচাও। ও নিতান্তই হতভাগা, তোমার এতখানি রোষের যোগ্য নয়।'

দ্বিতীয়াই যেন ঠেলে তাকে রণরঙ্গিণী চামুণ্ডা বেশে পাঠায় দায়ূদকে ত্রাণ করতে। যেতে যেতেই নিজের আচরণে বিস্ময়ের সীমা থাকে না তার। এ কী করছে সে, যার সর্বনাশের জন্য এত আয়োজন, তাকেই বাঁচাতে চলেছে!

তবু তো সেই দ্বিতীয়ারই জয় হল শেষ পর্যন্ত।

তারই আনুকূল্যে, তারই দয়ায়, শক্তিরূপিণী তার আবির্ভাবেই দায়ূদ কররাণীর নিরাপদে প্রাণ নিয়ে পালাতে সক্ষম হল।

এবং সেই অলৌকিক অবিশ্বাস্য ঘটনার পর যে নফিসাকে আর-কেউ দেখতে পায় নি—তার কারণ সে এক রকম পালিয়ে গিয়েছিল; প্রথম বিস্ময় বিমূঢ়তার সুযোগ নিয়ে দ্রুত চলে গিয়েছিল রণক্ষেত্র থেকে বহুদূরে—ঘন শাল-অরণ্যের মধ্যে।

আসলে সে তখন নিজেকে সকলের দৃষ্টি থেকে আড়াল করতে পারলে যেন বাঁচে। এমন কি নিজের কাছ থেকেও।

কাজটা করে ফেলেই দ্বিতীয়া অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। লজ্জায় প্রথমার কাছে মুখ তুলতে পারছিল না সে।

মনে হচ্ছিল আজ সে-ই মিয়া লুদীর সঙ্গে চরম বিশ্বাসঘাতকতা করল, তাঁকে নূতন করে হত্যা করল।...

'ছি ছি! এ কী করলি হতভাগিনী এ কী করলি! এতবড় বেইমানী করে বসে রইলি! পারলি এত বড় বেইমানী করতে!'

লোকচক্ষুর অন্তরালে নিবিড় অরণ্যের ছায়াঘন অন্ধকার এক কোণে বসে এই প্রশ্নই সে বার বার করেছে নিজেকে। ধিক্কারে ধিক্কারে নিজেকে জর্জরিত

করে তুলেছে। উপবাসে, অশ্রুতে, আত্মধিক্কারে এবং উপাসনায় প্রায়শ্চিত্ত করতে চেষ্টা করেছে। বার বার খোদার কাছে মিনতি জানিয়েছে এই বলে যে—জঙ্গলে নরখাদক পশুর তো অভাব নেই, বাঘ বা ভালুক—যে-কোন একটা জানোয়ার পাঠিয়ে দাও—শেষ হয়ে যাক সব। নিজের দায়িত্ব বহন করার দায় থেকে অব্যাহতি দাও।

সে যে আর পারছে না।

অয়ু খোদা, এ কী করছ তুমি তাকে নিয়ে—এ কী করছ!

॥ ২৭ ॥

দায়ুদ খাঁ কররাণী তুকারায়ের প্রান্তর ত্যাগ করে সোজা চলে এসেছিলেন কটকের বরবাটী দুর্গে। কোথাও এক বেলার বেশী বিশ্রাম করেন নি। ভেবেছিলেন এত দ্রুত মুঘলবাহিনীর আসা সম্ভব হবে না—তিনি দুটো দিন নিঃশ্বাস নেবার, ভবিষ্যৎ কর্মপ্রণালী স্থির করবার অবসর পাবেন।

কিন্তু তা হয় নি। টোডরমল সে-সময় তাঁকে দেন নি। প্রায় সমান দ্রুত পিছনে পিছনে এগিয়ে এসেছিলেন তিনিও। ফলে দায়ুদ কটক দুর্গে প্রবেশ করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ঘিরে ধরেছিলেন দায়ুদকে—নিরন্ধ্র অবরোধ গড়ে তুলেছিলেন দুর্গের চার পাশে।

বরং যদি গোড়াতেই দায়ুদ তাঁর ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের জড়ো করবার চেষ্টা করতেন, সর্দারদের একত্র করার চেষ্টা করতেন, আবার পথেই মুঘলবাহিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাদের বিব্রত ও ব্যতিব্যস্ত করে তুলতেন—তাহলে হয়ত ইতিহাস দাঁড়াত অন্যরূপ। তা তিনি করেন নি। স্ত্রীপুত্র ছিল কটকে—পাছে পথে ইতস্তত করলে মুঘলবাহিনী অন্য কোন পথে আগেই কটকে পৌঁছয়—হয়তো—এই ছিল তাঁর দুশ্চিন্তা।

তা ছাড়াও হয়ত আর-কিছু ছিল।

আসলে বিস্মিত হয়েছিলেন দায়ুদ, বড় বেশী বিস্মিত হয়েছিলেন। অভিভূত বিহ্বল হয়ে গিয়েছিলেন সে বিস্ময়ের আঘাতে। ভাল করে কিছু ভাববার বা ভেবে সেইমত কাজ করবার কোন শক্তিই আর অবশিষ্ট ছিল না তাঁর। বিহ্বল অবস্থায় অপরের নির্দিষ্ট পথে চলাই যায় শুধু—তাই চলেছিলেন। অনুচররাই একরকম তাঁকে চালিয়ে নিয়ে এসেছিল, তিনি পুতুলের মত ঘোড়ার পিঠে বসেছিলেন। পথের দিকেও তাকান নি।

অভিভূত হবার কারণও ছিল বইকি।

কত কীই না ঘটে গেল তাঁর জীবনের ওপর দিয়ে—এই গত কয়েক মাসে। কত অবিশ্বাস্য আপাত-অর্থহীন ঘটনা।

ঐ নারী তাঁর সর্বাপেক্ষা দুঃখের কারণ। মৃত্যুরও অধিক লজ্জা এবং

অপমানের মূল। বার বার আঘাতই পেয়েছেন তার কাছ থেকে। পেয়েছেন চরম সর্বনাশ।

তবে তার কারণ আছে, তার অর্থ বোঝেন।

কিন্তু সেদিন পাকুড়ের জঙ্গলে সে যা করল—যা করল আজ তুকারায়ের যুদ্ধক্ষেত্রে তা দুর্জ্ঞেয়ই রয়ে গেল তাঁর কাছে, রইল চির রহস্যে ঢাকা। যা করেছে তা স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ। তার মধ্যে কোন দ্বিধা কি সংশয়ের অবকাশ নেই। সে তাঁকে বাঁচিয়েছে আজ—নিজের জীবন তুচ্ছ করে বাঁচিয়েছে। অসংখ্য শত্রুর উদ্যত মারণাস্ত্রের সামনে বুক পেতে দিয়েছে সে—তাঁকে আচ্ছাদিত করতে।

না, নিজের জীবনের কথা ভাবে নি সে, হয়ত আশাও রাখে নি। নিজে মরেই তাঁকে বাঁচাতে গিয়েছিল।

কিন্তু কেন, কেন এ কাজ করতে গেল সে ? কেন, কেন ?

এই প্রশ্নই তো অহরহ নিজেকে করে যাচ্ছেন দায়ুদ কররাণী।

নিশ্চল নিরুত্তরতার প্রাচীরে ব্যর্থ মাথা খুঁড়ে ফিরে আসছে সে প্রশ্ন। আর সেই ব্যর্থতায় অন্তরে অন্তরে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন। কোন একটা স্বার্থ, কোন একটা উদ্দেশ্য আছে জানতে পারলে নিশ্চিন্ত হতেন। অথবা—

তার ঘৃণা, তার বিদ্বেষ তিনি বুঝতে পারেন। কিন্তু তার এই মমতা, তার এই জীবন-তুচ্ছ-করা দুঃসাহস—এর যে কোন কারণই খুঁজে পাচ্ছেন না।

আরও বিস্মিত হয়েছিল দায়ুদ তাঁর নিজের মনের দিকে তাকিয়ে।

এই নারীর হাত থেকে বহু লাঞ্ছনা লাভ করেছেন তিনি—এমন কি পরিচয় হবার পর এই গত কালও। কিন্তু তাতেও ওর সম্বন্ধে যথেষ্ট জ্বালা বোধ করেন নি। তবে তার একটা কৈফিয়ত ছিল। নিজের অনুশোচনা বা আত্মগ্লানিই এই মনোভাবের কারণ বলে বুঝিয়েছিলেন নিজেকে।

কিন্তু আজকের এই আচরণে শুধু কৃতজ্ঞতা নয়, শুধু কৌতূহল নয়—যে নিরতিশয় পুলক অনুভব করছেন তাতেই যেন ওঁর বিস্ময়ের সীমা নেই। এই পরাজয়ের মধ্যে যত গ্লানি, যত লজ্জা, যত আত্মধিক্কার, বিগত ও বর্তমান অসংখ্য বিপদের আশঙ্কা, সব ছাড়িয়ে ছাপিয়ে উঠেছে একটা আনন্দের বন্যা, একটা অপরিসীম নাম-না-জানা খুশির জোয়ার। এত গেছে তা যাক, যা পেয়েছেন তা যেন তাঁর সর্বস্ব যাওয়ারও ক্ষতিপূরণ করে দিয়েছে আজ।

এই পরম পাওয়ার অপরূপতাতেই আচ্ছন্ন, অভিভূত হয়ে আছেন তিনি।

তবে কি—?

গোপন প্রশ্নটা মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারছে বার বার—সেটা মনের কাছেও প্রকাশ করতে শঙ্কিত হচ্ছেন, যদি যুক্তি এসে আবেগকে ধিক্কৃত করে, প্রত্যক্ষ কঠোর সত্যের সামনে কল্পনাকে অপমানিত হতে হয়—এই আশঙ্কায়।...

অন্তরের এই আচ্ছন্ন অভিভূত অবস্থার জন্যই—যাকে নিতান্ত পরাজয় এবং শত্রুর অনুকম্পায় আত্মরক্ষার লজ্জা বলে ভুল করল অনুচররা—কিছু

করতে পারেন নি দায়ুদ কররাণী। কোন মতে, অন্ধ যেমন ভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে অপরের কাছে আত্মসমর্পণ করে পথ চলে, তেমনিভাবেই সঙ্গীদের উপর নির্ভর করে বরবাটীতে চলে এসেছিলেন তিনি। ভেবেছিলেন, কর্তব্য স্থির করা এবং কাজে নামবার আগে রূঢ় বাস্তবের সামনে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয় করে নেবেন—কয়েকটা দিন চুপ করে বসে থেকে বিক্ষিপ্ত মনটাকে আয়ত্তে আনবার চেষ্টা করবেন।

কিন্তু সে অবসর পেলেন না। বস্তুত নিঃশ্বাস ফেলবার আগেই যেন মুঘলরা ঘিরে ধরল তাকে।

এখন এই অবরোধের মধ্যেও মানুষের যা সাধ্য তা সবটাই করলেন দায়ুদ কররাণী। যে-কটা দিন প্রতিরোধ করা সম্ভব—সে কদিনই করলেন। তার-পর অবস্থা যখন মানব-সহনশীলতার সীমা লঙ্ঘন করল—আত্মসমর্পণ করা ছাড়া কোন উপায় রইল না, তখন সে প্রস্তাবই করে পাঠালেন।

একটি মাত্র শর্তসাপেক্ষে তিনি মুঘল সেনাপতির পায়ের কাছে নিজের অস্ত্র এবং সম্মান সমর্পণ করতে রাজী আছেন। সে-শর্ত আর-কিছু নয়—তার স্ত্রী-পুত্রকন্যার নিরাপত্তা। আর কোন প্রার্থনা নেই তাঁর, অন্য কোন অনুগ্রহই চাইবেন না তিনি—শুধু ওদের দূরে কোন নিরাপদ স্থানে চলে যেতে দেওয়া হোক।

মুঘল সেনাপতির পক্ষে টোডরমল তৎক্ষণাৎ সে আশ্বাস দিলেন তাঁকে। দূতকে বললেন, 'অবশ্যই তা দেওয়া হবে। দায়ুদ খাঁ যেন সে-জন্য কিছুমাত্র চিন্তা না করেন। তাঁর অন্তঃপুরিকারা কেউ দিল্লীশ্বরের দুশমন নয়, তারা কোন অপরাধ করে নি তাঁর কাছে। তারা নিজেদের মালপত্র নিয়েই চলে যেতে পারবে—যেখানে খুশি।'

অতঃপর মুঘল শিবিরে বিজয়োল্লাসের সাড়া পড়ে গেল।

তাঁবুতে তাঁবুতে শুরু হয়ে গেল উৎসব।

মোল্লা মৌলবীদের অকাতরে অর্থ বিতরণ করলেন মুনিম খাঁ। স্থানীয় দরগায় সিন্নি পাঠালেন। প্রত্যেক সৈন্য-শিবিরে মিষ্টান্ন, মদ ও মোহর বিলোবার হুকুম দিলেন।

শুধু সতর্ক করে দিলেন সবাইকে এই বলে যে, 'এখনও শত্রু ধরা দেয় নি, এখনও বেইমানী করার ঢের সুযোগ আছে। বেসামাল হয়ো না কেউ—হুঁশিয়ার!'

॥ ২৮ ॥

পরের দিন প্রভাতে দুর্গদ্বার খোলা হতে প্রথমেই সাদা ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে বেরিয়ে এলেন দায়ুদ কররাণী। দেহ সোজা, মাথা উঁচু, দৃষ্টি তাঁর সামনের দিকে শূন্যে নিবদ্ধ, ললাটে সামান্য একটু ভ্রূকুটি।

তিনি বেরিয়ে একপাশে সরে দাঁড়ালেন—মঘুলসৈন্যরা দূর থেকে ঘিরে রইল তাঁকে।

দায়ুদ তখনই যেতে রাজী নন, তিনি চান তাঁর সামনেই শর্ত পালিত হোক, মুঘলরাও চায় না তিনি কোন কৌশলে সেই সঙ্গে পালিয়ে যেতে পারেন কেউই কাউকে বিশ্বাস করে না।

দায়ুদ সরে দাঁড়াতেই পিছনে পিছনে বেরিয়ে এল ভেলভেটের ঘেরাটোপ দেওয়া অসংখ্য শিবিকা। তার পিছনে ঘোড়া, খচ্চর এবং বলদের পিঠে পুরনারীদের বস্ত্র, অলঙ্কার এবং ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্র।

শেষ শিবিকা ও শেষ বলদ বেরিয়ে যাবার পর দায়ুদ ঘোড়ার মুখ ঘোরালেন—মুঘল-শিবিরের দিকে। দশজন মাত্র দেহরক্ষী তাঁর সঙ্গে, তাও নিরস্ত্র। সুদ্ধমাত্র দায়ুদের কোমরবন্ধেই একটি তরবারি আছে—খাপে ঢাকা।

তাঁর ললাটের সেই সামান্য ভ্রূকুটিটাও মিলিয়ে গেছে—প্রশস্ত ও প্রশান্ত ললাটে নেমেছে একটা নির্বিকার নির্লিপ্ততা। কিছুতেই যেন কোন ঔৎসুক্য নেই তাঁর—পৃথিবীর কোন কিছুতেই যেন আর তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না—পারবে না কেউ কোন আঘাত হানতে। আসলে জীবন সম্বন্ধেই যেন কোন ঔৎসুক্য বা আসক্তি নেই।

মহামান্য খান-ই-খানান সেদিন দিল্লীশ্বর আকবর শা'র প্রতিনিধিরূপে দরবার দিয়েছেন। বিরাট তাঁবুতে বসেছে সেই দরবার। সেখানেই গিয়ে আনুগত্য স্বীকার করতে হবে দায়ুদকে। তাঁবুর বাইরে ঘোড়া থেকে নেমে নতমস্তকে অভিবাদন করতে করতে এগিয়ে এলেন দায়ুদ কররাণী, তারপর খাপসুদ্ধ তলোয়ারটি খুলে মুনিম খাঁর পায়ের কাছে সিংহাসনের সামনে রেখে দিলেন।

উৎসবের সুর সকলেরই প্রাণে লেগেছে কাল থেকে—মায় মুনিম খাঁরও। এতক্ষণে তিনি বেশ প্রফুল্লই ছিলেন—কিন্তু কে জানে কেন এখন দায়ুদ খাঁকে দেখার পরই তাঁর মুখ মেঘের মত অন্ধকার হয়ে উঠল, দৃষ্টি হল ভ্রূকুটিবদ্ধ।

খানিকক্ষণ নিঃশব্দে দায়ুদের দিকে তাকিয়ে থেকে অকস্মাৎ কঠিন কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন মুনিম খাঁ—'যে রমণীর আঁচলের তলায় ওড়নার আড়ালে সেদিন আত্মরক্ষা করেছিলে মহাবীর দায়ুদ খাঁ কররাণী—তাকে কোথায় রেখে এল? তোমার ভূতপূর্ব উজীরের সেই বাঁদীকে?'

চমকে উঠলেন দায়ুদ খাঁ। আর যাই হোক, সকল রকম শিষ্টাচার-বিরোধী এই শ্রেণীর সম্ভাষণ বা প্রশ্নের জন্য তিনি ঠিক প্রস্তুত ছিলেন না।

উপস্থিত সভাসদ্‌রাও সকলে বিস্মিত হলেন। এ ধরনের প্রশ্ন কেউই আশা করেন নি। টোডরমল তাঁর আসন থেকে সামান্য উঠে আবার কতকটা হতাশ ভাবেই বসে পড়লেন। তাঁর চঞ্চলতা তাঁর অস্থির ভাব চাপা রইল না। কিন্তু বলতে পারলেন না কিছুই। মুনিম খাঁ তাঁর উপরওয়ালা। কথা বলবার মালিক তিনিই।

দায়ুদ খাঁ চমকে একবার মাত্র মাথা তুলেই আবার মাথা হেঁট করেছিলেন। তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

মুনিম খাঁ উত্তরের জন্য কয়েক মুহূর্ত অপেক্ষা করে যেন রোষে ফেটে পড়লেন।

'কী, প্রশ্ন শুনতে পাও নি আমার? এ কী বেয়াদবি! জবাব দাও।'

'আমি জানি না জনাব।'

'মিথ্যা কথা'। গর্জন করে উঠলেন মুনিম খাঁ—খান-ই-খানান।

মুহূর্তে দায়ুদ খাঁ কররাণীর দুই চোখ জ্বলে উঠল। আরক্ত হয়ে উঠল চোখ মুখ। অভ্যস্ত হাত—বোধ করি বা তরবারির খোঁজেই—কোমরবন্ধের দিকেও গেল একবার। তারপরই আবার—বর্তমান অবস্থায় ক্রোধ ক্ষোভ অভিমান কোনটারই কোন মূল্য নেই বুঝে—অসহায় ভাবে একবার উপস্থিত সকলের দিকে তাকিয়ে মাথা নামিয়ে নিলেন। শুধু দুর্বার ক্রোধে দুই রগের শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠতে লাগল, দপদপ করতে লাগল মাথার মাঝখানটা—অসহ একটা আক্রোশ ও জিঘাংসা মাথা কুটতে লাগল বুকের মধ্যে। কিন্তু আজ তিনি পরাজিত, শত্রুকরতলগত, অপরের দয়ার ভিখারী। আজ বুঝি প্রতিবাদ করার এতটুকু ক্ষমতা নেই তাঁর, এ বেয়াদবির যোগ্য প্রত্যুত্তর তো দূরের কথা।

আজ তাঁর মত হতভাগ্য বুঝি আর-কেউ নেই।

তবু তিনি উত্তর দিলেন শেষ পর্যন্ত।

অবশ্য তার আগে অনেকক্ষণ সময় লাগল তাঁর এ অপমান সামলে উঠতে।

তারপর দৃপ্ত দুই চোখ মুনিম খাঁর চোখের ওপর রেখে কম্পিত কণ্ঠে উত্তর দিলেন, 'মিথ্যা কথা বলার অভ্যাস তো এখনও পর্যন্ত করি নি জনাব, তবে আপনার কাছে তালিম পেলে হয়ত চেষ্টা করে দেখতে পারি।

অস্ফুট, অতি মৃদু হলেও স্পষ্ট একটা বাহবার তরঙ্গ বয়ে গেল উপস্থিত মুঘল সভাসদ্‌দের ওপর দিয়ে।

বাহবা বা! এই তো সুলেমান কররাণীর ছেলের যোগ্য উত্তর।

কিন্তু মুনিম খাঁর দুই চোখ রক্তবর্ণ ধারণ করল, দুই হাত হয়ে উঠল মুষ্টিবন্ধ। এমনই বজ্রমুষ্টি যে নিজের নখ নিজের করতলে চেপে বসে রক্তপাতের কারণ ঘটাল।

তিনি আবারও গর্জন করে উঠলেন, 'এত বড় গুস্তাকি তোমার! কোথায়

কার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে তা জান না।'

তখন দায়ুদ কররাণীও মরীয়া !

তিনি মাথা তুলেই জবাব দিলেন, 'জানি। আমার প্রতিদ্বন্দ্বী জালালুদ্দীন আকবর শার এক ভৃত্যের সামনে।'

মাথাটা যে আর কোনমতেই বাঁচানো সম্ভব নয়—তা সবাই বুঝল।

মুনিম খাঁ থরথর করে কাঁপতে লাগলেন রাগে। সে উষ্মা দমন করে কণ্ঠস্বরকে সক্রিয় করে তুলতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তাঁর !

একটু সামলে নিয়েই তিনি ডাকলেন, 'দিলাওয়ার খাঁ !'

'জী জনাব !' দিলাওয়ার খাঁ সামনে এসে দাঁড়ালেন।

'এই বেতমিজকে এখনই বধ্যভূমিতে নিয়ে যাও। এর প্রাণদণ্ড দিলাম আমি।'

আবারও একটা চাঞ্চল্যের ঢেউ উঠল উপস্থিত সভাসদদের মধ্যে।

নিঃশব্দ সে চাঞ্চল্য, তবু তার সে স্ফীতি টের পেলেন মুনিম খাঁও। তার ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টি আরও কঠিন হয়ে উঠল। স্পষ্ট বিরোধিতা ও ঔদ্ধত্য সে দৃষ্টিতে।

টোডরমল এবার উঠে দাঁড়ালেন।

'কিন্তু জনাব—'

'বলুন রাজা সাহেব।' শান্ত শীতল—ইস্পাতের ফলার মতই শানিত কণ্ঠ মুনিম খাঁর।

'এত তাড়াতাড়ি এ কাজটা করা কি উচিত হবে—বিশেষ যখন দায়ুদ কররাণী আমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন ?'

'আমার উচিত অনুচিত আমাকে বুঝতে দিন রাজা সাহেব।···শাহেন-শাহকে কৈফিয়ত দিতে হয় আমিই দেব। দায়ুদ কররাণী আত্মসমর্পণ করলে আমরা তার প্রাণ ভিক্ষা দেব—যতদূর মনে পড়ে—এমন কোন শর্ত আমরা করি নি। যাদের মুক্তি দেবার শর্ত করেছিলাম—তাদের মুক্তি দিয়েছি।'

টোডরমল মাথা হেঁট করে বসে পড়লেন আবার। অপমানে তাঁরও মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় কী ? এ অপমান তিনি প্রায় ইচ্ছা করেই, মাথা বাড়িয়েই নিতে গিয়েছিলেন।

দায়ুদ একবার সকৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে তাঁর দিকে চেয়ে আবার মাথা হেঁট করলেন—কিন্তু এবার আর তাঁর দাঁড়াবার ভঙ্গীতে কুণ্ঠা বা সংকোচ নেই—আছে চরম তাচ্ছিল্য ও অবহেলা। শুধু যেন অনভিপ্রেত লোকের মুখ দেখতে হবে বলেই মাথা ও দৃষ্টি হেঁট করেছেন—দয়া কি করুণাপ্রার্থী হিসেবে নয়।

'দিলাওয়ার খাঁ, আমার আদেশ শুনতে পাও নি ? অপেক্ষা করছ কিসের জন্য ?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করেন মুনিম খাঁ।

'জী জনাব।'

দিলাওয়ার খাঁ এগিয়ে আসেন দায়ূদ কররাণীর দিকে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই—অকস্মাৎ দরবারের প্রবেশ-পথে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। উপস্থিত সভাসদ ও সেনানীরা যেন সসম্ভ্রমে দু ভাগ হয়ে গিয়ে কাকে পথ দিচ্ছেন।

মুনিম খাঁ বিস্মিত হয়ে চেয়ে দেখলেন। আর দেখার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে দাঁড়ালেন।

'বেটী!'

টোডরমল তাকিয়ে দেখলেন—সেই দেবী।

মুঘল সেনানীরাও চিনল, পূর্বের দেখা সেই দিওয়ানা সন্ন্যাসিনীকে, তুকারয়ের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণা দায়ূদের ত্রাণকর্ত্রীকে।

বিস্ময়ের গুঞ্জন উঠল সভাকক্ষে। তারই মধ্য দিয়ে নফিসা সিংহাসনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করল মুনিম খাঁকে।

'জনাব, আমার একটা আর্জি আছে। ততক্ষণ দিলওয়ালার খাঁকে একটু অপেক্ষা করার আদেশ দেবেন?'

স্পষ্ট বাচনভঙ্গী। কণ্ঠস্বরেও কোন জড়তা নেই। আর্জি বলল বটে কিন্তু বলার ভঙ্গীতে প্রার্থীর দীনতা ফুটল না।

তার দিকে তাকিয়ে ইতিমধ্যেই কোমল হয়ে এসেছে মুনিম খাঁর দৃষ্টি, মুখ হয়ে উঠেছে হর্ষোৎফুল্ল, উজ্জ্বল।

বল বেটী, বল কী চাও। দিলওয়ার খাঁ, একটু দাঁড়াও।'

এই বালিকাটি সম্বন্ধে খান-ই-খানানের অত্যধিক উৎকণ্ঠা ও ঔৎসুক্য নিয়ে যারা বিদ্রূপ করত, তারা সবাই বিস্মিত হল 'বেটী' সম্বোধনে। ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারল না—শুধু নীরব কৌতূহলে ঘাড় তুলে তাকিয়ে রইল সবাই।

'জনাব, আফগানদের বিরুদ্ধে মুঘলদের অভিযানে মুঘলপক্ষকে সামান্য কিছু সহায়তা করার সৌভাগ্য এই ভিখারিণীর হয়েছিল—আশা করি তা ভুলে যান নি!'

'না, ভুলি নি নফিসা। তুমিই শাহেনশাহ্‌কে পরামর্শ দিয়ে হাজীপুর কিলায় আগুন ধরিয়েছিলে, যার ফলে বিনাযুদ্ধে আমরা পাটনা দখল করতে পেরেছি, পাঠানদের প্রভূত ক্ষতি হয়েছে। তুমিই তিনপাহাড়ের গিরিবর্ত্মে আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিলে পাঠানবাহিনীর পিছনে, তার ফলে সেবারেও বিনাযুদ্ধে আমরা জিতেছি। আবার মেদিনীপুরের জঙ্গলেও তুমিই আমাদের পথ দেখিয়েছ, তুকারয়ের যুদ্ধেও প্রচুর সহায়তা করেছ আমাদের, শুনেছি গুজর খাঁও তোমারই শরে নিহত হয়েছেন। তোমার কাছে আমাদের মুঘলবাহিনীর অনেক ঋণ, তা আমি জানি। অবসর পেলেই একথা দিল্লীশ্বরকেও জানানো হবে—বেটী, আমাদের তরফ থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের কোন ত্রুটি হবে না। তবে পুরস্কৃত করার মালিক শাহেনশাহ্‌

আকবর বাদশা।'

'দিল্লী হানোজ দূরস্ত্ জনাব। দিল্লীশ্বর বহুদূরে, আপনি সামনে। আপনিই আমাদের কাছে তাঁর প্রতিনিধি। আমি আপনার কাছেই সামান্য একটি পুরস্কার চাইছি। আজ অবধি চাইনি—কথা দিচ্ছি, আর কখনও চাইব না।'

'বল কী চাও?'

'এই দায়ুদ কররাণীর মুক্তি। ওকে নিরাপদে চলে যেতে দিন জনাব—এবারের মত। যদি আবার কখনও আপনাদের বিরোধিতা করে—যা খুশি তাই করবেন—আমি কিছু বলব না।'

অকস্মাৎ মুনিম খাঁর সামনে যেন বজ্রপাত হল।

যখন দিলওয়ার খাঁকে অপেক্ষা করতে বলেছিল নফিসা, তখনও এটা আশঙ্কা করেন নি তিনি। বরং উল্টো বুঝেছিলেন। ভেবেছিলেন নিজে হাতে ওর প্রাণবধ করতে চায় বলেই সাধারণ ঘাতকের হাতে ছেড়ে দিতে ওর আপত্তি।

এ কী বলছে নফিসা, ওর কি মাথা খারাপ হয়ে গেল!

তিনি ব্যাকুল হয়ে বললেন, 'না না নফিসা, এ কী বলছ! তা হয় না।'

'আপনি আমাকে পুরস্কার দিতে বাক্যবন্ধ হয়েছেন জনাব।'

নফিসার কণ্ঠস্বর অকম্পিত ঠিক না হলেও অনেকটা শান্ত।

'কিন্তু—কিন্তু বেটী—এই পিশাচটা মিয়া লুদীর হত্যাকারী। তাঁকে অন্যায় করে, বিশ্বাসঘাতকতা করে বধ করেছিল।' ছেলেমানুষের মতই বলে ওঠেন খান-ই-খানান।

'জানি জনাব। তবে এ-ও জানি তিনি জীবিত থাকলে তাঁর প্রভুপুত্রকে তিনি ক্ষমাই করতেন।'

মুনিম খাঁ বিমূঢ় দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন। সভাসদ্রাও সকলে হতচকিত, বিস্ময়চঞ্চল।

কেবল টোডরমল উঠে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করলেন, কিন্তু নফিসা বেগমের কোন পুরস্কার আছে কিনা জনাব ভেবে দেখা দরকার সেটা। মুঘলবাহিনীকে সে কয়েকবার সাহায্য করেছে তা আপনার মুখে শুনলাম বটে, কিন্তু তুকারয়ের যুদ্ধে আমাদের শত্রুপক্ষকে রক্ষা করেছে সেটাও আমরা চোখে দেখেছি।'

নফিসা তাঁর দিকে ঘুরে দাঁড়াল। স্থির-নেত্রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বলল, 'সেটা বেইমানীর পর্যায়ে পড়ে কি রাজা সাহেব। আমি মুঘলদের বেতন-ভুক নই। যখন ভাল মনে করেছি সম্মুখযুদ্ধে প্রতিপক্ষের দিকে গিয়ে দাঁড়িয়েছি, প্রকাশ্যভাবে। তাতে মুঘলদের যে উপকারগুলো আগে করেছি তার মূল্য শোধ যায় না।'

মুনিম খাঁ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নফিসার মুখের দিকে চাইলেন। বললেন, 'বেশ তো—এখন না হয় আমরা ওকে বন্দী করেই রাখছি—

প্রাণদণ্ড না হয় না-ই বা দিলাম।'

'না জনাব। ওঁর মুক্তিই আমি চেয়েছি। এ-ই আমার পুরস্কার—আমার কাজের মজুরি। তার কম নিতে আমি রাজী নই।'

আবারও অসহায় ব্যাকুলভাবে সভাসদদের দিকে চান মুনিম খাঁ।

'আপনারা কী বলেন? রাজা টোডরমল, আপনার কী পরামর্শ?'

মুনিম খাঁর মুখের দিকে চেয়ে বুঝি করুণাই হয় রাজা সাহেবের। তিনি বলেন, 'আপনার কর্তব্য আপনিই বুঝবেন। শাহেনশার কাছে কৈফিয়ত দেবার জিম্মাদারও আপনি। তবে—ন্যায়ত এ মেয়েটি যা চাইছে তা চাইতে পারে বইকি জনাব।'

'বেশ, তাই হোক।' একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলেন মুনিম খাঁ, 'তোমার ঋণ তোমার মূল্যেই আমরা শোধ করলাম বেটী।·· দায়ুদ খাঁ কররাণী, আপাতত তুমি মুক্ত। তুমি এখনই এ দরবার ত্যাগ করতে পার। যত শীঘ্র সম্ভব এই এলাকা ছেড়ে চলে যাবে তুমি এবং আর কখনও দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধাচরণ করবার ধৃষ্টতা প্রকাশ করবে না—তোমার কল্যাণের জন্যই এই আশা আমরা পোষণ করব।···দিলওয়ার খাঁ, ওঁদের পথ দেখিয়ে শিবিরের দ্বার পর্যন্ত পৌঁছে দাও। প্রহরীদের বলে দাও কেউ যেন না ওঁদের কোন রকম বাধা দেয়। শুধু আমাদের না লোকসান করতে পারে—এইটুকু নজর রাখবে।'

দায়ুদ খাঁ ও তাঁর দশজন দেহরক্ষী অনুচর দরবার তথা মুনিম খাঁকে নীরবে অভিবাদন জানিয়ে কুর্নিশ করে পিছু হঠতে হঠতে বেরিয়ে গেলেন সেখান থেকে, নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে।

যাবার আগে দায়ুদ খাঁ একবার ফিরে চেয়েছিলেন নফিসার দিকে, কিন্তু নফিসা তখন অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে—চোখে চোখ মিলল না।

যতক্ষণ না ওঁরা দরবারের বাইরে চলে গেলেন—স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল নফিসা। তারপর সেও একটা অভিবাদন করে সভা ত্যাগ করতে উদ্যত হল।

ব্যাকুল হয়ে উঠলেন মুনিম খাঁ। স্থান-কাল-পাত্র সব ভুলে সিংহাসন থেকে নেমে দাঁড়ালেন।—'ও কী, তুমি কোথায় যাচ্ছ বেটী? না না, তুমি যেও না। তোমাকে যে আমার বড় দরকার!'

'মাফ করবেন জনাব।' কেমন এক রকম করুণভাবে স্খলিত ভগ্ন কণ্ঠে উত্তর দেয় নফিসা, 'আমার কিছুদিনের জন্য লোকালয়ের বাইরে, মানুষের সমাজের বাইরে যাওয়া বড় দরকার। বিস্তর অপরাধ জমে উঠেছে খোদার কাছে—কিছুদিন অন্তত নির্জনে বসে তার প্রায়শ্চিত্তের চেষ্টা করা দরকার।'

'কিন্তু বেটী, তোমার কাছেও যে আমার বহু অপরাধ জমে আছে! আমিই—আজ এই প্রকাশ্য দরবারে ঘোষণা করছি—আমিই তোমার পিতা। এই বৃদ্ধ বয়সে আমার কাছে দুটো দিন থেকে আমার স্তূপীকৃত অন্যায়ের একটু

প্রায়শ্চিত্ত করতে দেবে না আমাকে ?'

যেন চমকে উঠল নফিসা। যেন একবার ব্যাকুলভাবে তাকিয়ে দেখল মুনিম খাঁর মুখের দিকে, ক্ষণিকের জন্য বুঝি একটা লোভের আলোও খেলে গেল মুখে চোখে—কিন্তু তারপরই, হয়ত বা নিজের অন্তরের প্রশ্ন ও অনুনয়ের উত্তরেই—সবেগে ঘাড় নেড়ে বলল, 'কন্যার কাছে পিতার কোন অন্যায় কোনদিন হতে পারে না বাপজান।···আর তাছাড়া আমি আপনার সেবার যোগ্যও নই,—তাই অভাগিনী কন্যার অক্ষমতা বুঝে আমাকে ক্ষমা করবেন। আদাব বাপজান, বন্দেগী রাজাসাহেব!'

স্তম্ভিত বিমূঢ় মুনিম খাঁ আর কোন কথা কইবার কি বাধা দেবার আগেই নফিসা তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে দরবার থেকে বেরিয়ে গেল।

॥ ২৯ ॥

এতদিনের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও সহজাত বুদ্ধি বার বার বলতে লাগল—'পালাও, পালাও। এখানে আর এক মুহূর্ত নয়—শত্রুর সংস্পর্শ থেকে যত দূরে যেতে পার ততই মঙ্গল। অসহায় নিঃসম্বল অবস্থা তোমার—আত্মরক্ষার বিন্দুমাত্র শক্তি নেই—সুতরাং যত দ্রুত সম্ভব এই প্রবল শত্রু আর তোমার মধ্যে সুদূর ব্যবধান রচনা কর। আজকের সূর্য অস্ত যাবার আগে অন্তত শত যোজন দূরত্বে পৌঁছনোই বুদ্ধিমানের কাজ। মানুষের মন না মতি, বিশেষত শত্রুর মতি পরিবর্তিত হতে কতক্ষণ!'

অনুচর সঙ্গীরাও তাই বোঝাতে লাগল।

অনুনয়—মিনতি করতে লাগল বার বার।

বহুদিনের বিস্বস্ত সেবক তারা—তারা তাঁর কল্যাণই কামনা করে। বহুদিনের অভিজ্ঞও বটে; তাদের কথা শোনা শ্রেয় শুধু নয়—উচিতও।

তবু তখনই কটক ছেড়ে বহুদূরে যেতে পারলেন না দায়ুদ কররাণী।

কেন পারলেন না—সে কারণটা বোধ করি তাঁর কাছেও স্পষ্ট নয়। সকল অভিজ্ঞতা, সকল যুক্তিতর্ক, সকল বুদ্ধি-বিচারের অতীত যে একটা বস্তু প্রত্যেক মানুষের বুকে গোপনে বাস করে—যাকে হৃদয়াবেগ বলে বর্ণনা দেবার চেষ্টা করেছেন কবি ও কোবিদরা—তারই অমোঘ আর অলঙ্ঘ্য আকর্ষণ তাকে দুর্নিবার বলে ধরে রাখল কটকের অনতিদূরচর সীমারেখায়—কিছুতে কোন-মতে তার সে অদৃশ্য শক্তিকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না—হৃত-সিংহাসন, হৃতসর্বস্ব সুলতান দায়ুদ খাঁ।

তাই দিনের আলোকে শহরের সীমানা ত্যাগ করলেও অপরাহ্নের আবছায়া ঘনিয়ে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই ফিরে এলেন।

ওঁর দেহরক্ষীরা সকলে চলে যায় নি—উৎকণ্ঠিত চিত্তে মুঘল শিবিরের

বাইরে দাঁড়িয়ে প্রভুর ভাগ্য-পরীক্ষার ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছিল। দায়ুদ মুঘল শিবির থেকে বেরিয়ে আসা মাত্র ঘিরে দাঁড়াল তারা। কিন্তু না সেই মৃত্যু-পথযাত্রার বান্ধব আর না এই দেহরক্ষীর দল—কাউকেই সে পুনর্গমনের পথে সঙ্গে নিলেন না তিনি। সকলের সম্মিলিত উপরোধ অনুরোধ সতর্কবাণী উপেক্ষা করে—নদীতীরের নিবিড় জঙ্গলে তাদের অপেক্ষা করতে বলে—একাই ফিরে এসে ঢুকলেন শহরে।

রাজপথ ধরে নয় অবশ্য—কাঠজুড়ির সুপ্রাচীন জনবিরল বাঁধের ওপর দিয়েই শহরের সীমানায় প্রবেশ করলেন তিনি। কেমন যেন তাঁর মনের মধ্যে কে বলতে লাগল যে সেও শহর ছেড়ে চলে যায় নি এখনও—যাকে তাঁর সমস্ত মনপ্রাণ—সমস্ত সত্তা খুঁজছে। এই নির্জন নদীতীরেই কোথাও হয়ত শ্রান্তদেহে অবসন্ন-মনে বসে আছে।

হয়ত—

না, আর যে 'হয়ত'টা অনুমান করতে মন চাইছে—হয়ত তাঁর জন্যই অপেক্ষা করছে সে—এতটা অনুমানের সাহস তাঁর নেই।

চৈত্রের শেষে কাঠজুড়ির বিস্তৃত চড়া ধু-ধু করছে—নির্জন, নিঃসঙ্গ, নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে এক-একবার দমকা দক্ষিণা বাতাসে ছোটখাট বালির ঝড় উঠছে বটে কিন্তু তার শব্দ নেই, অন্তত এতদূর আসে না সে শব্দ। শুধু একটা অসহ্য তাপ ভেসে আসছে সেই আতপ্ত হাওয়ায়—সারাদিনের নির্মেঘ আকাশের বহ্নি-ইতিহাস বহন করে।

তারই মধ্য দিয়ে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলেন দায়ুদ—ক্লান্ত, মন্থর, আপাত-উদ্দেশ্যহীন গতিতে। তখনও পর্যন্ত অস্নাত, অভুক্ত—সকাল থেকে মুখে এক বিন্দু জলও দেবার অবসর মেলে নি। ঘোড়ার পিঠে চামড়ার সুরাপাত্র সর্বদা ভর্তি থাকে—কিন্তু একবারে খালিপেটে সুরাপান করতে রুচি হয় নি। ফলে দেহ এমনিতেই ভেঙে পড়বার কথা—তার ওপর সারাদিন ধরে তাঁর ওপর দিয়ে যে ঝড় বয়ে গেছে তাতে পা দুটোর যে এখনও পর্যন্ত এতটুকু বহন-ক্ষমতা আছে—সেইটাই বিস্ময়ের কথা!

সুদূরে নদীপারের গহন অরণ্যে সূর্য নেমে পড়েছেন বহুক্ষণ। ঠিক অস্ত না গেলেও বেলা আর নেই। ফলে ওপারে এপারের সুবিস্তীর্ণ চড়ায় এবং বাঁধে একটি সুস্নিগ্ধ ছায়া নেমে এসেছে কিন্তু একেবারে অন্ধকার হতে এখনও কিছু দেরি। সেই ম্লান আলোতে ক্লিষ্ট চোখ দুটি প্রাণপণে মেলে বাঁধ এবং বাঁধের পাশের ঝাউ ও শালবন দেখতে দেখতে চললেন দায়ুদ। যাকে খুঁজছেন তার মুখের পূর্ণ বর্ণনা আজও দিতে পারবেন না তিনি, এখনও ভাল করে তাকে দেখাই হয় নি। কিন্তু তবু তার উপস্থিতি তিনি সহস্র লোকের ভীড়েও টের পাবেন—সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

যদি শেষ পর্যন্ত দেখা না পান?

তাহলে কী করবেন তা এখনও জানেন না। ঠিক ভাবতেও পারছেন না,

অথবা মন চাইছে না ভাবতে ; সে সম্ভাবনাটা মনের কোণে আড়ালে উঁকি মারার সঙ্গে সঙ্গেই ঠেলে সরিয়ে দিচ্ছেন দু হাতে। দেখা যে তাঁকে পেতেই হবে। নইলে—

নইলে হয়ত শেষ পর্যন্ত ফিরে যাবেন—আর ফিরতেই তো হবে—কিন্তু, না না, দেখা তিনি পাবেনই।

ক্লান্ত পা দুটোকে যেন চাবুক মেরে সক্রিয় করে তোলেন দায়ুদ, অর্ধমুদিত চোখ দুটো বিস্ফারিত করেন জোর করে—

ধু-ধু রুক্ষ বালির চড়ায় একটা কুকুর হেঁট হয়ে কী খুঁজছে, হয়ত শুকনো শুঁটকী মাছ অথবা আর কোন খাদ্য। এ ছাড়া ওদিকে জনপ্রাণী নেই। এদিকেও দীর্ঘ বাঁধের যতদূর পর্যন্ত দৃষ্টি যায়—দু-একটা ছাগল কি গোরু এবং গাছের ডালে দু-একটা বানর ছাড়া অন্য কোন প্রাণীর চিহ্নমাত্র দেখা যাচ্ছে না। তাই সাবধানে বাঁধের ধারে ছায়ান্ধকার গাছতলাগুলোই দেখতে দেখতে চললেন দায়ুদ খাঁ।

অবশেষে এক সময় তাঁর এই সাধনা পুরস্কৃত হল। একটা বড় কাঁঠাল-গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে কে যেন বসে আছে! দূরে—অনেক দূরে, ভাল করে দেখা গেল না মানুষটাকে, এমন কি অন্য লোকের ক্ষেত্রে হয়ত পুরুষ না স্ত্রী তা-ই সন্দেহ উপস্থিত হত—কিন্তু দায়ুদের আর কোন সংশয় রইল না।

যা দেখার তিনি দেখে নিয়েছেন।

তাঁর আশা বা অনুমান কোনটাই বিফল হয় নি।

দরবারী তাঁবুর বাইরে নফিসা বেগমেরও ঘোড়া প্রস্তুত ছিল, সুদক্ষ শিক্ষিত ঘোড়া—তাই সভাস্থ সকলের বিস্ময়-বিমূঢ় অবস্থা বা বিহ্বলতার সামান্য সুযোগেই সে নিরাপদে ও প্রায়-সবার-অলক্ষ্যে মুঘল অধিকারের বাইরে চলে যেতে পেরেছিল। তার পক্ষে এই বাকী দুই প্রহর সময়ে আরও বহুদূর চলে যাবার কথা।

কিন্তু সেও তা পারে নি।

আর কেন পারে নি—তা সেও জানে না।

কিসের জন্য অপেক্ষা করছে সে, কার জন্যে?

এ প্রশ্ন যেন নিজেকে করবার সাহস নেই তার।

তার জীবনের ব্রত সফল না হলেও সমাপ্ত।

আর এখানে বা যুদ্ধবিগ্রহ হানাহানির মধ্যে তার থাকবার কোন প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই তার লোকালয়ে। কোথাও কোন নির্জন অরণ্যে, মানুষের দৃষ্টির বাইরে বসে অনুতাপের অশ্রুজলে এই পাপ, এই কালিমা ধুয়ে না ফেলা পর্যন্ত স্বস্তি নেই তার—শান্তি নেই। তাছাড়া—একবার খোদার সঙ্গেও মুখোমুখি দাঁড়াতে চায় সে। তার জীবন নিয়ে, তাকে নিয়ে এই ছেলেখেলা করার একটা কৈফিয়ত চায়। কেন, কেন এমন করবেন তিনি—কোন অধিকারে। তার জন্ম থেকেই শুধু তার অদৃষ্টে বিড়ম্বনা লিখে

রেখেছেন তিনি কেন ?

কিন্তু সৃষ্টিকর্তার, ঈশ্বরের সামনে দাঁড়াতে হলেও—সবাইকে ছেড়ে, সব ছেড়ে নির্জনে যাওয়া দরকার।

অথচ—অবাধ্য পা দুটো কিছুতেই যেন যেতে চাইছে না। অথবা মনের তাগিদ নেই বলেই পা দুটোর এত সাহস।

কী আছে এখানে ? আরও কিসের প্রত্যাশা তার ?

এ প্রশ্নের জবাব পায় নি সে সারাদিনেও—অথচ এখান ছেড়ে যেতেও পারে নি।

সবার অলক্ষ্যে চলে এসেছে শুধু এই জনবিরল নদীতীরে। আর কিছু না হোক—নিজেকে নিয়ে থাকতে পারবে সে এখানে। এধারে মানুষের যাতায়াত কম, যদিই বা কেউ এসে পড়ে—তাকে চিনবে না, বিব্রতও হতে হবে না পরিচিত দৃষ্টির সামনে পড়ে—

বেলা দ্বিতীয় প্রহর পার হবার আগেই এখানে পৌঁছেছে সে—তারপর থেকে ঠিক একভাবে—এই একই গাছতলায় বসে আছে। কোথাও নড়ে নি। ঘোড়া ছেড়ে দিয়েছে বাঁধে ওঠবার আগেই, লোকালয়ের ধারে। যাক যেখানে খুশি ; যার খুশি ধরে নিক। আর ওতে দরকার নেই তার। যেখানে হোক এই পা দুটোই টেনে নিয়ে যেতে পারবে—এখন আর কোন তাড়া তো নেই।

শেষ-চৈত্রের সূর্য তাপ চারপাশে অগ্নিবৃষ্টি করেছে সারাদিন ধরে—তৃতীয় প্রহর পার হবার সঙ্গে সঙ্গে গাছের ছায়া সরে গেছে মাথার ওপর থেকে—রোদ এসে পড়েছে ওর গায়ে, মুখে, মাথায়। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ করে নি সে, হয়ত বুঝতেও পারে নি। যেমন একদৃষ্টে কাঠজুড়ির বিস্তীর্ণ বালুময় চড়ার মধ্যেকার ক্ষীণ স্রোত-রেখাটির দিকে নিমেষহীন দৃষ্টিতে চেয়ে বসেছিল—তেমনিই রইল।

কেন সে ক্ষমা করল—না, ক্ষমা সে এখনও করেনি—রক্ষা করল তার মালিকের হত্যাকারীকে—এই প্রশ্নটাই বার বার করতে চাইছে সে।

সে কি শুধু দয়া ? শুধু অনুকম্পা ?

না কি কৃতজ্ঞতা ?

সেদিন বীরভূমির সেই নিবিড় অরণ্যে সর্বনাশিনী শত্রুনারীকে হাতের মধ্যে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিল দায়ুদ খাঁ—সেই কৃতজ্ঞতা ?

অথবা অনুকম্পা-কৃতজ্ঞতার বাইরেও একটা কিছু আছে—যেটার কথা সেদিন থেকে কিছুতেই প্রত্যক্ষ চিন্তার মধ্যে আনতে সাহস করছে না নফিসা।

পশ্চিমাকাশের রক্তচ্ছটা-প্রতিফলিত কাঠজুড়ির গলিত স্বর্ণস্রোতের দিকে চেয়ে চেয়ে এই প্রশ্নই বার বার করতে থাকে নিজেকে।

দায়ুদ খাঁ কররাণী একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালেন।

আস্তে ডাকলেন, 'নফিসা !'

গলাটা আশ্চর্য রকম শুকিয়ে গেছে তাঁর। শব্দগুলো স্পষ্ট উচ্চারিত

হচ্ছে না—বিকৃত শোনাচ্ছে নিজের কানেই।

চমকে উঠল নফিসা। চমকে কেঁপে উঠল।

কেঁপে উঠল আবেগে নয়—ভয়ে।

সে ভয় ওর নিজেকেই।

ওর মনে হল—সামনে যে এসে দাঁড়িয়েছে সে বাস্তব কেউ নয়। এ ডাকও কল্পনা। একাগ্র একমনে যার কথা সে ভাবছিল যার ছবি সে এতক্ষণ স্পষ্ট দেখছিল ঐ নদীজলের স্বর্ণপটে—তাকে তার ক্লান্ত উত্তপ্ত মস্তিষ্ক কল্পনাই করছে চোখের সামনে।

তাই সে উত্তরও দিল না—দাঁড়ালও না। বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে রইল শুধু।

হয়ত তার মনের ভাব বুঝলেন দায়ুদ, হয়ত বুঝলেন না।

তিনি ওর পাশেই বসে পড়লেন—কাঁঠালগাছটার দুটো উঁচু-হয়ে-থাকা শেকড়ের মাঝখানে, কাঁকুরে কঠিন জমির ওপর। তারপর ধীরে ধীরে, যেন অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে, ওর স্খলিত শিথিল ডান হাতখানা নিজের দুই হাতে তুলে নিয়ে আবারও তেমনি কম্পিত, বিকৃত কণ্ঠে আস্তে ডাকলেন, 'নফিসা !'

ওঁর ঐ দীন কুণ্ঠিত ভঙ্গী, এই সসংকোচ আহ্বান—সর্বোপরি জন্মাবধি রাজসুখে অভ্যস্ত রাজ্যেশ্বরের এই কঠিন কঙ্করময় আসন গ্রহণ—সব জড়িয়ে অকস্মাৎ নফিসার চোখে জল এসে গেল ; অবাধ্য ঠোঁট দুটো নিরুদ্ধ কান্নায় কাঁপতে লাগল। প্রাণপণ চেষ্টাতেও উত্তর দিতে না পেরে মুখটা ফিরিয়ে নিল সে।

'নফিসা !' আবারও ডাকলেন দায়ুদ।

না, ভুল নয়। কল্পনা নয়। মনের একাগ্রচিন্তার ফলে বাইরের দৃষ্টি-বিভ্রান্তিও নয়।

যে অঘটন দৈবাৎ ঘটে মানুষের জীবনে এও তাই।

সত্যি সত্যিই দায়ুদ খাঁ কররাণী তার চোখের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, এখন পাশে বসেছেন। তিনিই ডাকছেন ওর নাম ধরে।

কিন্তু তাতে ও এমন শিউরে উঠল কেন ?

কেন হাত দুটো এমন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে ?

না, অস্বীকার সে করবে না। করতে চায় না—মনের সঙ্গে লুকোচুরি করার প্রয়োজন নেই তার—এতক্ষণ ধরে সমস্ত প্রশ্ন সমস্ত আত্মজিজ্ঞাসার ফাঁকে ফাঁকে অথবা সেইগুলো উপলক্ষ করেই—সে একমনে এই দায়ুদ খাঁর কথাই ভাবছিল, বিশ্বাসঘাতক বান্ধব-হত্যাকারী এই পাপিষ্ঠটার কথা।

ভাবছিল ঠিকই।

কিন্তু তবু এ আবেগ, এ মমতা তো থাকবার কথা নয়। এমন ভেঙে পড়বে কেন সে ? তাকে যে কঠিন হতে হবে।

তার মালিক। তার স্নেহময় মহান্ উদার মালিক।

লুদী মিয়াকে প্রাণপণ মনে আনবার চেষ্টা করে সে।

অস্পষ্ট, ঝাপসা-হয়ে-যাওয়া তাঁর চেহারাটাকে মনের পটে উজ্জ্বল করে তোলবার জন্য আকুল হয়ে ওঠে।

'নফিসা!' চতুর্থবার ডাকেন দায়ুদ খাঁ।

'বলুন।'

এবার উত্তর দেয় নফিসা। মুখও ফেরায় কিন্তু ওঁর দিকে নয়—সোজা নদীটার দিকেই।

আর একটু ছায়া ঘনিয়ে এসেছে ওপারের শ্যামল বনরেখায়। সূর্য আর একটু নেমেছেন পশ্চিম দিগন্তে। নদীর জলে আকাশের ছায়া ম্লান হয়ে এসেছে অনেকটা। সে সোনালী ঔজ্জ্বল্য যেন আর নেই।

খুব দ্রুত, জোর করে করে—মনকে চাবুক মেরে, যেন এইগুলো লক্ষ্য করে নফিসা।

'তোমাকে নিতে এসেছি নফিসা।'

'আমাকে—নিতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। নিতে এসেছি।'

'কোথায়?'

'তা জানি না। শুধু তোমাকে সঙ্গে রাখতে চাই। দিবারাত্রির সঙ্গী করে। পতনে উত্থানে দুঃখে সুখে জীবনে মৃত্যুতে—শুধু তোমার সঙ্গেই কাটাতে চাই—পরমায়ুর বাকী কটা দিন, তার প্রতিটি মুহূর্ত।'

এই যে লোকটা এমন মিষ্টি করে করে কথা বলছে, এমন অসহায়ভাবে ভিক্ষা চাইছে তার সঙ্গ, তার সাহচর্য—সে-ই মিয়া লুদী খাঁর হত্যাকারী! শঠ, বেইমান, বিশ্বাসঘাতক। শুধু তাই নয়—অকর্মণ্য অপদার্থ অসচ্চরিত্র।

ওর পক্ষে এ প্রস্তাব অসহনীয় ধৃষ্টতা। স্পর্ধা।

নফিসার বিরক্ত হয়ে ওঠাই উচিত এ প্রস্তাবে।

সে ভ্রূ কুঞ্চিত করে বলল, 'আপনি চান! ওঃ।···কিন্তু আমিও যে তাই চাই—এমনটা ভাবলেন কী করে জাঁহাপনা?'

দায়ুদের বুকে অনেকখানি আবেগ আর উচ্ছ্বাস—এই নির্জন সাহচর্যে, এই হাতের স্পর্শে—এবং নিজের কণ্ঠস্বরেও—ফেনিয়ে উঠেছিল আকণ্ঠ। হঠাৎ একটা ধাক্কা খেয়ে যেন সেটা স্তিমিত হয়ে এল।

সে মুহূর্ত কয়েক চুপ করে থেকে আরও দীন আরও কুণ্ঠিত ভাবে বললে, 'আমি এটা ভিক্ষাই চাইছি নফিসা। প্রার্থীর তো দাতার মনোভাব জেনে ভিক্ষা চাওয়ার কথা নয়!'

'কিন্তু সময়ে সময়ে ভিক্ষা চাওয়াও ধৃষ্টতা হয়ে পড়ে জনাব। প্রার্থীরও অধিকার-বিচার আছে। আপনার আর আমার মধ্যে দুস্তর ব্যবধান—লুদী মিয়ার রক্তের নদী বইছে এ দু পারের মাঝে। আপনার সাধ্য নেই সে উত্তপ্ত নদী পার হয়ে আমার কাছে পৌঁছান।'

'সে অপরাধ তুমি আজও ক্ষমা করতে পারনি নফিসা?'

স্খলিত কণ্ঠে প্রশ্ন করেন দায়ুদ খাঁ কররাণী।

'কোনদিনই পারব না জনাব। এ দেহ থাকতে নয়।'

'তবে—' ছেলেমানুষের মত ঝোঁক দিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন দায়ুদ, 'তবে কেন তুমি আমাকে বাঁচালে? কেন আমাকে রক্ষা করবার জন্য এত কাণ্ড করলে? আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত তো হয়েই যাচ্ছিল, তাতে বাধা দিলে কেন?'

একটু অভিমানও প্রকাশ পায় তাঁর কণ্ঠে—যে অভিমানের কোন দাবীই নেই তাঁর নফিসার ওপর। কোনকালে ছিলও না।

একঝাঁক কী নিশাচর পাখী ওদের মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেল ওপারের ঘনায়মান অন্ধকারের দিকে—নিঃশব্দগতির একটা তরঙ্গ তুলে।

সেদিকে চেয়ে নফিসা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইল, তারপর সেও ছেলেমানুষের মতই কৈফিয়ত দেবার সুরে বলল, 'আপনি একদিন আমাকে জীবনদান করেছিলেন—শত্রুকে হাতে পেয়েও ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেই ঋণই শোধ করেছি মাত্র! শত্রুর অনুগ্রহের ঋণ রাখতে চাই না বলেই। তার চেয়ে বেশি কিছু বলে মনে করার কোন কারণ নেই।'

কিন্তু সে তো—ঐ একদিন—যুদ্ধক্ষেত্রেই যথেষ্ট শোধ হয়ে গিয়েছিল নফিসা। বহুগুণ সুদসুদ্ধই শোধ হয়েছিল। একদিনের বদলে একদিন। আজ অবধি জের টানবার তো কোন প্রয়োজন ছিল না।'

তাই তো!…কোনই কি প্রয়োজন ছিল না?

প্রাণপণে জবাবটা খুঁজে বেড়ায় নফিসা মনের মধ্যে। বিস্মৃতির আঁধারে হাতড়াতে থাকে পাগলের মত—একবিন্দু আলো, একটুখানি কৈফিয়তের জন্য।

কোন কারণই কি ছিল না—দায়ুদকে আবার আজও এই নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাবার?

নফিসার ললাটে ঘাম দেখা দেয়। দায়ুদের হাতের মধ্যে যে হাতখানা এতক্ষণ ধরাই ছিল—সেটা বড় বেশী কাঁপছে দেখে ধরা পড়বার ভয়ে তাড়াতাড়ি টেনে নেয়।

কারণ একটা চাই। কৈফিয়ত এখনই দিতে হবে।…

সন্ধ্যা এখনও নামে নি, এখনও যথেষ্ট আলো আছে। তবু এখনই ওপারে শিবারব শোনা যাচ্ছে। কাঠজুড়ির বিস্তীর্ণ চড়া পেরিয়েও এপারে স্পষ্ট এসে পৌঁছুচ্ছে রব। সেই দিকে কান পেতে বসে থাকে নফিসা আর স্মৃতির দুয়ারে মাথা কোটে।

'নফিসা! কই, উত্তর দিলে না?'

অত্যন্ত কোমল শোনায় দায়ুদের কণ্ঠস্বর।

বোধ হয় একটু ক্ষীণ হাসির রেখাও ফুটে ওঠে তাঁর ক্লান্ত চোখ দুটিতে।

মনে পড়েছে। মনে পড়েছে।

মনে মনেই লাফিয়ে ওঠে নফিসা।

মনে পড়েছে সে কথাটা।

মুখটা ফিরিয়ে একান্ত চেষ্টায় কণ্ঠস্বরটা সহজ করবার চেষ্টা করে নফিসা, বলে—গলাটা অকারণেই একটু কেশে সাফ করে নিয়ে—'সে কারণও একটু ছিল বইকি জনাব। প্রাণের বদলেই প্রাণ দিয়েছি। যুদ্ধক্ষেত্রে আপনি যে মুঘল বালকটির প্রাণ রক্ষা করেছিলেন—সে কথাটা আমি ভুলি নি। তারই কিঞ্চিৎ শোধ দিয়েছি মাত্র। আপনাকে—আপনাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছি যে এ জগতে সৎকর্মের পুরস্কারও পাপের শাস্তির অনুপাতে কম নয়। একগুণ দিলে চারগুণ পাওয়া যায়।'

শেষের দিকে—কথাগুলো বলতে বলতে নিজের কাছেই খণ্ডসত্যটা পূর্ণসত্য হয়ে ওঠে, কণ্ঠে বিজয়গর্ব ফুটে ওঠে খানিকটা, খানিকটা আত্মপ্রসাদও।…

'প্রাণের বদলে প্রাণ! প্রাণ দিয়েছি! আমি?…সে কী? কার প্রাণ দিলাম? কী বলছ নফিসা?'

'মনে করে দেখুন। ঠিকই বলছি।'

তবুও বিহ্বলভাবে ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকেন দায়ুদ।—স্মৃতির ওপরের কালো পর্দাটা সরাবার চেষ্টা করেন মনে মনে।

পশ্চিম দিগন্তের সে রক্ত-ঔজ্জ্বল্য আর নেই। অনেকক্ষণ আঁধারের কালি মিশেছে তাতে। তার প্রতিফলিত আলোও হয়ে এসেছে ম্লান। তবু তারই ক্ষীণ আভাতে চোখের সামনেকার এই শুষ্ক, ক্লান্ত মুখখানাকে অপরূপ দেখাতে থাকে। সেদিকে চেয়ে বুঝি আরও গোলমাল হয়ে যায় সব—চিন্তার খেই যায় হারিয়ে।

কিন্তু নফিসাকে দেখে ওর কথা মনে পড়ে বলেই বুঝি শেষ পর্যন্ত সে কথাটাও মনে পড়ে যায়। সেদিনকার যুদ্ধক্ষেত্রের পৃষ্ঠপটে নফিসার সঙ্গে যতবার যেভাবে দেখা হয়েছে—সবগুলো মনে করতে করতে একসময় এ ঘটনাটাও মনে পড়ে।

নিতান্তই তুচ্ছ—মনে পড়বার কথা নয়, পড়তও না। শুধু নফিসা তার সঙ্গে জড়িত ছিল বলেই—

সেই প্রথম ওঁদের দেখা হয়েছিল সেদিন।

ঘটনাটা এখন বেশ স্পষ্ট মনে পড়ছে। মুঘলবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যখন চারিদিকে ছিটকে পড়েছে—সেই সময়কার কথা। পাঠানরা ওদের পিছু পিছু ছুটেছে কালান্তক যমের মত। তারই মধ্যে একটি তরুণ মুঘল বালকও কী করে এসে গিয়েছিল! নিতান্তই বালক—ষোল বছরের বেশী বয়স হবে না। প্রাণভয়ে দিশাহারা হয়ে ছুটতে ছুটতেই বোধ হয় কখন হাত আলগা হয়ে রাশটা ছুটে গিয়েছিল—ঘোড়া সে সুযোগের অপব্যয় করে নি। সেও তার আগে বেদম ভয় পেয়েছে ঐ রাক্ষুসে হাতীগুলোকে দেখে—এই অবসরে সামনের দু পা তুলে সওয়ারীকে ছিটকে ফেলে দিয়ে ছুটে পালাল সে।

আঘাত পেয়েছিল খুবই। সেই জন্যই উঠতে একটু দেরি হয়েছিল

ছেলেটির, সামান্য দেরি। কিন্তু তার মধ্যেই চার-পাঁচজন আফগান সওসার এসে পড়েছিল। কণ্ঠে তাদের সোল্লাস বীভৎস চিৎকার, চোখে উন্মত্ত জিঘাংসা।

ছেলেটার বাঁচবার কথা নয়।

কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে দায়ুদ খাঁও এসে পড়েছিলেন সেখানে। তবে ছেলেটার দিকে তাঁর চোখ পড়েনি আগে। চোখ পড়েছিল দূরের আর-এক অশ্বারূঢ় মূর্তির দিকে, প্রথম প্রহরের উজ্জ্বল দিবালোকে চোখে চোখ মিলেছিল। চিনতেও যেমন ভুল হয় নি বিন্দুমাত্র, তেমনি সে চোখের আকুলতা বা করুণ মিনতি বুঝতেও এতটুকু বিলম্ব হয় নি।

সেই দৃষ্টি অনুসরণ করেই চেয়ে দেখেছিলেন ছেলেটির দিকে। একটু কৌতুকও বুঝি অনুভব করেছিলেন সেই অত্যল্পকালের মধ্যে। যুদ্ধক্ষেত্রে রণবেশে অশ্বারোহিণী নারী—মৃত্যুর সাগরে সাঁতার দিচ্ছে বলতে গেলে—তবু এই একটি বালকের ওপর তার কী মায়া, ওর প্রাণের সম্বন্ধে কী উদ্বেগ, কী মিনতি চোখে!

তারই মধ্যে মনকে বুঝিয়েছিলেন—এমন হয়। এই-ই মানুষের নিয়ম। অসংখ্য নরহত্যাকারী নস্যুকেও ছাগশিশুর অপমৃত্যুতে চোখের জল ফেলতে দেখা যায় এ পৃথিবীতে।

কিন্তু এসব চিন্তা এক লহমার বেশি তাঁর মন অধিকার করে থাকতে পারে নি, সে অবসর ছিল না। বিদ্যুৎ-গতিতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তখন একজন আফগান সওয়ার বালকের বুক লক্ষ্য করে বর্শা তুলেছে—আর এক মুহূর্তের মধ্যেই বিঁধবে ওর বুকে—তিনি চকিতে নিজের তরবারির উলটো দিক দিয়ে আঘাত করলেন আফগানের মুঠির কাছাকাছি, বর্শার ওপর—বলিষ্ঠ হাতের সবল আঘাতে বর্শা ছিটকে গিয়ে পড়ল দূরে।

'হুঁশিয়ার জওয়ান! খবরদার! একটা নিরস্ত্র বালককে মারবার জন্যে এত আয়োজন, এত উল্লাস! লজ্জা নেই তোমাদের! তোমরা না বীর, তোমরা না যোদ্ধা!...ছি!'

তারপর কঠোর দৃষ্টিতে একবার সবাইয়ের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবারও বলেছিলেন, 'ওকে একটা ঘোড়া ধরিয়ে দাও—একশ গজ যেতে দাও ওকে—তারপর পার তো ছুটে গিয়ে ওকে হত্যা কর। কিছু বলব না। সে হল যুদ্ধ, যুদ্ধের আইনে তাতে দোষ হয় না। কিন্তু এ যে খুন। এতগুলো ষণ্ডা মানুষ মিলে একটা বালককে খুন! ধিক তোমাদের!'

অধোবদন সওয়াররা অবশ্য আর তাও করে নি। রুষ্ট সুলতানকে প্রসন্ন করতে একজন নিজের ঘোড়ার ওপরই বালককে চাপিয়ে ছেড়ে দিয়েছিল। ওর পিছু নেবার আর চেষ্টামাত্র করে নি।

ছেলেটির সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে আর একবার দূরের দিকে তাকিয়েছিলেন দায়ুদ খাঁ কররাণী। কিন্তু অশ্বরোহিণীকে আর দেখতে পান নি। জনারণ্যে কোথায় মিশে গেছে সে ততক্ষণে।

হয়ত সে তাঁকে ভুল বুঝেই গেল, হয়ত তাঁকেও সে ঘাতকই মনে করলে—একটা বালককে হত্যা করার আনন্দেই তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন, এই ভেবেই অধিকতর ঘৃণায় সে মুখ ফিরিয়ে চলে গেল হয়ত—আর তার চেয়ে ভাল ধারণা হবার কোন কারণও তো তিনি থাকতে দেন নি নিজের কলুষিত জীবনে—এই মনে করে তখন একটু অস্বস্তিই বোধ করেছিলেন দায়ুদ।

কিন্তু আজ বুঝছেন—সেই সামান্য সৎকাজটিও ব্যর্থ হয় নি। যার প্রীতির জন্য তিনি করেছিলেন—হয়ত প্রীতির জন্য করছেন সেটা না বুঝেই করেছিলেন—তবু তো তার নজর এড়ায় নি!

ছায়াছবির মত ঘটনাটা মনের পর্দায় দ্রুত সরে সরে গেল।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন দায়ুদ। হয়ত একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাসও। তারপর আবারও নফিসার আর্দ্র শিথিল হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'আমার অপরাধের শেষ নেই নফিসা, পাপের সীমা নেই—তবু তুমি আমাকে ক্ষমাই করেছ।...ভাল করে মনের দিকে তাকিয়ে ভেবে দেখ।'

শিউরে কেঁপে উঠল নফিসা।

অপরাধী ধরা পড়লে যেন কেঁপে ওঠে তেমনই। তারপর একেবারে উঠে দাঁড়াল সে।

'কে বললে আপনাকে জাহাঁপনা যে আমি ক্ষমা করেছি—কে বললে আপনাকে? আপনি আত্মপ্রবঞ্চনা করছেন।'

দায়ুদও সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি এগিয়ে এসে দু হাতে ওর মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে তুলে ধরলেন। তারপর ঈষৎ গাঢ় কণ্ঠে বললেন, 'তুমিই আত্মপ্রবঞ্চনা করছ নফিসা। তুমি আমার চোখের দিকে চেয়ে বল দেখি আমাকে ক্ষমা করেছ কি না—! আমি জানি, মিছে কথা বলতে পার না। বলবে না।'

নফিসা প্রাণপণ চেষ্টা করল দায়ুদের দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি স্থির রাখতে—কিন্তু পারল না। দেখতে দেখতে ওর দুই চোখ ছাপিয়ে যেন অশ্রুর বন্যা নামল। ঝাপসা হয়ে গেল দৃষ্টি ; ওর লজ্জা ঢাকতেই যেন খোদা ঝাপসা করে দিলেন।

সে আকুল হয়ে, বার-দুই যেন জোর করে, মাথা নেড়ে বললে, 'না না জনাব। ক্ষমা করি নি আপনাকে। অস্বীকার করব না—ভালবেসেছি, কিন্তু ক্ষমা করি নি। লুদী মিয়ার হত্যাকারীকে ক্ষমা করতে পারব না কখনও।'

দায়ুদও ব্যাকুল হয়ে উঠলেন, 'ভালবেসেছ নফিসা! ভালবেসেছ! এর চেয়ে সৌভাগ্য যে আমি-ভাবতেও পারি না আজ।...কিন্তু ভালবাসার কাছে কোন অপরাধই তো ক্ষমার অযোগ্য নয়।...তুমি আজ দরবারে বলে এলে—তুমি নির্জনে বসে তোমার অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে ; বেশ তো, তাই চল না নফিসা, আমরা দুজনেই যাই। রাজ্য নয়, সিংহাসন নয়—এসব বিবাদ-

বিসম্বাদ, স্ত্রী-পুত্র—আজ আর আমার কাউকেই প্রয়োজন নেই। আমিও তোমার সঙ্গে যেতে চাই—যেখানে নিয়ে যাবে আমাকে, পাহাড়ে, পর্বতে গহন অরণ্যে—তোমার সঙ্গে বসেই বাকী জীবন খোদাকে ডাকব আর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করব। শুধু তুমি কাছে থাক আমার। তুমি পাশে থাকলে যেখানে থাকব সে-ই হবে আমার বেহেস্ত, পথের পাথরই হবে তখ্‌ৎ।'

উত্তর দিতে গিয়ে বহুক্ষণ নাফিসার ঠোঁটই কাঁপল শুধু। কিন্তু কথা যখন কইল তখন কণ্ঠ অশ্রুবিকৃত হলেও বক্তব্যে কোন জড়তা নেই তার। বলল, 'জাহাঁপনা, মন আমার স্বাধীন, তাই তা আপনাকে দিয়েছি, দিতে পেরেছি। তার জন্য বিবেকের কাছে কোন জবাবদিহি নেই।···কিন্তু এ দেহটা মিয়া লুদী খাঁর, তিনি এর মালিক—এ দেহ তাঁর হত্যাকারীকে কোনদিন দিতে পারব না। তার সংস্পর্শে, তার কাছেও রাখতে পারব না। সেটা বেইমানী হবে। খোদা সে বেইমানী সহ্য করবেন না।···আমরা পাহাড়ী মেয়ে জনাব—আমাদের ইমানের জ্ঞান ধারণা হয়ত আপনাদের সঙ্গে মিলবে না। কিন্তু তবু আমার বিশ্বাস আমার কাছে বড়। আদাব।···আর কোনদিন না আপনার সঙ্গে দেখা হয়—এই চেষ্টাই করব প্রাণপণে।···আপনি আপনার কর্তব্যে ফিরে যান, ফিরে যান নিজের বীরধর্মে—সামান্য একটা বাঁদীর চিন্তায় নিজের জীবন, নিজের জিন্দিগী আর বিড়ম্বিত করবেন না।'

সে সামান্য একটু অভিবাদনের ভঙ্গী করে চলে গেল। দেখতে দেখতে পাশের সেই গাছপালার ছায়ায় কোথায় মিলিয়ে গেল আর তার চিহ্নমাত্র রইল না চোখের সামনে। তার অশ্রুকম্পিত কণ্ঠে, তার বক্তব্যে, তার এখন এই চলে যাবার ভঙ্গীতে এমনই একটা অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পেল যে তাকে কোন রকম বাধা দিতে সাহসে কুলোল না দায়ুদ খাঁর। তিনি মাথা হেঁট করেই দাঁড়িয়ে রইলেন।

বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন সেই ভাবেই। তারপর কোনমতে আমার অর্ধ-অবশ পা দুটোকে টেনে নিয়ে ফিরে চললেন তিনি—শহরের বাইরে, যেখানে অরণ্যের আবছায়ায় তাঁর সাথী ও দেহরক্ষীরা অপেক্ষা করছে, সেইখানে—আশাহীন, আনন্দহীন, ভবিষ্যৎহীন জীবনের দিকে, শুধু জিন্দিগীর বাকী কটা দিন কোন মতে কাটিয়ে দেবার সাধনায়।

দূরে শহরে আলোকসজ্জা হয়েছে, বড়বাটি দুর্গের থামে থামে গম্বুজে গম্বুজে জ্বলেছে আলো। সে আলো এখান থেকেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। মুঘলদের আনন্দ-উৎসবের কোলাহল ভেসে আসছে এখানেও; বোধ হয় সন্ধ্যার দিকে মদ্যপানের ফলে কোলাহল বেড়েছে বলেই। ওপারে শিবাদল এখনও চিৎকার করে চলেছে।

কাঠজুড়ির বুকে নেমে এসেছে সন্ধ্যা। আঁধার ঘনিয়ে এসেছে ওপারের বনরেখায়। সূর্য একেবারেই ডুবে গেছে। তবু কী একটা বিচিত্র কারণে এখনও ওপরের একটা সাদা মেঘে তার একটুখানি রক্তাবর্ণাভা লেগে রয়েছে—তারই সামান্য আলোতে বাঁধের সরু পথটা দেখে দেখে চললেন দায়ুদ।

নাফিসা তাঁকে ক্ষমা করে নি কিন্তু ভালবেসেছে।

এক প্রহরের খেলা

সৈয়দ মুজতবা আলী

শ্রদ্ধাস্পদেষু,

কয়েকটি কথা

এই উপন্যাসটি যখন সাময়িক পত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়—তখন এর মূল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন ক'রে কয়েকজন চিঠি লেখেন। ভবিষ্যতেও এ ধরনের প্রশ্ন পাঠকদের মনে উঠতে পারে ভেবে এখানে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন বোধ করছি। জাহান্-আরার দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে তাঁর ভ্রাতারা যখন দিল্লীতে সমবেত হন—তখন অকস্মাৎ বাদশার আদেশে আওরঙ্গজেবের দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়, এবং তাঁর পদ ও পদবী কেড়ে নিয়ে আনুষঙ্গিক ভাতা প্রভৃতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আবার কিছুকাল পরে জাহান্-আরার মধ্যস্থতায় তাঁর পূর্ব-মর্যাদা, পদ ও ভাতা-মাসোহারা ফিরে পান। বাদশার এই আপাত-দুর্বোধ্য আচরণের কারণ সম্বন্ধে বহু ঐতিহাসিকের বহু মত—কিন্তু সে সব কারণ, ঠিক অসম্ভব না হ'লেও অনেকটা অবিশ্বাস্য বলে মনে হয়। এর মধ্যে অর্ধ-ঐতিহাসিক বলে অভিহিত 'হামিদ-উদ্দীন খান নিমচা'র কাহিনীটিকে অনেকে গাল-গল্প বলে উড়িয়ে দিলেও—আমার কাছে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয়েছে। বিশেষত তাঁর রচিত ইতিহাস আওরঙ্গজেবের জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয়েছে—সম্পূর্ণ মিথ্যা হলে কি আর কোন প্রতিবাদ উঠত না কোথাও থেকে? যাই হোক, সেইটুকু সূত্র অবলম্বন ক'রেই বর্তমান উপন্যাসের গ্রন্থনা, এবং বলা বাহুল্য—এর অধিকাংশ উপাদানই কাল্পনিক। তাই, একে ঐতিহাসিক উপন্যাস না ভেবে ইতিহাসের পৃষ্ঠপটে রচিত কাল্পনিক কাহিনী মনে করলেই সুখী হব। এই উপন্যাসের রচনা ও পরিকল্পনা প্রসঙ্গে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে দুটি নাম যুক্ত করতে চাই, প্রখ্যাত সাহিত্যিক অনুজোপম শ্রীমান আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও পরম স্নেহভাজন শ্রীমান মণীশ চক্রবর্তী। ইতি—

পুনরাবৃত্তিকা

সেদিন শহর আগ্রার এক নবনির্মিত আপাতসুষুপ্ত প্রাসাদের এক প্রান্তে এক নির্জন কক্ষে একটি কিশোরী বাঁদী বহু রাত্রি পর্যন্ত জেগে বসে ছিল।

অথচ তার শুভ্র সুকোমল শয্যা প্রস্তুত; ঘরের এক কোণে রাখা নীলাভ কাঁচের পাত্রে সুগন্ধি তেলের শেজ, তার আলো ও ধোঁয়াতে রঙীন স্বপ্নের আহ্বান; টানা-পাখায় সামান্য মৃদু বীজন; সুরাইয়ের গায়ে জড়ানো চামেলির মালার সুগন্ধে ঘরের বাতাস ভারী—এক কথায় কক্ষটির আবহাওয়া অতি সুখকর, নিদ্রারই অনুকূল। তবু যে এত রাত্রি পর্যন্ত এ প্রাসাদের ঐ কিশোরী বাঁদীটির চোখে তন্দ্রা নামে নি—তার কারণ কি শুধুই এই জ্যৈষ্ঠের দুঃসহ গরম? না কি ওর মালিক তথা প্রিয়তম-দয়িতের অদর্শনজনিত অসহ বিরহ?

আগ্রা শহরের জ্যৈষ্ঠ মাস অবশ্য চিরকালই ভয়াবহ। আজ থেকে পৌনে তিনশ বছর আগে হয়ত সেখানে এতটা মরুভূমির চেহারা ছিল না. এত বিলিতি মাটির বাড়ি আর বাঁধানো সড়কও হয় নি—তবু গরম ওখানে চিরদিনই বেশী। তাপ নিবারণের যে সব ব্যবস্থা আজ সুলভ, তখনকার দিনে তা কল্পনারও অতীত ছিল। বাদশা শাহ্‌জাদা—এবং কোন কোন নবাব-ওমরাহের বাড়িতে—কিছু কিছু টানা-পাখার ব্যবস্থা হয়েছিল, সারারাত জেগে বালক ক্রীতদাস কি ক্রীতদাসীরা টানত, সাধারণ বাড়িতে দিনে একতলার ঘর ও রাত্রে ছাদ কিম্বা উঠান ছাড়া শান্তি বা স্বস্তির কোন উপায় ছিল না। তেমনি বাদশা-নবাব-ওমরার বাড়ি এই সহজ সুখটুকু সহজলভ্য ছিল না, মেয়েরা বাইরে শুতে পারত না বেপর্দা হবার ভয়ে; কোন কোন বড় বাড়ির ছাদে অবশ্য মেয়েদের জন্যে একাংশ ঘিরে দেওয়া হ'ত—কিন্তু শাহী হারেমে এসব ব্যবস্থা করার কথা চিন্তাও করত না কেউ। সেখানে ইজ্জৎ বা লজ্জার চেয়েও বড় একটা কথা ছিল, নিরাপত্তা। শোনা যায় হুমায়ুং বাদশা পর্যন্ত নাকি চারিদিকে পাহারা রেখে বাইরে শুয়ে গেছেন—তা তাঁর তো জীবনের বেশির ভাগ মাঠে-বাটেই কেটেছে—পরবর্তীকালে আর কোন বাদশা সে সাহস করেন নি।

রীতি নেই বলেই সকলে সেই রকমে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। সুতরাং ঘরের অস্বস্তিকর চাপা গরমের জন্যে মেয়েটির এই অনিদ্রা—তা মনে করার কোন কারণ নেই। বিশেষতঃ জ্যৈষ্ঠ মাসে এদেশে বাইরে শোয়াও খুব আরামপ্রদ নয়, রাত্রির তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত বাতাস উত্তপ্ত হয়ে থাকে—অন্ধকার আকাশ থেকে মনে হয় রাশি রাশি অদৃশ্য অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। একেবারে শেষ রাত্রে সামান্য কিছুক্ষণের জন্য হাওয়া ঈষৎ সুখস্পর্শ বলে মনে হয়, আবহাওয়া সামান্য একটু শীতল হয়ে আসে—কিন্তু সে তো

দণ্ড-কয়েকের বেশী নয়—সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই সে শীতলতা, ভীরু অভিসারিকার মতোই অদৃশ্য হয়ে যায়। তার চেয়ে এই পুরু পাথরে ঢাকা ইমারতের মধ্যেকার ঘর অনেক ঠান্ডা, যদি বাতাসের একটু ব্যবস্থা থাকে তো বাইরের থেকে ঢের বেশী আরামদায়ক হয় এখানে শোওয়া। এ প্রাসাদের তো কথাই নেই, বলতে গেলে সদ্য-নির্মিত—বহুদিনের ভেজানো ইঁটে তৈরী ইমারতের ভিতরে বাইরে পুরু পাথর দিয়ে ঢাকা, বাইরের তাপ ভেতরে পেঁছিয় না। বাইরের গরম বাতাস আসবার পথও সঙ্কীর্ণ, এসব ঘরে জানালার কোন ব্যবস্থা নেই, যা আছে তাকে সম্ভ্রম ক'রে গবাক্ষ বলা যেতে পারে হয়ত, আসলে তা ঘুলঘুলি ছাড়া কিছু নয়। সুতরাং একটু বাতাস করার ব্যবস্থা থাকলে গরম এখানে দুঃসহ বোধ হয় না।

গরমও যেমন এ অনিদ্রার কারণ নয়—তেমনি প্রিয়-বিরহও না। কারণ আজকের এ বিরহ সম্পূর্ণই মেয়েটির স্বেচ্ছাসৃষ্ট। সে-ই কৌশল ক'রে মালিকের মর্জিকে ঠেকিয়েছে। মালিক তাঁর আগমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাতে আপত্তি জানানো ঘোরতর বেয়াদবি, সে রকম দুঃসাহসের কথা ভাবতেই পারে না এরা। সুতরাং সে সম্ভাবনার পূর্বেই তাতারী প্রহরিণীকে দিয়ে খৎ পাঠিয়ে জানিয়েছে যে অসহ্য মাথার যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে সে—মালিকের হুকুম হ'লে হাকিম সাহেবের কাছ থেকে কোন দাওয়াই আনাতে পারে। বলা বাহুল্য মালিকের সে হুকুম হতে বিলম্ব হয় নি। দাওয়াই তো এসেছে, সেই সঙ্গে এসেছে এ রাত্রির মতো ছুটি। দাসী পাঠিয়ে মালিক তাঁর সস্নেহ উদ্বেগ জানিয়েছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন দাওয়াই খেয়ে সকাল ক'রে শুয়ে পড়তে। তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রে না অকারণে মাথার যন্ত্রণা বাড়িয়ে ফেলে সে। সর্বাধিক রূপসী এবং সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠা এই বাঁদীটির সম্বন্ধে মালিকের স্নেহ ও প্রশ্রয় অত্যধিক এবং আন্তরিক, তা এ প্রাসাদের সকলেই জানে।

না, বাহ্য কারণ যেগুলো নজরে পড়ে—এই কিশোরী মেয়েটির চোখে তন্দ্রা না নামবার—তার কোনটাই এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।

তবু জেগে সে আছে—এটাও ঠিক।

ঘুম আসছে না বলে হয়ত নয়, হয়ত জেগে থাকা প্রয়োজন বলেই আছে।

কারণ, বারংবার পা টিপে টিপে দরজার কাছে যাচ্ছে সে, ভারী দামাস্কের লজ্জারক্ত পর্দাটার পাশে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, কী যেন কান পেতে শোনবার চেষ্টা করছে—আবার ফিরে এসে বিছানায় বসছে। কিন্তু বেশীক্ষণ স্থির হয়ে বসতে পারছে না। এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, চারপাইয়ের পাশে রাখা একটা অত্যন্ত কী অকিঞ্চিৎকর এবং এ ঘরের পক্ষে একান্ত বেমানান বস্তু নাড়াচাড়া করছে, এক একবার অন্যমনস্ক ভাবেই হাতে ক'রে ঘুরিয়ে দেখছে—আবার তা রেখে দিয়ে অস্থির ভাবে উঠে দাঁড়াচ্ছে। যেন একটা কিছুর জন্যে অপেক্ষা করছে।

কোন একটা ঘটনার অথবা কারও আগমনের।

এই ভাবেই এক সময় রাত্রির দ্বিতীয় প্রহর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। প্রাসাদের উদ্যানে রাখা পেটা ঘড়িতে দ্বিতীয় প্রহরের ঘণ্টা বেজে গেল একে একে।

শান্ত স্তব্ধ হয়ে গেছে এ প্রাসাদের প্রাণ-চাঞ্চল্য অনেকক্ষণ আগেই। কিন্তু সকলে ঘুমিয়ে পড়েছে কিনা সেটা এ স্তব্ধতা থেকে বোঝা যায় না। মালিক যখন তাঁর ঈপ্সিত কক্ষে শয়ন করতে যান, তখন থেকেই এ প্রাসাদে অনাবশ্যক শব্দ থেমে যায় একেবারে। পরিচারক পরিজনরা পা টিপে টিপে চলে, আহার করে তাও যতদূর সম্ভব নিঃশব্দে। জোর বাতি সব নিভিয়ে দেওয়া হয়। ফটকগুলোতে প্রচুর তেল দেওয়া থাকে—পাছে খুলে দেওয়ার সময় কোন ধাতব শব্দ ওঠে এই ভয়ে—তবু বড় বড় ফটকগুলো প্রথম প্রহর উত্তীর্ণ হবার আগেই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

এখানে গভীর রাত্রি পর্যন্ত জেগে থাকে শুধু বিরহিণী বা অভি-সারিকার দল। জেগে থাকে তাদের দয়িত বা প্রেমিকরা, আর জেগে থাকে ভৃত্য-কর্মচারী-প্রহরী-প্রহরিণীরা। তারাও মালিকের বিশ্রামের সময় হ'লে কাপড়ের জুতো পরে চলাফেরা করে—ভৃত্যরা খালি পায়ে। কথা কয় না কেউ, ইশারা ইঙ্গিতে কাজ সারে—নিতান্ত প্রয়োজন হ'লে চুপি চুপি ফিস ফিস করে কথা কয়। কিন্তু সেও দ্বিতীয় প্রহরের পরে আর নয়। তার মধ্যেই যে যার কাজ সেরে নিজের নিজের কোটরে গিয়ে ঢোকে—নয়ত বাগানে বা বারান্দায় চারপাই আশ্রয় করে। এর পরে জেগে থাকে কেবল তাতারী প্রহরিণীরা, হাবসী খোজারা। তাদের ঘুমোলে চলবে না। অন্ধকারে মুক্ত কৃপাণ হাতে নিঃশব্দে প্রেতমূর্তির মতো ঘুরে বেড়ায় তারা অলিন্দে অলিন্দে, উদ্যানের কোণে কোণে—ফটকের ধারে ধারে। কোন অপরাধী চোখে পড়লেও শব্দ করে না, চেঁচিয়ে ডাকে না কাউকে—হয় তাকে নিজে নিজেই গ্রেপ্তার করে, নয় তো অসুবিধা বুঝলে একেবারেই তরবারী বসিয়ে দেয় বুকে।

এ সবই জানে এই মেয়েটি—এ প্রাসাদের এই সব আইন-কানুন।

বোধ করি সেই জন্যেই অপেক্ষা করছে সে—অধীর অস্থির হয়ে।

দ্বিতীয় প্রহরের ঘড়ি বাজার শব্দ এ বাড়ির খিলানে খিলানে প্রতিশব্দ জাগিয়ে মিলিয়ে যাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই মেয়েটি যেন আশ্বস্ত হয়ে উঠে দাঁড়াল। মন স্থির করে ফেলেছে সে আগেই। শুধু যেটুকু দ্বিধা ছিল তা যেন ঐ ঘড়ির শব্দেই দূর হয়ে গেল। বেইমান সে নয়—এটা সন্ধ্যা থেকেই বারবার বুঝিয়েছে মনকে। ব্যবহারিক অর্থে যাকে বেইমানী বলে তা হয়ত করছে সে—কিন্তু ন্যায়ধর্মের দিক থেকে বিচার করলে সে বেইমান নয়। বিবেকের কাছে সে মুক্ত, নিশ্চিন্ত। যাকে অপরাধ বলে তা কিছু করে নি সে, করছে না। বরং যার পাপ-পুণ্যের এক রকম অংশভাগিনী সে —তাঁকেই এক ঘোরতর পাপাচরণ থেকে বিরত করছে।

অবশ্য হ্যাঁ—একটু অন্যায় হয়ত হয়ে যাচ্ছে, সামান্য একটু গুনাহ্।

যার কথা ভেবে, আসলে যার মঙ্গলের জন্যে সে এই দুঃসাহসিক কাজ করতে যাচ্ছে, তার কথা হয়ত এখন আর চিন্তা করা উচিত নয় ওর।

হয়ত এটা পাপ। এর জন্য প্রত্যবায়ভাগী হ'তে হবে তাকে। ঈশ্বরের কাছে—এরা যাকে খোদা বলে তাঁর কাছে একদিন জবাবদিহি করতে হবে।

সে জানে তা, তার জন্য প্রস্তুতই আছে সে।

তবু যে এ কাজ করতে যাচ্ছে—তার কারণ সে নিরুপায়।

এই প্রশ্নটা নিয়ে আজ কদিন ধরে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে সে। এই পাপ-পুণ্যের প্রশ্নটা নিয়ে। ক্লান্ত, ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে—ন্যায়নীতি-বিবেকের সঙ্গে আবেগ আর প্রণয়ের এই দ্বন্দ্বে। আজ যে মাথাধরার অজুহাত দেখিয়েছে সে, সেটা খুব মিথ্যাও নয়। শরীর সত্যই ভেঙ্গে এসেছে কদিনের এই দুঃসহ কুটিল চিন্তায়। কদিনেই যেন শীর্ণ হয়ে গিয়েছে, ম্লান হয়ে এসেছে মুখের স্বাভাবিক লাবণ্য ও স্বাস্থ্যের দীপ্তি।

অবশেষে সোজাসুজি আবেগের কাছেই আত্মসমর্পণ করেছে।

পারবে না সে—কিছুতেই স্থির থাকতে পারবে না; পারবে না আলস্য ও আরামে দিন কাটাতে—এই ভয়ঙ্কর সত্য জানবার পরও।

তার ধ্যানের দেবতা, তার অন্তরের নিভৃততম প্রদেশের একাধিপতি—সেই এক রাত্রির স্বপ্নে দেখা মানস-রাজাধিরাজের এই নিদারুণ বিপদের কথা জেনেও নিশ্চিন্ত হয়ে থাকতে পারবে না।

সে রাজাধিরাজ যে তাঁর এই দীনতমা সেবিকাকে মনে ক'রে রাখেন নি, তা ও জানে।

অসংখ্য সেবিকার মধ্যে সামান্যা এক বালিকাকে, তাও যার সঙ্গে সম্পর্ক একদিন—হয়ত বা মাত্র প্রহরকালের—মনে ক'রে রাখা সম্ভব নয়। বিশেষ তাঁর মতো কর্মব্যস্ত মানুষের। তা ছাড়াও, কোথায় তিনি আর কোথায় ও। দুস্তর ব্যবধান ওদের দুজনের জীবনে। একজন বহু লোকের দণ্ডমুণ্ডের মালিক, বহু লোকের জীবন-মরণ আশা-আকাঙ্ক্ষার সূত্র ধরে চালনা করছেন, আর একজন সামান্যা ক্রীতদাসী মাত্র। তাও তাঁর নিজের নয়—অপরের। কোন মানুষ কি তার গায়ে-উড়ে-এসে-বসা এক মুহূর্তের একটি মক্ষিকাকে স্মরণ রাখে? রাখা কি সম্ভব?

আরও কারণ আছে তাঁর মনে না থাকার।

সাধারণ মানুষও যে নন তিনি।

একদিন, মাত্র কিছুক্ষণের জন্য দেখেছে সে, হয়ত সব মিলিয়ে দুই প্রহরও নয়, তবু তাঁকে চিনেছে সে, ভাল ক'রেই চিনেছে।

আবেগ, প্রেম, দয়া, মায়া, করুণা—এসব তুচ্ছ হৃদয়-দৌর্বল্যের অনেক ঊর্ধ্বে তিনি। সেই জন্যেই দেবতার উপমাটা বারবার মনে আসে ওর। নির্মম, কঠিন, কোন কিছুই যেন স্পর্শ করে না তাঁকে। এ পৃথিবীর যা কিছু বস্তু—সব তাঁর কাছে প্রয়োজনের সামগ্রী—এর চেয়ে বেশী কিছু নয়। এই হিন্দুস্থানে আসার আগে সমুদ্র পার হ'তে হয়েছে ওকে, পাহাড়ের ধারে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখেছে সে। দেখেছে সে পাথরের অদ্ভুত

কাঠিন্য। সাগরের ঢেউ বারবার এসে আছড়ে পড়ছে পাহাড়ের গায়ে, কখনও মন্দবেগে, কখনও প্রবল আস্ফালনের সঙ্গে—কিন্তু ফল হচ্ছে একই, হার মেনে ফিরে যেতে হচ্ছে। না পারছে সে পাহাড়কে একবিন্দু টলাতে, না পারছে তার পাথরকে বিন্দুমাত্র আর্দ্র করতে। এ মানুষও তেমনিই—এ পৃথিবীর কোন কোমল অনুভূতিরই সাধ্য নেই যে তাঁকে দ্রবীভূত কি আর্দ্র করে, কিম্বা বিচলিত করে।

সুন্দর, অতি সুন্দর। আশ্চর্য তাঁর রূপ, তবু কি ভয়ঙ্কর। কী কাঠিন্য তাঁর শান্ত শাণিত দৃষ্টিতে। কী নির্মম ঔদাসীন্য তাঁর অত সুন্দর আয়ত চোখে—কী অপরিসীম ঔদ্ধত্য তাঁর সুপ্রশস্ত সুডৌল ললাটের কটি সূক্ষ্ম রেখায়, আর কী অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতা তাঁর ওষ্ঠের ভঙ্গীতে। সেই দৃঢ়সম্বন্ধ ওষ্ঠাধর যেন যে-কোন মুহূর্তে একটা নিষ্করুণ ব্যঙ্গে বিকৃত হয়ে উঠবে—মানুষের সমস্ত প্রচলিত ধারণা ও বিশ্বাসের প্রতি বিদ্রূপে। তাঁর সেই চোখের দিকে, চাহনির দিকে—মুখের ও মুখের সেই ঈষৎ-কৌতুক-ব্যঙ্গে-ভরা হাসির দিকে চাইলে অকারণ ও অজানা ভয়ে বুকের মধ্যে পর্যন্ত যেন হিম হয়ে যায়।

তবু তিনি সুন্দর, মনোমোহন। তিনিই ওর দয়িত।

তাঁকে ভুলতে পারে নি সেদিনের সেই শঙ্কিতা বালিকাটি আজও।

মনের নিভৃত পূজার আসনটিতে আজও নিত্য তাঁর আরতি চলছে।

তার কারণ—তিনিই ওর বালিকা বয়সের অনাঘ্রাত প্রথম প্রস্ফুট কুসুমটি গ্রহণ করেছিলেন।

না, অর্ঘ্য হিসেবে দেয় নি সে, তিনি জোর ক'রে গ্রহণ করেছিলেন; নির্মম অবজ্ঞায়, অবহেলায়—মাত্র কয়েক খণ্ড স্বর্ণ-মুদ্রার বিনিময়ে। নিতান্তই মুহূর্তের খেয়াল চরিতার্থ করার প্রয়োজনে লেগেছিল সে, কেনাবেচার হাটে সাধারণ পণ্য ছাড়া আর কিছু ভাবার অবসর হয় নি, অন্য কিছু ভাবার কথা সম্ভবতঃ তাঁর মনেও হয় নি।

তবু তাতেই যেন কৃতার্থ হয়ে গিয়েছিল সে।

অবাক হয়ে চেয়ে ছিল সেই স্নেহমমতাহীন পাষাণ দেবতার দিকে, যাঁর কাছে তার মতো মানুষ কীট-পতঙ্গের বেশী কিছু নয়, হয়ত ভোগের বস্তু, কিন্তু বিবেচনার যোগ্য কোন প্রাণী নয়; যার দিকে তাকাবার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজনের শেষে যাকে অনায়াসে ঝেড়ে ফেলে দেওয়া যায়, পায়ে দলে পিষে যাওয়া যায়।

হ্যাঁ, অবাক হয়েই চেয়েছিল সে। দেখে যেন আশা মেটে নি, দেখার বিস্ময় শেষ হয় নি। ভয় করেছিল, খুবই ভয় করেছিল। তবে ভয়ও যত করেছিল মুগ্ধও তত হয়েছিল। ভয় করেছিল বলেই বুঝি আজও ভুলতে পারে নি, চিরদিনের মতো তাঁকেই উপাস্য ক'রে বসে আছে, কখন নিজের অজ্ঞাতসারেই দয়িতের আসনে—মালিকের আসনে বসিয়েছে।...

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গেই অল্প বয়সের সক্রিয়তা ও সঙ্কল্পের

দৃঢ়তা ফিরে এল তার হাতে-পায়ে-মনে। উঠে দাঁড়িয়ে পাশের আলনা থেকে বোরখাটা টেনে নিয়ে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিল; তারপর, পাশের চৌকিতে রাখা সেই তুচ্ছ বস্তুটা তুলে নিয়ে মূষিকের মতো দ্রুত অথচ লঘু পায়ে বেরিয়ে এল সে ঘর থেকে। আসার আগে কুলুঙ্গিতে রাখা রঙীন শেজ্-এর আলোটাকে একটা হাত-পাখা দিয়ে আড়াল ক'রে রেখে এল—যাতে সামান্য আলোও না বিছানার ওপর গিয়ে পড়ে। তাতেও যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না, পর্দাটা ভাল ক'রে টেনে দিয়ে একবার বাইরে থেকে দেখে নিল—গৃহাধিকারিণীর অনুপস্থিতির কোন চিহ্ন বাইরে থেকে চোখে পড়ে কিনা।

ঘর থেকে বেরিয়ে দালানের মতো যে জায়গাটায় পড়ল সেখানটাও একেবারে অন্ধকার নয়, বাতিদানে ঝোলানো একটি তেলের আলোর ব্যবস্থা আছে। কিন্তু সেই সামান্য আলোতে অতবড় দালানে আলোর চেয়ে ছায়ারই সৃষ্টি হয় বেশী। ফলে এমনিতেই, দূরের ঘনীভূত অন্ধকারের দিকে চাইলে মনে হয় সেই আলো-আঁধারীতে ছায়ামূর্তির মতো কী যেন সব নড়ে বেড়াচ্ছে। তাই সত্যি সত্যিই যখন কেউ নড়ে—চোখে পড়লেও তত কেউ মাথা ঘামায় না। কায়াকে ছায়া মনে করে।

সেদিকে চেয়ে কিছুটা যেন আশ্বস্তই হ'ল সে গোপনচারিণী। তেমনি ত্বরিৎগতিতে দালান পেরিয়ে সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল একবার। কান পেতে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করল—নিচের দালানে প্রহরিণী ঠিক কোন্ দিকে আছে। নিঃশব্দ গতি তাদেরও, তবু কিছুক্ষণ সেই শব্দহীন স্তব্ধতায় কান পেতে থাকলে খানিকটা আন্দাজ করা যায়। অতি সূক্ষ্ম শব্দকেও বেছে নেওয়া যায় পরিপূর্ণ নৈঃশব্দ্য থেকে পৃথক ক'রে। বালিকাও একটু চেষ্টাতেই তফাৎটা ধরে নিল। যখন বুঝল প্রহরিণী অপর দিকের শেষ প্রান্তে গেছে, তখন নিশ্চিন্ত হয়ে নেমে গেল নিচে। সেখানেও সেই ক্ষীণ আলো, ওপরের মতোই আলো-ছায়ার খেলা। মনে পড়ল তার বোরখার রঙ কালো, ছায়াকেও ছায়া বলে হয়ত বোঝা যাবে না—যদি বা নজরে পড়েও। সে আর ইতস্ততঃ করল না, ফিরে তাকিয়ে প্রহরিণীর গতিবিধি বোঝবারও চেষ্টা করল না—তেমনি ক্ষিপ্র লঘুপদে দালানের কোণের দরজাটা দিয়ে বেরিয়ে একেবারে বাগানে পড়ল।

সেখানেও পাহারা আছে। প্রহরী-প্রহরিণী দু'রকমই আছে সেখানে। ফটকে আছে সান্ত্রী পাহারা। তবু বাইরে বেরিয়ে যেন স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল একটা। এখানে তার ভয় নেই তা জানে সে। এখানে আজকে যে প্রধানা প্রহরিণী সে তার দেশের লোক। বস্তুত সে তাকে ধাত্রীর মতোই মানুষ করেছে শৈশবে ও বাল্যে। তাকে কেনবার সময় মালিক ওকেও কিনে নিয়েছিলেন, সেই থেকে সঙ্গে সঙ্গেই আছে সে। আজকের এ দুঃসাহসিক অভিযানের কথা সে জানে, এর যা কিছু বহিরঙ্গ আয়োজন বা ব্যবস্থা—সে-ই করেছে। কাছাকাছিই কোথাও আছে সে—সে-ই তাকে খুঁজে নেবে।

আর খুঁজেও নিল সে। বাঁদীর অনুমান যে বেঠিক নয় তা বোঝা গেল সঙ্গে সঙ্গে। যেন প্রেতিনীর মতো অন্ধকার থেকে নিঃশব্দে আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল সেই প্রহরিণীর। কখন পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তা বাঁদী একটুও বুঝতে পারে নি—যদিও সে ওকেই প্রত্যাশা করছিল। একেবারে পাশে এসে বোরখার ওপর দিয়েই বাহুমূল ধরে আকর্ষণ করতে চমকে চেয়ে দেখল ও চিনতে পারল। কী ভাগ্যি যে চেঁচিয়ে ওঠে নি। তবে কিছু-ক্ষণের জন্যে নিঃশ্বাস যেন বন্ধ হবার মতো হয়ে গিয়েছিল, ভয়ে।

প্রহরিণীর কিন্তু এসব তুচ্ছ তথ্য নিয়ে মাথা ঘামাবার সময় ছিল না। সে এই বাঁদীর বাঁদী, এর আদেশই পালন করবার জন্য তার এত কাণ্ড, এত সতর্কতা—তবু তার কাছে এখন আদেশদাত্রীর চেয়ে আদেশটাই বড়। সে এক মুহূর্তও থামতে দিল না ওকে, নিঃশব্দে কনুইয়ের কাছটা ধরে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলল—বাগানের মধ্যকার পাথর-বাঁধানো রাস্তাগুলো ছেড়ে ঘাসের ওপর দিয়ে। অন্ধকার রাত্রি, তবু নক্ষত্রের আলো আছে; আর খুব অন্ধকারে সে আলোও বড় কম নয়—তাই সে প্রধানত গাছের তলায় তলায় গাঢ়তর অন্ধকারে আত্মগোপন ক'রে চলতে লাগল।

একেবারে পাঁচিলের কাছাকাছি এসে বুকের রক্ত আর একবার হিম হয়ে এসেছিল বাঁদীর। শুধু যে পলাতকরা গাছের ছায়া বেছে নেয় তাই তো নয়—পাহারাদাররাও চায় সেখানে লুকিয়ে থেকে গোপনচারীদের গতিবিধি লক্ষ্য করতে। অকস্মাৎ এমনি একটা বড় আমগাছের ছায়ায় ওরা বর্শাধারী এক প্রহরীর সামনে পড়ে গিয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে সে ব্যক্তি চেঁচামেচি করে নি বিশেষ—মনিবের ঘুম ভাঙ্গার আশঙ্কায় চোর বলে বুঝতে পারলেও চেঁচামেচি করে না এরা—শুধু বর্শা বাগিয়ে ধরে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছিল। সৌভাগ্যক্রমে লোকটি প্রহরিণীর পরিচিত—সে-খোঁজ নিয়েই এত নিশ্চিন্ত হয়ে আসছিল বোধহয় ও—ওকে চিনতে পারামাত্র সে আবার আগের মতোই গাঢ়তর অন্ধকারে, ঐ বিপুল অন্ধকারের খণ্ডাংশের মতো মিলিয়ে গেল কোথায়, কোন প্রশ্নমাত্র করল না।

পাঁচিলের নিচে এসে প্রথম একটু দাঁড়াল প্রহরিণী, কিন্তু সে বিশ্রামের জন্যে নয়, পার হওয়ার প্রস্তুতি হিসেবেই। অবশ্য সে বেশীক্ষণও নয়, নিজের অস্ত্রটা খাপে পুরে পিঠের দিক ক'রে বেঁধে নিয়ে বিনা বাক্যব্যয়ে মেয়েটাকে দু'হাতে উঠিয়ে ওপরে তুলে দিল, তারপর নিজেও এক লাফে পাঁচিলে উঠে ওপারে নেমে পড়ল টুপ ক'রে। তারপর একেবারে এসে বাঁদীর পায়ের কাছে পাঁচিলে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল—দু'হাত বুকের ওপর জোড়বন্ধ ক'রে। মেয়েটি বুঝতে পারল ইঙ্গিতটা, সে বিনা দ্বিধায় ওর কাঁধে ও হাতের ওপর পা দিয়ে নেমে এল।

যেখানে ওরা নামল সেটা রাস্তা নয়, পতিত জমি—কতকটা মাঠের মতো, সামান্য সামান্য ঠেঁটি ও অন্যান্য কাঁটাগুল্ম ছাড়া আর কোন গাছ-পালা নেই। পাঁচিল থেকে হাত ছয়েক দূরে একটা পরিখার মতোও আছে, তবে তাতে এখন জলের চিহ্নও নেই। ওরা অনায়াসে পায়ে হেঁটে পার

হয়ে এল।

পরিখা পেরিয়ে দ্রুত এসে যেখানে পথে উঠল সেখানে দেখা গেল একটা গাছের ছায়ায় একটা ডুলি ও দুজন বাহক নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। প্রহরিণীর ইঙ্গিতে মেয়েটি গিয়ে সেই ডুলিতে উঠল। বাহকরাও প্রস্তুত ছিল, তারাও তৎক্ষণাৎ বিনা প্রশ্নে ডুলি কাঁধে তুলে রওনা দিল। কোথায় যাবে বা যেতে হবে—তাও প্রশ্ন করল না, সম্ভবত জানাই আছে তাদের। প্রহরিণীও পিঠে বাঁধা কোষ থেকে ছোট তলোয়ারখানা খুলে নিয়ে ডুলির পাশে পাশে চলতে শুরু করল।

অপেক্ষাকৃত জনবিরল পথ ধরে, নগরীর উপকণ্ঠ দিয়ে যাচ্ছিল ওরা, ফলে গন্তব্যস্থানে পেঁৗছতে বহু বিলম্ব হয়ে গেল। প্রায় চার দণ্ডকাল সময় লাগল সেই অনতিদূরত্ব অতিক্রম করতে। গরম তো আছেই—অত রাত্রেও বাতাস শীতল হয় নি—তাতে আবার পরনে দুপ্রস্থ জামা, ওড়না, বোরখা—এর ওপর আছে ডুলির চার পাশে ভেলভেটের ঘেরাটোপ। প্রাণ কণ্ঠাগত হবার পক্ষে এই-ই যথেষ্ট কিন্তু এসব দৈহিক অস্বাচ্ছন্দ্যের থেকে ঢের বেশী অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছে দুশ্চিন্তা ও আশঙ্কা। যদি কেউ রাত্রে খোঁজ করে, যদি হঠাৎ মালিকেরই খেয়াল হয় আর তার ফলে ওর এই গোপন অভিযান ধরা পড়ে তাহলে,—তাহলে যে কী হবে তা ভাবতেই পারছে না মেয়েটি। দেবার মতো কোন কৈফিয়ৎই নেই, দিতেও পারবে না। আর এই উত্তরের অভাবই ওর বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে। আর তার অবশ্যম্ভাবী ফল কী হবে তাও ওর জানা। মালিকের স্নেহভাজন হওয়ার পরও যারা কোন রকম বিশ্বাসঘাতকতা করে—বিশেষত স্ত্রীলোকরা যদি অন্য পুরুষে আসক্ত হয়—তাদের জন্য একটিই মাত্র শাস্তির ব্যবস্থা আছে—জীবন্ত সমাধি দেওয়া।...

এতক্ষণ, সেই অপরাহ্নেরও পূর্ব থেকে—একান্ত মনে এই যাওয়ার কথাটাই ভেবেছিল, শুধু তার উপায়টাই ছিল সর্বাগ্র-চিন্তা, তাই অন্য কোন কথা, যেমন এই সব বিপদের সম্ভাবনাগুলো, ভেবে দেখার অবসর পায় নি। কিন্তু এখন ডুলিতে বসে, এতক্ষণ পর্যন্ত সমস্ত বাধাবিঘ্ন নিরাপদে অতিক্রম করে আসার ফলে কিছুটা নিরুদ্বিগ্ন হতে নতুন উদ্বেগ এবং দুশ্চিন্তা যেন ভীড় ক'রে এসে জুটল ওর মাথায়। অমঙ্গল বা বিপদ যা যা ঘটতে পারে তার ছবি ভয়াবহ রকমের বহুগুণ বর্ধিত আকারে ওর মানসচক্ষে ভেসে উঠতে লাগল। ঘেমে তো নেয়ে উঠেছিলই, এখন গা-মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত ডাক ছেড়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হল যেন—মনে হ'ল শৈশবের মতো কেঁদে পরিত্রাণ পায় সে তার অদৃষ্টের হাত থেকে। ভয় হ'তে লাগল যে আর বেশীক্ষণ এই ভাবে বসে থাকতে হ'লে এর মধ্যেই মরে পড়ে থাকবে সে।

যাই হোক—মৃত্যু না হোক মূর্ছার বেশী বিলম্ব ছিল না হয়ত, কিন্তু সে রকম কোন চরম পরিণতির আগেই এক সময় ওরা গন্তব্যস্থানে পেঁৗছে গেল। যেখানে ডুলি থামল সেটাও একটা প্রাসাদের পিছন দিক।

ওদের মালিকের বাসগৃহের মতো অত বড় না হ'লেও—এটাও যে কোন ধনীগৃহ তা বুঝতে দেরি হয় না।

ডুলিওয়ালারা ডুলি নামাতে প্রহরিণী ঘেরাটোপের দুই প্রান্ত সরিয়ে মেয়েটিকে এক রকম টেনেই বার করল ভেতর থেকে। ওর যে এইরকম একটা অবস্থা হবে, বয়স্কা প্রহরিণী আগেই অনুমান করেছিল তা। শেষের দিকটা মূর্ছিত বিহ্বলের মতো বসে ছিল মেয়েটি, কোথায় যাচ্ছে, কী কাজে, তাও যেন আর মাথাতে ঢুকছিল না। চিন্তা করার শক্তি এমন কি বাহ্য-অনুভূতিই যেন লোপ পেয়ে এসেছিল একটু একটু ক'রে। কাজেই মাটিতে নেমেও, দাঁড়াবার ক্ষমতা ফিরে পেতে সময় লাগল। হয়ত পড়েই যেত—প্রহরিণী অবস্থা বুঝে এক হাতে জড়িয়ে ধরে সম্পূর্ণ ভারটা নিজের ওপর রাখাতেই সেটা হ'তে পারল না।

অবশ্য বাইরের ঠাণ্ডা বাতাস, পায়ের নিচে কঠিন মাটি এবং প্রহরিণীর বলিষ্ঠ হাতের পরুষ স্পর্শে সম্বিৎ ফিরে পেতে বিলম্ব হ'ল না। সূক্ষ্ম মসলিনের রুমালখানা কামিজের জেব থেকে বার করে সে কপালের ও চোখের-খাঁজে-জমে-থাকা ঘাম মুছে নিয়ে বোরখাটা ভাল ক'রে জড়িয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেল! এবার কিন্তু আর পাঁচিলের দিকে নয়, সোজা-সুজি সামনের বড় ফটকের দিকেই।

ফটক তখন বন্ধ, অতরাত্রে বন্ধ থাকবারই তো কথা—মেয়েটি তা জানে। কিন্তু এও জানে যে অন্তত দু'জন পাহারাদার ঐ ফটকের ভেতর দিকে থাকবে, ফটকের পাহারা এসব বাড়িতে দিন-রাতই থাকে—আর মানুষের সাড়া পেলে কি মানুষ আসতে দেখলে তারাও এগিয়ে আসবে সামনের দিকে। তবে ফটক ভেতর থেকেই বন্ধ যখন তখন হঠাৎই কেউ তাকে আক্রমণ করবে না।

দেখা গেল এ বাড়ির পাহারার ব্যবস্থা ভাল, প্রহরীরা শুধু সজাগ নয়, সদাসতর্ক। ফটকের সামনে পাথর-বাঁধানো প্রশস্ত রাস্তায় ওদের খালি পায়ের সামান্য শব্দ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই ফটকের দুটি বড় থামের আড়াল থেকে দু'জন পাহারাদার যেন অন্ধকার শূন্যতা থেকে কোন জাদুবলে মূর্তি পরিগ্রহ ক'রে বেরিয়ে এল এবং ফটকের ভেতর থেকে বন্দুকের নল বার ক'রে চাপা অথচ তীক্ষ্ম কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'কে আসে ওখানে? দাঁড়াও, জবাব দাও, নইলে খত্‌রা ঘটবে।'

'দোস্ত্‌ আমরা' মেয়েটি কোন কথা বলার আগেই প্রহরিণী ওদের মতোই চাপা গলায় বলে উঠল।

'দোস্ত্‌! জেনানী দোস্ত্‌! তওবা, তওবা!' একজন পাহারাওয়ালা ওরই মধ্যে রসিকতার লোভ সামলাতে পারল না, 'কী রকম দোস্ত্‌ তোমরা? উমর কতো? কার সঙ্গে দোস্তী করতে এসেছ? না কি দু'জনের সঙ্গেই?'

'দিল্লগী থাক।' প্রহরিণী তেমনি চাপা গলাতেই ধমক দেয়, 'আমরা তোমাদের সঙ্গে মস্করা করতে আসি নি। কাজ আছে আমাদের, জরুরী

কাজ ?'

'কাজ!' ভ্রূকুটি ক'রে বলল প্রহরী, 'কাজ মানে কি? কী কাজ, কাকে দরকার ?'

'দরকার তোমাদের মালিককে। তোমাদের মতো পাহারাদারের সঙ্গে আমাদের দরকার থাকতে পারে না—এটা বোঝা উচিত।'

'বাহবা বা। বিবিজী বেশ দেলোয়ার আওরৎ বলে মনে হচ্ছে। কিন্তু কী দরের মানুষ তোমরা তা এই আঁধেরাতে কী ক'রে বুঝব বলো, বিশেষ এই সামনে যিনি তিনি তো বোরখায় সর্বাঙ্গ ঢেকে এসেছেন; তা যাক গে মরুক গে—যদি অপরাধ হয়ে থাকে তো ক্ষ্যামাঘেন্না ক'রে মানিয়ে নিও। এখন কাজটা কি বলো দিকি? যদি সত্যিই কোনো কাজের কথা থাকে তো বলো, নইলে চটপট সরে পড়ো।'

'কাজ তো বললুম—তোমাদের মনিবের সঙ্গে।'

'বা জী বা! আমাদের মালিক কি মোড়ের ঐ তামাকুর দোকানের হবিব মিয়া যে—যে-কেউ ডাকবে ঝাঁপ খুলে শশব্যস্তে বেরিয়ে আসবে? এখন ক' ঘড়ি বেজেছে তা খেয়াল আছে? এমন কে মেহমান তোমরা আসছ যে মালিক তোমাদের জন্যে জেগে বসে থাকবেন? ওসব ছাড়ো, মানে মানে সরে পড়ো। দুপুর রাতে এ সব তামাশা ভাল লাগছে না!'

'এসব তামাশা আমাদেরও ভাল লাগছে না। তা তাতে দরকারই বা কি. সোজাসুজি মালিককেই এত্তেলা দাও। বলো যে দুজন জেনানা তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চায়।'

'বেশ কথাটা বললে! সত্যি! কেন—তোমরা কি আমাদের গর্দানে দশটা ক'রে শির দেখেছ? এত রাত্তিরে যাওয়ার মতো এই এত্তেলা দিতে গেলে তখনই আমাদের শির যাবে—নিশ্চিন্ত থাকো। তাছাড়া আমরা ফটকের পাহারাদার, এই বাগিচা পর্যন্ত আমাদের হুদ্দো, মকানে ওঠারই এক্তিয়ার নেই। সেখানে আলাদা পাহারা, খোজা মীরমদন খাঁ ওখানের সর্দার, তার সামনে গিয়ে এই কথা নিয়ে দাঁড়াবার হেমাকৎ আমাদের নেই।'

'বেশ, তাহলে ফটক খোল, আমরাই যাই'—প্রহরিণী বলে ওঠে।

'আলবৎ। এ তো হক কথা। কিন্তু জানো তো বিবিজী, এই রাত-দুপুরে এসব বাড়ির ফটক খোল বললেই খোলানো যায় না। ফটক খোলাতে চাও—ইশারা বাতাও আজকের রাতের—যে কুঞ্জীতে ফটক খুলবে তা বার করো।'

প্রহরিণী আবারও কি বলতে যাচ্ছিল, হাতের ইঙ্গিতে তাকে নিরস্ত ক'রে কিশোরী বাঁদীটি এগিয়ে এল। বলল, 'ফটক খোলবার দরকার নেই, আমরা ভেতরে যেতে চাই না। যে কাজে এসেছি সেটা সারা হলেই ঢের। একটা জিনিস শুধু রেখে যেতে চাই—তোমাদের মালিকের জন্যে। এটা কাল ভোরবেলা মালিকের ঘুম ভাঙলে তাঁকে দিয়ে দিও, ব'লো যে এক আওরৎ এটা তাঁকে দিয়ে গেছে। এ দেখলেই তিনি বুঝতে পারবেন। খুব জরুরী ব্যাপার এটা—যদি খুব ফজিরেই তাঁর কাছে না পেঁছয় তাহলে

তোমাদেরই এর জন্যে জবাবদিহি করতে হবে, গর্দান যাওয়াও বিচিত্র নয়।'

'বটে! বটে! এমন চীজ! তা তুমি এই রাত দুপুরে এ তাজ্জব চীজ কোথা থেকে পেলে জাদু! গলা শুনে তো মনে হচ্ছে নেহাৎই নওজোয়ান লেড়কী তুমি! মোদ্দা এই বয়সেই অনেক ফন্দী আসে তো! বলি মতলবটা কি বলো দিকি? কোথায় থাকো তুমি? কোথা থেকে এলে, এলে তো সন্ধ্যের দিকে এলে না কেন? কিম্বা কাল ফজরে? এতই যদি জরুরী চীজ তো এই অসময়ে নিয়ে এলে কেন—জানো তো কোন ভদ্দরলোক এ সময়ে জেগে বসে থাকে না!'

স্পষ্ট অবিশ্বাস ও বিদ্রূপ পাহারাদারের কণ্ঠে।

বালিকাও ঈষৎ ধৈর্য হারায় এবার, অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে, 'অত কৈফিয়তে তোমার দরকার কি? আমি তো লুকিয়ে আসার চেষ্টা করি নি, সোজাসুজি সামনের রাস্তা দিয়ে বড় ফটকে এসেছি। আর আমি কিছু ভেতরেও ঢুকতে চাইছি না। একটা ছোট জিনিস দিয়ে যাচ্ছি—মনিবকে গিয়ে দেবে, এতে তোমার এত ভয় কিসের?'

'ঠিক আছে।' অন্য পাহারাদারটি এতক্ষণ চুপ করে ছিল, সে এবার প্রথমজনাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে এগিয়ে এল, 'ঠিকই বলেছ তুমি। এত কথায় আমাদের সত্যিই কোন দরকার নেই। শুধু একটা কথা—কী আছে এতে তা না জেনে তো মালিককে দিতে পারব না। মনে হচ্ছে আমাদের মালিককে চেন তুমি—তাহ'লে কেমন মানুষ তাও নিশ্চয় তোমার জানা আছে।...কোন গাফিলি মাফ করা তাঁর কেতাবে লেখা নেই, ও শব্দটাই কোন পুঁথিতে পড়েন নি তিনি। কাজে ভুলচুক হ'লে কোন কৈফিয়ৎ নেওয়াও তাঁর অভ্যাস নেই। হয় কাজ হাসিল করা চাই—নইলে গাফিলতির সাজা পেতে হবে। তুমি যা দিতে বলছ তা যদি কোন খতরার জিনিস হয় —বা এমন কিছু হয় যাতে তাঁর অপমান বোধ হ'তে পারে—তুমি কি মতলবে দিচ্ছ তা তো জানি না, তাঁকে অপমান করবার মতলবেই হয়ত এই গভীর রাতে ষড় ক'রে এসেছ—যা-শত্রু পরে-পরে—তোমার কাজ হাসিল হয়ে গেল, মনের ঝাল মিটল অথচ তার দায়টা পড়ল আমাদের ঘাড়ে—সে ক্ষেত্রে হাত পেতে নেওয়ার মানেই হ'ল আমাদের কয়েদ হওয়া বা গর্দান যাওয়া—আর আমাদের জরু ছাওয়ালের শুকিয়ে মরা। কাজেই ভাই বিবিজান, ওটা পেরে উঠব না। ভোর অবধি অপেক্ষা করো, মালিক উঠুন তাঁকে এত্তেলা পাঠাই—জিজ্ঞেস করি যে এক আনজান লেড়কীর কাছ থেকে কোন জিনিস নেব কি না—তারপর তাঁর হুকুম হ'লে অবিশ্যি নেব, কেন নেব না? আমাদের কি আপত্তি বলো না!'

এই বলে, নিজের মোচের দুই প্রান্তে একবার তা দিয়ে, চাপা গলায় একটু হেসেও নিল। নিজেরই বুদ্ধির তারিফের হাসি এটা।

'কিম্বা' প্রথমজন এতক্ষণ পরে একটু ফাঁক পেয়ে শুরু করল আবার, 'কী জিনিস দেখাও আগে, যদি বুঝি কোন বুরা চীজ নয়—তাহ'লে তোমার আরজিটা বিবেচনা ক'রে দেখব আর একবার।'

'দেখবে কিসে—এই আঁধিয়ারে? আলো কোথায়?' বাঁদী শান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

'আছে, আছে। হুঁ-হুঁ, সে ব্যবস্থাও আছে। ফটকের পাশে আমাদের যে ঘর তাতে আঁধারে-লণ্ঠন আছে একটা। সে আলো চারিদিকে পড়ে না—শুধু একটা ছুঁচের মতো মুখ আছে, সেইখান দিয়ে আলো এসে পড়ে একটু। তবে তাতে দেখা যায়—কাছে নিয়ে গিয়ে ধরলে।'

'তবে নিয়ে এসো তোমাদের সে লণ্ঠন। আমার দেখাতে কোন আপত্তি নেই।'

মুখের ওপর বোরখাটা আরও ভাল ক'রে টেনে দিয়ে হাতের জিনিসটা বাড়িয়ে ধরে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়ায়।

ফটকের থামের পাশেই পাহারাদারদের ছোট চোরা কুট্‌রী, ছুটে গিয়ে সেখান থেকে লণ্ঠন আনতে দেরি হ'ল না ওদের। আলোটা বাগিয়ে ধরে ওরা দু'জনেই ঝুঁকে পড়ল জিনিসটা দেখতে। কিন্তু দেখতে দেখতে সে আগ্রহ বিস্ময়ে পরিণত হ'ল। একটু দেরি হয়েছিল বুঝতে জিনিসটা কি, কারণ কল্পনার রাশ সম্পূর্ণ আলগা ক'রে দিয়েও এ জিনিসের নাগাল পায় নি ওরা। বেশ কিছুক্ষণ ওদের দু'জনের বাক্যস্ফূর্তি হ'ল না। তারপর দু'জনেরই মুখ দিয়ে একটা টানা যে শব্দ উচ্চারিত হ'ল তা একটা দীর্ঘায়ত 'দু্য—স্' ছাড়া আর কিছু নয়।

তারপরই চাপা কণ্ঠের রোষে ফেটে পড়ল যেন, 'তুমি এই রাতদুপুরে এক খিলৌনা নিয়ে তামাশা করতে এসেছ আমাদের সঙ্গে! দিল্লগীর আর জাগা পাও নি! জানো যে আমাদের ওপর দরাজ হুকুম দেওয়া আছে—তেমন বুঝলে জেনানা বলে রেয়াৎ করব না! পালাও শিগ্‌গির আমাদের সামনে থেকে, বেমালুম ফর্সা হয়ে যাও—নইলে এক এক গুলিতে তোমাদের মাথার ঘিলু বার ক'রে ফুটানি ভেঙ্গে দেব চিরকালের মতো।...কুত্তীর সাজাই হচ্ছে মার—এ আমরা বিলক্ষণ জানি।'

বাঁদী এ অপমানেও বিশেষ বিচলিত হ'ল বলে মনে হ'ল না। তিরস্কারে তো নয়ই। শুধু এবার তার শুভ্র সুন্দর এক মুঠো চামেলি ফুলের মতো নরম বাঁ হাতখানাও বোরখার মধ্য থেকে বার ক'রে আঁধারে লণ্ঠনের সেই অতি সামান্য আলোকে মেলে ধরল ওদের লুব্ধ দৃষ্টির সামনে। ওদের মতোই চাপা মৃদু কণ্ঠে ধমক দিয়ে উঠল, 'থামো! এত তো মালিকের দোহাই দিচ্ছ। সে দোহাই আমিও দিতে জানি। এটা কি দেখতে পাচ্ছ? চেনো?'

চাঁপার পাপড়ির মতো ঈষৎ বাঁকা নমনীয় যে আঙ্গুলগুলো প্রসারিত ওদের সামনে, মাথা ঘুরে যাবার পক্ষে তা-ই যথেষ্ট; আর যা-ই হোক, এ হাত এ আঙ্গুল কোন সামান্য 'মুলুকী' গাঁওয়ার মেয়ের হ'তে পারে না, খেটে-খাওয়া কোন গরীব আওরতেরও নয়—বড় কোন খানদানী ঘরের মেয়ে নিশ্চয়, শাহী হারেমের উপযুক্ত। ফুলের মতো হাত, ফুলের মতোই মুখও হবে—কিন্তু সে ফুলও সাধারণ বাগিচার নয়।

তবু সেটাই বড় কথা নয়। এই পদ্মের পাপড়ির মতো হাতের তালুতে যে বস্তুটা এই ক্ষীণ আলোতেও ঝকমক করছে—সেটার দিকে চেয়ে নিমেষে ঘেমে উঠল দু'জন সিপাহীই, পা দুটো অল্প অল্প কাঁপতে লাগল ওদের, তালু থেকে কণ্ঠ অবধি শুকিয়ে গেল ভয়ে। মেয়েটির হাতের বস্তুটি নিতান্তই একটা আংটি মাত্র—কিন্তু ওদের কাছে যদি শুধু একটা আংটিই হ'ত এটা!...এ আংটি ওরা চেনে। এ যার কাছে থাকতে পারে—সে সামান্য মানুষ নয়। এতক্ষণ যে ভাষায় কথা কয়েছে এর সঙ্গে, যে ঔদ্ধত্য ও ধৃষ্টতা প্রকাশ করেছে, তার শতাংশের একাংশও যদি মালিকের কানে পেঁছয় তাহ'লে যে কী অবস্থা হবে তা ভাবতেও পারছে না ওরা। সে চিন্তার সূচনাতে, অস্পষ্ট একটা কল্পনাতেই ওদের এই দিশাহারা অবস্থা।...

বিস্ময়ের প্রথম ধাক্কাটা সামলে উঠতে সময় লাগল কিছু। তারপরই, দু'জনে প্রায় একসঙ্গে 'তওবা', 'তওবা' উচ্চারণ করতে করতে আভূমি একটা সেলাম করল, ওকে কিম্বা আংটিটাকে ঠিক বোঝা গেল না—তারপর যেন কাঁপতে কাঁপতে বলল, 'কী সর্বনাশ। এ যে জনাবালির মোহরী আংটি! মুহর্-ই-সুলেমান!'

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

প্রস্ফুট পদ্মদল আবার কোরকে পরিণত হ'ল বুঝি। মুঠিটা বন্ধ হয়ে গেল, হাতটাও ঢুকে গেল বোরখার মধ্যে—বিহ্বল হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল সিপাহীরা। চেয়ে দেখল এবং চেয়েই রইল। শুনল যেন কোন্ দূরাগত শব্দ—মেয়েটি বলছে, 'হ্যাঁ, তাই। এখন তো বুঝলে এ কুত্তী মিছিমিছি এই রাত-দুপুরে দিল্লগী করতে আসে নি। কাজেই যা বলছি তা শোন—এটা কাল ফজরেই পেঁছে দিও তোমাদের জনাবালিকে। ব'লো যে তাঁর এক বাঁদী, এক নগণ্যা সেবিকা এটা দিয়ে গেছে, এর অর্থ তিনি ঠিক বুঝতে পারবেন এই ভরসায়।'

আর দাঁড়াল না বাঁদী। এদের তরফ থেকে কোন বাদ-প্রতিবাদ কিম্বা অন্য কোন যুক্তি অবতারণার অবসর দিল না। তার কাজ হয়ে গেছে। ফটকের মধ্য দিয়েই একজনের শিথিল হাতে সেই বস্তুটা ধরিয়ে দিতে পেরেছে, ওদের ভাষায় 'খিলৌনা'। আর কোনও কথা উঠবে না তা সে জানে, এদের আর সাধ্য নেই কোন কথা বলার। এ অঙ্গুরীর মূল্য—অঙ্গুরী যেদিন পায় সেদিন বোঝে নি, আজ বুঝছে। এটা যে এমনভাবে কাজে লাগবে তা ভাবে নি এতদিন। কাজে লাগবে বলে এতকাল নিভৃতে গোপনে সকল চক্ষুর অন্তরালে রক্ষা করে নি একে। অতি দুঃখের, অতি বেদনার স্মৃতি এটা; দুঃসহ দুঃখ এবং অপরিসীম বেদনার সঙ্গে জড়িত সে স্মৃতি—তবু সে দুঃখও যে বড় মধুর, সে বেদনাও যে কাম্য। সে স্মৃতি তিলে তিলে দগ্ধ করেছে ওকে, করেছে ক্ষতবিক্ষত—তবু তার রোমন্থন ত্যাগ করতে পারে নি। ত্যাগ করতে চায়ও নি। কারণ তা পীড়ন করেছে যেমন—তেমনি অদ্ভুত অনির্বচনীয় একটা আনন্দও দিয়েছে! নিমের মধুর

মতোই সে স্মৃতির স্বাদ, কটু কিন্তু মিষ্টও। মিষ্টত্বই বুঝি বেশী—তিক্ততার চেয়ে।...

তবে আজ সে ভেবে চিন্তেই এ আংটি সঙ্গে এনেছে, কাজে লাগতে পারে জেনেই। কাজে যে লেগেছে এতে তার খুশির সীমা নেই। সত্যিই আজ সে তৃপ্ত, সে সুখী। এত দিনের এত যত্ন ক'রে রাখা সফল হয়েছে। এই স্মারকচিহ্নকে উপলক্ষ্য ক'রে যাঁকে পূজা ক'রে এসেছে সে, তাঁরই কাজে লেগেছে এটা—এতেই ওর সুখ। তিনি জানুন বা না জানুন ও আজ ধন্য, কৃতার্থ।

বাঁদী নিশ্চিন্ত হয়ে পিছন ফিরল। ডুলিওয়ালারা প্রস্তুতই ছিল, সে এসে ডুলিতে চড়া মাত্র তারা কাঁধে তুলে নিল। দেখতে দেখতে ডুলি, তার দু'জন বাহক এবং সেই প্রহরিণী অন্ধকারে মিলিয়ে গেল পিছন দিকের নির্জন বিসর্পিল পথে। মনে হ'ল যেন চারিদিক থেকে তরল অন্ধকার এসে গ্রাস করল চারটি প্রাণীর সেই মিলিত জীবন-বিন্দুটিকে।

দ্রুত চলল ডুলি। প্রায় ছুটেই চলল বাহকরা, দ্রুতই চলতে হবে তাদের; শেষা কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ উঠতে আর দেরি নেই, আকাশে তার আভাস দেখা দিয়েছে। ভোর হ'তেও দেরি নেই বিশেষ, এই চাঁদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্যের আবির্ভাবও ঘোষিত হবে উদয়দিগন্তে। সে পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না কিছুতেই। নিশাচর এরা—আঁধারচারী, তিমিরাবসানের পূর্বেই এদের গিয়ে নিজ নিজ কোটরে আশ্রয় নিতে হবে। ওদের এই নৈশ অভিযানের কথা, এই প্রায়-অভিসারের কথা কাউকে জানানো চলবে না, মিথ্যায় এর শুরু, শেষ পর্যন্ত মিথ্যাতে ঢেকে রাখতে হবে এ ইতিহাস। অন্ধকার আর মিথ্যার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। সত্য গোপনের জন্যও আঁধারের বড় প্রয়োজন। আলোর সঙ্গে মিথ্যার চির-বিবাদ।

অবশ্য এরা পারবে তা। পূর্ব দিগন্তে আলোকোৎসব শুরু হবার বহু পূর্বেই ওরা পেঁাছে যাবে নিজেদের আশ্রয়ে। বাঁদী একবার ঘেরাটোপ সরিয়ে আকাশের অবস্থা দেখে নিল। এখনও দুই দণ্ড সময় আছে হাতে, তার মধ্যেই পেঁাছে দেবে বাহকরা। বক্‌শিসের লোভে যত না হোক, নিজেদের প্রাণের দায়েও।

নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসল সে। গরম এখনও হচ্ছে কিন্তু তা আর অত কষ্টকর মনে হচ্ছে না। কিছু পূর্বের সেই আতঙ্কের আভাস মাত্র নেই তার মনে।...ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিল সে। ডান হাতখানা কপালে ঠেকিয়ে সোজা নামিয়ে বুকে ঠেকাল একবার, তারপর এক কাঁধ থেকে আর এক কাঁধ পর্যন্ত সেইভাবে যেন এক অদৃশ্য সরল রেখা আঁকল। বহুদিনের—শৈশবের শিক্ষা এটা, কিন্তু আজও ভোলে নি।

ঈশ্বরের পুত্র যে দুই কাঠের তৈরী যন্ত্রে নিহত হয়েছিলেন, এ তারই প্রতীকচিহ্ন। এই চিহ্ন আঁকলে তাঁকেই স্মরণ করা হয় নাকি, তাঁকে ধন্যবাদ জানানো হয়।

ঈশ্বরকে ধন্যবাদই জানাল সে, অন্তরের সঙ্গে।

॥ ১ ॥

এ যেন কোথা দিয়ে কী হয়ে গেল!

অকস্মাৎ খুব কাছে বজ্রপাত হ'লে নাকি মানুষের এমনি স্তম্ভিত অবস্থা হয়; কিন্তু সে রকম কোন প্রাকৃতিক বিপর্যয় না ঘটে, ঈশ্বরের প্রবল রোষ নেমে না এসেও যে এমন হ'তে পারে তা কে জানত! এখানে উপস্থিত কেউ কেউ সে রকম অবস্থাও দেখেছেন, এ যেন তার চেয়েও বেশী। একটি মানুষের সামান্য একটি আচরণে ও ছোট্ট একটি কথায়—মনে হ'ল সেখানে উপস্থিত সব কটি প্রাণী যেন নিমেষে পাথর হয়ে গেলেন।

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব সাহসী তা সবাই জানে কিন্তু তিনি যে এমন দুঃসাহসী তা কেউ কোন দিন ভাবতে পারে নি। এর চেয়ে কামানের গোলার মুখে বুক পেতে দাঁড়ানোও যে ঢের সোজা। ছোট বেলায় শুধু তলোয়ার হাতে মাটিতে দাঁড়িয়ে পাগলা হাতীর সঙ্গে লড়াই করতে গিয়েছিলেন বলে বাদশা ওঁকে প্রচুর খেলাত ও 'বাহাদুর' উপাধি দিয়েছিলেন—কিন্তু সে বাহাদুরীও আজ এ আচরণের কাছে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর মনে হ'ল। এমন ধৃষ্টতার কথা কী ক'রে ভাবতে পারলেন তিনি সেইটেই তো আশ্চর্য। পরমেশ্বর খুদা সর্বশক্তিমান ঠিকই—কিন্তু তিনি আপাত-অপ্রত্যক্ষ, বহুদূর। সর্বতোপূর্ণ বে-নিয়াজ বাদশা-সালামৎ শাহানশাহ্‌ প্রত্যক্ষ ও অদূরবর্তী—সে-হেতু অধিকতর ভয়ঙ্কর। এঁর ক্রোধ আলেম-ইমাম বর্ণিত সুদূর কোন সম্ভাবনা নয়, মৃত্যুর পর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয় না তার পরিচয় পাবার জন্য—বাদশার রুদ্র রোষ সদ্য এবং অমোঘ, ঢের বেশী বাস্তব। সুধমাত্র তাঁর ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটিতেই তো ভস্মীভূত হয়ে যাবার কথা। শাহ্‌জাদাও তো তা জানেন, এক লহমায় কত লোককে বিনষ্ট হ'তে দেখেছেন তো নিজের চোখেই। পদমর্যাদা, প্রতিপত্তি, পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত ঐশ্বর্য, ঘরবাড়ি—মায় সন্তানসন্ততির প্রাণসুদ্ধ কিছুই তো রেহাই পায় নি।

তবে এ বেয়াদবির সাহস পান কোথা থেকে তিনি? এতখানি ভরসা আসে কোথা থেকে?

স্বয়ং বাদশাও এই প্রশ্ন করেন নিজেকে বারবার।

তবে কি তিনি বেঁচে নেই আর? এ কি তিনি কবরের নিচে থেকে চেয়ে দেখছেন?

না কি—খোয়াব দেখছেন তিনি, এর কোনটাই বাস্তব সত্য নয়।

কিম্বা তাঁর সিংহাসনই কেড়ে নিয়েছে কেউ—তিনি এখন নাচার নালায়েকের পর্যায়ে পড়েছেন?

নইলে এরকম তো হবার কথা নয় কোন মতেই।

তিনি তামাম হিন্দুস্তানের ভাগ্যবিধাতা, শাহানশাহ্‌ আবুল

মুজফ্ফর শিহাবউদ্দীন মুহম্মদ সাহিব-ই-কিরান, শাহ্জাহান, পাদশা গাজী—জীবিত এবং শাহীতখ্তে উপবিষ্ট থাকতেই এই ঔদ্ধত্য দেখতে হবে কেন?

কিসের এত ভরসা ওর? ও কি ভেবেছে যে তিনি একটু বেশী সন্তানবৎসল বলে তাঁর পুত্রস্নেহের সুযোগে এত বড় বেতমীজি ক'রেও নিস্তার পেয়ে যাবে? কোন কারণেই তিনি ছেলেকে শাস্তি দেবেন না, এই বোধ হয় ওর বিশ্বাস!

হায় রে মূর্খ! এ যে কত বড় ভুল তা যখন বুঝবে তখন যে আর অনুশোচনারও অবকাশ পাবে না!...তিনি স্নেহপরায়ণ পিতা হ'তে পারেন কিন্তু তিনি এত বড় সাম্রাজ্যের শাসকও। বাদশা সর্বাগ্রে বাদশা—তারপর সংসারী মানুষ। পিতা, স্বামী, পুত্র—কোনটাই তাঁর সম্যক পরিচয় নয়—বাদশা ছাড়া।

নিজের সন্তান বলে এতবড় গোস্তাকীও যদি আজ তিনি মাফ্ করেন তো কাল এ মুলুকের কেউ তাঁকে ভয় করবে না, মান্য করবে না। সন্তান ব'লে আরও কঠোর হ'তে হবে তাঁকে, কিছুমাত্র দয়ামায়া করা চলবে না। অন্তরে যত আঘাতই লাগুক তাঁর এ নাদানির প্রাপ্য সাজা তাঁকে দিতেই হবে।...

অথচ এর কোন প্রয়োজনই তো ছিল না।

বরং নাই আসতে পারত আদৌ। তাতে কিছুই মনে করতেন না তিনি।

তিনিও না, গৃহস্বামীও না।

বাদশা তো তাই-ই ভেবেছিলেন প্রথমে। আওরঙ্গজেব এ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করতে রাজী হবেন না, সবিনয় সৌজন্যের সঙ্গে কোন যুক্তি-সহ মধুর কৈফিয়তে এড়িয়ে যাবেন—এই ছিল তাঁর ধারণা। তাঁর প্রথম ও তৃতীয় পুত্রের মধ্যে যে কিছুমাত্র প্রীতির সম্পর্ক নেই, তা এ মুলুকের কে না জানে! ওদের এ আদাওতি রেষারেষি বোধ করি আজ তামাম হিন্দুস্তানের কহানী-কিস্সার উপাদান হয়ে উঠেছে। আওরঙ্গজেবের বিশ্বাস তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা দারা শুকোহ্ বাদশার প্রিয়তম পুত্র, নয়নের মণি; আর তিনি ওঁর দৃষ্টিশূল। তাঁর আরও বিশ্বাস যে, এ অকারণ পক্ষপাত একেবারেই অপাত্রে ন্যস্ত হয়েছে। রীতিমতো বে-ইনসাফি এটা—অবিচার। এই অবারিত উদার প্রশ্রয় পাবার কোন যোগ্যতাই তাঁর জ্যেষ্ঠ অগ্রজের নেই।

দারা সম্বন্ধে তাঁর এ মনোভাব আওরঙ্গজেব গোপন করারও বিশেষ চেষ্টা করেন নি। বরং এমন সব আসরে অনুযোগ করেছেন যাতে শাহান-শাহের কর্ণগোচর হওয়া সম্বন্ধে তিনি নিশ্চিত হ'তে পারেন। দারা আজ পর্যন্ত না যুদ্ধে, না রাজ্য-সংগঠনে বা শাসনে—কোথাও কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নি। পিতার স্নেহচ্ছত্রচ্ছায়ায় আরামে আলস্যে ও বিলাসে প্রতিপালিত হচ্ছেন মাত্র। অথচ এই অকর্মণ্য অপদার্থ নকারা পুত্রটির উপরেই শাহানশাহের অকৃপণ অনুগ্রহ। কারণে অকারণে লক্ষ

লক্ষ টাকা, মোহর, জহরৎ ও খিলাত বর্ষিত হচ্ছে, জায়গীরের পর জায়গীর লিখে দেওয়া হচ্ছে তাঁকে। একমাত্র গুণ দারাশুকোর যে তিনি সর্বদা পিতার কাছে কাছে থাকেন। কিন্তু সেও তো বাদশারই ব্যবস্থা। তিনিই অন্য ছেলেদের দূরে দূরে পাঠিয়ে দেন; সুবাদার বা নাজিম ক'রে—কিংবা কোন লড়াইতে প্রধান সেনানায়ক ক'রে।

আওরঙ্গজেবের এসব অভিযোগ বাদশা অবগত আছেন। বিশেষ ক'রে কন্যা জাহান্-আরার মারফৎ এসব খবর নিয়মিত পান তিনি। অন্তঃপুরের সব খবরই সে সংগ্রহ ক'রে এনে দেয়। ভাইদের সকলকার বাড়িই তার অবাধ গতিবিধি, সকলেই তাকে বিশ্বাস করে, সম্ভ্রম করে।

ভাইয়ে ভাইয়ে এরকম মনোভাব যে ভাল নয়—বিশেষত তাঁর পুত্রদের মধ্যে, তা বাদশাও বোঝেন। ঈর্ষা থেকে বিদ্বেষ বেশী দূর নয়। এমনিই, লোভ বলবান। এত বড় বিপুল সাম্রাজ্যের তখ্‌ৎ তাঁর কোন ছেলেই সহজে ছেড়ে দেবে না, একটা লড়াই ঝগড়া বাধবেই। কতকটা সেই জন্যেই আরও তিনি অন্য ছেলেদের দূরে দূরে রাখেন। হঠাৎ কোনদিন আকস্মিক কোন কারণে তাঁর এন্তেকাল হ'লে তারা রাজধানীতে পেঁছিবার আগেই তখ্‌ৎ এবং তার আনুষঙ্গিক সেলেখানা ও শাহী খাজানা দখল ক'রে বসতে পারবেন দারা শুকোহ। তখন অন্য ভাইদের দমন করা শক্ত হবে না তাঁর পক্ষে। বাদশা অবশ্য বলে যাবেন—বার বার বলে রেখেওছেন ইতিমধ্যেই—দারা যাতে অন্য ভাইদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন, যেন একটু স্নেহ ও প্রশ্রয়ের চোখে দেখেন। তারা যেমন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে শাসক হয়ে আছে তেমনিই যেন থাকতে পায়। দারাও তা করবেন—পিতার কাছে শপথ করেছেন।

অবশ্য এই কাছে রাখাটা জাহান্-আরাও সমর্থন করে না বিশেষ। সে বলে—আওরঙ্গজেবের মতো বিদ্বেষ থেকে নয়, দারার কল্যাণ ভেবেই—যে এতে ক'রে তিনি একেবারে অপদার্থ নাজুক ক'রেই তুলছেন তাঁর প্রিয়তম জ্যেষ্ঠ পুত্রকে। হাতে কলমে কিছু করার সুযোগ না থাকায় তিনি শাসনকার্য বা যুদ্ধকৌশল কিছুই শিখতে পেলেন না। শুধুই শাস্ত্রচর্চায় এবং লেখাপড়ায় অমূল্য সময় কাটিয়ে দিচ্ছেন দারা শুকোহ্। জ্ঞানচর্চা খারাপ কাজ নয়—খুবই ভাল বরং, কিন্তু সম্রাটপুত্র এবং ভাবী সম্রাটের পুঁথির বাইরেও অনেক কিছু শেখবার আছে। বিদ্যা যতই বাড়ুক, এই অহর্নিশ ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনশাস্ত্র চর্চা করার ফলে—কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতা কিছুমাত্র লাভ হচ্ছে না। এর পর যখন একদা এই বিরাট মুলুকের শাসন ও রক্ষণের ভার তাঁর ওপর এসে পড়বে তখন কী ক'রে সামলাবেন তিনি সব দিক? বাদশা এত বুদ্ধি ধরেন অথচ একথাটা একবারও ভেবে দেখলেন না—এইটেই জাহান্-আরার আপসোস।

ভেবে যে একেবারে দেখেন নি শাহান্‌শাহ্—তা নয়। যুক্তিটা যে ঠিক তাও স্বীকার করেন। তবুও দারাকে কাছছাড়া করতে মন সরে না

তাঁর। মনে হয় লেখাপড়া ভালবাসে—করুক। এর পর তো আর অবসর পাবে না। আর জ্ঞান অভিজ্ঞতা শৌর্য? তাঁর ছেলে, বিদ্বান বুদ্ধিমান স্থিতধী ছেলে—সে কি পারবে না কার্যকালে নিজেকে অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে?

এই লেখাপড়া বা শাস্ত্রচর্চাটাও আওরঙ্গজেবের বিষম চক্ষুশূল। দারা কাফেরদের কাছে বেদান্ত পড়েন, সুফীদের সঙ্গে দর্শন শাস্ত্র আলোচনা করেন : হাদিসে পূর্ণ বিশ্বাস নেই, ইসলামের শরীয়ত মেনে চলেন না—সম্পূর্ণ নাস্তিকের মতো ব্যবহার। যুক্তিতর্ক দিয়ে হাদিস লঙ্ঘন করতে চান, ধর্ম ও ঈশ্বর সম্বন্ধে অদ্ভুত মনোভাব তাঁর। এদিক দিয়ে আওরঙ্গজেব একেবারেই বিপরীত, এই বয়সেই গোঁড়া মুসলমান তিনি, প্রতিটি আচরণে দীনিয়াত মেনে চলেন। দারা চান তাঁর প্রপিতামহ আকবর শা'র মতো নূতন উদার ধর্মমত প্রতিষ্ঠা করতে—আওরঙ্গজেব তকলিদের পক্ষপাতী। পূর্বসূরীগণ যে মত বিশ্বাস ক'রে গেছেন—কয়েক শতাব্দীর প্রায় হাজার বছরের ব্যবহারে যা টিকে আছে—সে মত ভ্রান্ত তা তিনি কানে শুনতেও রাজী নন। পুরাতন প্রচলিত পথই নিরাপদ, তা ছেড়ে তিনি অজানা পথে যাবেনই বা কেন?...

এই বয়সে এতখানি মানসিক দৃঢ়তা দেখা যায় না। বাদশা এই কারণেই তাঁর তৃতীয় পুত্রকে একটু সমীহ ক'রে চলেন! আওরঙ্গজেব মনে করেন যে, পিতা তাঁকে দেখতে পারেন না—উপেক্ষা করেন, সেটা সম্পূর্ণ ভুল। উপেক্ষার পাত্র নয় তাঁর এ ছেলেটি—তা তিনি ভাল ক'রেই জানেন। এটুকু মানুষ চেনার ক্ষমতা না থাকলে এত বড় সাম্রাজ্য শাসন করতে পারতেন না তিনি, এতদিন ধরে সর্বোচ্চ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকতে পারতেন না। উপেক্ষা তো করেনই না—বরং বিপরীত, রীতিমতো ভয় করেন, সমীহ করেন। সে দুর্ধর্ষ বীর, চরম দুঃসাহসী, প্রখর বুদ্ধিমান। অদ্ভুত চরিত্রবল তার। সে মদ খায় না, ফুর্তি শব্দই জানে না বোধ হয়। আরামে ও আলস্যে তার প্রবল ঘৃণা। সর্বোপরি এই বয়সেই তার এত গভীর ধর্মনিষ্ঠা ও বিশ্বাস—সবটা জড়িয়ে এক বিচিত্র ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব। এই ছেলেটিকে যখনই দেখেন, ইস্পাতের তরবারির কথা মনে পড়ে তাঁর। তেমনি কঠিন—তেমনি অনমনীয়। এই জন্যেই তিনি দূরে দূরে রাখেন ওকে, দূরেই রাখবেন স্থির করেছেন।

কিন্তু সে যা-ই হোক, দুই ভাইয়ের মধ্যে রেষারেষিটা কারও অবিদিত নেই আর। ওঁরাও যে সেটা গোপন করার খুব বেশী চেষ্টা করেছেন তা নয়। সুতরাং গত সপ্তাহে যখন শাহ্‌জাদা দারা শুকোহ্ তাঁর গরিবখানায় এই দাওয়াত জানিয়ে গেলেন—তখন বাদশা নিশ্চিত ভেবেছিলেন যে, আওরঙ্গজেব এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করবেন না, কোন একটা ছুতোয় এড়িয়ে যাবেন। বিশেষতঃ যখন এই নিমন্ত্রণের মধ্যেই ঈর্ষার একটা বড় রকম কারণ ছিল।

এই দাওয়াতের উপলক্ষটাই সেই কারণ।

দারা শুকোহ্ সম্প্রতি যমুনার তীরে একটি নতুন প্রাসাদ তৈরী করিয়েছেন। নদীর বুক থেকে বলতে গেলে বাঁধিয়ে তুলেছেন সাদা পাথরের সুদৃশ্য সুবিস্তৃত এই হর্ম্যটি—তাকে সর্বপ্রকার আরামের ও বিলাসের উপকরণ দিয়ে সাজিয়েছেন। দারা এর আগে যে বাড়িতে থাকতেন তাও ছোট নয়, শুধু অনেকদিন তাতে বাস করেছেন বলেই এই নতুন প্রাসাদের আয়োজন। বেশ কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে এই প্রাসাদ নির্মাণ করতে—আর বলা বাহুল্য, তার প্রায় সবটাই যুগিয়েছেন শাহানশাহ্ স্বয়ং। তাতেও হয় নি—বাড়ি সাজাতে ফিরিঙ্গি মুলুকের আয়না, বাতির ঝাড়, বোখারার কার্পেট এবং নানা রকমের মূল্যবান আসবাব পাঠিয়ে দিয়েছেন। বাদশার নিজের ব্যবহারের আতর ও গুলাব পাঠিয়েছেন বাক্স বোঝাই ক'রে। গালিচাই পাঠিয়েছেন চৌদ্দ পনেরো বোঝা, সমসংখ্যক উটের পিঠে চাপিয়ে। এসব জিনিসের মহার্ঘতা সর্বজনবিদিত। কিন্তু মূল্যের প্রশ্ন বাদ দিয়েও, বাদশার যে অপরিমাণ স্নেহ প্রকাশ পেয়েছে এই সব উপহারের মধ্য দিয়ে—অপর ভ্রাতাদের মনে ঈর্ষার সৃষ্টি করার পক্ষে তা যথেষ্ট, বরং অতিরিক্ত বলাই উচিত।

দারা অবশ্য তা ভাবেন না। যে পায় সে যতই পাক সেটা তার প্রাপ্য বলেই মনে করে। সুতরাং তাঁর বিশ্বাস যে, তাঁর এই সৌভাগ্যে সকলেই আনন্দিত। তিনি তাই খুশিমনেই এসেছিলেন তাঁর দাওয়াত জানাতে।

সমস্ত প্রস্তুত, প্রাসাদ মায় প্রাসাদের সংলগ্ন বিস্তৃত উদ্যান পর্যন্ত মোটামুটি তৈরী হয়ে গেছে,—বাড়ির সঙ্গে সঙ্গেই এ কাজ শুরু করেছিলেন দারা, যাতে বাড়িতে বাস করতে আসার সময় গাছেপালায় ফলেফুলে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে তা—তার মধ্যে নহর ফোয়ারা সব চালু—কোথাও কোন ত্রুটি কি খুঁৎ তো নজরে পড়ছে না, শুধু একটি অভাব থেকে গিয়েছে, এই সুন্দর বস্তুটি একটু পবিত্র ক'রে নেওয়া হয় নি। আর সেটুকু না হওয়া পর্যন্ত শাহ্জাদা ঠিক স্বস্তি পাচ্ছেন না। সুতরাং কোন এক শুভদিনে যদি আলাহজরৎ দয়া ক'রে পায়ের ধুলো দিয়ে তাঁর নতুন গরিবখানাকে প্রসাদী ক'রে দেন তো শাহ্জাদা চিরকৃতজ্ঞ থাকবেন। খাদ্য যতই রসনাতৃপ্তিকর বা সুরভিত হোক,—ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদিত বা তবরুক না হ'লে তা যথার্থ সুখাদ্যে পরিণত হয় না। তেমনি এই প্রাসাদও, যত সুন্দর আর লোভনীয়ই হোক—শাহানশাহের পদার্পণ না ঘটলে তাকে বসবাসযোগ্য মনে করবেন না শাহ্জাদা দারা শুকোহ্।

দাওয়াত কিন্তু এখানেই শেষ হয় নি।

আরও কিছু প্রার্থনা জানিয়েছেন বড়ে শাহ্জাদা।

আলম্পনাহ্ তো যাবেনই—সেই সঙ্গে তাঁর প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ভাইরা —অন্য শাহ্জাদারাও যদি দয়া ক'রে যান তো কৃতার্থ হবেন তিনি, এও জানলেন। সৌভাগ্যক্রমে যখন এসময়ে তাঁর তিনটি ভাই-ই আগ্রায় উপস্থিত আছেন তখন এ আনন্দ থেকে তিনি বঞ্চিত হবেন কেন? এক সঙ্গে বাজান ও চার ভাই তাঁরা একত্রে বসে আহার করবেন—কিছুদিন ধরেই এ ইচ্ছা

প্রবল হয়েছে তাঁর। এ খুদারই যোগাযোগ, তাই তাঁর গরিবখানার নির্মাণ-কার্য শেষ হবার সময়-সময়ই ভাইজানরা সকলে আগ্রায় এসে উপস্থিত হয়েছেন।...

শাহানশাহ্ তো প্রস্তুতই—বরং বলা যায়, মনে মনে এ নিমন্ত্রণের অপেক্ষাই করছিলেন তিনি। তবে তাঁর অন্য পুত্রদের সম্বন্ধে কিছু সন্দেহ ছিল তাঁর। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল যে, তাঁর সে আশঙ্কা বা সংশয় সম্পূর্ণ অমূলক। দারা যখন একে একে তাঁদের কাছে নিমন্ত্রণ জানাতে গেলেন তখন তিনজনেই সে আমন্ত্রণ সাগ্রহে গ্রহণ করলেন! বোধ হয় ঈর্ষার চেয়ে কৌতূহল বেশী বলবান, অথবা ঈর্ষাই কৌতূহলকে প্রবল ক'রে তোলে। মানসিক যন্ত্রণার একটা নেশা আছে, যে চিন্তায় যন্ত্রণা বাড়ে, মন ঘুরে ফিরে সেই দিকেই যেতে চায়। সৌভাগ্যে ঈর্ষিত সবাই, তবু সে সৌভাগ্যের পরিমাণটাও নির্ণয় করা চাই বৈকি!

দিন-ক্ষণ দারা দেখেই গিয়েছিলেন—জ্যোতিষীদের দ্বারা তিথি-নক্ষত্র দেখিয়ে। বাদশারও সে দিনে কোন অসুবিধা দেখা গেল না। আর বাদশা যেখানে রাজী সেখানে শাহ্জাদাদের তো আপত্তির প্রশ্নই ওঠে না।

তবু শাহানশাহ্ ভেবেছিলেন, শেষমুহূর্তে আওরঙগজেব একটা কোন ওজর করবেন না-যাওয়ার। আর কিছু না হোক—অসুখই তো একটা চমৎকার অজুহাত, যার ওপর বাদশারও কোন হাত নেই। তাঁর ছেলেরা অবশ্য সকলেই স্বাস্থ্যবান, তৈমুরবংশের স্বাস্থ্য শক্তি ও রূপ—তিনই তাঁরা পেয়েছেন পূর্ণমাত্রাতে—তবু ওজর হিসেবে অসুখ হ'তে কোন বাধা নেই। বিশেষ ক'রে উদরাময়—এমন একটা রোগ—যা যে-কোন দিন যে-কোন লোকের হ'তে পারে। আবার তা একদিন সেরেও যেতে পারে—প্রয়োজনমতো।

কিন্তু সে সব দিক দিয়েই গেলেন না শাহ্জাদা আওরঙ্গজেব, কোন ওজর আপত্তি কিছুই তুললেন না। বরং নির্দিষ্ট দিনে, বাদশা আসবার অনেক আগেই, দেখা গেল তাঁর বজরা এসে শাহী বজরার ধারে—বাদশার প্রাপ্য সম্মান হিসেবে সামান্য ব্যবধান বজায় রেখে অপেক্ষা করছে।

বাদশার বুক থেকে যেন পাষাণভার নেমে গেল একটা।

অন্য ছেলেদের জন্য নয়—আর কেউ না এলেও বিচলিত হতেন না তিনি—ভয় ছিল তাঁর এই তৃতীয় পুত্রটির জন্যেই বেশী। সে ভয় অমূলক জেনে খুশির সীমা রইল না তাঁর। আজকের এই যাত্রাটা সত্যিই সুযাত্রা বলে মনে হ'ল। মনে মনে খুদাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁর এই সব কটি বাচ্চার জন্যই নতুন ক'রে দোয়া প্রার্থনা করলেন। দারার এই নতুন বাড়ির আয়-পয় ভাল—এ ধরনের কুসংস্কারকে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয় জেনেও—মনে মনে স্বীকার করলেন।

খুশি হয়েছিলেন বাদশা, খুশির পাত্র পূর্ণতর করার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

অনেকগুলো বজরা হাজির ছিল, ছেলেরা প্রত্যেকেই নিজস্ব বজরা

এনেছিলেন—আলাদা আলাদাই যাওয়ার কথা—কিন্তু বাদশা সে ব্যবস্থা নাকচ ক'রে দিলেন। তিন ছেলেকেই ডেকে নিজের বজরায় তুলে নিলেন। বাইরের লোকের মধ্যে রইলেন শুধু উজীর-এ-আজম বা প্রধানমন্ত্রী, তা তিনি প্রায় ঘরের লোকের মতোই অন্তরঙ্গ। বহুদিন পরে ছেলেদের সঙ্গে এমন নিরিবিলি গল্পগুজব করার সুযোগ পেয়ে যেন আনন্দে মেতে উঠলেন বাদশা, ছেলেমানুষের মতো ঠাট্টা-তামাশা করতে লাগলেন, তার মধ্যে ভাষার আগলও বজায় রইল না সব সময়ে, এমন কি কোন্ ছেলে নতুন কোন্ বাঁদী সংগ্রহ করল, তাদের 'উমর্' কত—চোখ টিপে হেসে সে প্রশ্ন করতেও ছাড়লেন না।

আসলে ছেলেরা যে দারার এ নতুন সৌভাগ্যে ঈর্ষিত হয়ে এ দাওয়াত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করে নি—তাতেই তাঁর এত আনন্দ।

ছেলেদের কাছে যেন নিজেকে কৃতজ্ঞ বোধ করতে লাগলেন তিনি।

॥ ২ ॥

সত্যি কথা বলতে কি, আজকে সকাল থেকেই দিনটা বড় মনোহর মনে হয়েছিল। ভারী ভাল লেগেছিল বাদশার এই যাত্রাটা। ঝলমলে রৌদ্রোজ্জ্বল প্রভাত, মধুর প্রভাতী হাওয়া—মন এমনিতেই প্রসন্ন হয়ে ওঠার কথা। তার ওপর পরিবেশটিও ছিল ভারী অনুকূল। কিল্লা থেকে দরিয়ার ধারে ধারে যত প্রাসাদ, সবগুলিই ফুলেপাতায় সাজানো হয়েছে—বাদশার প্রীতি বর্ধনের জন্য। নহবৎ এমনিতেই বাজে, কিল্লাতে তো বটেই—প্রায় সব 'রইস' লোকেরই নিজস্ব নহবতের ব্যবস্থা আছে। আজ সেসব সানাই-ওয়ালারাও প্রাণপণে সুর ধরেছে বাঁশীতে; বাদশাকে শোনাবার এমন সুযোগ আবার কবে আসবে কে জানে—হয়ত হঠাৎ কানে লেগে গিয়ে তাঁর কৌতূহল আকৃষ্ট করাও অসম্ভব নয়। ফলে, সেই বিভিন্ন রাগিণীর মিশ্রিত সুর-লহরীতে যমুনাতীরের বাতাস যেন স্বপ্নাচ্ছন্ন। ফুলের গন্ধে বাঁশীর সুরে যমুনার মিষ্টি স্নিগ্ধ বাতাসে—সর্বত্রই সেই স্বপ্নের বীজ। ঘাটে ঘাটে বাদশার দর্শনার্থী সুবেশ সুশ্রী নর-নারীর ভীড়—তাদের প্রিয় নৃপতিকে চোখে দেখবার জন্য সে কী ব্যাকুলতা! এই অনুক্ত স্তুতিতেও মনে একটা নেশা জাগায়। সর্বোপরি, বহুকাল পরে তাঁর আত্মজদের সাহচর্য। এতেও যদি ভাল না লাগে তো আর ভাল লাগা সম্ভব নয়। ছেলেদের মধ্যে শুধু দারাই নেই, তা তার কাছেই তো যাচ্ছেন; একটু পরেই চার ছেলেকে এক সঙ্গে কাছে পাবেন।

বাদশা যেন আজকের এই পরিণত প্রভাতের বেলাটুকুর প্রতিটি মুহূর্ত ছুঁয়ে ছুঁয়ে এসেছেন—সময়ের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অবসরগুলিও উপভোগ করতে করতে। আজ এই নদীপথে নৌকোয় চেপে ভেসে আসতে আসতে বার বার অতর্কিতে মনে হয়েছে তাঁর যে, সত্যিই তিনি আজ এ দুনিয়ার মধ্যে সব চেয়ে সুখী ও সৌভাগ্যশালী ব্যক্তি।

নদীপথে আসার এই পরিকল্পনাটাও বাদশারই।

স্থলপথে বড় ভীড়—বাদশার যাত্রায় বড় আড়ম্বর। সামান্য পথ, বোধ হয় এক ক্রোশও নয় কিন্তু সেইটুকু অতিক্রম করতেই এক প্রহর পার হ'ত। আর তাতে এমন অন্তরঙ্গভাবে পেতেন না ছেলেদের, এমন আলাপ কি খোশগল্পেরও সুযোগ মিলত না। জলপথেও জাঁকজমক কম নেই, রক্ষী-বাহিনীর ব্যবস্থা আছে, লোকলস্কর অসংখ্য থাকে সঙ্গে, তাতারী দেহরক্ষীরা তো থাকেই—কিন্তু তারা আগু-পিছু স্বতন্ত্র নৌকোয় থেকে পাহারা দেয়—বেশ খানিকটা সসম্ভ্রম ব্যবধান বজায় রেখে; বাদশাকে শান্তিতে ও নিভৃতে থাকার সুযোগ দিয়ে। জনতা বা প্রজাসাধারণের পূজাও পান কিন্তু এখানে পথের মতো পূজকের দল হুমড়ি খেয়ে গায়ে পড়তে চেষ্টা করে না, ভীড় ক'রে পথ আটকাতে পারে না। পূজার তৃপ্তি আছে এখানে, বিরক্তিটা নেই। সেই জন্যেই আজ এই পথ বেছে নিয়েছিলেন শাহানশাহ্।

তাছাড়া, দারার বাড়িও দরিয়ার ওপরে। পাড় থেকে ঘাট বেঁধে সিঁড়ি উঠেছে। আগ্রার গরম বিখ্যাত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে যখন চারিদিক থেকে অগ্নিবৃষ্টি হ'তে থাকে, খাঁ-খাঁ করে রুক্ষ শহর আগুনের নিঃশ্বাস ফেলে, তখন যা কিছু শান্তি এই নদীর ধারেই। নহর ফোয়ারা বসাবারও সুযোগ বেশী এখানে, নদী থেকে জল সামান্য একটু ওপরে তোলা খুব একটা কষ্টসাধ্য নয়, বাগানবাগিচা বানাতেও কুয়া থেকে বয়েল দিয়ে জল তুলতে হয় না, নদীর জলেই কাজ চলে যায়। কুয়ার জলে বাগান করাও তো মুশ্‌কিল, বেশিরভাগ কুয়ার জলেই ক্ষার আছে এখানে—ভাল গাছ মরে যায়।

তা বড়ে শাহ্‌জাদা দারার রুচিবোধ আছে এটা মানতেই হবে। ইমারতের মূল পরিকল্পনা অবশ্য খোদ শাহানশাহেরই—কিন্তু কল্পনা আর বাস্তবে অনেক তফাৎ। সুকল্পনাকে নিখুঁতভাবে রূপ দিতেও কিছু রুচি ও নিজস্ব কল্পনাশক্তির প্রয়োজন। যমুনার তীরে সাদা পাখীর মতো হাল্‌কা বাড়িটি, কালো জলে তার ছায়া পড়ে ছবির মতো দেখাচ্ছে দূর থেকে। হাল্‌কা কিন্তু সে শুধু গঠনের ভঙ্গীটাই নইলে প্রাসাদ আদৌ ছোট নয়। কাছে এলে বা ভিতরে ঢুকলে সেটা বোঝা যায়। বিশাল হর্ম্যের উপযুক্ত প্রশস্ত ঘাট, ঘাট থেকে চওড়া সাদা পাথরের সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে, একেবারে ভিতর মহল পর্যন্ত।

সেই শুভ্র মর্মরের সিঁড়িতে, বাদশার শুভ পদার্পণ উপলক্ষে রচিত মেহরাবের নিচে বেশির ভাগ লাল রঙের দামী ইস্পাহানী কার্পেট পাতা আর সেই বিপুল লাল রঙের মধ্যে—যেন লাল সরোবরে শ্বেতপদ্মের মতো—আগাগোড়া শুভ্র মসলিনের পোশাকপরা দারা শুকোহ্ করজোড়ে নত মস্তকে দাঁড়িয়েছিলেন এঁদের অভ্যর্থনা জানাবার জন্য। একেবারে জলের ধারে এসে দাঁড়িয়েছিলেন—কারণ বাদশার হাত ধরে নামাবার গৌরব তিনি অপর কাউকে দিতে রাজী নন। লোকলস্কর তাঁরও কম নেই—

আত্মীয়-পরিজন বান্দা-খোজা-খাবাস-খানসামায় প্রাসাদ বোঝাই—কিন্তু ইচ্ছা ক'রেই তাদের দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন দারা—সম্রাট পিতাকে তিনি একাই স্বাগত জানাবেন—যথেষ্ট বিনয় ও দৈন্যের সঙ্গে—সেই তাঁর ইচ্ছা।

তারপর—বাদশা যখন সত্যিসত্যি তশরীফ আনলেন দারার এই গরিবখানায়, অর্থাৎ তাঁর বজরা এসে ঘাটে ভিড়ল, তখন দারা সেইভাবে—প্রায় নতমস্তকেই তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে বাদশার পবিত্র হাত ধরে সাবধানে ও সন্তর্পণে নৌকো থেকে নামিয়ে, সেইখানে সেই সিঁড়ির উপরেই হাঁটু গেড়ে বসে তাঁর পরিচ্ছদের প্রান্ত চুম্বন ক'রে বাদশা এবং পিতার প্রাপ্য উপযুক্ত সম্মান প্রকাশ করলেন।

বাদশা অবশ্য এ শরাফৎ বা সৌজন্যের জন্য প্রস্তুতই ছিলেন, তার পুরস্কারও এনেছিলেন সঙ্গে ক'রে। তিনিও শশব্যস্তে চরণপ্রান্তে আনত পুত্রকে হাত ধরে উঠিয়ে প্রগাঢ় সস্নেহ আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন; তারপর ভৃত্যদের ইঙ্গিত করলেন, তারা সেইখানেই শাহ্‌জাদার জন্য আনীত খিলাৎ ও অন্যান্য উপঢৌকন এনে ধরল। অতঃপর বাদশা তাঁর দস্তমোবারক দ্বারা সেই উপহার দ্রব্যগুলি একবার ক'রে স্পর্শ ক'রে দিয়ে সপ্রীত চোখে পুত্রের মুখের দিকে চাইলেন, দারাও তবর্‌রুক হিসেবে সেগুলি একবার ক'রে মাথায় ঠেকিয়ে যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করলেন। এইভাবে সৌজন্যের প্রথম পাট চুকতে শাহানশাহ্‌ ধীরে ধীরে পুত্রের নব-নির্মিত প্রাসাদের সিঁড়ি বেয়ে উপরে গেলেন—চারিদিকে চাইতে চাইতে।

বড়ে শাহ্‌জাদা তাঁর ভাইদেরও যথাযোগ্য অভ্যর্থনা জানালেন। বরং একটু বেশীই বিনয়প্রকাশ করলেন যেন। তাঁর তক্‌দিরে এরা যে ঈর্ষিত তা তিনি কিছুটা বোঝেন। কিন্তু সে বোঝাটা এঁদের বুঝতে দিলে চলবে না। তাঁর আচার-আচরণে যেন কোন রকম তকব্বরি বা বাহাদুরীর ভাব না প্রকাশ পায়। ছোট ভাই সব—তবু আজ এঁরা তাঁর মেহ্‌মান, আর মেহ্‌মান মাত্রেই পূজনীয়। তিনি ভাইদের সস্নেহে আলিঙ্গন ক'রে সযত্নে ও সসম্মানে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ওপরে।

এ পর্যন্ত বেশ কেটেছিল। মনে হয়েছিল আজকের প্রভাত যথার্থ সুপ্রভাত। আজকের দিনটির স্মৃতি অনন্ত মাধুর্যের উৎস হয়ে থাকবে মনের মণিকোঠায়।

এমন কি খাওয়া-দাওয়ার সময়ও সে সুমধুর প্রসন্নতার সুর ভঙ্গ হয় নি। আহারের আগে দারা যখন রীতিমাফিক মান্য অতিথিদের জন্যে স্বহস্তে দস্তরখান* পাততে গেলেন তখন স্বয়ং আওরঙ্গজেব সেটা তাঁর

---

*মেহ্‌মানী সৌজন্যের নিয়ম হল অতিথি যদি বিশেষ সম্ভ্রান্ত বা গুরুস্থানীয় কেউ হন তো গৃহস্বামী তাঁর জন্য স্বহস্তে দস্তরখান অর্থাৎ বসে আহার করবার চাদর কি জাজিম পাতবেন। মেহমানদারী বা অতিথি সৎকারের কাজে এইটিই চূড়ান্ত ভব্যতা বা তরবীয়তের নিদর্শন বলে গণ্য হয়।

হাত থেকে টেনে নিয়ে নিজে পরিপাটি ক'রে পেতে দিলেন। দেখা গেল—স্বয়ং বাদশাও সেটা মনে মনে মানতে বাধ্য হলেন যে—এ কাজেও বাদশার এই তৃতীয় পুত্রটি অনেক দক্ষ। দারা হ'লে এমনভাবে এ কাজ সুসম্পন্ন হ'ত না। তিনি হাত দিয়ে স্পর্শ ক'রে দিতেন মাত্র, পরে দাসীদেরই আসলে কাজটা করতে হ'ত।

এমনি ক'রে খুশির পর খুশির ঢেউ উঠেছিল বাদশার মনে। নেশার মতো গোলাপী আমেজ লেগেছিল একটা। ফুর্তিতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিলেন তাই। খাওয়ার সময়ও সে আমেজ কাটে নি—সুর ভঙ্গ হয় নি প্রসন্নতার বীণায়। আহার্যও প্রত্যেকটি হয়েছিল মনের মতো। দারা তাঁর পিতার রুচি তো জানতেনই—ভাইদেরও বাবুর্চিখানায় লোক পাঠিয়ে জেনে নিয়ে প্রত্যেকের মনের মতো একটা দুটো পদ তৈরী করিয়েছিলেন। ভোজনরসিক শাহ্‌জাদা শুজা পর্যন্ত মানতে বাধ্য হলেন যে, দারার এ আয়োজন সব দিক দিয়েই বাদশার উপযুক্ত হয়েছে। এদিক দিয়ে অন্ততঃ শাহী তখ্‌তে বসবার যোগ্যতা ধরেন তিনি।

উৎসব ও প্রসন্নতার আমেজ লেগেছিল উপস্থিত সকলকারই মনে। কিন্তু সে আমেজ একটা কঠোর এবং রূঢ় আঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল একেবারে এই বিশ্রামের সময়।

এদেশে সকলেই গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে মাটির কাছাকাছি আসতে চায়, জননী মৃত্তিকার স্নেহার্দ্র স্নিগ্ধ স্পর্শ চায়—সজল শীতল প্রশ্রয় খোঁজে তাঁর কোলে। সাধারণ লোক যারা, তারা একতলায় এসে থাকে, মাটি কি পাথরের মেঝেতে জল ঢেলে তাতে গড়ায়। ধনী ব্যক্তিরা তারও নিচে নামেন, প্রত্যেকেই মাটির নিচে একটা মহল—নিদেন পক্ষে একখানা ঘর তৈরী করিয়ে রাখেন দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামের জন্য। প্রাসাদের তো অঙ্গই এটা, তেমন তেমন ক্ষেত্রে মাটির নিচেও দুইতলা-তিনতলা পর্যন্ত নেমে যায়। আগ্রার প্রাসাদ দুর্গে এরকম তিনতলা অবধি আছে। বাদশা স্বয়ং তৈরী করিয়েছিলেন, সে তহ্‌খানা।

শাহ্‌জাদা দারার এই নবনির্মিত আবাসভবনেও যে সে ব্যবস্থার ত্রুটি থাকবে না—তা বলাই বাহুল্য। নদীর ধারে জলের রেখার নিচে শ্বেতমর্মরে নির্মিত এই তহ্‌খানা দারুণ গ্রীষ্মেও কাশ্মীরের মধুর শৈত্য স্মরণ করিয়ে দেয়।

এ সব বাড়ির তহ্‌খানা মানে একটি স্বতন্ত্র অট্টালিকা। সেই রকমই বিশাল ও প্রশস্ত। এখানে বাসকক্ষে বা আশ্রয়কক্ষে কিছু স্বাতন্ত্র্যও বজায় রাখা হয়। মালিক, তাঁর নিকট আত্মীয় এবং সমপর্যায়ের মেহ্‌মানদের জন্য একরকম—আশ্রিত প্রতিপালিত পোষ্য পরিজন এবং পরিচারকদের জন্য আর এক রকম। এ প্রাসাদেও সে রীতির ব্যতিক্রম হয় নি। দুপাশে দুটি মহল—একটি পরিচারক-আশ্রিত-পোষ্যদের জন্য, অন্যটি তা থেকে কিছু উচ্চ শ্রেণীর আত্মীয়-স্বজনদের জন্য। এই দুইয়ের মাঝখানে ছোট অথচ নানা রকম আরামদায়ক ব্যবস্থায় পূর্ণ—শাহ্‌জাদার নিজের মহল। তাঁর

খাসমহল থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে এ মহলের—সাদা পাথরের সিঁড়ি, দুদিকের দেওয়ালও সাদা পাথরে ঢাকা। সিঁড়ির শেষে একটি নিরেট নিরন্ধ্র ভারী লোহার এক-কপাট দরজা, তার ওদিকে একটা অলিন্দ বা চলন—চলনের ওপারে সারি সারি তিন চারখানা ঘর। এ ঘরগুলোর সব ক'খানাই একেবারে জলের মধ্যে বা জলের তলায়। আশ্চর্য নির্মাণ-কৌশলে শত শত মণ জলের ভার ধরে রাখা হয়েছে ইঁটের খিলানে। সে খিলান অবশ্য নিচে থেকে দেখা যায় না; যাতে দেখা না যায়, সেই ব্যবস্থাই করতে হয়েছে অনেক যত্ন ক'রে—কারণ তাতে একটা আতঙ্কের ভাব মনে জেগে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটতে পারে, মনে হতে পারে এই কটা ইঁটের ব্যবধান যদি ভেঙ্গে খসে পড়ে—মুহূর্তে সলিল-সমাধি হয়ে যাবে। সে কল্পনার বিন্দুবাষ্পও যাতে না বিশ্রামার্থীর মনে আসতে পারে, সে জন্য অনেক কিছু করতে হয়েছে স্থপতিকে। ঘরে শুয়ে ওপরদিকে চাইলে সাদা পাথরের ওপর কালো লাল ও হলদে রঙের ফুল ও লতাপাতাকাটা ছাদ ছাড়া কিছুই দেখা যাবে না। অন্যান্য সাধারণ ছাদের মতোই।

এ অংশেও ঘর একাধিক। দালানও বেশ প্রশস্ত, দালানের প্রান্তে হামাম গোসলখানা কিছুরই ত্রুটি বা অভাব নেই। এ মহলের বন্ধ বাতাস বার করার ব্যবস্থাও ঐখানে—হামামের চৌবাচ্চা ভর্তি জলের উপর দিয়ে কয়েকটি সর্পিল সরু পথ নলের মতো—ভেতরের দূষিত বাতাস যাওয়া ও ওপরের টাটকা বাতাস আসা—দুটো কাজই জলের ওপর দিয়ে হয়ে থাকে, ফলে ভেতরের আবহাওয়া গরম হওয়ার সুযোগ ঘটে না কখনই।

এই সুন্দর সুসজ্জিত সুবিন্যস্ত বিস্তৃত মহলের প্রবেশ পথ কিন্তু একটিই। ওপর থেকে নিচে নামা বা নিচে থেকে ওপরে ওঠার একটিই সিঁড়ি। মানুষ গতায়াতের পথ বেশী থাকলে গরম হাওয়াকেও ঠেকানো কঠিন। তাই যতদূর সম্ভব সে পথ বন্ধ করা হয়েছে। সিঁড়ির দুই মুখও দুটি মজবুত দরজা দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে, ওপর থেকে নামবার মুখে একটা—সেটা সাধারণ চন্দনকাঠের তৈরী; আর নিচে মহলের প্রবেশ পথে আর একটা। এই দরজাটাই দেখবার মতো। দুদিকে পুরু ভারী ইস্পাতের চাদরে ঢাকা, আসল কপাটটা হল ঘনসম্বন্ধ মোটা লোহার শিকে তৈরী। যেমন ভারী তেমনি পুরু কপাট। নিশ্ছিদ্র নিরেট। যখন বন্ধ হয় তখন এমনভাবে দেওয়ালের খাঁজে আটকে যায় যে, এক বিন্দু বাতাসেরও ভেতরে যাওয়ার পথ থাকে না। এ ছাড়া উপায়ই বা কি, ওপরের উষ্ণ বাতাস ভেতরে ঢুকলে তো এত আয়োজন সবই মাটি।

দরজাটার আরও কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

এমন মসৃণ এর চালনা ব্যবস্থা, এত সুন্দর এর কব্জা যে একটি আঙ্গুলের সামান্য টিপেই খোলে ও বন্ধ হয়—এতটুকু গায়ের জোর দিতে হয় না। আর দুটো কাজই চলে নিঃশব্দে—কোন রকম ধাতব শব্দ ওঠে না।

আরও বৈশিষ্ট্য, কপাটের ইস্পাতের ওপর সাদা রঙ করা হয়েছে দুপাশের শ্বেত পাথরের ঈষৎ নীলাভ রঙের সঙ্গে মিলিয়ে। বন্ধ থাকলে

দরজা বলে বোঝাই যায় না, মনে হয় এটাও দেওয়াল। শুধু তাই নয়, চাবি দেওয়ার জায়গাটাও এমন আশ্চর্য কৌশলে ঢেকে রাখা হয়েছে যে, দারা তার মুখ সরিয়ে কুঞ্জী বা চাবি পরানোর আগে পর্যন্ত মসৃণ কপাটের অন্য অংশের সঙ্গে সেই অংশটুকুর বিন্দুমাত্র পার্থক্য বোঝা যায় নি।...

এমনিতেই তো প্রাসাদে পা দেওয়ার পর থেকেই—ওঁরা এর নির্মাণ কৌশলের প্রশংসা ক'রে ক'রে প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন, এখন তহ্‌খানায় ঢোকার মুখেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। বিশেষ ক'রে এই দরজার কায়দা দেখে সবাই ধন্য ধন্য ক'রে উঠলেন। বার বার বাহবা দিলেন এর পরিকল্পনাকারী—অর্থাৎ এই হর্ম্যের মালিককে।

এঁদের সে মুখর প্রশংসায় প্রসন্ন হবারই কথা শাহ্‌জাদা দারাশুকোর। আর তা হলেনও তিনি। তাঁর সুগৌর মুখ খুশিতে রক্তাভ হয়ে উঠল, তিনি কপাটটা খুলে ধরে বিনত অভিবাদনের ভঙ্গিতে মাথা নত ক'রে দাঁড়ালেন। মহামান্য অতিথিদের ভিতরে প্রবেশের অগ্রাধিকার, তাঁরা আগে গেলে তবে তিনি ঢুকবেন!

ঢুকলেনও সবাই। শাহানশাহ্‌, তাঁর উজীর-এ-আজম, খাবাস, অঙ্গ-সংবাহনের জন্য তাতারী বাঁদী—সে আগে থেকেই ভেতরে ঢুকে পাথরের মূর্তির মতো দেওয়াল ঘেঁষে হেঁট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এঁদের পর ঢুকলেন শাহ্‌জাদা শুজা ও শাহ্‌জাদা মুরাদ, সঙ্গে পা টেপার জন্য দুটি বালক ভৃত্য। এঁরা কপাটের ওপারে পেঁাছে স্মিতমুখে ফিরে দাঁড়ালেন তৃতীয় শাহ্‌জাদার জন্য। এখনও পর্যন্ত ভিতরে আসেন নি একমাত্র তিনিই, আর আসে নি তাঁর ব্যক্তিগত কিশোর ভৃত্যটি—তাকে কোন্‌ নিঃশব্দ ইঙ্গিতে কখন সরিয়ে দিয়েছেন, কাছাকাছির মধ্যে তার কোন অস্তিত্ব নেই। হয়ত সে এ বাড়ি ছেড়েই চলে গেছে—।

শুধু যে আসেন নি তা-ই নয়, আসবার ইচ্ছাও বিশেষ আছে বলে মনে হ'ল না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের ভাবভঙ্গী দেখে। তখনও তিন চার ধাপ উঁচুতে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি; স্থির হয়ে পাশের দেওয়ালে সাদা পাথরের ওপর রঙ্গীন পাথরের মীনার কাজ লক্ষ্য করছেন।...

শাহানশার এই পুত্রটির মুখের দিকে তাকিয়ে কোন কালেই ওঁর মনের কথা বোঝা যায় না—আজও গেল না। সেই চিরাভ্যস্ত ভাবলেশহীন মুখ ভ্রূকুটিশূন্য প্রশান্ত ললাট। কেবল দারার মনে হ'ল—ওঁর দৃঢ়সম্বন্ধ ওষ্ঠাধরের প্রান্তে ঈষৎ, অতি ক্ষীণ একটু বিদ্রূপের আভাস।

দারা কী ভাবলেন ওঁর এই ভব্যতার-রীতিবিরুদ্ধ নিশ্চিন্ত ঔদাসীন্য দেখে, এই বেয়াদবিতে রুষ্ট হলেন কিনা—তা তাঁরও আচরণ বা বাক্যে প্রকাশ পেল না। আজ সকাল থেকেই তিনি আদর্শ গৃহস্বামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, এখনও সেই ভাবই বজায় রাখলেন। অতি মোলায়েম প্রীতি-মধুর কণ্ঠে ডাকলেন, 'এসো ভাইসাহেব, আমরা দাঁড়িয়ে আছি তোমার জন্যে।'

আওরঙ্গজেব যেন বিষম ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। বার বার মাথা হেঁট

ক'রে উপস্থিত সকলকে অভিবাদন জানিয়ে বললেন, 'ইস্, বড়ই গুস্তাকী হয়ে গেছে, আমি যে আপনাদের বলতেই ভুলে গেছি—সেটাই আমার ইয়াদ ছিল না। আপনারা যান শাহ্‌জাদা, বিশ্রাম করুনগে। আমার নসিবে আপনার এই বেহেস্তী তহ্‌খানায় আরাম করার সুখ নেই। আমার একটা জরুরী কাজ পড়ে গেছে—খুবই জরুরী, সেজন্যে আমাকে এখনই আমার গরিবখানায় ফিরতে হবে।'

'সে কি! এই দুপুর রোদে! ঝলসে যাবে যে!'

দারা কোন উত্তর দেবার আগেই শুজা বলে ওঠেন।

ঈষৎ অবজ্ঞার হাসি দেখা দেয় আওরঙ্গজেবের ওষ্ঠপ্রান্তে। অবজ্ঞা আর তার সঙ্গে একটু বিদ্রূপও থাকে সে হাসিতে। সকলেই বলে এই হাসি তৃতীয় শাহ্‌জাদাকে যেমন মানায় এমন আর কাউকে নয়। এই হাসি হাসবার সময় তাঁর ওপরের ঠোঁটটিতে কেমন একটা কুঞ্চন দেখা দেয়. সামান্য একটু বিকৃত হয়ে ওঠে—কিন্তু তাতেই যেন ওঁকে আরও সুন্দর দেখায়। সুন্দর—কিন্তু সে সৌন্দর্য মনে একটা আতঙ্কের সঞ্চার করে, মনে হয় এ হাসি যে হাসতে পারে, তাকে সাধারণ মানুষের কোন গুণ, কোন হৃদয়াবেগই বোধ হয় স্পর্শ করে না। উনি যখন এই হাসি হাসেন, তখন উপস্থিত অন্য মানুষরা যেন নিজেদের কেমন ছোট মনে করেন ওঁর কাছে। এই হাসি দেখে নাকি এক বাঁদী—এক রাত্রির নর্মসহচরী এক বিদেশিনী—বহুদিন আগে ওঁকে বলেছিল, 'বিধাতা যে আপনাকে বাদশা হবার সনদ দিয়ে পাঠিয়েছেন এই দুনিয়ায়—ঐ হাসিই তার প্রমাণ!'

কথাটা ভোলেন নি শাহ্‌জাদা।

বোধ করি ভুলতে পারেন নি। মনের মধ্যেকার কোন্ একটি অব্যক্ত অস্ফুট গোপন আশার তন্ত্রীতে ঘা দিয়ে গিয়েছিল কথাটা।

তাই আজকাল এই হাসি হাসবার সঙ্গে সঙ্গে সচেতন হয়ে ওঠেন। আজও হয়ে উঠলেন।

বোধ করি সচেতন হওয়ার আরও কারণ ছিল। কারণ—কোনও তীক্ষ্ণদৃষ্টি লোক সেখানে উপস্থিত থাকলে লক্ষ্য করত—তাঁর দুটি কান ও তার কাছাকাছি কপোলের খানিকটা রক্তাভ হয়ে উঠল সঙ্গে সঙ্গেই।

তবে তা উপস্থিত কারও লক্ষ্য করার কথা নয়, করলও না কেউ। শুধু হাসিটাই দেখল সকলে, আর মনে মনে—সম্পূর্ণ অকারণেই কুণ্ঠিত হয়ে উঠল।...

আওরঙ্গজেব তাঁর সেই অননুকরণীয় তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন, 'রোদের তাতে ঝলসে যায় শাহী হারেমের আরামে অভ্যস্ত মেয়েরা আর মোটা বানিয়ারা। যাদের খেটে খেতে হয়—বিশেষত পুরুষদের মুখে একথা মানায় না। আপনাদের অনুচররা, কর্মচারীর—বিশেষ ক'রে সাধারণ প্রজারা শুনলে লজ্জা পাবে, আপনাদের উপহাস করবে। এখন পথে বেরোলে দেখবেন বহু স্ত্রী-পুরুষ তাদের অভ্যস্ত কাজ ক'রে যাচ্ছে, পথ একেবারে জনহীনও নয়। আপনি নিজে তো বিখ্যাত যোদ্ধা, অভিজ্ঞ সেনাপতি—

প্রয়োজন হ'লে আপনি দ্বিপ্রহরে যুদ্ধযাত্রা করবেন না?...আমাদের প্রপিতামহ শাহানশাহ্ আকবর শাহ্ শুনেছি জ্যৈষ্ঠ মাসের গরমেও দিনে রাতে কোথাও না থেমে এক দণ্ডও বিশ্রাম না নিয়ে একটানা রাজোয়ারার মরুভূমি পার হয়ে এই আগ্রায় এসেছিলেন। ঘোড়া মরেছিল অনেক—কিন্তু তাঁর শরীর খারাপ হয় নি। একথা আপনিও শুনেছেন শাহ্‌জাদা, আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে যাওয়া বাহুল্য মাত্র!'

অপমানে শুজার মুখ অঙ্গার-বর্ণ ধারণ করল কিন্তু দেখা গেল যে স্বয়ং শাহান্‌শাহও এই ধৃষ্টতায় কম ক্রুদ্ধ হন নি। বার বার আরামের ইঙ্গিত এবং আকবর শার সঙ্গে তুলনাটা তাঁর গায়ে লাগল কিনা কে জানে, তিনি অসহিষ্ণুভাবে পাথরের মেঝেতে পা ঠুকে (তহ্‌খানার মেঝেতে গালিচা পাতার রেওয়াজ নেই, পাথরের হিমস্পর্শই সুখদ বলে বিবেচিত হয় এখানে) বলে উঠলেন, 'আঃ, এই পথের মাঝে দাঁড়িয়ে কী শুরু করলে তোমরা? আওরঙ্গজেব, তোমার ও খুব জরুরী কাজ, আশা করছি দু তিন ঘণ্টা বিলম্বে এমন কিছু পণ্ড হবে না। তুমি আপাততঃ দয়া ক'রে ভেতরে এসে দরজাটা বন্ধ করতে দাও।...শুধু শুধু—বাজে কথা কয়ে দেরি করছে—মাঝখান থেকে গরম হাওয়া খানিকটা ঢুকে যাচ্ছে এখানে। আরও কিছুক্ষণ কপাটটা খোলা থাকলে এত আয়োজন সব মাটি হয়ে যাবে!'

'আমার অপরাধ হয়ে গেছে শাহানশাহ্, বিস্তর অপরাধ হয়ে গেছে। শাহ্‌জাদা দারা অনুগ্রহ ক'রে এখনই কপাট বন্ধ ক'রে দিন—আমার জন্য অনর্থক বিলম্ব করবেন না।...আমাকে সত্যিই একবার বাড়ি যেতে হবে এখনই!'

অকস্মাৎ সকলকে চমকে দিয়ে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে উঠলেন বাদশা, 'না, হবে না। আমি বলছি হবে না। আর এ রাজ্যে তা-ই যথেষ্ট। কাজ মানে তো আমারই কাজ, পণ্ড হয় আমি বুঝব।...ভেতরে চলে এসো বলছি, অবাধ্য বেয়াদব ছেলে।'

এ সরোষ কণ্ঠস্বর, এই পদদাপ অনেক দিন শোনেন নি শাহ্‌জাদারা, তাঁরা সকলেই চমকে উঠলেন। এ কণ্ঠস্বরের সামনে বড় বড় সুবাদার, বড় বড় যোদ্ধাদের কেঁপে উঠতে দেখেছেন তাঁরা, দশহাজারী মনসবদারদের ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যেতে দেখেছেন। এর পরবর্তী আদেশ কি তাও জানা আছে সকলের। এর পরই কোতলখানায় নিয়ে যাবার আদেশ বার হয় শাহী কণ্ঠ থেকে। ছেলের বেলায় হয়ত এতটা হবে না; তবুও সকলেই—একমাত্র শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব ছাড়া—একবার নিজেদের অজ্ঞাতসারেই নিজেদের গলায় হাত বুলিয়ে নিলেন। যেন, ধড়ের ওপর শিরটা এখনও আছে কিনা যাচাই ক'রে নিলেন।

শুধু শাহানশাহের তৃতীয় পুত্রটিই বিচলিত হলেন না তেমন, যেখানে ছিলেন সেখানেই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। কেবল, যেন রাজকীয় রোষ মাথা পেতে নিয়ে সম্মান দেখানো উচিত বলে, সামনের দিকে আরও

অনেকখানি ঝুঁকে হেঁট হয়ে দাঁড়ালেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন সকলে। মায়, স্বয়ং সম্রাট পর্যন্ত।

এতখানি দুঃসাহস যে কারও থাকা সম্ভব, এতখানি ধৃষ্টতা যে কেউ কোনদিন বাদশার সামনে প্রকাশ ক'রেও স্থির অচঞ্চল থাকতে পারে—তা চোখে দেখেও বিশ্বাস করা কঠিন যে।

তিনি কি জেগে আছেন?

তিনি কি জীবিত এখনও?

না কি, এ সমস্তটাই খোয়াব দেখছেন?

এই বাড়ি, এই তহ্‌খানা—কিছু পূর্বের উপাদেয় খাদ্য-সামগ্রী—এর কোনটাই কি বাস্তব কিছু নয়? এখনই, ভোরাই-নাকারার শব্দে এবং ফজরের আজানে ঘুম ভেঙে জেগে উঠে দেখবেন—তিনি তাঁর শয়নকক্ষেই অবস্থান করছেন, এতক্ষণ গাঢ় ঘুমে অচেতন ছিলেন মাত্র।

অথবা তাঁর বাদশাহীই আর নেই! পিতৃপিতামহের শাহীতখৎ—শাহানশাহ্ বাবর-আকবরের সিংহাসনে তাঁর কোন অধিকার নেই। লক্ষ লক্ষ সিপাহী-সান্ত্রী, মনসবদার-নবাব-রাজা, উজীর-সুবাদার—কোন্ সুদূর দিগন্তে লুপ্ত হয়ে গেছে, মিলিয়ে গেছে প্রত্যূষের পশ্চিমাকাশে বিলীয়মান শেষ নক্ষত্রটির মতো, ভোরের ঘুম ভাঙা সুখ-স্বপ্নের মতো!

কিম্বা, সৃষ্টির শেষ দিনটিই বুঝি আসন্ন, সারা জাহানের আখেরী মুহূর্তটি। মানুষের গুনাহ্ আর গোস্তাকিতে, স্পর্ধা আর ধৃষ্টতায় নারাজ হয়ে জগদীশ্বর বুঝি আজই স্মরণ করেছেন ইস্রাফিলকে—দুনিয়ার এই খেলাঘরটাকে ভেঙ্গে দেবার জন্য। এখনই বুঝি মাটি কেঁপে উঠবে, পাহাড় ভেঙে পড়বে, নদীর উৎস যাবে শুকিয়ে, উন্মত্ত সমুদ্রের তরঙ্গোচ্ছ্বাসে এই সব শহর, গ্রাম, জনপদ ধুয়ে মুছে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। আর, সেই চরম সর্বনাশ আসন্ন জেনেই সবাই এমন বেপরোয়া হয়ে গেছে। শাহানশাহ্ বাদশা শাহ্‌জাহানের স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ আদেশ অমান্য ক'রেও সামান্য একটা প্রাণী এমন স্থির ও নিশ্চিন্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে।...

বিস্ময়! বিস্ময়! এর চেয়ে সোজাসুজি বিনা ভূমিকম্পে একটা পাহাড় ভেঙে পড়তে বা নদীর জল ঊর্ধ্বগামী হইতে শুরু করেছে দেখলেও এ'রা বোধ হয় বেশী বিস্মিত হতেন না।

তাই বেশ কিছুটা সময় লাগল এ'দের—বোধ, চৈতন্য এবং অনুভূতি শক্তি ফিরে পেতে। তার পরও—চিন্তা-শক্তি সক্রিয় হয়ে বাস্তব অবস্থাটা অনুভব করতে, আরও অনেকখানি সময় লাগল। তখন—বাদশার মুখের দিকে সভয়ে—আনত মুখে দাঁড়িয়ে যতটা দেখা সম্ভব—চেয়ে দেখল সকলে যে, তাঁর শুভ্র সুগৌর মুখ সত্যসত্যই অঙ্গারবর্ণ ধারণ করেছে, ঈষৎ নীল চক্ষু দুটি জবা ফুলের মতো লাল হয়ে উঠেছে, ললাটের দুদিকে শিরা-গুলো আনীল রক্তাভ দড়ির মতো মোটা হয়ে ফুলে উঠেছে।

অর্থাৎ তাঁর দেহের সমস্ত রক্ত, তৈমুরশাহী বাবরশাহী বংশের স্বভাব-উত্তপ্ত লোহু প্রবল বেগে মাথায় উঠছে, হয়ত এখনই শির ছিঁড়ে নাক-মুখ

দিয়ে বা দুই চক্ষু বিদীর্ণ ক'রে সে রক্ত বেরিয়ে আসবে; অথবা সন্ন্যাস রোগে এখনই অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাবেন!

উজীর-এ-আজম ব্যাকুলভাবে একবার চারদিকে চাইলেন। ভুল হয়ে গেছে, খুবই ভুল হয়ে গেছে তাঁদের। সবাইকে আনা হয়েছে সঙ্গে. শুধু হাকিম সাহেবের কথাই মনে পড়ে নি। কিন্তু এখানে কি কেউ নেই? শাহ্‌জাদা দারার কোন চিকিৎসক? শাহ্‌জাদা তাঁকে ডাকছেন না কেন?

তিনি কী যেন একটা বলতেও চেষ্টা করলেন, হয়ত শাহ্‌জাদা দারাকে হাকিম ডাকবার কথাই বলতে গেলেন, কিন্তু সে চেষ্টার ফলে তাঁর ঠোঁট দুটোই শুধু নড়ল, তার মধ্য দিয়ে কোন শব্দ বার হ'ল না। বাদশার মুখের দিকে চেয়ে আসন্ন একটা প্রলয়কাণ্ডের আশঙ্কায় তাঁর কণ্ঠ তালু সমস্ত শুকিয়ে গিয়েছিল, রসনা হয়ে গিয়েছিল অসাড় অনড়—কথা ফোটা তো দূরের কথা, কোন ধ্বনি বার হবারও অবস্থা ছিল না।

কিছুই করতে না পেরে—মনে মনে শুধু খোদাকেই স্মরণ করতে লাগলেন তিনি।

কিন্তু না, কোন প্রলয়ঙ্কর কিছু ঘটল না। মাথার ওপরের ছাদ তার বিপুল কালো জলের বোঝা নিয়ে ভেঙ্গে পড়ল না কিংবা পায়ের তলার পাথর বিদীর্ণ হয়ে একটা বিরাট অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করল না। এমন কি বাদশাও উমন্ত রোষে ফেটে পড়ে উপস্থিত সকলের গর্দান নেবার আদেশ দিলেন না। বরং যেন অমানুষিক চেষ্টায় সেই দুর্বার ক্রোধকে দমনই করলেন শেষ পর্যন্ত। এটাও বাদশাহীর একটা প্রধান শিক্ষা, পিতৃপিতামহের রক্ত থেকে প্রথম জীবনানুভূতি লাভ করার সঙ্গে সঙ্গেই এই শিক্ষাটুকুও সংগ্রহ করেন তাঁরা। শাহ্‌জাহানও সে শিক্ষা লাভ ক'রে আসছেন, তাঁর শৈশব থেকে। চিত্ত দমন করা ও মনোভাব গোপন করার শিক্ষা। বহু পুরুষের শাহী রক্ত বইছে তাঁর ধমনীতে—চেঙ্গিজ খাঁ-তৈমুরলঙ্গ থেকে বাবর শা-আকবর শা—দুর্ধর্ষ যোদ্ধা ও শ্রেষ্ঠ শাসকের রক্ত; সেই রক্তেরই শিক্ষা এটা।

সাধারণ মানুষের যে সহজাত ক্রোধ, কিছুকালের জন্য তা দুর্মদ হয়ে উঠেছিল হয়ত—কিন্তু সে নিতান্তই কয়েক মুহূর্তকাল, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর শাহানশাহী ঐতিহ্য কঠিন নির্মমভাবে দমন করল তাকে। আস্তে আস্তে ফুলে ওঠা শিরাগুলো মিলিয়ে গেল তাঁর দুই রগের ওপর থেকে, মুখের সেই অঙ্গার ভাব ধীরে ধীরে তার স্বাভাবিক রক্তাভ গৌরবর্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করল। বাদশা তাঁর আপন সত্তায় ফিরে এলেন আবার।

আর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, যেন কোন বিজয়-লাভের আত্মতৃপ্তিতেই, তাঁর স্বাভাবিক ঋজুদেহ ঋজুতর হয়ে উঠল, আর একটু সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন—যাতে তাঁর দীর্ঘদেহ আরও বেশী দীর্ঘ দেখায়, পদবীর উপযুক্ত সম্ভ্রমের সৃষ্টি করে উপস্থিত সকলের মনে। তিনি যে উপস্থিত সকলের থেকেই বড়—কী মহিমায়, কী মর্যাদায় আর কী শক্তিতে—সে

সম্বন্ধে সংশয় মাত্র না থাকে কারুর।

সম্রাট এবার দরজার দিক থেকে ফিরে একেবারে বিপরীত দিকে মুখ ক'রে দাঁড়ালেন। তারপর গম্ভীর অথচ অনুত্তেজিত ভাবলেশহীন কণ্ঠে জানালেন তাঁর আদেশ ও নির্দেশ। বললেন, 'মাননীয় উজীর-এ-আজম, আজ থেকে আমার তৃতীয় পুত্র শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের দরবারে প্রবেশ নিষিদ্ধ হ'ল। সাধারণ দরবারে তো নয়ই—কোন রাজকীয় জুলুস জলসা উৎসব বা ভোজসভাতেও তিনি যোগ দিতে পারবেন না। কোন কারণেই আমার সামনে যেন কোন দিন না আসেন আর। যে সব দায়িত্বভার তাঁর ওপর ন্যস্ত ছিল, দয়া ক'রে তা লাঘব ক'রে দেবেন। কোন কাজই ওঁর ওপর রাখার দরকার নেই। বোধ করি কিছুদিন পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন হয়েছে তাঁর—অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর শরীর খারাপ হয়ে পড়েছে, তাঁর চিন্তা-শক্তিতেও চাপ পড়ছে বেশ বোঝা যায়। ওঁর কোন্ কাজ কী ভাবে কাকে বে'টে দেবেন—সে ভার আপনার ওপরই দেওয়া রইল। শুধু দাক্ষিণাত্যে আমার প্রতিনিধি হিসেবে অতঃপর কাকে পাঠানো হবে—সেটা কাল আমার কাছ থেকে জেনে নেবেন। দশহাজারী মনসবও তাঁর থাকছে না—সেটাও মনে রাখবেন। কোন মনসবেই আর প্রয়োজন নেই তাঁর।'

এই পর্যন্ত বলে এক মুহূর্তকাল চুপ করলেন তিনি। বোধ করি আরও কি করা যেতে পারে, আরও কোন্ শাস্তি দিলে এই বেয়াদবির যোগ্য প্রত্যুত্তর হয় ভেবে নিলেন মনে মনে। তারপর বললেন, 'আর—শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের যে মাসোহারা নির্দিষ্ট আছে আজ থেকে উনি তার মাত্র এক-চতুর্থাংশ পাবেন। ঘোড়া গাড়ি বা পাল্‌কী বাবদেও অতিরিক্ত কোন ভাতা দেওয়া হবে না ওঁকে।...আদেশগুলো আপনি এখনই লিপিবদ্ধ ক'রে নিন, ভুল না হয়। আমি আজই অপরাহ্ণে বিশ্রামের পর দেখে দস্তখৎ ক'রে দেব। তারপর শাহ্‌জাদা দারাকে দিয়ে পাঞ্জার ছাপ দিইয়ে নেবেন।'

কাটা কাটা পরিষ্কার কথা। কোথাও কোন দ্বিধা কি জড়তা নেই, নেই কোন অস্পষ্টতা। কারও শোনবারও অসুবিধা হ'ল না, কারণ বেশ শ্রুতি-গম্য স্বরেই তিনি বলেছেন কথাগুলো। আদেশ শেষ ক'রে আর দাঁড়ালেনও না শাহানশাহ্, দৃঢ় স্বচ্ছন্দ পদক্ষেপে গিয়ে নিজের নির্দিষ্ট কামরায় প্রবেশ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর তাতারী বাঁদী ও খাবাস ভিতরে গিয়ে কামরার প্রবেশপথের সামনেকার ভারী পর্দাটা ফেলে দিয়ে দরজা আবৃত ক'রে দিল। ঘরে সুগন্ধি তেলের শেজ জ্বলছে, বাইরের আলোর কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু, শুধু তিনিই গেলেন, আর তাঁর সেবকরা গেল। আর কেউই নড়ল না। বহুক্ষণ পর্যন্ত নড়তে পারল না। স্থির নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সবাই—যে যেখানে ছিল। বজ্রাহতের মতো স্তম্ভিত অবস্থা তাদের, না আছে হাত-পা নাড়ার সাধ্য—না আছে কথা কইবার। এমন কি উজীর-এ-আজমও—যাঁকে সম্বোধন করে এই ভয়ঙ্কর আদেশ জানানো হ'ল—কোন কথা কইতে পারলেন না। এক্ষেত্রে অন্ততঃ যেটুকু শব্দ করা প্রয়োজন, আনুগত্য ও সম্মতিসূচক, সেটুকুও তাঁর গলা দিয়ে বেরুল না। শুধু সেই

বোধ করি, সূচীপতন-শব্দহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে বাদশারই ভারী ভরাট গলার উচ্চারিত শব্দগুলো অনেকক্ষণ ধরে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগল। বাদশা যেখানে উপস্থিত, সেখানে মাত্র তাঁর কণ্ঠই সরব ও সক্রিয় থাকবে— এই সত্য প্রত্যক্ষভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল আজ।

নিঃশব্দ ও নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবও —কিন্তু সে এঁদের মতো বিস্ময়ে বা ভয়ে নয়। তাঁরও স্তম্ভিত অবস্থা— তবে সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাকৃত, যেন কতকটা তাঁর রাজাধিরাজ পিতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই। বিনা প্রতিবাদে বিনা দ্বিধায় মাথা পেতে নিচ্ছেন পিতার অসন্তোষ ও আদেশ—সেইভাবেই মাথা হেঁট ক'রে রইলেন। তাঁর মুখ দেখে মনে হ'ল না তিনি কিছুমাত্র অনুতপ্ত বা বিচলিত হয়েছেন। বরং সে সময় যদি ভাল ক'রে কেউ লক্ষ্য করতেন ওঁর মুখভাব, তাঁদের মনে হ'ত যে অতি ক্ষীণ, প্রায় অদৃশ্য একটি হাসির রেখাই ফুটে উঠেছে তাঁর দুই ওষ্ঠপ্রান্তে। সে হাসির অর্থ কী—তা অবশ্য কেউ বলতে পারতেন না। সে কি উপেক্ষা? সে কি স্পর্ধা? সে কি বিদ্রূপ?—নাকি শুধুই এক প্রকারের স্নেহমিশ্রিত প্রশ্রয়—শিশুর আস্ফালন দেখলে গুরুজনরা সেটাকে যেভাবে নেন তেমনিই?

কী সে—তা বোঝা গেল না। বুঝতে দিলেনও না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। শাহানশার উপস্থিতি যবনিকার অন্তরালে অন্তর্হিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন তিনি। যেন কিছুই হয় নি, যেন বাদশা আর কারও সম্বন্ধে কইলেন কথাগুলো—এইভাবেই খুব সহজে স্বগৃহে যাত্রার জন্য প্রস্তুত হলেন।

ভয় নেই, দুশ্চিন্তা নেই—তাই বলে দুর্বিনয়ও নেই। সৌজন্যের রীতি প্রকাশে কখনও ভুল হয় না তাঁর। শুজা ও মুরাদের উদ্দেশে একটু মাথা হেলিয়ে তাঁদের অভিবাদন জানালেন, উজীর-এ-আজমের দিকে একটু হাসি এবং সম্মানসূচক একটা ভঙ্গী যেন ছুঁড়ে দিলেন—তারপর অতি মধুর বিনয়ের সঙ্গে গৃহস্বামীর দুই হাত ধরে বিদায় প্রার্থনা জানিয়ে ধীর পদ-ক্ষেপে উপরের দিকে উঠে গেলেন।

এদের কী রকম মনোভাব বা মুখভাব হ'ল তা দেখার জন্য যেমন এক মুহূর্তও আর অপেক্ষা করলেন না—তেমনি পিছনের ভারী দরজাটা যে নিঃশব্দে বন্ধ হয়ে গেল তাও লক্ষ্য করলেন না আর।

॥ ৩ ॥

বজরায় এসেছিলেন অথবা বলা যায় বজরা তাঁর পিছু পিছু এসেছিল— কিন্তু তাতে আর ফিরলেন না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। তাঁর যা মানসিক অবস্থা এখন—তা ঐ নিষ্ক্রিয় মন্থর জলযাত্রার পক্ষে অনুকূল নয় আদৌ। বিলাস ও আরাম কখনই দেখতে পারেন না তিনি, এখন তো অসহ্য। বজরা চলবে স্রোতের বিপরীত দিকে—প্রায় না চলার মতোই, ধীরে ধীরে—আর

তিনি মুখ বুজে বসে থাকবেন চুপ ক'রে, অথবা শুয়ে থাকবেন, এ তাঁর দ্বারা হবে না, অন্ততঃ এখন তো নয়ই। সুতরাং তিনি অগ্রজের নূতন বাড়ির তহ্‌খানা থেকে উঠে এসে সর্বপ্রথমেই যা আদেশ দিলেন তা হ'ল বজরাকে ফিরে যাবার। দারার কর্মচারীরা ব্যস্ত হয়ে তাঁর জন্য তাঞ্জাম বা ঘোড়ার গাড়ির ব্যবস্থা করতে যাচ্ছিল—মধুর ধন্যবাদের সঙ্গে তাদেরও নিরস্ত করলেন।

প্রয়োজনও কিছু ছিল না। তাঁর বালক ভৃত্যকে বৃথাই তিনি আগে সরিয়ে দেন নি; সে-ই তাঁর ফেরার ব্যবস্থা করেছে তাঁর মনের মতো। তাঁর ঘোড়া আর সেই সঙ্গে জনা আষ্টেক অশ্বারোহী দেহরক্ষী ডেকে এনেছে সে, দারার প্রাসাদের বাইরে অপেক্ষা করছে তারা। আনবে যে—সে কথা আওরঙ্গজেব নিশ্চিত জানেন। এবং আনবে সে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই। এতক্ষণ পেঁাছে যাবার কথা যখন—তখন পেঁাছেও গেছে। আওরঙ্গজেব প্রশ্ন করলেন না কাউকে, কারুর কাছে খবর নিলেন না—বাইরে এসে দেখলেন ঘোড়া অপেক্ষা করছে, বিনাবাক্যব্যয়ে ঘোড়ায় চেপে নিজের প্রাসাদের দিকে রওনা দিলেন।...

এই ধরনের লোক ছাড়া শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের চলে না। অলস অকর্মণ্য সেবক আর চাটুবাদী পার্ষদকে অন্তরের সঙ্গে ঘৃণা করেন তিনি। এরাই মানুষের পতনের মূল। এরা মনিবদের শুধু যে অমানুষ ক'রে দেয়, তাই নয়, তাদের সর্বনাশের পথে টেনে আনে। বালক দেলওয়ার শুধু অত্যন্ত অনুগত বা অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলেই নয়—অত্যন্ত বুদ্ধিমান ও অসাধারণ কর্মঠ বলেই শাহ্‌জাদার এত প্রিয়। ইঙ্গিতে ইশারায় বুঝে নেয় তাঁর মনের কথা, অনেক সময় সেটুকুও করতে হয় না পুরোপুরি। ইচ্ছা বুঝে নিতে পারে এবং ইচ্ছা বোঝামাত্র তা পূর্ণ করতে পারে, অন্ততঃ সে চেষ্টায় এতটুকু বিলম্ব কি গাফিলতি হয় না। এই বয়সেই এমন চৌকস এবং কর্মঠ ছেলে তিনি বড় একটা দেখেন নি। পরিশ্রমী বুদ্ধিমান অথচ বিশ্বস্ত। তাঁর সন্দেহ হয়—তাঁকে হয়ত ভালওবাসে। সর্বক্ষণ ছায়ার মতো কাছে থাকে, তাঁর ব্যক্তিগত সেবার খুঁটিনাটি কাজগুলো পর্যন্ত নিজে করে—জোর ক'রেই, খাবাস বা অন্য কোন ভৃত্যকে করতে দেয় না। সেই জন্যেই—এত বয়স্ক লোক থাকতে বহু গুরুতর কাজের ভার তিনি এই কিশোর বয়স্ক সেবকটিকেই দেন নিশ্চিন্ত হয়ে।

আজও দিয়েছিলেন তাই। ইঙ্গিত মাত্র সরে গিয়েছিল সে, সকলের চোখের সামনে থেকে যেন ডুবে গিয়েছিল। আলোতে-আসা-ছায়ার মতোই মিলিয়ে গিয়েছিল। এই রকমই প্রয়োজন ছিল, তা সে বুঝেছে। নইলেই জবাবদিহি, সহস্র কৌতূহলী প্রশ্নের সামনে পড়া। তাতে কার্য সিদ্ধির বিঘ্ন ঘটত। ঠিক সময়ে বেরিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সময়ে ফিরেছে। যা করা উচিত ছিল, যা আনা বা যাদের আনা দরকার—সব এনেছে ঠিকঠিক। ঘোড়া দেহরক্ষী কিছুই ভুল হয় নি।

খুশি হলেন আওরঙ্গজেব কিন্তু মুখে কিছুই বললেন না। কোন

বাহবা দেবারও চেষ্টা করলেন না। তিনি জানেন যে, এক্ষেত্রে অন্তত, মৌখিক প্রশংসার কোন প্রয়োজন নেই। মালিক খুশি হলেন কিনা—তাও দেলওয়ার তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারে।

দেহরক্ষীরা শাহ্‌জাদাদের আমীরদের আগে পিছে চলবে—এই তাঁদের কর্তব্য ও দায়িত্ব, কিন্তু আওরঙ্গজেব আজ আর তাদের সে কর্তব্য পালনের অবসর দিলেন না। বোধ করি রেকাবে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়ার ক্ষমতা বুঝতে পারলেন, ঘোড়াও পিঠে বসার সঙ্গে সঙ্গে চিনল সওয়ারীকে—দেখতে দেখতে দেহরক্ষীদের বহু পিছনে ফেলে এগিয়ে চলে গেল। তাদের সাধারণ ঘোড়ার সাধ্য নেই যে শাহ্‌জাদার শিক্ষিত আরবী ঘোড়ার সঙ্গে সমান চাল বজায় দেয়। সুদ্ধ মাত্র বালক দেলওয়ার কোনওমতে—প্রাণ-পণ চেষ্টায়, কতকটা কাছাকাছি চলতে লাগল। তাও ঘোড়ার ওপর উপুড় হয়ে পড়ে, তার সাধ্যাতিরিক্ত দ্রুত চালিয়ে।

তা হোক, দেহরক্ষীর প্রয়োজন নেই আওরঙ্গজেবের। ওটা নিতান্তই সম্মানের প্রশ্ন মাত্র। ভয় তিনি কাউকে করেন না, একমাত্র বে-নিয়াজ জগদীশ্বরকে ছাড়া। এখানের কাউকেই ভয় নেই তাঁর। এ শহরে এমন কেউ নেই যে তাঁর অনিষ্ট করতে সাহস করবে। তাছাড়া ঈশ্বর তাঁকে এমনই ব্যক্তিত্ব দিয়েছেন, ইন্দ্রিয়গুলি এমনই সজাগ ও সতর্ক ক'রে পাঠিয়েছেন এ পৃথিবীতে যে, বিপদ কোনদিক থেকে আসছে তা চোখে না দেখেও টের পান তিনি। আর সে কথা জানেও পরিচিত সবাই। তাঁর ভাইরাও জানে। তাদেরও ভরসায় কুলোবে না এভাবে তাঁকে বিপন্ন করার। আর এই দুপুরে দুঃসহ অগ্নিতাপে সকলেই ঘরের কোণে অর্ধ-মূর্ছিত হয়ে পড়ে আছে। যাদের বিশেষ কাজে বাইরে থাকতে হয়েছে, তারা তো মৃতপ্রায়, কোন রকমে কাজ সেরে ছায়ায় কোথাও যেতে পারলে বাঁচে। পথ দিয়ে কে যাচ্ছে ঘোড়ায় চেপে তা দেখার সময় বা অভিরুচি কিছুই নেই।

কষ্টকর খুবই, তবু মুহূর্তে আওরঙ্গজেবের যেন এই কষ্টটাই ভাল লাগল। এর চেয়েও দৈহিক কষ্ট বোধ করতে পারলে যেন তিনি সুস্থ বোধ করতেন। আর কিছু না হোক—দ্রুত চলতে পেরে বেঁচে গেলেন খানিকটা, এই দ্রুতগতিই যেন রসায়নের কাজ করল।

প্রাসাদের ফটক সুদ্ধ পেরিয়ে গিয়ে একেবারে সিঁড়ির মুখে ঘোড়া থেকে নামলেন শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। লাগামটা দেলওয়ারের উদ্যত ও সদাপ্রস্তুত হাতের উদ্দেশে ছুঁড়ে দিয়ে তরতর ক'রে ওপরে উঠে গেলেন—নিজের মুন্সীখানায়। এখনও মধ্যাহ্ন কাটে নি, তহ্‌খানায় খস্‌খস্‌ সুরভিত শীতল ঘরে পূর্ববঙ্গ থেকে আনা শীতলপাটি বিছানো শীতলতর শয্যা এখনও অপেক্ষা করছে তাঁর জন্য। পাশে ফুলের মালা জড়ানো সুরাইতে হিমশীতল জল এবং শয্যার উপর খস্‌খসের টানা পাখা সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এখনও—এসব কোন কথাই মনে পড়ল না তাঁর। আশে-পাশে যে সন্ত্রস্ত খাবাস ও খানসামার দল ছুটে এসেছে, তাতারিণী ও খোজা প্রহরীর দল উন্মুখ হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আছে আদেশের

জন্য—সেদিকে তাকিয়ে দেখলেনও না একবার। কাজের সুবিধার জন্য দোতলায় মুন্সীখানার পাশে একটি ছোট একক শয়নকক্ষ প্রস্তুত থাকে সর্বদা. প্রয়োজন হ'লে তিনি সেখানেই বিশ্রাম করতে পারবেন। করেনও তা, গুরুতর রাজকার্য থাকলে, এমন কি রাত্রেও এক একদিন এখানেই বিশ্রাম নেন। গভীর রাত্রে কোন স্ত্রীকে ডেকে তুলে তার আলস্যমদির চক্ষু ও নিদ্রাস্ফীত মুখ দেখার প্রবৃত্তি তাঁর হয় না।...দরকার হ'লে আজও সেই ঘরেই শোবেন। গরম ? যে এই দুপুরে এতটা পথ ভেঙ্গে এসেছে তার পক্ষে ঘরের ছায়াই তো যথেষ্ট শীতল। তা ছাড়া সে যা-ই হোক, এখন ঘুমোবার কথা তো ভাবতেই পারছেন না। মনের মধ্যে চিন্তাগুলোকে একটু গুছিয়ে নেওয়া দরকার।

মুন্সীখানায় ঢুকেও তাঁর অভ্যস্ত আসনে তখনই বসতে পারলেন না শাহ্‌জাদা। মেহগনি কাঠের পালঙ্কে ফরাস পাতা, পাশের একটি উঁচু চৌকিতে বিস্তর কাগজপত্র মানচিত্র প্রভৃতি স্তূপাকার করা, কলম দোয়াতদান—রীতিমতো দফতরের সজ্জা। ফরাসেও একটা বড় উঁচু তাকিয়া আছে, কিন্তু শাহ্‌জাদা তাতে হেলান দেন কদাচিৎ, সোজা হয়ে বসেই কাজ করেন। এত কাজও তাঁর মতো কেউ করতে পারে না—পাঁচ ছ-জন মুনীম ও মুন্সী তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিতে হিমশিম খেয়ে যায়। তবু তো চিঠিপত্র বেশির ভাগ তিনি নিজের হাতেই লেখেন।

ঘরে ঢোকার পরও, অনেকক্ষণ পর্যন্ত, তিনি যে ঘরে ঢুকছেন তা যেন বুঝতেই পারলেন না। সম্পূর্ণ অন্যমনস্ক ও অনবহিতভাবেই পায়চারি করতে লাগলেন। এ ঘরেও যে শয্যা আছে একটা—অন্তত তাতে বসা চলে অনায়াসেই—পাশের ঘরে তো শয়নের সব ব্যবস্থাই প্রস্তুত—সে সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সচেতনতা দেখা গেল না। শুধু হঠাৎ কোথা থেকে খানিকটা বাতাস এসে লাগতে চমকে লক্ষ্য করলেন, দেলওয়ার কখন ঘরে এসে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রে দিয়ে ঘরের কোণে রাখা বড় পাখাখানা তুলে নিয়ে বাতাস করতে শুরু করেছে।

বাতাসটাতে বড়ই আরাম বোধ করলেন শাহ্‌জাদা। এইবার তিনি প্রথম লক্ষ্য করলেন যে, প্রচুর ঘামছেন তিনি। যতক্ষণ বাইরে ছিলেন, গরমে ঝল্‌সে গেছেন কিন্তু ঘাম হয় নি। এ ঘরের দরজা-জানালায় ভিজে খস্‌খসের পর্দা থাকায় বাইরের থেকে যথেষ্ট ঠাণ্ডা, তবু এখানে আসার পর থেকেই ঘামতে শুরু করেছেন। সেই জন্যেই হাওয়াটা এত মধুর লেগেছে তাঁর।

সচেতন হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই মাথার উষ্ণীষটা খুলে চৌকীর ওপর রাখলেন, তারপর রুমালে মাথা গলা কপাল ভাল ক'রে মুছে নিয়ে —যেন অনেকটা প্রকৃতিস্থ হয়ে, ঈষৎ স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে দেলওয়ারের দিকে চাইলেন। দেখলেন বারতিনেক এই পথ ছুটোছুটি ক'রে রোদে গরমে বেচারীর মুখ শুকিয়ে উঠেছে, বরং বলা উচিত—আউতে গেছে। তার ওপর এই পরিশ্রমে এখন তারও টুপির নিচে দিয়ে কপাল বেয়ে অজস্র ধারায়

বড় বড় ফোঁটা ঘাম ঝরে পড়ছে।

প্রসন্ন হলেন শাহ্‌জাদা। সহ্যশক্তি ও কর্তব্যে—নিষ্ঠা শুধু নয় অনুরাগও—এ দুটি গুণই পুরুষের পক্ষে অত্যাবশ্যক। এর দুটোই আছে। ভবিষ্যতে উন্নতি করবে। তিনি একপা এগিয়ে এসে, তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ কোমল কণ্ঠে বললেন, 'থাক, পাখা রেখে দে। আর হাওয়া লাগবে না। টুপিটা খোল, দরকার হয় তো আঙরাখাটাও খুলতে পারিস, তাতে কোন দোষ হবে না।'

পাখাটা রাখল দেলওয়ার কিন্তু নিজের টুপি বা জামা খোলার কোন চেষ্টা করল না। তার বদলে, পালঙ্কের সামনে রাখা ভেলভেটের চটি জুতোটা এনে ওঁর পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে আস্তে আস্তে বলল, 'জুতোটা খুলবেন না, জনাব-ই-আলী? এ জুতো যা তেতে উঠেছে, হয়ত ফোস্কা পড়বে।'

একটু হাসলেন শাহ্‌জাদা, তবে বেশ নরম গলাতেই বললেন, 'এত সহজে আমার পায়ে ফোস্কা পড়ে না রে। সে পড়ত বড়ে শাহ্‌জাদা এমনি এলে—তাঁর পায়ে। আমাকে মরুভূমিতে লড়াই করতে যেতে হয়েছে, সেখানে তাত এর চেয়ে ঢের বেশী। এত সহজে ফোস্কা পড়লে কি চলে আমাদের?'

বললেন কিন্তু পা বাড়িয়েও দিলেন। দেলওয়ারের বোধ হয় মনে হয়েছিল, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পায়ের জুতো খুলতে গেলে শাহ্‌জাদাকে কিছু ধরতে হবে, আর তখন হয়ত—ওর মনে দুরাশা ছিল—তিনি ওর মাথাটাই ধরতে চাইবেন হাতের কাছে অন্য কিছু না পেয়ে। তাই সে প্রাণপণে গলা উঁচু ক'রে মাথাটা ওঁর হাতের নাগালের মধ্যে নিয়ে এল কিন্তু শাহ্‌জাদা সেদিক দিয়েও গেলেন না, আশ্চর্য কৌশলে এক পায়ের ওপরই খাড়া দাঁড়িয়ে আর একটা পা বাড়িয়ে দিলেন।

জুতো পাল্‌টানো হ'লে ধীরে ধীরে গিয়ে ফরাসে বসলেন। তাকিয়াতেও হেলান দিলেন, কিন্তু শুলেন না। আরাম করার প্রবৃত্তি বা প্রয়োজন কোনটাই নেই তাঁর। তিনি শুধু এলোমেলো চিন্তাগুলোকে একটু গুছিয়ে নিতে চান মনের মধ্যে।

এইমাত্র যে কাজটা ক'রে এলেন তিনি—সেটা কি যথার্থই একটা বেহুদা বে-অকুফি হয়ে গেল?

উন্মাদের মতো নিজের জাহান্নমের পথ নিজে তৈরী ক'রে দিয়ে এলেন। একেবারে অকারণে চরম সর্বনাশ ডেকে আনলেন?

তাই যদি হয় তো, সে বে-অকুফি নিজেই ক্ষমা করতে পারবেন না কোন দিন। বুঝবেন যে তিনি কেবল ভাবীকালে বিপুল এই মুলুকের দেশশাসক রূপ গুরুদায়িত্বের অযোগ্য যে—তাই নন, পিতৃ-পিতামহের পরিচয় দেওয়ারও অযোগ্য। অপদার্থ তিনি, ঐ সুরতহারাম বড়ে শাহ্‌জাদার চেয়েও অপদার্থ।

ভাবতে ভাবতে অকস্মাৎ যেন অস্থির হয়ে উঠলেন শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। দেলওয়ার ইতিমধ্যে কখন পাশে এসে দাঁড়িয়ে বাতাস করতে

শুরু করেছে—কিন্তু তাতেও যেন শরীর ঠাণ্ডা হচ্ছে না। তিনি আরও জোরে বাতাস করতে ইঙ্গিত করলেন। ঐটুকু বালকের ওপর এটা হয়ত অত্যাচারই হচ্ছে, অন্য সময় হ'লে সেটা মনেও পড়ত শাহ্‌জাদার কিন্তু মনে পড়ল না। এ সময় অন্য সেবক কাউকে ডেকে বাতাস করতে বলার কথাও ভাবতে পারলেন না তিনি। একা থাকতে হবে এখন তাঁকে। কিছুক্ষণ অন্তত একা থাকা চাই। একমাত্র দেলওয়ারই নিজের অস্তিত্ব বিলোপ ক'রে থাকতে পারে পাশে, সে যে আছে সেটা মনে না রাখলেও চলে।

কী করলেন সেটা একটু তলিয়ে ভাবা দরকার—কিন্তু এখন ভাবার চাইতে কাজটা করার আগেই ভাবা উচিত ছিল। আসলে সে সময়টাই পান নি তিনি।

আজকের এ ঘটনাটার সূত্রপাত হয়েছে প্রত্যুষেই।

ভোরেই ওঠেন শাহ্‌জাদা। এ তাঁর দীর্ঘকালের অভ্যাস। মদ্য পান করেন না, সুতরাং নেশা কাটাবার জন্য বেলা অবধি ঘুমোতে হয় না। যত রাত্রেই শুতে যান না কেন, শেষ রাত্রে ঠিক উঠে পড়েন—ভোরের আলো পূর্বাকাশ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে। একাই উঠে প্রাতঃকৃত্য সারেন। ফজরের নমাজ করার আগে, আল্লাতা'লাকে প্রণাম জানানোর আগে কোন ভৃত্যের সাহায্য নেন না তিনি। জগদীশ্বরের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হয় দীনহীনের মতো—তা তিনি জানেন।

আজও ভোরেই উঠেছিলেন। বরং ভোর হওয়ারও আগে। ফজরের প্রার্থনা শেষ ক'রে বাইরের দিকে যখন তাকিয়েছিলেন তখন পূর্ব দিগন্তে লালিমার আভাস মাত্র দেখা দিয়েছে। সাধারণত এসময় কোন ভৃত্য তাঁর সামনে আসে না। তিনি একাই এসে মুন্সীখানায় কাজে বসেন। এখানের কাজ সেরে দফ্‌তরখানায় যান। এখানের কাজ একা-একা করার, ব্যক্তিগত ও গোপনীয়। তিনি চান না এখানে কৌতূহলী বাজে লোকের দৃষ্টি সন্ধানী হয়ে ওঠে।

আর দরকারও হয় না। ধূমপান করার অভ্যাস নেই, ভোরে কিছু খাওয়ারও দরকার হয় না। তাই ভৃত্যদেরও প্রয়োজন হয় না সামনে আসার, তবে কাছাকাছি থাকে তারা। সামান্য আহ্বানেই এসে দাঁড়ায়। শাহ্‌জাদাও তার বেশী চান না। কিন্তু আজ অত ভোরেই, মুন্সীখানায় প্রবেশ করার আগেই তাঁর খাবাস কুণ্ঠিতভাবে এসে অভিবাদন ক'রে দাঁড়িয়েছিল। বিস্মিত বোধ করেছিলেন শাহ্‌জাদা, মুখ তুলে ঈষৎ ভ্রূকুটি ক'রেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'কী চাই, কোন জরুরী খবর আছে?'

'জী, জনাব।' সে আর একবার আভূমিনত হয়ে অভিবাদন করেছিল, 'কাল রাত্রে ফটকে যে দুজন সান্ত্রী পাহারায় ছিল তারা একবার আপনার দর্শন চায়।'

'সান্ত্রীরা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়? তার মানে? তাদের গুস্তাকী তো কম নয়। যদি তাদের কোন নালিশ থাকে তো মির-ই-বকাউলকে জানাতে বলো। তাদের এমন কি জরুরী কথা থাকতে পারে যা

তাদের ওপরওয়ালাকে না জানিয়ে আমাকেই বলতে হবে?'

স্পষ্টই বিরক্ত হয়ে ওঠেন শাহ্‌জাদা।

'সেইটেই তো কিছু বুঝতে পারছি না জনাব-ই-আলী। তারা বলছে যে তাদের যা বলবার তা আপনাকেই তারা বলবে, সেই রকমই নাকি হুকুম আছে তাদের ওপর।'

'হুকুম আছে! তাজ্জব। আমার নৌকরদের আমি ছাড়াও হুকুম দেবার অন্য মালিক থাকতে পারে—তা জানা ছিল না তো! দিতে পারেন এক আলমপনা, আলাহজরৎ, তা তিনি নিশ্চয়ই অত রাত্রে লোক পাঠান নি, তাহ'লে তো তখনই আমাকে ডেকে তুলত।'

'সে কথা আমিও বলেছি আলিজা। কিন্তু তারা জিদ্ করছে—বলছে যে, হুকুম দিতে পারেন এমন একজনই এসেছিলেন, আর সে খবর ভোরেই আলিজার কাছে পেঁাছে দিতে হবে বলে গেছেন। যদি তারা কোন বাজে কথা বলে আপনার সময় নষ্ট ক'রে কিম্বা মিথ্যে ক'রে দিল্লগী ক'রে কিছু বলে —তাহলে তাদের জিভ কেটে তাদের সামনেই কুকুরকে দিয়ে খাওয়ানো হবে—একথা তাদের জানিয়েছি, তৎসত্ত্বেও তারা আপনার কাছে আসতে চায়। বলছে যে খুব জরুরী কথা, এখনই জনাব-ই-আলীর জানা দরকার। না হ'লে এর পর আপনিই নাকি রাগ করবেন ওদের ওপর?'

চকিতের জন্য আরও একটু ঘনসম্বন্ধ হল কি ভ্রূকুটিটা, ঈষৎ একটু কঠিন হয়ে উঠল দৃষ্টি?...হ'লেও তা এক লহমার জন্যই। বিরক্তি বা বিস্ময় এই সব ইতর লোকদের কাছে প্রকাশ করতে নেই। যেটুকু করেছেন, তাঁর পক্ষে তা-ই যথেষ্ট। তিনি প্রশান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, 'বেশ, তাহ'লে তাদের মুন্সীখানাতেই নিয়ে এসো, আমি সেখানেই বসব এখন।'

এখানেই এসেছিল তারা, এই কামরাতেই।

ঠক ঠক ক'রে কাঁপছিল, ভয়ে কি উত্তেজনায়—তা বলা কঠিন। সম্ভবত ভয়েই। তারা জানে যে এর চেয়ে বাঘের গুহায় গিয়ে দাঁড়ানো ঢের সহজ। বড় বড় ঘামের ফোঁটা গড়িয়ে পড়েছিল কপাল দিয়ে সেই অত ভোরেই, কথাও বলতে পারছিল না ভাল ক'রে।

কোনমতে কুর্নিশ করতে করতে সামনে এসে ঐ পদার্থটা রেখেছিল, এখন যেটা যত্ন ক'রে তিনি লেখার চৌকীতে, কলমদানের পাশে রেখে দিয়েছেন।

'কী এটা? এ জিনিস এখানে কেন?' জলদগম্ভীরস্বরে প্রশ্ন করেছিলেন শাহ্‌জাদা, 'এসব কি দিল্লগী শুরু হ'ল ভোর বেলাতেই? রাতের নেশা ছোটে নি বুঝি এখনও, শিরটা কাঁধ থেকে না নামলে ছুটবে না?'

'মাফ—মাফ করবেন জনাবেহকীম।' গলা কাঁপছিল তাদের, 'কোন নেশা করি নি, খোদা সাক্ষী। যদি নেশা ক'রে থাকি তো এখনই যেন মাথায় বজ্রাঘাত হয়।...আপনার সঙ্গে দিল্লগী করব এত হিমাকতও আমাদের হবে না, আমাদের ঘাড়ে দু-দশটা শির নেই।...আ-আমাদের কোন দোষ নেই আলিজা, কাল শেষ রাত্রে সেই আওরৎ এসে এটা দিয়ে গেছে, বলে গেছে আজ

ফজরেই যেন এটা আপনার সামনে এনে হাজির করি—না হ'লে আমাদের নাকি শির থাকবে না, আমাদের নাতোয়ানির জন্যে জনাবালির কাছে জবাবদিহি করতে হবে।'

'আওরৎ! আওরৎ দিয়ে গেছে! কে সে আওরৎ? কার এত বড় স্পর্ধা যে আমার সঙ্গে এমন ভাবে দিল্লগী করে।'

'কে তা বলতে পারব না বন্দানওয়াজ। বুরখা পরা ছিল। শুধু তার হাতটা দেখেছি। খুবসুরৎ হাত—কোন বড় ঘরের লেড়কী কি ঘরোয়ালী হবে নিশ্চয়।'

এবার আর শাহ্জাদার উষ্মা চাপা রইল না। ক্রোধে অঙ্গারবর্ণ ধারণ করল তাঁর স্বভাব-আরক্ত সুগৌর মুখ। আর ওদের দিকে তাকালেনই না তিনি, খাবাসকে উদ্দেশ ক'রে ভীষণকণ্ঠে বললেন, 'খোজা আব্বাস কোথায়? তাকে ডেকে পাঠাও। এই সব সান্ত্রীদের কে চাকরী দিয়েছে আমি জানতে চাই। বেছে বেছে এই সব পাঁড় বে-অকুফ্‌কে ধরে এনেছে কেন আর কোথা থেকে—জানা দরকার। কত ঘুষ খাচ্ছে সে? এমনভাবে আমার টাকা নষ্ট করানো যায় না—সেটা তাকে ভাল ক'রে জানিয়ে দেওয়া দরকার, যাতে জীবনে আর না ভোলে।'

সান্ত্রী দুজনের ততক্ষণে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে, পা দুটো এতই কাঁপছে যে আর দাঁড়ানো সম্ভব নয়। তারা বলতে গেলে ওঁর এই পালঙ্কের নিচে ওঁর পায়ের সামনে আছড়ে পড়ল।

'হজরৎকুম আপনি আমাদের মা-বাপ, আপনার কুত্তার কুত্তা আমরা, আপনার গুস্‌সার যোগ্য নই। আমাদের জান নেওয়া আপনার এক লহমার কাজ, আর যদি আপনার খুশি হয়—এখনই দিতে তৈয়ার আছি। শুধু বান্দাদের আর্জিটা একবার শুনতে হুকুম হয় জনাব-ই-মবারক। সত্যিই বলছি, আমাদের কোন দোষ নেই। খোদা জামিন, নেশাও করি নি আমরা। আপনার নৌকরদের মধ্যে এমন সাহস কারও নেই যে সরাব খাবে কি অন্য নেশা করবে। আর এত বে-অকুফও নই যে পথের এক বেগানা আওরতের কথায় এক খিলৌনা নিয়ে ভোরবেলাই আপনাকে দিক করতে আসব। আমরা সে আওরৎকে তো হাঁকিয়েই দিয়েছিলুম কিন্তু শেষ পর্যন্ত আপনার মোহরী আংটি দেখাতেই আর কিছু বলতে পারলুম না।'

'কী? কী দেখাল?' উত্তেজনায় শাহ্জাদা উঠে দাঁড়ালেন একেবারে।

'আ-আপনার মোহরতের আংটি* জনাবালি, মুহর-ই-সুলেমান।'

'আমার মোহরতের আংটি! সে তো এই আমার হাতে রয়েছে—গদ্ধে কে বচ্চে, বে-অকুফ।'

তিনি তাঁর বাঁ হাতের অনামিকা প্রসারিত ক'রে ধরলেন।

মাথা আর তুলতে পারছে না ওরা কিছুতেই। তবু, বোধ করি মৃত্যুকে অবধারিত আর সামনে প্রত্যক্ষ ক'রেই মরীয়ার সাহস সঞ্চয় করে। বলে,

* Signet Ring—গালার ওপর বা মোমের ওপর মোহর করার জন্য।

'সে তো দেখছি হুজুর, কিন্তু অবিকল এই আংটি দেখেছি তার হাতেও। খুব ভাল ক'রে দেখেছি লণ্ঠনের আলো ধরে। যদি ঝুট বলে থাকি তো যেন জাহান্নমেও ঠাঁই না হয় আমাদের। তা ছাড়া আমরা জানি আলিজা, যে আপনার সামনে ঝুট বললে স্বয়ং পীরসাহেবও আমাদের বাঁচাতে পারবেন না। এ জান চোখের পলক ফেলার আগেই চলে যাবে তা জেনেই বলছি গরিব পরোবর, খোদা জামিন।'

অস্পষ্ট ঝাপ্‌সা একটা কী স্মৃতি যেন বিস্মৃতির জলে সাঁতার দিয়ে এদিকে আসছে। বহুদিন, বহুকালের ব্যবধান—দূর শ্বেতবিন্দুর মতোই অস্পষ্ট, তবু তার অস্তিত্ব একটা টের পাচ্ছেন ঠিকই।

কিন্তু সে তাঁর মনেই তখনও কোন আকার নেয় নি। তাই কঠিনতর কণ্ঠে আবারও প্রশ্ন করেন, 'আমার মোহর করার আংটি তোমরা চিনলে কি ক'রে।'

দেখা গেল এ প্রশ্নের জন্য তারা প্রস্তুতই ছিল, তেমনি ঘাড় গুঁজেই জবাব দিল, 'বহু খতে আর হুকুমনামায় জনাবালির মোহর দেখেছি আমরা। অনেক খৎ আমাদেরই নিয়ে যেতে হয়েছে অনেক সময়।'

'সেই আংটি এক আওরৎ দেখিয়ে গেল। আওরৎ!'

তখনও অবিশ্বাসের সুরে প্রশ্ন করেন শাহ্‌জাদা।

'কী রকম আওরৎ সে? একা এসেছিল, না সঙ্গে কেউ ছিল? ডুলিতে এসেছিল, না পায়ে হেঁটে? গাড়িতে এলে আমি আওয়াজ পেতুম।'

'সঙ্গে ছিল একজন কিন্তু তাকে কোন বাঁদী কি পাহারাদারনী বলে মনে হ'ল। যিনি এ খিলৌনা দিলেন তাঁর মুখে রেশমী বুরখা চাপা ছিল, মুখ দেখি নি, গলার আওয়াজে মন হ'ল নওজোয়ান লেড়কী কেউ হবে। বড় ঘরের মেয়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই।'

বিন্দুটা আর একটু কাছে এসেছে। তবু চিনতে পারছেন না।

এখন মনে হচ্ছে এই মোহরের আংটি একসঙ্গে দুটো করিয়েছিলেন যেন। একটা যেন কাকে দিয়েছিলেন—

কাকে দিলেন যেন। কী একটা ক্ষণিকের দুর্বুদ্ধিতে—

এইটুকু মনে পড়লেই দীর্ঘকালের কালো পর্দাটা সরে যায়—অতল আঁধার ব্যবধান যায় কমে।

অপেক্ষাকৃত বয়স্ক সান্ত্রী ইয়ার আলিই কথা বলছিল এতক্ষণ, শাহ্‌জাদা ভ্রূকুটিবদ্ধ দৃষ্টিতে নীরবে তার মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। দৃষ্টি বলা ভুল, চোখের তারাই ছিল ওর মুখের ওপর স্থির হয়ে—দৃষ্টি তখন কালো পর্দার আবরণ ভেদ করতে ব্যস্ত।

অনেকক্ষণ, এদের মনে হ'ল এক যুগ পরে বললেন, 'কী বলেছে সে আওরৎ? কী বলেছে ঠিক ঠিক ইয়াদ আছে?'

'ঠিক ইয়াদ আছে হুজুর। ঐ বাঁদীটা জিদ্দ করছিল তখনই আপনার সঙ্গে দেখা করার জন্যে, কিম্বা সেই অত রাত্রেই ঘুম ভাঙিয়ে এটা পেঁছে দিতে—আমরা রাজী হই নি, বলেছিলুম যে আমাদের ফর্মানের ওপর একটাই

শির আছে, ও আমরা পারব না। ঠিক ঠিক নিশানী দিলেও না হয় আমাদের ওপরওলা খাজা আব্বাসকে জানাতে পারি। তখন ঐ নওজোয়ান বুরখা-উলীই বলল যে তাতে দরকার নেই, কিন্তু এই জিনিসটা যেন অতি অবশ্য ভোরবেলা ফজরের আলো ফোটার সঙ্গে সঙ্গে আলিজাকে পেঁছে দিই আমরা।...বলে গেল খুব দরকারী জিনিস, খোদ আপনার সামনেই হাজির করা চাই। বলল, খুব জরুরী এ কাজ, দেরি হলে জনাবালির কাছে নাকি জবাবদিহি করতে হবে আমাদের। নোকরি তো যাবেই, জান যাওয়াও বিচিত্র নয় নাকি। আর বলল যে, এটা দিলেই আপনি বুঝতে পারবেন, কিছু বলতে হবে না।'

'তা খামকা তোমাদের মোহরের আংটি দেখাতে গেল কেন?'

'আমরা প্রথমে এ ভার নিতে চাই নি খুদাওয়ান্দ্। আগে ভেবেছিলুম মস্করা করছে আমাদের সঙ্গে। কিম্বা আসলে ওদের কোন বদ-মতলব আছে, হয়তো দারু খেয়ে নেশার ঝোঁকে আপনার সঙ্গে দিল্লগী করতে এসেছে। আমাদের জান দিয়ে এই দিল্লগীর খেশারৎ দিতে হবে—তাতেই ওদের ফুর্তি।...তাই, যখন একেবারে বেঁকে দাঁড়ালুম, তখনই ঐ আংটিটা দেখাল। বলল, ইচ্ছে করলে তারা এখনই ভেতরে ঢুকতে পারে। তবে তার দরকার নেই। এই জিনিসটা পেঁছে দিলেই হবে। আংটির কথা বললেই খুদাওয়ান্দ্ চিনতে পারবেন তাদের, এ জিনিসটা দিয়ে যাওয়ার অর্থও বুঝতে পারবেন।'

মনে পড়েছে, এতক্ষণে মনে পড়েছে তাঁর।

আংটি তিনি দুটোই করিয়েছিলেন এক সঙ্গে। আগে যেটা তাঁর হাতে থাকত সেটা তিনিই স্বেচ্ছায় খুলে দিয়েছিলেন একজনকে।

যাকে দিয়েছিলেন, সে-ই এসেছিল কাল রাতে তাতে কোন সন্দেহ নেই আর।

কিন্তু এতকাল পরে, এত রাত্রে সে কী বার্তা জানাতে এল এমনভাবে, জান হাতে নিয়ে?

এ আসার বিপদ শাহ্‌জাদা জানেন। সে যেখানে আছে, সেখান থেকে এভাবে রাত্রে বেরিয়ে আসা—। উঁহু ভাল করে নি, মোটেই ভাল করে নি।...

আর কেনই বা এ ঝুঁকি নিতে গেল?

এই আঁধেরা রাতে কোন্ প্রাণের দায়ে এমনভাবে এল সে?

কেন? কেন?...

এই আংটিটা যখন চেয়ে নেয় তখন অবশ্য এই কথাই বলেছিল যে, 'কোথায় থাকব কোথায় গিয়ে পড়ব তা তো জানি না। তবে যদি কোনদিন কাছাকাছি এসে পড়ি আর আপনাকে খুব দেখতে ইচ্ছা হয় একবার—তাহ'লে যাতে বিনা তকলিফে আপনার কাছে পেঁছতে পারি, এমন কোন নিশানী একটা দিন আমাকে। এমন কোন জিনিস যা আপনি ব্যবহার করেছেন, যা দেখলে আপনার কথা আমার মনে পড়বে, যা দেখে ভবিষ্যতে

আপনারও মনে পড়বে আমার কথা।'

এখনও কি সে সত্যিই মনে ক'রে রেখেছে তাঁর কথা?

এতকাল পরেও?

আশ্চর্য! শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের এইটেই বড় অহঙ্কার যে তিনি কাউকে ভোলেন না, কিছুই ভোলেন না। তকব্বরি মানেই গুণাহ্—তাই খোদা সেটা চূর্ণ ক'রে বুঝিয়ে দিলেন। তিনি তো ওর কথা ভুলেই বসে-ছিলেন এতকাল। তা নইলে এতক্ষণ সময় লাগত না মনে করতে।

না, ভোলা সত্যিই উচিত হয় নি তাকে, সেই একরাত্রের ছোট্ট পিয়ারীটিকে। সেদিন অনেক জুলুম করেছিলেন তার ওপর, অনেক অন্যায় করেছিলেন কিন্তু তার বদলে সে দিয়েছিল তাঁকে অন্তরের প্রীতি আর শ্রদ্ধাই। তাঁর কাছেই থাকতে চেয়েছিল সে, তাঁরই সেবার অধিকার চেয়েছিল। তা তিনি দেন নি, হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। তবু সে রাগ করে নি, ঘৃণা করে নি তাঁকে।

তা যে করে নি—সেদিন তার চোখ দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন তীক্ষ্নধী শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব।

কিন্তু এটার অর্থ কি? এই পদার্থটা পাঠাবার?...

জিনিসটা হাতে ক'রে তুলে দেখেছিলেন সকালের আলোয়। আগে ভেবেছিলেন ওর মধ্যেই এমন কোন সঙ্কেত আছে কিম্বা কোন চোরা খাঁজে এমন কোন খৎ—যা দেখেই বুঝতে পারবেন তিনি। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরে তন্ন তন্ন ক'রে দেখেও তেমন কিছু খুঁজে পেলেন না। কোথাও কোন লিপি কি চিহ্ন পর্যন্ত নেই।

আর থাকবেই বা কোথায়? সামান্য জিনিস একটা। এ জিনিসের কথা কোন শাহ্‌জাদা বা কোন নবাব আমীরের জানার কথা নয়। অপর কোন শাহ্‌জাদা চিনতেই পারতেন না। আওরঙ্গজেব সব প্রয়োজনীয় জিনিসের খবর রাখেন বলেই বুঝতে পারলেন এটা কী। ফৌজের সঙ্গে যখন রসদ যায়—তখন তিনিই একমাত্র সিপাহ্‌সালার যিনি মনে ক'রে এই জিনিস কতকগুলো কিনে নিয়ে যান।

চুহাকল একটা। ইঁদুর ধরার খাঁচা।

তবে ঠিক বাজারের চুহাকল নয়। মনে হয় ফরমাশ দিয়ে তৈরী করানো এটা। কাঠের নয়, লোহার তৈরী। তাও তার দিয়ে নয়—বাক্সর মতো লোহার পাত দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। বিশেষ ক'রে দরজাটা—যেমন ভারী তেমনি মজবুত। এমনভাবেই তৈরী যে ইঁদুর দরজার মধ্যে পা দেওয়া মাত্র এটা পড়ে যাবে আর তার পর ইঁদুর যত বলিষ্ঠ এবং বৃহদাকারই হোক তার সাধ্য থাকবে না এ কপাট ঠেলে খোলার! শুধু তাই নয়—বাইরের এক বিন্দু হাওয়া ঢোকবারও কোন পথ নেই, নেই ভেতর থেকে কোন শব্দ আসবার সামান্য একটু ফাঁক। যে ইঁদুর এতে পড়বে—দম বন্ধ হয়েই মরে যাবে।

বলতে গেলে সারা সকালটাই কোন কাজকর্ম করতে পারেন নি

শাহ্‌জাদা। কেবলই বসে বসে ভেবেছেন আর জিনিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছেন। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও কোন মাথা-মুণ্ডু খুঁজে পান নি। অথচ তিনি জানেন, যে দিয়ে গেছে সে এতকাল পরে নিছক রসিকতা করতে আসে নি। নিশ্চয়ই এর কোন নিগূঢ় অর্থ আছে, তিনিই এখনও ধরতে পারছেন না। তাঁর তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বহু দূরে পর্যন্ত যায় তা তিনিও জানেন—এটা কোন দুর্বিনয় নয়, নিছকই তথ্য একটা—কিন্তু আজ তাঁর সেই বুদ্ধিও হার মেনেছিল, নেহাৎই বাধ্য হয়ে সরিয়ে রেখেছিলেন ইঁদুর-কলটা।

তারপর আর বেশী সময়ও পান নি ভাববার।

খুব জরুরী চিঠি ছিল খানকতক, যা তাঁর নিজের লেখা দরকার। কতকগুলো দলিল পরোয়ানা সই করার ছিল—আদ্যোপান্ত না পড়ে তুচ্ছ কোন কাগজেও সই করবেন না শাহ্‌জাদা—তারপর ছিল দৈনিক হিসাব-গুলোয় চোখ বোলানো। মুনীম প্রতিদিনের হিসেব তৈরী ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে, সেগুলো নিজে দেখে দেন। এই প্রাত্যহিক কাজ সারতে সারতেই গোসলের সময় হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রহর পার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, কিল্লার ঘড়িতে ন'টা বাজলেই শাহ্‌জাদাদের নিজের নিজের বজরায় চাপতে হবে, আলমপনার এই খুশমর্জি কাল জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁদের।

তবু কথাটা কোন সময়েই একেবারে ভুলে থাকেন নি।

নামাজের সময় অন্য সমস্ত চিন্তা জোর ক'রে ঝেড়ে ফেলে দেন মন থেকে—আজ তাও পারেন নি। স্নানের সময়, নামাজের সময়, নাস্তা করতে করতে মনের অবচেতনে সর্বদাই কথাটা তোলপাড় করেছে মনের মধ্যে। বজরায় উঠে নিরিবিলিতে ভাল ক'রে চিন্তা করবেন ভেবে রেখেছিলেন, তা হয় নি। বাদশা ডেকে নিজের নৌকোয় তুলে নিয়েছেন। সেখানে শুধু কানই নয়—সমস্ত ইন্দ্রিয় সজাগ সতর্ক রাখতে হয়েছে। বাদশার যখন খোশগল্পের মর্জি হয় তখন শ্রোতাদের অন্যমনস্ক থাকা বিষম অপরাধ। তা ছাড়াও, অন্য শাহ্‌জাদারা কে কি বলছেন, কার কথার কী গূঢ়ার্থ, সে সম্বন্ধেও সজাগ সতর্ক থাকা প্রয়োজন। কে কোথায় কি খোঁচা দিয়ে গেল, কোথা থেকে কোন খবরের টুকরো গেল পড়ে, কার অসতর্কতার অবসরে—এগুলো জানা প্রয়োজন। অন্তত তাঁর প্রয়োজন। আর কিছু না হোক তিনি যদি বিন্দুমাত্র অন্যমনস্ক হন বা বাদশার কথার উত্তর দিতে একটু-খানিও দেরি হয়—অন্য শাহ্‌জাদারা তৎক্ষণাৎ সেদিকে বাদশার মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে চুকলি খাবার সুযোগ নেবেন।

ভাবনাটা ছিলই, কিন্তু সেটা বিচার বিশ্লেষণ করার সুযোগ বা অবসর পান নি। সব সময়েই বাদশার সামনে, ভাইদের সামনে থাকতে হয়েছে। বিশেষত বড়ে শাহ্‌জাদার দৃষ্টি ও শ্রুতি যে সম্পূর্ণ তাঁর দিকেই নিবদ্ধ তা তিনি জানেন। কাফেরদের পুরাণে নাকি আছে খোদাতায়ালাকে যে বৈরীভাবে ভজনা করে সে নাকি ভক্তদের থেকে আগে তাঁর করুণা লাভ করে। বড়ে শাহ্‌জাদাও যেন তাঁকে সেই রকম বৈরীভাবে ভজনা করেন।

অনুক্ষণের ধ্যানজ্ঞান তাঁর এই তৃতীয় সহোদরটি।...

না, কিছুই ভেবে ঠিক করতে পারেন নি তিনি, ওবাড়িতে যাবার পরেও বহুক্ষণ পর্যন্ত।

একেবারে বিদ্যুৎ চমকের মতো কথাটা তাঁর মাথাতে গেছে, বড়ে শাহ্‌জাদা তহ্‌খানায় বিশ্রাম করতে যাওয়ার প্রস্তাব করতে। নতুন ধরনের তহ্‌খানা বানিয়েছেন তিনি, ওঁরা শান্তিতে নির্জনে বিশ্রাম করবেন বলে। ...মেঘ-ঘন অন্ধকার আকাশে যেমন এক এক সময় এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত বিদ্যুৎ খেলে গিয়ে সমস্ত নিচের দুনিয়াটা অকস্মাৎ স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে, তেমনি এতক্ষণের আকুল সংশয়ান্ধকারও তাঁর সেই একটি বিজলী-বিকাশে মুহূর্তের জন্য কেটে গেল, বড়ে শাহ্‌জাদার মনের প্রত্যন্ত প্রদেশ পর্যন্ত দেখতে পেলেন তিনি। সেই সঙ্গে খুঁজে পেলেন প্রভাতে ঐ চুহাকল উপঢৌকনের অর্থ!

তখন আর মুহূর্তকালও অবসর ছিল না দ্বিধা বা ইতস্তত করার। সঙ্গে সঙ্গেই ইঙ্গিত করেছেন দেলওয়ারকে প্রাসাদে ফেরার জন্যে। এ ইঙ্গিতও করেছেন যে এখানে তাঁর কোন বিপদ ঘটাও বিচিত্র নয়। বেশী সময় লাগে নি অবশ্য ব্যাপারটা ওকে বুঝিয়ে দিতে, চোখের পাতা নড়া দেখে বুঝতে পারে ছেলেটা—তাঁর অভিপ্রায় বা আদেশ।

তবু তখনও যেটুকু সংশয় ছিল, ঐ লোহার ভারী দরজাটা দেখে সেটুকুও আর রইল না, যে দরজার কোন চিহ্ন বাইরে থেকে নজরে পড়ে না, যা খোলা বা বন্ধ হওয়ার সময় বিন্দুমাত্র শব্দ করে না, যার ভেতর থেকে এক বিন্দু বাতাস বা প্রাণপণ চিৎকারও বাইরে আসতে পারে না।

ইচ্ছে ক'রেই সকলের পিছনে ছিলেন তিনি। মিলিয়ে নেবার, সংশয়ের কতটা যথার্থ—যাচাই করবার জন্যে। কিন্তু দরজাটা দেখার পর আর চিন্তা করার অবসর মেলে নি, বিচার-বিশ্লেষণেরও না। কতটা ঝুঁকি নিচ্ছেন—তার ফলাফল ওজন ক'রে দেখার মতো সময় ছিল না আর। পাকা জুয়াড়ির মতো তাই চোখ বুজেই বাজী ধরেছেন। এসপার কি ওসপার। সর্বনাশের খেলা তাঁর—কিম্বা সর্বরক্ষার।

কী করলেন, কী ক'রে এলেন—বেতরবিয়ৎ বে-অকুফের মতো নিজের তকদির নিজেই নষ্ট ক'রে এলেন কিনা—সেইটেই এখনও বুঝতে পারছেন না। সত্যিই কি বড়ে শাহ্‌জাদা এতবড় শয়তানি এঁটেছিলেন মনে মনে, নাকি তিনিই নিজের অন্তরের বিষে এতটা বে-ইনসাফি, এতটা অবিচার ক'রে বসলেন।

কে বলবে তাঁকে, কেমন ক'রে নিঃসংশয় হবেন তিনি?

অপারগ নাতোয়ান তিনি নন, সর্বস্ব গেলেও যদি ভগবানের দয়া হয়—বুদ্ধি এবং শক্তি যদি থাকে, তো একদিন আবার সব-কিছুই বাহুবলে অর্জন করতে পারবেন—তাও জানেন, কিন্তু সে এখন বিপুল সময়সাপেক্ষ। সাতসমুদ্রের জল খেতে হবে তাঁকে জীবনের নৌকো সাফল্যের ঘাটে ভেড়াবার আগে।

ঈশ্বরে যতই বিশ্বাস থাক, ইনশা আল্লাহ্ বা ঈশ্বরের মর্জি বলে মনে ক'রেও নিশ্চিন্ত হতে পারছেন না তাই। অনেক বড় বাজী ধরেছেন তিনি, নিজের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা ভবিষ্যৎ—এক কথায় এই জিন্দিগীটাই!

নিজে নিশ্চিন্ত হ'তে পারলে, আর যাই হোক অনেকখানি সান্ত্বনা লাভ করতে পারতেন তিনি। সেইটেই যে এখনও হ'তে পারছেন না।

॥ ৪ ॥

আবারও যেন কেমন হাঁফ ধরার মতো মনে হ'ল তাঁর। আরও একবার ছটফট ক'রে উঠলেন। কিন্তু এবার—আরও জোরে বাতাস করার কথা বলতে গিয়েও থেমে গেলেন। ছেলেটার দিকে চেয়ে নিজের এই সামান্য অসুবিধার কথা বলতে পারলেন না। দেখলেন শক্তি ও সামর্থ্যের প্রায় শেষ সীমায় এসে পড়েছে সে। সমস্ত মুখ ঘামে ভিজে যেন চুপ্‌সে গেছে, কাগজের মতো সাদা দেখাচ্ছে। বাতাস এখনও করে যাচ্ছে কিন্তু হাত দুটো থর থর ক'রে কাঁপছে তার, বোধ হয় পাখাটা এখনই পড়ে যাবে, সেই সঙ্গে সেও।

নিমেষে অনুতপ্ত হয়ে উঠলেন শাহ্‌জাদা।

ইস্, বড়ই অন্যায় হয়ে গেছে। আরও ঢের আগে খেয়াল করা উচিত ছিল।...তিনি এক ঝট্‌কায় দেলওয়ারের হাত থেকে পাখাটা নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, তারপর তার হাত ধরে টেনে কাছে নিয়ে এলেন। ফরাসের ওপর, একেবারে কাছেই আনতে চান তিনি। কিন্তু দেলওয়ার যেন এতখানি ধৃষ্টতার আভাসেই শিউরে উঠল। কথা কওয়ার শক্তি ছিল না নইলে বলে উঠত হয়ত, 'না না জনাব-ই-আলী, ওতে আমার গুণাহ্ হবে।'

আওরঙ্গজেব ওর মনের ভাব বুঝলেন। সস্নেহ কণ্ঠে বললেন, 'এইখানে বসে আমার পা দুটো টিপে দে বে-অকুফ, আমি কি তোকে আরাম করার জন্যে ওপরে বসতে বলছি!'

পা টিপে দেবার জন্যে ফরাসের ওপর মনিবের সঙ্গে এক আসনে কেন বসতে হবে সেটা তখনও মাথাতে গেল না দেলওয়ারের, এই তো নিচে হাঁটু গেড়ে বসে এখান থেকেই বেশ দেওয়া যায়। এবারেও সামান্য একটুখানি ইতস্তত করাতেই বুঝতে পারলেন শাহ্‌জাদা—একেবারে ওর কান ধরে একটু ধমকের সুরেই বললেন, 'আমি হুকুম দিয়েছি না? হুকুম যা-ই হোক, তৎক্ষণাৎ তা তামিল না করার মানেই বে-আদবি, গুস্তাকী। একদিন তো পরিষ্কার বলে দিয়েছি কথাটা—বার বার একই কথা বলা আমার পছন্দ নয়।'

অগত্যা অতি সন্তর্পণে সেই ফরাসের ওপরই বসল দেলওয়ার। পা টিপে দেওয়ার কথাটাই সত্যি বলে ভেবেছে সে, তাই তাড়াতাড়ি ওঁর পা দুটো নিজের কোলে তুলে নিতে যাচ্ছিল, শাহ্‌জাদা তাঁর বলিষ্ঠ হাতের

আকর্ষণে একেবারে কোলের কাছে টেনে নিলেন, আর এক হাতে ওর সেই আউতে-পড়া কচি মুখখানা নিজের দিকে ফিরিয়ে ধরে প্রশ্ন করলেন, 'তুই আমাকে খুব ভালবাসিস, না রে?'

লজ্জায় সুখে, অকল্পিত সৌভাগ্যে ওর স্বেদধৌত বিবর্ণ মুখে যেন এক মুঠো আবীর মাখিয়ে দিল কে। চোখ নত করতে পারল না বলেই বুজে এল, কোনমতে ঘাড় নেড়ে জানাল, হ্যাঁ, সে ওঁকে ভালবাসে।

'খুব—? খুব ভালবাসিস? ভালবাসিস না ভয় করিস—ঠিক ক'রে বল্ তো!'

এইবার অতি কষ্টে বলল দেলওয়ার, 'ভয় করব কেন মালিক, ভয় পাওয়ার মতো তো কিছু দেখি নি আপনার মধ্যে। যত মানুষ দেখেছি আপনি সকলের চেয়ে বড়—আমার কাছে আপনার চেয়ে বড় কেউ নেই।'

'আমাকেও ভালবাসে কেউ কেউ! অন্তত দুজন তো বাসে দেখছি।... বিনা স্বার্থে, শুধু আমার জন্যেই আমাকে কেউ ভালবাসতে পারে তা ভাবিনি কখনও। আশ্চর্য!'

অন্যমনস্কভাবে, কতকটা স্বগতোক্তির মতো ক'রেই কথাগুলো বললেন শাহ্‌জাদা, আর বলতে বলতেই কেমন যেন গলা জড়িয়ে এল শেষের দিকে, স্তব্ধ হয়ে কী এক গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে গেলেন।

হ্যাঁ আরও একজন ভালবাসে তাঁকে—বিনা স্বার্থেই ভালবাসে। সেটা আজ নিঃসংশয়ে জেনেছেন।

তার জানা বা বোঝার ভুল হ'তে পারে—কিন্তু তাঁর জন্যে তার এই আকুলতাটা মিথ্যা নয়।

অথচ তিনি জানেন, আজ সে জন্যে তাঁর লজ্জা ও অনুতাপের শেষ নেই, এতখানি ভালবাসা পাবার মতো কোন যোগ্যতাই তাঁর ছিল না। কতটুকুরই বা পরিচয় তাঁর সঙ্গে, কতটুকুর দেখা। তাও, সেই প্রথম এবং বোধকরি শেষ পরিচয় যা সে তার পেয়েছে, যে ব্যবহার তিনি করেছেন তার সঙ্গে—তাতে ঘৃণা করাই উচিত ছিল তাঁকে। একটা ভয়ঙ্কর দুঃস্মৃতিই জেগে থাকার কথা তাঁর সে আচরণের। তবু সে তাঁকে ভালবেসেছে, এতকাল তাঁর কথা মনে ক'রে রেখেছে, তাঁর স্মারক সযত্নে বহন করেছে এই দীর্ঘদিন—এর চেয়ে বিস্ময়কর আর কী হ'তে পারে!

এখন সবটাই মনে পড়ছে তাঁর—সেদিনের সমস্ত ঘটনাগুলো।

ছবির মতো ফুটে উঠেছে মনে।

বাদাখ্‌শানে যাওয়ার পথে কাশ্মীরের প্রান্তে এসে কয়েকদিন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। বিশ্রাম নেওয়ার কথা নয়, সে ইচ্ছাও ছিল না, বাধ্য হয়েই থামতে হয়েছিল তাঁকে। পিছনের সরবরাহ অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। সামনের পাহাড়ী পথে এ অবস্থাটা আদৌ বাঞ্ছনীয় নয়। যখন তখন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে, পাহাড়ে ধ্বস নেমে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাওয়া তো এখানে অতি সাধারণ ঘটনা। সে ক্ষেত্রে রসদ যদি

সঙ্গে না থাকে তো এতগুলো লোক শুকিয়ে মরবে। যে পথে যেতে হবে এখন থেকে, সে পথে সামান্য কিছু কিছু ফল আর দুচারটে দুম্বা ছাড়া কিছুই মিলবে না। তার ওপর আছে এখানকার পাঠান উপজাতিদের আকস্মিক আক্রমণের মোকাবিলা করা। ওরা এই রকম সুযোগই খোঁজে, সাময়িক বিপদ কি অপ্রস্তুত অবস্থার অবসরে নেকড়ের পালের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে লুঠপাট ক'রে নিয়ে যায়। সুতরাং রসদ ও গোলাবারুদ সঙ্গে না নিয়ে আর এগনো ঠিক নয়।

এরকম বিলম্ব তাঁর কখনও হয় না। আগ্রার অব্যবস্থাতেই এসব হয়েছে। সরকারী গড়িমসির ফল এটা। কাজের ভার দিয়ে রওনা করেছেন তাঁরা—বড় বড় উপদেশের মালা পরিয়ে—কিন্তু নিজেদের দায়িত্বটুকু পালন করেন নি। কে জানে এই অযথা বিলম্বের মধ্যে তাঁর বড় ভাইয়ের হাত ছিল কিনা। শাহ্জাদার বিশ্বাস তা ছিল।

বিরক্ত হয়েছিলেন আওরঙ্গজেব খুবই—তিনি কাজের লোক, নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা তাঁর পক্ষে শাস্তির মতো—কিন্তু কিছু করবারও ছিল না তাঁর, নিরুপায় রোষে নিজেরই অধরোষ্ঠ নিজে কামড়ে ক্ষতবিক্ষত করা ছাড়া। শেষে একরকম মরীয়া হয়েই ঠিক করেছিলেন, কয়েক দিনের জন্যে কাশ্মীর ঘুরে আসবেন। অল্প কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে চলে গিয়েছিলেন তিনি, এখানকার ছাউনী অক্ষত রেখে, অনেকে টেরও পায় নি, এমন চুপি চুপি চলে গিয়েছিলেন তিনি।

যেতে যেতে পথেই খবর পেয়েছিলেন—ইরাণ থেকে একজন বড় কারবারী একদল ভাল ক্রীতদাসী এনেছে, তারা লাহোর হয়ে আগ্রার বাজারে যাবে। সে নাকি শাহী হারেমেরই উপযুক্ত, সন্ধান পেলে শাহ্জাদার দলই চড়া দামে কিনে নিয়ে যাবেন, ওমরাদের কাছ পর্যন্ত পেঁছিবে না। সোজাই চলে যেত, কিন্তু এতটা দূর পথ আসার ফলে গরমে আর পথশ্রমে অনেকেরই শরীর খারাপ হয়ে গেছে বলে এখানে ঠাণ্ডায় বিশ্রাম করিয়ে নিচ্ছে। এদের বেশির ভাগই নাকি এসেছে ঠাণ্ডা মুলুক থেকে—তাই গরমে কারও কারও ঘামাচি বেরিয়ে চামড়া বিশ্রী হয়ে গেছে, সে জন্যেও কদিন এইরকম জায়গায় থাকা দরকার। দেহটাই যেখানে প্রধান পণ্য, সেখানে সেটা যথেষ্ট লোভনীয় অবস্থায় না থাকলে দাম উঠবে না। এখানে এতদিন রেখে বসিয়ে খাওয়াতে অতিরিক্ত কিছু খরচ হ'লেও সেটা নেহাৎ অকারণ নয়, শরীরটা আবার তাজা হয়ে উঠলে, চামড়ার গুলাবী রং ফিরে এলে—এসব খরচা সুদসুদ্ধ পুষিয়ে যাবে।

স্ত্রীলোক সম্বন্ধে বাবরশাহী বংশের অপর পুরুষদের মতো খুব একটা লোভ নেই শাহ্জাদা আওরঙ্গজেবের, কিন্তু একেবারে কিছু ছিল না বললেও ভুল হবে। সেটা অস্বাভাবিকও নয়। তখন একেবারেই কাঁচা বয়স, ঐ বয়সের স্বাস্থ্যবান কর্মঠ তরুণের রক্তে চাঞ্চল্য কিছু তো থাকবেই। তবে প্রথমটা লোভের থেকে কৌতূহলটাই প্রবল হয়েছিল। বিশেষ যখন শুনলেন যে, এসব মেয়ের কেউই সাধারণ বাঁদী নয়, বহু দূর থেকে,

ইরাণের উত্তরে ক্রেস্তান মুলুক থেকে সাদা চামড়ার মেয়ে ধরে আনা হয়েছে, অনেক কষ্ট স্বীকার ক'রে, অনেক অর্থ ব্যয় ক'রে—রুশের বাদশার অধীন সে সব দেশ, সেখানের আইনও খুব কড়া, সুতরাং প্রাণ হাতে ক'রেই এ কাজ করতে হয়েছে মহাজনকে—তখন সে কৌতূহল প্রায় অসম্বরণীয় হয়ে উঠেছিল। আর্মানী বাঁদী দু-চারটে এর আগে দেখেছেন, তাঁর হারেমেও আছে দু-একটা—এরা নাকি আরও উত্তরের, এদের গায়ের রং দুধের মতো। সুতরাং দেখার মতো নিশ্চয়ই।

বাঁদী তিনি কিনবেন না—সে সামর্থ্যও নেই, সে অভিরুচিও নেই। তাছাড়া এখন যাচ্ছেন দুর্ধর্ষ প্রজাদের শাসন করতে—লড়াই ঝগড়ার মধ্যে, সেখানে স্ত্রীলোক নিয়ে যাওয়া যায় না। তবু, চোখে দেখতে দোষ কি?

ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে, শহরের উপকণ্ঠে নদীর ধারে কোন এক হিন্দু বানিয়ার বাগানবাড়িতে যেখানে ওরা আড্ডা গেড়েছে—সেই দিকে এগিয়ে গেলেন শাহ্‌জাদা আর তাঁর সঙ্গীরা।

সেটা অপরাহ্ণ বেলা, আজও সেই ক্ষণটির কথা স্পষ্ট মনে আছে তাঁর। সূর্য অস্ত যায় নি তখনও, দূর পাহাড়ের দিকে হেলে পড়েছে মাত্র। মাথার ওপরে একটা প্রকাণ্ড সাদা মেঘে সেই রাঙা রোদ পড়ে অদ্ভুত একটা সিঁদুরে লাল আলোর সৃষ্টি হয়েছে। সেই উজ্জ্বল বর্ণাভায় পাশের নদী, দূরের পাহাড়, বাগিচার গাছপালা, ফুল-ফল সব যেন নতুন একটা রূপ ধারণ করেছে। এমন কখনও দেখেন নি শাহ্‌জাদা। এ আলো অবশ্য দেখেছেন এর আগে—পুরবীয়ারা বলে 'কনে দেখানো আলো'—কিন্তু সে আলোতে যে প্রকৃতির সুদ্ধ চেহারা পাল্‌টে যায় তা এর আগে কখনও এমনভাবে অনুভব করেন নি।

প্রায় কুড়ি পঁচিশটি মেয়ে এনেছে মহাজন আতাউল্লা খাঁ। পুরনো ঘাগী ব্যবসাদার, এই দিকেরই লোক, ব্যবসার খাতিরে বহু দূর দূর দেশে ঘোরে—আরব, ইরাণ, রুম, ইস্তাম্বুল—কোন দেশ বাকী নেই তার। এবার আরও দূরে রুশী মুলুকে গিয়েছিল। মাল চেনে সে, চুনে চুনেই এনেছে। এই একটা কিস্তিতেই খরচ-খরচা বাদ লাখ পাঁচেকের টাকা নীট মুনাফা করবে—এই রকম তার আশা। তার জন্যে চেষ্টারও ত্রুটি রাখছে না। এখানে এসে বিশ্রামই দেওয়াচ্ছে না শুধু, খাওয়া-শোওয়া সব ব্যাপারেই নজর রেখেছে। কতটা খাবার কাকে দেওয়া হবে—তার মাপ আছে। কেউ ঘি খাবে, কেউ খাবে না। কাউকে মাংস দেওয়া হবে, কাউকে শুধু সব্‌জি। বাবুর্চিখানায় নিখুঁত নির্দেশ দেওয়া আছে এসব—হুকুমও খুব কড়া, এর এতটুকু এদিক ওদিক হ'লে শাস্তি পেতে হবে তাদের। এর সঙ্গে আছে নিয়মিত ব্যায়াম, নাচ-গান শেখানোর ওস্তাদ সঙ্গেই আছে। এমনি খোলা ব্যায়ামেরও ব্যবস্থা আছে। লড়াইয়ের ঘোড়া যারা বেচতে আসে, তারাও যেমন ঘোড়াকে মেপে খাওয়ায়—চর্বি হয়ে গেলে চলবে না, আবার বেশি রোগা হ'লেও নিতে চাইবে না—দলাই মলাই দৌড় করায় নিয়মিত—এখানেও সেই নিয়মেই মেয়েদের যথেষ্ট লোভনীয় আর 'কিম্‌তী'

অর্থাৎ মূল্যবান ক'রে তুলছে আতাউল্লা।

শাহ্‌জাদা যখন পেঁছিলেন তখন এমনি একটা ব্যায়াম করানো হচ্ছে ওদের। নদীর ধারে খোলা জমিনে ঘাসের ওপর অল্প অল্প দৌড়চ্ছে ওরা, কতকটা ঘোড়ার দুল্‌কি চালের মতো; বেশি দৌড়লে রোগা আর পাকাটে চেহারা হয়ে যাবে, এতে সেটা হবে না; ভুঁড়ি কমবে কিন্তু নিম্নাঙ্গ ভারী থাকবে।

সবাই সুশ্রী, সবাই অল্পবয়সী—ঠিক যাকে কিশোরী মেয়ে বলে তাই। তার ওপর খাটো পাজামা আর আঁট কুর্তা পরানো হয়েছে, তার ফলে দেহের সুঠাম গঠন চোখে পড়তে কোন অসুবিধা হয় না। নয়নাভিরাম দৃশ্য—মনে মনে স্বীকার করলেন শাহ্‌জাদা।...

আতাউল্লাকে শাহ্‌জাদা চেনেন, এর আগে দেখেছেন—সেও চেনে ওঁকে। দূর থেকে আসতে দেখেই ছুটে গিয়ে রেকাব স্পর্শ ক'রে আনুগত্য জানিয়ে লাগাম ধরে ঘোড়াকে দাঁড় করাল। তার দিকে অবশ্য বিশেষ লক্ষ্য ছিল না শাহ্‌জাদার, তিনি মুগ্ধ দৃষ্টিতে সামনের ঐ অপরূপ দৃশ্যটাই উপভোগ করছিলেন।

সবাই সুন্দর, তার মধ্যে নির্বাচন করা শক্ত, তবু দেখতে দেখতে হঠাৎ একটি মেয়ের মুখে এসেই চোখ দুটো যেন আটকে গেল তাঁর।

ঠিক কি দেখছিলেন, কী দেখে এতটা মোহগ্রস্ত হয়েছিলেন তা হয়ত ভাল বোঝাতে পারবেন না শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব কিন্তু আজও, সেই স্মৃতি মনে জাগামাত্র দেহের শিরায় শিরায় তেমনি আগুন জ্বলে উঠল, ধমনীর রক্তস্রোতে তেমনি উন্মাদনা অনুভব করলেন তিনি—সেদিন যেমন করেছিলেন। হ্যাঁ—উন্মত্তই হয়ে উঠেছিলেন সেদিন। তাঁর মধ্যে যে এতখানি কামনা আছে, এত প্রচণ্ড ক্ষুধা—তা ওকে দেখার আগে কখনও বুঝতে পারেন নি। এখনও তাঁর লোমকূপগুলো হর্ষকণ্টকিত হয়ে উঠল সেই দৃশ্য মনে পড়ে।

তেরো কি চৌদ্দ বছর বয়স হবে হয়ত, নিতান্তই বালিকা। অর্ধ-বিকশিত তো নয়ই, বিকাশোন্মুখও বলা চলে না। ফোটার পূর্বেকার কোরকের মতোই কাঁচ সে। তবু কী যে ছিল তার দুগ্ধশুভ্র বর্ণে, তার নীলাভ চোখে সুঠাম কপোলে আর সুডৌল ললাটে, ধনুকের মতো অপরূপ বঙ্কিম ওষ্ঠাধরে—তার দিকে চেয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত চোখের পলক পড়ল না শাহ্‌জাদার, মনে হ'ল পাথর হয়ে গেছেন তিনি, নিঃশ্বাসটাও বোধহয় ফেলতে পারছেন না, পাছে দেখার ব্যাঘাত ঘটে।

এমন দৃশ্য এর আগে কখনও চোখে পড়ে নি তাঁর। এতক্ষণের পরিশ্রমে ওর শ্বেতবর্ণে একটা লালিমার আভাস লেগেছে, স্বর্ণাভ অলকের কোণে কোণে ফুটে উঠেছে দুটি একটি স্বেদবিন্দু। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বুক ফুলে ফুলে উঠছে, শুধু নাকে নিঃশ্বাস নিয়ে পর্যাপ্ত বাতাস পাচ্ছে না, তাই ঠোঁট দুটিও সামান্য ফাঁক হয়ে আছে, তার মধ্য দিয়ে মুক্তোর মতো দাঁতগুলির আভাস পাওয়া যাচ্ছে—সবটা জড়িয়ে যেন কোন শিল্পীর

ধ্যানমূর্তি বলে মনে হ'ল শাহ্জাদার। কল্পনার মেয়ে এ, রক্তমাংসের নয়। হাত দিয়ে ধরতে গেলে বুঝি স্বপ্নের মতোই মিলিয়ে যাবে, ছোঁয়া যাবে না।...

ওঁর সেই মুগ্ধ দৃষ্টি তার মুখেই নিবদ্ধ হয়েছে বুঝে আরও লাল হয়ে উঠল মেয়েটি। তার ত্বকের শুভ্র উজ্জ্বল বর্ণে ক্ষণে ক্ষণে যে রক্তোচ্ছ্বাস খেলে যাচ্ছে তা দূর থেকেই চোখে পড়ল শাহ্জাদার। দেখতে দেখতে সুনিবিড় লজ্জায় তার চোখ দুটি নত হয়ে এল, মাথা নিচু ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে।

বাকী মেয়েদের চোখে ওঁর এই পক্ষপাত ধরা পড়তে দেরি হয় নি, কৌতুকে ও ব্যঙ্গে তাদের ওষ্ঠ শাণিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু সে সব কোন দিকেই খেয়াল ছিল না শাহ্জাদার। ওঁর তৈমুরশাহী রক্তে আগুন জ্বলছে তখন, কামনায় আর আবেগে অধীর হয়ে উঠেছেন। যতক্ষণ মেয়েটির চোখে চোখ লেগে ছিল ততক্ষণ এতটা বুঝতে পারেন নি, এখন সে মাথা নামাতেই যেন চমক ভাঙল ওঁর। সঙ্গে সঙ্গে জ্বালাটা আরও বেশী ক'রে অনুভব করলেন। আর ধৈর্য মানল না। ইশারায় আতাউল্লাকে একটু দূরে ডেকে নিয়ে গিয়ে বিনা ভূমিকাতেই বললেন, 'আতাউল্লা, ঐ মেয়েটিকে আজ রাত্রে আমার চাই, তার জন্যে কত নেবে বলো।'

বেশী বলার ক্ষমতাও ছিল না তাঁর, আবেগের অস্থিরতায় গলা কাঁপছে, আওরঙ্গজেবের পক্ষে যেটা একেবারেই অস্বাভাবিক।

এ চাহনি, এ গলা আতাউল্লা চেনে, পুরুষের এ অবস্থা দেখতে অভ্যস্ত সে। তার মুখ শুকিয়ে উঠল; তবুও বলল, 'তওবা, তওবা! কী বলছেন, জনাবেহকীম, এ সে সব জিনিস নয়। কসবী নয় এরা। এ একেবারে টাটকা ফুল, বাদশার সেবায় লাগার মতো।'

'ওসব কথা আমাকে শুনিয়ে কোন লাভ হবে না।' অসহিষ্ণু শাহ্জাদার কণ্ঠ কঠিন হয়ে ওঠে, 'আমার চাই-ই, আর সে কথাটা যত শীগ্গির তোমার মাথায় ঢোকে ততই মঙ্গল।'

'কিন্তু বাসি হয়ে গেলে যে ও ফুলের দাম পাবো না হুজুর', আতাউল্লা কাতরভাবে বলে, 'এ কথা চাপা থাকবে না কিছুতেই, তাছাড়া যে নেবে সে যাচাই করে নেবে। এ বহুত কিম্তী মাল, বিস্তর টাকা খরচ করেছি আমি, ক্রেস্তানী মেয়ে ও, রুশের বাদশার মুলুক ওদের, অনেক কষ্ট ক'রে অনেক খরচ ক'রে ওকে ওর দেশের বাইরে আনতে হয়েছে। সব বরবাদ হয়ে যাবে বন্দানওয়াজ, এত মেহন্নৎ ঝুটা হয়ে যাবে।'

'দ্যাখো আতাউল্লা, তুমি আমাকে বিলক্ষণ চেনো। ইচ্ছে করলে আমি এমনিই নিতে পারি, তোমার কিছুমাত্র সাধ্য নেই যে আমাকে বাধা দাও। এক আগ্রায় গিয়ে জাহাঁপনার কাছে নালিশ জানাতে পারো কিন্তু তিনি তোমার এ নালিশে মুচকী হাসবেন শুধু, মনে মনে ছেলের পছন্দর তারিফ করবেন। তা ছাড়া তাঁর দরবারে হাজির হ'তে আমার অনেক দেরি। কাজেই ভাল চাও তো একটা দাম ঠিক ক'রে নাও; তোমার পুরো নুকসান ওঠাতে

চাই না আমি, তবে বেশী চেও না, তাহ'লে দিতে পারব না।'

'তাহ'লে ওকে একেবারে কিনেই নিন না খুদাওয়ন্দ্! আমি—আমি না হয় অল্প মুনাফায় ছেড়ে দেব। এতই যখন নজর পড়েছে আপনার—। ভাল টাটকা মাল, নাচ-গান-বাজনা সব জানে, কিছু কিছু লেখাপড়াও করেছে, বাদশার বেগম হবার যোগ্যতা ধরে ও।'

'না, অত পয়সা আমার নেই, অভিরুচিও নেই। আমি আজ এখানে আছি, কাল ওখানে। তা ছাড়া বহু দূরের সফর আমার এ যাত্রায়—এর মধ্যে ওসব ঝামেলা জড়াতে চাই না।'

অগত্যা আতাউল্লাকে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে সত্য অবস্থাটা মেনে নিতে হয়েছিল। বহুদিন যারা ব্যবসা করে—তাদের কিছুটা দার্শনিক মনোভাব জন্মে যায়ই—বাস্তবকে সহজে মেনে নিতে পারে, অকারণ হা-হুতাশ ক'রে সময় ও শরীর নষ্ট করে না। দরদস্তুর সে করে নি। শাহ্‌জাদার মর্জি আর মেহেরবানির ওপর ছেড়ে দিয়েছিল সেটা। সে জানত সামান্য দু একশ মোহর বেশী বা কমে এ লোকসানের কোন ক্ষতিবৃদ্ধি হবে না, মিছিমিছি কেজিয়া ক'রে লাভ কি। এ শাহ্‌জাদার একটু কৃপণ বদনাম আছে, চাপ দিলেও বেশী আদায় হবে না।...

সেই রাত্রে সেই বাগানবাড়িরই একটা ঘরে শয্যা রচিত হয়েছিল শাহ্‌জাদার; ফুলের কুঁড়ির মতো মেয়েটিকে সেখানেই পাঠিয়ে দিয়েছিল আতাউল্লা। কী যেন নাম বলেছিল মনে নেই আজ, মরিয়ম না কি যেন, আর্মানীরা যে জাতের ক্রেস্তান—সেও তাই। গলায় একটা সরু সোনার হারে ওদের পয়গম্বর যিশুর একটা মূর্তি ঝোলানো ছিল।

ভয়ে উত্তেজনায় অল্প অল্প কাঁপছিল মেয়েটি; মুখের ওপর দশ বারোটা বাতির মিলিত আলোয় তেমনি ক্ষণে-ক্ষণে-মিলিয়ে-যাওয়া রক্তোচ্ছ্বাস দেখতে পেয়েছিলেন শাহ্‌জাদা, দেখতে পেয়েছিলেন কেমন একটি একটি ক'রে তার সেই সুন্দর নাকটির ওপর আর ওপরের ঠোঁটে সূক্ষ্ম স্বেদবিন্দু ফুটে উঠছে।...আর বিলম্ব সয় নি তাঁর, দুটো মিষ্টি আশ্বাসের কথা বলার, কি কোন প্রণয়সম্ভাষণেরও চেষ্টা করেন নি—একেবারেই রূঢ় কঠিন হাতে নিজের দিকে আকর্ষণ করেছিলেন।...

আশ্চর্য, মেয়েটি কোন বাধা দেয় নি, অনুযোগ করে নি। নীরবে, যেন স্বেচ্ছাতেই নিজেকে সঁপে দিয়েছে ওঁর সেই নির্দয় বাহুবন্ধনে। বর্বরের মতো, পশুর মতো, বহু শতাব্দী আগের মোগল পূর্বপুরুষদের মতোই আচরণ করেছেন তার সঙ্গে, কিন্তু তবু তার চোখে এতটুকু ভর্ৎসনা ফুটে উঠতে দেখেন নি। বরং, আজ যেন মনে হয়, একটা মুগ্ধ কৃতার্থতাই দেখেছিলেন তার দৃষ্টিতে, একটা সার্থকতা লক্ষ্য করেছিলেন তার নিঃশেষে সঁপে দেওয়ার ভঙ্গীতে!...

রাত্রিশেষের বিদায় নেবার সময় এক থলি মোহর বার করেছিলেন শাহ্‌জাদা, ঈষৎ একটু অপ্রতিভভাবে বলেছিলেন, 'লড়াইয়ে চলেছি, সঙ্গে

আওরং নেই—কাজেই জেবর-জহরংও কিছু নেই। এই মোহরগুলো রাখো, মনের মতো জেবর একটা গড়িয়ে নিও। তোমার যা দাম মালিককে দিয়েছি, এটা তোমার বকশিস।'

সে টাকা নেয় নি, সসম্ভ্রমে মাথায় ঠেকিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছে। সহজ-ভাবেই বলেছে, 'আমি যে কেনা বাঁদী মেহেরবান, আমার নিজস্ব টাকা থাকতে নেই। যা দেবেন তাও মালিকেরই প্রাপ্য হবে।'

'তবে তোমাকে কী দিতে পারি বলো' পরিতৃপ্ত শাহ্জাদা সেই মুহূর্তে উদার হয়ে উঠেছিলেন, 'বলো তো আতাউল্লাকেই বলে দিই তোমাকে একটা দামী গহনা গড়িয়ে দিতে।'

'সেও মালিকই শেষ পর্যন্ত নিয়ে নেবেন খুদাওয়ান্দ, আমাদের ও সব ভোগে হয় না। নতুন মালিককে যখন বিক্রি করবেন তখন কি আর জেবর পরিয়ে বিক্রী করবেন? সে মালিক যদি গহনা পরাতে চান তিনিই পরাবেন—সেও তাঁর খুশি আর মর্জির ওপর নির্ভর করছে।...না, না, জনাব, যদি দিতেই চান কিছু তো আপনার ব্যবহার করা অথচ খুব কম-দামী কোন জিনিস দিন, যা আমি অনায়াসে কাছে রাখতে পারব, যা কেড়ে নিয়ে কারও কোন লাভ হবে না, অথচ যা স্পর্শ ক'রে আপনার স্পর্শ অনুভব করব, আর যদি—যদিই কোনদিন ভাগ্য আবার আপনার কাছাকাছি নিয়ে আসে তো যা দেখে আপনিও স্মরণ করতে পারবেন আপনার এই বাঁদীকে।'

মুগ্ধ হয়েছিলেন শাহ্জাদা ওর এই অনুরোধে। লজ্জিতও বোধ করেছিলেন একটু! এই যৎপরোনাস্তি অমানুষিক ব্যবহারের পরিবর্তে এতটা সৌজন্য আশা করেন নি তিনি। তাই ওর সামান্য অনুরোধটুকু রক্ষার জন্যে ব্যস্তই হয়েছিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তেমন কোন জিনিসের কথাই মনে পড়ে নি। অসহায়ভাবে বিমূঢ়ভাবে চারিদিকে তাকিয়ে দেখে-ছিলেন শুধু। এখানে কী আছে এমন তাঁর ব্যবহার করা জিনিস, পোশাক আর হাতিয়ার ছাড়া?

মেয়েটিই ওঁর মনোভাব বুঝে দেখিয়ে দিয়েছিল আংটিটা, 'ঐটে দেবেন শাহ্জাদা? কমদামী আংটি, ওটা কেউ কেড়ে নেবে না হয়ত!'

'এটা? এটা যে আমার মোহর করার আংটি?

'ও—। বুঝতে পারি নি জনাব-ই-আলি। মাফ করবেন।' সংকোচে যেন এতটুকু হয়ে গিয়েছিল সে, মুহূর্তে ম্লান হয়ে উঠেছিল।

সেই আংটিটার পাশে অনামিকার চৌকো-চুনী আংটিটা দেখিয়ে তাড়াতাড়ি বলেছিলেন শাহ্জাদা, 'তুমি বরং এইটে নাও।'

'ওটা এক দণ্ডের বেশী আমার কাছে রাখতে দেবেন না মালিক, অতবড় পাথরের কী কিম্মং—কিছুটা আমি জানি।'

সেই সময়েই কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল শাহ্জাদার। হঠাৎ হারিয়ে গেলে অসুবিধা হ'তে পারে বলে এই মোহরের আংটি এক সঙ্গে দুটো করিয়েছিলেন। একটা তাঁর সঙ্গে তাঁবুতেই আছে। এটা খুলে দিলে বিশেষ কোন অসুবিধা হবে না। তিনি আংটিটা খুলে ওর হাতের মধ্যে

গ‍ুঁজে দিয়ে বলেছিলেন, 'বেশ, এইটেই রাখো। সাবধানে রেখো, এটা যে আমার মোহর তা কেউ না বুঝতে পারে! আঙুলে পরতে পারবে না—তবে যদিই পরো, মোহরের দিকটা ভেতরে রেখো।' মাথা নত ক'রে সেই সামান্য দান গ্রহণ করেছিল মেয়েটি, ধন্য হয়ে গিয়েছিল যেন।

বেশীক্ষণ লাগে নি শাহ্‌জাদার এই স্মৃতি-পরিক্রমা শেষ করতে। ছবিগুলো যেন সাজানোই ছিল মনের মধ্যে পর পর, শুধু এতকাল চোখ বুজে ছিলেন বলেই দেখতে পান নি। একটার পর একটা—ঘটনাগুলো যেন নতুন ক'রে ঘটে গেল আবার, তেমনি স্পষ্ট দেখতে পেলেন তিনি। মনের মধ্যে ঘটল বলেই বোধ করি অর্ধদণ্ডও লাগল না, কিন্তু সবগুলোই মিলিয়ে পেলেন তিনি। স্মৃতির ভাণ্ডারে সব ঠিক ঠিক জমা ছিল, কোথাও এতটুকু ছেদ পড়ে নি, এতটুকুও হারিয়ে যায় নি। সে রাত্রির স্বাদ আজও তেমনি আছে, অনুভূতির তীব্রতাও কমে নি। সেদিনের সেই কামনা, সেই অধীরতা, সেই আনন্দ সেই রকমই অনুভব করলেন আবার। চঞ্চল হয়ে উঠলেন এত দিনের বিস্মৃত সেই সুখস্মৃতিতে। স্থান কাল পাত্র তেমনিই ভুলে গেলেন যেন—সেদিনের মতোই।

হঠাৎ মনে হ'ল—সেই পুষ্পকোরকের মতো কোমল—তেমনি অম্লান তেমনি কচি দেহটা এখনও তাঁর বাহু বন্ধনের মধ্যেই আছে। তিনি সজোরে সবেগে চেপে ধরলেন তাকে।...

একজন ছিল ঠিকই—তবে সেদিনের সেই মেয়েটি নয়। যন্ত্রণায় অস্ফুট একটা শব্দ ক'রে উঠল দেলওয়ার। সেই শব্দেই চমক ভেঙে প্রকৃতিস্থ হলেন শাহ্‌জাদা, স্বপ্ন থেকে বাস্তবে নেমে এলেন।

মনে পড়ল দেলওয়ারকে কোলের কাছে টেনে আনার কথা। এখনও সে সেইভাবেই আছে, এখনও তার মুখখানা এক হাতে তেমনি তুলে ধরা। কথা কইতে কইতেই তিনি যে চিন্তায় ডুবে গেছেন তা বুঝতে দেরি হয় নি দেলওয়ারের। সে তাঁকে দিন-রাত অখণ্ড মনোযোগে লক্ষ্য করে—তাঁর প্রতিটি ভঙ্গী তার পরিচিত। পাছে এই গভীর চিন্তায় ব্যাঘাত ঘটে তাই সে একটুও নড়ে নি কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে। ভাল ক'রে নিশ্বাসও ফেলতে পারে নি এতক্ষণ।

অপ্রতিভ হলেন শাহ্‌জাদা। যতই হোক, সামান্য এক ভৃত্যের কাছে এতটা আবেগ প্রকাশ করা ঠিক হয় নি। তাঁরও যে সাধারণ মানুষের মতো হৃদয় আছে আর সে হৃদয় তাদের মতোই আবেগের অধীন, এটা অধস্তন কর্মচারী কি ভৃত্যদের না জানাই ভাল। বিশেষ ক'রে এক্ষেত্রে একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে। ও কী ভাবল কে জানে, এই আলিঙ্গন ওরই প্রাপ্য বলে যদি মনে করে তো স্পর্ধা বেড়ে যাবে। সে ভুল এখনই ভেঙে দেওয়া দরকার।

একটু বিরক্তই হলেন তিনি—নিজের ওপরে তো বটেই—ঐ ছেলেটার ওপরেও।

তিনি বেশ একটু জোরেই ঠেলে সরিয়ে দিলেন তাকে। সে বিরক্তি তাঁর ভ্রূকুটিতেও প্রকট হয়ে উঠল।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই ওর ভয়ার্ত শুষ্ক মুখের দিকে চেয়ে আপনিই কোমল হয়ে এল দৃষ্টি, ভ্রূকুটিও মিলিয়ে গেল। তাঁরও আগে সে-ই নিজেকে অপরাধী মনে করেছে, তেমনিই কুণ্ঠিত দীন তার ভঙ্গী। যেন কোন মতে তাঁর চোখের সামনে থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে পারলে বাঁচে।

না, আর ভুল করবেন না। যে যথার্থ অনুগত, বিশ্বস্ত—যে তাঁকে ভালবাসে—তার প্রীতি আর বিশ্বস্ততা হারাতে পারবেন না তিনি।

একে দিয়ে অনেক কাজ হবে তাঁর। দেলওয়ার একদিন তাঁর ডান হাত হয়ে উঠতে পারবে। বড় বংশের, ওমরার ছেলেদের ডেকে বড় বড় পদ দেওয়া যেতে পারে—প্রয়োজন বোধে, রাজনীতির খাতিরে দিতেও হয়—কিন্তু তাদের ওপর ভরসা করা যায় না। তার চেয়ে ঢের বেশী আশা তাঁর এর ওপর। বিশ্বস্ত এবং দক্ষ—এ লোক সর্বকালেই দুর্লভ।...

বিশ্বস্ত অথচ দক্ষ।

এই মুহূর্তে এই রকম লোকেরই একটা একান্ত দরকার।

স্বস্তি পাচ্ছেন না তিনি। কিছুতেই স্থির হ'তে পারছেন না, সত্যটা না জানা পর্যন্ত। সেটা কে জেনে বলবে তাঁকে নিশ্চিত ক'রে।

সে কাজ এই বালকের দ্বারা হবে না।

বাঘের গুহায় গিয়ে তার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্যে আরও ঢের ঝানু লোকের দরকার।...

কিন্তু—সত্যিই কি হবে না?

অন্যমনস্ক হয়েই চেয়েছিলেন হয়ত—তবু ওর সুকুমার সুশ্রী মুখখানা একেবারে দৃষ্টির বাইরে ছিল না। সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতেই চিন্তাটা খেলে গেল মাথায়।

দুঃসাহসিক পরিকল্পনা—কিন্তু দুঃসাহসই তো আনন্দ। অন্তত আওরঙ্গজেবের ক্ষেত্রে তাই।

এ সংশয় তাঁর দূর করতে পারে এমন একজনই আছে, যে তাঁকে কাল শেষ রাত্রে ঐ ইঁদুর-কলটা দিয়ে গেছে। তার কথা সাময়িকভাবে বিস্মৃত হয়েছিলেন ঠিকই, তবে সে তাঁর জানার বাইরে যেতে পারে নি। তার খবর তিনি রাখেন। সে এখন বড়ে শাহ্‌জাদার অন্তঃপুরচারিণী, তাঁর আদরের কাশ্মীরী বাঈ। সেই ক্রীতদাসী, যাকে আতাউল্লা চড়া দামে বেচতে চেয়েছিল। চড়া দামেই বেচেছে সে। দৈবক্রমে শাহ্‌জাদা দারাশুকোও সেই সময়ে কাশ্মীরে গিয়ে পড়েছিলেন, কৌশলে আতাউল্লা মেয়েটিকে তাঁর চোখের সামনে এনে হাজির করেছিল। বাদশার অনুগ্রহে বড়ে শাহ্‌জাদার অর্থের অপ্রতুল কোনদিনই ছিল না। তিনি চড়া দামেই কিনে নিয়েছিলেন মেয়েটিকে তৎক্ষণাৎ। কাশ্মীর থেকে কেনা বলে দারা আদর ক'রে তার নাম রেখেছেন কাশ্মীরী বাঈ।

এ সবই জানেন আওরঙ্গজেব। আরও জানেন সেই ক্রেস্তানী বাঁদীকে

নেকাহ্ ক'রে তাকে বেগমের সম্মান দিয়েছেন বড়ে শাহ্‌জাদা। অপূর্ব রূপসী সে, রূপসী এবং গুণবতী। লেখাপড়া যা জানে তাতে মুঘল হারেমেও লজ্জা বোধ করার কারণ নেই. তা ছাড়াও নাচ গান চিত্রাঙ্কন সমস্ত কলাবিদ্যাতেই পারদর্শিনী সে। এ মেয়েকে বাঁদী ক'রে রাখতে দারার বিবেকে ও ঔদার্যে বেধেছিল, তিনি তাকে বিবাহ ক'রে বেগমের পদবীই দিয়েছিলেন।

এইখানেই আছে সে, মাত্র হয়ত অর্ধক্রোশের ব্যবধানে। এই আগ্রা শহরেই।

কোন মতে যদি তার কাছে কাউকে পাঠানো যায়—চতুর এবং বিশ্বস্ত কাউকে, তা হ'লেই এই সমস্যার সমাধান হয়ে যায়, এই দ্বিধা ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে অব্যাহতি পান শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব।

তেমন কেউ নেই। যাকেই পাঠাবেন কথাটা ছড়িয়ে পড়বে, সে বেচারীর প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে—যে নিজের প্রাণ বিপন্ন ক'রে তাঁর প্রাণ রক্ষা করতে এসেছিল। যাকে-তাকে এ কাজে পাঠানো চলবে না।

তেমন বিশ্বাসী লোক হাতের কাছে আছে একমাত্র এই বালকটিই।

শুনতে খারাপ লাগবে অনেকেরই—কিন্তু যা সত্য তা স্বীকার করতে কুণ্ঠিত নন তিনি কোনদিনই।

তবে নিতান্তই অল্প বয়স ওর, এই দুরূহ কাজের ভার কি এর ওপর দেওয়া উচিত হবে?

চিরদিনের দুঃসাহসী মন তাঁর বলে ওঠে, দোষ কি!

যদি বানচাল হয়ে যায় তাঁর মতলব, যদি ধরা পড়ে?

তখন অনেক কৈফিয়ৎ আছে দেবার মতো। সে তখন ধীরেসুস্থে ভেবে দেখলেই হবে। একটা কথা তিনি নিশ্চিত জানেন, সহস্র অত্যাচার বা প্রলোভনেও দেলওয়ারের মুখ থেকে সত্যটা বার করতে পারবে না ওরা।

শাহ্‌জাদা আস্তে আস্তে দেলওয়ারের মাথায় একটা হাত রাখলেন. 'বাচ্চা, একটা কাজ করতে পারবি?'

দেলওয়ার এতক্ষণ একটা কঠোর তিরস্কার বা ঐ ধরনের কিছু আশা করছিল, তার পরিবর্তে এই প্রস্তাবে যেন কৃতার্থ হয়ে গেল। সাগ্রহে ঘাড় নাড়ল সে—পারবে।

'না শুনেই ঘাড় নাড়ছিস যে! যে কাজের লোক তার এত তাড়া ভাল নয় কিন্তু—জেনে রাখ!...বিষম শক্ত কাজ, প্রাণ নিয়ে টানাটানি পড়তে পারে—এতটুকু ভুল হলে।'

'তা হোক, তবুও পারব। আপনি হুকুম করলে সবকিছু পারব।'

কঠিন কোন কাজ ক'রে মালিককে খুশি করার সম্ভাবনায় উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে দেলওয়ার, তার উৎসাহ এই ধরনের মামুলি ভয় দেখানোতে স্তিমিত হবার কথা নয়।

সে এখনই তৈরী, শুধু কি করতে হবে মালিক যদি অনুগ্রহ ক'রে বলে দেন।

'শোন্ তবে। মন দিয়ে শুনে নে। এত তাড়ার কিছু নেই। এখনই কোথাও যেতে হবে না। দেরি আছে। হয়ত আজও নয়—অন্য কোন্ দিন যেতে হবে, খবর নিয়ে ঠিক করব সেটা। আর এভাবে তোর এই চেহারায় যাওয়া চলবে না। তোকে মেয়েছেলে সাজতে হবে। কেউ না টের পায়, কাউকে বলবি না কথাটা। জানাজানি হ'লে শুধু তোরই না—আরও অনেকের বিপদ ঘটবে। তোর কচি মুখ, মেয়েদের মতোই দেখাবে মেয়ে-ছেলে সাজলে। কেউ অত বুঝতে পারবে না। বিশেষ ক'রে বাতির আলোয় তফাৎ অত ধরা পড়ে না। আমার বড় বেগম সাহেবার যে দাই আছে বুড়ি, আমিনা বলে, ও আমার ছেলেবেলার দাই, খুব বিশ্বাসী আর খুব ঝানু। মেয়েদের সাজাতেও পারে, সেদিক দিয়ে ওস্তাদ। তাকেই বলব তোকে সাজিয়ে দেবার কথা। পোশাক গয়না সে-ই যোগাড় ক'রে নেবে, দরকার হয়তো কাজ চলার মতো পোশাক টেঁকে ছোট ক'রে নিতে পারবে, তোর মাপে। তাকে বলে দেব আমার পাশের এই ঘরে বসে সাজিয়ে দেবে। একেবারে পোশাক পরিয়ে বোরখায় ঢেকে পাল্কীতে রওনা ক'রে দেবে সে. কেউ বুঝতে পারবে না, জানবেও না কেউ। আমিনা কাউকে বলবে না, তুইও বলিস নি। খবরদার। যদি কোনদিন শুনি কাউকে বলেছিস তাহ'লে আর জীবনে মুখ দেখব না তোর।'

শাহ্জাদা জানেন, এর চেয়ে বড় শাস্তি দেলওয়ারের কাছে আর কিছু নেই।

দেলওয়ার ঘাড় নাড়ল।

কী করতে হবে বুঝেছে সে—কেন সেইটে কেবল বুঝতে পারে নি। কৌতুকে আর কৌতূহলে, নতুন এক দুঃসাহসিক কাজের আগ্রহে তার দুই চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠেছে, স্থির থাকা কঠিন তার পক্ষে। শুধু মনিবের সামনে তাঁর সম্বন্ধে কোন কৌতূহল প্রকাশ করা বেআদবি বলেই চুপ ক'রে রইল। কেমন ক'রে যেতে হবে তা বলেছেন মালিক, কিন্তু কোথায় যেতে হবে আর সেখানে ঠিক কি করতে হবে তা এখনও বলেন নি। সেটা জিজ্ঞাসা করতে পারল না মুখ ফুটে, শুধু উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তাঁর মুখের দিকে চেয়ে। এর বেশী কিছু করার নেই, তাঁর মর্জি-মতো তিনি নিজেই বলবেন।

বললেনও শাহ্জাদা, নিজেই বললেন।

ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, কোথায় গিয়ে কি করতে হবে আর কি বলতে হবে।

এ বিষয়ে তাঁর অসাধারণ খ্যাতি আছে। যখনই কোন অধীনস্থ কর্মচারীকে কিছু কাজের ভার দেন তখন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রতিটি নির্দেশ দিয়ে দেন। কোন ছোট-খাটো তথ্যও ভুল হয় না। তেমনি তাদের তরফ থেকেও কোন ভুল মার্জনা করেন না। কাজ না হওয়ার কৈফিয়ৎটাই সবচেয়ে অসহ্য তাঁর কাছে।

দেলওয়ারকেও নিখুঁত নির্দেশ দিয়ে দিলেন।

বড়ে শাহ্‌জাদার প্রাসাদে যেতে হবে তাকে। সে যাবে নবাব বাঈ বেগম সাহেবার বাঁদী সেজে। বেগম সাহেবার সন্তান সম্ভাবনা হয়েছে—এই কারণে তিনি অন্য শাহ্‌জাদার বেগমদের উপহার উপঢৌকন পাঠাচ্ছেন। ছলনাটা হঠাৎ ধরা পড়বে না—তিনি অভিনয়টা ত্রুটিহীন করার জন্যে অন্য শাহ্‌জাদাদের অন্তঃপুরেও এমনি ভেট পাঠাচ্ছেন। কিন্তু দারা শুকোর অন্তঃপুরে শুধু ভেট পেঁছে দিলে হবে না, একটা কাজও সেরে আসতে হবে। সেই জন্যেই এত কাণ্ড ক'রে দেলওয়ারকে পাঠাচ্ছেন তিনি। প্রত্যেকটি বেগমের নামে আলাদা আলাদা উপহার থাকবে, যারা বয়ে নিয়ে যাবে তারা সকলেই বোবা, কাজেই তাদের দ্বারা কথা বলার কাজ চলবে না, সেটা বলতে হবে দেলওয়ারকেই। বেছে বেছে বোবা দাসীই রেখেছেন শাহ্‌জাদা, অল্প বয়সে এদের জিভ কেটে বোবা ক'রে দেওয়া হয়েছে—যাতে ঘরের কথা বাইরে না গল্প করতে পারে। তা দেলওয়ারের গলা এখনও মেয়েদের মতোই মিষ্টি আছে, সন্দেহও করবে না কেউ। আর সে যেন লজ্জায় ভাল ক'রে কথা কইতে পারছে না—এমনিভাবে ঘাড় হেঁট ক'রে আস্তে আস্তে কথা বলবে, তাহ'লে অত কেউ ধরতেও পারবে না। সে বলবে যে যার যা ভেট বেগম সাহেবাদের বরাবর নিজে হাতে সে পেঁছে দেবে, মালিকের এই রকম হুকুম আছে।

এইসব উপহারের মধ্যে কাশ্মীরী বাঈ বেগম সাহেবার জন্যেও কিছু থাকবে। ওদের অন্তঃপুরের কর্তা বৃদ্ধ খোজা জাবেদ আলি তাকে সেখানেও নিয়ে যাবে নিশ্চয়। সেইখানে, ভেট হাতে তুলে দিতে দিতে তাকে দেখাতে হবে এই আংটিটা, বলত হবে যে মালিক বলে দিয়েছেন যে এই আংটি দেখলেই বেগমসাহেবা বুঝবেন সে বিশ্বাসী লোক। তারপর চুপি চুপি তাঁকে জানাবে যে, মালিক সম্প্রতি একটা চুহাকল উপহার পেয়েছেন, নতুন রকমের চুহাকল বলেই ঠিক বুঝতে পারছেন না, কেমন ক'রে ব্যবহার করতে হয় ওটা। ওতে চুহা কেমন ক'রে জব্দ হবে তাও বুঝতে পারছেন না তিনি। বেগম সাহেবার যদি রহস্যটা জানা থাকে তো যেন মেহেরবাণী ক'রে বলে দেন ওকে।...যেমন ক'রেই হোক কথা কটা বলতে হবে কাশ্মীরী বাঈ বেগমসাহেবাকে। কী জবাব দেন তিনি ধীরভাবে শুনে মনে ক'রে রাখতে হবে। কোন কথা না শুনতে ভুল হয়—গোলমাল না হয়ে যায়। একটা শব্দও ভুললে চলবে না। তিনি যা বলবেন—ঠিক ঠিক শুনতে চান শাহ্‌জাদা।

দু'বার ক'রে সব বলে দিলেন তিনি। দরকার ছিল না, দেলওয়ারের পক্ষে একবারই যথেষ্ট, তবু বললেন। ভাল ক'রে বুঝিয়ে দিলেন, কাকে কি বলবে, কী আচরণ করবে কার সঙ্গে। তারপর ওর মুখ থেকে সবটা আবার শুনে নিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। এখন গোসল করে নে আগে। তারপর কিছু খেয়ে নিয়ে তৈরী হয়ে এখানেই বসে থাকবি। সন্ধ্যের আগে যাওয়া যাবে না। দিনের আলোয় হয়ত জাবেদ আলি ধরে ফেলতে পারে, তার নজর বড় সাফ্‌। তাছাড়া, সেই সময় যাওয়াই নিরাপদ, ঐ সময়টায়

বড়ো শাহ্‌জাদা আমাদের বা'জান—শাহানশাহের কাছে যান প্রত্যহ। ফিরতে ফিরতে প্রথম প্রহর পেরিয়ে যায়। তিনি থাকলে হয়ত—এই ধরনের ভেট পাঠানো দেখে কিছু সন্দেহ করতে পারেন, না থাকলে অত কেউ মাথা ঘামাবে না।'

এই বলে আবারও ওর মাথায় একটা হাত রাখলেন শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব। সস্নেহে ওর চুলগুলো এলোমেলো ক'রে দিয়ে বললেন, 'কী রে, পারবি তো— ? ভেবে দ্যাখ এখনও। মস্ত বড় ঝুঁকির কাজ কিন্তু। প্রাণ মান ইজ্জৎ—অনেক কিছু চলে যেতে পারে. অনেকের বিপদ ঘটতে পারে।'

উৎসাহে তখন দেলওয়ারের চোখ জ্বলছে। তার ক্লান্তি কোথায় চলে গেছে। এত বড় একটা দায়িত্বপূর্ণ কাজের ভার তার ওপর দেবেন শাহ্‌জাদা—এ তার কাছে অবিশ্বাস্য সৌভাগ্য। এতটা বিশ্বাস আর ভরসা করেন তিনি, তাঁর হুকুম তামিল করতে পারবে না সে ! তাহ'লে আর বেঁচে থাকারই বা অর্থ কি !

সে গলায় একটা অস্বাভাবিক ঝোঁক দিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই পারব।'

'কোন গোলমাল হবে না ?'

'কিচ্ছু হবে না। জান কবুল।'

'যদি ধরে ফেলে ওরা—আমার নাম করবি না তো ?'

'কিছুতেই না। একটু একটু ক'রে পুড়িয়ে মারলেও বলব না।'

তবু যেন দ্বিধা যেতে চায় না শাহ্‌জাদার। বড্ডই ছোট এ—নেহাৎই বালক। পারবে এতখানি বোঝা বইতে !

একটুখানি চুপ ক'রে থেকে আবারও বললেন, 'ভয় করছে না তোর—একেবারে এমন একা বাঘের মুখের সামনে যেতে ?'

'ভয় করবে কেন ?' বিস্মিত হয়ে মুখ তুলে তাকাল সে এবার, সরল নির্ভীক পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে। সে চোখে একই সঙ্গে যেন আত্মবিশ্বাস আর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি কৃতজ্ঞতা—এবং হয়ত ভালবাসাও উপচে পড়ছে। আশ্বস্ত হলেন শাহ্‌জাদা। তিনি জানেন, যে যথার্থ ভালবাসে সে ভাল-বাসার পাত্রের জন্য অসাধ্য সাধন করতে পারে।

তাঁর চোখের ওপর চোখ স্থির রেখে দেলওয়ার বলল, 'আমার মালিক ছাড়া আর কাউকে ভয় করি না আমি। তিনি খুশি থাকলে দুনিয়ার কারও নারাজীকে ভয় নেই আমার।'

'দূর পাগল !' আওরঙ্গজেব ওর পিঠে একটা মৃদু চাপড় মেরে বললেন, 'মালিক ছাড়াও একজন আছেন—তাঁকেই সব সময় সব চেয়ে ভয় করতে হয়। মালিকের মালিক তিনি, বাদশারও বাদশা। এক পরমেশ্বর খোদা ছাড়া এ দুনিয়ায় ভয় করার মতো কেউ নেই।'

॥ ৫ ॥

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব যতই অস্থির হয়ে উঠুন, সেদিন আর দেলওয়ারকে পাঠানো গেল না। সেদিনও নয়—তার পরেও কদিন নয়। সন্ধ্যার সময় শাহ্‌জাদার চর সংবাদ নিয়ে এল, শাহানশাহ্‌ মাত্র কিছুক্ষণ আগে দারার প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন। তাও তাঁর তবিয়ৎ ভাল নেই, দুপুর থেকেই বে-এক্তিয়ার হয়ে আছে—প্রচণ্ড মাথা ধরেছে নাকি, তাই যাওয়ার আগেও বড়ে শাহ্‌জাদার সঙ্গে বিশেষ কথাবার্তা বলেন নি, দারা তাঁর সঙ্গে কিল্লা পর্যন্ত গিয়ে পেঁছে দিয়ে আসবার প্রস্তাব করেছিলেন, বাদশা খুব রূঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করেছেন। অর্থাৎ শুধু বিরক্তই নয়—তিক্ত হয়ে আছেন তিনি। প্রাসাদে ফিরে গিয়েই নাকি হাকিম তলব করেছেন বাদশা—ঘুমের ওষুধের জন্য। কাজেই আজ রাত্রে আর বড়ে শাহ্‌জাদার প্রাসাদে যাওয়ার কোন সওয়াল উঠছে না।

তার পরও কদিন বাদশা কারও সঙ্গে দেখা করলেন না। তাঁর নাকি সেদিনের পর থেকে মাথা ধরেই আছে। প্রত্যহ শুধু একবার ক'রে রুগ্ন কন্যা জাহান্‌আরাকে দেখতে আসেন—কিন্তু সে সময় সেখানেও অন্য কারও সঙ্গে দেখা করেন না।...এদিকে দারাও ব্যস্ত। তাঁর তৃতীয় ভ্রাতার ব্যবহার বাকী দু'ভাই পাগ্‌লামি বা খাম-খেয়াল বলে উড়িয়ে দিলেও দারা অতটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন না বোধ হয়। কোন্‌ সাহসে এবং কী কারণে সে শাহান্‌শার এতখানি রোষও অগ্রাহ্য করতে পারল, এই অবিশ্বাস্য ধৃষ্টতা প্রকাশ ক'রে ইহকাল পরকাল অর্থাৎ বর্তমান ও ভবিষ্যতের আশা-ভরসা নষ্ট ক'রে বসল! সেই কারণটা না জানা পর্যন্ত যেন দারার স্বস্তি নেই। আওরঙ্গজেবের লোক খবর আনছে—দারা কদিন ধরেই তাঁর অন্ত-রঙ্গদের সঙ্গে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন আর পরামর্শ নিচ্ছেন। নানা অছিলায় তৃতীয় শাহ্‌জাদার বাড়ি লোক পাঠাচ্ছেন তিনি; অসংখ্য গুপ্তচরও নিয়োগ করেছেন। স্বয়ং ওয়াকিয়া নিগার-ই-কুল* ইয়ার আলি খাঁকে ভার দেওয়া হয়েছে সঠিক সংবাদ সংগ্রহের জন্য। খুব সহজে যে তাঁর এই তৃতীয় সহোদরটির পেটের কথা বার করা যাবে না তা দারা জানেন, তাই তাঁর চেষ্টার ও যত্নের ত্রুটি রাখেন নি এতটুকুও, কোন রকম পথই পরিহার করেন নি।

সুতরাং বাধ্য হয়েই শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবকে অপেক্ষা করতে হ'ল বেশ কয়েক দিন। এতখানি উদ্বেগের মধ্যে এইভাবে নিষ্ক্রিয় বসে থাকা অপরের পক্ষে অসহ্য হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু তিনি ধৈর্য ধরতে জানেন, হতাশ হওয়া বা অস্থির হয়ে উঠে কোন কাজ ক'রে বসা তাঁর

* রাজকীয় সংবাদ-সংগ্রাহক—Imperial Staff Reporter.

স্বভাবে নেই। অধীর হয়ে উঠেছে বেচারী দেলওয়ারই—এত বড় একটা কঠিন কাজের ভার যদি বা তার অদৃষ্টে মিলল. সেটা সুসম্পন্ন করার গৌরব কি আর ভাগ্যে জুটবেই না কোনদিন? ছটফট করে সে, উৎসুক দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে মালিকের মুখের দিকে চায়, কিন্তু সে প্রশান্ত ও প্রশস্ত ললাটে একটি কুঞ্চনও জাগে না, চোখের দৃষ্টিতে কোন উত্তরই ফোটে না। মালিককে চেনে সে—তাই মুখ ফুটে প্রশ্ন করতে সাহস পায় না। গোপন কোন কাজের কথা—মালিক নিজে থেকে না তুললে—এমন কি তাঁর সঙ্গেও আলোচনা করতে নেই—এটা ভাল ক'রেই বুঝেছে সে, নইলে এই বয়সে এতটা আস্থাভাজন হ'তে পারত না। মালিক প্রায়ই বলেন. 'যে কথা বলতে বারণ করা হয়—সে কথা সেই মুহূর্তে ভুলে যাওয়াই হ'ল কাজের লোকের লক্ষণ।'

অবশেষে প্রায় দশ বারো দিন পেরিয়ে যাবার পর—তার এবং শাহ্‌জাদার ধৈর্যের পুরস্কার মিলল। খবর পাওয়া গেল শাহানশাহ্‌ এতদিন পরে নিজেই বড়ে শাহ্‌জাদাকে তলব করেছিলেন, কী একটা জরুরী কাজ পড়েছে—পরের দিনই দারা বুলন্দশর যাত্রা করছেন। সেখানে কদিন থাকবেন তা জানা না গেলেও কয়েক দিনের জন্যে তো নিশ্চিন্ত, যাতায়াতেই তো চার দিন লাগবে, লোকলস্কর নিয়ে যাওয়া!

দারা রওনা হবার পরের দিনই ভগবানের নাম নিয়ে দেলওয়ারকে পাঠালেন শাহ্‌জাদা। আগের দিনও এমনি ভেট নিয়ে লোক গেছে. শুজা ও মুরাদের বেগমদের জন্যে। শুজাও নাকি সেই দিনই পূর্ব দেশে যাত্রা করছেন—তার আগে সেখানে পৌঁছনো দরকার। খবর—বিশেষ এই ধরনের খবর অতি দ্রুত হাঁটে—এক শাহ্‌জাদার বাড়ির খবর আর এক শাহ্‌জাদার বাড়ি যেন হাওয়ায় ভেসে পৌঁছে যায়। তা যাবে জেনেই আওরঙ্গজেব দু'দিনে পাঠানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। তাই দারার বাড়ি যখন ভেট পৌঁছল —তখন কেউই বিশেষ বিস্মিত হ'ল না। বেশী কোন জিজ্ঞাসাবাদও করল না। শুধু জাবেদ আলি একবার দারার প্রধানা মহিষীর কাছে জিজ্ঞাসা ক'রে নিল যে শাহানশাহ্‌ যার ওপর এত অপ্রসন্ন হয়েছেন—তাঁর বেগমের পাঠানো উপহার নেওয়া ঠিক হবে কিনা; শাহানশাহ্‌ তাতে নারাজ তো হবেন না? বেগম সাহেবা তার উত্তরে আগের দিনের নজীরই দিলেন, ওরা যদি নিতে পেরে থাকে—তাঁদের নিতেই বা দোষ কি? বকুনি খায় তো সবাই খাবে, তাতে অতটা গায়ে লাগবে না।

আসলে কী কী পাঠিয়েছে নবাব বাঈ—সেটা জানতে না পারা পর্যন্ত কৌতূহল নিবৃত্ত হতে পারছে না। ফিরিয়ে দেওয়া তো অসম্ভব—এইটুকু অপেক্ষারও যেন বিলম্ব সইছিল না।

সুতরাং উপহার-পর্ব নির্বিঘ্নেই মিটে গেল। অন্য সব বেগমদের দেওয়া শেষ হ'লে নবাব বাঈ বেগম সাহেবার খুবসুরৎ খাস বাঁদীটিকে কাশ্মীরী বাঈ বেগম সাহেবার কাছে নিয়ে যাওয়া হ'ল। তালিকায় সেই-ভাবেই নাম ছিল, যে বাঁদী থেকে বেগম হয়েছে তাকে কিছু—খানদানী

ঘরের মেয়ে যাঁরা—তাঁদের আগে ভেট পেঁাছনো যায় না।

এ ঘরের ভেটও সামান্য,—কয়েক শিশি আতর ও একটা রেশমী ওড়না। অন্য ঘর ঘোরার সময় এ ডালার চাপা দেওয়া রুমাল তুলে সবাই একবার ক'রে দেখে নিয়েছে এবং উপহারের অপ্রতুলতায় খুশি হয়েছে, বেগম বাঈ-এর বিবেচনার প্রশংসা করেছে। সুতরাং 'কৌতুহল-অবসান' এ ঘরে কেউই আসে নি দূতীর সঙ্গে। জাবেদ আলিও ওকে কাশ্মীরী বাঈয়ের খাস বাঁদী জহিরন বিবির কাছে পেঁাছে দিয়ে চলে গেছে। তারও কৌতূহল নেই আর। বড়লোকদের এমন উদ্ভট খেয়াল চাপে মধ্যে মধ্যেই—এ সবে অভ্যস্তই আছে সে। এই দেখতে দেখতে চুল পেকে গেল তার। ছেলে হয় নি এখনও—হবে বা হ'তে পারে এই ফূর্তিতেই কে আবার কবে দান-খয়রাতের বন্যা বইয়ে দেয়। তাও দরগায় সিন্নি পাঠায় কিম্বা বড় পীরের কাছে মানসিক করে—সে এক রকম। জায়েদের ভেট পাঠানো—জাবেদ আলিও দেখে নি, এতখানি বয়সে শোনেও নি কখনও। এদিকে কত তো ভাব ভায়ে ভায়ে—এ ওকে হাতে পায় তো উকুনের মতো নখে টিপে মেরে ফেলে! মরুক গে, বড়লোকের বড় কথা, কিছু বললে কাটা যায় মাথা—চুপ ক'রে থাকাই ভাল। এতকাল বাদশা-শাহ্‌জাদাদের কাছাকাছি থেকে এই সার বুঝে নিয়েছে সে, আর সেই জন্যেই তার এত উন্নতি।...

খবরটা কাশ্মীরী বাঈও পেয়েছিল বৈকি!

আর পেয়ে পর্যন্ত উদ্বেলিত-বক্ষে বসে আছে ভেট কখন এ ঘরে আসবে—এই অপেক্ষায়।

সাগ্রহে শুধু নয়—সোৎকণ্ঠায়।

কারণ তার চিন্তাটা এদের থেকে বহুদূর এগিয়ে গেছে, প্রায় সত্যের কাছাকাছি।

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের সেদিনকার পাগ্‌লামির বিবরণ সবাই শুনেছে। শুধু এ প্রাসাদে কেন, গোটা শহরেই আর কোন আলোচনা নেই—ঐ কথা ছাড়া। কেউই বুঝতে পারছে না—নানা রকম অনুমানই শুধু করছে, নিজেদের অনুমানে নিজেরাও কোন সদুত্তর পাচ্ছে না। একমাত্র কাশ্মীরী বাঈই বোধ হয় জানে সে আচরণের কারণ। সম্ভবত সেদিনের সেই মধ্য রাত্রির বিপজ্জনক অভিযানেরই ফল ওটা। সেদিনের সে আকুলতা ব্যর্থ হয় নি—শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের এক রাত্রির নর্ম-সহচরী সেই ছোট্ট সেবিকাটির।

তাই, অসম্ভব জেনেও মনের গোপন কোণে একটা দুরাশা লালন করছিল—ও পক্ষ থেকে একটা স্বীকৃতি একটা কৃতজ্ঞতা আসবার। কে জানে এই উপহারের মধ্য দিয়েই কোন বার্তা আসছে কিনা তার প্রিয়তমের।

খাস বাঁদীর সঙ্গে ডালা বয়ে এনেছিল যে নির্বাক বাঁদী, মহলের ভেতরে তার ঢোকার অধিকার নেই, দোরের কাছ থেকে খাস বাঁদীই সেটা বহন ক'রে এনে বেগম সাহেবার সামনে হাঁটু গেড়ে বসে ডালাটা সামনে তুলে ধরল। কাশ্মীরী বাঈয়ের খাস বাঁদী জহিরন বিবি রীতি-মাফিক

রুমালটা সরিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল—বেগম সাহেবা একবার হাত ঠেকিয়ে স্পর্শ ক'রে দিলে ডালাটা সে-ই নিয়ে সরিয়ে রাখবে।

এই স্পর্শ করাটাই হ'ল গ্রহণ করা। বাহক বা বাহিকাদের হাত থেকে দাস-দাসীরাই উপহার তুলে নেয়। কিন্তু কাশ্মীরী বাঈ সে নিয়ম লঙ্ঘন করলেন, অধীর আগ্রহে নিজেই ডালাটা ধরে নিলেন বাঁদীর হাত থেকে। জহিরন বিস্মিত হ'ল কিন্তু কিছু বলল না, বরং নিঃশব্দে ঘরের প্রবেশ-পথের কাছে এগিয়ে গেল। বোধ করি বেগম সাহেবারই নির্দেশ ছিল এই রকম পাহারা দেবার!

ডালাটা হাত থেকে বেগম সাহেবাই নেবেন—বালিকা বাঁদী বোধ হয় তা আশা করে নি, কিন্তু তাই বলে অপ্রস্তুতও হ'ল না. বরং হাতে তুলে দেবার সময় আর একটা ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বসল—বেগম সাহেবার একটা আঙ্গুলে সামান্য একটু চাপ দিল।

চমকে কেঁপে উঠলেন বেগম সাহেবা। এই রকমই আশা করেছিলেন—তবুও কেঁপে উঠলেন, ভয়ে কিম্বা উত্তেজনায়—কিম্বা দুরাশা পূরণের অবিশ্বাস্য সম্ভাবনায়। কিন্তু চমকের সেই-ই শেষ নয়—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর হৃদ্‌স্পন্দন ক্ষণেকের জন্য থেমে গেল—বাঁদীর প্রসারিত হাতে একটি বিশেষ পরিচিত আংটি।

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের মোহর দেওয়ার আংটি। মোহর-ই-সুলেমান।

এই বালিকার মুখের দিকে চেয়ে মনেই হয় না যে শাহ্‌জাদা এর মারফৎ কোন সংবাদ বা বার্তা পাঠিয়েছেন। কিন্তু আংটিটাও ভুল হবার কোন সম্ভাবনা নেই। এ ওর বিশেষ পরিচিত। বুকের মধ্যে থাকে তার, অথবা মাথার চুলে। এখনও তার বেণীর মধ্যে লুকনো আছে। তার অতি প্রিয় আংটি—প্রিয়তমের স্মারক।

কিন্তু এত ভাবার সময় নেই, বাড়তি প্রশ্নেরও না। যে কোন মুহূর্তে কোন সাধারণ দাসী বা প্রহরিণী এসে পড়তে পারে, ঈর্ষাতুর অন্য বেগমরা তো নানা ছুতোয় কেবলই লোক পাঠান এ মহলে, কোন দোষ ত্রুটি বা বে-আইনী কোন আচরণের সূত্র খুঁজতে। সুতরাং তিনি তখনই হেঁট হয়ে, প্রায় ওর কানের কাছে মুখ এনে প্রশ্ন করলেন, 'কোন খং আছে?'

ঘাড় নাড়ল বাঁদী।

'কোন খবর?'

হ্যাঁ, খবর একটা আছে।

এমন কিছু নয় অবশ্য। বলবার মতো কিছু নয়। খবরটা ঠিক বেগম সাহেবার নয়, শাহ্‌জাদার। সেদিন থেকে শাহ্‌জাদা একটা বড় ধাঁধায় পড়েছেন। ধাঁধার খবরটা বিশেষ কেউ জানে না, এই বাঁদী জানে শুধু। সমস্যা একটা চুহা ধরা কল নিয়ে, একদিন মাঝ রাত্রে কে এক লৌণ্ডী এই চুহাকলটা ভেট দিয়ে গেছে। কে দিয়ে গেল কেন দিয়ে গেল—তা তিনি বুঝতে পারছেন না, আরও মজা, কেমন ক'রে এ কল পাততে হয় তাও

জানেন না। বাজারে যে কল পাওয়া যায়—এ ঠিক তা নয়। অথচ চুহাকল একটা শাহ্‌জাদার খুব দরকার, চুহা আর ছুছুন্দরের উৎপাতে অস্থির হয়ে রয়েছেন। কিন্তু এটার খবর ঠিক জানেন না বলেই কাজে লাগাতে পারছেন না।

দ্রুতই বলে গেল দেলওয়ার। দ্রুত আর নিম্ন কণ্ঠে।

কাশ্মীরী বাঈও সেইভাবেই উত্তর দিলেন।

তিনি বুঝতে পেরেছেন বাঁদী কোন্ চুহাকলের কথা বলছে। তিনিও এমনি একটা চুহাকল গাড়িয়েছেন। ভারী মজার কল, দরজাটা পড়ে যখন তখন একটুও শব্দ হয় না, তেমনি ভেতরের শব্দও বাইরে আসে না, ইঁদুর কলে পড়ে যতই চিৎকার অর্থাৎ কিচ কিচ করুক—গৃহস্থের ঘুম ভেঙেগ বিরক্তির কারণ ঘটে না। গৃহস্থ টেরও পায় না—ইঁদুর পড়ল কিনা। আরও একটা ভারী সুন্দর ব্যবস্থা আছে ইঁদুর মারার ব্যাপারটাও চমৎকার। সাধারণ কলে মারবার জন্যে বার করলে অনেক সময় চুহা পালিয়ে যায়, এতে তার কোন দরকারই নেই—কলের ওপর দিকে একটা চোরা দরজা আছে, কলটা সুদ্ধ জলে ডোবালেই সেই দরজা আপনি খুলে গিয়ে ভেতরটা জলে ভরে যায়—ইঁদুর চুবুনি খেয়ে হাঁপিয়ে মরবে অথচ সেদিক দিয়েও বেরোতে পারবে না।

স্থির হয়ে মন দিয়ে শুনল নবাব বাঈ বেগম সাহেবার এই একরত্তি খাস বাঁদী! তারপর হেঁট হয়ে বেগম সাহেবার সালোয়ারের প্রান্ত কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'ভালই হ'ল, আমি গিয়ে আমার বেগম সাহেবাকে বলব—তিনি বুঝিয়ে দেবেন শাহ্‌জাদাকে।'

এতক্ষণ নিখুঁত অভিনয় চলছিল—দু' পক্ষেই। কিন্তু কাশ্মীরী বাঈ শেষ রাখতে পারলেন না। একবার দ্বারপথের দিকে চেয়ে হঠাৎ বাঁদীর হাত দুটো ধরে বললেন, 'তুমি কে তা জানি না, তবে বুঝেছি যে তাঁর বিশ্বস্ত লোক। তাঁকে—তাঁকে তুমি আমার নাম ক'রে বলো যে আমার জিন্দিগী আর তকদির তাঁর পায়েই বিকিয়ে আছে চিরদিনের মতো। এই আশায় শুধু বেঁচে আছি যে আর একবার তাঁর দেখা পাবই। তিনি আমাকে না ভুলে থাকেন—না ভুলে যান।...বলবে তো তাঁকে, বলতে পারবে তো কথা কটা?...আর যদি তিনি কিছু বলেন, তুমি এসে একবার বলে যেতে পারবে না? একটা আশার বাণী শোনার জন্যে মনে মনে হাহাকার ক'রে মরছি। তুমি এসো—মেহেরবানী ক'রে এসো। মঙ্গলবার আর বৃহস্পতিবার রাত্রে আমার এই খাস বাঁদী জহিরনের ভাই বাগানে পাহারায় থাকে। যদি তুমি আসবে বলো, ঐ দুদিনই জহিরন তোমার জন্যে রাত বারোটায় অপেক্ষা করবে। বাগানের উত্তর দিকের দেওয়ালের কাছে যেখানটায় একটা দেওদারে আর চেনারে জোড় বেঁধেছে—সেইখানে আমগাছের তলায় থাকবে ঐ দুদিনই, বারোটা থেকে একদণ্ডকাল পর্যন্ত, তুমি পাঁচিল টপকে নামলে ও-ই সঙ্গে করে নিয়ে আসবে আমার কাছে, আবার কথা শেষ হ'লে পোঁছে দিয়ে আসবে। ওর হাতে হাতিয়ার থাকে, ও সঙ্গে থাকতে তোমার অন্তত কোন ভয় নেই। মনে থাকবে তো কথাটা?'

'থাকবে মালেকান।'

'আমি আশা করব তো?'

'যদি বেঁচে থাকি তো, আসবই।'

'তোমার—তোমার নাম কি ভাই?'

মুহূর্তকয়েক ইতস্তত করল বাঁদী, তারপর বলল, 'আমি মেয়ে নই, আমার নাম দেলওয়ার হোসেন।'

কাশ্মীরী বাঈ স্থানকালপাত্র ভুলে দেলওয়ারের হাত দুটো ধরে বললেন, 'তুমি—তুমি আসবে তো বাচ্চা, আমাকে মিথ্যে স্তোক্ দিচ্ছ না তো? তাঁর দুটো কথা শুনব—এই আমার আশা, আর কিছু নয়।'

দু'চোখে জল ভরে এসেছিল কাশ্মীরী বাঈয়ের।

অসামান্যা সুন্দরী কাশ্মীরী বাঈ। আশ্চর্য সুন্দর তাঁর চোখ।

সে চোখে জল দেখলে বিচলিত হবারই কথা। দেলওয়ার তাঁর দুটি হাত নিজের কপালে ঠেকিয়ে বলল, 'নিশ্চয়ই আসব মালেকা, কেউ আমাকে রুখতে পারবে না। আমার মালিকের খবর আমি আপনাকে শুনিয়ে যাবোই। খোদার নাম ক'রে জবান দিয়ে যাচ্ছি, আমার কাছে তাঁর চেয়েও বড় যে—সেই মালিকের নাম ক'রে বলে যাচ্ছি!'

॥ ৬ ॥

আওরঙ্গজেব মনোযোগ দিয়ে শুনলেন সব কথা। জেরা ক'রে ক'রে যাচাই ক'রে নিলেন আর একবার।

শেষের কথাগুলোও শুনলেন। গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি।

ঈষৎ তিরস্কারের সুরেই বললেন, 'এই জন্যেই এ সব কাজে ছেলে-মানুষদের পাঠাতে নেই। অনেকগুলো অন্যায় ক'রে এসেছ তুমি। প্রথমত তোমার পরিচয় দেওয়া ঠিক হয় নি। কারও কাছেই বলবে না, এই কথাই বলা ছিল। মেয়েদের বিশ্বাস করতে নেই—ওরা আবেগের তুবড়ি এক একটা। তারপর আমার হুকুম ছাড়া এ ধরনের জবান দিয়ে আসা উচিত হয় নি, তুমি আমার কাজে গেছ—বলে আসা উচিত ছিল যে মালিক যদি হুকুম দেন তো আসব। ভাগ্যের সঙ্গে বার বার চালাকি করতে যাওয়া ঠিক নয়, ওতে খোদা নারাজ হন। তাছাড়া, বাঘের গুহা থেকে একবার নিরাপদে ফিরে এসেছ বলে সে বাঘের দাঁত-নখে ধার নেই এমন কথা বোঝায় না। বিপদকে তাচ্ছিল্য দেখায় আহাম্মকরা। আর সবচেয়ে বড় গুনাহ্—আল্লার নাম ক'রে কিরা খাওয়া। কখনও এ কাজ করবে না আর। এত তুচ্ছ কাজে আল্লার নাম নিতে নেই। পরমেশ্বরের নামের সঙ্গে আমার নাম যুক্ত ক'রে আরও বড় অন্যায় করেছ। আমি তাঁর বান্দার বান্দা, খাদেমের খাদেম। তিনি বাদশারও বাদশা। তাঁর বড় কেউ নেই—বলে দিয়েছ না।'

ঘাড় হেঁট ক'রে দাঁড়িয়ে রইল দেলওয়ার। তারও দুই চোখে জল ভরে এসেছিল, প্রাণ-পণে সেটা দমন করছিল, মালিক না দেখতে পান। মালিকের

অবশ্য সেদিকে চোখও ছিল না। তিনি ওকে আর একবার ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক ক'রে দিয়ে বিশ্রাম করতে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁর এখন চিন্তার শেষ নেই। অকূল সমুদ্রে যে ভাসছে তার অপরের মনোভাব নিয়ে মাথা ঘামানো চলে না।

দেলওয়ারকে বিদায় দিয়ে পাশের নিভৃত শয়ন কক্ষে এলেন। খাবাসকে আগেই সরিয়ে দিয়েছেন। এখন খানিকটা একা থাকতে হবে, একেবারে একা। নিজের সঙ্গে এখন একটু আলোচনা করা দরকার।

শোবার ঘরে এলেন, কিন্তু বিছানায় বসলেন না, পিছন দিকে দুই হাত বন্ধ ক'রে তাঁর অভ্যস্ত চিন্তার ভঙ্গীতে পায়চারি করতে লাগলেন। ঘর ছোট—কিন্তু একটি ছোট্ট বিছানা ছাড়া আর কিছুই নেই বলে কোন অসুবিধা হ'ল না। বিছানা আর পাশে একটা চৌকীতে রাখা আধার সুদ্ধ একখানা কোরাণ ও জপের মালা, মাথার কাছে কুলুঙ্গীতে এক সুরাই জল —এ ছাড়া এ ঘরে কিছুই নেই, মেঝেতে কার্পেট সুদ্ধ নেই একখানা। আরামের অভ্যাস ভাল না, তাতে পরিশ্রমের শক্তি কমে যায়, বুদ্ধিতে জড়তা আসে। পুরুষের জন্যে আরাম নয়—আওরঙ্গজেব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন।

অনেকক্ষণ ধরে এমনি নিঃশব্দে পায়চারি করলেন শাহ্‌জাদা। চিন্তার যেন কূল-কিনারা পাচ্ছেন না। তহ্‌খানার লোহার কপাটটা দেখে ইঁদুর কলের ইঙ্গিতটা বুঝেছিলেন বটে, কিন্তু তবু তখনও ঠিক ষোল আনা বিশ্বাস করতে পারেন নি, কতকটা সন্দেহের ওপরই অতখানি দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। যাচাই ক'রে নেবার সময় ছিল না বলেই কাজটা করতে হয়েছিল। এখন এ আবার কি শুনলেন। এ যে আরও অবিশ্বাস্য। বন্দী করাও অন্যায়—কিন্তু হত্যার ষড়যন্ত্র? এতটা কি সম্ভব? দারা এতটা ভাবতে পারবেন?

বিশ্বাস হয় না। এখনও হচ্ছে না। কিন্তু কাশ্মীরী বাঈই বা মিথ্যা বলবে কেন? এত গরজ ক'রে এতখানি মিথ্যা বলতে যাওয়ার তার দরকার কি ছিল? ওঁর মনের সামনে আসা? ওঁর কৃতজ্ঞতা অর্জন করা? ঠিক মনে হয় না তা। এতকাল চুপ ক'রে ছিল যে—আজ তার এমনি একটা এই নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে আসার কী এমন তাড়া পড়ল? এমন ভয়ঙ্কর আজগুবি—কিস্‌সা কাহানীর মতো বিচিত্র সংবাদ নিয়ে এত কাণ্ড ক'রে নিজের প্রাণ বিপন্ন করতে আসার কি এমন তাড়া পড়ল? এমন ভয়ঙ্কর কল্পনা ঐটুকু মেয়ের মাথাতে যাওয়াও খুব স্বাভাবিক নয়।

না, এ গরজ ভালবাসার। যে কোন কারণেই হোক, কাশ্মীরী বাঈ তাঁকে ভালবেসেছিল সেদিন, আজও হয়ত বাসে। এ গরজ সেই ভালবাসারই।

কিন্তু তাই বলে দারা এমনটা করবেন! দারা!

শ্রেষ্ঠ জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহানশার। পিতার প্রিয়তম পুত্র! পিতৃভক্ত, উদার, মহৎ দারা! কী বিশ্বাসই না করেন বাদশা তাঁকে!

দারা অকর্মণ্য অপদার্থ—এই কথাই জানতেন, কিন্তু শয়তান? অকর্মণ্য লোক এত বড় শয়তানীর কথা ভাবতে পারে?

হয়ত অকর্মণ্য বলেই পারে। এমন নির্বোধের মতো কাজ আর কে করতে যাবে। আরও মনে হ'ল—প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই—নিজের ধর্মেই আস্থা নেই দারার, তার কাছে আর এর চেয়ে বেশী কি আশা করা যায়! দারা নাকি দার্শনিক, বেদান্তবাদী। কাফের বলেন তাকে আওরঙ্গজেব, কিন্তু কাফেরদেরও একটা ধর্ম আছে, তারা তাতে বিশ্বাসী। দারা কোন ধর্মেই পুরো বিশ্বাসী নন। যে দার্শনিক তার কাছে মায়া মমতা, ঐহিক সম্পর্ক—এ সবের মূল্য কি? তিনি নাকি সুফী আর কাফের পণ্ডিতদের সঙ্গে এইসব আলোচনাই করেন। তাঁর মতে নাকি এই সৃষ্টি এই দুনিয়া—সবকিছুই মিথ্যা, মায়া। তাই যদি হয় তো বাবা ভাই এদের সম্বন্ধেই বা মাথাব্যথা থাকবে কেন?

কিন্তু এ সব তত্ত্বের কথা।

স্থূল কথা যেটা—সেটা কি শাহান্‌শাকে বিশ্বাস করানো যাবে? প্রমাণ কোথায়? দারার কোন দোষ নিজের চোখে দেখলেও বিশ্বাস করেন না বাদশা, এ তো ভিত্তিহীন প্রমাণহীন একটা অনুমানের কথা। আওরঙ্গজেবের নিজেরই যা বিশ্বাস হচ্ছে না—তা ঐ স্নেহান্ধ পিতাকে বিশ্বাস করাবেন কী ক'রে?

তা হ'লে?

একথা তুলতেই তো পারবেন না প্রথমত। কাশ্মীরী বাঈয়ের নাম করা যাবে না। যে এতটা করল তাকে বিপন্ন করতে পারবেন না শাহ্‌জাদা। যারা বলে নিজের স্বার্থের জন্য তৃতীয় শাহ্‌জাদা সব করতে পারেন—তারা ওঁকে সম্পূর্ণ চেনে না বলেই বলে। এতকাল শুধুই নিজের স্বার্থ তিনি দেখেন নি ভাইদের মতো। তিনিই শাহান্‌শার একমাত্র পুত্র—যিনি জ্ঞানমতো, বিবেকমতো পিতার নির্দেশ যথাসাধ্য পালন করেছেন, কর্তব্যে অবহেলা করেন নি। তার বদলে পুরস্কার পান নি কিছুই, বরং বারবার, দারা—এই দারারই চক্রান্তে তিরস্কার লাভ করেছেন। তবু আজও এই সাম্রাজ্যের, মুঘল রাজশক্তির বা বাদশার কোন ক্ষতি হয় তা কখনও করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনেও তিনি, যতদূর জানা আছে তাঁর, দীনিয়াৎ আর হাদিস লঙ্ঘন করেন নি। কোন ঐহিক লাভের আশাতেই না।

না, কাশ্মীরী বাঈয়ের ওপর এতখানি অবিচার তিনি করতে পারবেন না। 'কেউ একজন বলেছে' এমন কথাও বলা চলবে না। কে জানে, হয়ত সেই সূত্র ধরেই কাশ্মীরী বাঈয়ের যোগাযোগ খুঁজে বার করবে। আর বলেই বা লাভ হবে কি? প্রমাণ না দিতে পারলে এ অভিযোগ ক'রেও লাভ নেই, সবটাই তাঁর অপরাধী মনের কল্পনা বলে গণ্য হবে।

অথচ কোন একটা প্রতিকার না করলেও নয়। অবস্থা কঠিন হয়ে আসছে তাঁর। মাসোহারা সত্যিই বন্ধ করেছেন বাদশা, যে তারিখে খাজাঞ্চীখানা থেকে টাকা পাওয়া যায় সে তারিখে মুনীমকে পাঠিয়েছিলেন শাহ্‌জাদা, শূন্য হাতে ফিরে এসেছে। বিপুল খরচা তাঁর, শাহ্‌জাদাকে শাহ্‌জাদার মতোই থাকতে হয়। অকারণ বিস্তর ব্যয় হয় তাতে। আজ

হঠাৎ হাত-গুটোনোও সম্ভব নয়। এখনও কিছু টাকা হাতে আছে, কিন্তু এখানে থাকলে ছ'মাসের বেশী চলবে না। বাদশার অসন্তোষের কথা ইতি-মধ্যেই সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে, তার ফলে কোন মহাজনই তাঁর লোককে ধারে কোন মাল বেচতে চাইছে না। প্রত্যেকটি জিনিস নগদ টাকায় কিনতে হচ্ছে। রাজকর্মচারী ও ওমরাহের দল বিষাক্ত কুষ্ঠরোগীর মতো তাঁর সঙ্গ পরিহার ক'রে চলেছেন। তিনি উপবাস ক'রে মরছেন শুনলেও কেউ এক পয়সা দেবে না।

কেবল একজন ছাড়া।

আত্মীয়দের মধ্যে মাত্র একজনই এখনও তাঁকে ত্যাগ করে নি।

তাঁর ভগ্নী জাহান-আরা।

বিপদে না পড়লে আত্মীয় বন্ধুদের ঠিক চেনা যায় না—এই সত্যটাই এবার নতুন ক'রে উপলব্ধি করলেন শাহ্‌জাদা।

জাহান-আরা অসুস্থ, বলতে গেলে মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে এসেছেন, জীবনের আশঙ্কা গেলেও সুস্থ হয়ে কাজকর্ম দেখতে এখনও দীর্ঘকাল দেরি হবে—সম্পূর্ণ শয্যাশায়িনী, তবু তিনিই সকলের আগে শাহ্‌জাদার সঙ্কট অনুমান ক'রে উপযাচক হয়ে এক লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছেন। নিজের কর্মচারী দিয়ে নিজের টাকা—সেই সঙ্গে অতি বিনীত অনুরোধ জানিয়েছেন, ভাই যেন দয়া মনে না করেন, উপহার হিসাবেই গণ্য করেন।...যেন দয়া মনে করলেও শাহ্‌জাদার ফিরিয়ে দেবার ভরসা হ'ত!

পায়চারি করতে করতে সহসা থেমে গেলেন আওরঙ্গজেব।

অকস্মাৎ যেন চমক ভাঙল তাঁর।

এই তো—একটা পথ খোলা রয়েছে এখনও।

জাহান-আরাকে দিয়েই বলাবেন নাকি?...যদি কেউ পারে বাদশার কাছে কথাটা পাড়তে তো তিনিই পারবেন। বাদশা তাঁর বড়ছেলের থেকেও যদি কাউকে বেশী ভালবাসেন তো সে তাঁর এই বড় মেয়েটিকেই। এবারের এই দুর্ঘটনায় বাদশা যে পাগল হ'তে বসেছিলেন—এ তো সকলেই দেখেছে। মুঠো মুঠো বললে কম বলা হবে, হাজার হাজার টাকা দান করেছেন প্রত্যহ সাধু-ফকীর-ভিখারীদের—যদি তাদের মিলিত শুভেচ্ছায় মেয়ের জীবন ফিরে পান। সুতরাং দারার বিরুদ্ধে যদি কোন কথা বাদশা শোনেন তো একমাত্র জাহান-আরার মুখ থেকেই শুনতে পারেন।

কিন্তু জাহান-আরা কি বলবেন? আওরঙ্গজেবের মুখ আবার অন্ধকার হয়ে ওঠে। দারার প্রতি তাঁর পক্ষপাত কে না জানে! যে ভাগ্যবান তার সর্বদিকেই সুবিধা, পিতার প্রশ্রয় তো আছেই, আবার পিতা যাকে সর্বাধিক স্নেহ করেন সেই জাহান-আরাও দারাকে সব ভাইয়ের চেয়ে বেশী ভালবাসেন, আর সেটা দারার বিপুল একটা ভরসা ও আশ্রয়।

আওরঙ্গজেব আবারও অস্থির হয়ে পায়চারি শুরু করলেন।

জাহান-আরা দারাকে বেশী ভালবাসেন এও যেমন সত্য, তেমনি কোন কারণেই যে তিনি কোনদিন অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নি, সেও তো তেমনি সত্য। এটুকু আওরঙ্গজেবও মানতে বাধ্য; মিথ্যাচরণ বা মিথ্যাভাষণ— এসব দোষও জাহান-আরাকে কেউ দিতে পারবে না। কারও প্রতি কোন অন্যায় হয়েছে জানলে তিনি বাদশাকেও স্পষ্টাক্ষরে বলতে পিছ্পা হন না কোনদিন। তাঁর ন্যায়-অন্যায়ের বিচারও তাঁর নিজস্ব, যা কর্তব্য বলে জানেন তা থেকে ভ্রষ্ট হন না। তা নইলে, স্বয়ং বাদশা ও বড়ে শাহ্‌জাদার প্রতি অসম্মান দেখিয়ে আতিথ্যের অমর্যাদা ক'রে তাঁদের বিরাগভাজন হয়েছেন জেনেও, আওরঙ্গজেবকে অর্থ সাহায্য করতে সাহস করতেন না।

যা থাকে অদৃষ্টে, জাহান-আরাকেই ধরবেন তিনি। আবারও একটা জুয়াখেলার বাজী ধরতে যাচ্ছেন হয়ত, কিন্তু তাছাড়া তো আর কোন পথও খোলা নেই।

একটা সুবিধা আছে, ভগ্নীর এই আকস্মিক পুড়ে যাওয়ার কথা শুনে তিনি যে সুদূর দাক্ষিণাত্য থেকে প্রধানত তাঁকেই দেখতে এসেছিলেন, একথাটা জাহান-আরাও জানেন। আর সে কারণে মনে মনে খুশিও আছেন নিশ্চয়। অন্তত দেখা করতে যাওয়ার প্রস্তাবে আপত্তি করবেন না।

মন স্থির করার সঙ্গে সঙ্গে যেন অনেকটা সুস্থ বোধ করলেন শাহ্‌জাদা। তখনই এ ঘরে এসে ভগ্নীকে খৎ লিখতে বসলেন।

অনেক ভেবে গুছিয়ে একটা সংক্ষিপ্ত পত্রই লিখলেনঃ

'মাননীয়া ভগ্নী জাহান-আরার যদি আপত্তি বা অসুবিধা না থাকে তো তাঁর অনুগত ভাই আওরঙ্গজেব একবার কাল তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যেতে চান। আর হয়ত বেশী দিন তাঁর আগ্রায় থাকা সম্ভব হবে না, এখানের খরচ চালানোর মতো সামর্থ্য আর তাঁর নেই, ভগ্নীর সময়োচিত স্নেহের দান না পেলে এ কদিনও থাকতে পারতেন কিনা সন্দেহ—যাওয়ার আগে ভগ্নীর সঙ্গে একবার দেখা ক'রে যেতে না পারলে খুবই আপসোস থেকে যাবে তাঁর। কখন গেলে সুবিধা হ'তে পারে যদি দয়া ক'রে শাহ্‌জাদী সাহেবা জানিয়ে দেন তো তাঁর দীন ও অনুগত ভাই আওরঙ্গজেব বড়ই সুখী হবেন।'

জাহান-আরা চিঠিটা পেয়ে একটু হেসেছিলেন মনে মনে। এ চিঠি অনেকদিন ধরেই আশা করছেন তিনি। দেখা করার একটিই মাত্র অর্থ হয়— 'বাদশাকে বলে মিটিয়ে-দাও ব্যাপারটা।' এই অনুরোধ। আর সেই সঙ্গে আরও কিছু টাকাও চান বোধহয় ভাইসাহেব। অবস্থা যে রীতিমতো সঙ্গীন হয়ে উঠেছে তা চোখে না দেখেও কী আর জাহান-আরা বুঝতে পারছেন না!

হেসেছিলেন, তাই ব'লে সাগ্রহ এবং সাদর আমন্ত্রণ জানাতেও বিলম্ব করেন নি। এখনও হাকিম সাহেব তাঁকে চলাফেরা করার অনুমতি দেন নি, নইলে জাহান-আরাই যেতেন ভাইসাহেব আর ভাবীদের সঙ্গে দেখা

করতে। ভাই যদি দয়া ক'রে আসেন তো জাহান-আরার চেয়ে সুখী আর কেউ হবে না। তিনি যখনই আসতে চাইবেন সেইটেই সুসময়। বোনের কাছে ভাই আসবে তার আবার সময় কি?...

কিন্তু আওরঙ্গজেব এসে—জাহান-আরা যা ভেবে রেখেছিলেন—সে দুটি প্রসঙ্গের ধার দিয়েও গেলেন না।

মনেই হ'ল না যে শাহ্‌জাদা কোন মতলব নিয়ে এসেছেন।

স্বাভাবিকভাবেই কুশল-প্রশ্ন করলেন তিনি। ভগ্নী যে বড় কৃশ হয়ে পড়েছেন, এখনও তাঁর দেহে যথেষ্ট রক্ত ফিরে আসে নি—সেজন্য বারবার উদ্বেগ প্রকাশ করলেন। যে দুটি বাঁদী তাঁর সালোয়ারের আগুন নেভাতে গিয়ে নিজেরা পুড়ে গিয়েছিল—তাদের কুশল জানতে চাইলেন। তাদের কর্তব্যজ্ঞানের ভূয়সী প্রশংসা করলেন। সব শেষে ভগ্নীর কোন প্রিয় সাধন করা যদি তাঁর সাধ্যের মধ্যে থাকে তো ভগ্নী যেন নিঃসংকোচে তাঁকে আদেশ করেন—বারবার সে অনুরোধ জানাতে লাগলেন।

অর্থাৎ জাহান-আরার স্বাস্থ্যের প্রসঙ্গেই আলাপটা সীমাবদ্ধ রইল প্রধানত। তবে শাহ্‌জাদা কিছু নূতন কথাও বললেন। বললেন, 'তোমার এ দুর্ঘটনা খুবই আপসোসের ব্যাপার, তুমি যে কী পরিমাণ কষ্ট পেয়েছ তাও বুঝতে পারছি—সামান্য কোথাও তাপ লাগলে আমাদের সে জ্বালা অসহ্য মনে হয়, তোমার তো এতখানি পোড়া, অসহ্য যন্ত্রণাই পেয়েছ নিশ্চয়, তবে এ থেকে আমার একটা বড় শিক্ষাও লাভ হ'ল। বুঝলাম যে সব ঘটনারই ভালমন্দ দুটো দিক আছে—একেবারে খারাপ ঈশ্বরের রাজত্বে কোন কিছুই ঘটে না।'

'কিন্তু সেটা আমার বেলায় খাটছে কী ক'রে? আমি তো কষ্টই পেলুম, তবে বলতে পারো আমাকে উপলক্ষ ক'রে হাকিমদের জায়গীর হয়ে গেল, গরীব দুঃখীরা বিস্তর টাকা পেল।'

অবাক হয়েই প্রশ্ন করেন জাহান-আরা। তাঁর এই দুর্ঘটনায় তাঁর এ সৃষ্টিছাড়া ভাইটি আবার ভাল কি দেখতে পেল! তিনি যেভাবে পুড়েছিলেন তাতে বাঁচবারই তো আশা ছিল না। বেঁচে গেছেন সেটা পীরফকীরদের আশীর্বাদ কিন্তু প্রথম দুটো মাস যে অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করেছেন—তা যেন তাঁর অতি বড় শত্রুকেও না সইতে হয়!

আওরঙ্গজেব তাঁর বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে হেসে ফেললেন, 'দ্যাখো বহিন, পরমেশ্বর খোদা কখনই কাউকে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ দেন না। কষ্ট পেয়েছ ঠিকই—কিন্তু এ ঘটনা না ঘটলে—তোমার ভাইবোন, বাপজান, আত্মীয়স্বজন যে তোমাকে এতটা ভালবাসে তা কি এমনভাবে বুঝতে পারতে? এই অকৃত্রিম স্নেহ—দ্যাখো না কেন আমরা তিন ভাই তো তোমার বলতে গেলে হিন্দুস্তানের তিন প্রান্ত থেকে ছুটে এসেছি—এটা তো কোনদিন উপলব্ধিই করতে পারতে না! আমাদের বাপজান বাদশা সালামৎ শাহানশাহ্ তোমাকে বেশী পিয়ার করেন তা জানতে—কিন্তু ঠিক এতটা যে করেন তা কি তুমিই কোনদিন ভেবেছিলে? এই জানাটাই তো জীবনের একটা বড় লাভ

নয় কি ?'

চোখ ছলছলিয়ে এল জাহান-আরার। তিনি গাঢ়-কণ্ঠে বললেন, 'ঠিকই বলেছ ভাই, ঈশ্বরের যে এত অনুগ্রহ আমার ওপর—তোমরা যে আমাকে এত ভালোবাসো সবাই—তা এই সাংঘাতিক বিপদ না ঘটলে বোধহয় এমন ক'রে বুঝতে পারতুম না।'

'তবেই দ্যাখো।' কণ্ঠস্বরে কেমন যেন অস্বাভাবিক জোর দেন আওরঙগজেব, 'এই কথাই তো আমি বলি। কোন ঘটনাই এক দিক দিয়ে বিচার করতে নেই। যত খারাপ ঘটনাই ঘটুক না কেন, আমাদের মতো নির্বোধ গোলা লোকের দৃষ্টিতে তার মন্দ দিকটাই শুধু হয়ত চোখে পড়বে—কিন্তু বুদ্ধিমান, জ্ঞানবান লোকেরা কখনই শুধু একদিক দেখেন না, তাঁরা সমস্ত অসতের মধ্যে, মন্দের মধ্যেই করুণাময় খোদার কল্যাণ-হস্ত দেখতে পান। সেইখানেই যথার্থ জ্ঞান আর শিক্ষার পরিচয়। জ্ঞানী লোকেরা মনে রাখেন—যে ঈশ্বর রাত্রির অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আবার দিনের আলো দিয়েছেন। রাতের আঁধিয়ার দেখে কেউ যদি সেই-টেকেই দুনিয়ার নিয়ম ভাবে তো সে তারই বেকুবি—নয় কি ?'

এই বলে শাহ্জাদা আওরঙগজেব বিদায় নেবার ভূমিকা হিসেবেই বোধ হয় একেবারে উঠে দাঁড়ান।

জাহান-আরা মন দিয়ে শুনছিলেন কথাগুলো—আর এর গূঢ়ার্থটা ধরার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর এই ভাইটি এত বাজে কথা বলার লোক নন, বিনা কারণে এত কথা বলছেন না। সেই কারণটা কি প্রাণপণে সেইটেই আন্দাজ করার চেষ্টা করছিলেন। এখন একেবারে ওঁকে উঠে দাঁড়াতে দেখে বেশ একটু অবাকই হয়ে গেলেন। কথা কি এইতেই শেষ হয়ে গেল ?

'এখনই চললে ভাই সাহেব ?'

'হ্যাঁ উঠি এখন। তোমাকে বেশী বিরক্ত করা উচিত নয়। কথা কইতে তোমার এখনও রীতিমতো ক্লান্তি বোধ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এতক্ষণ ছিলুম—তাই হয়ত হাকিম সাহেবরা জানতে পারলে রাগ করবেন।'

তারপর চলে যেতে গিয়েও—যেন কী একটা মনে পড়ে যায় তাঁর, বলে ওঠেন, 'হ্যাঁ, ভাল কথা, শুনলাম তোমার এখানে নাকি খুব চুহার উপদ্রব হয়েছে। আমি একটা নতুন ধরনের চুহাকল পেয়েছি, বলো তো পাঠিয়ে দিই।'

জাহান-আরার বিস্ময়ের শেষ থাকে না, 'আমার এখানে চুহার উৎপাত হয়েছে— ? কৈ, আমি তো শুনি নি। তোমাকে কে বললে একথা ?'

'ঐ দ্যাখো, কে বললে তা কী আর মনে ক'রে রেখেছি! তবে নিশ্চয়ই কেউ বলেছে, নইলে আমি আর জানলুম কী ক'রে ?...যাক গে, কলটা তো আমার কাছে পড়েই আছে, পাঠিয়েই দিলাম না হয়। ক্ষতি কি ? তবে তুমি একটু দেখো কলটা। একেবারে নতুন ধরনে তৈরী।'

এত লঘু প্রসঙ্গ এবং এই ধরনের ভাষা আওরঙগজেবের পক্ষে একে-বারেই বেমানান। ব্যাপারটা কি, কী বলতে চান শাহ্জাদা ? জাহান-আরা

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আসল কথাটা বোঝবার চেষ্টা করছিলেন। এখন একটু তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, 'ইঁদুরকলের আবার নতুনত্ব! হাসালে তুমি ভাই সাহেব!'

'নতুনত্ব একটু আছে বলেই তো বলছি। বাজারে যা পাওয়া যায়, যা বাবুর্চিরা রসুই-ঘরে পাতে—এ তা নয়। আজব কল বানিয়েছে লোহার। তারে নয়—ইস্পাতে তৈরী কল, দরজাটাও ইস্পাতের, মজবুত আর ভারী কিন্তু অত ভারী দরজাও যখন বন্ধ হয়—একটুও আওয়াজ পাবে না। যে-গৃহস্থ পাতবে তার খোয়াব দেখার একটুকু ব্যাঘাত ঘটবে না। চুহারা ঠেলে বেরোবে সে উপায় তো নেই, ভেতরে তারা যতই কিচ্‌কিচ্‌ করুক, বাইরে তার এতটুকু শব্দ পৌঁছবে না। একটু হাওয়া বেরোবারই ফাঁক নেই, আওয়াজ বেরোবে কি ক'রে!'

'আচ্ছা— ? তাই নাকি?' সাগ্রহে প্রশ্ন করেন জাহান-আরা। এতক্ষণে যেন কোথায় একটা আলো দেখতে পান তিনি।

'শুধু কি তাই ?' আওরঙ্গজেব এত উৎসাহিত হ'য়ে ওঠেন, মনে হয় তিনিই বুঝি তৈরী করেছেন কলটা, যা-কিছু কৃতিত্ব তাঁরই, 'আরও আছে। এমনি বাজারের যা মামুলী কল, চুহাকে বার করে মারতে হয়, অনেক সময় পালিয়ে যায়—কিন্তু এতে তার দরকারই হবে না। জলে ডোবালেই একপাশের একটা জায়গায় লোহা সরে যায়—মানে কলটা যদি বাড়ি ধরো তো—এক ধারের ছাদ দেবে যায়—সেখান দিয়ে জল ঢুকে চুহাকে চুবিয়ে মারে, অথচ সে পথেও চুহার পালাবার পথ থাকে না।'

কখন ধীরে ধীরে কঠিন ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে জাহান-আরার মুখ, শাহ্‌জাদা হয়ত অত লক্ষ্য করেন নি। তাঁর বলা শেষ হ'লে জাহান-আরা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইলেন, তারপর ঈষৎ ক্লান্ত সুরে বললেন শুধু, 'আচ্ছা পাঠিয়ে দিও, দেখব।' আর কথাবার্তারও অবসর রইল না একেবারে চোখ বুজে ও-পাশ ফিরে শুলেন। সম্ভবত এতক্ষণ কথা বলার ক্লান্তিতে অবসন্ন বোধ করছেন।

শাহ্‌জাদাও আর বিরক্ত করলেন না, পা টিপে টিপে বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে।

॥ ৭ ॥

প্রথমটা বাদশা অত বুঝতে পারেন না। রুগ্ন মেয়ের খেয়াল ভেবে কতকটা স্তোক দেবার ছলে বলেন, 'আচ্ছা সে হবে৷ হবে। একটা কেন বেটি, তোমার খুশি হ'লে শহর দিল্লী আর আগ্রা মিলিয়ে দশখানা বাড়ি বানিয়ে দেব। শাহ্‌জাহানাবাদ তৈরী হচ্ছে—নতুন শহরে তোমার বাড়িটাই সবচেয়ে মশহুর হবে—দেখে নিও।'

জাহান-আরা হাসেন, 'আপনি ভাবেন আমি এখনও আপনার সেই খুকী মেয়েটি আছি, না আলমপনা ?'

'কেন, কেন, একথা কেন মা ? আর আলমপনাই বা কেন, তোমাকে শুধু বাপজান বলে ডাকতে বলে দিয়েছি না!'

বাদশা যেন ব্যস্ত হয়ে ওঠেন।

'সে তো ডাকিই। আর তাই ডেকে ডেকেই বোধ হয় আপনিও ভুলে গেছেন যে, আপনি তামাম হিন্দুস্তানের বাদশা। কথাটা মধ্যে মধ্যে ইয়াদ করানো ভাল।'

'কেন?' ভ্রূ-কুঁচকে তাকান বাদশা, 'বলো না কী বাদশাহী দেখাতে হবে। কার কটা শির নামিয়ে আনতে হবে গর্দান থেকে—একবার বলেই দ্যাখো না।'

'ঐ জন্যেই তো বলছিলাম আপনি এখনও খুকী ভাবেন আমাকে। খামকা মানুষের শিরই বা কেটে আনতে বলব কেন?...কেন, বাদশাহী জানবার কি আর অন্য কোন তরীকা নেই।'...

'বেশ তো, বলোই না কী হ'লে বাদশাহীটা তুমি বুঝতে পারবে।' সকৌতুকে মেয়ের দিকে চেয়ে হাসেন শাহানশাহ্।

'বলে কী করব বলুন। আপনার সে দিন আছে! একটা ছোট বাড়ি চাইলুম—তা আপনি দশটা বিশটা বাড়ি দেখিয়ে খুকী ভুলোচ্ছেন। একটাই দেবার সামর্থ্য নেই তো দশটা।'

'সামর্থ্য নেই!' যেন পৌরুষে ভীষণ আঘাত লেগেছে এমনি ভাব দেখান বাদশা, 'এত বড় কথা! বেশ বলো কী রকম বাড়ি চাও। আমার শাহ্‌জাহানাবাদের কিল্লা-ই-মুয়াল্লার* মতো একটা গোটা কিল্লা চাও? তুমি চাইলে তাও দিতে পারি!'

'আঃ, বাপজান, আপনার যত বয়স বাড়ছে আপনি যেন তত ছেলে-মানুষ হয়ে যাচ্ছেন। আমি কিল্লাও চাই না, গড়ও চাই না। চাই বড়ে ভাইয়া দারার মতো একটা ছোট্ট বাড়ি—দরিয়ার কিনারে। আপনি শুধু মেহেরবানী করে ইকতিদা খাঁকে একবার ডেকে পাঠান, তাহ'লেই হবে, বাকী যা করবার তা আমিই করব, আপনাকে ভাবতে হবে না।'

'তা ইকতিদা খাঁকেই বা কেন মা। তুমি বলো না ওর চেয়ে ঢের বড়ো আর ভাল সর্দার মিস্ত্রী আমার হাতে আছে, তাদেরই ডেকে পাঠাচ্ছি। দুনিয়ার সেরা মিস্ত্রী সব চুণে চুণে আনিয়েছি আমি—আমার মিস্ত্রীর ভাবনা! একটা বাড়ি করাতে কতক্ষণ লাগে।'

'না, বা'জান। ইকতিদা খাঁকেই আমার চাই।'

'তা বেশ তো, তাও হবে। তবে এখনই এত তাড়া কি। আর দু'দিন যাক না--'

'আপনি যদি কেবল ঐ ছেলেভুলোনোর মতো করেন বাবা, আমি কিন্তু আর আপনার সঙ্গে কথা কইব না, আপনাকে বা'জান বলেও ডাকব না আর।'

'এই দ্যাখো, রাগ করিস কেন বেটি, আমি তোর শরীরের কথা ভেবেই তো—। কী বিপদ! আচ্ছা, আমি এখনই ইকতিদা খাঁকে তলব ক'রে পাঠাচ্ছি। তা কি বলতে হবে?'

---

* লাল কিল্লার অনেকগুলি নাম ছিল--তার মধ্যে কিল্লা-ই-মুয়াল্লা অন্যতম।

'না বা'জান, যা বলবার তা আমিই বলব। সে এলে এইখানে একটা পর্দা টাঙিয়ে দিতে বলবেন, পর্দার ভেতর থেকে আমি কথা কইব।... আপনাকেও কিন্তু হাজির থাকতে হবে, তাহ'লে আর ইর্কাতদা বেশী চালাকী করতে সাহস করবে না।'

'ইস! আমাকেই বুঝি দুনিয়ার সবচেয়ে হুঁশিয়ার লোক ভেবেছিস্? ওরে আমার মতো বুদ্ধু লোক কম আছে আমার মুলুকে। তা হোক—। যা বলছিস তাই হবে! কিন্তু ব্যাপারটা কি বল্ দেখি। আমার যেন কেমন গোলমাল ঠেকছে কোথায় একটা—'

'তা ঠেকুক না! যা বলছি সেই রকম হুকুম দিন তো! গোলমাল যদি কিছু থাকে, সে কি আর আপনার কাছে চাপা থাকবে! নিন, আপনি এখনই লোক পাঠান!'

ঠোঁট ফুলিয়ে আবদারের ভঙ্গীতে শেষের কথাগুলো বলেন জাহান-আরা।

বাদশার মনে হয় সেই মুহূর্তে তাঁর সামনে সেই ছেলেবেলার ছোট্ট খুকীটিকেই দেখলেন। বিস্তর জরুরী কাজ থাকা সত্ত্বেও ঠোঁট ফুলিয়ে এসে দাঁড়াল, সব কাজ আর কাগজপত্র ফেলে যাকে কোলে তুলে নিতে হ'ত। আবদার ধরলে তাঁর এই মেয়েটিকে কোন দাই কি কোন বাদী ভোলাতে পারত না, একমাত্র বাদশা কোলে নিলেই শান্ত হ'ত।

তিনি তখনই ইর্কাতদা খাঁর কাছে লোক পাঠিয়ে দিলেন।

একে বাদশার সামনে ডাক পড়েছে, তায় পর্দার ওপাশে স্বয়ং জাহান-আরা শাহ্জাদী সাহেবা। ইর্কাতদা খাঁ তার পায়ে যদি একটু কমজোরী অনুভব করেন তো বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। আর কপালে ঘাম দেখা দেওয়াও এমন বিচিত্র কি, যা পচা গরম!

তবে বেশীক্ষণ উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকতে হ'ল না। বাদশা অভয় দিয়ে বললেন, 'আমি নয় খাঁ সাহেব, বেটি-ই ডেকে পাঠিয়েছে। শাহ্জাদী সাহেবার শখ হয়েছে—বড়ে শাহ্জাদার মতো একটা বাড়ি করাবে। এখনও তো চোখে দেখে নি, লেকিন্ আমাদের মুখে শুনেই খেয়াল হয়েছে—ঠিক অমনি একটা বাড়ি চাই ওর। পারবে তো বানাতে, দ্যাখো?'

শেষের দিকে ঈষৎ একটু চোখ টিপেই প্রশ্ন করেন শাহানশাহ্, তাঁর মুখ কৌতুকে উজ্জ্বল।

'বহুত শোখ সে!' ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ে খাঁ সাহেবের। এনে কোতল করার জন্যে ডাকা হয় নি তাহ'লে, বরং আরও কিছু মোটা আয়ের পথই সুগম করার জন্যে ডেকে আনা হয়েছে!... আসার আগে খাজা সাহেব সেলিম চিস্তির কবরে যে সিন্নি মেনেছিলেন পাঁচ সিক্কা টাকার—সেটা মনে মনে বাড়িয়ে পুরো এক মোহর ক'রে দিলেন ইর্কাতদা খাঁ সাহেব। বাবার অসীম দয়া—তা মানতেই হবে। ...মুখে বললেন, 'এর আর কথা কি,

বলেন তো আজই শুরু ক'রে দিই, লোকজন সব তৈয়ার, হুকুম হ'লে এক মাহিনায় বানিয়ে দেব।' তারপরই যেন একটু উৎকণ্ঠার সুরে বললেন, 'লেকিন্ জাহাঁপনা জমিনটা? সেটা একটু দেখে নেওয়া দরকার যে, নক্সা করার আগে।'

শাহানশাহ্ কোন জবাব দেবার আগেই পর্দার ওপার থেকে সুমধুর নারীকণ্ঠ ভেসে আসে, 'জমিন এখনও ঠিক হয় নি। তবে খোদার ফজলে আর শাহান্শার মেহেরবানীতে জমি পেতে দেরি হবে না। কিন্তু বাড়ি ঠিক ঐ রকম হবে তো?'

'আলবৎ। পাশাপাশি একটা একটা ক'রে মিলিয়ে নেবেন, ঐ নক্সা মাফিক ক'রে দেবো—ঠিকঠিক। এক বুরুল এদিক ওদিক হবে না। তবে, ওর চেয়েও ভাল নক্সা আমার তৈরী আছে, যদি বলেন তো এমন বানিয়ে দেব যে, বড়ে শাহ্জাদার বাড়ি খারিজ হয়ে যাবে এর কাছে।'

'না, অত ভাল চাই না আমার। ঠিক ঐ রকমই চাই।...আচ্ছা ভাইয়ার নয়া বাড়ির তহ্খানারই নাম শুনছি সবচেয়ে—আমার বাড়িতেও অমনি হবে তো?'

'জরুর। যদি ঠিক এক রকম না হয়, নিজের চোখ নিজে উপড়ে ফেলব আপনার সামনে।...ও নক্সা তো আমারই করা বড়ে বেগম সাহেবা। আর এও বলব, খাজা বাবার কুদরতে—এ মাথা থেকে যা বেরিয়েছে, তা আর কেউ ভাবতে পর্যন্ত পারত না। শওসাল কোসিস করলেও পারত না।'

'হ্যাঁ, শুনেছি খুব ভাল হয়েছে। কপাটটাই নাকি সবচেয়ে উম্দা হয়েছে ওর মধ্যে। লোহার দরজা বলে বোঝাই যায় না নাকি, আর অত বড় কপাট, তবু এতটুকু আওয়াজ হয় না বন্ধ করার সময়। অথচ নাকি খুব ভারী—ভারী আর পুরু!'

'নাকি! দিওয়ার যতটা মোটা আছে অতটাই হবে দরওয়াজাটাও। পাক্কা পাঁচ মণ ওজন পাল্লাটার। অথচ একটা আঙ্গুল দিয়ে চাপ দিন, বন্ধ হয়ে যাবে। কেউ টের পাবে না।'

'ঐ একটাই তো দরজা—না? গোটা মহলের।'

'জী। ইচ্ছে ক'রেই একটা করেছি। বেশী দরজা থাকলে বাইরের তাপ ঠেকানো যাবে না যে!'

'তা তো বটেই।...আচ্ছা, যদি কেউ হঠাৎ ভেতরে গিয়ে পড়ে, ধরুন অন্য লোক কেউ জানল না, চাবিও বাইরেই রয়ে গেল ধরুন—আর দরজাটা আপনিই বন্ধ হয়ে গেল—তাহ'লে সে বেরোবে কি ক'রে? ভেতর থেকে ডাকলে ওপরের লোক শুনতে পাবে? অত পুরু কপাট বলছেন—?'

'মুশকিল আছে শাহ্জাদী সাহেবা। ওপর থেকে কেন, বাইরে থেকেই শোনা যাবে না। পুরু লোহার দরজা, মানে গরম ঠেকানোর জন্যে তো করা হয়েছে—আওয়াজ বাইরে থেকে পাওয়া শক্ত।...তা এমনি তো লোকজন নোকর-বাঁদী থাকবেই—কতক্ষণ আর আটকা থাকবে বলুন, যখন কেউ খুলবে তখনই তো বেরিয়ে আসবে সে। দু'চার ঘণ্টা কেন, একদিন দু-

দিনেও তো আর কেউ মরে যাবে না—'

'না, ধরুন শীতকালে তো আর কেউ তহ্‌খানায় যায় না, সে সময় যদি কোন ছোট ছেলেপুলে গিয়ে পড়ে ভেতরে, ভেতর থেকে খুলতে পারবে না তো?'

'চাবি না থাকলে পারবে না। কেউ শুনতেও পাবে না। তবে শীতকালে তো তহ্‌খানায় চাবি দেওয়াই থাকে। জাড়ার দিনে কে আর শখ ক'রে গিয়ে ঐ হিমঘরে ঢোকে বলুন।'

'তা ঠিক।...আচ্ছা খাঁ সাহেব, কাঠের চেয়ে তো লোহা তাড়াতাড়ি তাতে, তবে কাঠের না ক'রে লোহার কপাট বানালেন কেন?'

'তা বলতে পারবো না—ওটা শাহ্‌জাদার মর্জি। তবে সবটা তো ঢালাই লোহা নয়, তিন পুরু মোটা চাদরে তৈরী, প্রত্যেকটা লোহার শিকে আটকানো—প্রত্যেকটা থেকে প্রত্যেকটার মধ্যে খানিকটা ফাঁক আছে, তাই বাইরেটা তাতলেও ভেতরে সে তাত পৌঁছয় না খুব জলদি।'

খানিকটা চুপ ক'রে থাকেন শাহ্‌জাদী। তারপর বলেন, 'আচ্ছা, শুনেছি তহ্‌খানা খানিকটা দরিয়ার মধ্যে পর্যন্ত গেছে—সেটা কি ঠিক?'

'জী, বেগমসাহেবা। সেইখানেই তো আমার এলেমদারী। হাজার হাজার মণ জল মাথার ওপর—তিন পাশে, তার মধ্যে ঘর করা—একি সহজ কথা! আর কারও হিম্মতে কুলোত না, আপনাদের এই বান্দা ছাড়া।'

'তা যদি কোন দিন কোন দেওয়াল ধ্বসে পড়ে, অতটা চাপ তো? যারা ভেতরে আছে—ঘুমিয়েই থাকবে আশা করা যায়—তাদের কি দশা হবে?'

'কোন দেওয়াল ভাঙবে না। চাই কি আপনি বাইরে থেকে কামান চালিয়ে দেখুন না। আপনারা ইচ্ছে না করলে এক ফোঁটা জলও ভেতরে ঢুকবে না।'

'ইচ্ছে করলে ঢুকতে পারে—না কি? সে আবার কী রকম?'

খুবই সহজ কণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে যান শাহ্‌জাদী সাহেবা, অলস কৌতূহলের সুরে। বড়লোকেরা এই ধরনের কথা-বার্তাতেই অভ্যস্ত, ইর্কাতদা খাঁও তা জানেন, কোনই কাজ হবে না জেনে—কিছুই দরকার নেই, শুধু কথা বলার সুখে কথা বলে যাওয়া। তিনিও উৎসাহের সঙ্গে জবাব দেন, 'হ্যাঁ, সে ব্যবস্থা একটা আছে। নদীর দিকে, ছাদ ঘেঁষে একটা চোরা দরজা আছে। সেও অমনি ভারী লোহার দরজা, যা মালিক ইচ্ছে করলে বাইরে থেকে একটা চাকা ঘুরিয়ে খুলে দিতে পারেন আর তাহ'লে আধ ঘড়ির মধ্যে পুরো মহলটা জলে ভরে যাবে।'

'কেন, এ রকম করার মানে?' এতক্ষণ চুপ ক'রে নীরব শ্রোতা হিসেবে বসে ছিলেন বাদশা, এখন অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন ক'রে ওঠেন, 'এর মানে কি? এ তো রীতিমতো সব্বনেশে ব্যাপার।'

বাদশা বিষম উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন, তা বুঝতে দেরি হয় না শাহ্‌জাদীর। বাদশার কপালে বড় বড় ফোঁটায় ঘাম দেখা দিয়েছে, দুজন দাসী বড় বড় পাখায় হাওয়া করা সত্ত্বেও।

সে কণ্ঠস্বরে ইর্কাতিদা খাঁ ভয় পেয়ে যান। উত্তর দিতে গিয়ে গলা কেঁপে যায় তাঁর, 'শোভানাল্লা! কথাটা—কথাটা আমারই বলা উচিত হয় নি হয়ত। এ-সব গোপন তথ্য কাউকে না জানানোই ভাল। বড়ে শাহ্‌জাদা জানতে পারলে হয়ত কয়েদ করবেন আমাকে কিম্বা শূলে দেবেন। তাঁর বাড়ির কোথায় কি করিয়েছেন সেটা অপর কাউকে বলতে বার বার বারণ ক'রে দিয়েছেন।...আমি, ভেবেছিলাম আলাহজরত যে আপনারা সব জানেন।...আমায়, আমায় মাফ করবেন আলমপনা, আমি আপনাদের কুত্তার কুত্তা, বড়ে শাহ্‌জাদা যা হুকুম করেছেন—'

'আপনার কোন ভয় নেই ইর্কাতিদা খাঁ সাহেব, আপনি কিছু অন্যায় করেন নি।' পর্দার ওপারের কণ্ঠ তেমনি মধুর, তেমনি অবিচলিত, তেমনি আশ্বাসভরা, 'শুধু এমন কেন করা হয়েছে—উদ্দেশ্যটা কি সেইটে বুঝতে পারছেন না বলেই শাহানশাহ্‌' বিস্ময় বোধ করছেন একটু!'

ইর্কাতিদা খাঁ আশ্বস্ত হন কিছুটা। বলেন, 'মতলবটা বড়ে শাহ্‌জাদারই। তবে এমনি কথার কথা হিসেবেই একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, ও-রকম কিছু হয় কি না। আমি তারপর আর কোন আলোচনা করি নি ওঁর সঙ্গে, একেবারে তৈরী ক'রে তাক লাগিয়ে দেব বলে। অবশ্য করেছি যে—কেমন হয়েছে তা কোন দিন পরখ ক'রে দেখাও হয় নি। শাহ্‌জাদাও বলেছিলেন তাই। এটা যে ঠিক ঠিক কাজ করবে তা বুঝব কি ক'রে? আমি বলেছিলুম, বলেন তো ক'রে দেখিয়ে দিই। তবে এই জল আবার বার ক'রে মহল সাফ করতে বিস্তর মেহনৎ করতে হবে আপনাকে। আর খোলা যতটা সহজ, বন্ধ করা তত সহজ হবে না। অতখানি জলের চাপ তো।'

'তা ওতে কি ফয়দাটা হবে, সেটা তো এখনও জানলুম না।'

পর্দার ওপার থেকে পুনশ্চ প্রশ্ন হয়।

'ফয়দা? এমনি কিছুই না। তবে যদি এমন কোন দুশমনকে কোন দিন হাতে পান, যাকে চুপি চুপি সরানো দরকার—তাকে তহ্‌খানায় বন্ধ ক'রে নিঃশব্দে ঐ চোরা দরওয়াজাটা খুলে দিলেই হবে। কেউ টেরও পাবে না। পেলেও, অনায়াসে বলা চলবে একদিকের দেওয়াল ভেঙে জল ভেতরে ঢুকেছে—'

'খুব ভাল। তবে আমার এত সব হাঙ্গামার দরকার নেই খাঁ সাহেব। এসব কায়দা বাদ দিয়ে মোটামুটি কতটা খরচ পড়তে পারে আমাকে একটা হিসেব দেবেন।'

'যে আজ্ঞে, নিশ্চয়ই দেব। সাত দিনের মধ্যেই আমি নক্সা আর হিসেব তৈরী ক'রে দিয়ে যাব।'

ইর্কাতিদা খাঁ পর্দাকে একটা অভিবাদন জানিয়ে বাদশাকে কুর্নিশ করতে করতে বেরিয়ে গেলেন।

পর্দা সরানো হলে দাসীদের ঘর থেকে চলে যেতে ইঙ্গিত করে জাহান-আরা বাদশার মুখের দিকে চাইলেন।

বিবর্ণ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে বাদশার মুখ। কপালে বড় বড় ঘামের ফোঁটা জমেছে। জেব থেকে রুমাল বার করার কথা মনে পড়ে নি, বোধ হয় আস্তিনেই ঘাম মুছেছেন বার কতক, আস্তিনটা ভিজে উঠেছে। মাটির দিকে চেয়ে পাথরের মতো স্থির হয়ে বসে আছেন শাহানশাহ্।

জাহান-আরার মনটা উদ্বেল হয়ে ওঠে ওঁর অবস্থা দেখে। আস্তে ডাকেন, 'বা'জান!'

যেন কান্নার মতো করুণ কণ্ঠে বলে ওঠেন বাদশা, তামাম হিন্দুস্তানের দণ্ড-মুণ্ডের মালিক শাহানশাহ্ শাহজাহান, 'কিন্তু মা উপায় ছিল বলেই যে ইচ্ছাও ছিল—এটা তো প্রমাণ হয় নি।'

'প্রমাণ হ'লে আর এসব আলোচনার সময় পেতেন না, জাহাঁপনা।' জাহান-আরাও একটুখানি বিষণ্ণ হাসি হাসেন।

'না মা। অবিচার আমি করব না। এ আমি এখনও বিশ্বাস করি না। কেন করবে সে. কিসের অভাব তার? এ সবই তো তার হবে একদিন। তাই না?' একটু থেমে যেন সমর্থন খোঁজেন জাহান-আরার কাছে, উত্তর না পেয়ে আবারও বলেন, 'আর করলেই বা দোষ দেব কাকে? আমি কোন্ অধিকারে তার বিচার করব? আমি আমার বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছি. তিনিও তাঁর বাবার জীবদ্দশাতেই সিংহাসন নিতে গিয়েছিলেন। এমন কি আকবরশাও, তাঁর পিতৃতুল্য মন্ত্রী, যিনি ঘোর দুর্দিনে বুকের রক্ত দিয়ে বালক বাদশার সিংহাসন রক্ষা করেছিলেন—তাঁকে এক কথায়, বিনা কারণে সরিয়ে মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বাবরশাহী রক্তের ধারাই এই। যদি—যদিইএ-রকম একটা লোভ তার মনে এসে থাকে তো খুব একটা দোষ দিতে পারি না।...তুই, তুইও তাকে ক্ষমা কর মা। প্রমাণ তো কিছু পাস নি সঠিকমতো।'

'না, তা পাই নি। আর তা যখন পাই নি তখন ক্ষমার কথাই বা তুলছেন কেন বাবা।...কিন্তু আওরঙ্গজেবের ওপরই কি অবিচার করা ঠিক হচ্ছে?'

'না, না। তাও করব না। যদি সে জেনেই ও কাজ ক'রে থাকে তো তার ওটা অবাধ্যতা বলে গণ্য করা উচিত হবে না। বরং আমাদেরই কৃতজ্ঞ থাকা উচিত তার কাছে।'

'জেনেই করেছে বাবা, নইলে আমি জানলুম কী ক'রে?'

'ও, তুই জেনেছিলি, না মা! তাই ইকতিদাকে—।...আমি এবার বুড়ো হচ্ছি রে।' কেমন যেন খাপছাড়াভাবে হাসেন বাদশা, কান্নার থেকেও করুণ দেখায় সে হাসি। তার পর বলেন, 'তুই হুকুম দে মা, কী দিবি। আমি পাঞ্জা লাগিয়ে দেওয়াচ্ছি। না না, অবিচার কারুর ওপরই না হয়। বেচারা অকারণে কত লাঞ্ছনা সহ্য করল।...টাকা, খেলাৎ, ঘোড়া—যা পাঠাতে চাস পাঠা। কৃপণতা করার দরকার নেই। দরবারে আসার অনুমতি-নামাও অমনি একটা লিখিয়ে দিস্। আরও জানিয়ে দে যে, তার মনসবদারী সুবাদারী সব তাকে আবার ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল। যা কিছু করতে হয় তুই-ই কর মা. তোকেই

খোদা বাদশাহী করার মতো বুদ্ধি বিবেচনা সবচেয়ে বেশী দিয়েছেন, আমার সব ছেলেমেয়ের মধ্যে।'

'আচ্ছা, আচ্ছা। হয়েছে। আপনি চুপ করুন তো বাজান। সক্কাল-বেলাই বসে বসে মেয়ের গুণগান করতে হবে না।'

সস্নেহে ধমক দিয়ে ওঠেন জাহান-আরা।

॥ ৮ ॥

ইর্কাতদা খাঁ বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে কাঁপতে শাহ্জাদা দারার খাস দপ্তরে এসে দাঁড়ালেন। তলব এমনই জরুরী, ভাষা এমনই কঠিন যে, খাজা বাবার নাম ক'রে বেরিয়েও স্বস্তি পান নি। এখানে এসেও যা দেখলেন তাতেও আশ্বস্ত হবার মতো একটুকু ভরসা খুঁজে পেলেন না। বজ্রগর্ভ মেঘের মতো অন্ধকার মুখে একা বসে আছেন বড়ে শাহ্জাদা, তাঁর স্বভাব-সুন্দর প্রশান্ত মুখ যেন ভয়ঙ্কর একটা চাপা ক্রোধে বিকৃত, দৃষ্টি কঠিন ও জিঘাংসু। সেদিকে চেয়ে ইর্কাতদা খাঁর মনে হ'ল একটা কোন জীবিত প্রাণীকে বাঘের মতো নিজের নখে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে ফেলতে না পারলে এ উষ্মার শান্তি ঘটবে না তাঁর।

ইর্কাতদা আসতেই, কোন কুশল প্রশ্ন বা কোনরকম ভূমিকা না ক'রেই প্রশ্ন করলেন শাহ্জাদা দারা, 'তুমি কাল আমার ভগ্নী শাহ্জাদী সাহেবার কাছে গিয়েছিলে?'

গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল ইর্কাতদা খাঁর। কোনরকমে শুধু ঘাড় নাড়লেন।

'কেন? আমার নামে চুকলি খেতে?'

'না জনাব-ই-আলী। এ আপনি কি হুকুম করছেন! খোদা জানেন, আমি নিজে যাই নি। খোদ বাদশা-সলামৎ লোক পাঠিয়ে আমাকে তলব করেছিলেন। বহুত ইসাদী আছে হুজুর। জিজ্ঞাসা করলেই তারা বলবে।'

'কিন্তু তুমি সেখানে আমার কথা কি বলেছ তাই শুনি!'

হিংস্র কণ্ঠে প্রশ্ন করেন শাহ্জাদা।

কণ্ঠস্বর যতই শাণিত আর তীক্ষ্ন হোক, গলা চড়াতে সাহস করছিলেন না শাহ্জাদা। তাতেই একটু ভরসা পেলেন ইর্কাতদা। বলেন, 'আমাকে কিছুই বলতে হয় নি জনাব-ই-মবারক, শাহ্জাদী সাহেবা নিজেই আপনার বাড়ির কথা তুললেন। ঠিক ঐ রকম একটা বাড়ি তাঁকে ক'রে দিতে হবে ঐ রকম দরিয়ার কিনারে! কিন্তু সেটা তত কাজের কথা বলে মনে হ'ল না, বাড়ির অন্য কথা ছেড়ে ঘুরে ফিরে কেবল তহ্খানার কথাই জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন বারবার।'

'তহ্খানার কী কথা', প্রাণপণ চেষ্টা সত্ত্বেও শাহ্জাদার গলা যেন কাঁপা কাঁপা আর বিকৃত শোনাল।

'তিনি সবই জানেন দেখলাম', ও পক্ষের ভয় দেখে ইর্কাতদা খাঁ আরও

একটু ভরসা পেয়েছেন, 'আসলে কথাগুলো একবার শাহানশার সামনে ঝালিয়ে নিলেন বই আর কিছু নয়।...দরজাটা কত পুরু, আর কত ভারী—একবার বন্ধ হয়ে গেলে ভেতর থেকে ধাক্কাধাক্কি, হাজার ডাকাডাকি করলেও বাইরে থেকে শোনা যায় কিনা—এই সব। দেখলাম তিনি চোরা দরওয়াজাটার কথাও জানেন। ওটা কেন করা হয়েছে, সেইটেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন বারবার।...শাহানশাহ্ সুদ্ধ—'

'তুমি কি বললে!' যেন আর্তনাদের মতো শোনাল শাহ্‌জাদার গলাটা, 'আমি যে ওর বিন্দুবিসর্গও জানতুম না, সেটা বলেছ তাঁদের?'

'নিশ্চয়ই বলেছি।' অর্ধসত্য বলার সময় কণ্ঠস্বরে যতটা জোর দিতে হয় ততটাই দেন ইকতিদা, 'বলেছি বৈকি সে কথা। বলেছি যে শাহ্‌জাদাকে একেবারে তাক লাগিয়ে দেব বলে ঘুণাক্ষরেও জানাই নি তাঁকে।'

কেমন একরকম অসহায় আর করুণ কণ্ঠে বলেন শাহ্‌জাদা, 'আমি—আমি তো সত্যিই কিছুই জানতুম না ইকতিদা, তুমিই তো এটা করলে।'

'আমি তা বলেছি শাহ্‌জাদীকে—বিশ্বাস করুন। স্বয়ং শাহানশাহ তো সেখানে বসেছিলেন—'

'তিনি শুনে কি বললেন?'

'তিনি একটা কথাও বলেন নি। চুপ ক'রে শুনেই গেলেন। আর এতে বলবারই বা কি আছে?'

দারা আর কিছু না বলে অস্থির হয়ে উঠে দাঁড়ান একবার, আবার ধপ্ ক'রে বসে পড়েন।

'কেন জনাব-ই-আলী, শাহানশাহ্ কি কিছু বলেছেন আপনাকে? কোন সোবে করেছেন?'

'না না, সোবে করবেন কেন? সোবে আবার কিসের? এ-সব কি বলছ ইকতিদা খাঁ, তোমার আস্পর্ধা তো কম না!'

অকস্মাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠেন শাহ্‌জাদা দারা।

সন্দেহ কেউ করেছেন কিনা, করলেও ঠিক কতটা করেছেন—সেইটেই যে বুঝতে পারছেন না তিনি। কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাঁকে কেউই ডেকে পাঠায় নি, কোন কৈফিয়ৎও চায় নি। কাল বিকালবেলা যখন জাহান-আরাকে দেখতে যান তখনও কিছু জানতে পারেন নি। সন্ধ্যার পর কিল্লায় গিয়ে যখন শুনলেন বাদশার তবিয়ৎ ভাল নেই, তিনি শুতে গেছেন, তখনও অত কিছু ভাবেন নি। এমন আজকাল প্রায়ই হয়, শাহানশার এমন মাথা ধরে বিকেলের দিকে যে—একেবারে মাথা তুলতে পারেন না। সুতরাং এ বিপদের আভাসমাত্র পান নি কোথাও। একেবারে বাড়িতে ফিরে শুনেছেন কথাটা। শোনাবার জন্যেই বিবর্ণ পাংশুমুখে তাঁর নিজস্ব পার্ষদের দল বসে অপেক্ষা করছিল। শুনলেন বাদশা নাকি দু-তিন উট বোঝাই দিয়ে শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবকে ভেট পাঠিয়েছেন, টাকা মোহর খিলাৎ রেশমী কাপড়ের থান—দামী সাজসুদ্ধ দশটা ঘোড়া আর সেই সঙ্গে মনসবদারী যে তাঁকে ফিরিয়ে দেওয়া হ'ল তার হুকুমনামা এবং দরবারে হাজির হবার আমন্ত্রণ পত্র।

প্রত্যেকটিতেই বাদশার নিজের দস্তখৎ আর পাঞ্জার ছাপ। ফলে আজ তৃতীয় শাহ্‌জাদার বাড়িতে আমোদের হুল্লোড় পড়ে গেছে; গোটা বাড়িটা আলো দিয়ে ফুল দিয়ে সাজানো হয়েছে, দরগায় দরগায় সিন্নি চড়ানো হচ্ছে, ফকিরদের ডেকে দুহাত বোঝাই ক'রে ফল আর মিষ্টি দেওয়া হচ্ছে। খোদ শাহ্‌জাদা ছুটেছেন নিজামউদ্দীনে নিজে হাতে ফুল আর আগরবাতি চড়াতে পীরসাহেবের কবরে।...

আর, এই প্রসঙ্গে ঐ পার্ষদেরই একজনের মুখে শুনেছিলেন, কাল সকালে ভগ্নী জাহান-আরার ওখানে ইকতিদা খাঁর ডাক পড়ার কথা। তারপর অবশ্য দুই আর দুইয়ে চার মিলিয়ে পেতে দেরি হয় নি। চুকলি খেয়েছে কেউ, নিশ্চয়ই চুকলি খেয়েছে। আর এক্ষেত্রে যে চুকলি খাওয়া যায়, যে অভিযোগ আনা যায়—সে যে সাংঘাতিক। তার ফলাফল ভাবতে গেলেই হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসে যে!

কাল সারারাত দু চোখের পাতা এক করতে পারেন নি বড়ে শাহ্‌জাদা। এক টুকরো কোন খাদ্যও মুখে তুলতে পারেন নি। চরম সর্বনাশের মুখে দাঁড়িয়ে কার আর পানভোজনে রুচি থাকে! এখনও কেউ অভিযোগ আনে নি, এখনও ডাক পড়ে নি বাদশার কাছে—কিন্তু পড়লে যে আর কিছু বলবার নেই, কী ক'রে প্রমাণ করবেন যে, তাঁর কোন অসদুদ্দেশ্য ছিল না। তার চেয়েও বিপদ এই নীরবতা, এইটেই যে অস্থির ক'রে তুলেছে তাঁকে—এই অনিশ্চয়তা। অথচ নিজে থেকে কিছু গিয়ে অনুক্ত অনুচ্চারিত অভি-যোগের জবাব দেওয়া যায় না। সে তো অপরাধ স্বীকারেরই সামিল।

এই সবই ভেবেছেন কাল সারারাত, সারারাত পায়চারি করেছেন একা একা। শুধু যখন খুব পিপাসা বোধ করেছেন, বুক অবধি শুকিয়ে উঠেছে, তখন একটু ক'রে দ্রাক্ষারসজাত সুরা পান করেছেন। তাতে শরীর এবং মস্তিষ্ক দুই-ই অধিকতর উত্তপ্ত হয়েছে শুধু, চিন্তার কোন সুসার হয় নি, তন্দ্রাও নামে নি চোখে।...

মনটা বহুদূর চলে গিয়েছিল। খেয়াল হ'ল ইকতিদা খাঁ এখনও দাঁড়িয়ে আছে চোখের সামনে এবং সম্ভবত তাঁর দুশ্চিন্তাটা অনুমান ক'রে নিয়ে মনে মনে উপভোগ করছে। সঙ্গে সঙ্গে সর্বাঙ্গে যেন বিষ ছড়িয়ে দিল কে। এ লোকটাকে এখনই নিজে হাতে কেটে ফেলতে পারলে, নিদেন পক্ষে কয়েদ করতে পারলেও কতকটা শান্তি হ'ত তাঁর—কিন্তু তাতে তাঁর ওপর সন্দেহটা বেড়েই যাবে সকলের, সেই ভেবেই কিছু করতে পারছেন না।

অতিকষ্টে সে জিঘাংসা দমন ক'রে রূঢ় কণ্ঠে শুধু বললেন, 'আচ্ছা, তুমি এখন যেতে পারো। তবে শহরের বাইরে যেও না কোথাও—আমাকে না জানিয়ে; বাড়িতে নজরবন্দীর মতো থাকবে। যদি আমার কোন বিপদ হয় তোমার ঐ বাড়ি করার জন্যে, তা হ'লে তোমাকেও আমি ছেড়ে দেব না!'

ইকতিদা খাঁ অকারণেই সেলাম করেন একটা কিন্তু যাওয়ার কোন লক্ষণ দেখান না। বরং বারকতক হাত কচলে কাতর স্বরে বলেন, 'একটা কথা

বলব বান্দা-নওয়াজ ?'

'কি ?' তেমনি রূঢ় কণ্ঠে বলেন বড়ে শাহ্‌জাদা, 'তোমার আবার কী বলার আছে ?'

'আপনার এই বাড়ি থেকে কেউ চুকলি খেয়েছে ?'

'চুকলি খাবার লোকের অভাব নেই ইকতিদা খাঁ, তা আমি জানি, আমার সর্বনাশ হয়ে যদি দুটো টাকাও বেশী মুনাফা হয় তাহ'লে তুমিই কি চুকলি খেতে পিছ-পা হবে ?'

'আমি তো আছিই বড়ে শাহ্‌জাদা, আমার মতো লোককে পায়ে টিপে মারতে তো বেশী সময় লাগবে না! কিন্তু আমার কথাটা একেবারে ঠেলবেন না, দয়া ক'রে একটু শুনুন। কালরাত্রেই আমি খবরটা পেয়েছি। করিমবক্স লোহার—যার কারখানায় আমি ইস্পাত-লোহার কাজ-টাজ করাই—তার মুখে শুনলাম আপনার হারেমের এক বাঁদী তার কোন মিস্ত্রীকে দিয়ে একটি চুহাকল তৈরী করিয়েছে।'

'বেশ তো, তাতে কি ?'

'বলছি খুদাওয়ান্দ—সবটা শুনুন দয়া ক'রে। সে চুহাকল নাকি বাজারের সাধারণ চুহাকল নয়। ছোট্ট কল কিন্তু ফরমাশ হয়েছিল কলটা আগাগোড়া ইস্পাতের চাদরে তৈরী করতে হবে, তার দিয়ে নয়। দরওয়াজাও হবে লোহারই, আর দরওয়াজাও একটা হবে না, ওপর দিকে একটা বাড়তি দরজা থাকবে, চাবি ঘুরিয়ে খুলতে হবে সেটা, আর ভেতর দিকেই খুলবে শুধু। বেশ পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল, যেমন বলা হচ্ছে তেমনিই চাই। মিস্ত্রীও গরজ বুঝে এক আশরফি হেঁকেছিল। তাতেই রাজী হয়ে তৈরী করানো হয়েছে। এই আজব ফরমায়েশ বলেই মিস্ত্রী গল্প করেছে করিমবক্সের কাছে, তার কাছ থেকে আমি শুনলুম।'

তবুও বুঝতে পারেন না দারা, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন ইকতিদার মুখের দিকে। সুরাপানের মাত্রা বুঝি বেশীই হয়ে গেছে—মনে মনে ভাবেন বড়ে শাহ্‌জাদা।

আরও একটু ইতস্ততঃ ক'রে মাথা চুলকে ইকতিদা বলেন, 'গুস্তাকী মাফ করতে হুকুম হয় গরীব-পরোয়র—আমাকে নিজের জান বাঁচানোর জন্যেই এত খোঁজ খবর করতে হয়েছে।—আমার বাবুর্চির ফুফেরা বহিন হ'ল মহামান্যা বড়ে শাহ্‌জাদীর বাঁদী। আমি বাবুর্চিকে পাঠিয়ে কালরাত্রেই খবর নিয়েছি—শাহ্‌জাদা মানে আপনার ভাই যখন পরশু গিয়েছিলেন তাঁর বহিনজীকে দেখতে, তখন এমনি একটা চুহাকলের কথা গল্প ক'রে এসেছিলেন, শাহ্‌জাদীকে পাঠিয়ে দেবেন বলেছিলেন দেখবার জন্যে। তাই শুনতে শুনতেই নাকি শাহ্‌জাদীর মুখ গম্ভীর হয়ে যায়, শাহানশাকে বলে আমাকে ডাকতে পাঠান।'

'তা সে বাঁদী জানল কি ক'রে ?' প্রশ্নটা কি শাহ্‌জাদাই করছেন ? তিনি নিজের গলা যেন নিজেই চিনতে পারেন না। যেন খুব দূর থেকে ক্ষীণস্বরে আর কে কথা কইছে।

'আজ্ঞে, ও বাঁদী, মানে আমার বাবুর্চির ফুফেরা বহিন, ও আড়াল থেকে নাকি শুনেছিল সব। কোন মন্দ মতলব ছিল না জনাব-ই-আলী, শাহ্‌জাদারা ভাইবোনে কেমনভাবে কথা বলেন তাই শোনবার জন্যেই নাকি দাঁড়িয়ে ছিল।...আমাকে বিশ্বাস ক'রে বলেছে খুদাওয়ান্দ, কথাটা জানা-জানি হ'লে কিন্তু ওদের কারও শির থাকবে না!' শেষের কথাগুলো খুব মিনতির সঙ্গেই বলেন ইকতিদা।

দারা হাসেন এবার। তাঁর বিবর্ণ মুখে হাসিটা হাসির উপহাস বলেই মনে হয়। তিনি বার দুই রুমালটা খোঁজবার বৃথা চেষ্টা ক'রে টুপিটা খুলেই কপালের ঘাম মোছেন, তারপর সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বলেন, 'শির শেষ পর্যন্ত কার থাকে আর যায় তাই দ্যাখো ইকতিদা খাঁ। হয়ত তোমার আমার কারুরই থাকবে না। কিন্তু ওদের শির ঠিক ওদের গর্দানে থেকে যাবে, আর এমনি ক'রে মনিবের নিমক খেয়ে তার দোরে আড়ি পাতবে—আরও বহুদিন। তা তুমি তো বিস্তর খবর রাখো দেখছি, একদিনে যোগাড়ও করেছ ঢের, বাদশা শাহ্‌জাদাদের গুপ্তচর আছে, খবর যোগাড় করার জন্যে তন্‌খা-করা লোকও আছে—কিন্তু বানিয়া ব্যবসাদারদের ওসব না থেকেও দেখি তারা আমাদের থেকে ঢের বেশী ওয়াকিবহাল। তা আমার হারেমের সে জেনানাটি কে—সে খবরটা দিতে পারো?'

'আমাদের খবর যে প্রাণের দায়ে যোগাড় করতে হয় আলিজা, যে তন্‌খার জন্যে খবর আনে সে আমাদের সঙ্গে পেরে উঠবে কেন! তিস্‌রে শাহ্‌জাদার বাড়ি খিলাৎ আর মোহর পেঁীছবার খবর কি আর আমিই পাই নি! তারপর থেকে সারারাত ছুটোছুটি করেছি এইসব খোঁজ নিতে। যে বাঁদী গিয়েছিল তার নাম বলে নি। তবে এদেশের মেয়ে নয় সে, বয়স হয়েছে তার, মদ্দাটে গোছের চেহারা, কথায় কথায় চটে যায়। মিস্ত্রীর সোবে হয় সে কেরেস্তান, অন্ততঃ কেরেস্তান ছিল কোনকালে। ওর সঙ্গে গল্প করতে করতে দুটো কাঠি জোড়া ক'রে কেরেস্তানদের দোকাঠির মতো ক'রে মাথায় ঠেকিয়েছিল একবার! এর বেশী আর বলতে পারে নি সে।'

'আচ্ছা তুমি যাও।' বলেন কিন্তু ইকতিদা খাঁ চলে গেল কিনা তাও আর লক্ষ্য করেন না শাহ্‌জাদা দারা, ফরাসের ওপর তাকিয়াটায় ঠেস দিয়ে মূর্ছিতের মতো এলিয়ে পড়েন।

॥ ৯ ॥

এ সন্দেহ যে শাহ্‌জাদা দারার সর্বনাশেরও বেশী। এ জানার আগে যদি শাহানশার হুকুমে তাঁর শির যেত তাহলেও বোধ হয় এত কষ্ট হ'ত না। সত্যি সত্যিই বুকে যেন একটা দৈহিক আঘাত পেয়েছেন—এমনি একটা যন্ত্রণা অনুভব করেন।

তহ্‌খানার ঐ ওপরের দরজাটার কথা ইকতিদা ও মিস্ত্রীরা ছাড়া আর দুটি মাত্র প্রাণী জানে—তাঁর দুই বেগম। একেবারে জ্যেষ্ঠা ও সর্বকনিষ্ঠা,

যাকে বাঁদী থেকে বেগম করেছেন তিনি।

সব চেয়ে যেটা দুঃসহ বোধ হচ্ছে—এ সন্দেহটা যে এইমাত্র, ইকতিদার এ কথায় হয়েছে তা নয়—তার আগেও মনে এসেছে তাঁর—শুধু, এতক্ষণ পর্যন্ত কিছুতেই সে সংশয়কে প্রশ্রয় দেন নি, জোর ক'রে যেন দু-হাত দিয়ে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছেন।

খোঁজ-খবর তিনিও কিছু কিছু নিয়েছেন বৈকি।

বুলন্দশহর থেকে ফিরে যখন শুনেছেন যে শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের এক বেগম অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন বলে তিনি তাঁর জায়েদের কাছে বিভিন্ন ভেট পাঠিয়েছেন—তখনই তাঁর মনে নানারকম কুটিল সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। অনেক সম্ভব অসম্ভব শয়তানীর কথা ভেবেছেন তখনই—ঠিক কোনটাকে ধরা-ছোঁওয়ার আওতায় পান নি। কিন্তু যার চাকরি গেছে, মাসোহারা বন্ধ হয়েছে, দরবারে যার প্রবেশ নিষিদ্ধ—তার স্ত্রী এত তুচ্ছ কারণে উপঢৌকন বিলোবে এটাও বিশ্বাস করা কঠিন, অন্ততঃ দারার পক্ষে। আর কেউ না চিনুক তিনি বিলক্ষণ চেনেন তাঁর এই তৃতীয় ভ্রাতাকে। অত্যন্ত ধূর্ত এবং অত্যন্ত হিসাবী। বহুদূর পর্যন্ত না ভেবে কোন কাজ করে না সে। তাছাড়া মিতব্যয়ী—কৃপণ বলাই উচিত। বিনা স্বার্থে বা প্রয়োজনে অকারণ টাকা খরচ করা তার পক্ষে একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ। মতলব একটা নিশ্চয়ই আছে, শুধু সেইটে কি—ভেবে পাচ্ছিলেন না।

কিন্তু ভাবছিলেন ক্রমাগতই। এ রহস্যের মূল আবিষ্কার না করা পর্যন্ত স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এটা ঠিক যে আওরঙ্গজেবকে কিছু একটা করতেই হবে, এবং করতে হবে দ্রুত। কোণঠাসা জন্তুর মতো অবস্থা তার, সে যদি আক্রমণ ক'রে বেরিয়ে আসতে না পারে তো মৃত্যু অবধারিত। আর পড়ে মার খাবার লোক সে নয়। সেই আক্রমণটা কোন্ দিক দিয়ে আসবে, এই উপহার বিতরণটাই সে আক্রমণের সূচনা বা অংশ কি না এই দুর্ভাবনায় ঘুম হচ্ছিল না তাঁর। অবশেষে কাল, নিজের আসন্ন সর্বনাশের তীরে দাঁড়িয়ে, নিচের অতলস্পর্শী অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কোথায় যেন একটু আলো দেখতে পেয়েছিলেন তিনি। আক্রমণ নয়—প্রস্তুতিই হবে নিশ্চল। আসলে ভেট দিতে আসার নাম ক'রে খবর সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য ছিল। খবর নেওয়া কিম্বা দেওয়া—কে জানে! হয়ত কোন অশুভ যোগাযোগ আছে এবাড়িতে কোথাও। কিন্তু সে যোগসূত্রটা কি? কে? এ খবর নেওয়া বা দেওয়ার লক্ষ্য যে তিনিই—সে বিষয়ে দারার সন্দেহ মাত্র ছিল না, অপর ভাইদের বাড়ি ভেট পাঠানো হ'ল আসল লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য গোপন করা, মনোযোগটা ঘুরিয়ে দেওয়া। ওটা ছদ্ম আবরণ মাত্র।

যত ভেবেছেন ততই এই সম্ভাবনাটা বেশী বিশ্বাস্য বলে মনে হয়েছে। আর ততই মাথা গরম হয়ে গেছে, সন্দেহের পীড়নে অস্থির হয়ে উঠেছেন। শেষে গভীর রাত্রেই জাবেদ আলিকে ডাকিয়ে পাঠিয়েছেন। এই ঘরে নিভৃতে জেরা করেছেন তাকে। একে একে নিজে সূত্র যুগিয়ে সে দিনের সন্ধ্যার ঘটনা তাকে মনে করতে বাধ্য করিয়েছেন।

নবাব বাঈয়ের বাঁদী যখন মহলে মহলে ঘোরে সে সঙ্গে ছিল কি না? প্রথমটা জাবেদ নিশ্চিন্ত হয়ে জানিয়েছিল যে সে তো ছিলই, অন্য এক পরিচারিকাও ছিল মুসম্মৎ বলে। আরও কেউ কেউ ছিল। সমস্ত সময়ই সঙ্গে ছিল তারা। কিন্তু অত সহজে দারা নিশ্চিন্ত হ'তে পারেন নি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে এবং ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জেরা করতেই আসল তথ্যটা প্রকাশ পেয়েছিল। সব ঘরেই ওরা সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিল কেবল কাশ্মীরী বাঈয়ের ঘর ছাড়া। অতটা দরকার বোঝে নি আর। তখন আর একটিই মাত্র ডালা বাকী, কী আছে ডালায় তাও দেখা হয়ে গেছে—তাই আর অত গরজ ছিল না কারও। জাবেদ আলিরও কোন সন্দেহ হয় নি বাঁদীর ব্যবহার দেখে। সে নিজে বেগমসাহেবার দরজা পর্যন্ত পেঁ‌ৗছে দিয়ে চলে গিয়েছিল, বাঁদী কোন কথাই বলে নি। তাছাড়া বেগমসাহেবার খাস বাঁদী জহিরণ ছিল, সে-ই নিয়ে গেছে ভেতরে। আর—দারার রক্তবর্ণ চোখের দিকে চেয়ে তাড়াতাড়ি যোগ করে জাবেদ আলি, 'সে বাঁদী বেশীক্ষণ ছিলও না, অর্ধদণ্ডকালও বোধ করি হবে না, তার মধ্যেই বেরিয়ে এসেছে মহল থেকে।...'

রাগ হবারই কথা, অসহ্য ক্রোধই বোধ করেছিলেন বড়ে শাহ্‌জাদা, কিন্তু তখন আর এ নিয়ে চেঁচামেচি করার শক্তি বা রুচি কোনটাই ছিল না। বুড়ো হয়ে গেছে জাবেদ আলি এই সংসারে, তাঁকেও এতটুকু বয়স থেকে দেখছে—তাকে আর এখন কর্তব্যের ওপর বক্তৃতা দেওয়া যায় না, তিরস্কার তো করাই যায় না। শুধু একটু তিক্ত হাসি হেসে বলেছিলেন, 'আধ দণ্ড সময় বড় কম নয় জাবেদ আলি, তারও ঢের কম সময়ে এক গোছা খৎ পেঁ‌ৗছে দেওয়া যায়, আরও এক গোছা নিয়ে যাওয়া যায়। শুনেছি পানিপথের লড়াইয়ে হিমু যদি আর আধ দণ্ড টিকে থাকতে পারতেন তাহলে বৈরাম খাঁকে আর জিততে হ'ত না, মুঘলদের শাহী তখৎ নিয়ে এসব বখেরা কিছুই হ'ত না। তোমার তো এইখানেই জীবন কাটল জাবেদ আলি, মাটিতে যাওয়ার সময় হ'তে চলল প্রায়, তোমার এ ভুল করা উচিত হয় নি।'

'কিন্তু কাশ্মীরীবাঈ বেগমসাহেবা বলেই—', তিরস্কৃত জাবেদ প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে কী বলতে গিয়েছিল, দারা মাঝ পথেই থামিয়ে দিয়েছিলেন, 'আচ্ছা তুমি এখন যাও' বলে বিদায়ও ক'রে দিয়েছিলেন তাকে।

থামিয়ে দিয়েছিলেন তার কারণ কথাটা তাঁর একটা গোপন অথচ গভীর ক্ষতের জায়গাতেই আঘাত করেছিল।

কাশ্মীরী বাঈ বেগম সকল সন্দেহের ঊর্ধ্বে এটা তিনিও শুনতে চান, বিশ্বাস করতে চান। কাশ্মীরী বাঈ তাঁর নবতমা, সেজন্য একটু বেশী মোহ থাকবে তাঁর—এটা স্বাভাবিক। কাশ্মীরী বাঈয়ের অসাধারণ রূপ, অল্প বয়স—এগুলোও সে স্বাভাবিক কারণের অনুষঙ্গী। কিন্তু আজ কদিন ধরেই একটা আকারহীন সন্দেহ—ঠিক সন্দেহ বললেও ভুল বলা হবে হয়ত—একটা সামান্য তথ্য কাঁটার মতো খচ খচ করছে। এই কদিন আগেরই ঘটনা। এক চিত্রকর তাঁদের কয় ভাই, বাদশা, তাঁর পিতা জাহাঙ্গীর শাহ্ ও পিতামহ আকবর শার ছবি এঁকে এনেছিল—উদ্দেশ্য বিক্রী করবে। জাবেদ আলি

তাকে বাইরে বসিয়ে ছবিগুলো এনেছিল শাহ্জাদাকে দেখাতে। দারা তখন কাশ্মীরী বাঈয়ের মহলে ছিলেন, দুজনে এক সঙ্গেই দেখছিলেন ছবিগুলো। খুব যে একটা পছন্দ হয়েছিল তা নয়—তবু আশা ক'রে তাঁর কাছে এসেছে, কিছু কেনা কর্তব্যবোধেই তিনি পিতা ও পিতামহের দুখানি পট কিনেছিলেন। তারপর এমনি অলসভাবে প্রশ্ন করেছিলেন, 'তুমি কিছু রাখতে চাও ছবি, এর মধ্যে থেকে?' কিছু ভেবে বলেন নি, তবু মনে হয়েছিল যে কাশ্মীরী বাঈ হয়ত তাঁর ছবিখানা রাখতে চাইবে। কিন্তু বেগম ঠোঁট উল্টে তাচ্ছিল্যের ভঙ্গী ক'রে বলেছিলেন, 'এ কিচ্ছু আঁকতে জানে না, একটা ছবিও আসল চেহারার কাছ দিয়ে যায় নি।'

'কেন, আমার ছবি আমার চেহারার সঙ্গে মিলছে না?' রহস্যচ্ছলে বলেছিলেন শাহ্জাদা, 'আমার চেহারা কি এর চেয়েও খারাপ?'

'না, ঢের ভাল। আপনার চেহারার কিছুই আনতে পারে নি।' বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই বলেছিলেন বেগমসাহেবা, 'বিশেষ ক'রে এই তিসরে শাহ্জাদার ছবিটাই দেখুন না, এই কি তাঁর ছবি হয়েছে! তাঁর অমন সুন্দর চেহারার কিছুই আসে নি এতে!'

'তুমি আবার তিসরে শাহ্জাদাকে দেখলে কোথায়? এত ভাল ক'রে?' সামান্য ঈর্ষা বোধ করেছিলেন কি না তা আর মনে পড়ে না, তবে কৌতূহলটাই প্রবল হয়েছিল তখন।

'বাঃ, তা দেখবো না কেন! পথে ঘাটে দরবারে। এই তো সেদিনও এখানে এসেছিলেন।'

'তা বটে। তবে আমার সেজ ভাইয়ের চেহারা এত খুবসুরৎ একথা তোমার আগে আর কারও মুখে শুনি নি। আমাদের বংশে সকলেই অবশ্য মোটামুটি ভাল দেখতে—তবে আমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে সবাই বলে আমার আর শাহ্জাদা মুরাদের চেহারাই বেশী সুন্দর!'

'ছোটে শাহ্জাদা! বলবেন না, কুস্তিগীর পালোয়ানের মতো এতখানি লম্বা চওড়া হলেই কি আর সুন্দর হয়। যে পুরুষের মুখে বুদ্ধির ছাপ নেই, চোখে গভীরতা নেই, সে আবার সুন্দর কি?'

জাবেদ আলি ছবিগুলোর তাগাদা করতে প্রসঙ্গটা সেইখানেই চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু আজ, সেই প্রায়-ভুলে-যাওয়া অলস কথোপকথনের ইতিহাসটা, বুকের মধ্যকার ক্ষতটায় নতুন জ্বালার সৃষ্টি করল।

ইর্কাতিদা খাঁ বিদায় নেবার পর বহুক্ষণ ঐ ভাবে মূর্ছিতের মতো পড়ে রইলেন শাহ্জাদা। ঘুমিয়ে আছেন কি মূর্ছা গিয়েছেন তা বোঝা কঠিন, এমনই স্থিরভাবে চোখ বুজে শুয়েছিলেন। ও'র খাবাস গোসল করার জন্য জল তৈরী ক'রে ডাকতে এসে ফিরে গেল দুবার।

শেষে প্রায় চার দণ্ড এইভাবে পড়ে থাকার পর উঠে বসলেন আবার। কিন্তু তখনই স্নান করতে গেলেন না, আরও এক চুমুক সুরা পান ক'রে জাবেদ আলিকেই ডেকে পাঠালেন আবার।...

জাবেদ এসে দাঁড়াতে তিনিই কাছে এগিয়ে গেলেন। খুব নিম্ন কণ্ঠে প্রায় চুপি চুপি প্রশ্ন করলেন, 'জাবেদ, আতাউল্লা শহরে আছে কি না—জানো?'

'কোন্ আতাউল্লা জনাব?'

'যে বাঁদী বিক্রী করে?'

'ও, কাশ্মীরীবাঈকে যার কাছ থেকে কিনেছিলেন? হ্যাঁ, সে এই তো কদিন হ'ল এসেছে।'

চাবুকের মতো মুখের ওপর এসে আঘাত করল কথাটা। মুহূর্তের জন্য চোখ বুজে মুখটা বিকৃত ক'রে যেন সত্যিকারের একটা দৈহিক আঘাত সামলে নিলেন শাহ্জাদা। কিন্তু তার পর যখন কথা কইলেন তখন কণ্ঠ-স্বরে সে আঘাতের চিহ্নও পাওয়া গেল না। সহজ ভাবেই প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কি ক'রে জানলে সে এসেছে?'

'ওর বোন গওহর বিবি যে দুবেলা হাঁটাহাঁটি করছে—কিছু বাঁদী বেচে দিতে পারি কি না আমরা, কিম্বা আমরাই কিনব কি না এই খোঁজে। খুব নাকি ভাল মাল্ এনেছে, নাচ গান জানা, দেখতেও খুবসুরৎ, তার দাম উঠছে না!'

দারা একটুখানি ইতস্ততঃ করলেন, তারপর বললেন, 'আজ সন্ধ্যেবেলা একবার তাকে ডেকে আনতে হবে জাবেদ আলি। লোক পাঠিয়ে নয়, তুমি নিজে গিয়ে নিয়ে আসবে। কেউ না টের পায়, খুব সাবধান। নৌকোয় আনবে, দরিয়ার দিক দিয়ে—একেবারে তহ্খানায় নিয়ে যাবে। আমি সেখানে থাকব, একাই থাকব। তুমি বাইরে থেকে পাহারা দেবে, কেউ না কোন কারণে গিয়ে পড়ে।...প্রাসাদের কোন লোক—তুমি ছাড়া টের পেলে চলবে না।'

জাবেদ আলি নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। বুঝেছে সে। এ ধরণের কাজ আজ নতুন নয় তার। এমন বহু রহস্যই তার মাথায় জমা আছে, তার সঙ্গে মাটিতে চলে যাবে।

দারাও যেন এতক্ষণে কিছুটা নিশ্চিন্ত হলেন। সংশয় ঘুচল বলে নয়—মনটা স্থির করতে পেরেছেন বলে, রহস্য সমাধানের ঠিক রাস্তা খুঁজে পেয়েছেন বলে।

সেই দিনই গভীর রাত্রে আবার জাবেদ আলির ডাক পড়ল, শাহ্জাদা দারার খাস কামরায়।

উদ্‌ভ্রান্তের মতো ঘরে পায়চারি করছেন দারা শুকোহ্। মাথায় কোন আচ্ছাদন নেই, চুলগুলো এলোমেলো উশ্‌কো খুশ্‌কো। দেখে মনে হয় নিজে হাতে টেনে ছেঁড়বার চেষ্টা করেছেন নিজের চুল। মুখখানা এক দুঃসহ ক্রোধে বিকৃত—ওষ্ঠপ্রান্তে বাবরশাহী বংশের বৈশিষ্ট্য—নিষ্ঠুর বঙ্কিমতা, এটা দারার মুখে এর আগে কখনও দেখা যায় নি—স্বভাব-প্রশান্ত আর প্রসন্ন মুখ তাঁর। এখন চোখ দুটো কোটরগত, রক্তবর্ণ। দৃষ্টিতে পৈশাচিক জিঘাংসা।

দারার এ চেহারা একেবারেই নূতন।

দেখে মনে হয়েছিল এখনই যেন ফেটে পড়বেন শাহ্‌জাদা।

কিন্তু কথা কইলেন যখন, তখন তাঁর অস্বাভাবিক শান্ত কণ্ঠস্বরেই বরং চমকে উঠল জাবেদ আলি।

সে ঘরে ঢোকা মাত্র পায়চারি থামিয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়ালেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কাশ্মীরী বাঈয়ের বাঁদী জহিরন রাত্রে অন্য তাতারী বাঁদীদের সঙ্গে পাহারা দেয়?'

'দেয় আলিজা। কিন্তু সে মহলের মধ্যে, বাইরে ওর ভাই পাহারা দেয়। সপ্তাহে দুদিন তার পালা।'

'হুঁ, ওকে কিছু বলবার দরকার নেই, তাতারী বাঁদী আর হাবসী খোজাদের মধ্যে যে কজন তোমার খুব বিশ্বাসী, মানে যাদের বিশ্বস্ততার প্রমাণ পেয়েছ এর আগে—মনে রেখো যা বলছি তা যদি পাঁচ কান হয় তাহলে বুড়ো কি পুরনো লোক বলে রেয়াৎ করব না, তাদের সঙ্গে তোমাকেও জ্যান্ত পুঁতে ফেলব আমি—তুমি আর তারা পালা ক'রে দিনরাত কাশ্মীরী বাঈয়ের মহলে নজর রাখবে, সামনে দাঁড়িয়ে পাহারা নয়, শুধুই লক্ষ্য রাখবে। কে ঢুকছে কে বেরোচ্ছে—ঘড়ি ঘড়ি খবর চাই আমার। কোন বাইরের লোক এলে, যে কোন ছুতোতেই আসুক—তখনই আমাকে খবর দেবে। আর সেই সঙ্গে জহিরনের ভাই আর জহিরনকেও চোখে চোখে রাখবে সর্বদা। কিছু বলবে না, কোন কাজে বাধা দেবে না, চোখে চোখে যে আছে তাও জানতে না পারে। রাত্রে পাহারা দিতেও নিষেধ করবে না। শুধু লক্ষ্য রাখবে, এই পর্যন্ত। যদি দ্যাখো কোন বাইরের লোক কাউকে নিয়ে আসছে তাও বাধা দিও না, এমন কি যদি বেগম সাহেবার ঘরে নিয়ে যায় তাহ'লেও না। শুধু আমাকে তৎক্ষণাৎ খবর দেবে। আজ থেকে আমি এই ঘরেই থাকব, রাত্রেও শোব। দরকার বুঝলেই দিনে হোক রাতে হোক আমাকে খবর দেবে!...বুঝেছ? ঠিক ঠিক ইয়াদ থাকে যেন।'

জাবেদ আলি ঘাড় নেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দারা ইশারায় দাঁড় করালেন।

'আর শোন, ফিরিঙ্গীদের কাছ থেকে সেই যে তিনটে কুকুর কেনা হয়েছিল—সেগুলো বেঁচে আছে এখনও?'

'আছে বৈকি। ভালই আছে।'

'ওদের নৌকরকে বলো—আজ থেকে যেন ওদের আধপেটার বেশি খেতে না দেয়। খুব রোগা হয়ে যাচ্ছে দেখলে আমাকে জানাবে, তখন আবার খাবার বাড়িয়ে দেব।'

॥ ১০ ॥

শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব তাঁর চিঠিপত্রের মধ্যে এমনই ডুবে ছিলেন যে, দেলওয়ার বহুক্ষণ থেকে এসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আছে তা জেনেও মুখ তুলে তাকাবার ফুরসুৎ পান নি। অবশ্য খুব প্রয়োজনও বোধ করেন নি। এমন

প্রায়ই এসে দাঁড়িয়ে থাকে সে, যদি মালিক তাঁর ব্যক্তিগত সেবার কোন ফরমাশ করেন এই আশায়। একমাত্র দেলওয়ারেরই এ ঘরে বিনা এত্তেলায় বিনা আওয়াজে আসবার অধিকার আছে। শাহ্‌জাদার খাবাসেরও তা নেই। তাকেও এ ঘরে ঢোকবার আগে ঈষৎ শব্দ ক'রে ঢুকতে হয়। শাহ্‌জাদার এই রকমই নির্দেশ।

অনেকক্ষণ পরে হাতের চিঠিটা শেষ ক'রে মুখ তুলে তাকালেন আওরঙ্গজেব। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখেই বুঝলেন যে এখন তাঁর হুকুমের আশায় আসে নি. ওরই কোন আর্জি আছে। একটু হেসে স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কী রে, কি চাই ?'

একটু ঢোঁক গিলে বার-দুই মাথা চুলকে দেলওয়ার বলল, 'আজ মঙ্গলবার আলিজা, আজ যাব একবার ? অনেকদিন হয়ে গেল, তিনি আমার আশায় আছেন।'

গম্ভীর হয়ে গেলেন আওরঙ্গজেব। বললেন, 'তোকে তো একবার বলে দিয়েছি দেলওয়ার যে এখন ও চেষ্টা করিস নি। এক কথা বার বার বলা আমার নিয়ম নয়। যাকে তা বলতে হয়—তাকে আমি কাছে রাখি না। দুশমনকে খোঁচা দেওয়া হয়েছে, তাকে আহত ক'রে আমরা অক্ষত দেহে থেকে গিয়েছি—এতে তার মরীয়া হবারই কথা। কি করেছে না করেছে তা জানি না। কতটা কি খবর পেয়েছে তাও বুঝছি না। আমি যতদূর খবর পেয়েছি, এমনি যেমন চলছিল তেমনি চলছে। সেইটেই খারাপ লাগছে আমার। এই ক'দিনে বড়ে শাহ্‌জাদার নাকি এমন চেহারা হয়েছে যে চেনা যাচ্ছে না। শাহানশাহ্‌ তাঁকে কিছুই বলেন নি, সম্ভবত ভগ্নী জাহানআরাও না, হয়ত তাঁরা ঠিক বিশ্বাসও করেন নি—কিন্তু কিছু বলছেন না বলেই দারার আরও মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে, এ অবস্থা আমি জানি, আমারই ভাই —তার মনের অবস্থা বেশ বুঝতে পারছি। ল্যাজে পা দেওয়া সাপের মতোই ফণা তুলে বসে আছে। সুযোগ পেলেই ছোবল মারবে।'

শেষের কথাগুলো কতকটা আপন মনেই বললেন, স্বগতোক্তির মতো।

'কিন্তু আমি যে খোদার নাম ক'রে, আপনার নাম ক'রে জবান দিয়ে এসেছি তাঁকে !'

'বেশ তো, আয়ু তো তোমার ফুরিয়ে যায় নি। জবান পুরো করার জন্যে সারা জিন্দিগীই তো পড়ে আছে। খোদা কিছু আমাদের মতো বেওয়াকিফ নন, তিনি সবই দেখছেন। যদিই ঘটনাচক্রে ওয়াদা পুরো করতে না পারো তাও তিনি মাফ করবেন। তিনি চেষ্টাটাই দেখেন মনের ইচ্ছা তাঁর কাছে গোপন থাকে না।'

হঠাৎ যেন দেলওয়ারের দুচোখে জল ভরে আসে। সে ওঁর পালঙ্কের সামনে হাঁটু গেড়ে বসে বলে, 'বেগম সাহেবা আপনাকে তাঁর জীবনের চেয়েও ভালবাসেন খুদাওয়ান্দ্‌, আপনার খবরের জন্য মরে যাচ্ছেন তিনি।'

'সেটা তাঁর অন্যায়।' বেশ একটু কঠিন কণ্ঠেই বলেন শাহ্‌জাদা, 'তিনি এখন আমার আত্মীয়া, গুরুজন। আমার জন্যে তাঁর এত চিন্তা করা উচিত

নয়।’

বলতে বলতেই বোধ হয় মনে পড়ে যায় সে বেগম সাহেবা তাঁর কথা এত চিন্তা না করলে তাঁর বা তাদের অবস্থা কি হ’ত। তাই সঙ্গে সঙ্গেই সামনে নিয়ে ঈষৎ কোমল কণ্ঠে আবার বলেন, ‘বেশ তো, এতকাল যদি আমার খবর না পেয়ে কেটে থাকে তাঁর—আরও দু-চার মাস বেশ কাটবে।... তুই এখন যা এখান থেকে, পালা। আমার হাতে অনেক জরুরী কাজ আছে।’

অগত্যা দেলওয়ারকে অভিবাদন করতে করতে বেরিয়ে আসতে হয়। কিন্তু সারাদিনই মন-মরা হয়ে থাকে সে। তিন সপ্তাহ কেটে গেছে, হয়ত আরও কয়েকদিন বেশিই হবে, জবান্ রাখতে পারে নি।...শাহ্‌জাদা এত বোঝেন, কাশ্মীরীবাঈ বেগম সাহেবার কষ্টটা যে কেন বোঝেন না। বিশেষ যিনি ওঁর জন্য এত করলেন!

বেগম সাহেবার সেই আশ্চর্য সুন্দর চোখ দুটিতে কী করুণ অশ্রুই না দেখেছে সে! তার মতো সামান্য গোলামের হাত ধরে তিনি অনুনয় করেছেন শুধু একটুখানি খবরের জন্য। সে এতই হতভাগ্য আর অপদার্থ যে আজ পর্যন্ত সেটুকুও দিতে পারল না। অথচ খোদার নামে শপথ ক’রে এসেছে সে, মালিকের নামেও—যাঁকে এ দুনিয়ায় খোদার পরই মান্য করে, ভালবাসে আরও বেশী।

সেইটেই যে ভুলতে পারছে না কিছুতে। ভুলতে পারছে না সেই দুটি সজল চোখের মিনতি।...

সেদিন সন্ধ্যার সময়ই দপ্তরের কাজ শেষ ক’রে শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব বড় বেগম সাহেবার মহলে চলে গেলেন। শোনা গেল রাতের খানাও সেই-খানেই যাবে। তার মানে ওঁর ব্যক্তিগত ভৃত্যদের সে রাত্রির মতো ছুটি, সেই সঙ্গে দেলওয়ারেরও।

দেলওয়ার এটাকে যেন ঈশ্বরেরই ইঙ্গিত মনে করল। আসলে তার মন এই ধরনের একটা ইঙ্গিত খুঁজে বেড়িয়েছে সারাদিন—একটা কোন প্রশ্রয় ওর গোপন সংকল্পের। সারাদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে সে, এখন এমনিই প্রায় হার মেনে বসেছিল, এইটেই খোদার নির্দেশ মনে ক’রে শান্তি পেল।

বৃথা ভয় পাচ্ছেন শাহ্‌জাদা। কাম ফতে ক’রে এসে সে তাঁকে তাক লাগিয়ে দেবে। রাগ করবেন অবাধ্যতার জন্যে? তা হয়ত করবেন, তবে এমন কিছু শাস্তি দেবেন না। আসলে তিনিও এটা মনে মনে চান, তিনি কি আর কাশ্মীরীবাঈ বেগম সাহেবার ব্যথা বুঝছেন না? শুধু তার বিপদের কথা ভেবেই নিরস্ত করতে চাইছেন। কিন্তু কি আর বিপদ হবে? জহিরণ তো থাকবে বলেছে, যদি না থাকে সে তো ফিরেই আসবে।...

দূরে কিল্লার ঘড়িতে এগারোটা বাজার সঙ্গে সঙ্গে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে পড়ল সে।

তার টাট্টু ঘোড়াটা সে আগেই বাইরে বেঁধে রেখে এসেছিল।

এটা শাহ্‌জাদার উপহার তাকে, এবারের এই সফল দৌত্যের বকশিশ।

কেউ কিছু বললও না তাকে অসময়ে বাইরে যাবার জন্যে, সকলেই জানে সে বয়সে বালক হ'লেও শাহ্‌জাদার প্রিয় এবং বিশ্বস্ত সেবক, নানা রকম সম্ভব অসম্ভব কাজে তাকে যখন তখন পাঠান তিনি। কোন কৈফিয়ৎ চাইতে যাওয়াও ঠিক নয়।

রাস্তায় পড়ে দেলওয়ার খানিকটা কদম চালে নিয়ে গেল ঘোড়াটাকে। তারপর, শাহ্‌জাদার সম্ভাব্য শ্রুতিসীমার বাইরে আসতে পেরেছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল। শাহ্‌জাদা নিশ্চয়ই এতক্ষণ শুয়ে পড়েছেন, বড়ে বেগম সাহেবার মহলও দূরে—তবু শাহ্‌জাদার চোখ এবং কান যে কতদূর যায়—আজও যেন তার হিসাব পেল না দেলওয়ার।

বড়ে শাহ্‌জাদার বাড়ি থেকে বেশ খানিকটা দূরেই আবার ঘোড়ার গতি কমিয়ে দিল সে। একেবারে কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া যাবেও না, খানিকটা পায়ে হেঁটেই যেতে হবে। রাত্রে বাড়িতে পাহারা থাকে, ঘোড়ার পায়ের শব্দ পেলে সকলেই সতর্ক হয়ে যাবে।

জায়গাটা আগেই একদিন দেখে গিয়েছিল সে—দিনের বেলায়। খানিকটা পোড়ো জমির মতো খালি পড়ে আছে, তাতে নিচু নিচু কাঁটা গাছ কতকগুলো—ঠেঠি আর বেত-ঝোপ, কিছু শিয়াকুল—আর কিছু নেই। সে মাঠ পেরিয়ে গেলে নিচু খানার মতো পড়ে কতকটা—তারপর শাহ্‌জাদার বাড়ির পাঁচিল। দেওদার ও চেনারে যেখানে জড়াজড়ি, সেখানটাও চিহ্নিত করা আছে। রাত্রেও ভুল হবে না। সে মাঠেরও এপারে একটা গাছে ঘোড়াটাকে বেঁধে সাবধানে এগিয়ে চলল। ইচ্ছে ক'রেই গাঢ় সবুজ রঙের পোশাক পরে এসেছে, রাত্রে না দূর থেকে কারও নজরে পড়ে। পায়ে খুব নরম চামড়ার জুতো, তবু সেটা নিচে খুলে রেখে খালি পায়েই পাঁচিলে উঠল।

পাঁচিলে উঠে কিছুক্ষণ স্থির হ'য়ে বসে রইল সে। কোথাও কোন শব্দ আসে কি না কোন দিক থেকে, কান খাড়া ক'রে শুনে নিল, অন্ধকারে চোখ অভ্যস্ত হয়ে গেছে এতক্ষণে—বেশ ক'রে চেয়েও দেখল চারিদিকে। না, মানুষ তো দূরের কথা, কোথাও কোন জীবিত প্রাণীর চিহ্ন নেই। অন্তত সেখানটায়।

অনেকক্ষণ দেখে, কিল্লার ঘড়িতে বারোটা বাজা শুরু হ'তেই সেই শব্দের সুযোগে টুপ ক'রে ভেতরে নেমে পড়ল সে।

যেখানে নামল তার পাঁচ-সাত হাত তফাতেই আম গাছটা; তার ছায়ায় গুঁড়ির সঙ্গে গা মিশিয়ে নিশ্চল দাঁড়িয়ে ছিল জহিরণ, এবার নিঃশব্দ ক্ষিপ্রগতিতে কাছে এসে চাপা গলায় প্রশ্ন করল, 'কে, কে তুমি?'

'আমি দেলওয়ার হোসেন। তুমি তো জহিরণ বিবি?' তেমনি ভাবেই প্রায় অস্ফুট স্বরে উত্তর দিল সে।

জহিরণ আর কথা কইল না। শুধু ওর কাঁধটা ধরে সঙ্গে আসবার ইঙ্গিত জানাল। কোথায় কোথায় শুকনো পাতা আছে জহিরণ জানে, অথবা নিজেই আগে এসে সরিয়ে দিয়ে গেছে সে—শব্দ হওয়ার সম্ভাবনা বাঁচিয়ে গাছের ছায়ায় ছায়ায় গা ঢাকা দিয়ে এগিয়ে চলল ওরা; হাত পায়ের

পর্যন্ত কোন শব্দ না ক'রে। জহিরণের সঙ্গে কোন হাতিয়ার নেই আজ, বাইরে যেতে হবে না, হাতিয়ারের দরকার নেই। মিছিমিছি আওয়াজ হওয়ার ভয় থাকে তাতে।

দীর্ঘপথ পেরিয়ে দালানের পেছনের দরজাটার সামনে এল ওরা। এই-খানে এসে জহিরণ থমকে দাঁড়াল একবার। দেলওয়ার কিছু শোনে নি, কিন্তু জহিরণের মনে হ'ল কী যেন একটা সামান্য শব্দ পেল সে, যেন তাদেরই মতো পা টিপে টিপে কেউ আসছে। রাত্রে পাহারা দেয় জহিরণ, এতটুকু আওয়াজ ধরে নিতে অভ্যস্ত তার কান। সে নিঃশ্বাস রোধ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল—আর একবার সেই শব্দ পায় কি না। কিন্তু সব নিস্তব্ধ, দূরে বড় ফটকের দিকে সান্ত্রীরা পায়চারী করছে, আর কোন প্রাণলক্ষণ নেই কোথাও। তারই মনের ভয় বা ভ্রম—মনে ক'রে জহিরণ নিশ্চিন্ত হ'ল। দালানের দরজা ভেজানোই ছিল, কব্জায় নিজে তেল দিয়ে রেখেছে সে, খুলে ভিতরে ঢুকে গেল। ভেতরের একমাত্র তেলের আলোর তখন প্রায় নিবন্ত অবস্থা, সম্ভবত তেল নেই। হয়ত জহিরণই কোন সময় খানিকটা তেল কমিয়ে দিয়ে গেছে।....

দালান পেরিয়ে ওপরের দালান পেরিয়ে নির্বিঘ্নে কাশ্মীরীবাঈয়ের ঘরে পেঁছিল ওরা। বেগম সাহেবা জেগেই বসেছিলেন, সেই ভেট আসার পর থেকে—প্রতি দোসম্বা ও সেসম্বা অর্থাৎ মঙ্গল ও বৃহস্পতিবারে জেগেই থাকেন তিনি, এক ঘড়ি না বাজা পর্যন্ত। বসে থাকেন দেলওয়ারের আশায়, মন উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে, যদিচ তাঁর সহজাত বুদ্ধি বলে যে আসার প্রয়োজন নেই, অনর্থক বহুলোকের বিপদ টেনে আনা। কদিন শাহ্‌জাদা দারা তাঁর ঘরে আসছেন না, কারও ঘরেই যাচ্ছেন না অবশ্য, নিজের দপ্তরঘরে বাস করছন—কিন্তু তাঁর যা চেহারা হয়েছে, জহিরণের মুখে যা শুনেছেন—একদিন আড়াল থেকে নিজেও এক লহমা দেখেছিলেন—তাতে ভয়ই হয়েছে তাঁর, খুবই ভয় হয়েছে। হয়ত উনি কিছু জেনেছেন কিম্বা সন্দেহ করেছেন। ঠিক কতটা জেনেছেন বা সন্দেহ করেছেন তা না জানা পর্যন্ত বেগমসাহেবা স্বস্তি পাচ্ছেন না মনে।

দেলওয়ারকে দেখে ছুটে এসে আজও ওর হাত দুটো ধরলেন। এমনি একটি ছোট ভাই ছিল তাঁর, আজ সেও, যদি বেঁচে থাকে, এতবড়টিই হয়েছে—এমনই সুন্দর। কে জানে ভাগ্য তাকে কোথায় নিয়ে ফেলেছে, সেও এমনি কোথাও দাসত্ব করছে কি না কে জানে!

কিন্তু সময় নেই মোটে। কাজটা যে ভাল হয় নি, বড় বেশী দুঃসাহসিক হয়েছে তা বেগমসাহেবা জানেন। যতক্ষণ বা যতদিন আসে নি, আশাটা আর আকুতিটাই প্রবল ছিল, এখন শুধুই আশঙ্কা। বেগমসাহেবা কোন বৃথা ভূমিকা করেন না, চাপা এবং দ্রুত কণ্ঠে বলেন, 'শাহ্‌জাদা, শাহ্‌জাদা কেমন আছেন? রাজী-খুশী আছেন তো? তিনিই কি তোমাকে পাঠালেন, না তুমি নিজেই এলে? জানিয়ে এসেছ তো? আমাকে কি কিছু বলে পাঠিয়েছেন? আমাকে, আমাকে এখনও ইয়াদ আছে

তাঁর ?'

ওঁর ব্যাকুলতা দেখে আজও দেলওয়ারের চোখে জল এসে পড়ে। সে মনে মনে ভগবানের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে মিথ্যে বলে, 'হ্যাঁ, তিনিই তো পাঠালেন। আপনাকে জানাতে বলেছেন যে আপনি যা করলেন—সে ঋণ তিনি কখনও ভুলবেন না। যদি খোদা দিন দেন তো তিনিও দেখিয়ে দেবেন যে তিনি বেইমান নন। আপনাকে তিনি কোনদিনই ভোলেন নি—এই কথাটা জানাতে বলে দিয়েছেন বার বার।'

'এইটুকুই আমার যথেষ্ট পুরস্কার। ভগবান যিশু তোমার মঙ্গল করুন ভাই, কিন্তু তুমি এবার যাও। আর এসো না এখন। মালিকের ভাবভঙ্গী ভাল লাগছে না। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে আমার বুক কাঁপছে। আমার অদৃষ্টে যা আছে হবে, যদি বেঁচে থাকি তো তাঁর খবর পাবই। তাঁর জয় হবে, তাঁর উন্নতি হবে। তাঁকে বলো যে আমি জানি তিনিই মুঘলদের শাহী তখ্তে একদিন বসবেন। তাঁকে রুখতে পারে এমন কেউ নেই। তাঁর সিকি যোগ্যতাও নেই এদের। বলো যে তাঁর সুখেই আমার সুখ, তাঁর উন্নতিতেই আমার আনন্দ। যেখানেই থাকি আমার মন পড়ে থাকবে তাঁর পায়েই। তুমি এখন যাও ভাই, যদি দিন পাই, সেদিন তোমার যোগ্য পুরস্কার দেব, এখন সামান্য টাকা মোহর দিয়ে তোমার অপমান করব না।'

দেলওয়ার আরও কি বলতে যাচ্ছিল কিন্তু কান্নায় গলা বুজে আসায় বলতে পারল না। এ কান্না কিসের তা সে জানে না, আপাতত কোন দুঃখই নেই বেগম সাহেবার—শুধু তাঁর এই আবেগই ওর মনের সূক্ষ্ম ও কোমল আবেগের তারে আঘাত করেছে, সেই আঘাতের ব্যথায় সে তার কাঁপছে রিন্‌রিন্ করে।

বলবার সময়ও পেল না অবশ্য। অসহিষ্ণু জহিরণ ওকে প্রায় টেনেই বাইরে নিয়ে এল। সময় নেই আর। এখনও কিছু বিপদ ঘটে নি কিন্তু তারও ভাল লাগছে না এ-বাড়ির কদিনের আবহাওয়া। জাবেদ আলি মাঝে মাঝে তার দিকে বিচিত্র দৃষ্টিতে চায়। যেন তাকে হুঁশিয়ার ক'রে দিতে চায়। তার অজ্ঞাত কোন বিপদের দিকে সঙ্কেত করতে চায়। কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না। জহিরণও সাহস ক'রে না প্রশ্ন করতে। কদিন ধরেই তার মনে হচ্ছে অনেকগুলো সতর্ক চোখ সর্বদা একটা অদৃশ্য দৃষ্টির জাল পেতে রেখেছে তার চার দিকে।

আবার সেই ওপরের দালান পেরিয়ে সিঁড়ি। সিঁড়ি থেকে নিচের দালান। এবার সেখানকার সামান্য আলোটুকুও আর নেই। তা না থাক, এ পথের নাড়ী-নক্ষত্র জহিরণের জানা, সে দেলওয়ারের একটা বাহুমূল ধরে অভ্রান্ত পদক্ষেপে বাইরে নিয়ে এল।

একেবারে বাইরে পা দিয়ে দেলওয়ার যেন আশ্বস্ত হয় একটু। হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। নক্ষত্রের আলো নেই, আকাশ মেঘে ঢাকা—তবু ভেতরের থেকে এখানে নজর চলে কিছু। কিন্তু জহিরণ অতটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারল না। আবারও যেন কী আওয়াজ পেল সে। খুব দূরে—খুব চাপা একটা শব্দ।

তবু এবার আর নিজেরই ভয়ের প্রতিধ্বনি বলে মনে হ'ল না। মনে হওয়ার কোন কারণ নেই। বাগানে প্রহরী থাকে—কিন্তু তার মধ্যে ওর ভাইও আছে। তাকে বলাই আছে, বেগম সাহেবা অনেক মোহর দিয়ে বশ করেছেন তাকে—সে বাকী দুজনকে বাগানের বড় ফটকের দিকে টেনে নিয়ে যাবে এই সময়টায়—এদিকটায় ফাঁকা রাখবে।

শব্দটা কেমন যেন অনৈসর্গিক, যে সব শব্দ শুনতে অভ্যস্ত সে—সে রকম নয়। ধাতব শব্দ একটা। খুবই চাপা, খুব সাবধানে কোন জিনিস নাড়তে গিয়ে দৈবাৎ যেমন এক-আধটু শব্দ হয়ে যায় তেমনিই। কিন্তু কিসের শব্দ, কে করছে?

জহিরণ দেলওয়ারের কানের মধ্যে মুখ দিয়ে বলে, 'জলদি জলদি, আর এক লহমাও দেরি নয়, শিগ্‌গির চলো, যতটা পারো শিগ্‌গির।'

প্রায় টানতে টানতেই নিয়ে যায়। সোজাসুজি ছুটতে ভরসা হয় না। দৌড়লে খালি পায়েরও আওয়াজ উঠবে।...

প্রায় পাঁচিলের কাছাকাছি গিয়ে পড়েছে। আমগাছটা থেকে মাত্র হাত কতক দূরে।

দুজনেই শুনল এবার।

এবার আর ভুল হওয়ার কোন কারণ নেই। এ শব্দ দুজনেরই পরিচিত। কোন জন্তুর নরম পায়ের আওয়াজ। এই দিকেই দৌড়ে আসছে।

এক নয়—একাধিক। ভারী বড় জন্তু।

জহিরণ প্রাণপণে দৌড়তে লাগল এবার।

দেলওয়ারের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলল। আর শব্দের ভয় করলে চলবে না। এবার সে মরীয়া। এই কহাত ব্যবধান যদি পার হ'তে পারে—কোনমতে বাচ্চাটাকে পাঁচিলে তুলে দিতে পারে, তাহ'লেই নিশ্চিন্ত সে। তার নিজের জন্যে সে ভাবে না—যা আছে অদৃষ্টে হোক।

কিন্তু সেই সামান্য অবসরটুকুও মিলল না।

তার আগেই, সেই গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে জমাট বাঁধা গাঢ়তর অন্ধকারের মতো—মসীকৃষ্ণ দৈত্যের মতো কতকগুলো কি প্রাণী ঝাঁপিয়ে পড়ল—একেবারে তাদের ওপর।

॥ ১১ ॥

পরের দিন সকালবেলাই শাহ্‌জাদা দারার কয়েকজন প্রহরী একটা মৃতদেহ কাপড়ে জড়িয়ে এনে শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেবের সামনে নামাল। ওদের সঙ্গে এসেছিল উচ্চশ্রেণীর ভৃত্য একজন, সে সসম্মানে একটা খৎ ধরল ওঁর সামনে।

আওরঙ্গজেব জানেন, এমনিই একটা অনুমান করেছিলেন তিনিও—যখন ভোরে উঠে শুনেছেন যে দেলওয়ার কাল রাত দ্বিতীয় প্রহরের আগে

কোথায় বেরিয়ে গেছে, এখনও ফেরে নি। তার পরিণাম কি হয়েছে সঠিক না জানলেও ভাল যে কিছু হয় নি—তা বুঝতে পেরেছেন সঙ্গে সঙ্গেই। ফজরের নমাজ করার সময় যেখানেই থাক, কাছাকাছি এসে দাঁড়ায় সে, এ তার নিত্যকার অভ্যাস।

শাহ্জাদা কতকটা যন্ত্রচালিতের মতো খাস মুন্সীকে ইঙ্গিত করলেন খৎখানা নিতে।

চিঠি লিখেছেন বড়ে শাহ্জাদার মীর মুন্সী।

লিখেছেন যে, কাল রাত্রে বড়ে শাহ্জাদার বাগানের পাঁচিল টপ্কে এক চোর নেমেছিল। চুরি কি অপর কোন মতলব ছিল তা তাঁরা জানেন না, তবে নিঃশব্দে পাঁচিল টপকে মধ্য রাত্রে যে পরের বাড়ি ঢোকে, তাকে চোরই বলা উচিত। সম্ভবত প্রাসাদের কারও সঙ্গে ষড়যন্ত্র ছিল তার। ইদানিং এই শ্রেণীর চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়ায় শাহ্জাদা তাঁর শিক্ষিত শিকারী কুকুরদের বাগানে ছেড়ে রাখার ব্যবস্থা করেছেন। ওঁদের সান্ত্রী প্রহরী বা কোন নৌকর এসে পড়ার আগেই কুকুরগুলো তাদের ওপর গিয়ে পড়েছে। ঐ চোর ছাড়াও একটি স্ত্রীলোক ছিল, সে প্রাসাদেরই কোন বাঁদী। সম্ভবতঃ তার সঙ্গেই দেখা করতে এসেছিল, বা তার সাহায্যে চুরি করার উদ্দেশ্য ছিল। ভৃত্য বা প্রহরীরা গিয়ে কুকুরগুলোকে ধরবার আগেই তারা দুজনের দেহ খণ্ড খণ্ড ক'রে দিয়েছে, কেউই বেঁচে নেই ততক্ষণ।...চোরের দেহ ওঁরা বাইরেই ফেলে দিতেন—কিন্তু শাহ্জাদা দারার কোন ভৃত্য চোরের পোশাক এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দেখে সন্দেহ প্রকাশ করেছে যে চোর শাহ্জাদা আওরঙ্গজেবের কোন বান্দা। একদিন তাকে নাকি শাহ্জাদার সঙ্গে এ বাড়িতেও আসতে দেখেছে তারা। শাহ্জাদা দারা অবশ্যই বিশ্বাস করেন নি কথাটা, তবু কথাটা যখন উঠেছেই—তখন একবার তাঁর প্রিয়তম ভাইয়ের কাছে দেহটা পাঠানোই কর্তব্য মনে করেছেন। যদি এ লাশ সত্যিই তাঁর কোন বান্দা বা পরিচিত কারও হয়—শাহ্জাদা স্বচ্ছন্দে ইচ্ছা মতো যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করতে পারেন। আর সেক্ষেত্রে আন্তরিক দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া বড়ে শাহ্জাদার অন্য কোন কৈফিয়ৎও দেবার নেই। কারণ যা হয়েছে তা দৈবক্রমেই ঘটেছে, বড়ে শাহ্জাদার অজ্ঞাতসারেই। সাধারণ তস্করের জন্য যে ব্যবস্থা রাখা উচিত তাই রেখেছিলেন তিনি।....পরিশেষে শাহ্-জাদা দারা শুকো যে তাঁর ভাইয়ের জন্য নিত্য পরমেশ্বরের কাছে দোয়া ভিক্ষা করেন—সেই প্রয়োজনীয় সংবাদটি দিয়ে পত্র শেষ করেছেন দারার মীরমুন্সী।...

বাহকদের মধ্যেই কে যেন কী ইঙ্গিত করল, আর একজন শবদেহের আবরণ-বস্ত্র সরিয়ে অনাবরিত ক'রে দিল। আওরঙ্গজেব অবিচলিত স্থির দৃষ্টি মেলে দেখলেন। এ দেহ চেনবার কোন উপায় নেই, মুখ থেকেও খানিকটা মাংস খুবলে নিয়েছে। দেহের বেশির ভাগ স্থানেই সাদা হাড় বেরিয়ে গেছে। কতকগুলো রক্তাক্ত মাংসের টুকরোও এর সঙ্গে জড়ানো—সবগুলো এই দেহেরই কিনা বোঝা সম্ভব নয়। সবগুলো হয়ত নেইও,

খেয়েও ফেলেছে ক্ষুধার্ত সারমেয়র দল। যেখানে যেখানে এখনও মাংস আছে শরীরে, সেখানগুলোও রক্তে মাখা। এ থেকে সনাক্ত করার কোন সঙ্গত কারণ নেই, পোশাকেও এমন কোন চিহ্ন নেই, যাতে চেনা যায়। তার মানে ওকে অক্ষত দেহেই দেখেছে কেউ কেউ—কুকুর ছাড়া হয়েছে তার পরে। দারা হয়ত আশাই করেছিলেন, এ বাড়ি থেকে কোন লোক যাবে—তার জন্যে বিস্তৃত আয়োজন ক'রে রেখেছিলেন।

অবিচলিত ভাবলেশহীন মুখে লাশটা একবার দেখে নিয়ে ঘাড় নাড়লেন আওরঙ্গজেব, 'না, এ আমার কোন বান্দা কি নৌকর নয়। আমি চিনি না একে। এ লাশ তোমরা নিয়ে যাও, শাহ্‌জাদা যা ভাল বোঝেন সেই মতোই ব্যবস্থা করবেন তিনি। তিনি যে এতটা বিবেচনা ক'রে আমার কাছে পাঠিয়েছেন—এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। তাঁর এ মেহেরবানী ও সহৃদয়তার কথা ইয়াদ থাকবে আমার।'

তারপর নিজের মীর-ই-বকাউলকে আদেশ দিলেন, 'বড়ে শাহ্‌জাদার লোক এরা, কিছু কিছু বকশিশ দিতে ভুল না হয়। একটু ক'রে শরবৎ আর কিছু মিঠাইও খাইয়ে দিও এদের—এই গরমে এতটা পথ লাশ বয়ে এনেছে—'

আর কোন প্রশ্ন করলেন না তিনি, কোনও ঔৎসুক্য প্রকাশ করলেন না। মনোভাব গোপন করার শিক্ষা তাঁর বংশে সহজাত, কিন্তু শাহ্‌জাদা আওরঙ্গজেব কঠোর অভ্যাসে মনটাকে সুদ্ধ নির্বিকার ক'রে তুলতে পেরেছেন। অকারণ কৌতূহল নেই তাঁর। যে খবর দিতে গিয়েছিল তার এ দুর্গতি দেখে যাকে খবর দিতে গিয়েছিল— সেই কাশ্মীরীবাই সম্বন্ধে একটা আশঙ্কা ও ঔৎসুক্য স্বাভাবিক—কিন্তু বোধ করি তাও অনুভব করলেন না তিনি। যদি সেখানেও বিপদ কিছু হয়েই থাকে—তিনি কোন প্রতিকার করতে পারবেন না। আর যদি বেঁচে থাকে তো একদিন তাকে সেখান থেকে উদ্ধার ক'রে আনবেনই—এ সংকল্প বহু পূর্বেই নেওয়া হয়ে গেছে। সুতরাং ও প্রশ্নের ঐখানেই শেষ। তার জন্য বিচলিত হবার প্রয়োজন নেই।...

স্থির অবিচল মুখেই নিজের মুন্সীখানায় এসে ঢুকলেন তিনি। এই ঘরে দেলওয়ারের অসংখ্য স্মৃতি—কালও অনুনয়-বিনয় ক'রে তাঁর পায়ে হাত বুলিয়ে দেবার অনুমতি আদায় করেছিল। এই শ্রেণীর ব্যক্তিগত আরামে চিরদিনের বিতৃষ্ণা শাহ্‌জাদার—ছেলেটার তেমনি লোভ সেবা করার।

কিন্তু তবু, এ ঘরে এসেও শাহ্‌জাদার চোখে জল এল না। বরং নির্জন নিভৃতে এসে দুই চোখে আগুনই জ্বলে উঠল। মাটির দিকে চেয়ে অস্ফুট, প্রায় অশ্রুত স্বরে বললেন, 'ভুল করলে, বড়ই ভুল করলে শাহ্‌জাদা দারা। অন্যায় করেছিল ঠিকই—তা বলে এতটা না করলেও পারতে।...... তাকে কয়েদ ক'রে পায়ে বেড়ি পরিয়ে আমার কাছে পাঠালে আরও বেশী শোধ উঠত তোমার। ঢের বেশী সাজা হ'ত, তারও—আমারও। আমাকে

অপদস্থ করার এমন সুযোগ তুমি হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে।....নির্বোধ তুমি, একটা অবোধ বালকের রক্তের ঋণ মাথায় চাপিয়ে দিলে আমার! আর কোন বিবেচনার কারণ রইল না।—যেটুকু দ্বিধা ছিল, তুমিই তা কাটিয়ে দিলে। একই সঙ্গে শাহী তখ্‌ৎ, নিজের জিন্দিগী আর তোমার ছেলেদের তক্‌দির—এক বাজীতে হেরে বসে রইলে। এই প্রতিটি বিন্দু রক্তের কিম্মৎ তোমাকে ওয়াশিল দিতে হবে—তোমার রক্তে—তোমার উত্তরপুরুষদের রক্তে। তুমি কি করলে হতভাগ্য শাহ্‌জাদা, এ কী করলে!'

চোখের সে বহ্নি কখন অন্তরের বাষ্প আকর্ষণ ক'রে মেঘের সৃষ্টি করেছিল, দৃষ্টি আচ্ছন্ন ক'রে দিয়েছিল, তা আওরঙ্গজেব নিজেও টের পান নি। এক ফোঁটা গরম জল গালে গড়িয়ে পড়তে চমক ভাঙ্গল তাঁর। হৃদয়াবেগের এই পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়ায় জনহীন ঘরেও যেন লজ্জা বোধ করলেন—তাড়াতাড়ি রুমালে তার চিহ্ন পর্যন্ত মুছে নিয়ে শান্তভাবে একখানা কাগজ আর দোয়াত কলম টেনে নিয়ে যেন চিঠি লিখতে বসে গেলেন তখনই।

শুধু দেলওয়ার থাকলে লক্ষ্য করত, কপালের দু পাশে রগের কাছে দুটো জায়গা তখনও মধ্যে মধ্যে ফুলে উঠছে একবার ক'রে—দৃঢ় কোন সংকল্পের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে।